সাহিত্য-সংহিতা।

সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা।

একাদশ খণ্ড।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩১৭

কলিকাতা।

সূচীপত্র।

সাহিত্য-সংহিতা।

[illegible] খণ্ড] ১৩১৭ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা।

বিদায়।

১

মনে আছে তায় ?
[illegible] ক ল'য়ে, আনন্দে অধীর হ'য়ে
[illegible]বাহন, বরষ তোমায় ;
[illegible]ল্লাস-আশা গিয়াছে কোথায় ?

২

রোগ, শোক, হা হুতাশ,
তপ্ত অশ্রু দীর্ঘশ্বাস,
অবনতি অপচয় অতৃপ্ত-অনল,
সুদীর্ঘ-বরষ ভরি পেয়েছি কেবল।

৩

সুখ-শান্তি ধন মান,
তোমার স্নেহের দান,
তেমনি স্নেহের দান শোক সমুদায়
জানি, তাই প্রিয়তম,
তুমি সখা, স্বামী মম,
আমার যা উপযুক্ত দিয়াছ আমা[illegible]

৪

তাই তব শ্রীচরণে
আমরা অনন্যমনে
[illegible]খে, মহাকাল ! করি নমস্কা[illegible],
ইচ্ছা পূর্ণ হউক তো[illegible]।

বর্ষ আবাহন।

১

অতীত ও ভবিষ্যত মিলনের পথে
নব বর্ষ ! তুমি সমাগত,
আমরা সকলে আসি দশ দিক্ হ'তে
গাই আজি তোমায় "স্বাগত !

২

যত যাতনার জ্বালা যাউক নিভিয়া
সুধাময় পরশে তোমার,
নব উন্নতির আশা উঠুক জাগিয়া
আমাদের হৃদয়ে সবার,

৩

দলাদলি দ্বেষ হিংসা ঘৃণা ও নীচতা
তব পদে দিয়ে বলিদান,
ভালবাসা পরস্পরে স্নেহ ও মমতা
[illegible] ধরে এই আ[illegible]ন

বৈশেষিক দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

উহাদের প্রত্যক্ষ নিবারণের জন্য প্রত্যক্ষের প্রতি অভিব্যক্ত-রূপকেই কারণ বলিতে হইবে, এই জন্যই কণাদ বলিয়াছেন যে, অভিব্যক্ত-রূপাভাব প্রযুক্তই বায়ুতে প্রত্যক্ষরূপ কার্য্যের অভাব সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অভিব্যক্তরূপের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। অভিব্যক্ত-রূপের উল্লেখ করিয়া বায়ুতে অনভিব্যক্ত-রূপের কর্ত্তা অঙ্গীকার করেন নাই। কিরূপে যে বায়ুতে অনভিব্যক্তরূপ কণাদের মতে সিদ্ধ হইল, ইহা অন্ততঃ আমি বুঝিতে পারি নাই।

ন্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতমের সহিত বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতা কণাদের প্রমাণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গৌতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণচতুষ্টয়-বাদী, কণাদ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণ-দ্বয়বাদী। কণাদের মতে উপমান ও শব্দ এই প্রমাণদ্বয় অনুমানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। কণাদ বলেন, সাদৃশ্য জ্ঞান উপমান প্রমাণ, শব্দ-জ্ঞান শব্দ প্রমাণ। এই স্থলে যেরূপ ধূম-হেতু দ্বারা অগ্নির অনুমান সিদ্ধ হয়, সেইরূপ সাদৃশ্য হেতু দ্বারা ও শব্দ হেতু দ্বারা [illegible]

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চ [illegible]" এই শ্রুতিকে মূল ভিত্তি করিয়া গৌতম [illegible] দ্বৈতবাদী, কণাদও সেইরূপ দ্বৈতবাদী। উভয় মতেই জ্ঞান-সুখ-দুঃখ [illegible] গুণ। নিত্যজ্ঞান, নিত্য প্রযত্ন, [illegible] পরমাত্মার গুণ, পরমাত্মা জ্ঞান-সুখ-[illegible] নহে। "নিত্যবিজ্ঞানমানন্দং [illegible]" যে ব্রহ্মতাৎপর্য্যে আনন্দপদের [illegible] ঐ আনন্দপদের অর্থ দুঃখাভাব—সুখ নহে; উভয় মতেই নিত্য সুখের সত্তা নাই। জীবাত্মার নানাত্বসম্বন্ধে কপিল ও পতঞ্জলির সহিত কণাদ ও গৌতমের কোন মতভেদ নাই, পরন্তু কপিল ও পতঞ্জলির মতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। কণাদ ও গৌতমের মতে চৈতন্যের আশ্রয়। এইবার বৈশেষিক দর্শনের প্রতিপাদ্য স্থূল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতা কণাদ-মতে পদার্থ সপ্তবিধ, দ্রব্য গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায় ও অভাব। কোন কোন দর্শনকর্ত্তার মতে অগ্নির দাহানুকূল-শক্তি, একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি সংখ্যা ও সাদৃশ্য সপ্তপদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ। অগ্নির দাহানুকূলশক্তি যে অতিরিক্ত, [illegible] তাঁহারা বলেন যে অগ্নিতে [illegible] ধান অবস্থায় দাহ হয় না, [illegible] সরণ অবস্থায় দাহ হইয়া [illegible] বলিতে হইবে যে, মণ্যাদির [illegible] র দাহানুকূলশক্তি সংকুচিত [illegible] অপসারণে ঐ শক্তি পুনরু[illegible] হইয়া থাকে। ইহাতে [illegible] তিরিক্ত শক্তি কল্পনার [illegible]

প্রয়োজন নাই, মণ্যাদির সমবধানে অবস্থায় মণ্যাদি সমবধানরহিত অগ্নিকে দাহের প্রতিকারণ বলিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া। মণ্যাদির সমবধান অবস্থায় মণ্যাদি সমবধানরহিত অগ্নিরূপ কারণ না থাকায় দাহরূপ কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে, অগ্নির অতিরিক্ত দাহানুকূল শক্তির সংকোচ ও পুনরুত্তেজন স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ একত্ব দ্বিত্বাদি সংখ্যাও অতিরিক্ত পদার্থ নহে, গুণপদার্থের মধ্যে উহাদের সন্নিবেশ। উপমানগত অসাধারণ ধর্ম্ম উপমেয়ে সাদৃশ্য যেরূপ মুখে চন্দ্রগত আহ্লাদজনকত্বই চন্দ্র সাদৃশ্য। চন্দ্র দর্শনে যেরূপ আহ্লাদ জন্মায়, উত্তম মুখ দেখিলেও সেইরূপ আহ্লাদ জন্মায়, সুতরাং মুখে তুল্যরূপে আহ্লাদজনকত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম থাকায় মুখ চন্দ্রসদৃশ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সপ্ত পদার্থের মধ্যে দ্রব্য পদার্থ নববিধ — পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ-কাল দিক্ আত্মা মন। মীমাংসকমতে দ্রব্য পদার্থ দশবিধ ইঁহারা অন্ধকারকে দ্রব্য পদার্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। তাঁহারা বলেন, "তমস্তমালবর্ণাভং চলতীতি প্রতীয়তে। রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যং দশমং তমঃ॥" অন্ধকার, তমাল বৃক্ষের ন্যায় নীলবর্ণবিশিষ্ট আলোকের আগমন হইলে, স্থানান্তরে চলিত হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং নীল রূপ ও ক্রিয়া থাকায় অন্ধকার দ্রব্য পদার্থ ভিন্ন আর কি হইবে? যে হেতু গুণ ক্রিয়ার আশ্রয় ও [illegible] আশ্রয়ই দ্রব্য পদার্থ। ইঁহাকে [illegible] যে, তেজোবিশেষের অভাব [illegible] উহা ভাব পদার্থ নহে, [illegible] ক্রিয়াদি বুদ্ধি হয়, উহা ভ্রান্তিমাত্র।

দ্রব্য পদার্থের মধ্যে [illegible] উহারা অনিত্য. যাহারা [illegible] নিত্য, অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থের মধ্যে আকাশ কাল, দিক্, আত্মা, মন ও পরমাণু ইহারা নিরবয়বত্ব নিবন্ধন নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশরহিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত দ্রব্য পদার্থ সকল অনিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল। সুবর্ণের গুরুত্ব দেখিয়া অনেকে উহা পার্থিব পদার্থ মনে করেন, কিন্তু কণাদের মতে উহা তেজঃ পদার্থ। তিনি বলেন যে, পার্থিব মৃত্তিকাদির সহিত ও জলের সহিত অত্যন্ত অগ্নি সংযোগ হইলে উহাদের দ্রবত্বের উচ্ছেদ হইয়া থাকে, কিন্তু সুবর্ণের সহিত অত্যন্ত অগ্নি সংযোগ হইলেও উহার দ্রবত্ব নষ্ট হয় না, এই জন্য উহা পার্থিবও নহে, জলও নহে অথচ উহাতে রূপ আছে, সুতরাং উহা তেজের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হইবে, যেহেতু পৃথিবী জল তেজ ভিন্ন দ্রব্যে রূপের সত্তা নাই, তবে যে সুবর্ণে গুরুত্বের উপলব্ধি হয়, উহা কেবল সুবর্ণের সহিত পার্থিব পদার্থের সংসৃষ্টি থাকা নিবন্ধন। রূপ রসাদি ভেদে চতুর্বিংশতি প্রকার গুণ পদার্থ উৎক্ষেপণাদিভেদে কর্ম্ম পঞ্চবিধ। সামান্য অর্থাৎ জাতি পরাপরভেদে দ্বিবিধ। পরমাণুদিগের পরস্পর ভেদক ধর্ম্মই বিশেষ, এই বিশেষ পদার্থকে অন্যান্য দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না। কেবল কণাদই স্বীকার করিয়া থাকেন, এই জন্য কণাদদর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। এই বৈশেষিক নামটী যৌগিক। অবয়বাবয়বিও গুণ-গুণি প্রভৃতির নিত্য সম্বন্ধই সমবায়, সেই সমবায় [illegible]

এবং তাঁহার অনুক্ত কতিপয় পদার্থের অঙ্গীকার করিয়াছেন। কণাদ-মতে দিক্ ও কাল অতিরিক্ত পদার্থ, শিরোমণি-মতে দিক্ ও কাল ঈশ্বরানতিরিক্ত। এই সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, প্রাচ্যাং ঘটঃ পূর্ব্বদিকে ঘট, ইদানীং ঘটঃ এইকালে ঘট, তদানীং ঘটঃ সেই কালে ঘট ইত্যাদি ব্যবহারকে ঈশ্বরাত্মক বিভুবিষয়ক বলিলেই চলিতে পারে, অতিরিক্ত দিক্ কাল মানিবার কোন প্রয়োজন নাই। মহর্ষি অতিরিক্ত আকাশকে শব্দের সমবায়ি কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, শিরোমণি বলেন, শব্দের নিমিত্ত-কারণস্বরূপে অবশ্য কৢপ্ত যে পরমেশ্বর উহাই শব্দের সমবায়ি কারণ, অতিরিক্ত আকাশ কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। গবাক্ষপ্রদেশে রবিকিরণের সম্বন্ধ হইলে ঐ রবি-কিরণের মধ্যে আমরা যে সকল সূক্ষ্ম রেণু দেখিতে পাই, উহাই শাস্ত্রে ত্রসরেণু। তাহার অবয়ব দ্ব্যণুক, তদবয়ব পরমাণু ইহা কণাদ স্বীকার করেন। এই স্থলে শিরোমণি ত্রসরেণুতেই বিশ্রাম বলেন, তদবয়ব দ্ব্যণুক ও পরমাণু স্বীকার করেন নাই। এই স্থলে কেহ আপত্তি করেন যে, ত্রসরেণুকে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উহাকে অপেক্ষাকৃত স্থূল বলিতে হইবে, সুতরাং যদি পরমাণু না থাকে, তাহা হইলে অণুপরিমাণেরও উচ্ছেদ হইবে। লোকে যে, অণু ব্যবহার হইয়া থাকে ঐ ব্যবহারের উপপাদন কিরূপে হইবে? এতদুত্তরে শিরোমণি বলেন যে, অপকৃষ্ট পরিমাণই [illegible] ব্যবহারের বিষয়, [illegible] [illegible] নাই, [illegible] অপকৃষ্ট [illegible] [illegible] ব্যবহার হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহার হইয়া

থাকে, সুতরাং বলিতে হইবে যে, নারিকেল হইতে অপকৃষ্ট পরিমাণই ঐ অণু ব্যবহারের বিষয়, এই দৃষ্টান্তে অপকৃষ্ট পরিমাণই সর্ব্বত্র অণু ব্যবহারের বিষয়, অতিরিক্ত [illegible] পরিমাণ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। আর একটী, আপত্তি হইতে পারে যে, অনেক অবয়ব দ্বারা গঠিত না হইলে তাহাতে স্থূল পরিমাণ জন্মায় না, ত্রসরেণু যদি দ্ব্যণুক ও পরমাণুরূপ অনেক অবয়ব দ্বারা গঠিত না হয়, তাহা হইলে উহাতে স্থূল পরিমাণ কোথা হইতে আসিবে? এতদুত্তরে শিরোমণি বলেন যে, ত্রসরেণুতে বিশ্রাম স্বীকার করিলে ত্রসরেণুকে অবশ্য পরমাণুর ন্যায় নিত্য বলিতে হইবে। নিত্য হইলে তাহার পরিমাণও নিত্য অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ, উহার কারণ অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নাই। কণাদ কোন স্থলেই অতিরিক্ত শক্তি কল্পনা করেন নাই, শিরোমণি স্থলবিশেষে অতিরিক্ত শক্তি কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, অগ্নিবিশেষে তৃণ ফুৎকার-কারণ, অগ্নিবিশেষে অরণি নির্ম্মন্থন কারণ, অগ্নিবিশেষে মণি রবি-কিরণ-কারণ, এইরূপ কারণত্রয় কল্পনা অপেক্ষা অগ্নির উৎপাদিকা একবিধ শক্তি কল্পনা করিয়া তাদৃশ শক্তিমৎকে কারণ বলিলেই উক্ত কারণত্রয় সংগৃহীত হইবে, কল্পনা লাঘব হইবে, শাস্ত্রীয় বিচারে লাঘব পক্ষই সমীচীন। কণাদ-মতে সংখ্যা গুণ পদার্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট, শিরোমণি-মতে সংখ্যা অতিরিক্ত। তিনি বলেন যে, একং রূপং একটী রূপ, দ্বে রূপে দুইটী রূপ; ত্রীণি রূপাণি তিনটী রূপ, এই সকল [illegible] যখন রূপেতে সংখ্যা ব্যবহার [illegible] হইতেছে তখন সংখ্যা কিরূপে গুণ-[illegible] হইবে? রূপ গুণপদার্থ, সংখ্যাও যদি গুণ [illegible]

কিরূপে গুণের সমাবেশ হইবে? শাস্ত্রে গুণ নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্থলে কেহ বলেন যে, রূপাদিতে যে সংখ্যা ব্যবহার হয়, উহা গুণ নহে, বুদ্ধিবিশেষ বিষয়ত্বমাত্র। এতদুত্তরে শিরোমণি বলেন যে, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই সংখ্যাকে বুদ্ধি-বিশেষ বিষয়ত্ব বলিলেই সকল সংখ্যা ব্যবহার নির্ব্বাহ হইতে পারে। সংখ্যাকে গুণের মধ্যেও সন্নিবেশ করিবার প্রয়োজন থাকে না। এইরূপ যুক্তি দ্বারা অনেক অতিরিক্ত পদার্থেরও অঙ্গীকার শিরোমণি করিয়াছেন। পদার্থ-তত্ত্বনিরূপণ-প্রকরণের শেষে শিরোমণি তিনটী পদ্য লিখিয়াছেন; যথা—

"অর্ব্বানাং যুক্তিসিদ্ধানাং মদুক্তানাং প্রযত্নতঃ।
সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তবিরোধো নৈব দুষণং॥"
অর্বানিরুক্তাঃ সিদ্ধান্তবিরোধেনাপি পণ্ডিতাঃ।
বিনা বিচারং ন ত্যাজ্যা বিচারয়ত যত্নতঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞান্ নত্বানত্বা ভবাদৃশান্।
ইদং যাচে মদুক্তানি বিচারয়ত সাদরং॥

এই পদ্যত্রয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে, মদুক্ত যুক্তিসিদ্ধ যে সকল বিষয় উহাতে অন্যান্য দার্শনিকদিগের যে সিদ্ধান্ত, উহার বিরোধ হইলেও ঐ বিরোধ দোষ হইবে না, আমি ঐ বিরোধ জানিয়াই ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে আমি সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে বার বার নমস্কার করিয়া তাঁহাদের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা যেন বিচার না করিয়াই উল্লিখিত বিষয়ের পরিত্যাগ না করেন।

এই স্থলে কোন সমালোচক "সুখ দুঃখ-জ্ঞাননিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যং।" এই কণাদ-সূত্রে ঐকাত্ম্যং এই পদটী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৈদান্তিক প্রভৃতি কতিপয় দর্শনকর্ত্তারা যেরূপ অদ্বৈতমতাবলম্বী, সেইরূপ কণাদও অদ্বৈতমতাবলম্বী। পরন্তু তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, ঐ সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র, সিদ্ধান্ত-সূত্র নহে। কণাদমুনি আত্মপরীক্ষা-প্রকরণ সমাপনান্তে আত্মনানাত্ব-প্রকরণের আরিপ্সু হইয়া পূর্ব্বপক্ষস্থলে ঐ সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রের তাৎপর্য্য এই, যেরূপ তত্তৎ প্রদেশাবচ্ছেদে শব্দ নিষ্পত্তি হইলেও শব্দরূপ লিঙ্গের অবিশেষ প্রযুক্ত আকাশ এক—নানা নহে, সেইরূপ সর্ব্বশরীরাবচ্ছেদে সুখ-দুঃখ-জ্ঞানোৎপত্তির অবিশেষ প্রযুক্ত আত্মাও এক—নানা নহে। এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত স্থলে কণাদ মহর্ষি "ব্যবস্থাতো নানা" এই সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ, প্রতিনিব ব্যবস্থাহেতুক আত্মা নানা, অর্থাৎ এই সংসারে কোন পুরুষ আঢ্য, কোন পুরুষ দরিদ্র, কোনও পুরুষ সুখী, কোনও পুরুষ দুঃখী, কোনও পুরুষ উচ্চবংশসম্ভূত, কোনও পুরুষ নীচ-বংশসম্ভূত, কোন পুরুষ বিদ্বান্, কোন পুরুষ নিন্দনীয়, এইরূপ ব্যবস্থা আত্মার নানাত্ব ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে; সুতরাং আত্মা নানা, এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীয়গণ উপপত্তি করেন যে, যেরূপ একাত্মা স্থলে জন্মভেদে ও বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেরূপ এক পুরুষ এক জন্মে দুঃখী, অপর জন্মে সুখী, অথবা বাল্যাবস্থায় সুখী, কৌমারাবস্থায় বা বার্দ্ধক্যাবস্থায় দুঃখী, সেইরূপ চৈত্রমৈত্রাদি দেহভেদেও ব্যবস্থা হইবে। ইহাতে উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র বলেন যে, কালভেদে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ হইতে পারে, কিন্তু এক কালে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কদাচ সঙ্গত নহে, অর্থাৎ এক পুরুষ এক কালে আঢ্য ও কালান্তরে দরিদ্র হইতে

পারে, কিন্তু এক পুরুষ এক কালেই আঢ্য ও দরিদ্র হইতে পারে না। আঢ্যত্ব ও দরিদ্রত্ব এই দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এককালে ঐ দুইটীর একত্র সমাবেশ হইতে পারে না, বিভিন্ন কালে হইতে পারে। পরন্তু দেখা যাইতেছে, এককালেই চৈত্র মৈত্র এই উভয়ের মধ্যে চৈত্র আঢ্য, মৈত্র দরিদ্র. ইহা একাত্মা স্থলে কিরূপে সম্ভবপর হইবে, সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মার নানাত্ব-বাদ স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন যে, কণাদ মহর্ষি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই প্রশস্তপাদাচার্য্য, কণাদ ও গৌতমকে সমান সিদ্ধান্তে উপনীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি কণাদ অদ্বৈতবাদী, আর গৌতম দ্বৈতবাদী হইতেন, তাহা হইলে প্রশস্তপাদাচার্য্যের ঐ নির্দ্দেশ অত্যন্ত অসঙ্গত হইত।

আমি কোনও কারণে এই প্রবন্ধের শেষে অপ্রাসঙ্গিক একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিষয়টী এই,—বর্ত্তমান সময়ে কলিযুগ-মাহাত্ম্যে যে সকল দ্বিজাতি-সন্তানের বেদাধিকার আছে অর্থাৎ বেদের অধ্যয়নে অধ্যাপনাতে ও বেদমন্ত্রোচ্চারণে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেই সকল দ্বিজাতি-সন্তান ঐ সকল কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদের পুরুষপারম্পর্য্যে দ্বিজাতিদিগের অনুষ্ঠেয় কার্য্যানুষ্ঠানের যোগ্যতা কোনও কালে ছিল না, তাঁহারা এক্ষণে দ্বিজাতির স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন! কালে আরও যে কত পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? দ্বিজাতির মধ্যে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের কেবল বেদের অধ্যয়নে অধিকার আছে, অধ্যাপনাতে অর্থাৎ শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইতে অধিকার নাই, পরন্তু ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই উভয় কার্য্যেই অধিকার আছে, এই জন্যই ব্রাহ্মণ তৎকালে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ভূদেব নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে ভূদেবের মধ্যে অনেকে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন না। এক্ষণে ভূদেবের কোনরূপ পদস্খলন হইলে ভৃত্যস্থানীয় যাঁহারা, তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, এবং সেই ভূদেব কিরূপে অপমানিত হন, কিরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ভগবান্ যে ভূদেবের পদাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, আজ সেই ভূদেব কালদোষে ও নিজ দোষে অনেকের পদদলিত হইতেছেন। না হইবেন কেন? আজ কি সেই ভূদেবের ভূদেবত্ব আছে? আজ কি সেই ভূদেবের ব্রহ্মতেজ আছে? আজ কি সেই ভূদেবের সন্ধ্যাবন্দন ভগবদুপাসনাজনিত মানসিক বল আছে? আজ কি সেই ভূদেবের ব্রহ্ম-কোপানল প্রজ্বলিত আছে—যে ব্রহ্ম-কোপানলে রাজা পরীক্ষিৎ-ভস্মীভূত হইয়াছিলেন! ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কেবল যজনে ও দানে অধিকার আছে, যাজন ও প্রতিগ্রহে অধিকার নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই সকলেই অধিকার আছে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মবিশিষ্টই ব্রাহ্মণ। তৎকালে দাতারা, ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করিতে স্বীকার করিলে, আত্মাকে চরিতার্থ মনে করিতেন। এক্ষণে অনেক দাতা, ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিজের আত্মা চরিতার্থ হইল মনে করেন না, ব্রাহ্মণকে চরিতার্থ করিলাম ইহাই মনে করিয়া থাকেন! কাল-মাহাত্ম্যই ইহার একমাত্র কারণ। ক্ষত্রিয়ের ত্রিবিধ ধর্ম্ম

যজন, অধ্যয়ন, দান। প্রজারক্ষণ ইহাঁদের জীবিকা। গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ এই আশ্রমত্রয়ে ইঁহাদের অধিকার আছে।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে,—"ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি পার্থিব দদ্যাদ্রাজা নযাচেত যজেত নচ যাজয়েৎ। নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ। নিত্যোসংযুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমং॥" ক্ষত্রিয় দান করিবেন, কাহারও নিকট কোনও প্রার্থনা করিবেন না; স্বয়ং যজন করিবেন, কাহাকেও যজন করাইবেন না; স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিবেন, শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইবেন না; প্রজাদিগের পরিপালন করিবেন, দস্যুবধের নিমিত্ত উদ্‌যুক্ত হইবেন; রণে পরাক্রম দেখাইবেন। বৈশ্যের শাস্ত্র-নিরূপিত ধর্ম্ম তিন প্রকার— অধ্যয়ন, দান, যজন। তাঁহাদিগের জীবিকা চারিপ্রকার—কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কুশীদ অর্থাৎ সুদ গ্রহণ দ্বারা ধনবর্দ্ধন। তাঁহাদের আশ্রম তিন প্রকার— ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ। শূদ্রের শাস্ত্রনিরূপিত ধর্ম্ম দ্বিজাতি শুশ্রূষা, দান, ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবপূজাদি, বিহিত পিত্রাদি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি। শূদ্রের গার্হস্থ্যমাত্র আশ্রম। শূদ্রের জীবিকা দ্বিজাতি শুশ্রূষা, ও কারুকর্ম্মাদি। শূদ্রমাত্রেরই বেদাধিকার নাই, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি এই,—"স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়েতাং।" স্ত্রী ও শূদ্র উভয়ই বেদাধ্যয়ন করিবে না। এই বিষয়ে পুরাণ বচনও প্রমাণ। বচন এই— "বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ।" ইতি পরাশর-বচন। শূদ্র বেদের একটী অক্ষরের বিচার করিলেও চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবেন। বেদের কথা দূরে থাকুক, শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রের পৌরাণিক মন্ত্র পাঠেও অধিকার নাই, ইহার প্রমাণ মৎস্য পুরাণবচন যথা—"এবং শূদ্রোপি সামান্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ সর্ব্বদা। নমস্কারেণ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদামান্নবদ্ বুধঃ।" শূদ্র মন্ত্র পাঠ না করিয়া কেবল নমস্কারমাত্রের উচ্চারণ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবেন। "নিষাদ স্থপতিং যাজয়েৎ" চাণ্ডাল জাতীয় রাজাকে যাগ করাইবে এইরূপ শ্রুতি থাকায়, ঐ যাগ নির্ব্বাহের জন্য বেদে ঋক্ বিশেষ কল্পিত হইয়াছে। ঐ কল্পিত ঋক দ্বারাই তাহাদের ফল নির্ব্বাহ হইবে, অন্য ঋক্ ব্যবহারে তাহাদের অধিকার নাই। যদি শূদ্রের বেদাধিকার থাকিত, তাহা হইলে ঋক্‌বিশেষের কল্পনার প্রয়োজন হইত না। বর্ত্তমান সময়ে দ্বিজাতি ভিন্ন অনেক বর্ণের বেদপাঠে ঔৎসুক্য দেখা যায়, এবং অনেক বর্ণ বেদপাঠের সুবিধার জন্য দ্বিজাতি হইতেও চেষ্টা করিতেছেন ইহা দেখা যায়। আবার কতিপয় পণ্ডিত ঐ বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্যও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে, যাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব, তাঁহারাও পূর্ব্বপুরুষের অননুশীলিতপথের অনুবর্ত্তন করিবেন না।

এই স্থলে অপর বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি, কালস্রোতই ইহার প্রধান কারণ, ব্যক্তিগত দোষ সহকারি মাত্র। বর্ত্তমান স্থলে অনেকের যে এই সকল দোষ ঘটিবে, ইহা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পূর্ব্বেই কলি-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কলি-মাহাত্ম্য এই,—"আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি। দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে। ন বেদাঃ প্রভবন্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ॥ তদালোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখাঃ। নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ।

নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ।
অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ।
ব্রাহ্মণাচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণং॥"

ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইলে স্মৃতিশাস্ত্রের ত কথাই নাই, বেদেরও প্রভুত্ব থাকিবে না। সেই কালে লোক সকল ধর্ম্মকর্ম্মবিমুখ হইবে, নীচাচারপরায়ণ ও নীচসংসর্গ-নিরত হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রাচারসম্পন্ন ও সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিত হইবে। লোভপরতন্ত্র হইয়া অযাজ্যযাজন করিবে, কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ মাত্র ব্রাহ্মণের চিহ্ন থাকিবে। অনেক ব্রাহ্মণ সেই সূত্রও ফেলিয়া দিবে, অনেক শূদ্র আবার তাহা কুড়াইয়া লইয়া গলদেশে ধারণ করিয়া দ্বিজাতির দলে গিয়া মিশিবে। কালস্বভাবে যে সমাজ-শৈথিল্য ঘটিতেছে, সভাসমিতির গঠন দ্বারা ইহার নিবারণের উপায় নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইঁহারাই যখন কালের অধীন, তখন কাল-স্রোতের গতির অন্যথা করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবেন? ভগবান্ যে সময়ে অনুকূল হইবেন, সেই সময়েই আমাদের সমাজ আবার পূর্ব্ববৎ গঠিত হইবে। এই রূপ সাময়িক অবস্থাতে কোনও রূপ দোষে ব্যক্তিবিশেষের নাম কীর্ত্তন করিয়া ব্যক্তি বিশেষের উপর ঘৃণা প্রকাশ করা সাধুচিত কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি না। হয়ত অনুসন্ধান করিলে, কালদোষে নিন্দাকারী ব্যক্তির এত অধিক দোষ বাহির হইতে পারে যে, নিন্দনীয় ব্যক্তির দোষ তাঁহার দোষের সহস্রাংশের একাংশ স্থানকেও অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থলে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক ব্যক্তিবিশেষের দোষানুসন্ধান চালনী কর্তৃক সূচীর ছিদ্রানুসন্ধানের সমান হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময় সমাজ গঠন দ্বারা পরচ্ছিদ্রানুসন্ধানের সময় নহে, নিজে যতদূর সাবধান হইয়া চলিতে পারা যায় ততদূর চেষ্টা করাই উচিত। কলিযুগে পাপ হইতে পরিত্রাণের অনেক সুবিধাও আছে। সত্যযুগে পাপীর সম্ভাষণ মাত্রে পাপ হয়, ত্রেতাযুগে পাপীর দর্শনে পাপ হয়, দ্বাপর যুগে পাপীর অন্ন ভক্ষণে পাপ হয়, কলিযুগে নিজ কৃত কর্ম্ম দ্বারা পাতিত্য হয়। ইহার প্রমাণ,—"কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ। দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥" যুগান্তর অপেক্ষা কলিযুগে পাপের প্রায়শ্চিত্তেরও অনেক সুবিধা ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জীব যতই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হউক, উত্তর কালে ভক্তির সহিত গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন বা গঙ্গাস্নান করিলেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেরই আর্থিক বল আছে, ধেনু মূল্য তিন কাহন কড়ি উৎসর্গ করিতে অনেকেরই সামর্থ্য আছে। উহা প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া আমার মনে হয় না। তদপেক্ষা ভক্তিভাবে গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন ও বৈধ গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্তই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে হয়। যেরূপ পাপীই হউক, ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে যে নিষ্পাপ হইবে, ইহা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। ইহার প্রমাণ স্থলে দুইটী বচন উদ্ধৃত করিলাম, "অভক্ষ্য-ভক্ষণাৎ পাপমগম্যাগমনাদিজং। নশ্যতে নাত্র সন্দেহো গোবিন্দস্য চ কীর্ত্তনাৎ॥" "কলৌ কলুষচিত্তানাং পাপদ্রব্যরতাত্মনাং বিধিহীনক্রিয়াণাঞ্চ গতির্গঙ্গাং বিনা নহি॥",

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে মুখবন্ধ।

প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষা আলোচনা করিতে হইলে, অগ্রে কবিগণের ভাষা বিচার করা কর্ত্তব্য। কবিগণ-মধ্যে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়, যথায় যে প্রকারের উক্তি করিতে হয় তাহার যথাযথ ব্যক্তিগত কথোপকথনের রীতির একশেষ দেখাইয়াছেন তাঁহার কাব্য ব্যতীত অন্যের কবিতা তাদৃশ মনোহারী নহে, ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করাই অভিপ্রেত। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে অল্পমাত্র দেখান গেল। উহা স্ত্রীলোকের উক্তি। শিবের বিবাহের সময় শিবের বেশভূষা দেখিয়া বিবাহ-সভায় সমাগত ললনাবর্গ যেরূপ ধিক্কার দিতেছেন, সে ভাষাটীতে স্ত্রীজাতির কথোপকথনের রীতির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। যথা—

"আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামরছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়ে ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো॥
উমার মুখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শোণের নুড়া,
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ওমা উমা করবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া
ভারত কহে পাগল নহে ভুবনেশ্বর লো॥"

উপরি উক্ত উদাহরণের শব্দবিন্যাস দেখিলে সকলেই বুঝিবেন যে, উহাতে স্ত্রীলোকের কথাবার্ত্তার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু ঐরূপ ভাষা না হইয়া যদি সমস্ত শব্দই বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় রচিত হইত, তাহা হইলে তত প্রীতিপ্রদ হইত না। সুতরাং মহাকবি ভারতচন্দ্র যথায় যে প্রকারের উক্তি সুসঙ্গত, ভাষারচনাবিষয়ে তথায় তদ্রূপ প্রয়োগই দেখাইয়াছেন। বিদ্যার প্রতি যখন তাঁহার জননীর ক্রোধ হইয়াছে, তখন যেরূপ উক্তি করিতে হয়, রাণী বক্তা ও শ্রোতার প্রসঙ্গানুরূপ তদ্রূপ ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। ক্রোধাবস্থায় রৌদ্র রসের উদয় হয়। রৌদ্র রসে ক্রোধ স্থায়িভাব, সুতরাং ক্রোধব্যঞ্জক কথায় ভাষার রূঢ়তা ব্যতীত মাধুর্য্য বা প্রসাদগুণ থাকে না। উদাহরণ যথা—

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, আঁচল ধরায় পড়ে,
আলুথালু কবরী-বন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘন ডাক,
চমকে সকল পুরজন॥
শয়ন-মন্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়,
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইসে ক্রোধমনে, নুপূরের ঝনঝনে,
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায়॥"

এইটী গৌড়ীয় ভাষার মূল প্রকৃতির বাক্যভঙ্গীমাত্র। বাঙ্গালা ভাষা গৌড়ীয় ভাষার নামান্তরমাত্র। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার বিচার করিতে গেলে গৌড়মণ্ডলের প্রদেশবিশেষের ভাষার উল্লেখ না করিলে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ প্রকৃতিতে রচিত, তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না। সেই জন্য গৌড়

দেশস্থ এবং উৎকলের ভাষার উল্লেখ করিতে হইলে, সেই ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার সাদৃশ্য আছে কি না, এখানে তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া বা উৎকল ভাষার ক্রিয়া এবং অক্ষরের অবয়বগত বৈসাদৃশ্য ও পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় না। উৎকল-ভাষার ক্রিয়া ও বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়াপদ্ধতি পরে দেখান যাইবে। এখন উৎকল ভাষার কাব্যের কয়েকটী কবিতা মাত্র নিয়ে দেখান গেল। উহাতে উভয় ভাষার শব্দ-সাম্য অনুভূত হইবে। তদ্দ্বারা পাঠকগণ বুঝিবেন যে, গৌড়ীয় ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইলে মৈথিল, উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষাদি প্রদেশের কথোপকথন ও কাব্যরচনা প্রদর্শন করা নিতান্তই প্রয়োজন। তদনুসারে পূর্ব্বেই তুলসীদাসী রামায়ণ হইতে হিন্দী ভাষার সহিত বঙ্গভাষার কি সৌসাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য তাহার দিঙ্‌মাত্রের নিদর্শন দেখান হইয়াছে। এখন উৎকল-ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার কি তারতম্য, তাহার একটী উদাহরণ দেখান যাইতেছে। পরে আসামী ভাষার সঙ্গে কি সামঞ্জস্য আছে, তাহাও প্রদর্শিত হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার রচনাপ্রণালীর সূত্র নির্দ্দেশ করা সহজ হইয়া আসিবে। যথা—

১ম উদাহরণ—

স্বপনে আজবরজ রাজনন্দন দেখিলি রে
ঘনশ্যাম বরষার তনু হেলা জর জর
বুড়িলা বিবেক মোর প্রেম পঙ্করে রখিলিরে
মোহন মুরলী সজ দেখি হরাইলি লাজ
উর উপরে উরজ ভিড়ি লগাই রাখিলিরে
জিনি (ড়িঁ) কোটী সুধাকর দর হাস্য কি মধুর
ঝরুছি অমিয় অঝর তাঙ্ক অধরু চাখিলিরে
ছৈইলো ছবিছটক দেখি মনে এ অটক
বোলে বনমালি (ড়ু) ধিকতাঙ্ক নামকু দেখিলিরে
কদম্বমূলে কি এ বসিছি গো নন্দনন্দন পরিদৃষ্টিছি...
ত্রিভঙ্গ ছন্দে উভা পাঁউছু কেড়ে সোনা কামকোদণ্ড

উৎকলের মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ

দ্বিতীয় উদাহরণ—

দূতীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।
সখি অপূর্ব্ব দেখিলি অজব
ত্রিভঙ্গিমঠানি তেরছ চাহানি
ত্রৈলোক্য জিনি দিশু আছি তেজ
অগস্তিস্কতাত ঘেনিমু গলি
সাত তাত সুতা তটরে মিলিলি
এগাররে বল আনন্তে বহন
পপরে ভেটিলি মোহন সে রাজ
দেখিনু বন্ধুঙ্কর মোহন চূড়া
হরিসুতা কলা দ্বিগুণরে পীড়া
চন্দ্রসুত ঘিলা দেখি হজি গলা
গিরিসুতাপতি সুতবাহন
পুচ্ছতাঙ্কশিরে কিশ শোভাবন
শতাইশ পতি সঙ্গতে অছন্তি
দুই পাঁই দূতি হেলা মোতেলাজ
তুণ্ডর নৈলা বিরাট তনুজ
আঠ পাঞ্চধরি কহু আছি তোতে
চারি সুত ভ্রাত দেবুকিনা মোতে
উপইন্দ্র ভণি মন সূত্রে গুণি
রাধারাণী শুনি দূতী হেলা সজ।

উৎকলের মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ।

তৃতীয় উদাহরণ—

দেখি ঘোর বরষা নবসাত বয়সা
রস মণ্ডনা রসা চির থিব
আঠ অটিশিরে জেতে হব মিছিলে
হরকৃত্তিবাসরে হেড় উনাইশরে
জে অঙ্ক রহে ক্ষিতি তা রিপুপতি
ঐ রিকুনীতি নীতি ডরুথিব

উৎকলের মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ।

এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা যে গৌড়ীয় ভাষা হইতে অভিন্ন, তাহাই প্রমাণ করা আবশ্যক তদনুসারে অগ্রে প্রকৃত বাঙ্গালা শব্দ গুলির নির্দ্দেশ করিতে হয়। যথা—

সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা।		প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা।	
পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
পুরুষ মানুষ	স্ত্রীলোক	বেটা মানুষ	মেয়ে মানুষ
পুত্র	কন্যা	বেটা ছেলে, ছেলে	বেটী ছেলে, মেয়ে
ভ্রাতা	ভগিনী	ভায়	বোহিনী
বর	বধূ	বর	বৌ, বহু
ভ্রাতা	ভ্রাতৃজায়া	ভায়	ভাজ
জামাতা	কন্যা	জামাই	মেয়ে
নপ্তা	নপ্ত্রী	নাতি	নাতিনী
পৌত্র	পৌত্রী	পোত্‌া ছেলে	—
শ্বশুর	শ্বশ্রূ	শ্বশুর	শাশুড়ী
মাতুল	মাতুলানী, মাতুলী	মামা	মামী
মাতৃস্বসৃপতি	মাতৃস্বসা	মেষো	মাসী
পিতৃস্বসৃপতি	পিতৃস্বসা	পিষে	পিষী
পিতা	মাতা	বাবা	মা
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	দাদা	দিদী
ক্ষুদ্র	কনিষ্ঠা	ছোট	ছোট
পিতামহ	পিতামহী	ঠাকুর দাদা, ঠাকুর বাবা, ঠাকুরুণ দিদী, ঠাকুর মা	
মাতামহ	মাতামহী	দাদা মহাশয়, আজা	দিদী মা, আয়ি
দেবর	যাতর	দেঅর, দেবর, Greek, Daer	যা (জা)
ভাগিনেয়	ভাগিনেয়ী	ভাগ্নে	ভাগ্নী
পুত্র	কন্যা	ছেলে, পো	ঝী, মেয়ে
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্রী	ভাই পো	ভায় ঝী
পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র	পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রী	ভাশুর পো	ভাশুর ঝী
দেবর পুত্র	দেবর পুত্রী	দেঅর পো	দেঅর ঝী
ভগিনী পুত্র	ভগিনী পুত্রী	বোন পো	বোন ঝী
ননন্দা পতি	ননন্দা	নন্দাই	ননদ
পতি বা পত্নীর পিষা	পতি বা পত্নীর পিষী	পিষ শ্বশুর	পিষাশ
পতি বা পত্নীর মেষো	পতি বা পত্নীর মাসী	মাস্ শ্বশুর,	মাসাশ
ঐ মাতুল, মামা	ঐ মাতুলানী, মামী	মামা শ্বশুর	মাস শেশ

এখন ভাশুর শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখা আবশ্যক। পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্বশুরবৎ পূজ্য এবং তদ্রূপেই অভিধেয়। সেই কারণেই সচরাচর লোকে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা। অপিতু তাহার প্রমাণ জন্য শব্দাব্ধি কোষ হইতে ভাশুরের ব্যুৎপত্তিটী লিখিত হইল। যথা—

"পতিঃ শ্বশুরতা জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতানুজে।
ইতরেষুচ দ্রৌপদ্যাস্ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং বিভুঃ॥"

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর দুইটী সম্বন্ধ—পতি এবং ভাশুর। সহদেবের সহিত পতি এবং দেবরত্ব ভাব। ভীম, অর্জ্জুন এবং নকুলের সহিত দ্রৌপদীর পতি, দেবর ও ভাশুর পরিচয়, ইহা শাস্ত্রীয় উক্তি। সুতরাং তদ্রূপ উপাধিতেই পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর ক্ষণিক সম্বন্ধ জ্ঞান করিতে হইত। নতুবা মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। তৎকাল হইতেই প্রাকৃতে ভাশুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, ইহা অনুমানসিদ্ধ। আরও—

সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা		প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা	
পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
খুল্ল পিতা	খুল্ল পিতৃব্যানী	খুড়া	খুড়ী (মা)
জ্যেষ্ঠতাত	জ্যেষ্ঠা মাতা	জেঠা	জ্যেঠী (মা)
পিতৃব্য Greek, Patras	পিতৃব্যানী		
বীর Latin Vir	বীরা	বীর	বীরা
বর্ব্বর	বর্ব্বরী	বব্বর	বর্ব্বরী
শিশু	শিশ্বী, শিশু	ছোঁড়া	ছুঁড়ী
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	বুড়া	বুড়ী
শিশুকা	শিশ্বিকা	ছোকরা	ছুকরী
শ্যালক	শ্যালিকা	শালা, সম্বন্ধী	শালী
ঠাকুর পুত্র	ঠাকুর পুত্রী	ঠাকুর পো	ঠাকুর ঝী
ভাগিনেয়	ভাগিনেয় বধূ	ভাগ্নে	ভাগ্নে বৌ
কিঙ্কর	কিঙ্করী	চাকর	চাকরাণী
গৃহস্থ	গৃহিণী	ঘর	ঘরণী
সখা	সখী	সয়া	সৈ

এমন কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা বা গৌড়ীয় ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, যাহার ব্যুৎপত্তি স্থির করা যায় না। অর্থাৎ সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষা দ্বারা মূল অন্বেষণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। যথা—

চাউল বা চাল, ঢেঁকী, কুলো, আকা (চুল্লী), খৈ (লাজ), মুড়কী, লুচী, কচুরী, বাঞ্জন, ধুচুনী।

সর্ব্বনাম শব্দগুলির অধিকাংশ সংস্কৃতমূলক, তবে প্রাকৃতের সঙ্গে নিতান্ত অনৈক্য দেখা যায় না। যথা—

একবচন			বহুবচন		
সং	প্রা	বাং	সং	প্রা	বাং
অহং	অহং	আমি মু, মুহি	বয়ম্	বয়ম্	আমরা
ত্বং	তুমং	তুমি	যূয়ং	অম্	তোমরা

এখন বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গীয় কবিগণ বা গায়কবর্গ কবিতা ও গীত রচনায় সাধ্যমত চলিত শব্দ প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের কাব্য রচনায় বা গীতে সামাজিকের মন আকর্ষণ করিতে হইলে গ্রাম্য শব্দের পরীহার করা সম্ভবতঃ যতদূর সাধ্য, তাঁহারা তাহারই প্রয়াস পান। লোকের কৌতূহলনিবৃত্তিজন্য কাশীদাসী মহাভারত হইতে একটী উদাহরণ দেখান যাইতেছে। আধুনিক সময়ে সংস্কৃত শব্দেরই সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষা অধিকতর পুষ্টিলাভ করিতেছে, প্রাকৃত শব্দকে নিতান্ত আশ্রয় করে নাই।

শ্রীবৎস রাজার রোদন ও চিন্তার অন্বেষণ।

কাতর হৃদয় অতি শ্রীবৎস ধরণীপতি
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কথা।
কহ সবে সমাচার কোথা চিন্তা সে আমার
না হেরিয়া মনে পাই ব্যথা॥
রাজার বচন শুনি পড়সী কহিছে বাণী
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ এই ঘাটে একজন
আইলা ধনাঢ্য মহাজন॥
তাহার কর্ম্মেতে ঘটে তরণী আটক ঘাটে
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
আসি সেই মহাজন কহিলেন সুবচন
যত নারী সবারে ডাকিল॥
গৌরব করিয়া সাধু লইয়া কাঠুরে বধূ
ক্রমে ক্রমে তরণী ছোঁয়াল।
না ভাসিল সেই তরী পুনঃ সাধু যত্ন করি
তোমার চিন্তায় লয়ে গেল॥
বজ্রসম বাণী শুনি মূর্চ্ছাগতা নৃপমণি
লোটায়ে পড়িল ভূমিতলে।

আবার দেখ, কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম সংস্কৃত শব্দের একান্ত পক্ষপাতী হইলেও স্ত্রীলোকের কথায় প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যথা—শিবের বিবাহ—

গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

বেদান্তদর্শনে জৈন-মত খণ্ডন।

বৌদ্ধ-মত অপেক্ষা জৈন-মতের যুক্তি ন্যূনশক্তি হইলেও ইহা যে রাম শ্যাম তৎক্ষণাৎ ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে সমর্থ, এই বিষয়ে বিচারশীল ব্যক্তির মনে অবশ্যই সন্দেহ আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ-মতের ন্যায় জৈন-মতও বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া আসিয়াছে। নিরীশ্বরবাদ, স্বমতের সিদ্ধপুরুষদিগকে ঈশ্বরের স্থানে অভিষিক্ত করা এবং জীবে সীমাতিক্রমকারিণী দয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে এই উভয় মতবাদীদিগের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন-মত, বৌদ্ধ-মতের অঙ্গবিশেষ বা স্বতন্ত্র একটা জিনিষ, এই বিষয় লইয়া পণ্ডিত-সমাজে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক প্রতীচ্য মনীষী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৈদিক ধর্ম্ম খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ৭০০০ বৎসরের, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ৫০০ হইতে ১০০০ বৎসরের ও জৈন ধর্ম্ম ২০০ হইতে ৪০০ বৎসরের পূর্ব্বতন। ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধ-মতের নিরাকরণ ও জৈন-মতের অনুল্লেখও এই মত হইতে বৌদ্ধ-মতের পূর্ব্বভাবিত্ব সূচনা করিয়া দেয়। পরন্তু জৈন-মতের স্বাতন্ত্র্যবাদীরা শাকটায়নের ব্যাকরণ, কটক জিলার উদয়গিরি ও জুনাগড়ের উপর কোর্ট হইতে রুদ্রদামার পূর্ব্ববর্ত্তী শিলালিপি এবং ধম্মপদ গ্রন্থে অচেলক ও নির্গ্রন্থক নামক জৈনসম্প্রদায়ের উল্লেখ দ্বারা বৌদ্ধ-মতকে জৈন-মত হইতে প্রাচীন স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ বাদীরা শাকটায়নকে এই কারণে জৈন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে, তৎপ্রণীত ব্যাকরণে "নমঃ শ্রীবর্দ্ধমানায়" বলিয়া মঙ্গলাচরণ আছে। জৈন-মতে বর্দ্ধমান ও চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর এই উভয়ই অভিন্ন। এইরূপে ঐ ব্যাকরণের "শ্রুতকেবলাধিপতি শাকটায়ন" ইহাও জৈন ধর্ম্মের সাঙ্কেতিক শব্দ। টীকাকার যশোবর্ম্মাও বলিয়া গিয়াছেন,—"স্বস্তি শ্রী সকলজ্ঞানসাম্রাজ্যপদমাপ্তবান্ মহাশ্রমণ সঙ্ঘাধিপতির্যশর শাকটায়নঃ"। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, যে সকল চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে জৈন বলিয়া ধরা হইয়াছে, উহা হইতে বৌদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না? আর শাকটায়ন পাণিনির ব্যাকরণে "শাকটায়নস্যানর্ষে" প্রভৃতি সূত্রদ্বারা উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও তিনি যে তাঁহার সমসাময়িক বা অল্পপূর্ব্বের নহেন, কিন্তু বহুপূর্ব্বের, এই বিষয়ে কোন প্রবল প্রমাণ নাই। যাস্কের অভিহিত বৈদিক ঋষি শাকটায়নকে যদি "শব্দানুশাসন"-প্রণেতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে জৈন মনে করা কোন প্রকারে বিচার-বৈশদ্যের পরিচায়ক হইতে পারে না। জৈন পণ্ডিতেরা যে বেদে নিজ মতের কাহিনী দেখিয়াছিলেন, তাহা যে করণ-বৈরূপ্যঘটিত নহে, সে সম্বন্ধেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নেমী রাজার উপাখ্যান বেদে থাকিলেও তিনি যে জৈন ছিলেন, এ বিষয়ে বেদে কোন বর্ণনা নাই, সুতরাং জৈন নেমী ও বৈদিক নেমীকে এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বিচারশীলতার পরিচায়ক হইতে পারে না। ব্যাসসূত্র ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে জৈন-মতের কথা পাইলেও ঐ গ্রন্থগুলিকে বৌদ্ধ-মতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত করা সহজ ব্যাপার নহে।

জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা প্রধানতঃ শ্বেতাম্বর

ও দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শ্বেতাম্বরদিগকে 'তুপ্পা' এবং দিগম্বরদিগকে "উন্মাদ"ও বলা যাইতে পারে। এই উভয় দায়ে যে কেবল নগ্ন থাকা বা শুভ্র বস্ত্র ধারণ করা লইয়াই বিবাদ তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মমত ও গ্রন্থের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এমন কি উভয় সম্প্রদায়ের একত্র ভোজন এবং বৈবাহিক সূত্রে পরস্পর আদানপ্রদানাদিও দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্বেতাম্বরগণ ৮৪ গচ্ছে বিভক্ত হইলেও বর্ত্তমান সময়ে ২০ গচ্ছের অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের যে কয়েকটি গচ্ছ আছে, তন্মধ্যে "লোষক" গচ্ছের জীব-নির্বিশেষে অহিংসাবাদ অধিক সমুন্নত। এই গচ্ছের লোকেরা 'অর্হত' বিশ্বাস করিয়াও মূর্ত্তিপূজার বিরোধী। ইহাদের আচার্য্যকে শ্রীপূজ্য বলা হইয়া থাকে। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীপূজ্যের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় কোন পুরোহিত আপন প্রভাববিস্তারপূর্ব্বক "ঢুণ্ডুনিয়া" নামে এক অভিনব গচ্ছ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গচ্ছের সাধুরা শুভ্র বস্ত্রে আপন অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে শরীরস্থ জীবেরা মরিয়া যায়, এই জন্য বস্ত্রখণ্ডে বদনমণ্ডল ঢাকিয়া রাখেন। কীটপতঙ্গাদির হত্যাজনিত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিবার জন্য ইঁহারা বড়ই সাবধান। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চলিবার সময়েও পোষাকী সম্মার্জ্জনী দ্বারা মার্গ পরিষ্কার করিতে থাকেন। শুনিতে পাই যে, ইহাঁরা অঙ্গস্থ জীবাণুসমূহের হত্যা আশঙ্কা করিয়া কখন গাত্রমার্জ্জন করেন না এবং দন্তধাবন না করাতে এই শ্রেণীর কোন কোন অগ্রণীর দন্তপংক্তির উপরিভাগে খাদ্যাবশিষ্ট অংশ জমিয়া এরূপ পুরু হইয়া যায় যে, উহার উপরে পয়সা রাখিলেও উহা আটকাইয়া যায়। ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতায় এরূপ জীবাণুকম্পাতৎপর সম্ভ্রান্ত জৈনও বিদ্যমান আছেন, যিনি ছারপোকার আহারাভাবজনিত দুঃখবিমোচনার্থ ভৃতি প্রদান দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট কোন হতভাগ্য অর্থলুব্ধ লোককে হস্তপদবন্ধনপূর্ব্বক কোন স্থানে শোয়াইয়া তাহাঁর উপর ছারপোকাপূর্ণ লেপ চাপা দেন এবং উহাদের অসহ্য দংশনে ঐ লোকটা চীৎকার করিতে থাকিলেও ছারপোকার আহারদানরূপ কর্ত্তব্যের সমক্ষে ঐ হতভাগ্যকে এইরূপ শোচনীয় দশা হইতে উদ্ধার-করা-রূপ কর্ত্তব্যকে তিনি তুচ্ছ বলিয়াই মনে করেন। পাঠক, আপনারাই মীমাংসা করিয়া লউন যে, এইরূপ অপরূপ জীব-দয়ার অর্থ কি হইতে পারে?

জৈন-মতে পদার্থকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—১ম জীব, ২য় অজীব। জীব ত্রিবিধ—১ম নিত্যসিদ্ধ (অর্হৎ), ২য় সাধনবশে সিদ্ধ (মুক্তপুরুষ), ৩য় বদ্ধ। অজীব আবার ৬ প্রকারের—১ম মহীধরাদি, ২য় আস্রব, ৩য় সম্বর, ৪র্থ নির্জর, ৫ম বন্ধ, ৬ষ্ঠ মোক্ষ। প্রথমের অর্থ পর্ব্বতাদি, দ্বিতীয়ের অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ, তৃতীয়ের অর্থ অবিবেকাদি, চতুর্থের অর্থ কাম ক্রোধাদির বিনাশক কেশোৎপাটন ও তপ্ত শিলারোহণ প্রভৃতি তপস্যা, পঞ্চমের অর্থ ৪ প্রকার ঘাতীকর্ম্ম ও ৪ প্রকার অঘাতী কর্ম্ম। এই অষ্টবিধ কর্ম্মজনিত জন্ম-মরণপরম্পরা। ষষ্ঠের অর্থ শাস্ত্রাভিহিত উপায় দ্বারা এই ৮ প্রকার কর্ম্ম হইতে বিনির্গত জীবের সর্ব্বদা উর্দ্ধগমন। ৪ প্রকার ঘাতীকর্ম্ম এইরূপ—১ম জ্ঞানাবরণীয় (তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয় না ইহা), ২য় দর্শনাবরণীয় (আর্হত শাস্ত্র শ্রবণে মুক্তি হয় না ইহা), ৩য় মোহনীয় (বহুবিধ তীর্থঙ্করের আবিষ্কৃত মোক্ষমার্গে বিশেষ অবধান না করা), ৪র্থ আনন্তর্য্য

(মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত হওয়ার বিঘ্ন করা), এই ৪ প্রকার কর্ম্ম কল্যাণবিধ্বংসী বলিয়া ঘাতী নামে অভিহিত হইয়াছে। ৪ প্রকার অঘাতীকর্ম্ম এইরূপ—১ম বেদনীয় (আমার জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে এইপ্রকার অভিমান), ২য় নামিক (আমার নাম অমুক এইরূপ অভিমান), ৩য় গোত্রিক ('আমি পূজ্যপাদ গুরু অর্হতের শিষ্য-বংশে প্রবিষ্ট হইয়াছি এইরূপ অভিমান), ৪র্থ আয়ুষ্ক (শরীর রক্ষার উদ্দেশে কর্ম্ম)। অথবা ১ম শুক্রশোণিতমিশ্রণ, ২য় তাহার তত্ত্বজ্ঞানানুকূল শরীররূপে পরিণত হইবার শক্তি, ৩য় ঐ শক্তির প্রভাবে তাহা হইতে কললাবস্থা বা বুদ্বুদাবস্থার আরম্ভক ক্রিয়াবিশেষ, ৪র্থ ক্রিয়া হইতে জঠরস্থ অগ্নি ও বায়ু দ্বারা তাহার ঈষদ্‌ঘনীভাব। তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল উৎকৃষ্ট শরীরজনক বলিয়া এই ৪ প্রকার কর্ম্মকে অঘাতী বলা হইয়াছে। ঐ পদার্থগুলিকে আবার সংক্ষেপে ৭ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম জীব, ২য় মহীধরাদি, ৩য় আস্রব, ৪র্থ সম্বর, ৫ম নির্জ্জর ৬ষ্ঠ বন্ধ, ও ৭ম মোক্ষ। এই সপ্তবিধ পদার্থকে চতুর জৈন পণ্ডিতেরা সপ্তভঙ্গী নীতিতে সংস্থাপন করিয়া থাকেন। উহার প্রণালী এইরূপ,—"স্যাদস্তি" (হয়ত আছে)। ২য় "স্যান্নাস্তি" (হয়ত নাই), ৩য় "স্যাদস্তিচ নাস্তিচ" (ক্রমনীতিতে হয়ত আছে, হয়ত নাই), ৪র্থ "স্যাদবক্তব্যঃ" (এককালীন অস্তিত্ব নাস্তিত্ব উভয় হয়ত বলা যাইতে পারে না), ৫ম "স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ" (এককালীন অস্তিত্বনাস্তিত্ব উভয় ও নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব হয়ত বলা যাইতে পারে না), ৬ষ্ঠ "স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" (এককালীন অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব উভয় ও নিরবচ্ছিন্ন নাস্তিত্ব হয়ত বলা যাইতে পারে না), ৭ম "স্যাদস্তিচ নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ" এককালীন ও ক্রমিক অস্তিত্ব নাস্তিত্ব উভয় হয়ত বলা যাইতে পারে না)।

সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের গূঢ় রহস্য এই যে, এইরূপ দুর্ব্বোধ্য বাগ্‌জাল রচনা করিলে, প্রতিবাদীরা অনির্ভেদ্য প্রহেলিকায় যাইয়া পড়িবে, অর্থাৎ কোন প্রতিবাদী যদি আসিয়া জৈন-মতাবলম্বীকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার মতে কি মোক্ষ আছে? তবে তিনি এইরূপ উত্তর দেন যে, হয়ত আছে ইত্যাদি। এইরূপ অদ্ভুত উত্তরের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদীকে বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিতে হয়। আর এই সুযোগে জৈনমতাবলম্বীর প্রতি বিজয়-লক্ষ্মীও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এইস্থলে প্রতিবাদী-দিগকেও সদ্বাদী, অসদ্বাদী, সদসদ্বাদী, শুদ্ধ অনির্ব্বচনীয়বাদী, সদ্বাদমিশ্রিত অনির্ব্বচনীয়বাদী, অসদ্বাদ-মিশ্রিত-অনির্ব্ব-চনীয়বাদী ও সদসদ্বাদমিশ্রিত অনির্ব্বচনীয়বাদী এইরূপ ৭ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধেও জৈনেরা এইরূপ দুর্ব্বোধ্য উত্তরপ্রদানপূর্ব্বক বিজয়লাভ-জনিত সুখসম্ভোগের উদ্দেশে প্রয়াস করিতে ছাড়েন না। এই প্রকার উত্তরের মধ্যে "হয়ত" কথাটার সমধিক বাহাদুরী দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা এই কথাটাকে হাঁ ও না উভয় দিকেই লইয়া যাইতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ দুর্ব্বোধ্য বাক্য প্রয়োগে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার বিধানানুপাতে উত্তর-দাতাকেই নিগৃহীত হইতে হয়, কেননা মহামুনি গৌতম এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, "পরিষৎ প্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্য-বিজ্ঞাতার্থং।" ৫ম অ, ২য় আ, ৯ সূত্র।

যে বাক্য বাদী তিন বার উচ্চারণ করিলেও মধ্যস্থ ও প্রতিবাদীর অবোধগম্যই থাকে, তাহার প্রয়োগকে অবিজ্ঞাতার্থ নামক নিগ্রহ স্থান বলা যায়।

জৈন-মতের এই সপ্তভঙ্গী-নীতি ও জীবের মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ শরীর তুল্য

পরিমাণকে ভগবান্ বাদরায়ণ সপ্তভঙ্গী নিরাকরণাধিকরণে, যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।" ২য় অ, ২ পা, সূত্র।

তুমি সপ্তভঙ্গী-নীতির আশ্রয় লইয়া একই বস্তুকে প্রতিবাদীর প্রশ্নের অনুপাতে কখন সৎ, কখন অসৎ, কখন সদসৎ ও কখন সদসদনির্ব্বচনীয় প্রভৃতি বলিতে পার না। কেননা এক বস্তুতে এইরূপ বিরোধিভাবাপন্ন ধর্ম্মসমূহের সমাবেশ সম্ভবপর নহে।

ফলতঃ এই সপ্তভঙ্গী-নীতিটার অভ্যন্তরে প্রতিবাদি-নির্যাতনের দুরভিসন্ধি ব্যতীত অপর কোন সারবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের বিন্দু বিসর্গ জানেন না, তাঁহারাই এইরূপ বাগ্-জালে পড়িয়া বিপদাপন্ন হইতে পারেন, কিন্তু দার্শনিকের সমক্ষে সপ্তভঙ্গী কেন, এইরূপ শত ভঙ্গী-নীতির প্রয়োগ করিলেও, কিছু ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

গ্রন্থকার ঐ নীতির খণ্ডন করিয়া মধ্যম পরিমাণের খণ্ডন করিতেছেন—"এবং চাত্মা কাৎস্ন্যং।" ঐ, ঐ, ৩৪ সূত্র

তুমি যদি শরীরানুরূপ পরিমাণ জীবের মানিয়া লও, তবে তোমার মতে তাহা নিখিল শরীরব্যাপী হইতে পারে না, অর্থাৎ মশকাদি শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী সূক্ষ্ম জীব কর্ম্মবশে মাতঙ্গাদি শরীর প্রাপ্ত হইলে, উহা ঐ বৃহৎ শরীরের কোন না কোন সূক্ষ্ম অংশেই পড়িয়া থাকিবে। এইরূপে মাতঙ্গাদি শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী বৃহৎ জীব কর্ম্মবশে ক্ষুদ্র মশকাদি দেহ প্রাপ্ত হইলে, উহাতে অবস্থানই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জীবের শরীরানুরূপ পরিমাণ ও পর্য্যায় ক্রমে সঙ্কোচ-বিকাশশালিত্ব মানিয়া লইলেও যে, ক্ষপণক-মতের জীব দোষ-পঙ্ক হইতে অব্যাহতি পায় না, তাহা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন।

"নচ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।" ঐ, ঐ, ৩৫ সূত্র।

শরীরানুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট জীবকে পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কোচ-বিকাশশালী মানিয়া লইলেও বিরোধ পরিহার হয় না, যেহেতু সাবয়বত্বমূলক বিকার ও বিনাশ প্রভৃতি অন্যান্য দোষ আসিয়া পড়ে।

তাৎপর্য্য—হস্তি-শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী জীব যদি মশকের ন্যায় লঘু হইয়া, মশক-শরীরে এবং মশক-শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী জীব যদি হস্তীর ন্যায় বৃহৎ হইয়া হস্তি-শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দোষ নিবারিত হইলেও একরূপের বিনাশানন্তর অপর রূপের উৎপত্তি হওয়াতে জীবের বিকৃতত্ব ও বিনশ্বরত্বরূপ দোষ অপরিহার্য্যই রহিল।

"অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ"। ঐ, ঐ, ৩৬ সূত্র।

যখন মোক্ষ অবস্থায় জীবের শরীর প্রভৃতি উপাধির বিলোপ হওয়াতে স্বরূপতঃ একই রূপে অবস্থান ঘটিয়া থাকে, তখন উপাধি দৃষ্টিকে বাদ দিয়া স্বরূপ দৃষ্টিতে বর্ত্তমান শরীর গ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে তাহার অনিত্যত্ব দোষ প্রসঙ্গ হয় না, এই রূপ যদি বল, তবে তুমি স্বমত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত-মতে আসিয়া পড়িলে।

তাৎপর্য্য—বেদান্ত-মতে ব্রহ্মই উপাধিবশে অর্থাৎ অন্তঃকরণ প্রভৃতির সম্বন্ধ বশতঃ অজ্ঞানি-সমাজে জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, সুতরাং জীবের উপাধি অংশেই জীবত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষ,—স্বরূপতঃ উহা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সদাশিব পরব্রহ্ম। অজ্ঞানীরা অগ্নিকে তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় পরব্রহ্মকে জন্ম-মরণশীল জীব বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়াছেন। এই ধারণাজনিত মহা

পার্শে তাঁহারা নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতেছেন, একমাত্র ইহাই নহে, কিন্তু আপনা হইতে স্বতন্ত্র মনোকল্পিত ঈশ্বর মানিয়া অপৌরুষেয় বাণীর মুখ্য অভিধেয় হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ স্বয়ংপ্রকাশ চিদাত্মা অদ্বৈত পরব্রহ্মকে অবজ্ঞা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। মলিন অন্তঃকরণ ও স্থূলবুদ্ধি হেতু তাঁহাদিগকে তত্ত্বদর্শী বুঝাইলেও কিছুতেই তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বরং "পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং" নীতিতে ইহার বিপরীত ফলই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই লৌকিক বিদ্যার অভিমানে দিক্‌শূন্য হইয়া নিজের অজ্ঞানত্বকে বিদ্যাবত্তার আবরণে ঢাকিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে যে লৌকিক বিদ্যা নিষ্ফল, ইহাতেও তাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা শাস্ত্রবারিধির অন্তস্তলে প্রবেশপূর্ব্বক অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মহানির্ব্বাণের যাত্রী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক প্রভৃতি বলিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ব্যক্তিবিশেষ বা মনের মানুষের প্রেমে পড়িয়া তাঁহারা ন্যায্যতা অন্যায্যতার জ্ঞানও হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যখন বেদই ঘোষণা করিয়াছে যে "যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি নসবেদ যথা পশুরেব সঃ" তখন যাঁহারা আত্মা হইতে ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরব কি প্রকারে করিতে পারা যায়? যখন "অভয়ং বৈজনক প্রাপ্তোসি তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি" উপনিষদ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন আমিই পূর্ণব্রহ্ম সদাশিব এইরূপ বলিতে প্রবুদ্ধের কি বিপদাশঙ্কা আছে? যখন "যদন্যং তদনৃতং" "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" প্রভৃতি শ্রুতি আছে, তখন কনক কান্তা প্রভৃতি পার্থিব বস্তুকে মিথ্যা মায়াময় বলিতে জ্ঞানীর অধিকার নাই, এই কথাটাকেই বা কে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে? ইহাতে যদি অজ্ঞানী গৃহিণী সহচরদিগের হৃদয়-দাহ উপস্থিত হয়, সেজন্য শাস্ত্রই দায়ী।

ভগবান্ মহর্ষি ব্যাস যে যুক্তিবাণে জৈনমত খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন, ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। পরন্তু এই মতের অহিংসাবাদ সম্বন্ধে তিনি তটস্থই রহিয়া গিয়াছেন, এজন্য এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। এই মতবাদীদিগের দয়া যেরূপ কীট-পতঙ্গের প্রতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ মনুষ্যের প্রতি নহে। জৈনসম্প্রদায় অহিংসাবাদের দাবি রাখিয়াও বাহুল্যরূপে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজকর্ম্মচারীর যে অত্যন্তাভাব, তাহাও নহে। অবশ্যই রাজসেবা বা ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষতঃ অপরের বক্ষঃচ্ছেদন পূর্ব্বক শোণিতপান করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এই উভয় কার্য্যে অহিংসা-ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলা যে কঠিন সমস্যার কথা, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? আর এই বিষয়েই বা কে সন্দেহ আনিতে পারে যে ধর্ম্ম ও ন্যায়কে নেতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হওয়া অতীব কঠিন? শ্রীভগবানের রাজ্যে যে সকল ভোগ্য বস্তু আছে, ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ তাহার অধিকার প্রত্যেক মনুষ্যেরই রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থাতে যিনি ঐশ্বর্য্য বা সম্পদের অধিস্বামী হইয়া থাকেন, তিনি যে অপরের প্রাপ্য অংশ নিজে অধিকার করিয়া লন না, ইহা প্রমাণিত করা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। তবে অবশ্যই যিনি এই কার্য্যে

যত অধিক কূটনীতির প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি তত অধিক সভ্য বলিয়া বর্ত্তমান জগতে প্রথিত হইয়া থাকেন।

।স্তরে পর্য্যাপ্ত সম্পদ্‌ ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও যিনি আপনাকে অহিংসা-ধর্ম্মে ব্রতী মনে করিতে পারেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। আর এমন সম্পদশালী ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি অপরের প্রাপ্য অংশ আত্মসাৎ না করিয়া স্বর্গ হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জৈন-মতের সকল ব্যক্তিই যে সংসারের কোলাহল হইতে সুদূরে অবস্থিত রহিয়াছেন, ইহাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? আর সংসারের কোলাহলে থাকিয়া যে জীব-হিংসা হইতে সর্ব্বথা অব্যাহতি পাওয়া যায় না, ইহাতেই বা কি সন্দেহ আছে? পক্ষান্তরে জৈনব্যবসায়ীরা সকলেই যে কূটনীতির প্রয়োগ পূর্ব্বক অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে নির্লিপ্ত থাকেন, তাহারই বা প্রমাণ কই? তবে ইহা সত্য যে, প্রত্যক্ষতঃ অপরের গলদেশ ছেদন করিতে জৈনসম্প্রদায়ের অনেকেই সাহস করেন না। কিন্তু একমাত্র ইহাতেই কি অহিংসা ধর্ম্মের পর্য্যবসান হইয়া যাইতেছে?

এইত গেল ক্ষপণক গৃহমেধীর কথা; আবার ঐ মতের সাধুরা জীবহত্যার ভয়ে বসনখণ্ডে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াও শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে ক্ষান্ত হন না যে, তাহারা অপর সম্প্রদায়ের লোককে দানাদি দ্বারা যেন কোন সাহায্য না করে, এমন কি অপর মতের ভিক্ষুকদিগকেও ভিক্ষা না দেয়। এই বিষয়ে তাঁহারা এইরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন করেন যে, অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ সাহায্য ও ভিক্ষা দ্বারা নিজের বল বাড়াইয়া জীব-হত্যায় প্রবৃত্ত হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলে সাহায্যকারীকে ঐ পাপের ভাগী হইতে হইবে। ইষ্টাপূর্ত্তের বিরুদ্ধে ঐ সাধুরা এমন সুন্দর বক্তৃতা দেন যে, তদীয় শিষ্যেরা উহা শ্রবণ মাত্রেই প্রতিজ্ঞা করিয়া লয় যে, তাহারা কখন ঐরূপ হিংসাজনক কার্য্যে লিপ্ত হইবে না। এই বক্তৃতার সকল অংশ লিখিলে প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া পড়িবে, এই কারণে দুই এক কথা এই সম্বন্ধে বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে। "দেখ অর্হৎ-ভক্তবৃন্দ, সাবধান, তোমরা কদাপি কূপ বা পুষ্করিণী খনন কার্য্যে লিপ্ত হইও না। প্রথমতঃ কূপ ও পুষ্করিণী খননে অসংখ্য জীবের প্রাণ সংহার হইয়া থাকে। পরে উহা সম্পন্ন হইলে পর কাঠবিড়ালী আদি কত জীব উহাতে পড়িয়া মরে। বল দেখি আর্হতগণ, এই পাপের ভাগী কে হয়?" এই স্থলে বক্তা ও শ্রোতাদিগের অভূতপূর্ব্ব ভাবভঙ্গীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। অবশেষে শ্রোতারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না যে, ঐ কূপ ও পুষ্করিণীর সত্ত্বাধিকারীরাই মুখ্যতঃ এই প্রকার জীব-হত্যাজনিত পাপের ভাগী হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ে পুরোহিত ও সাধুরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের উপর এত বিদ্বেষভাব রাখেন যে, এই বিষয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তেরাও তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। যেরূপ বহির্জাতিক বিদ্বেষ ইহাদের মধ্যে প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আন্তর্জাতিক অহিনকুল-নীতিও কম নহে। এই সম্প্রদায়ের অহিংসা-ভাবটা আর্য্যভূমির অধিকাংশ বণিক্‌সমাজেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারাও ইঁহাদের আদর্শে ছলে বলে কৌশলে অপরের ধন আত্মসাৎ করিয়া উহার যৎকিঞ্চিৎ অংশের ব্যয় দ্বারা সারমেয়, পারাবত ও পিপীলিকা

প্রভৃতিকে ভক্ষ্য প্রদান অথবা তাহাদের পোষণকে স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বার বলিয়াই জানেন। অবশ্যই তাঁহাদের নিরামিষ ভক্ষণ প্রশংসার কথা; কিন্তু ইহা দ্বারা ভক্ষণ সম্পর্কিত জীবহত্যা হইতে অব্যাহতি পাইবার নহে। আর উদ্ভিজ্জাত জীবের অস্তিত্ব স্বীকারে আর্য্য, বৌদ্ধ ও জৈন একমত। সুতরাং অজবৃন্দ ও মৎস্যকুলের মুণ্ড ছেদন করিয়া ভক্ষণ না করার জন্যই তাঁহাদিগকে অহিংসাবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। আর প্রত্যহ যে তাঁহারা শত শত উদ্ভিজ্জাত জীব গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে এই অহিংসাবাদ যে প্রকারান্তরে আর্য্যভূমিতে নির্জীবতা ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহাকেও অসম্বদ্ধপ্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। ফলতঃ জৈনসম্প্রদায়ের অহিংসাবাদকে নির্ব্বিকার বা সীমান্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র।*

কবি, দার্শনিক, আস্তিক, নাস্তিক সকলেরই মত এই যে, সংসার অনিত্য। সংসার যখন অনিত্য, তখন সংসারী মানুষ যে নিত্য হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মানুষ দুই দিনের জন্য সংসারে আসে, আসিয়া রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার ন্যায় সংসারের খেলা খেলিয়া আবার চলিয়া যায়; সংসারে আর তাহার কোন চিহ্নই থাকে না। কিছুই কি থাকে না? একটী জিনিষ থাকে—স্মৃতি। সে স্মৃতি কখন পুণ্যের সমুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া সৌম্য-মধুর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ প্রদর্শন করে, কখন বা পাপের ঘন-কালিমায় আবৃত হইয়া আমাদের সম্মুখে বিভীষিকার করাল মূর্ত্তিরূপে উপস্থিত হয়। অনিত্য সংসারে নশ্বর মানব-জীবনের ইহাই শেষ চিহ্ন। এ চিহ্ন অনশ্বর—অনন্তকালস্থায়ী। ইতিহাস এই চিহ্নটীকেই বক্ষে ধারণ করিয়া অনাদিকাল হইতে বলিয়া আসিতেছে, "মানুষ! তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পার যদি, আমার বুকে একটু দাগ রাখিয়া যাইও, তুমি নশ্বর জীবনে অবিনশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে।"

মানুষ যায়, স্মৃতি থাকে। সকলের থাকে না; যে ভীরু মানব জীবন-সংগ্রামের ভীষণতা-দর্শনে পশ্চাৎপদ হইয়া আপনাকে অদৃষ্টের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, সংসার তাহার স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারে না, তাহা আপনা হইতেই মুছিয়া যায়। কিন্তু যে বীর পুরুষ কঠোর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহায়তায় একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, শত প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও আপনাকে স্থির রাখিয়া কর্ত্তব্যের কঠোর অনুশাসন মাথা পাতিয়া লইতে পারে, সংসার আদর করিয়া তাহার স্মৃতি অনন্তকালের জন্য স্বীয় বক্ষে অঙ্কিত করিয়া রাখে, প্রলয়ের মহাপ্লাবনেও সে স্মৃতি মুছিয়া যায় না। এইরূপ কত মহাপুরুষের স্মৃতি-চিত্র আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যৎ মানবগণের হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে। এইরূপ একটী মহাপুরুষের চরিত্র-চিত্রের

* বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর স্মৃতি-সভায় পঠিত।

কিয়দংশ প্রদর্শন জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "অধুনা এই ভূমণ্ডলে এমন কে আছেন, যিনি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র, সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষী, বিদ্বান্, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, দীপ্তিমান্, অসূয়াশূন্য এবং সমরক্ষেত্রে কাহার ক্রোধ দর্শনে সুরগণ শঙ্কিত হইয়া থাকেন।" এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদ সেই রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের বিভূতি বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই রামচন্দ্র, বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া আজিও হিন্দুর গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন। কিন্তু এখন যদি কেহ ঐরূপ প্রশ্ন করেন, তবে তাহার উত্তর দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, ঐরূপ বহুগুণসম্পন্ন মানুষ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। একেবারেই কি দেখিতে পাওয়া যায় না? দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তিনি ঐরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন না হইলেও বহু গুণসম্পন্ন বটে। এখন যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কোন কোন কথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা কোন কোন বিভূতিকে বাদ দিয়া বা তাহাদের মাত্রা কমাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি, এখনও ঐরূপ মানুষ ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। তিনি কে? তিনি বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

আমার বা আর কাহারও ভালবাসার দৃষ্টিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র "প্রিয়দর্শন" হইলেও অনেক নিরপেক্ষ সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তিনি প্রিয়দর্শন হইতে পারেন না। তবে যাঁহারা কখন তাঁহাকে চোখে দেখেন নাই, কেবল তাঁহার সাহিত্য-শক্তি ও কর্ম্মাবলীর মধ্য দিয়া মানস-নেত্রে তাঁহার কল্পিত সৌম্য-মধুর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট যোগেন্দ্রচন্দ্র নিশ্চয়ই প্রিয়দর্শন বলিয়া প্রতিভাত হইবেন। সুতরাং উক্ত বিশেষণটী বাদ না দিলেও আমরা বোধ হয় বিশেষ অপরাধী হইব না। আর এক কথা, যোগেন্দ্রচন্দ্র যে কখন কোন সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধের বিকট প্রকটনে অরাতিকুলকে ভীত করিয়াছেন, এরূপ শুনা যায় নাই। তবে যদি সংসার-সংগ্রামকে প্রকৃত সংগ্রাম বলিয়া ধরা যায়, আর তাহার অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওয়াকে প্রকৃত বীরত্ব বলা যায়, তবে যোগেন্দ্রচন্দ্রকে এই সংগ্রাম-বিজয়ী বীর বলা যাইতে পারে। ফল কথা, যোগেন্দ্রচন্দ্র বহু গুণে গুণবান্ ছিলেন; তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, সংযতচিত্ত; তিনি সচ্চরিত্র, সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষী, দৃঢ়ব্রত; তিনি সর্ব্ববিষয়দক্ষ, বিদ্বান্ ও জিতক্রোধ ছিলেন।

মাসাধিক কাল পূর্ব্বে আমি যদি যোগেন্দ্রচন্দ্রের এইরূপ গুণব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতাম, তবে হয় তো অনেকেই মনে করিতেন যে, আমি বর্ণনায় অতিরিক্ত পরিমাণে অতিশয়োক্তির খাদ মিশাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ আমাকে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী স্তাবক বলিয়া মনে করিতেন, তবে তাহাতেও আমার বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আজি আর সে দিন নাই। আজি যোগেন্দ্রচন্দ্র আর ইহলোকে নাই, তিনি এখন ইহলোকের পরপারে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গবাসী তাঁহাকে যেমন চিনিয়াছেন, তাঁহার অসাধারণত্ব যেমন অনুভব করিতে-

ছেন, তাঁহার জীবিতকালে অনেকেই তাঁহাকে সেরূপ চিনিতেন না, সেরূপে বুঝিতেন না, বা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না। যেমন বায়োস্কোপের চিত্রকে দূর হইতে না দেখিলে তাহার সম্যক্ সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না, তেমনই নিকটে থাকিতে অনেক মহাপুরুষের অসাধারণত্ব বোধগম্য হয় না। তাঁহারা যখন সংসার ত্যাগ করিয়া অতিদূরে—ইহলোকের পরপারে গিয়া দণ্ডায়মান হন, তখনই তাঁহাদের চরিত্র-চিত্র সম্যক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখনই আমরা তাঁহাদের লোকাতীত মহত্ব-দর্শনে বিমুগ্ধ হই, তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে আমরা অন্তরের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি। মরণেই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রকে না চিনিবার আরও কারণ ছিল। তিনি অনেক সময় আত্মগুপ্তির আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতেন। তাঁহার সাহিত্যের ভিতর দিয়াই বাহিরে বাহিরে তাঁহার চরিত্র-সৌন্দর্য্যের যাহা কিছু অনুভূতি হইত, কিন্তু তাঁহার ভিতরে যে কি সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা কে বুঝিত? প্রভাতের অরুণ-কিরণ-সম্পাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার বাহিরে যে কনক-কান্তি ফুটিয়া উঠে, তাহার সৌন্দর্য্যই লোকে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি হইতে দিবারাত্র কিরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কেননা কাঞ্চনজঙ্ঘা দুরধিগম্য, দুরারোহ। যোগেন্দ্রচন্দ্র নিত্য নিভৃত নিলয়ে বাণীর আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন, বাহিরের অনেক লোকেরই তাঁহাকে দেখিবার বা বুঝিবার সুযোগ ঘটিত না। মাৎসর্য্যবর্জ্জিত ধনকুবেরের গৃহে কত পেটিকা কত ধনরত্নে পরিপূর্ণ, তাহা তিনি বাঁচিয়া থাকিতে বাহিরের লোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার জীবনান্তে লোকে যখন তাঁহার গৃহ অনুসন্ধান করিতে থাকে, তখন তাঁহার চিরসঞ্চিত বিভবরাশি দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা তাঁহার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সাহিত্যে সংসারে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রকৃতই যোগেন্দ্রচন্দ্র অসাধারণ। তিনি অসাধারণ কর্ম্মী, অসাধারণ সাহিত্যসেবী। পুরুষকারের প্রভাবে এবং অদৃষ্টের সহায়ে তিনি সকল কর্ম্মেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কর্ম্মের সাফল্যে আজ বঙ্গসমাজে তাঁহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সে প্রতিষ্ঠার সহস্র দৃষ্টান্ত এখন প্রকটিত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, সাহিত্য সম্মিলন, সাহিত্যেরই পরিপোষক। বঙ্গ সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রভাব কিরূপ, তাহাই দেখাইবার বা বুঝাইবার ভার আমার উপর প্রদত্ত হইয়াছে। আমি সাহিত্যে অকৃতী হইলেও, তাঁহার সাহিত্যপ্রতিষ্ঠার যে একটা পরিচয় পাইয়াছি, তাহা এখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে অব্যক্ত। অবশ্য তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এখনও কেহ সে প্রতিষ্ঠার উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হন নাই। তিনি স্বয়ং সাহিত্যসেবী ছিলেন একথা সকলেই জানেন, কিন্তু তিনি সাহিত্যসেবীর কিরূপ সেবা করিতেন, তাহার পরিচয় বোধ হয় অনেকেই পান নাই। সে পরিচয় পাইলে, বঙ্গসাহিত্যে সাহিত্যসেবীর সেবায় যোগেন্দ্রচন্দ্র যে পূর্ণাদর্শ, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। নদীয়ার চৈতন্য প্রেমিক ছিলেন; তিনি প্রেমিকের পূজা করিতেন, প্রেমিকের পদরজে গড়াগড়ি দিতেন। বর্দ্ধমান বেড়গ্রামের যোগেন্দ্রচন্দ্র

সাহিত্যসেবী ছিলেন; তিনি সাহিত্যসেবীর পূজা করিতেন, সাহিত্যসেবী পাইলেই তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া প্রেমালিঙ্গন দিতেন

সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, বঙ্গে আর কোন সাহিত্যসেবীই বুঝি তেমন করিতে পারেন নাই। 'বঙ্গবাসী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গের বহু শক্তিশালী সাহিত্যসেবীর সেবা করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মূলধন বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠা সংবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে কি না, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু তৎকালে যাঁহারা শক্তিশালী লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, এমন কি বঙ্গদর্শনের অনেক কৃতী লেখক পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। আর যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের সেবা করিয়া, তাঁহাদের অনেকেরই চরণে প্রণামী দিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। ইহার পূর্ব্বে এমন করিয়া প্রণামী দিয়া আর কেহ সাহিত্যসেবিগণের সেবা করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা জানি না। কেহ কেহ ভালবাসার খাতিরে বঙ্গবাসীতে লিখিতেন বটে, এবং তাঁহারা প্রণামীর প্রত্যাশা করিতেন না; কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রকারান্তরে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। ভক্তের বিশ্বাস, প্রণামী না দিয়া দেবদর্শন করিতে নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্রেরও বিশ্বাস, প্রণামী না দিয়া সাহিত্যসেবিগণকে পরিশ্রম করাইতে নাই। এখন হয়ত অনেকেই মিতব্যয়িতার অনুরোধে সর্ব্বাগ্রে দেবদর্শনের প্রণামী বন্ধ করিয়া অর্থনীতির সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র এ নীতির বড় একটা ধার ধারিতেন না।

চুম্বকের আকর্ষণের ন্যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রেরও উদারতা ও বিনয়নম্রতায় এমন একটা মধুর আকর্ষণ ছিল যে, যিনি একবার তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইতেন, তিনি আর তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠা হইতে তিনি এ পর্য্যন্ত বহু সাহিত্যসেবীরই এইরূপে সম্মান রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। কি বঙ্গবাসী, কি জন্মভূমি, কি হিন্দি বঙ্গবাসী, কি টেলিগ্রাফ সকলের সম্বন্ধেই সাহিত্যসেবীর সম্মানরক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই সাহিত্যসেবায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের অনুগত প্রতিপালনের প্রস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গবাসীর বেতনভোগী লেখকও জন্মভূমিতে লিখিয়া স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইতেন। কেহ কেহ হয়তো এইরূপ সাহিত্যসেবার উপর স্বার্থপরতার আরোপ করিয়া বলিতে পারেন, তিনি তাহাদিগের নিকট সেবা পাইতেন, তাই সেবা করিতেন, ইহা নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবা নহে, ব্যবসায়ের বিনিময়মাত্র। কিন্তু আমরা জানি, কোন কোন দুঃস্থ সাহিত্যসেবী যোগেন্দ্রচন্দ্রকে কোনরূপে সাহায্য করিবার সুযোগ না পাইলেও পরদুঃখকাতর যোগেন্দ্রচন্দ্র উপযাচক হইয়া তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। বঙ্গবাসীতে লিখাইয়া লইবার জন্য তিনি কোন কোন লেখককে এককালীন অনেক টাকা অগ্রিম দিয়া রাখিতেন; আমরা জানি, কোন কোন লেখক অগ্রিম টাকা লইয়াও কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু সে জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্রকে সেই লেখকের চরিত্র-সম্বন্ধে কখনও কোন অনুযোগ করিতে কেহ শুনে নাই। তিনি 'জন্মভূমি'তে উপন্যাস লিখিবার জন্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যোগেন্দ্রচন্দ্রের আশা ফলবতী না হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

সাহিত্য-সরোবরের স্ফুট-কোরক-কমল-কাননে কমলাসনা ভারতীর চরণচুম্বী মধুকরনিকর যে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করে, বীণাপাণির সপ্তস্বরসংবাদিনী বীণার কোমল ঝঙ্কারে যে সুবিমল সুধারাশি অজস্রধারে ক্ষরিত হইয়া বিশ্ব আমোদিত—প্লাবিত করে, যোগেন্দ্রচন্দ্র নিভৃত নিলয়ে বসিয়া, মাতৃপদধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, সেই মধু, সেই সুধা সঞ্চয় করিতেন। আর তাঁহারই মত মাতৃপদসাধকগণের সাহচর্য্যে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট যে মধু পাইতেন, তাহা লিপিকমলপত্রে বঙ্গের গৃহে গৃহে ছড়াইয়া দিতেন। আজ সেই মধুর—সেই সুধার সুমধুর আস্বাদনে বঙ্গবাসী বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যসেবার আর একটা প্রকৃষ্ট পরিচয় এখনও দেওয়া হয় নাই। তাহা পুরুষকার। যে উপকরণে পুরুষকারের পূর্ণতা, সেই উপকরণেই তাঁহার বঙ্গবাসী, জন্মভূমি, হিন্দিবঙ্গবাসী ও শাস্ত্রপ্রকাশ সৃষ্ট ও পুষ্ট। আবার সেই উপকরণেই ইংরাজী দৈনিকপত্র টেলিগ্রাফ সংগঠিত ও সংবর্দ্ধিত। সে উপকরণ কি? একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও অকপটতা। টেলিগ্রাফ প্রকাশিত হইবার দুই এক মাস পরেই তিনি বুঝিলেন যে, টেলিগ্রাফ ঠিক তাঁহার মনের মত সম্পাদিত হইতেছে না, ঠিক তাঁহার মতের পরিপোষক হইতেছে না। তিনি নিজে টেলিগ্রাফে লিখিতেন না। ইংরাজী লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি ইংরাজী পড়িতেন, কিন্তু লিখিতেন না। তাঁহার মুখে কখনও ইংরাজী জ্ঞানের গর্ব্ব শুনি নাই। টেলিগ্রাফ মনের মত সম্পাদিত হইতেছে না দেখিয়া তিনি বড় ব্যথিত হইলেন; এই ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে এক কঠোর প্রতিজ্ঞা জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি টেলিগ্রাফে লিখিব, আমারই মত করিয়া, আমারই মত বজায় রাখিয়া টেলিগ্রাফে লিখিব। যে কাল রোগে যোগেন্দ্রচন্দ্রের জীবনান্ত হইল, ঠিক এই সময়েই সেই রোগের বীজ তাঁহার বিরাট্ দেহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। ভিতরে ভিতরে একটু একটু জ্বর হইতেছিল, দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল। ভিতরে যে আগুন জ্বলিতেছিল, বাহিরে তাহার কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না। দুইমাস কাল প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তিনি ইংরাজী সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রমে অবিচল উৎসাহসহকারে পড়িতে লাগিলেন। বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়সনের সহিত তাঁহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল। সেই সময়েও তিনি অনেক ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফলে দুইমাস পরেই তিনি টেলিগ্রাফে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে রুষ-জাপানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই রুষ-জাপান-যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি টেলিগ্রাফে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। টেলিগ্রাফে সেই সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর, চারিদিক্ হইতে ইহার প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। বাস্তবিক রুষ-জাপান-যুদ্ধ সম্বন্ধে সেই যে কয়েকটী প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, তেমন প্রবন্ধ অনেক খ্যাতনামা ইং সংবাদপত্রেও বড় বেশী দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের ইংরাজী লিপিপটুতায় সেই সকল প্রবন্ধ যে সর্ব্বজন-মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল, এমন কথা বলিতেছি না। তবে তাঁহার বাঙ্গালা ভাবাভঙ্গী যেরূপ সরল,

সহজ এবং সুখপাঠ্য, ইংরাজীর ভাষাভঙ্গীতেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয় বিশ্লেষণে, যুক্তিতর্কের অবতারণায়, রস-সৃষ্টিতে তিনি টেলিগ্রাফের প্রবন্ধনিচয়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, অধুনা সে শক্তি প্রকৃতই দুর্লভ। কেবল রুষজাপানের যুদ্ধ-সম্বন্ধে কেন, অন্যান্য বিষয়েও তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্বভাবজ রস-রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বিষম গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল যোগেন্দ্রচন্দ্র সে সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র অনুবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা জানি, সেই অনুবন্ধটী ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র "সিভিল মিলিটারি গেজেটে" সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহার অনেক প্রবন্ধই অনেক ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদ পত্রে উদ্ধৃত হইতে দেখিতাম। যখন তিনি দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য সুদূর হাজারিবাগে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও তিনি সেই রুগ্ন ভগ্ন দেহে টেলিগ্রাফের জন্য নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দিতেন। মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব নির্ব্বাসিত কুলচন্দ্র সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হইয়াছিল। রুগ্ন-মস্তিষ্ক-প্রসূত কারুণ্যসম্পূর্ণ সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কোন পাঠক যে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না।

এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের ফলে যোগেন্দ্রচন্দ্র ক্রমে শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার টেলিগ্রাফকে ভুলিতে পারিলেন না। দেহান্তের কয়েক দিন পূর্ব্বেও তিনি মধুপুর হইতে টেলিগ্রাফের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া টেলিগ্রাফের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা যথাযথরূপে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধন্য প্রতিজ্ঞা! ধন্য উৎসাহ! ধন্য অধ্যবসায়! তাঁহার বঙ্গবাসী, তাঁহার জন্মভূমি, তাঁহার হিন্দি বঙ্গবাসী, তাঁহার শাস্ত্র-প্রকাশ, এ সকলের জন্যই তিনি এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ অধ্যবসায় এইরূপ একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক টেলিগ্রাফের নিদর্শনেই বুঝা যায় যে, যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রতিজ্ঞায় যেমন অটল, তেজে তেমনই অপরাজেয়, উৎসাহে তেমনই অবিচল। বিদায়োন্মুখ বসন্ত যেমন লতায় পাতায়, ফলে ফুলে, পল্লবে পল্লবে পূর্ণ-সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া একেবারে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলে, তেমনই ইহলোক হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিভা জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কাব্যে দর্শনে, সংযমে সাহসে সমগ্র শক্তি বিস্তার করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হায়, ইহা যে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ দীপ্তি!

কর্ম্মবীর যোগেন্দ্রচন্দ্র কেবল যে টেলিগ্রাফের চিন্তাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহার উপর সহস্র দিক্ হইতে সহস্র প্রকার চিন্তা আসিয়া তাঁহার রোগ-জীর্ণ হৃদয়ে চাপিয়া বসিয়াছিল; এইরূপ সহস্র কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রমেও কখনও তাঁহার মুখ হইতে অবসাদের বাণী শুনা যায় নাই, এক দিনের জন্যও ক্লান্তি আসিয়া তাঁহাকে এই বিশাল সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। ভগ্ন রুগ্ন দেহে সহস্র চিন্তার সহিত অজস্র সংগ্রামে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, জীবন-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া আসিতেছিল, তথাপি যোগেন্দ্রচন্দ্র স্থির, নির্ভীক, অটল। মানসিক তেজই এই

সকল বাধাবিঘ্নকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহাকে এরূপে স্থির রাখিয়াছিল, এরূপে তাঁহার ললাটে বিজয় তিলক পরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু মানবদেহ তো পাষাণ নয়? মানব-হৃদয় তো লৌহবিনির্ম্মিত নয়? সুতরাং তাহাতে আর কত সহিবে? আর সহিলও না; কাল-নিক্ষিপ্ত অমোঘ শক্তিশেলের নিদারুণ প্রহারে তাঁহার জীবনতন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গেল।

বঙ্গ সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের কিরূপ প্রভাব, কিরূপ অধিকার, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থান কোথায়, ইহা বুঝাইতে হইলে তাঁহার লিখিত খণ্ড প্রবন্ধাদি বা গ্রন্থসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু সে অবসর নাই, আলোচনা করিবার শক্তিও আমার নাই। অবসর বা শক্তি থাকিলেও শ্রোতৃবৃন্দের ততদূর ধৈর্য্যধারণের ক্ষমতা আছে কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ। তবে সংক্ষেপে অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর আলোচনা সম্ভব, তদ্দারাই যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের প্রভাব, অধিকার ও স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই একটা কথা বলিতে হয়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিভঙ্গীতে যেমন তাঁহারই নিজস্বের পূর্ণ পরিচয়, বঙ্কিমচন্দ্রের লিপি-প্রণালী যেমন বঙ্গ-সাহিত্যে এক নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছে, যোগেন্দ্রচন্দ্রের লিপিভঙ্গীতেও তেমনই একটা নিজস্বের—একটা নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ ভাষা, এরূপ ভাব, এরূপ ভঙ্গী যেন তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের, ইহার জন্য যেন তাঁহাকে কাহারও নিকট হাত পাতিতে হয় নাই। তিনি প্রথমে যখন সাধারণীতে লিখিতে আরম্ভ করেন, তখনই তাঁহার লেখার ভঙ্গীতে কেমন একটা নূতনত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে নূতনত্ব দেখিয়া সাধারণীর পাঠকবর্গ ভাবিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নূতন সুর নূতন ভাব লইয়া আবার কে নূতন গায়ক অবতীর্ণ হইলেন? মতিরায়ের যাত্রার আসরে এ কোন্ কীর্ত্তনিয়া মৃদঙ্গের মৃদুবোলের সহিত মধুরকণ্ঠে কীর্ত্তনের মধুর পদ ধরিল? বাস্তবিকই যোগেন্দ্রচন্দ্রের লেখায় এমনই একটা মধুরতা, এমনই একটা নূতনত্বের আভাস পাওয়া যায়। সে লেখার ভিতর সাধু ভাষা আছে, গ্রাম্য কথাও আছে; গাম্ভীর্য্য আছে, পরিহাসও আছে; বৌবাজারের ভীমময়রার দোকানের কড়া পাকের মনোহরা আছে, আর রামা মুদির কলসীর গুড়টুকুও আছে। এই উভয়ের সংমিশ্রণে তাঁহার ভাষাস্রোত যখন একটা সরল সৌন্দর্য্যের নবীন তরঙ্গ তুলিয়া তরতর বেগে বহিয়া যায়, তখন সেই সঙ্গে পাঠকের চিত্তও তালে তালে নাচিয়া উঠে, কি যেন এক মোহমদিরায় তাহাদের চিত্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রত্যেক গ্রন্থেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থান নাই, সময়ও নাই, নতুবা প্রত্যেক গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারিতাম। তবে আভাসে বুঝাইবার জন্য তাঁহার 'মডেল ভগিনী'র এক স্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা দ্বিপ্রহর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বাতাস সাঁ সাঁ করিতেছে, মন খাঁ খাঁ করিতেছে। বাবুর বাগানে, দাড়িম্ব পত্র যেন ঝলসিয়া গিয়াছে; কদম্বকাণ্ড যেন নীরস, নির্গুণ, নিশ্চলভাবে পরম ব্রহ্মের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। জলে, কমলসরোবরে, তপন সোহাগে তৃপ্ত হইয়া কমলিনীকুল ফুটিয়া

উঠিয়াছে। এদিকে নভোমণ্ডলে পাখী প্রাণবঁধু জীবনধন জলকে "ফটী-ঈক জল" বলিয়া ডাকিতেছে। ও দিকে তারকেশ্বরের মোহন্তের হাতীটা অতিগরমে ক্ষেপিয়া উঠিয়া জলে পড়িয়া কমলদলের অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। স্বভাবের এই বিপরীত ব্যবহারে বঙ্গভূমি চমকিত।

"আরও কথা আছে। অতি গরমে আম পাকিল, জাম পাকিল, লিচু পাকিল, কলা পাকিল, বেল পাকিবে না কেন? হাতী ক্ষেপিল, কমলিনী ফুটিল, দাড়িম ঝলসিল—বারিপতন হইবে না কেন?

"কলিকাতার দালানগুলা যেন দাবানল জ্বলিতেছে। খোলার ঘর ত আগুনের খাপরা। টিনের ছাদ তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে। নূতন চূণকাম করা শাদা দেওয়ালে মধ্যাহ্নতপনের তাপ লাগিয়া গরিব পথিকের চক্ষু কেবল ঝলসিতেছে। যে বাড়ীগুলার হল্‌দে রঙ, সে গুলাতে বরং একটু রক্ষা আছে। তক্তাচাপা অসূর্য্যম্পশ্য নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রঙের অনুকরণে যে সকল বাড়ীতে আজকাল একটু হরিতালী গোছ রঙ মাখান হয়, দেখিলেই কতকটা উত্তপ্ত পথিকের মন প্রাণ শরীর ঠাণ্ডা হইতে পারে।"

কি সুন্দর বর্ণনা! কি মধুর ভাষার লালিত্য! এইটুকুর ভিতর সাধুভাষাও আছে, গ্রাম্য কথাও আছে; সংস্কৃত শব্দ আছে, দেশজ শব্দও আছে, সবই আছে। কিন্তু কেমন সহজ সরল সরস লিপিভঙ্গী! ভাষা যেন ছন্দের তরঙ্গে তালে তালে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। বর্ণনায় কেমন নূতন সরস ভাব। যোগেন্দ্রচন্দ্রের ভাষাভঙ্গী সর্ব্বত্রই এইরূপ। যেন হারমনিয়মের বাঁধা সুর। ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ, সাতটী সুরই বাঁধা। যখন যে সুরই ধরুন না, ইচ্ছামাত্রে লয় ঠিক রাখিয়া সুর চড়াইতে ও নামাইতে পারেন। কড়ি কোমলে তাঁহার সাধা বিদ্যা। রুচির বিচারে মডেল ভগিনী সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষা-ভঙ্গীর নিজস্ব ও নূতনত্ব সম্বন্ধে মতভেদ নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেকের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার ভাষার মাধুর্য্য, সর্ব্বসম্মত। তাঁহার ভাষা সরল, সহজ, সরস, সর্ব্বজন-বোধ্য, যেন খাঁটি নির্জ্জলা পদ্মমধু। যেখানে যেমনটী চাই, তিনি সেইখানে ঠিক তেমনটী ধরিতেন; তিনি খেমটায় ঢোলক এবং ধামারে পাখোয়াজ ধরিতেন; তাঁহার সাধা সুর কখন তানপুরার গম্ভীর তানে বাজিত, কখন বা গ্রাম্য কৃষকের বাঁশের বাঁশীর ভিতর দিয়া বাহির হইত। তাই সে সুরে সকলের মন মুগ্ধ হইয়া পড়িত। তাঁহার বিষয়ে বৈচিত্র্য, ভাষায় বৈচিত্র্য, ভাবে বৈচিত্র্য, রসে বৈচিত্র্য; তাঁহার ব্যঙ্গে রঙ্গের অবিশ্রাম প্রবাহ, শ্লেষে ক্ষুরধার কুঠার বল্লম, গাম্ভীর্য্যে গিরিসার।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'নেড়া হরিদাস' ব্যঙ্গ প্রধান গ্রন্থ। বঙ্গে ভণ্ডের ভণ্ডামি সম্পূর্ণ-রূপে উদ্ঘাটিত। ইহাতে ব্যঙ্গের ভাষায় যেমন রঙ্গের তরঙ্গ উঠিয়াছে, তেমনই আবার গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্যও প্রক-টিত হইয়াছে। মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গে—শ্লেষের কঠোর কষাঘাতে মর্ম্মের হাড় পর্য্যন্ত মড় মড় ভাঙ্গিয়া যায়। যেখানে ব্যঙ্গ, যেখানে শ্লেষ, সেইখানেই যোগেন্দ্রচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাঁহার লেখা যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়, তাহা তাঁহার বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবগিরি এবং

বারাণসীর কৃষ্ণানন্দের মোকদ্দমা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলিতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যোগেন্দ্রচন্দ্র রসভঙ্গীতে কিরূপ ব্যঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলিতে পারেন, শ্লেষের কিরূপ তীব্র তীর ছুটাইতে পারেন, তাহা তাঁহার চিনিবাস চরিতামৃত ও বাঙ্গালী চরিতে পূর্ণ প্রতিভাত। বাঙ্গালী চরিতের গদাধরচন্দ্র চিনিবাসের দ্বিতীয় দোসর। গদাধরচন্দ্র চিনিবাসের ন্যায় বক্তৃতার ডম্বরু-নিনাদে জননী জন্মভূমি ভারতের উদ্ধারপ্রয়াসী। গদাধরও চিনিবাসের ন্যায় তাহাতে চিন্তামগ্ন। বাঙ্গালী চরিত হইতে গদাইচরিতের একটু আভাস লউন ;—

"একদিন প্রাতঃকালে সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া গদাই নিবিষ্টচিত্তে কি গভীর ভাব ভাবিতেছেন, তাহা কেহ জানে না ; মলয়-মারুত-আন্দোলিত নলিনীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে দুলিতেছেন, আর অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলিতেছেন, 'সব ঠিক, কেবল চীনে একজন দূত পাঠাইলেই হয়—উপযুক্ত পাত্র কে ? পাত্রের মধ্যে আমি আর মিষ্টার গোবর্দ্ধন। কিন্তু আমরা গেলে চলে কই ? তবে কি কামস্কটকা রেলপথ হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। গদাই ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ভাবসাগরে ডুবিয়া গেলেন। ক্রমে একটু উচ্চস্বরে বলিলেন ;—

একা আমি এ সংসারে কোন দিক্ রাখি,
দুই হাত, দুই পদ, দুই নাসা-পুট,—
দুয়ির অধিক মোর নাই কর্ণছিদ্র ;
হায়রে নাহিক জিহ্বা একের অধিক,—
সামান্য সম্বলে বল কেমনে পশিব
কামস্কাটকা ভূমি ; হায় মোর কি যন্ত্রণা ;
কেন না হইল মোর দুইটি রসনা,
চারি চক্ষু, চারি হস্ত চারিটী চরণ
তা হলে কি আজ আমি ভাবিতাম এত ?
দুই চোখ পাঠাতাম চীন উপকূলে,
একটী রসনা যেত লয়ে দুটী হাত
(বক্তৃতাকারে নাড়িবার হেতু চীন দেশে)
এতক্ষণ চীনরাজ কাঁপিত সভয়ে--
পায়ে ধরি ভাব করি দিত ভূমি ছাড়ি ;
চলিত বাষ্পীয় যান গভীর গর্জ্জনে
ঘোর রবে ঘর্ঘরিয়া ঘুরিয়া উঠিত
গিরিশৃঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে মাতঙ্গ যেমতি
ধায় মাতঙ্গিনী পিছে পর্ব্বত উপরি।
কিন্তু একা আমি ; যোড়া যোড়া নাই বস্তু
কি করিতে পারি ? ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
অসি করি করে উপাড়িয়া ডান চক্ষু
চিরিয়া রসনা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু
ফেলি চৈনিক প্রাচীরে :

এমন সময়, একটী লোক আসিয়া পশ্চাৎ হইতে গদাইয়ের চক্ষু টিপিয়া ধরিল ; গদাই বলিলেন ;—

কে তুমি হে ? মিষ্টার মিত্রজ নাকি ?
চক্ষু চাপি কিবা ফল, ছাড় দুনয়ন ;—
জ্ঞান-চক্ষে ধূলি দেয় কাহার শকতি ?
পার্থিব নয়ন ঢাকি মোরে কি ভুলাবে ?
চক্ষু বুজি সব দেখি আমি গদাধর।

তখনও তিনি চক্ষু ছাড়িলেন না ; গদাই আবার বলিলেন ; –

চক্ষু ছাড় গোবর্দ্ধন মিত্রজনন্দন !
নয়ন রতন আজ বড় মূল্যবান্ ;
ডান চক্ষু যাবে আজ চীনের মুলুকে
বাম আঁখি রবে গৃহে গৃহ করি আলো।

সেই লোকটি তখন চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল ; গদাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, এ কি ?

নিবাস কোথায় তব ঘর কোন্ দেশে ?
কভু তুমি নহ বঙ্গে মিষ্টার গোবর ;
বঙ্গভূমি জন্মভূমি নহেরে তোমার ;
জাতীয় লক্ষণ নাই তোমার শরীরে।
হ্যাট কোট কই তব ? গলায় কলার কৈ ?

একি বস্ত্র পরিধান? লাজে মরি দেখে
ফিঙ্‌ ফিঙে কানি—নীচে তার কাল ডোরা
উপরে উলঙ্গ অঙ্গ—রঙ্গ ভঙ্গ দেখি
রে আতঙ্কে অঙ্গ মোর; হায় বিধি!
কি মাটীতে গড়েছিলে এ নর-মুরতি?

লোকটীর নাম হরিদাস। হরিদাস গদাইয়ের নিকট টাকা পাইত। গদাই হরিদাসকে চিনিতে পারিলেন না। হরিদাস বলিল, ভাল গদাই তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? তখনই

উত্তরিল গদাধর ক্রোধে কম্প দেহ—
কে তুমি হে কৃষ্ণকায় ভোমরা ভরম
হয় দেখি তব দেহ; কুকণ্ঠে উগার
কেন কালপেঁচা সম কিচকিচে ধ্বনি;
(এবে) অনেক সাঙাত আসে সখা সখা বলি
আলাপিতে মোর সনে এ ঐশ্বর্য্য কালে।
ভাই বল, খুড়া বল, বাবাই বা বল
কিছুতেই গদাধর ভুলিবার নয়।

ইহা সমাজের একটী নিখুঁত চিত্র। যোগেন্দ্রচন্দ্র উৎপ্রেক্ষায় ব্যঙ্গের রঙ্গে, তীব্র ভাষাভঙ্গে, সমাজের একটী স্বভাবজ সুন্দর চিত্র আঁকিয়া সমাজের চক্ষে ধরিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কননৈপুণ্যে এই ব্যষ্টি-চরিত্রে সমাজের একটী সমষ্টি-চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই ব্যঙ্গলেখকের সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ পরিচয়।

ব্যঙ্গবর্ণনায় কিরূপ রসনর্ত্তনে যোগেন্দ্রচন্দ্র মন মজাইতে পারেন, নেড়া হরিদাস হইতে তাহারও একটু নমুনা তুলিয়া দেখাইতেছি;—

"গঙ্গার ধারে দিব্য দ্বিতল বাড়ীটী। বৈকালে দ্বিতলের বারাণ্ডায় বসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া থাকিলে স্বর্গসুখ সম্ভোগ হয়। অট্টালিকাটী প্রকাণ্ড। মেরামত বোধ হয় অনেক দিন হয় নাই। বাহিরের সাদা চুণকাম কতকটা কালো হইয়াছে খড়খড়ির পাখী, দুই চারিটা ভাঙ্গিয়াছে। পুরাতনত্ব হেতু বাড়ীটীর প্রকাণ্ডত্ব যেন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বারে দুই জন উপবিষ্ট। ইহা ব্যতীত দাস আছে, দাসী আছে—তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী আছেন—সোহাগিনী সংচরী আছেন—ক্ষীর-সর-নবনীত-বণ্টন-কারিণী গরবিণী গোয়ালিনী আছেন;—ফুলমালাবিনায়িনী মনোমোহিনী মালিনী মাসী আছেন;—আর' আছেন,—সেই মহিলাকুল-মনমজায়িনী 'মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারিণী লবঙ্গমঞ্জরী নাপিতিনী। আছেন সবই, নাই কেবল একটি,—অথবা কিছুই নাই। নীলাকাশে কোটী কোটি নক্ষত্র—নাই কেবল চন্দ্র। ব্যঞ্জন অসংখ্য—নাই কেবল ভাত। হাতে ফেরাই অনেক—নাই কেবল রঙ।"

দেখিতে পাই, যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের স্থানে স্থানে এক একটি বাক্যে বহু ভাবের রসগাম্ভীর্য্য, যেন মধুমিশ্রিত মর্দ্দিত রসাসিন্ধুর কষিত কনক-সৌন্দর্য্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজলক্ষ্মীর একটি কথা এখানে উদ্ধরণ যোগ্য।

কাত্যায়নী হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ রমণী, সাধ্বী পতিব্রতা। তিনি বিধবা। তাঁহার স্বামী ধনী ছিলেন। এখন অবস্থা হীন। পূর্ব্বাবস্থার বর্ণনায় যোগেন্দ্রচন্দ্র এক স্থানে এই ভাবে লিখিয়াছেন;—সমৃদ্ধির সময় কাত্যায়নীর স্বামীর সুন্দর উদ্যান ছিল। এখন এই হীনাবস্থায় তাহার দুরবস্থা হইয়াছে। এখন আর দেবীপূজার ফুলগাছ ভিন্ন অন্য কোন ফুলগাছ বা অন্য কোন গাছই নাই। আছে কেবল একটি আম গাছ। ৺কর্ত্তা মহাশয় স্বহস্তে তাহা রোপণ করেন। প্রবাদ সেরূপ সুমিষ্ট আম সে দেশে ছিল না। কর্ত্তা স্বয়ং জালতি করিয়া সে আম পাড়িতেন, পাকাইতেন, দেবতাকে ও ব্রাহ্মণকে দিতেন। অবশেষে স্বীয় সহধর্ম্মিণী

কাত্যায়নীকে বলিতেন,—আম সকলকে দেওয়া হইয়াছে, এখন তুমি একটি খাইলেই আমি খাইতে পারি। কাত্যায়নী হাসিয়া বলিতেন—ও আম টক, প্রসাদ না হইলে মিষ্ট হয় না, আমি টক আম কেন খাইব?" একজন ভাল ফটোগ্রাফার কাহারও চেহারা তুলিলে বড় আকারের ফটোতে যেমন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফুট করিয়া তুলে, ছোট আকারের ফটোতেও সেই চেহারার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তেমনই প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে পারে। সমগ্র রাজলক্ষ্মী গ্রন্থ কাত্যায়নী-চরিত্রের বিরাট ফটো; কিন্তু "ও আম টক, প্রসাদ না হইলে মিষ্ট হয় না।" এই কথা কয়টীতেও কাত্যায়নী-চরিত্রের পূর্ণ ফটো উঠিয়াছে। এই কথা কয়টীতেই প্রমাণ হইল, রমণী সাধ্বী, রমণী রসিকা। তাঁহার রসিকতা প্রগাঢ় রস-সিন্ধু, সরোবরের তরতর সলিল নহে। এই রসিকতায় রসভাষায় প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা সংযম—হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ রমণীর সকল বিভূতি সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র আপনাকে দেখাইতেন না, কিন্তু তিনি বাহিরের সবই দেখিতেন। কখন কিরূপে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা বুঝিবার অবসর আমাদিগকে দেন নাই। তিনি সভায় মিলিতেন না, সমাজের সঙ্গ রাখিতেন না। শরীর অত্যন্ত স্থূল ছিল বলিয়া যৌবনেই তিনি কতকটা অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য আবশ্যক হইলেও অনেক সময়ে সমাজে বা সামাজিক কার্য্যে যোগ দিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার যে কোন গ্রন্থ পড়িলেই মনে হয়, তিনি নাট্যমঞ্চের যবনিকার অন্তরালে থাকিতেন, আর কখন্ কোন্ ফাঁক দিয়া দর্শকমণ্ডলীর চরিত্র চর্চ্চা করিয়া লইতেন। তাঁহার বাঙ্গালী চরিতে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কোন ভাক্ত ভণ্ড কোন্ সমাজের কোন্ অঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া ভণ্ডামীর প্রকট লীলা করিতেছে, তাহার প্রস্ফুট দেখিতে হইলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাঙ্গালী চরিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি বাঙ্গালী চরিত্রে ভণ্ড বাঙ্গালীর মুখোশ খুলিয়া দিয়াছেন। গদ্যে পদ্যে, ব্যঙ্গে রঙ্গে, শ্লেষে বিদ্রূপে ভণ্ডচরিত্রের এরূপ বিকাশ বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল।

ব্যঙ্গের ভাষা যোগেন্দ্রচন্দ্রের সকল গ্রন্থেই পরিস্ফুট। ইহা পদ্যেও যেরূপ, গদ্যেও সেইরূপ। আবার গ্রন্থেও যেমন, প্রবন্ধেও তেমনই। আবার গাম্ভীর্য্যের ভাষাও ঠিক এইরূপই। ফল কথা, ভাষা যেন তাঁহার দাসী; তাহাকে যখন যে দিকে চালাইয়াছেন, তাহা ঠিক সেই দিকেই সমভাবে চলিয়াছে। একই জলধারা কখন ভীমাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া উদ্দাম গতিতে তরঙ্গ ভঙ্গে ছুটিয়াছে, আবার কখন বা শান্ত সুধীরা বালিকাটীর মত মৃদুভাবে মৃদু উর্ম্মি-মালা তুলিয়া ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। চূণ সুরকী বালি ইট, এই কয়েকটী যেমন সৌধসৃষ্টির প্রধান উপকরণ, তেমনই করুণ, অদ্ভুত, বীর রৌদ্র ও শান্ত এই কয়টী রসই গাম্ভীর্য্যসৃষ্টির উপাদান। এই কয়টী রসের যথাযথ-প্রয়োগে গাম্ভীর্য্যসৃষ্টিতেও যোগেন্দ্র-চন্দ্র সিদ্ধহস্ত। রাজলক্ষ্মী এবং মডেল ভগিনী হইতে গাম্ভীর্য্য সৃষ্টির বহু উদাহরণ উদ্ধৃত হইতে পারে। মডেল ভগিনীর ব্রাহ্মণ রাধাশ্যাম, রাজলক্ষ্মীর সাধ্বী বিধবা কাত্যায়নী, পুত্রবধূ যশোদা, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীপ্রসাদ, ভৃত্য রঘুদয়াল, দীনদয়াল, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি গাম্ভীর্য্যসৃষ্টির সজীব বিগ্রহ।

পুণ্যচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে

আগে পাপের চিত্র দেখিতে হইবে; আগে অন্ধকার না দেখিলে আলোকের র্য্য বুঝা যায় না। এই জন্য সকল ভাষায় সকল কাব্যে পাপ-পুণ্যের চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত হয়। তাহাতেই কাব্যের কৃতিত্ব-রাগ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এক দিকে যেমন পাপের ঘন কালিমাময় বিকট চিত্র, অন্যদিকে তেমনই পুণ্যের সৌরকরোজ্জ্বল ভাস্বর মহিমময় চিত্র। অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক, দুঃখের পার্শ্বে সুখ, রাত্রির পার্শ্বে দিবা, শোকের পার্শ্বে সান্ত্বনা। যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে ঠিক এমনই করিয়া পাপ ও পুণ্যের চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মডেল ভগিনীতে পাপপথচারিণী বিলাসিনী কুলকলঙ্কিনী কমলিনীর, এবং রাজলক্ষ্মীতে ভণ্ড কাশীবাসী, সনাতন, শিয়ালমারা প্রভৃতি পাপচিত্রের পূর্ণ প্রকট মূর্ত্তি। অপর দিকে মডেল ভগিনীর রাধাশ্যাম, এবং রাজলক্ষ্মীর কাত্যায়নী, অন্নপূর্ণা, রঘুদয়াল, পুণ্যচিত্রের আদর্শস্বরূপ। কাত্যায়নী ও অন্নপূর্ণার চরিত্রে করুণ রস, প্রভুভক্ত রঘুদয়ালের চিত্রে বীর রস, ধার্ম্মিক ভক্ত রাধাশ্যাম ও দীনদয়ালের চিত্রে শান্ত রস, আর কমনীয় কিশলয়সম কিশোরী রাজলক্ষ্মীর চিত্রে রৌদ্র রসের যে পরিচয় পাই, প্রকৃতই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা বাঞ্ছনীয়। যোগেন্দ্র চন্দ্রের রাজলক্ষ্মী উপন্যাস সত্য সত্যই যেন নব রসের পূর্ণাধার। কাশীতে ভণ্ড ভক্তে যোগেন্দ্রচন্দ্র যে অদ্ভুত রসের অবতারণা করিয়াছেন, সেরূপ অদ্ভুত রসের বিকাশ আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এক একটি দৃষ্টান্তসহকারে এক একটী রসের বিশ্লেষণ [illegible]দ্য এই প্রবন্ধে অসম্ভব। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শরতে বঙ্গের গৃহে গৃহে আমরা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী দশভুজার মোহিনী মূর্ত্তিতে যে মধুর প্রখর ভাবোন্মাদ দেখিতে পাই, যোগেন্দ্রচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী উপন্যাসে চিত্রিত রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-চিত্রে সেই মধুর প্রখর ভাবোন্মাদ পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত।

চরিত্র বা স্বভাবের বর্ণনায় সম-আলোক-ছায়া-সম্পাতে বর্ণবিন্যাসে যোগেন্দ্রচন্দ্রের তুলিকা এমন আঁকিয়াছে যে, সে চিত্র দেখিলে মনে হয়, যেন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর গুইডো বা র‍্যাফেল চক্ষের সম্মুখে একখানি ছবি আঁকিয়া ধরিলেন। বর্ণনার ভাষায়, রঙ্গের বৈচিত্র্যে, ভাবের নূতনত্বে তাহা সর্ব্বজনমনোহর। তাঁহার ভাষা গাম্ভীর্য্যে সন্ধ্যার শান্ত-সৌম্য-গম্ভীর-মূর্ত্তি, আর রঙ্গে স্বচ্ছ-সরোবর-সলিল-প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমার ঢল ঢল ছায়া। তাহা গাম্ভীর্য্যে প্রশান্ত ঋষিমণ্ডলী-সেবিত বিশুদ্ধ তপোবন, আর রঙ্গে বিলাসীর বিলাসরসপূর্ণ নর্ত্তকী-কল-কণ্ঠ-মুখরিত প্রমোদকানন। সহজ অলঙ্কারে সহজ করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, তাঁহার ভাষা গাম্ভীর্য্যে বৌমাষ্টারের যাত্রার দলের ধ্রুবচরিত্রের সুনীতি, আর রঙ্গে গোপাল উড়ের যাত্রার বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসী। তাঁহার রঙ্গপূর্ণ ভাষার পরিচয় পূর্ব্বে অনেক পাইয়াছেন, এখন রাজলক্ষ্মী হইতে গাম্ভীর্য্যের একটু পরিচয় লউন।

অন্নপূর্ণা অন্নাভাবে পিতা ভবানীপ্রসাদের অন্নসত্রে ধান ভানিতেছেন। ভবানী-প্রসাদ জানেন না যে, তিনি তাঁহারই কন্যা, এইখানকার একটু বর্ণনা শুনুন;—

"রাজা অমর সিংহ ঢেঁকিশালার সম্মুখে আসিয়া, কাঠের বেড়া ধরিয়া, বহির্দ্দেশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি অনি-

মেষলোচনে অন্নপূর্ণার অপূর্ব্ব অলৌকিক মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা, তাঁহার লাল টুকটুকে দক্ষিণ চরণ খানি ঢেঁকির উপর স্থাপন করিয়া, ঈষৎ ভর দিতেছেন, আর ঢেঁকি অল্প উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। পায়ের ভর একটু কমাইতেছেন, আর ঢেঁকির মুষল সজোরে গিয়া চাউলের উপর পড়িতেছে। ফলার তীরের সহিত আড়ভাগে এক খণ্ড বাঁশ বাঁধা আছে। হাত দ্বারা সেই বাঁশ ধরিয়া দেহভার কতকটা সেই বাঁশের উপর রাখিয়া তিনি ধানভানা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। আর ঢেঁকির পার্শ্বে বসিয়া, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী জননী যশোদা, একান্তমনে কুলার দ্বারা চাল পাছাড়াইতেছেন, আবর্জ্জনা উড়াইতেছেন এবং খুদ্ এক পাশে এবং চাল এক পাশে রাখিতেছেন।

"রাজা অমরসিংহের দৃষ্টি কেবল অন্নপূর্ণার প্রতি এখন নিপতিত। ধানভানা উপলক্ষে অন্নপূর্ণা কখনও হেলিতেছেন, কখনও দুলিতেছেন, কখনও অবনতাঙ্গী হইতেছেন, কখনও যেন নতজানু হইবার উপক্রম করিতেছেন, কখনও যেন বীর রমণীর ন্যায় স্ফীত কলেবরে ঈষৎ উর্দ্ধপানে উঠিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল, বিস্তৃত নয়ন আজ আরও যেন অধিকতর উজ্জ্বল এবং বিস্তৃত দেখাইতেছে। লাল লাল অধরপ্রান্তে মাঝে মাঝে মধুর-মধুর সাদা-সাদা হাসিফুল যেন আধ-আধ ফুটিয়া উঠিতেছে।

"অন্নপূর্ণার এই অপরূপ স্বর্গীয় রূপরাশি দেখিয়া, রাজা অমরসিংহ মোহিত হইলেন। মনে মনে কহিলেন,—"তুমি কে মা? তুমি কাহার কন্যা? আধ-আধ হাসিয়া, মহাসমরে কেন নাচিতেছ? মা! আজি কি শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের দিন? বল মা! তুমি কে,—মায়া! এরূপ এলোথেলো কেশে, এরূপ ছিন্ন-মলিনবেশে প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব অঙ্গভঙ্গী করিয়া,—প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব রঙ্গ-তরঙ্গ দেখাইয়া,—সমরাঙ্গনে নাচিয়া নাচিয়া তালে তালে পা ফেলিতেছ? মা! তুমি ভবভয়হারিণী? তোমার নয়নদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে নাচে কেন মা? মা! এই যে শব্দ উত্থিত হইতেছে,—এ কি দৈত্যদলবিনাশকালীন ঘোর গভীর হুহুঙ্কার শব্দ? হে জগৎ-পালিকে! নাচ, মা! নাচ;—জীবের জ্বালা যন্ত্রণা দূর কর মা!

"মাগো! আমার হৃদয়-মাঝারে আসিয়া একবার নাচ গো! তেমনি তেমনি করিয়া করতালি দিয়া দিয়া, হাসি-জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আমার এই অর্দ্ধদগ্ধ মরুময় হৃদয়মাঝারে আসিয়া একবার নাচ,—মা! মা! হৃদয় আমার পুড়িয়া ছারখার হইতেছে। মা গো! অমৃতবারি সেচন করিয়া, শান্তি জল ঢালিয়া, আমার এই হৃদয়ের আগুন, নাচিয়া নাচিয়া নিভাও, মা!

"মা! তুই লাল-বরণী হইয়া, কাল রংএর কাপড় কেন পরিয়া আছিস? নীলাম্বরে কি কখন অচঞ্চলা দেহ-সৌদামিনী ঢাকিয়া রাখা যায়? সত্য সত্যই মেঘ দিয়া, তুই কি পূর্ণিমার চাঁদখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিস্? অথবা মেঘাম্বর পরিধান করিয়া মেঘাম্বরে কটীতট বাঁধিয়া, মেঘের উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিলে—তোর নাচ বুঝি ভাল দেখায় মা! তবে ঐ নীলবসন পরিয়া পরিয়াই অনন্তকাল ঐরূপ নাচিতে থাক্, মা!

"হে নীলকণ্ঠভূষণা! হে নীলপদ্মনয়না! হে নীলবসনপরিধানা! একবার আমার অন্তরে আসিয়া নাচ্ মা! একবার আমার বাহিরে আসিয়া নাচ্ মা!—আমার অন্তরে বাহিরে উভয় স্থানে নাচ মা!"

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের বর্ণনায় আর

এক বিশেষত্ব এই যে, কোন কোন স্থানের বর্ণনা তাঁহার নিজের বিরাট বপুবৎ বিরাট্ হইলেও বিকট নহে। বিরক্তিকর তো নহেই। পরন্তু তাহা পাঠকের আগ্রহজনক। এখানে তাঁহার রচিত কালাচাঁদ গ্রন্থে কালাচাঁদের ভূরি-ভোজন উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই বিংশতি পৃষ্ঠাব্যাপী ভূরি ভোজনের বিবরণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইবার অবসর এক্ষণে নাই। সুতরাং শ্রোতৃ-বৃন্দকে উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াই নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম। সে ভূরি ভোজনের ব্যাপার পড়িতে বিরক্তি তো হয়ই না, পরন্তু অতি ক্ষুধার্ত্ত পাঠকেরও যেন একটা ক্ষুন্নিবৃত্তির সুখানুভূতি আসিয়া পড়ে। সহজ কথায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের বিরাট্ বর্ণনা যেন ময়রার দোকানের লেডিকেনি—উপরে খট্‌খটে, ভিতরে রসে ভরা।

চাঁদ কেমন করিয়া সমুদ্রের জল বাড়ায়, তাহা কেহ জানে না, কিন্তু চাঁদের কিরণে সমুদ্রের জল বাড়ে, ইহা সত্য। যোগেন্দ্রচন্দ্র কেমন করিয়া সাহিত্যের সেবা করিতেন, তাহা হয় তো অনেকেই জানেন না, কিন্তু তাঁহার সেবায় যে সাহিত্য সম্পুষ্ট, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহার সাহিত্যসেবার প্রক্রিয়া দেখি নাই —প্রভাব বুঝিয়াছি।

মানুষ অলক্ষ্যে অন্তরালে থাকিলেও তাহার ছায়া দর্পণে পড়িলে যেমন তাহার আকৃতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়, তেমনই যোগেন্দ্রচন্দ্র সমাজ হইতে দূরে থাকিলেও তাঁহার সাহিত্যে, তাঁহার চরিত্রের ছায়া পরিদৃষ্ট হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র স্বরচিত রাজলক্ষ্মী উপন্যাসে রূপান্তরে দীনদয়াল। দীনদয়াল যৌবনে দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নে নিত্য ব্যথিত অন্তঃকরণে মাথায় সামান্য মাত্র দ্রব্যসম্ভার লইয়া পথে পথে ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। তিনি ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ; ব্যবসায়ে অসত্যাচরণে সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত, দীনদয়ালের ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তিনি যখন পথে পথে ফেরি করিয়া বেড়াইতেন, তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, কখন কাহাকেও কোনরূপে প্রবঞ্চনা করিব না, এক দর ভিন্ন দুই দর বলিব না। ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক! প্রথম প্রথম সত্যপরায়ণ দীনদয়াল ব্যবসায়ে নিষ্ফল হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম সত্যপরায়ণ দীনদয়ালের কথা লোকে অসত্য ভাবিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও দীনদয়াল সত্যের পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সত্যের অপার মহিমায় দীনদয়াল কালে ব্যবসায়ে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। জীবনে কত কোটি টাকা উপার্জ্জন করিলেন। তিনি অনন্ত দয়ার সাগর—উপার্জ্জিত অর্থ মুক্তহস্তে দীন দরিদ্রে বিতরণ করিতেন। তিনি নামের ভিখারী ছিলেন না। উপযাচিত হইয়াও তিনি উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি অপনাকে লুকাইয়া দান করিতেন, কিন্তু পরকে দেখাইবার জন্য উপাধি লইতেন না। অনুচর, কিঙ্কর, আত্মীয় স্বজন, পরিচিত, সকলের প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। তিনি পুরুষকারের পূর্ণ অবতার ছিলেন।

এই দীনদয়ালের চরিত্র যতই আমরা আলোচনা করি, ততই যোগেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্র আমাদের নিকট প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি নিজে বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপন-পত্রিকা বিতরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইলে পর তিনি এক দরেই বিজ্ঞাপন লইতেন; তাঁহার দর বাঁধা ছিল। কাহারও নিকট কম বা কাহারও নিকট বেশী দর

কিছুতেই লইতেন না। ইহাতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হইয়াছিল, বঙ্গবাসীতে খড় বেশী বিজ্ঞাপন আসে নাই। কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। তিনি বলিতেন, এক জনের নিকট এক দর ও অন্য জনের নিকট আর এক দর লইলে প্রবঞ্চনা করা হয়। বঙ্গবাসী থাকুক বা না থাকুক, এরূপ্ প্রবঞ্চনা করিব না। পরে কিন্তু বঙ্গবাসীতে আর বিজ্ঞাপনের অভাব হয় নাই। এই নীতিতে তিনি এ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী চালাইয়া আসিতেছিলেন। নিজের অধ্যবসায়ে, নিজের সাধুতায়, তিনি দীনদয়ালের মত অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার দীনদয়ালের মত পরার্থে অনেক অর্থ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। দীনদয়ালের ন্যায় তিনি উপাধিকে উপেক্ষা করিতেন। অনেক বারই তাঁহার উপাধি পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগে তিনি আত্মহারা হন নাই। যাহা তাঁহার দৃষ্টিতে উপেক্ষণীয়, তাহা দেববাঞ্ছিত হইলেও তিনি তাহাকে আবর্জ্জনা জ্ঞানে বর্জ্জন করিতেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের জীবনে নির্জ্জনতারই নিদর্শন দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত প্রভুভক্ত ভৃত্য রঘুদয়াল, ভ্রাতৃভক্ত রাম প্রসাদ, সতীশিরোমণি যশোদা, আবার অন্যদিকে শিয়ালমারা সনাতন কাশীবাসী, মড়েল ভগিনীর পাপময়ী কমলিনী, নগেন্দ্র, কপিল খানসামা প্রভৃতির চিত্রগুলি তাঁহার দৃষ্টির অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিয়া দেয়। এই সকল চিত্র দেখিলে মনে হয়, যোগেন্দ্র চন্দ্র স্থূল দেহে স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিলেও যেন তাঁহার কোন্ অতি সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বঙ্গের বিরাট সমাজে ঘুরিয়া ফিরিয়া, প্রত্যেক লোক-চরিত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের নিখুঁত ফটো তুলিয়া লইত। সাহিত্যে চরিত্র বা ভাষার রঙ্গে এবং গাম্ভীর্য্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্রের ছায়াই দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি গুরু, গম্ভীর, কার্য্যের বাহিরে সখ্যসুখালাপে। রসাবতার। কার্য্যে দার্শনিক, সখ্যে কবি। কমলসরোবরের তটস্থিত ঘন কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজি দর্শনে যাঁহারা অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা যেমন সেই সরোবরের কমলসৌন্দর্য্যের দর্শনসুখানুভবে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ যাঁহারা দূর হইতে তাঁহার ঘনমসীবর্ণ স্থূল দেহের গাম্ভীর্য্যটুকুর আভাস পাইয়া তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সাহসী হইতেন না, তাঁহারা তাঁহার রসানুভবে বঞ্চিত হইতেন।

সাহিত্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রভাব কিরূপ, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ফল কথা, যোগেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যে সুনিপুণ সুপকার। একদিকে সাহিত্যের পোলাও, কোর্ম্মা, কাবাব, পায়েস পিষ্টক প্রভৃতির পাকে তিনি যেরূপ সিদ্ধহস্ত, অপর দিকে শুক্ত, ঝোল, ডাল, অম্বলের পাকেও তেমনই পটু। তিনি পোলাওর আঁকনীর জল কখনও আঁকাইয়া ফেলেন নাই, এবং শুক্ত ঝোলে কখনও নুণ ঝাল বেশী করেন নাই। যিনি পাকা অভিনেতা, তিনি রাজা সাজিয়া যেরূপ বাহাদুরী লন, আবার ভৃত্য সাজিয়াও সেইরূপ বাহাদুরী লইতে পারেন। যোগেন্দ্র চন্দ্র বড় বড় উপন্যাস লিখিয়া যেমন প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তেমনই সংবাদপত্রে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিয়াও বাহবা পাইয়াছেন। এরূপ সৌভাগ্যশালী সর্ব্বতোমুখী-প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবক বাঙ্গালায় বিরল।

সমাজে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণ এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার বঙ্গবাসী, তাঁহার প্রকাশিত সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশ, এবং বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্য গ্রন্থাদির ...রে বঙ্গে হিন্দু সমাজের বিপ্লবের গতিরোধের পক্ষে কতটা সহায়তা করিয়াছে, তাহা বোধ হয় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে কাহাকেও বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ২০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভূমিতে হিন্দুসমাজ কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এখনই বা তাহার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলেই যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের প্রভাব বেশ বুঝা যাইবে।

বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, এখনও কোন ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুসন্তান টীকি রাখিলে এবং গলায় মালা পরিলে কাহারও কাহারও নিকট বঙ্গবাসীর চেলা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, যোগেন্দ্রচন্দ্রের বঙ্গবাসী ও সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশ বঙ্গের হিন্দুসমাজে লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মভাব আবার জাগাইয়া তুলিয়াছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের ন্যায় নব্যবঙ্গে বোধ হয় আর কাহারও সাহিত্য এরূপ ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। বিলুপ্তপ্রায় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধার ও সুলভ প্রচার করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু সমাজের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু সমাজ চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আজি আমরা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া এত নাড়া-চাড়া করিতেছি, এবং প্রতি কথায় শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতেছি, একদিন এই সকল গ্রন্থের এক একখানি পৃষ্ঠার জন্য কত লোককে প্রাণপাত করিতে হইয়াছে; প্রাণান্ত পরিশ্রমেও হয়তো সকলের অদৃষ্টে উহার দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। সেই শাস্ত্রগ্রন্থরাজি আজি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কে বিলাইল? যোগেন্দ্রচন্দ্র। এই সকল মহামূল্য লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার করিয়া কে আমাদের আর্য্য শাস্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিল? যোগেন্দ্রচন্দ্র। প্রাণান্ত পরিশ্রম, কঠোর অধ্যবসায়, অবিচল সহিষ্ণুতার ফলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই সুলভ শাস্ত্রপ্রকাশের প্রচার।

প্রাচীন কাব্যাদি প্রকাশে যোগেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গের বর্ত্তমান সাহিত্যসেবীদিগের হৃদয়ে প্রাচীন সাহিত্যের মর্ম্ম ও মাহাত্ম্য যেরূপ প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ কি আর কেহ পারিয়াছেন? প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভাশক্তির পরিচয় প্রস্ফুটনে বহু বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীকে প্রাচীন লেখকদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব সংবর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি পাঠ্যাবস্থায় প্রাচীন কবিদিগের কাব্যালোচনায় তাঁহাদিগের শক্তি-মাহাত্ম্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। কর্ম্মজীবনে তিনি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাদির প্রচার করিয়া আপনার ন্যায় অনেক সাহিত্যসেবীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সহবাস সম্মতির আইনসম্বন্ধীয় আন্দোলনের সময় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্য কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এ প্রবন্ধে তাহার সবিস্তার আলোচনা অনাবশ্যক। কেননা তাহা ভারতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং উহা চিরদিনই তাঁহার সাহিত্যপ্রভাবের প্রমাণস্বরূপ দেদীপ্যমান রহিবে।

বাঙ্গালার পাঠকের উপর যোগেন্দ্রচন্দ্রের কিরূপ প্রভাব, তাঁহার লিখিত বিজ্ঞাপনের লিপি-পটুতাতেই তাহা পূর্ণ-প্রমাণিত।

সমাজকে বুঝাইতে, মজাইতে, তাঁহার সাহিত্য মোহময়ী মদিরার তীব্র-মধুর ধারা সমাজের শিরায় শিরায় ঢালিয়া দিত। সংবাদপত্রে লেখনী চালনার সূত্রপাতে যোগেন্দ্রচন্দ্রের যে সাহিত্য প্রখর প্রভাবে দীপক রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার পরলোকগমনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা তেমনই ভাবে প্রজ্বলিত ছিল।

যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রথমে সাধারণীতে লিখিতে আরম্ভ করেন। কোন একটী গ্রামের লোক একটী রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আবেদনেও কোন ফল হয় নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্র সেই রাস্তা সম্বন্ধে সাধারণীতে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের ফলে দুই এক বৎসরের মধ্যেই রাস্তাটী প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, "আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালা সংবাদপত্রে কোন বিষয় লিখিলে তাহার ফল হয় না। কিন্তু ধন্য যোগি! লিখিতে জানিলে এবং লিখিতে পারিলে ফল হয়।" কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিষয়েই তাঁহার এইরূপ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গের বহু বাগ্মী কলরবসহকারে যাহা করণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র নীরবে সাহিত্যের সাধনায় তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশ বৎসরের কলরব বিফল হইয়াছে; যোগেন্দ্রচন্দ্র ২৫ বৎসরের নীরব সাহিত্যসাধনায় সফল করিয়া তুলিয়াছেন। কলরবে কাজ হয় না, বরং অনেক সময় দেখা যায়, যাহারা কলরবে সমধিক পটু, তাহারা কার্য্যে অক্ষম। বসন্তের কোকিল পঞ্চমের কুহুতানে বিশ্ব বিমোহিত করিতে পারে, কিন্তু আপনার সন্তানগুলিকেও পালন করিতে পারে না। যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের যাপ্য মন্ত্র—কথা ছাড়, কাজ কর। স্বর্গারোহণের এক সপ্তাহ পূর্ব্বেও বঙ্গবাসীর সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্গবা... বরাবর বলিয়া আসিতেছে "কথা ছাড় কাজ কর"—এখনও বলিবে। ইহাতে যদি দোষ হয়, তবে বঙ্গবাসী এরূপ দোষযুক্ত চিরকাল থাকুক।"

যোগেন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যে যে এত প্রতিষ্ঠা, আমাদের মনে হয়, তাঁহার ব্যবসায়বুদ্ধির প্রখরতা ইহার একটী প্রধান কারণ। তিনি সাহিত্যকে প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের লক্ষ্য-স্থল করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সুলভ সমাচার, সুলভ সংবাদ-পত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। সুলভ সংবাদপত্র বঙ্গবাসী আজ ২৫ বৎসর কাল পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। যোগেন্দ্র-চন্দ্রের অপূর্ব্ব ব্যবসায়বুদ্ধিবলেই বঙ্গবাসী বঙ্গের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্ররূপে পরিচিত হইয়াছিল। বঙ্গবাসীর উপহারে তাঁহার ব্যবসায় বুদ্ধির প্রখরতার আরও একটী পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এখনও বুঝিতে পারি না, তিনি কিরূপে বৃহৎ বৃহৎ শাস্ত্রগ্রন্থ এত অল্প মূল্যে দিতেন। কোন কোন অগাধ ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই সুলভ সংবাদপত্র ও শাস্ত্র-প্রকাশের ব্যবসায়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ধন্য ব্যবসায়-বুদ্ধি! আবার ইহাও জানি, তিনি লাভের আশায় শাস্ত্র প্রকাশ বাহির করেন নাই, দেশে শাস্ত্র-গ্রন্থের বহুল প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিতেন, আমি যে মূল্যে শাস্ত্র প্রকাশ বিক্রয় করিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মূল্য বাড়াইলে আমার লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের লোক সে মূল্য দিয়া পুস্তক ক্রয় করিতে পারিবে না। আমার লাভ না হউক লোকসান না হইলেই মঙ্গল।

আমার লোকসান হয় না, অথচ দেশের লোক শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়িতে পায়, ইহাই আমার লাভ—ইহাই আমার আনন্দ। শাস্ত্রাদির সুলভ মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তাঁহার কথায় সন্দেহ করিবার কোনই কারণ থাকে না। যোগেন্দ্রচন্দ্র সখের সাহিত্যসেবী ছিলেন না। তিনি জানিতেন, সখের যাত্রায় লোকশিক্ষার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা স্থায়ী হয় না। পেশাদারী যাত্রা লোকশিক্ষাকর, এবং স্থায়ী। সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার এই ধারণা ছিল। এই ধারণায় তিনি আজীবন সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যসেবার ফলে বঙ্গদেশে এবং বঙ্গীয় সমাজে যাহা হইয়াছে, তাহা আর কেহ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

সাহিত্য, চরিত্র, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন, যোগেন্দ্রচন্দ্রের অসাধারণত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই অসাধারণ পুরুষের অভাব আমরা এখনও সম্যক্ অনুভব করিতে পারিতেছি না। কিন্তু যতই দিন যাইবে, ততই আমরা তাঁহার অভাবজনিত দুঃখ অনুভব করিতে পারিব। তখন সেই অভাবের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের [illegible] তীব্র বেদনা জাগিয়া উঠিবে। ত[illegible] সেই কর্ম্মবীর সাহিত্যরথীর স্মৃতি আ[illegible]দের হৃদয়ে পূর্ণভাবে প্রকটিত হইবে। ভীষণ জলকষ্টের দিনে যেমন শুষ্কপ্রায় বিশাল দীর্ঘিকার স্বচ্ছশীতল জলরাশির মধুর স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তেমনই একদিন সত্যসত্যই আমাদিগকে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অভাব অনুভব করিতে হইবে। তবে অভাবের সঙ্গে মানুষের লুপ্ত পুরুষকার উদ্দীপিত হইয়া থাকে। জলের অভাবে গ্রামবাসীদিগের পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়, যোগেন্দ্রচন্দ্রের অভাবে বঙ্গ-সমাজে সাহিত্যসেবক কর্ম্মবীরের কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জাগরিত হইতে পারে। ইহাই আমাদের একটা আশ্বাসের বিষয়।

আজি আর সেই কর্ম্মবীর যোগেন্দ্রচন্দ্র ইহলোকে নাই—সংসারে কেই বা চিরদিন থাকে?—আজি শুধু যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি আছে। এই স্মৃতিই এখন আমাদের সম্বল, এই স্মৃতির পূজাই এখন আমাদের করণীয় কার্য্য। আসুন সকলে, আমরা এখন সেই মহিমময়ী স্মৃতিকে হৃদয়ে বসাইয়া তাহার পাদমূলে শ্রদ্ধার উপহার ঢালিয়া দিই; আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া সমাজে শত শত যোগেন্দ্রচন্দ্রের সৃষ্টি করুক, সংসারে তেমনই শত শত কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হউক, তাঁহাদের পূত পাদস্পর্শে বঙ্গসমাজ ধন্য—চির-গৌরবান্বিত হউক।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।

সচরাচর এইরূপ দেখা যায়, ঐতিহাসিকেরাই রাজচরিত্র বা রাজ-শাসন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। সাধারণের চক্ষে রাজার চরিত্র ও কার্য্য-কলাপ যেরূপ প্রতিভাত হয়, ইতিহাস-লেখকেরা তাহাই বিবৃত করেন। স্বপ্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী, এবং স্বীয় কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্বন্ধে রাজার নিজের অভিমত কি, তাহা রাজপক্ষ হইতে অবগত হইবার উপায় প্রায়ই পাওয়া যায় না। সাধারণ সভায় রাজগণ যে বক্তৃতাদি করেন এবং সাধারণের জন্য যে ঘোষণা-পত্রাদি প্রচারিত করেন তাহাতেই সময়ে

সময়ে রাজার মনোভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু রাজ্য-পরিচালনকার্য্যের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত স্বহস্তে কোন রাজাকে লিপিবদ্ধ করিতে দেখা যায় না। পাশ্চাত্য দেশের রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং প্রসঙ্গতঃ পারিবারিক বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকল বৃত্তান্তে রাজ্যশাসনঘটিত বিবরণ এবং নিজাধিকৃত রাজ্যের অবস্থা সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হয় নাহি। ভারতীয় সম্রাট্‌গণের মধ্যে একমাত্র জাহাঙ্গীর বাদ্‌সা আত্মজীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই বিবরণ হইতে তাৎকালিক শাসন-প্রণালী, রাজ্যের অবস্থা, প্রজার সুখ-দুঃখ, শিল্পের উন্নতি প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সংকলিত হইতে পারে। সুতরাং ইতিহাসের হিসাবে, জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ।

পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত মেজর ডেভিড্ প্রাইস, মূল পারস্য হইতে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনচরিত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথমে প্রচারিত করেন। ছয় বৎসর হইল, কলিকাতার সুবিখ্যাত "বঙ্গবাসী" প্রেস হইতে ইহার একখানি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাহাতে এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণের করায়ত্ত হইয়াছে। ভারতীয় ইতিহাস-সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধনকল্পে বঙ্গভাষায় ইহা অনুবাদিত হওয়া প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া আমরা সাহিত্য সংহিতায় ক্রমশঃ ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থখানিই যে প্রকৃত পক্ষে জাহাঙ্গীরের লিখিত, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কারণ উক্ত সম্রাটের আত্মকাহিনী বলিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ দাবী করে। সেই সকল গ্রন্থের ভিতর, "তারিখ-ই-সলিম-সাহী"; "তারিখ-ই-জাহাঙ্গীর নামা-সলিমী"; "জাহাঙ্গীর নামা"; "তুজক্-ই-জাহাঙ্গীরী"; "দোয়াজদা জাহাঙ্গীরী"; "ওয়াকিয়ৎ-ই-জাহাঙ্গীরী"; "ইক্‌বাল্ নামা" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই গ্রন্থগুলি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে এবং বর্ণিত-কালের ব্যাপ্তিসম্বন্ধেও পরস্পর বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে একখানি পুস্তকও যে জাহাঙ্গীর-রচিত নহে, এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সম্রাট্ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বয়ং এই কাহিনী লেখেন, পরে তাঁহারই আবৃত্তির অনুসরণ করিয়া অপর লেখক আরও কিয়দংশ লিখেন, এবং সম্রাটের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বিবরণ লিখিতে অপর একজন লেখক আদিষ্ট হন। হাদী মহম্মদ বলেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালের প্রথম অষ্টাদশ বর্ষের বিবরণ সম্রাট্ স্বয়ং রচনা করেন, পরে তিনি (হাদী মহম্মদ) অন্যান্য বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়া সম্রাটের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিবরণ লেখেন। সম্রাট্ স্বয়ং বলেন যে, তিনি কয়েক বৎসরের বিবরণ নিজেই লিখিয়াছিলেন, পরে মতামদ খাঁকে অবশিষ্টাংশ লিখিতে আদেশ করেন। সম্রাট্ স্বয়ং কত বৎসর ধরিয়া লিখিয়াছিলেন, এবং মতামদ খাঁই বা কত বৎসরের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন, তাহা সম্রাট্ বলেন নাই, এবং অন্য কোন সূত্রেও তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু দেখা যায় যে, সম্রাট্-লিখিত প্রথম দ্বাদশ বৎসরব্যাপী রাজত্ব কালের কাহিনীর অনুলিপি তাঁহারই আদেশে "দোয়াজদা-সাহা-জাহাঙ্গীরী" নামে অভিহিত হইয়া রাজ্যমধ্যে বিতরিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রথম দ্বাদশ বর্ষের বিবরণ গ্রথিত; সেইজন্য অনেকে বলেন যে, এই

খানিই স্বয়ং সম্রাট্ কর্ত্তৃক রচিত। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে; এই কাহিনীতে সম্রাটের অনেক দৌর্ব্বল্য ও ভীষণ হত্যাকার্য্যের সহিত সংস্রব এরূপ অকপটভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাতে এই গ্রন্থ যে তিনি ব্যতীত অপর কেহ লিখিয়াছেন, তাহা সম্ভবপর নহে।

নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর ৩৬ বৎসর বয়সে মোগল-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং দ্বাবিংশতি বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তন্মধ্যে প্রথম বার বৎসর সম্রাট্ কোন্ কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় মনোহারিণী ভাষায় এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সে সময়ে অতি সহজে সামান্য প্রজাও সম্রাটের সম্মুখীন হইয়া আপনার অভাব অভিযোগ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইত। ইহাতে তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহের কথা, সম্রাটের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী, বঙ্গীয় বাজিকরগণের অদ্ভুত ক্রীড়া, মথুরার দরবেশের অলৌকিক ক্রিয়া ও অন্যান্য নানা বিষয়িণী কথা কৌতূহল-উদ্দীপক ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মধ্যে একদিকে যেমন অসার গৌরব ঘোষণা, অপর দিকে তেমনই দীনোচিত বাক্যবিন্যাস দৃষ্ট হয়। অর্থ ও সৈন্য-বলসম্বন্ধে অতিরঞ্জনের প্রাবল্যও বহুলভাবে দৃষ্ট হয়। কিন্তু লেখকের অসামান্য অকপটতাই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ বলিয়া মনে হয়। জাহাঙ্গীর মদ্যপ ছিলেন সত্য, কিন্তু রাজ্যমধ্যে যাহাতে মদ্যপান নিবারিত হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার মদ্যপানের সহচরগণের মধ্যে কেহ দিবাভাগে পূর্ব্বরাত্রের পানামোদের কথার উল্লেখ করিলে তিনি বিরক্ত হইয়া তাহাকে দণ্ডদান করিতেন। দিবাভাগে তিনি এমন কাঠিন্য দেখাইতেন যে, যদি কাহারও নিশ্বাসে মদের সামান্যমাত্র গন্ধ বাহির হইত, তাহাকে তিনি নিকটে আসিতে দিতেন না। তিনি যৌবনের প্রাক্কালে পিতা আকবর প্রবর্ত্তিত "ইলাহি" ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ভিতরে যাহাই থাকুক মুসলমান ধর্ম্মের বহিরাবণের তিনি আবৃত থাকিতেন; পরন্তু হিন্দু বা খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীকে তিনি দ্বেষ করিতেন না। নুরজাহান বেগম সম্বন্ধে এই গ্রন্থে এমন কোন উল্লেখ নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহার রাজকার্য্যে কর্ত্রীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নুরজাহানের প্রথম স্বামী সের আফগাণের "হত্যার" পরে সম্রাট্ নুরজাহানকে বিবাহ করেন, গ্রন্থে এই মাত্র উল্লিখিত আছে। হন্তা কে এবং হননের কারণই বা কি, এ সকল কথার কোনই উল্লেখ নাই। কিন্তু পিতা আকবরের প্রিয়পাত্র সুপ্রসিদ্ধ আবুল ফজলকে যে তাঁহারই আদেশে হত্যা করা হইয়াছিল, এ কথা জাহাঙ্গীর স্বীয় গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন, এবং হত্যার কারণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সম্রাটের হৃদয়ের গূঢ় ভাবের অভিব্যক্তিস্বরূপে বড়ই মূল্যবান্। ইহাতে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা বিষয়ের সমাবেশ আছে, এবং কৌতুকপ্রদ অনেক বিষয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির উদ্দেশে এবং জাহাঙ্গীর নিতান্ত অপদার্থ স্ত্রৈণ সম্রাট্ ছিলেন এই ভ্রমাত্মক মতের খণ্ডনের অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে মেজর প্রাইসের উপাদেয় ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য সংহিতায় আমরা প্রকাশিত করিব।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।*

মঙ্গলাচরণ।

যাঁহার নাম সকলের শীর্ষদেশে সংস্থাপিত, যাঁহার মহিমা সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত; যিনি একটিমাত্র বাক্য প্রয়োগে, শূন্য হইতে স্বর্গরাজ্য ও মর্ত্ত্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমাদের মস্তকের উপর আকাশ বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং এই পৃথিবীকে তাঁহার শক্তি-গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন;—সেই সনাতন সর্ব্বশক্তিমান্ শিল্পীর জয় উচ্চারণ করি এবং তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। আর সৃষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠতম জীব মানবকুলকে যিনি ভ্রমের জটিল পথ হইতে সত্য এবং কর্ত্তব্যের পথে আনিয়াছেন; যাঁহাকে ঈশ্বর মর্ত্ত্য-শক্তির উপরে আধিপত্য এবং অপরাপর প্রেরিতগণের উপরে প্রাধান্য দিয়াছেন; যিনি আপনার আগমনবার্ত্তা আপনিই প্রকাশিত করিয়াছেন; যাঁহার স্বর্গীয় জ্যোতির কণামাত্র পাইবার জন্য ইজরেল-শাসনকর্ত্তা অভিলাষ করিয়াছিলেন;—সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত হজরৎ মহম্মদ ঈশ্বরের অসংখ্য অনুগ্রহ লাভ করুন।

সিংহাসনে আরোহণ।

কালের পুস্তকে স্থায়িভাবে স্থান লাভ করিবে এই অভিপ্রায়ে আমার জীবনের কিয়দংশ ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করিতে সংকল্প করিয়াছি।

হিজিরা ১০১৪ অব্দে শেষার্দ্ধ জুমাদী মাসের অষ্টম দিবসে † বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে আগ্রা নগরে অষ্টাত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি সম্রাট্-গৌরব লাভ লাভ করিলাম এবং আমার ঈপ্সিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলাম। পৃথিবীর মায়ার স্রোতে যে আমি গা ঢালিয়া দিলাম, এ কথা শুনিয়া কেহ হাসিও না। যিনি মাথার বালিস বাতাসে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই সলোমন অপেক্ষা কি আমি শ্রেষ্ঠতর? যে মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসনে বসিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই সূর্য্য আকাশমার্গে উদিত হইল; ইহা জয়লাভের ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজত্বের একটি লক্ষণ বলিয়া আমার ধারণা হইল। সেইজন্যই আমি "জাহাঙ্গীর বাদসা" ও "জাহাঙ্গীর সা"—ভুবনবিজয়ী সম্রাট্, ভুবনবিজয়ী নৃপতি,—এই আখ্যা গ্রহণ করিলাম। আমার রাজ্যমধ্যে প্রচলিত হইবার অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইল, তাহাতে আমি নিম্নলিখিত কথাগুলি অঙ্কিত করিবার আদেশ দিলাম;—"পৃথিবীর রক্ষাকর্ত্তা খসরু দ্বারা আগ্রায় মুদ্রিত; সম্রাট্ আকবরের পুত্র, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ-জ্যোতিঃ জাহাঙ্গীর"।

এই উৎসব উপলক্ষে আমি যে সিংহাসন ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা আমার পিতা সূর্য্যের মেষ রাশিতে গমনকালে নববর্ষের উৎসবে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে নির্ম্মিত এবং অতিরিক্ত ব্যয়ে ভূষিত করাইয়াছিলেন। এই সিংহাসনখানি নির্ম্মাণ করিতে অন্যূন দশ কোটি আসরফি কেবল মণি মুক্তার জন্য ব্যয় করা হইয়াছিল; ইহা ব্যতীত হিন্দুস্থানী ওজনের ৩০* মণ স্বর্ণ ইহার কারুকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

---

* Autobiographical Memoirs of the Emperor Jahangir নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

† ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর। কেহ কেহ বলেন, সম্রাট্ আকবর এই বৎসরের জুমাদী মাসের শেষার্দ্ধের ১০ই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন; তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* প্রায় চারি টন্। (প্রত্যেক টনের ওজন ৭ মণ ৮ সের ১৪ ছটাক। সং।)

সিংহাসনখানি এরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল যে ,যেখানে সেখানে লইয়া যাইতে হইলে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারিত। . . হইলে আবার সেই খণ্ডগুলি একত্রিত করা হইত। ইহার পায়াতে এবং মূল অংশে ৫০ মণ এম্বরগ্রীশ (Amber gris *) স্থাপিত থাকিত; সুতরাং যেখানে যত বড় সভাই হউক না কেন, সেখানে আর অন্য সুগন্ধির প্রয়োজন হইত না।

আমার প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছিত সিংহাসনে বসিবার পরেই রাজমুকুট আনাইয়া সমবেত আমিরগণ সমক্ষে, আমার রাজত্ব কালের স্থায়িত্ব এবং সুখপ্রদানের শুভচিহ্নস্বরূপে, সেটি আমি এক ঘণ্টাকাল আমার মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিলাম। এই মুকুটখানি আমার পিতা পারস্য-সম্রাট্গণের মুকুটের অনুকরণে স্বীয় রাজত্বকালের উপসত্ব হইতে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই মুকুটের বারটি শিখর ছিল। প্রত্যেক শিখরের উপরে একটি করিয়া লক্ষ আসরফি মূল্যের হীরক খচিত ছিল। মুকুটের মধ্যস্থলের উপরে একটি লক্ষ আসরফি মূল্যের মুক্তা এবং অন্যান্য অংশে দুই শত চুণি বসান ছিল। প্রত্যেক চুণির মূল্য ছয় হাজার টাকা।

চল্লিশ দিন যাবৎ দিবারাত্র, আমি বিজয় ও আনন্দ ঘোষণাকল্পে বৃহৎ নাগরা বাজাইবার এবং সিংহাসনের চতুর্দ্দিকস্থ পঞ্চাশ জরিব পরিমিত স্থানের উপর বহুমূল্য কিংখাপ ও স্বর্ণসূত্র-খচিত গালিচা বিস্তৃত করিবার আদেশ দিলাম। প্রতি রাত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল; এবং তিন হস্ত দীর্ঘ তিন সহস্র কর্পূরমিশ্রিত মোমের বাতি, এম্বারগ্রীশ লেপিত স্বর্ণ ও রৌপ্য আধারে স্থাপিত হইয়া সমুদয় দৃশ্যটি আলোকিত করিতে লাগিল। মিসর দরবারের যুবক জোসেফের ন্যায় সুন্দর একদল যুবাপুরুষ, বহুমূল্য স্বর্ণখচিত কৌষের বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং হীরা, পান্না, নীলা ও চুণি খচিত কটি-বন্ধ ও বলয় ধারণ করিয়া আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় স্ব স্ব মর্য্যাদা অনুসারে সসম্ভ্রমে আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিল। এতদ্ব্যতীত পাঁচশত হইতে পাঁচহাজার অশ্বের অধিনায়ক নয়জন আমীর, আপাদমস্তক স্বর্ণ ও রত্ন মণ্ডিত হইয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে আমি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি জগজ্জনসমক্ষে এই সকল বিভব ও উৎসবের দৃশ্য উন্মুক্ত রাখিয়া সাম্রাজ্য-গৌরবের অতুলনীয় আদর্শ প্রদর্শন করিলাম।

জন্মবৃত্তান্ত।

২৮ বৎসর বয়সের মধ্যে আমার পিতার যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহই একমাসের অধিক কাল জীবিত ছিল না। এজন্য আমার পিতা সাতিশয় চিন্তিত ছিলেন। অভীষ্টসিদ্ধির আশায় তিনি সেই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট কাতর অন্তঃকরণে অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতা দরবেশগণের উপরে ভক্তিমান্ এবং তাঁহাদের প্রভাবে আস্থাবান্ ছিলেন। এইরূপ সময়ে একদিন আমার ম্রিয়মাণ পিতাকে জনৈক আমীর বলিলেন যে, আজমীর সহরে পূজ্য ময়নুদ্দীন তেহস্তীর কবরের সমীপে একজন অতি পূতচেতা সাধু বাস করেন। কেবল ভারতে নহে, তিনি সমস্ত জগতে অতুলনীয়। আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমার পিতা ব্যগ্রতার সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঈশ্বরের কৃপায় যদি আমি একটি দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করি, তাহা হইলে আগ্রা হইতে ১৪০

* সুগন্ধি নির্য্যাসবিশেষ—সং।

ক্রোশ দূরস্থিত আজমীর নগরে পদব্রজে গমন করিয়া সেই সাধুর সমাধি-স্থানে ভক্তি উপহার প্রদান করিব। পিতার এই প্রতিজ্ঞা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা-প্রসূত বলিয়াই আমার অব্যবহিত পূর্ব্বজাত শিশু ভ্রাতার মৃত্যুর ছয় মাস পরে, ৯৭৪ হিজিরা অব্দে রবিবিয়া মাসের প্রথমার্দ্ধের সপ্তদশ দিবসে * বুধবারে, তুলারাশির চতুর্ব্বিংশ ডিগ্রিতে সূর্য্যের অবস্থান কালে, দিবাভাগের সপ্তম "ঘড়ি" অতীত হইলে, ঈশ্বর এই নগণ্য কাহিনী-লেখককে জগতে প্রেরণ করিলেন।

আমার সত্যপালনতৎপর পিতা,—যিনি এক্ষণে স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন,—অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত আমীরের সহিত আগ্রা নগর হইতে বহির্গত হইয়া প্রতিদিন পাঁচ ক্রোশ হিসাবে পদব্রজে গমন করিলেন। অতঃপর আজমীর সহরে ময়নুদ্দীনের সমাধি-স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে উপাসনাদি সমাপন করিলেন। যে সাধু পুরুষের ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভাবে তাঁহার কামনার বস্তু পাইয়াছিলেন, অনন্তর তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। সেই সাধু পুরুষের নাম সেখ সেলিম। সাধুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া পিতা আমাকে স্বীয় বাহুযুগলে স্থাপিত করিলেন এবং তাঁহাকে আমার মঙ্গলার্থে ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহা ব্যতীত, ঈশ্বর পিতাকে অন্য সন্তান লাভরূপ সৌভাগ্য দিবেন কিনা, এ কথা তিনি সেই সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্রাট্‌কে অতিথিস্বরূপে পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সাধু পিতাকে বলিলেন যে, ঈশ্বর তোমাকে তিনটি পুত্র দান করিবেন। পিতা বলিলেন,—"ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে আমি আপনার বক্ষে নিক্ষেপ করিলাম সাধু উত্তর করিলেন—"উহার মঙ্গল উহাকে তুমি যখন আমার হস্তে করিলে, তখন আমি উহার নাম রাখিলাম মহম্মদ সেলিম।" সাধুর সস্নেহ ব্যবহারকে তাঁহার আশার অনুকূল লক্ষণ মনে করিয়া পিতা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদবধি ১৪ বৎসর যাবৎ পিতা সেই সাধু পুরুষের সহিত সাতিশয় ঘনিষ্ঠতা রাখিয়াছিলেন।

(এই খানে মূল গ্রন্থের কিয়দংশ পাওয়া যায় না বলিয়া বোধ হয়। কারণ, এইখানে জাহাঙ্গীর হঠাৎ সিক্রী গ্রামের কথা পাড়িয়াছেন। জাহাঙ্গীর বলেন যে, গুজরাট্‌ জয়ের স্মরণচিহ্নস্বরূপে আকবর এই গ্রামকে ফতেপুর নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন)।

পিতার মুখে কিন্তু আমি কখন "মহম্মদ সেলিম" এই আখ্যা শ্রবণ করি নাই। তিনি সকল সময়েই আমাকে "বাবা" এই স্নেহসূচক নামে ডাকিতেন। হয়ত, "সুলতান সেলিম" এই আখ্যায় আমি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম। কিন্তু রুম রাজ্যের (টর্কির) অধিপতিগণের সমকক্ষ হইবার ইচ্ছায় এবং দিগ্বিজয় করা সম্রাট্‌গণের গৌরবের কার্য্য এইটি মনে করিয়া, আমার চরিত্রের অনুরূপ "জাহাঙ্গীর পাদসা' এই আখ্যা আমি সিংহাসন অধিরোহণকালে ধারণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলাম। আমি আশা করি যে, ঈশ্বরের অসীম কৃপায়, অনুকূল গ্রহের প্রভাবে, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, আমি এই আখ্যার উপযুক্ত হইতে সমর্থ হইবে।

বিচার-শৃঙ্খল।

সিংহাসন আরোহণের পরে আমি নিম্নলিখিত বিধির প্রচলনে আজ্ঞা দিলাম।

* ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট; তাহা হইলে সিংহাসন অধিরোহণ কালে জাহাঙ্গীরের বয়স ৩৬ বৎসরের অধিক হয় নাই।

এইটি আমার সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত বিধি। আমি একটি স্বর্ণ-শৃঙ্খল নির্ম্মিত করাইলাম। টি ১৪০ গজ দীর্ঘ। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে আশীটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা সংলগ্ন ছিল। শৃঙ্খলটির ওজন ৬০ হিন্দুস্থানী মণ।* এই শৃঙ্খলের এক অংশ আগ্রা দুর্গের বহির্দ্দেশস্থ প্রাচীরে, এবং অপর অংশটী যমুনা নদীর গর্ভের সন্নিকটে স্থাপিত একটি প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভে সংলগ্ন করা হইল। উদ্দেশ্য এই যে, আমার নিযুক্ত বিচারকগণের কার্য্যে ত্রুটি ঘটিলে, অন্যায়রূপে বিচারিত ব্যক্তিগণ এই শৃঙ্খলে হস্তার্পণ করিবে এবং অতি শীঘ্রই সুবিচার লাভে সমর্থ হইবে।

দ্বাদশ বিশেষ বিধি।

আমার নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের অবশ্য প্রতিপালনীয় নিম্নলিখিত দ্বাদশটি বিশেষ বিধি আমি প্রবর্ত্তিত করিলাম।

১। জেথাওত্, শেরমোহরী ও তুমঘা, —এই তিন প্রকার রাজস্ব আমি একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। এই সকল আয় হইতে আমার পিতা সর্ব্বশুদ্ধ ১৬০০ হিন্দুস্থানী মণ ওজনের স্বর্ণের মূল্য প্রাপ্ত হইতেন।

২। ঈশ্বরসৃষ্ট মনুষ্যের যে সকল সম্পত্তি আমার জিম্মায় আছে, সেই সম্পত্তি যদি রাহাজান কর্ত্তৃক বা অপর কোন প্রকার বল প্রয়োগে অপহৃত হয়, তাহা হইলে যে জেলায় এই ঘটনা ঘটিবে, সেই জেলানিবাসী ব্যক্তিরা অপহৃত সম্পত্তি বা অপহারককে হাজির করিবে, কারণ সেই সকল ব্যক্তিরাই অপহরণবৃত্তান্ত সম্যক্‌ভাবে অবগত থাকিতে পারে। যে জেলা পতিত বা জনশূন্য, সেখানে সহর নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং লোক স্থাপন করিয়া তাহাদের সংখ্যার হিসাব রাখিতে হইবে। মোট কথা, এমন কার্য্য করিতে হইবে, যাহাতে প্রজাগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ঐরূপ জন-শূন্য স্থানে জায়গীরদারগণ মসজিদ ও পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সেই সকল স্থান আবার প্রজাপূর্ণ হয়, এবং সেই স্থান দিয়া পান্থগণ নিরাপদে যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়। যে সকল জেলা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্রাটের অধীন, সেখানকার ক্রোরী * সরকারী তহবিল হইতে উক্ত কার্য্যসকল সম্পন্ন করিবে।

৩। ভ্রমণকারী সওদাগরদিগের গাঁটরী বা মালের বস্তা তাহাদের অসম্মতিতে খোলা হইবে না। যদি তাহারা স্বেচ্ছায় কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে ক্রেতৃগণ অবাধে তাহাদের সহিত দর দস্তর করিতে পারিবে।

৪। বেসরকারী কোন লোক সন্তান রাখিয়া মৃত হইলে, কেহই তাঁহার সম্পত্তির সামান্য অংশেও হস্তক্ষেপ করিতে কিংবা তাহার সন্তানগণের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। যদি কেহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত হয়, এবং সাক্ষাৎভাবে বা অবিসংবাদিতভাবে তাহার কোন উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে তাহার আত্মার মঙ্গলার্থে তাহার সম্পত্তি হইতে মসজিদ ও তালাব নির্ম্মিত হইবে।

৫। কেহই মদ বা মত্ততাজনক অন্য কোন প্রকার পানীয় প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। সকলেই জানেন যে ১৬ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া আমি প্রভূতপরিমাণে মদ্য পান করিয়া আসিতেছি, এবং এখনও মদ্যে আমার বিলক্ষণ স্পৃহা রহিয়াছে; তথাচ আমি এই বিধিটির অনুষ্ঠান

* প্রতি মণ ২৮ পাউণ্ডের হিসাবে, প্রায় ১৮ hundred-weight.

* এক ক্রোর 'দাম' রাজস্বরূপে আদায় করিবার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। এই পদটি আকবর সৃষ্টি করেন। ৪০টা 'দাম'এর মূল্য এক টাকা।

করিলাম। সমবয়স্ক ও অভিন্ন-হৃদয় সহচরগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া, সুখপ্রদ দেশের বায়ু সেবন করিয়া, প্রস্তর মূর্ত্তি ও চিত্রাদি ভূষিত, স্বর্ণখচিত বহুমূল্য কৌষেয় আসনমণ্ডিত, সু-উচ্চ ও সুসজ্জিত বিলাস-গৃহে বিচরণ বা অবস্থান করিয়া, কে এমন বাতুল আছে যে, একটু উত্তেজক পানীয়ের সাহায্য লইতে ইচ্ছা করে না? আর দ্রাক্ষা রস অপেক্ষা কোন্ পানীয় শ্রেষ্ঠতর? কিন্তু এরূপও ত হইতে পারে যে, অহিফেন বা উত্তেজক অন্য কোন দ্রব্য সেবন লোকের প্রকৃতি-গত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর করুন, যেন উহা সেবনে মনুষ্যের সৎপ্রবৃত্তির লোপ না হয়। উহার হিতকারিতা স্বীকৃত হইলেও অতিরিক্ত ব্যবহারে, মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটে, এবং মনোমধ্যে নানাবিধ বৃথা ইচ্ছার উদয় হয়। উত্তেজক পদার্থের এই-গুলি প্রধান দোষ।

আমার নিজের কথা বলিতেছি। আমি এক সময়ে এত অতিরিক্তভাবে মদ্যপান করিতাম যে, আমার দৈনিক পানের পরিমাণ ২০ পাত্র, কখন কখন বা ২০ পাত্রের অধিক হইত। প্রত্যেক পাত্রে আধ সের মদ্য হিসাবে আটটি পাত্রের পরিমাণ ইরাকী মণের এক মণ। আমার এই অনিষ্টকর প্রবৃত্তি এত দূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, একঘণ্টা কাল যদি আমি মদ্যপান না করিতাম, তাহা হইলে আমার হাত কাঁপিত এবং আমি শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতাম না। এই সকল লক্ষণে আমি বেশ বুঝিলাম যে, এই অভ্যাস যদি এই হিসাবে বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। এই অভ্যাস যাহাতে কমিয়া যায়, তাহার উপায় স্থির করিলাম। ছয় মাসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে আমার পানের পরিমাণ ২০ পাত্র হইতে ৫ পাত্রে পরিণত হইল। তবে বিশেষ আমোদ-উৎসব-উপলক্ষে দুই এক পাত্র অধিক পান করিতাম। অনেক দিবাবসানের দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত করিব না, এইরূপ নিয়ম করিলাম। এক্ষণে রাজ্যভার গ্রহণ করায়, আমি আর সান্ধ্য উপাসনার পূর্ব্বে পান আরম্ভই করি না; আর পাঁচ পাত্রের অধিক পান করি না। ইহার অধিক পান আমার এখন সহ্যও হয় না। দিবারাত্রের মধ্যে একবারমাত্র আমি রীতি-মত আহার করিয়া থাকি; দিবারাত্রের মধ্যে একবারমাত্র পান করাও আমি যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। জীবনধারণের জন্য আহার যেমন প্রয়োজনীয়, পানও তেমনই প্রয়োজনীয়; সেই জন্য অসম্ভব না হইলেও পানাভ্যাস পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বর করুন, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক। আমার পিতামহ হুমাউনের ন্যায়—যিনি ৪৫ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্বে এই অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন—আমি কোন না কোন সময়ে এই অভ্যাস ত্যাগের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সমর্থ হইব। "ঈশ্বর যে কার্য্যে বিরক্ত, সে কার্য্য হইতে বিরত হইবার সামান্য চেষ্টা করিয়াও মানব প্রভূতপরিমাণে নিজের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া লইতে পারে।"

৬। আমার রাজ্যের কোন প্রজার গৃহে অপর ব্যক্তি বলপূর্ব্বক বাস করিতে পারিবে না। রাজসৈন্যের মধ্যে যদি কেহ কোন সহরে উপস্থিত হইয়া গৃহস্বামীর সম্মতি লইয়া ও তাহাকে ভাড়া দিয়া তাহার গৃহ অধিকার করে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু গৃহস্বামী সম্মত না হইলে সেনাগণ অনাবৃত স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া তাহাতে বাস করিবার ব্যবস্থা করিবে

একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অপরের গৃহে প্রবেশ করিল, সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট অংশটি অধিকার করিল, আর গণের হস্ত প্রসারণ করিবারও স্থান রহিল না,—ইহা অপেক্ষা প্রজার আর কি গুরুতর অভিযোগ হইতে পারে ?

৭। যে কোন অপরাধ হউক না কেন, তাহার জন্য অপরাধীর নাসিকা বা কর্ণচ্ছেদ করা হইবে না। চৌর্য্য অপরাধে, অপরাধীকে কণ্টকযুক্ত বেত্রাঘাত করা হইবে; কিংবা কোরাণের শপথ করাইয়া ভবিষ্যতে অপরাধ করিতে নিবৃত্ত করা হইবে।*

৮। ক্রোরী ও জায়গীরদারগণ বলপূর্ব্বক প্রজাগণের জমি নিজাধিকারে আনিতে পারিবে না, কিংবা তাহাতে নিজের পক্ষে চাষ করিতে পারিবে না। তাহারা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট অধিকারের বহির্ভূত অন্যের অধিকারে প্রভুত্ব করিতে পারিবে না, বা সেখানকার মনুষ্য বা পশু বলপূর্ব্বক আপন অধিকারে আনিতে পারিবে না। যে এলাকার ভার যাহার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই এলাকার উন্নতিকল্পেই সে ব্যক্তি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিবে।

৯। (এই অংশের মূলটি একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। ইহাতে বিষম দ্রব্যাদি সেবন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে নিয়মাবলি প্রকটিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমিত হয়)।

১০। প্রধান প্রধান নগরের শাসনকর্ত্তৃগণ স্বীয় স্বীয় অধিকার মধ্যে চিকিৎসালয় স্থাপন করিবে, এবং তাহার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিবে। সেই সকল স্থানে রোগীরা আনীত হইয়া সরকারী ব্যয়ে চিকিৎসিত হইবে। আরোগ্য লাভের পরে, রোগিগণকে প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য করিয়া বিদায় দিতে হইবে।

১১। যে মাসে আমি জন্মগ্রহণ করি, অর্থাৎ রবিয়া মাসের প্রথমার্দ্ধে, কি সহরে কি পল্লিগ্রামে, সকল স্থানেই মাংসাহার নিষিদ্ধ করিলাম; এবং বৎসর মধ্যে সমব্যবহিত দিনে পশু হত্যাও বন্ধ করা হইল। প্রতি বৃহস্পতিবার, (ঐ বার আমার জন্ম-বার বলিয়া) এবং প্রতি রবিবারও আমি মাংসাহার রহিত করিলাম। রবিবার সৃষ্টিকার্য্য সম্পূর্ণ হয়, সে কারণে এই দিনে প্রাণিহত্যা অতীব গর্হিত কার্য্য। আমি রাজ্যের মধ্যে এই দিনে মাংসাহার নিষিদ্ধ করিলাম। ১১ বৎসর ধরিয়া পিতাও কিছুতেই এই দিনে মাংস খাইতেন না।

১২। পিতার রাজত্বকালে যাঁহারা যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা যে মর্য্যাদার অধিকারী ছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে সেইরূপই রাখিলাম। অধিকন্তু, যাঁহাদের গুণের সম্যক্ পরিচয় পাইলাম, তাঁহাদের পদবৃদ্ধিও করিয়া দিলাম; যেমন ১০ অশ্বের অধিনায়ককে ১৫ অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। এইরূপ অনুপাতে সকলকে উচ্চ উচ্চ পদমর্য্যাদা দান করিলাম।

কৃতজ্ঞতা।

যে সকল অযোগ্য কর্ম্মচারী আমার বদান্যতার উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাহাদের বিচারের ভার আমি ঈশ্বরের উপর দিলাম। মনুষ্যস্বভাবের এইরূপ বক্রতা দৃষ্ট হয় যে, উহাদের ভিতর এমন লোক আছে, যাহারা সাতিশয় অনিচ্ছার সহিত আমাকে সম্মান প্রদর্শন করে ও আমার বশ্যতা স্বীকার করে।* এই শ্রেণীর

* মূল গ্রন্থের লিপিকারের অসাবধানতা হেতু এই স্থলে এবং অপরাপর স্থলে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

* এই কথাগুলি জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরুর অনুচরগণকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে।

লোকের সহিত কিছুতেই মিল হইতে পারে না। ইহারা কেবল রাজ্যের মধ্যে ভেদভাব ও বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া আপন আপন স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর লোককে যে ঝড়ে প্রথমেই উড়াইয়া দিবে, এ কথা তাহারা ভুলিয়া যায়।

স্বর্গীয় পারস্যের সাহ তামাস্প (Tahmasp) যে সমীচীন কথাটি বলিয়াছিলেন, এইখানে সেইটীর উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা প্রাসাদের সন্নিকটে একটি জলাশয় খনন করাইয়া সাহ অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দ্রব্য দিয়া ইহা পূর্ণ করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম?" একজন বলিলেন—"স্বর্ণ।" সাহ উত্তর করিলেন, "তুমি উত্তম বলিয়াছ, কারণ ধন লোভই তোমার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি"। আর একজন বলিলেন —"বরফের টুক্‌রা মিশ্রিত সরবৎ, চিনি, ও গোলাপ জল।" সাহ বলিলেন—"বোধ হইতেছে তুমি আফিম-খোর; তাই তোমার অভিলষিত দ্রব্যের সুন্দর নির্দ্দেশ করিয়াছ।" এইরূপে অপর সকলে নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে দ্রব্যের নাম করিল। অতঃপর সাহ বলিলেন, "তোমাদের একজনেরও মতের সহিত আমার মতের ঐক্য হইতেছে না; আমার মতে যাহারা অসন্তুষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল এবং বিদ্রোহের সহকারী, তাহাদের রক্তই এই জলাশয় পূর্ণ করিবার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্য।" সাহ প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন, কারণ আমার পিতার মৃত্যুর পরে আমি দেখিতেছি যে, প্রকৃত বিশ্বাসী ও রাজভক্তের সংখ্যা সাতিশয় অল্প। যদি সেরূপ লোক পাওয়া যায়, তাহা তাহাদের সংখ্যা লক্ষের মধ্যে একজনের অধিক হইবে না।

আমি যখন যুবরাজ ছিলাম, তখন সাহ আব্বাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটি শুনিয়াছিলাম। ফরহাদ খাঁ নামক অন্যতম মন্ত্রীকে তিনি এত প্রগাঢ়রূপে স্নেহ করিতেন যে, এক সময়ে ফরহাদ খাঁ অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলে সাহ প্রতিদিন প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া আপনার জিহ্বা দ্বারা তাহার ক্ষতস্থান লেহন করিতেন। সাহ পরিশেষে এমন স্নেহভাজন মন্ত্রীর মস্তক দেহচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সাহের এ কার্য্য করিবার যে যথেষ্ট কারণ ছিল, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ আমি অনেক দিন যাবৎ দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, বিশ্বাসঘাতককে দণ্ড দিতে বিরত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য আর হইতে পারে না। পক্ষান্তরে পরীক্ষিত বিশ্বাসী ভৃত্যের বহুলভাবে সম্মান ও পদবৃদ্ধি করা অতীব কর্ত্তব্য। সে যাহা হউক, এই কথা পুনঃপুনঃ বলা যাইতে পারে যে, যে নরাধম কার্য্যকালে উপস্থিত হইবামাত্র বেতনবৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হয়, তাহার আর পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে রাজদ্রোহী স্বেচ্ছাচারী ভিন্ন আর কোন সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে না।

ক্রমশঃ।

বারুণী।

দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সুশীলা তখন ষোড়শী। সুশীলার স্বামী পুণ্ডরীকাক্ষ তখন নবীন যুবা;—তখনও তাহার স্ফুটনোন্মুখ পুণ্ডরীকের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, শ্মশ্রু-ভ্রমরসকল সম্যক্ সমাগত হয় নাই। যুবক যুবতী তখন পুষ্পধন্বার শরাসন হইতে প্রক্ষিপ্ত আকুল পুষ্পসমাকীর্ণ এক স্বপ্নময় প্রেমরাজ্য রচনা করিয়া অতি সুখে সুখের দিনগুলি অতিবাহিত করিত। পুণ্ডরীকের মাতাপিতা বর্ত্তমান ছিলেন; তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন-চিন্তা পুণ্ডরীকের অবিচ্ছিন্ন প্রেম-স্বপ্ন তখন কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইত না। কুলদেবতাদিগের পাদপদ্মে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বহু বিনীত প্রার্থনাতেও সুশীলা তখনও পুত্রবতী হইতে পারে নাই; তখনও তাহার অবাধ স্বামিপ্রেম একটি নবাগত অবোধের ক্রন্দনের দ্বারা অনুশাসিত হয় নাই।

বি, এ, পরীক্ষার পর শ্রীমান্ পুণ্ডরীকাক্ষ রায় কলিকাতা হইতে তাহাদিগের পল্লি-গ্রামের বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াছিল। সম্মুখে সুদীর্ঘ অবকাশ। এই সুদীর্ঘ অবকাশ, কেবলমাত্র প্রণয়িনীর বিরহ-ব্যথার প্রেমানুলেপনে অতিবাহিত করা সহজ নহে। প্রেমতন্দ্রাবিজড়িত সুদীর্ঘ দিনগুলি, অতি সন্তর্পণে, অতি মন্থরগমনে অতিবাহিত হইতেছিল। পুণ্ডরীকের নবীন প্রাণ এ জড়তা হইতে মুক্তিলাভের জন্য কাতর হইয়া পড়িল। সে একটা নূতন উদ্দীপনাপূর্ণ আনন্দের অন্বেষণ করিল। অর্গল-বদ্ধ গৃহে, পত্নী-প্রেমের মধুরতা সে আকণ্ঠ পান করিয়াছিল; কিন্তু বাহিরে,—উদার অনন্ত আকাশের নিম্নে, সঙ্কোচশূন্য পত্নীপ্রেমের মধুরতা যে কত মধুর, তাহা আস্বাদন করিবার অবসর এ পর্য্যন্ত পুণ্ডরীকের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইতি-পূর্ব্বে সে কতবার মনে করিয়াছিল যে, পত্নীকে সঙ্গে লইয়া সে কোন দূর দেশ পরিভ্রমণ করে। কিন্তু বালক কখনই পিতামাতার নিকট এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। কাজেই এতদিন নিভৃত গৃহ-কোণে যে মধুরতাটুকু লাভ করিতে পারিত, তাহাই সে আনন্দিতমনে উপভোগ করিত। এক্ষণে তাহার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাটি আবার সজীব হইয়া উঠিল। তাহার বার বার মনে হইল, কোনও দূর দেশে পত্নীকে লইয়া পরিভ্রমণ করিলে, তাহাকে পার্শ্বে রাখিয়া অবলোকন করিলে, বুঝি বা প্রকৃতির রুচির ছবি আরও কত মধুর হইয়া উঠিবে!

এক দিন নিশা শেষে, সুশীলার সম্প্র-সারিত বাহুর মধ্যে স্থানলাভ করিয়া, পুণ্ডরীক অতি প্রেম-গদগদ-কণ্ঠে ডাকিল, "সুশীলা!" সুশীলা কহিল "কেন?"

পুণ্ডরীক। এক জায়গায় যাইবে?

সুশীলা। কোথায়? তুমি কতবার বলিয়াছ আমাকে এক জায়গায় লইয়া যাইবে। কিন্তু তুমিত কখন কোন স্থানে লইয়া যাও নাই। আমাকে ভুলাইবার জন্য তুমি কেবল মিথ্যা কথা বল।

পুণ্ডরীক। এবার সত্যই যাইব।

সুশীলা। বল, কোথায় যাইবে?

পুণ্ডরীক। গঙ্গাসাগরে। এবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বারুণী-স্নানের দিন তোমাকে 'গঙ্গাসাগরে' স্নান করাইব। তুমি 'গঙ্গা-সাগর' স্নানের মন্ত্র জান?

সুশীলা। তা'ত জানি না। কি মন্ত্র? তুমি জান? আমাকে শিখাইয়া দাও।

সুশীলা তাহার অতিপ্রিয় প্রিয়তমের সহিত সাগরে যাইবে। ষ্টীমার চড়িবে। ষ্টীমারে চড়িয়া কত দেশ বিদেশ দেখিবে। সাগর স্নান করিয়া কত কোটীকল্প পুণ্য সঞ্চয় করিবে, কত কোটীকুল উদ্ধার করিবে। তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। উৎসাহ বেগে স্বামীর আলিঙ্গনমুক্তা হইয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। আপন কুসুমসন্নিভ রক্ত করতল স্বামীর বক্ষে স্থাপন করিয়া, আগ্রহভরে কহিল, "বল, কি মন্ত্র?"

পুণ্ডরীক। না, না; আমি মন্ত্র জানি না। তুমি উঠিও না; এখনও প্রভাত হয় নাই।

সুশীলা। না, তুমি জান। তুমি আগে বল, আমাকে শিখাইয়া দিবে?

পুণ্ডরীক। আচ্ছা, সে মন্ত্র আমি তোমাকে শিখাইয়া দিব। ইহার পর লিখিয়া দিব, তুমি মুখস্থ করিয়া লইও।

সাগরস্নানের মন্ত্র যে সে শিক্ষা করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সুশীলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল বটে, কিন্তু তাহার মনে আবার একটা দুশ্চিন্তা প্রবেশলাভ করিল। সে মন্ত্র শিক্ষা করিবে, কিন্তু যদি তাহাদের সাগরে—কি জানি, যদি দৈবাধীন তাহাদের সাগরে মোটে না যাওয়া হয়! সে সংশয় প্রকম্পিতচিত্তে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা যদি আমাদের যাওয়া না হয়?"

পুণ্ডরীক। কেন হইবে না?

সুশীলা। আমি যদির কথা বলিতেছি। যদি না যাওয়া হয়?

পুণ্ডরীক। ইহার মধ্যে কিছু যদি নাই, সকলিই নিশ্চয়।

সুশীলা। মা বাবা যদি আমাদের যাইতে না দেন?

পুণ্ডরীক। কেন দিবেন না? যদি কেবলমাত্র আমরা যাইতাম, তাহা হইলে হয় ত তাঁহারা নিষেধ করিতেন। আমি মাকেও লইয়া যাইব।

সুশীলা। তুমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

পুণ্ডরীক। এখনও করি নাই। আজ আহারের সময় সমস্ত ঠিক করিব।

সুশীল। মা যদি না যা'ন।

পুণ্ডরীক। সে ভার আমার। শোন, আমি এক কৌশল করিব। আমি মাকে বলিব, "চল, আগামী বারুণীতে তোমাকে গঙ্গাসাগরে স্নান করাইয়া আনি।' একে গঙ্গাস্নান, তাহাতে বারুণীতে বিদেশে, গঙ্গাসাগরে গঙ্গাস্নান,—মেয়ে-মানুষ মা আমার, আমার এ প্রস্তাবে নিশ্চিত স্বীকৃত হইবেন এবং বাবাকে বলিয়া সাগর-যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করিবেন। যখন সমস্ত ঠিক হইবে, তখন তুমি মাকে ধরিয়া বসিবে, বলিবে 'মা আমিও তোমার সহিত সাগরে যাইব। কিছুতেই ছাড়িব না।' বুঝিলে? একটু বিশেষ জেদ করিয়া বলিতে হইবে।

সুশীলা। তা, আমি খুব জেদ করিয়া বলিতে পারিব।

পুণ্ডরীক। তখন আমিও বলিব 'তা মা একজন আপনার লোক সঙ্গে থাকা ভাল; তোমার একলা কষ্ট হইবে; এ ছাড়া বিদেশে কত বিপদ্ আপদ্ আছে।' ইহাতে মা নিশ্চয়ই তোমাকে সঙ্গে লইবার মত করিবেন; আর মার মত হইলেই বাবার অমত হইবে না।

সুশীলা। না, বাবার অমত হ'বে না।

পুণ্ডরীক। তখন তোমার সহজেই যাওয়া হইবে। তোমাকে লইয়া সাগরে বেড়াইতে যাইব এ কথা মা বাবার কাছে

বলিতে আবার আমার যে লজ্জা হইত, এই পলে সহজে তাহা হইতে রক্ষা পাইব। বল ?

আর কি বলিবে ? সে মনে মনে তাহার স্বামীর সুগভীর বুদ্ধির অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছিল। সহজে সাগরযাত্রা সমাধা করিবার জন্য নবীন দম্পতির কি চূড়ান্ত চক্রান্ত! হায়! সংসারানভিজ্ঞ সরল তা'রা; তা'রা তখন বুঝিতে পারে নাই যে, আমরা মানুষ, আমরা এই বিশ্ব-রঙ্গশালার নিতান্ত শক্তিহীন পুতুলমাত্র। আমরা কিছু করি না; কিছু করিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। আমাদের সমস্ত চক্রান্তগুলি এক অদৃশ্য পুরুষের চিরঘূর্ণ্যমান চক্রমাত্র। চিরদিন আমাদের চক্রান্তের ভিতর দিয়া তিনি আপনার দেবকার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। চিরদিন আমরা ব্যর্থবুদ্ধি লইয়া, এই অদৃশ্যকে দৃশ্যমান্ দেখিবার জন্য অবাক্ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছি। পুণ্ডরীক বুঝে নাই, সরলা সুশীলা বুঝে নাই যে, সেই দিন প্রভাতে তাহারা সাগরযাত্রার জন্য যে কৌশলের পথ অবলম্বন করিয়াছিল, দশ বৎসর পরে, তাহা তাহাদিগকে কোন জ্বালাময় শ্মশানে লইয়া যাইবে। কি অশুভক্ষণে পুণ্ডরীক ও সুশীলা সাগরযাত্রার কল্পনা করিয়াছিল! এ 'সাগর'-উত্থিত হলাহলে তাহাদের আনন্দপূর্ণ জীবনকে বিষময় করিয়া দিবে!

২

পরদিন দ্বিপ্রহরে, সুশীলা যখন আপন শয়নগৃহের নিভৃতে বসিয়া, স্বামীর লিখিত এক ক্ষুদ্র লেখন হস্তে লইয়া, অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে আবৃত্তি করিতেছিল;—

'ত্বং দেব সরিতাং নাথ
ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা
মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ ॥'—

তাহার সুবুদ্ধি স্বামীটি তখন মাতার সুগভীর স্নেহসাগরে আপন কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছিল। বিবিধ ব্যঞ্জনপরিবেষ্টিত অন্নপাত্র পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া মাতা আহারে চির-অপটু পুত্রকে এই ব্যঞ্জনটা বা ঐ অতিসামান্য মৎস্যমুণ্ডটুকু খাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন। অবসর বুঝিয়া পুণ্ডরীক জাল বিস্তার করিল, কহিল, "মা, তুমি কখন ষ্টীমারে চড়িয়াছ ?"

মাতা। যে ষ্টীমার গঙ্গা দিয়া যায়, সেই ষ্টীমারের কথা বলিতেছ ?

পুণ্ডরীক। হাঁ, মা।

মাতা। ষ্টীমারে লোকে কিরূপে চড়ে, পুণ্ডরীক ?

পুণ্ডরীক। তুমি মা কখনও ষ্টীমারে চড় নাই ? চড়্‌বে ? আমি নিয়ে যেতে পারি।

মাতা। কোথায় নিয়ে যা'বে ?

পুণ্ডরীক। তুমি যদি বল, তোমাকে আমি গঙ্গাসাগরে নিয়ে যেতে পারি।

মাতা। আমার কপালে কি বিধাতা এমন পুণ্য লিখিয়াছেন যে, তুমি আমাকে গঙ্গাসাগরে স্নান করাইয়া আনিবে ?

পুণ্ডরীক। কেন আনিব না ? আগামী ১৪ই চৈত্র মঙ্গলবার বারুণী। বারুণীর দিন তোমাকে গঙ্গাসাগরে স্নান করাইব; দেখ, মা, সে দিন পুরোহিত মহাশয় বলিতেছিলেন যে, বারুণীতে সাগরে স্নান করিতে পারিলে দশ কোটী কুল উদ্ধার হয়। আমি কিন্তু মা এ সকল কথা বিশ্বাস করি না।

মাতা। তোমরা ইংরাজি পড়িয়া নাস্তিক হইয়াছ। তোমরা কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম বিশ্বাস কর। তুমি দশ কোটী কুলের

কথা কি বলিতেছ, গঙ্গাসাগরের জল স্পর্শ করিলেই চৌদ্দ কোটী কুল উদ্ধার হয় তা, তুমি যদি সত্যি আমাকে নিয়ে যেতে পার, তাহা হইলে আমার জীবনের বাসনা পূর্ণ হয়।

পুণ্ডরীক। মা, আমি কি তোমার তেমনই মিথ্যাবাদী ছেলে; আমি সত্যি তোমাকে লইয়া যাইব, তুমি বাবাকে বলিয়া সমস্ত উদ্যোগ কর। পরশু বেশ ভাল দিন আছে; আমরা পরশুই রওনা হইব।

মাতা। কোথা দিয়া যাইবে?

পুণ্ডরীক। এখান হইতে ষ্টীমার চড়িয়া কলিকাতায় যাইব। কলিকাতায় একদিন থাকিয়া, বড় ষ্টীমারে চড়িয়া পরদিন সকালে সাগরে রওনা হইব। সাগরে সাত দিন থাকিব; মেলা দেখিব; তোমাকে "সাগরী" কিনিয়া দিব। তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া দশ দিন থাকিব। তোমাকে মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী এবং কালীঘাটের কালী সব দেখাইব। চৈত্র-সংক্রান্তিতে নকুলেশ্বর শিবের মাথায় দুধ-গঙ্গাজল ঢালিও। কালীঘাটে ভাল ভাল পাথরের থালা-বাটী কিনিতে পাওয়া যায়, কিনিও। তাহার পর বৈশাখ মাসের প্রথমে আমরা বাড়ি ফিরিয়া আসিব।

মাতা। বাঁচিয়া থাক। তোমার এক শত আশী বৎসর পরমায়ু হউক। কর্ত্তার শরীর যেরূপ খারাপ, তাহাতে যে কখনও তীর্থধর্ম্ম করিতে পারিব, এরূপ ভরসা ছিল না। কত পুণ্যের ফলে, তোমাকে বংশের তিলক পুত্র পাইয়াছিলাম। আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে চলিল।

বংশের তিলক, পুণ্যের ফল, পত্নীর নিকট আপন বিজয়-বারতা ঘোষণা করিবার জন্য, দ্রুত আহার সমাধা করিয়া ধাবিত হইল। মাতা গৃহকর্ত্তার অনুসন্ধানে ফিরিলেন। এবং অনুসন্ধান লাভ করিয়া অনুনাসিক শব্দ যোজনার দ্বারা, পুত্রসহ সাগরযাত্রায় অতি সহজ সম্মতি হইলেন। পরিধেয় বস্ত্রসকল, এবং আবশ্যক দ্রব্যসমূহ পেটক মধ্যে সংগৃহীত হইল। যে সকল দাস দাসী সঙ্গে যাইবে, তাহারাও প্রস্তুত হইল। প্রতিবাসিনী গৃহিণীসকল দলে দলে পুণ্ডরীকের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিল। শত মুখে সুবর্ণের চন্দ্র পুণ্ডরীককে এক শত আশী বর্ষ জীবিত থাকিবার জন্য আদেশ প্রচারিত করিল। তাহার পর যাত্রার দিন প্রভাত হইল। পুণ্ডরীকের মাতা বধূর চিবুক ধরিয়া কহিলেন;—"লক্ষ্মী মা আমার; তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। যদি হরি কৃপা করেন, তোমাদের রাখিয়া যদি মা গঙ্গাসাগরে মরিয়া যাই, তুমি আমার মত ঘর সংসার করিও। এই নাও, আমার চাবির থোলো তুমি রাখিয়া দাও।"

সুশীলা চাবির থোলো গ্রহণ না করিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদতল অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া এবং তাহা সবলে করতলে গ্রহণ করিয়া কহিল, "না মা, আমি কোন মতেই বাটীতে থাকিব না। আমিও তোমার সহিত যাইব; একলা এখানে থাকিতে পারিব না।

মাতা। তুমি মা ছেলে-মানুষ, তুমি বাঁচিয়া থাক। আমার পুণ্ডরীক বাঁচিয়া থাক্. তুমি কতবার সাগরে যাইবে।

সুশীলা। না মা আমি তোমার সহিত যাইব। তুমি বল যে লইয়া যাইবে, তাহা না হইলে, আমি তোমার পা কিছুতেই ছাড়িব না।

বধূকে বিরত করিতে অক্ষমা হইয়া, মাতা পুণ্ডরীককে আহ্বান করিলেন। পুণ্ডরীক আসিয়া কহিল, "তা যদি ও একান্ত যাইতে চায়, চলুক; বিদেশে তোমার একলা

অসুবিধা হইতে পারে, একজন আপনার লোক কাছে থাকা ভাল।" শুনিয়া, গৃহিণী লেন। বস্ত্রাদি সত্বর গুছাইয়া লইবার বধূকে আজ্ঞা দিলেন। গৃহিণীত জানিতেন না যে, বধূ যে কেবলমাত্র পূর্ব্ব হইতে আপনার বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিয়াছিল তাহা নহে, সে সাগরস্নানের মন্ত্রটি কণ্ঠ করিয়াছিল, অপিচ বারুণীস্নানের উপকরণ, সদ্য-আহৃত কাঁচা আম্র,—আপন সজল জিহ্বাকে বঞ্চিত করিয়া পেটক-মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। কার্য্য উদ্ধার করিয়া পুণ্ডরীক আপন হাস্য-প্রফুল্ল দৃষ্টি পত্নীর নির্ম্মল নয়নে নিক্ষেপ করিয়া, তাহাতেও হাস্যতরঙ্গ সৃষ্টি করিল।

বেলা দশটার পর, আহারাদি সমাপন করিয়া, ললাটতলে দধির মঙ্গল-তিলক ধারণ করিয়া, কর্ণমূল দেবপূজার বিল্বদলে পরিশোভিত করিয়া, পূর্ণকুম্ভের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া, দাস-দাসী পেটক পুটুলি-মাতা-পত্নী সমভিব্যাহারে শ্রীমান্ পুণ্ডরীকাক্ষ রায় ষ্টীমারে চড়িয়া সাগরযাত্রা করিল। তাহার গৃহকোণবদ্ধ জড় জীবন, গঙ্গার অবাধ বিস্তৃত বক্ষে মুক্তিলাভ করিল। আরব্য-উপন্যাসের ক্ষুদ্র কুম্ভমুখনির্গত দৈত্যরাজের ন্যায়, তাহার বদ্ধ প্রেম ধূমাকারে অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাহারা কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিল। বহু দীপাবলির দ্বারা আলোকিত, বহু বৃহৎ অট্টালিকা-পরিশোভিত, বহু জনাকীর্ণ বৃহৎ নগরী দেখিয়া পুণ্ডরীকের মাতা এবং সুশীলা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্না হইয়াছিলেন। পুণ্ডরীক সাগরযাত্রী এক ষ্টীমারে একটি সুবিধাজনক ক্যাবিন সন্ধ্যার পর ঠিক করিয়া রাখিল, এবং রাত্রের আহারাদির পর, সকলকে লইয়া তথায় আসিয়া শয়ন করিল। পরদিন সকালে সাতটার সময় ষ্টীমার ছাড়িবে।

সাগরে পৌঁছিয়া, বাসের সুবিধার জন্য, এবং সুবিধামত নানা স্থান পরিদর্শনের জন্য পুণ্ডরীক এক বজ্‌রা ভাড়া করিয়া লইল। বজ্‌রার কামরা হইতে সুশীলা এবং সুশীলার শ্বশ্রূঠাকুরাণী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কখন জনাকীর্ণ তীরভূমি, কখন বিপুল তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি অবলোকন করিতে লাগিলেন। যদিও পুণ্ডরীকের মাতা কখনও পর্ব্বত দেখেন নাই, তথাপি আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি ঐ সকল জল-তরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগের সহিত পর্ব্বতের তুলনা করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উচ্চে উহারা এক একটি তালবৃক্ষের সমকক্ষ। মকর-সংক্রান্তিতে সাগরে যেরূপ মহা লোক-সমারোহ হয়, বারুণী উপলক্ষে তদ্রূপ কিছুই হয় না; তথাপি সেবার বারুণীর সময় এত লোক সাগরের পুণ্যজলে স্নান করিয়াছিল যে, আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাস, পুরোহিত মহাশয়দিগের কথা যদি সত্য হয় যে এক একটি ডুবে কোটি কোটী কুল নরক হইতে উদ্ধার লাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চিতই সে বৎসর নরকটি একবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। পুণ্ডরীকের মাতা বধূ ও পুত্র লইয়া কয়েক দিন নানা স্থানে পদব্রজে ক্রমাগত বিচরণ করিয়া, এবং ঈপ্সিত কয়েকটি দ্রব্য স্বহস্তে ক্রয় করিয়া, একদিন সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হইয়া বজ্‌রাতে প্রত্যাগতা হইয়াছিলেন

মাতা বজ্‌রার কামরার মধ্যে বসিয়া বধূর সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে নৈশ আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। পুণ্ডরীক কামরার বাহিরে বসিয়া, বজ্‌রার পার্শ্ব হইতে নিম্নে হস্ত প্রসারিত করিয়া, অঙ্গুলিসকলের দ্বারা স্রোতোজলের সহিত

ক্রীড়া করিতেছিল। দূরে—পশ্চিম গগনে আপন দিবাসময়ের রক্তাক্ত চিহ্ন রাখিয়া, এবং অবগাহন দ্বারা সাগরের জল রক্ত রঞ্জিত করিয়া, সূর্য্যদেব বিশ্রামলাভের জন্য সন্ধ্যার কোলে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তরঙ্গসকল রাশি রাশি পূজার পুষ্প শিরে পরিয়া নৃত্য করিতেছিল; কখন প্রগল্‌ভার ন্যায় খলখল শব্দে হাসিতেছিল। রাত্রি আপনার কৃষ্ণ অঞ্চলখানির দ্বারা ধীরে ধীরে পৃথিবীর গাত্র আচ্ছাদন করিতেছিল।

পুণ্ডরীক সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। পুত্রের বেদনাবিজড়িত কণ্ঠস্বর শুনিয়া, মাতা ভীতা হইয়া, কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, পুণ্ডরীক স্রোতের জল হইতে আপন হস্ত সবলে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহা জলের বাহিরে আনিতে সমর্থ হইতেছে না। কি সর্ব্বনাশ! মাতার প্রত্যেক অঙ্গ প্রকম্পিত হইল! তিনি সভয়ে পুণ্ডরীককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমার হাত কি কোন জীবজন্তুতে কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়াছে।" পুণ্ডরীক কহিল, "হাঁ, মা, বোধ হয় কুম্ভীরে আমার হাত ধরিয়া টানিতেছে; তুমি মাঝিকে শীঘ্র ডাক।"

সব শুনিয়া, সুশীলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো মাঝি! আমার সমস্ত গহনা আমি তোমাকে দিব, তুমি উহাঁর জীবন রক্ষা কর।"

মাঝি কহিল, "কোন ভয় নাই; কোন ভয় নাই, মা ঠাকুরাণি! ও কুমীর নহে; আমি এখনই জলে নামিয়া দেখিতেছি। বাবু, হাত টানাটানি করিও না, উহাতে হাতে বেদনা হইবে মাত্র।"

কথার সহিত, অন্যের নিষেধবাক্য শুনিবার পূর্ব্বেই, মাঝি জলে ঝম্প প্রদান করিল। বথায় নৌকা হইতে পুণ্ডরীক আপন হস্ত প্রাণপণ শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে তথায় উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে, কোন গুরুদ্রব্য নৌকার উপর উঠাইয়া দিল। গুরু দ্রব্যের দ্বারা পুণ্ডরীকের হস্ত আবদ্ধ হইয়াছিল। এ গুরুদ্রব্যটি কি? মাঝি তাহার উপর হইতে বসনাবরণ উন্মোচিত করিল। একটি মৃতকল্পা ক্ষুদ্র বালিকা সবলে দুই হস্তের দ্বারা পুণ্ডরীকের মণিবন্ধ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

বালিকা ভুবনমোহিনী রূপসী। তাহার কৃষ্ণ আলুলায়িত কেশগুচ্ছ ঐ নীল সাগরের তরঙ্গ অপেক্ষা সুন্দর। তাহার অঙ্গুলিসকল, তরঙ্গের শিরোশোভা পুষ্পদল অপেক্ষা কমনীয়। এইমাত্র অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রশ্মি এবং সীমাহীন জলরাশি যে অপূর্ব্ব সন্ধ্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, এই অপূর্ব্বা বালিকা সেই সন্ধ্যার অপেক্ষা মধুর। পুণ্ডরীকের মাতা যে আলোকের সাহায্যে কন্যার মুখাবলোকন করিতেছিলেন, তাহার অলোকসামান্য লাবণ্য সেই আলোক অপেক্ষা উজ্জ্বল। তাহাকে পুণ্ডরীক দেখিল, পুণ্ডরীকের মাতা দেখিলেন এবং সুশীলা দেখিল। দেখিল যে যাহা পুণ্ডরীকের মণিবন্ধ সজোরে গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা কুম্ভীর নহে; জলনিমজ্জনে জ্ঞানাপহৃতা এক লাবণ্যময়ী কুমারী। কুমারীর বয়ঃক্রম পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক হইবে না।

পুণ্ডরীকের প্রকোষ্ঠধৃত কুমারীর দুইটি কোমল হস্ত তাহা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইল; কিন্তু কেহই তাহাতে সহজে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না। মাঝি কহিল, "মা ঠাক্‌রুণ, উহার জ্ঞান না হইলে, হাত ছাড়াইয়া লইতে পারিবেন না। প্রাণের ভয়ে অত্যন্ত জোরে হাত ধরিয়া, অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ জ্ঞান না

হইবে, ততক্ষণও হাত কিছুতেই ছাড়িবে
আপনারা উঁহাকে সন্ধান করিবার
চেষ্টা করুন।" তাহাই করা হইল।

বালিকাটি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিল। পুণ্ডরীকের হাত ছাড়িয়া, চারি দিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ক্রন্দন করিল। ক্রন্দন করিয়া, অশ্রুজলে আপনার কোমল গণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া, তাহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত তথ্য কয়েকটি অবগত হইতে পারা গেল। হরিপুর নামক একটি পল্লিগ্রামে তাহাদের বাস; হরিপুর কোন্ জেলায়, তাহা সে জানে না। তাহার নাম পুঁটি। তাহারা কায়স্থ, তাহার পিতামাতা নাই; সে তাহার দিদিমার নিকট হরিপুরে থাকিত। গ্রামের কয়েকটি স্ত্রীলোকের সহিত তাহার দিদিমা বারুণী-স্নান-উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে আসিয়াছিল; সেও দিদিমার সহিত আসিয়াছিল। সেই দিন দ্বিপ্রহরে তাহার দিদিমা স্নান করিবার জন্য জলে নামিয়াছিল। সেও দিদিমার অঞ্চল ধরিয়া জলে নামিয়াছিল। পদস্খলিত হইয়া দিদিমা বেশী জলে যাইয়া পড়ে এবং ডুবিয়া যায়। দিদিমার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে সেও বেশী জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। তাহার পর তাহার আর কিছু স্মরণ নাই।

পুণ্ডরীক পুলীষে সংবাদ দিল; নানা স্থানে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোনক্রমে বালিকার কোনও আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইল না। পুঁটি তাহাদের বজ্‌রাতে আশ্রয় পাইল।

দুই দিন পরে যখন পুণ্ডরীক সকলকে লইয়া কলিকাতায় আসিল, পুঁটি তখন তাহাদের সহিত আসিয়াছিল। পুণ্ডরীকের ইচ্ছা ছিল যে, কলিকাতায় কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া, পুঁটির আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করে। তথায় উপস্থিত হইয়া, সে রেল্‌ষ্টেসনে এবং ষ্টীমার ঘাটে যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই পুঁটীর দিদিমার তথ্য অবগত থাকিয়া, তাহার অনুসন্ধান দিতে সমর্থ হইল না। সে হরিপুর গ্রামের অনুসন্ধান করিল; কেহ কেহ বলিল যে, শান্তিপুরের নিকট হরিপুর নামে এক পল্লিগ্রাম আছে। পুণ্ডরীক পুঁটীকে লইয়া নিজে সেই হরিপুরে গেল। পুঁটী হাত নাড়িয়া কহিল, "না, না, এ আমাদের গ্রাম নহে।" পুণ্ডরীক কলিকাতায় ফিরিয়া আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। সংবাদপত্রসকলে বিজ্ঞাপন প্রচার করিল। কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল; দিদিমাকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে পুণ্ডরীকের মাতা বলিলেন, "এ সোনার চাঁদ মেয়েটি আমাদের কাছেই থাকুক। স্বজাতি; আমার গর্ভের কন্যা নাই, ইহাকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিব। এবং উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দিব।"

কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া, পুণ্ডরীক সকলকে লইয়া গৃহে ফিরিল।

৪

গৃহে, দুইটি অত্যন্ত শুভ সংবাদ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র পুণ্ডরীকের পিতা পুণ্ডরীকের হস্তে দুইখানি তারের সংবাদ দিলেন। একখানি সংবাদ কয়েক দিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল। গঙ্গার উপরের এক চর লইয়া, তাহাদের সহিত অন্য এক জমীদারের এক দীর্ঘকালব্যাপী এবং বহু অর্থ-ধ্বংসকারী মকদ্দমা হইতেছিল; কলিকাতা হাইকোর্টে এই মকদ্দমার শেষ মীমাংসা হয়; শেষ মীমাংসায় পুণ্ডরীকের পিতার জয় লাভ হইয়াছিল; এই তারের সংবাদে ইহাই লিখিত ছিল। দেখিয়া পুণ্ডরীক পিতাকে

কহিল, 'বাবা, এই বার আমাদের বিষয়ের আয় বৎসরে প্রায় দুই হাজার টাকা বাড়িয়া যাইবে।" পিতা বলিলেন, "হ্যাঁ, কেবল মাত্র আয় বৃদ্ধি পাইবে এমত নহে, মকদ্দমার খরচা বাবদ অনেক নগদ টাকা পাওয়া যাইবে। তুমি অন্য টেলিগ্রামটি পড়; উহা আমি এইমাত্র—তোমাদের গৃহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছি।" পুণ্ডরীক তাহা পাঠ করিয়া জানিল যে, সে বি, এ পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পুণ্ডরীকের মাতার আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁহার পুণ্যের ফল সদ্য লাভ হইয়াছিল। তিনি স্বামীর ললাটটি মকদ্দমার অহরহ চিন্তা হইতে মুক্ত, এবং পুত্রকে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য দেখিয়াছিলেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, যে দিন সন্ধ্যার পর মকদ্দমার জয়লাভের সংবাদ আসিয়াছিল, সেইদিন ঠিক সেই সময় জলনিমজ্জিত পুঁটী পুণ্ডরীকের হস্তধারণ করিয়াছিল। আর, যে মুহূর্ত্তে তিনি পুঁটীকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইক্ষণে পুণ্ডরীকের পরীক্ষা সম্বন্ধে শুভ সংবাদ আসিয়াছিল। অতএব এটা ঠিক হইয়া গেল যে, পুঁটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এমন সুন্দরী এবং এমন সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মী ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। পুণ্ডরীককে আহ্বান করিয়া মাতা কহিলেন, "তোরা ত অনেক কেতাব পড়িয়াছিস্, পুঁটীর একটা ভাল রকম নাম রাখ্।" এখন পুণ্ডরীক বি, এ, পাশ করিয়াছিল বটে, এবং মেঘদূতের কিয়দংশ, আর শকুন্তলা পাঠ করিয়া সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিল বটে, কিন্তু মহাকবি কালিদাসের উপরোক্ত দুই গ্রন্থমধ্যে কোন স্থানে পুঁটীর নামকরণ হয় নাই। এবং মিল, বেন প্রভৃতি সুবুদ্ধি দার্শনিকগণও এ সম্বন্ধে কুত্রাপি কোনও প্রকার উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই।

তথাপি মাতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় জানি দুই দিন চিন্তার পর পুণ্ডরীক পুঁটীর একটি নাম সংগ্রহ করিল। এবং মাতাকে আসিয়া বলিল, "পুঁটীকে বারুণী-স্নান-উপলক্ষে আমরা পাইয়াছি, এ জন্য উহার নাম "বারুণী" রাখিলে মন্দ হয় না।" মাতা কহিলেন, "বেশ, আজ হইতে উহাকে আমরা 'বারুণী' বলিয়া ডাকিব।" এইরূপে পুঁটী, বারুণী হইল।

বারুণী নাম পাইয়া, এবং দিদিমার অপেক্ষা শতগুণ অধিক আদর লাভ করিয়া, অতি অল্পদিন মধ্যে বারুণী হরিপুর গ্রামটিকে এবং দিদিমাটিকে ভুলিয়া গেল। বালিকাটিকে যে দেখে, সেই তাহাকে একবার আদর করিয়া বলে, "আহা"! এই লক্ষ্মী মেয়েটিকে সরস্বতী করিবার জন্য স্বয়ং বি, এ, পাশ-করা পুণ্ডরীক তাহার অধ্যাপনাভার গ্রহণ করিলেন। আদর ও যত্নের মধ্যে বারুণী ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একটি কারণে সুশীলার একটু অভিমান হইয়াছিল। হইবারই কথা। পুঁটিকে যখন বারুণী নাম দেওয়া হইল, তখন পুণ্ডরীক এ সম্বন্ধে কোন পরামর্শ সুশীলার নিকট গ্রহণ করে নাই। পুণ্ডরীকের এ বড় অন্যায়। সে চিরদিন সুশীলার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়াছে। আজ নামকরণটা সুশীলার পরামর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত ছিল; তাহা হইল না কেন?

তা, লোকের অভিমান হয়; কিন্তু তাহা চিরদিন থাকে না। কিন্তু বারুণীকে লইয়া বাড়ীর লোক বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছিল। সুশীলার শ্বশুরের মাথায় পাকা চুল এমনই কিছু বেশী ছিল যে, তিনি

প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে বারুণীকে পাকা চুল তুলিতে বলিতেন। আর বারুণী আপনাকে বলিয়া পরিচয় দিয়াছে বলিয়া তাহার সহিত একত্রে ভোজন করা এবং সমুদয় মৎস্যপুচ্ছটি তাহাকে আহার করিতে দেওয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর একবারে উচিত হয় নাই। আর প্রত্যহ সকালে, সমস্ত কাজ নষ্ট করিয়া এবং নিজের শরীর নষ্ট করিয়া পুণ্ডরীক যে বারুণীকে পড়া বলিয়া দিত, এটাও তাহার পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই।—কেন?—তাহার লেখা পড়ার জন্য একটী পণ্ডিত রাখিয়া দিলেই ত চলিতে পারিত। আর পাড়ার লোক সকলে আসিয়া যে বার বার বারুণীর সম্মুখেই তাহাকে 'বড় লক্ষ্মী মেয়ে' বলিত, এটাও তাহাদের পক্ষে বড় অনুচিত কার্য্য হইত;—ছেলেদের কাছে কি ছেলেদের সুখ্যাতি করিতে আছে?—তাহাতে ভাল মেয়েও খারাপ হইয়া যায়। আর ঝিরা যে বারুণীকে পান সাজিতে দিত, এটাও ভারি অন্যায়। ছেলে মানুষ, কোন্ দিন পাণে এমন বেশী চুণ দিয়া ফেলিবে যে, লোকের জিভ্ একেবারে পুড়িয়া যাইবে। বারুণীকে লইয়া এই সকল বাড়াবাড়ি সুশীলার ভাল লাগিত না।

তাহার পর, সুশীলা মনকে প্রবোধ দিল যে, লোকের যদি বারুণ লইয়া এইরূপ বাড়াবাড়ি করাই ভাল লাগে, তবে তাহারা তাহাই করুক। কিন্তু সুশীলা পুত্রবতী হইলে, যে আদর, যে স্নেহ তাহার পুত্র বা কন্যা প্রাপ্ত হইত, তাঁহাদের প্রাপ্য সেই আদর সেই স্নেহ তাহারা জন্মাইবার পূর্ব্বেই একটা অজ্ঞাতকুলশীলা অপরিচিতা বালিকা আসিয়া যে নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিবে, ইহাতে সুশীলার মনে একটু ক্ষোভ থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। কেন সে, যে তাহার উপভুক্ত উচ্ছিষ্ট আদর এবং স্নেহ তাহার গর্ভজ বংশের তিলক আসিয়া উপভোগ করিবে?

কিন্তু সুশীলার এই বয়সেও ত তাহার কোলে বিধাতা একটি পুত্র দেন নাই। পুণ্ডরীকের মাতা কত দুঃখ করিতেন; কত দেবতার কাছে কত পূজা মানত করিতেন; কিন্তু বংশরক্ষার জন্য দেবতারা পুণ্ডরীককে একটি বংশের তিলক প্রদান করেন নাই। দেবতাদিগের এ বড় অন্যায়। সুশীলা বার বার মনে করিত, যদি তাহার কোলে একটি ছেলে থাকিত, তাহা হইলে বারুণী এখন যে আদর পাইতেছে, সে আদর তাহার গর্ভজ সন্তানই প্রাপ্ত হইত। এস বৎসগণ এস; এক অদৃষ্ট দেশ হইতে তোমাদের কোমল কমনীয়তা লইয়া এস; আসিয়া সুশীলার শূন্য কোল আলো করিয়া বিরাজ কর।

৫

দেখিতে দেখিতে পাঁচটি বৎসর চলিয়া গেল। অভাগিনী সুশীলা এখনও মাতা হইতে পারিল না। হায়! তাহার সন্তানের প্রাপ্য সমস্ত আদর, সমস্ত স্নেহ, বারুণী হেলায় উপভোগ করিয়া লইল।

বারুণী এক্ষণে একাদশবর্ষীয়া বালিকা। সে পুণ্ডরীকের যত্নে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছে। পুণ্ডরীকের মাতার যত্নে সে গৃহকর্ম্মও শিক্ষা করিয়াছে। এবং আমাদের আশা আছে যে, পুণ্ডরীকের পিতার যত্নে সে অবিলম্বে এক সৎপাত্রে সমর্পিতা হইবে। তিনি ঘটকদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, বারুণীর বিবাহে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিবেন।

কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী হইলেও কে তাহাকে বিবাহ করিবে? সুতরাং বারুণীর জন্য একটি বর পাওয়া বড়ই দুর্ঘট হইয়া

পড়িল। ঘটকসকল দুই তিন বৎসর ব্যাপী অনুসন্ধান করিয়াও, বারুণীর চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেও, অকৃতকার্য্য রহিল।

এদিকে সুশীলার সন্তান হইবার বয়ঃক্রম অতীত হইতেছিল; সন্তান ব্যতীত একটি পুরাতন বংশ লোপ হইবার সম্ভাবনা ঘটিতেছিল। অন্য দিকে পরম স্নেহের পাত্রী বারুণীর বিবাহের কাল অতীত হইতেছিল; বহু চেষ্টাতেও একটি সুপাত্র পাওয়া কঠিন হইয়াছিল। পুণ্ডরীকের মাতা এই দুই কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িয়া বিশেষরূপ চিন্তিতা হইয়াছিলেন।

এক দিন চিন্তিতা মাতা, স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, "বারুণীর জন্য ত অনুসন্ধান করিয়া পাত্র পাওয়া গেল না; আর এত বয়সেও ত বধূমাতার পুত্র হইল না। এমন অবস্থায় আমার ইচ্ছা যে, বারুণীর সহিত পুণ্ডরীকের বিবাহ দিই। তুমি কি বল?" পুণ্ডরীকের পিতা কহিলেন, পুণ্ডরীকের মত কি?"

মাতা। আমরা যাহা বলিব তাহাতে তাহার অমত হইবে না। বারুণী পরম সুন্দরী এবং সুলক্ষণাক্রান্তা; বহুপুণ্যের ফলেও এমন বধূ একটি পাওয়া যায় না।

পিতা। তুমি আগে পুণ্ডরীককে জিজ্ঞাসা কর। বোধ হয় এরূপ বিবাহে তাহার মত হইবে না।

মাতা। আমি পুত্রের মন বুঝিয়াছি। সে বারুণীকে ভালবাসে। কেবল পাছে সুশীলা মনে ব্যথা পায়, এজন্য কোনও কথা মুখে বলিতে পারে না।

অন্তরাল হইতে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর উপরোক্ত বাক্যগুলি সুশীলা শুনিয়াছিল। শুনিয়া, এরূপ অবস্থায় পড়িয়া, অন্য যুবতীরা যাহা ভাবে, সেও তাহাই ভাবিয়াছিল, "আমার মনে হে ঠাকুর! বল দাও। আমার প্রাণেশ্বরের—আমার ইহকালের ও পরকালের দেবতার সুখের জন্য, আমার স্বামীর বংশের কল্যাণের জন্য, আমি আপনার সমস্ত বলি দিব। পাপ মন লইয়া আমি এত বারুণীকে সুচক্ষে দেখি নাই। আমার প্রাণের প্রাণ, আমার সর্ব্বস্ব যদি তাহাকে ভালবাসেন, তবে আজ হইতে আমিও তাহাকে ভালবাসিব। কে আমি—কোন্ কীটাণুকীট, যে আমার মনের কষ্টের জন্য আমার স্বামী চিরদিন অসুখী থাকিবেন?" ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুজলে সুশীলার চক্ষু দু'টি পূর্ণ হইয়া গেল।

নিশীথে, শয্যা'পরে স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া, সুশীলা কহিল, "এস, আজ তোমার চরণ সেবা করিব।" স্বামীর চরণ আপনার সুকোমল ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তাহাতে আপন আনন্দিত বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া সে আবার ভাবিল, "যদি এই দুর্লভ চরণে এ অভাগিনীর মতি থাকে, তবে আজ হইতে আর নিজের কথা ভাবিব না। তুমি যাহাতে সুখী হইতে পার, প্রাণ দিয়া তাহা করিব।" সুশীলা যাহা চিন্তা করিয়াছিল, তাহা করিয়াছিল। স্বামীর পদপ্রান্তে থাকিয়া এবং অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া সে স্বামীকে কহিল, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য উত্তর দিবে?"

পুণ্ডরীক। কি কথা?

সুশীলা। তুমি বারুণীকে ভালবাস?

পুণ্ডরীক চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

সুশীলা। কেহ বলে নাই; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

পুণ্ডরীক। কেন সুশীলা, তুমি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সুশীলা। আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে; তুমি আমাকে বলিবে না?

পুণ্ডরীক। আজ আমাকে ক্ষমা কর সুশীলা! আর একদিন তোমাকে আমি তার উত্তর দিব।

সুশীলা। তোমার যে দিন ইচ্ছা বলিও; কিন্তু আমার নিকট ক্ষমা চাহিও না; ইহাতে তোমার দাসীর অকল্যাণ হইবে।

পুণ্ডরীক ভাবিয়াছিল যে, দুই চারি দিবসের মধ্যে সে আপনার উন্মত্ত মনকে বিশেষরূপ শাসিত করিতে পারিবে; এবং অবিলম্বে বারুণীর একটী বিবাহ দিয়া, তাহাকে আপনার তীব্র আকর্ষণের সীমার বাহিরে রাখিয়া আসিবে; এবং তৎপরে আপনার মুক্ত হৃদয় লইয়া সুশীলার নিকট আসিয়া বলিবে, "না, আমি বারুণীকে ভালবাসি না। আমি চিরদিন তোমার ছিলাম এবং চিরদিন তোমারই থাকিব।" হায় পুণ্ডরীক! তুমি পাঁচ বৎসরের বারুণীর হস্ত হইতে একদিন আপনাকে মুক্ত করতে সমর্থ হও নাই, আজ কিরূপে এই পঞ্চদশবর্ষীয়া বিদ্যুৎপ্রভা প্রভাময়ীর প্রভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে? দশটি বৎসর ধরিয়া বারুণী অজ্ঞাতে তোমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে; হৃদয়শূন্য তুমি, কোন্ হৃদয়ের শক্তি লইয়া, তোমার প্রমত্ত হৃদয়কে শাসিত করিবে?

একদিন পুণ্ডরীক পিতার নিকট আসিয়া বলিল, "বাবা, আমি বারুণীর জন্য একটি সুপাত্র অনুসন্ধান করিয়াছি।"

পিতা। এ সুপাত্রটি কে?

পুণ্ডরীক। আপনি ও পাড়ায় হারাণ বাবুকে জানেন?—

পিতা। কি, হারাণ এই বয়সে আবার বিবাহ করিবে না কি?

পুণ্ডরীক। না, না, হারাণ বাবু বিবাহ করিবেন না। হারাণ বাবুর এক সম্বন্ধী আছেন; তিনি রামচন্দ্রপুরের জমীদার; তাঁহার নাম—

পিতা। বুঝিয়াছি; তুমি পার্ব্বতী ঘোষের কথা বলিতেছ।

পুণ্ডরীক। আজ্ঞা হাঁ। তিনি শ্রেষ্ঠ কুলীন।

পিতা। কিন্তু সুপাত্র নহেন। আমি মদ্যপায়ী ব্যক্তির সহিত বারুণীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি না। আমি জানি পার্ব্বতী ঘোষ মদ্যপায়ী।

পিতার নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুণ্ডরীক অন্য এক স্থানে ঘটক পাঠাইয়া দিল। কিন্তু সেটিও সুপাত্র হইল না;—বিদ্যাহীন। পুণ্ডরীকের আজ্ঞা পাইয়া ঘটক আবার একটি নূতন স্থান হইতে একটী পাত্রের অনুসন্ধান লইয়া আসিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পাত্রটি সুপাত্র হইল না; সেরূপ ধনহীন দরিদ্রের হস্তে বারুণীকে সমর্পণ করা কাহারও অভিপ্রায় হইল না। তবে কি স্বয়ং পুণ্ডরীক ব্যতীত আর কাহাকেও বিধাতা বারুণীর স্বামী হইবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই? কিন্তু পতিব্রতা সুশীলার মনে দারুণ ব্যথা দিয়া পুণ্ডরীক কিরূপে বারুণীকে বিবাহ করিবে? তাহা অপেক্ষা বারুণী অবিবাহিতা অবস্থায় জীবন যাপন করুক।

পুণ্ডরীক আপনার অশান্ত মনকে তাহার প্রাণপণ শক্তির দ্বারা দমিত করিবে। যে বুক সে বাল্যকাল হইতে আপনার আদর-প্লাবিত বুকে ধারণ করিয়াছে, আজ কিরূপে সেই বুকে ব্যথা দিয়া সে পরম অধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে? তাহা অপেক্ষা মৃত্যু কি তাহার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে?

পুণ্ডরীক অনেক ভাবিয়াছিল। কিন্তু সে বারুণীকে ছাড়িয়া মরিতে পারে নাই; মরিলে যে সে বারুণীকে আর দেখিতে পাইবে না। আপনার হৃদয়কেও সে দমিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

৬

পোড়ারমুখী বারুণীও কি পুণ্ডরীককে ভালবাসে? বাসে বই কি,—খুবই বাসে। তাহার বিছানার তলায় যে খাতাখানা রহিয়াছে, তাহা গোপনে সংগ্রহ করিয়া, তাহার মধ্যে পোড়ারমুখী কি কবিতা লিখিয়াছে, তোমরা তাহা একবার পড়িয়া দেখ। দেখ, এ গুরুতর প্রেম;—

কারে বল ভালবসি, কাহার হইব দাসী,
কাহার রূপেতে বল শোভে দশ দিক্?
—পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক!
কাহার অধরে হাসি, দেখিবারে অভিলাষী
ধরামাঝে কে আমার সবার অধিক?
—পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক!

ধিক্ ধিক্ কি ভয়ঙ্কর কলিকালই পড়িয়াছে। সেকালে বাহাত্তর বৎসর বয়সেও প্রেমিকাদিগকে আমরা একটি ক্ষুদ্র প্রেমের কথা উচ্চারণ করিতে শুনি নাই; আর আজ কিনা একটা পঞ্চদশ বর্ষীয়া নাবালিকা বালিকা, আমার অপেক্ষা ভালরূপ ছন্দ বন্ধ মিলাইয়া, প্রেমের কবিতা রচনা করিল! তথাপি, বারুণীর হৃদয়ের কথা বাটীর কেহ অবগত ছিল না।

সুশীলা স্বহস্তে বারুণীর কেশরচনা করিয়া দিত। একদিন কেশরচনা করিয়া, সুশীলা এক উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করাইয়া, বারুণীকে সজ্জিত করিল। বস্ত্রাবৃত তাহার বর দেহ, মণ্ডল মণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুশীলা আপন অঞ্চলবস্ত্র দ্বারা তাহার কমনীয় মুখমণ্ডল মার্জ্জিত করিয়া ভ্রূমধ্যে কৃষ্ণ টিপ্ অঙ্কিত করিলেন;—যেন অনঙ্গদেব তপস্যার জন্য আপনার অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণাজিনের আসনখানি তথায় বিস্তৃত করিলেন। বারুণীর রূপ দেখিয়া সুশীলা ভাবিল, "হাঁ, এই ফুল্ল শতদল দিয়া দেবতার পূজা করিতে পারিলে, পূজার ন্যায় পূজা হয় বটে। আমার দেবতার পায়ে, আমি এই নির্ম্মল শ্রেষ্ঠ শতদল নিবেদন করিব।" সুশীলা বারুণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আয়, বারুণি! আমার সহিত আয়।" বারুণী সুশীলাকে 'দিদি' বলিত; সে কহিল, "কোথায় যা'ব, দিদি?"

সুশীলা। আমার বরকে প্রণাম করবি চল্।

বারুণী। তুমি দিদি আমার সহিত তামাসা করিতেছ।

সুশীলা। না বোন! তামাসা করি নাই। সত্যই আজ তোমাকে তাঁহার পায়ে প্রণাম করিতে হইবে।

বারুণীর সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, "দিদি আমাকে আজ কেন এ প্রকার অদ্ভুত অনুরোধ করিতেছে। তবে কি আমার মনের কথাটি দিদি জানিতে পারিয়াছে?" দেবী জানকীকে যেদিনী-দেবী যে প্রকার আপনার নিভৃত ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া, লুকায়িত করিয়াছিলেন, আজ যদি তিনি বারুণীকে তেমনই লুকাইতে পারিতেন, তাহা হইলে সে এই ভয়ঙ্কর লজ্জার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত। পদ্ম চক্ষু অবনত করিয়া, আপনার নিদারুণ লজ্জা গোপন করিবার জন্য, সে কোনক্রমে সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায়?"

সুশীলা। উপরে, বারান্দায় বসিয়া ঐ দেখ একখানি খাতা পড়িতেছেন। ওখানি কি তোমার খাতা? ও খাতাখানিতে বোন, তুমি কি লিখিয়া রাখিয়াছ?

বিস্ময়বিস্ফারিত বিশাল পদ্মসদৃশ চক্ষু বারুণী সুশীলার নির্দ্দেশ মত বারান্দার দিকে ফিরাইল। কি সর্ব্বনাশ! উহা যে সেই কবিতা লিখা তাহারই খাতা। উহা উঁহার হস্তে কিরূপে আসিল? লজ্জায় বারুণীর সুন্দর

রক্তচন্দন-চর্চ্চিত প্রসূনের ন্যায় শোভা পাইল। সুশীলা তাহার হস্ত ধরিয়া কহিল, “বা কি দেখ? এস আমার সহিত এস; যাঁহাকে এতদিন মনে মনে পূজা করিয়াছ, এস আজ তাঁহার পায়ে, আমার সম্মুখে প্রণাম কর। দেখিয়া আমার জন্ম সার্থক হউক।” কাষ্ঠপুত্তলিকার মত, স্বপ্নাভিভূতার ন্যায়, সুশীলাকে অনুসরণ করিয়া বারুণী পুণ্ডরীকের পদে প্রণত হইল। কি উৎকৃষ্ট কুসুমের দ্বারা সুশীলা স্বামীর চরণ পূজা করিয়াছিল! কিন্তু তোমাদের চক্ষের অগোচরে সে ইহা অপেক্ষা আরও এক দেবদুর্ল্লভ দ্রব্যের দ্বারা স্বামীর চরণ অলঙ্কৃত করিয়াছিল,—দেবী আপনার রক্তকমলসদৃশ, প্রেমপূর্ণ রক্তাক্ত হৃদয়টি চিরবাঞ্ছিতের—চিরপ্রিয়তমের চরণতলে উপহার স্বরূপ স্থাপন করিয়াছিল।

* * * *

একটি শুভ দিনে পুণ্ডরীকের সহিত বারুণীর বিবাহ হইয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে, যখন পুষ্পময়ী বারুণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া পাপীষ্ঠ পুণ্ডরীক অত্যন্ত সুখে অচেতন ছিল, তখন গৃহদ্বারে একটা কলরব শুনিয়া, সহসা তাহার সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন হইয়া গেল। ঝি ভয়বিকৃত কণ্ঠে ডাকিয়াছিল, “দাদা বাবু! শীঘ্র একবার বৌদিদির (সুশীলার) ঘরে এস। বৌদিদি কি রকম করিতেছে।”

পুণ্ডরীক মগ্নপদে সুশীলার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুশীলা তীরাহত পক্ষিণীর ন্যায় শয্যার উপর পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। সে মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়া তীব্র হলাহল পান করিয়াছে!

পুণ্ডরীক কাতর কণ্ঠে কহিল, “সুশীলা, কেন তুমি এমন কাজ করিলে?” সুশীলা এ কথার কি উত্তর দিবে? তাহার ভগ্ন হৃদয়ের ভিতর যে বজ্রধ্বনি বার বার ধ্বনিত হইতেছিল, তাহা শ্রবণ করিবার শক্তি যদি পুণ্ডরীকের থাকিত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত যে, যে যন্ত্রণার উপশমের জন্য যে মৃত্যুকামনা করিয়া বিষ পান করিয়াছিল, তাহার তুলনায় মৃত্যুযন্ত্রণা অতি তুচ্ছ! সুশীলা তাহার সুগঠিত বাহু প্রসারিত করিয়া, আপনার দুই হস্তের দ্বারা স্বামীর পদদ্বয় গ্রহণ করিয়া কহিল, “তুমি দাসীকে ক্ষমা করিও। আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্ম-জন্মান্তরে দাসী তোমার পদ সেবা করিতে পারে। এ পৃথিবীতে আমার কার্য্য ফুরাইয়াছে। এতদিন যে কার্য্যের জন্য দাসী জীবিত ছিল, তাহা যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত করিয়া দাসী তোমার নিকট চির বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।” বলিতে বলিতে সুশীলার মুখ ম্লান হইল; কণ্ঠস্বর বিকৃতি প্রাপ্ত হইল। সে স্বামীর পদদ্বয় ত্যাগ করিয়া, স্বামীর পদস্পর্শপূত হস্তদ্বয় আপন মস্তকে স্থাপন করিল। পুণ্ডরীক গণ্ডপ্রবাহিত অশ্রুধারায় সুশীলার সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া দিল।

সুশীলার মৃত্যুর পর, পুণ্ডরীক বারুণীকে পাইয়াও জীবনে আর কখনও সুখ অনুভব করিতে পারে নাই। তাহার সমস্ত সুখের মধ্যে কোথা হইতে এক ম্লান মূর্ত্তি আসিয়া আনন্দের সব ছবি ম্লান করিয়া দিত। সুশীলাকে গ্রাস করিবার জন্য শ্মশানে একদিন যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহার উত্তাপ কখনও শীতলতা প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের ইছামতী।

(১)

আমাদের ইছামতী কূলে ;—
কিনারায় বালুরাশি মরুভূমি-সম—
শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বরষায়—
ধু ধু ধু ধু করে নাক পুঞ্জীকৃত হয়ে।
ঢাকা বেলা তরু আগাছায় !
কাঁচা হলুদের রঙে অঙ্গ বিথারিয়া
বাবলার শিরোপরি উঠি,—
আবদারে মূলহীনা অলক লতিকা—
নদী-বুকে চেয়ে আছে ফুটি।
কেঁদাড়া কলমী কোথা নলবনমাঝে
ভরা থাকে সাদা, নীল ফুলে,
ওগো এস কিবা শোভা দেখে যাও তুমি
আমাদের ইছামতী কূলে।

(২)

আমাদের ইছামতী নদী ;—
শিমুলের বৃক্ষ হতে বসন্ত বাতাসে
তুলাগুলি আসি গো উড়িয়া—
পড়ি ধীর তটিনীর কাক-চক্ষু জলে।
কিবা শোভা থাকে গো জুড়িয়া।
পাট, ধান কেটে নিয়ে খুঁড়ি পলি জমি
কেহ কোথা পুঁতছে পটল।
নিড়ায় তামাক ক্ষেত হুকা সাথে ঢাকা
শান নাই অচল অটল !
বাঙাল সুরের গান জেলেদের মুখে
শুনিবার সাধ থাকে যদি—
ওগো এস দেখে যাও, গ্রাম সন্ধ্যাকালে
আমাদের ইছামতী নদী।

(৩)

আমাদের ইছামতী তীর ;—
সারাদিন বসে থাকি কলার বাগানে
যবে চাষ, ঘরে ফিরে যায়—
মাঝিরা লুকায়ে গিয়ে পাতা কেটে আনে
লোনা ধরা ভাঙ্গা ভোঁতা দা'য়।
কোথা বা বাঙাল মাঝি লালসায় বশে
খাল কেতে নিতে গেল খাল
কচা ঝোপনের আড়ে ছিল খেতোয়াল
টের পেয়ে দিল গালাগা'ল।
বক্ষ চিরি অষ্ট বক্র খর্জ্জুর হরষে
প্রদানিছে সুধাসম নীর
দেখিতে বাসনা যদি, এস একবার
আমাদের ইছামতী তীর !

(৪)

আমাদের ইছামতী তীর ;—
জেলেরা কিনারে বসি নায়ে গাব দেয়
জেলে বউ সম্মুখাইয়া হাঁটে,
'কড়া' 'কনে' 'কয়ে দিব 'হ্যারা' যাবি 'ওরে'
ধ্বনিছে 'শশুরে' কথা ঘাটে।
এঘাটে চুণুরে মাঝি চূণা মুখে টিপে—
ঢোল নিয়ে ধুয়া গান গায় ;
তারি পাশে বাদাবুনে কাঁকড়ার নায়ে
মেছুনীরা মত্ত বচসায়।
দক্ষিণের ধান ভরা সারি সারি সারি
কিবা শোভা হোথা তরণীর
কয়ালী আগুলে কোথা সায়েরের ঘাট—
আমাদের ইছামতী তীর !

(৫)

আমাদের ইছামতী কূলে ;—
এ পারে ডুবিলে বেলা বাঁশবন আড়ে
ওপার কাঁদিয়া হয় রাঙ্গা ;
ওপারে আসিলে উষা অশথের শিরে
কেঁদে রাঙা এপারের ডাঙা।
সাত' ভেয়ে কালীতলে নদীতীরে উঠি
পাড়াগেঁয়ে কুলবধূগণ !

বেঁধে খেয়ে চলে যায় করিয়া মানত
পরশি মায়ের শ্রীচরণ !
শ্রী চলে যায় সকাল সন্ধ্যায়—
কেহ দেয় রাঙ্গা পাল তুলে
ওগো মুকুতা দেখিবে যদি এস একবার
আমাদের ইছামতী কূলে।

(৬)

আমাদের ইছামতী নদী ;—
শোষক কুম্ভীর হৌক, গৌক ঘেরা ঘাট,
কিবা দোষ, কিবা ক্ষতি তায় ;
ভীতিময়ী ম্যালেরিয়া মৃত্যু গ্রাস সম—
তারা বেশী কিছু নাহি খায় !
মূর্খ বিদেশীর কথা "কুমীরের গাঙ"—
ভ্রান্ত লোক কত কথা বলে ;
ওরে এমন সোণার নদী আছে কোন্ দেশে—
মুকুতা ফুটিয়া থাকে জলে !
ধন্য যশোহর তুমি, ধন্য জন্মভূমি,
ধন্য আমি তোমারি সন্তান ;
তা না হলে অভিরাম অনুপমা নদী
এজনমে হ'ত না সন্ধান ;
মরা দেহে দেখাইও, যে থাক আমার—
ভাগ্যগুণে দেশে মরি যদি—
কাসপুর শ্মশানের সেই তরুতলা,—
পাদদেশে ইছাময়ী নদী !

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

শোক সঙ্গীত।

(রাজবিয়োগে)

ইমন-পূরবী—একতালা।

সহিতে নারিত যেই কারো শোক কো'না কালে
সে আজ জড়ায়ে দেছে এ ভূলোক শোক-জালে
জগতের সুসন্তান
এডওয়ার্ড মহাপ্রাণ
ক্লান্ত দেহে শান্তিতরে পশিয়াছে অস্তাচলে ॥
সসাগরা বসুন্ধরা
হইয়াছে শোকাতুরা
ভারত-মঙ্গল ঘট ভেঙ্গে গেল যে অকালে ॥
শুনিল না কোনো কথা,
বুঝিল না মর্ম্ম-ব্যথা
নিঠুর কালের ডাকে মা ব'লে সে গেল চলে ॥
আঁধার আঁধার ধরা
জীবন্ত হয়েছে মরা
রাজা প্রজা ভাসিতেছে সকলে নয়ন-জলে ॥
গেছ যদি ভব পার,
পাছু না ডাকিব আর,
হোক্ তব শান্তিলাভ হে রাজন্ অবহেলে।
তোমারি ও সিংহাসনে,
তোমারি ও পুত্র-ধনে,
বসায়ে, রাখিব দেব তোমারে গো স্মৃতিমূলে ॥

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

সোহংগীতা—হিমালয়বাসী সোহং স্বামী প্রণীত। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

এই গ্রন্থখানির পরিচয় দিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকগণকে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রন্থকার সোহং স্বামীর পূর্ব্বনাম শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে বিক্রমপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইনি ব্যায়ামে আসক্ত ছিলেন। ইনি ত্রিপুরার মহারাজের নিকট দুই বৎসর পার্শ্বচররূপে থাকেন। পরে বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি সার্কাস করিবার আয়োজন করেন। শ্রীহট্ট

জেলায় সুনামগঞ্জ নামক স্থানে ইনি একটি চিতাবাঘ ক্রয় করেন এবং দুই মাসে তাহাকে বশ করিয়া সুনামগঞ্জেই তাহার সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ক্রমে ইঁহার এমন শক্তি জন্মিল যে, যে কোন হিংস্র জন্তুর পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতেন। জয়দেবপুরের রাজা ইঁহাকে একটী বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া ব্যতীত ইনি শারীরিক শক্তির পরিচায়ক আর একটী ক্রীড়া দেখাইতেন। ইনি ১২।১৪ মণ ওজনের পাথর বক্ষে ধারণ করিতে পারিতেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কুক সাহেবের সার্কাসে মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে ইনি নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর ক্রীড়া করেন। পরে ইনি নিজের সার্কাস লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং শারীরিক বল, নির্ভীকতা ও হিংস্র পশুদমনের সম্যক্ পরিচয় দেন। এইখানেই ইঁহার কর্ম্ম-জীবনের শেষ হয় এবং অর্থোপার্জ্জনের উপর বিরাগ জন্মে। এই সময়ে বিলাতের কোন বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানী ইঁহাকে মাসিক ৩০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু শ্যামাকান্ত ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ধর্ম্মবীজ বাল্য কাল হইতেই ইঁহার হৃদয়ে নিহিত হইয়াছিল। কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এবং চারি বৎসর মাদ্রাজে থাকিয়া নাইনিতাল হইতে শত মাইল দূরবর্ত্তী হিমালয় পর্ব্বতে ভওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কাশী অবস্থান কালে একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীর সহিত শ্যামাকান্তের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট, ও পিতৃদত্ত নাম নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তিনি ৩২ বৎসর তিব্বতে ছিলেন, এজন্য লোকে তাঁহাকে "তিব্বতী বাবা" বলিয়া থাকে। তিনি যখন লক্ষ্ণৌ ছিলেন, তখন শ্যামাকান্ত হরিদ্বারে। তথা হইতে তাঁহাকে আনাইয়া মহাসমারোহের সহিত সর্ব্বশ্রেণীর সন্ন্যাসীর সমক্ষে তিব্বতী বাবা, শ্যামাকান্তের "সোহং স্বামী" নামকরণ করেন। সেই হইতে শ্যামাকান্ত উক্ত নামেই পরিচিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বঙ্গ ভাষায় পদ্যে লিখিত। সংসারের সুখ দুঃখ, গুরুশিষ্য, শাস্ত্র, ঈশ্বর, পুনর্জন্ম, কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, সৃষ্টি-রহস্য, মায়াতত্ত্ব, মুনিবাক্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি অদ্বৈতবাদপ্রধান। সংসার দুঃখময়, সুখ-দুঃখাদি সমস্তই মায়াকল্পিত; এ জগতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং তিনিই উপাস্য, প্রতিমা-পূজাদি নিষ্ফল, এই তত্ত্ব ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় গুরু হইলেও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া জটিল বিষয়গুলি অনেক স্থলে সুখবোধ্য হইয়াছে।

কেশবজ্যোতি—নিস্তারিণী দেবী প্রণীত। কুন্তলীন প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

ইহা একখানি কবিতা গ্রন্থ। জ্যোতিরিন্দ্র-প্রসাদ নামক বিংশতিবর্ষীয় বালকের মৃত্যুতে তদীয় মাতৃস্বরূপা গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার কবিতাগুলি শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। লেখিকা শোকের মধ্যে মাঝে মাঝে স্বর্গীয় সান্ত্বনার ছায়া দেখিতে পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কবিতার বিশেষত্ব কিছুই নাই।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বৈষ্ণব সমাজে বিনামূল্যে বিতরিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে যে সকল

বৈষ্ণব মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণব সমাজকে সুপবিত্র ও সর্ব্বজনমান্য করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের দর্শনে ও সুমধুর উপদেশাবলী শ্রবণে কত নাস্তিক—কত পাষণ্ড উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থে সেই সকল বৈষ্ণব প্রভুর বন্দনা-গীতি প্রকাশিত হইয়াছে। পরিশেষে বৈষ্ণবগণের নামমালা মধুর সংস্কৃত ছন্দে প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই।

চাক্‌মা জাতি—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ এম, আই, আর, এস, প্রণীত। শ্রীযুত সারদাচরণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের কতকগুলি অধিবাসী চাক্‌মা জাতি নামে অভিহিত। এই পুস্তকে তাহাদেরই জাতীয় ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস, রাজপরিবর্ত্তন, স্থানীয় তত্ত্ব, মুসলমানশাসনকালে দেশের অবস্থা, চাকমা জাতি আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, খাদ্য ও পরিচ্ছদ প্রণালী, পর্ব্বাদি, কৃষিকার্য্য, ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার সহিত চাক্‌মা ভাষার সাদৃশ্য, ক্রীড়া-কৌতুক, জাতীয় উপকথা ও ছড়া প্রভৃতি বহু বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কয়েকটী চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ইতিহাস হইলেও সুপাঠ্য। ইহা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকারকে যে সবিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্ত তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা এইরূপ জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

সাহিত্য-সভার

১৩১৭ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতি

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সহকারি-সভাপতিগণ।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, সি, এস, আই, ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, এম, এ, ডি, এল, সি, এস, আই।

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বি, এ,।

শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, এফ, সি, এস,

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

সহযোগি সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ।

সাহিত্য-সংহিতা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র।

ধনরক্ষক।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বনোয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন।

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি,এইচ,ডি,।

শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল,।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ.।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এফ, আর, জি, এস।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মল্লিক।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এম, বি, এল।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী। *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বৃত্তি ও বেতন।

রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন আমি ১০ হইতে ১৫ টাকা—এই হারে বৃদ্ধি করিয়া দিলাম; অর্থাৎ যে ১০ টাকা বেতন পাইতেছিল, তাহার বেতন ১৫ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। শিক্ষানবিস ও সোলেখানার শিল্পিগণের বেতন ১০টাকা হইতে ১২ টাকা—এই হিসাবে বর্দ্ধিত হইল। আমার পিতার অন্তঃপুরে ১০০০ রমণী ছিলেন; তাঁহাদের দৈনিক বৃত্তি দুই আসরফি ছিল; আমি তাহা ৪ আসরফি করিয়া দিলাম; ইহা ব্যতীত বাৎসরিক ও বিশেষ উৎসব-উপলক্ষে তাঁহাদিগকে উপঢৌকন দিবার পদ্ধতি প্রচলিত করিলাম। আমার পিতার সময়ে রাজ্যের প্রত্যেক প্রধান নগরে ২০০০ ধর্ম্ম-যাজক ও ৩০০০ আইন ও সাহিত্য-ব্যবসায়ী সরকারী-বৃত্তি পাইতেন। আমি পিতার নিয়োগ-অনুসারে হিরাটের সৈয়দ-কুল-শ্রেষ্ঠ মীরণ সদর জাহজানকে (Jahzan) উহাঁদের স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদা-অনুসারে ভরণ-পোষণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত বৃত্তি দিবার আদেশ করিলাম। এই বৃত্তিটি যে কেবল আমার প্রজাস্থানীয়কে প্রদত্ত হইল তাহা নহে; পারস্য, রুম, বোখারা, আজেরবৈজান (Azerbaijan) প্রভৃতি অপর দেশবাসী-দিগকেও প্রদত্ত হইল। যাহাতে উহাঁদের কোন প্রকার অভাব বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তদ্বিষয়ে আমি মীরণ সদর জাহ্জানকে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিলাম। "ধন ঈশ্বরদত্ত, সকল শক্তিই তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইঁহারা তাঁহারই সেবক।" কোটী কোটী মানবের মধ্যে, এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরস্বরূপে ঈশ্বর আমাকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন; সুতরাং এই সকল ঈশ্বর-সেবকের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত না হয়, যাহাতে তাঁহাদের অভাব-মোচনে আমার কোন ত্রুটি না ঘটে, যাহাতে তাঁহারা আমার বিশেষ মনোযোগের পাত্র হন,—এই সকল বিষয়ে আমার দৃষ্টি রাখা সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য। যদি আমি ইহার বিপরীত আচরণ করি, তাহা হইলে সেই ভয়ানক হিসাব-নিকাশের দিনে আমার দায়িত্বের পরিমাণ কত ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা চিন্তা করিলে মনে বিষম ভীতি উপস্থিত হয়।

কারামুক্তি।

ইহার পরে আমি অপরাধিগণের

* Autodiographical Memoirs of tne Emperor Jahangir নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ।

অপরাধ মার্জ্জনা ও কারামুক্তি সম্বন্ধে একটি অনুজ্ঞা প্রচারিত করিলাম। একমাত্র গোয়ালিয়র দুর্গ হইতে সাত হাজার বন্দী মুক্তি প্রাপ্ত হইল; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চল্লিশ বৎসরের উপরও কারাবদ্ধ ছিল। হিন্দুস্থানের মধ্যে ২৪০০ প্রধান দুর্গ আছে; ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশে যে কত দুর্গ আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কারামুক্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা কত, ইহাতেই কতকটা উপলব্ধি হইবে। রাজা মানসিংহের ২৮০টি পুত্র ছিল; ইহারা এক সময়ে পিতৃদ্রোহী হয়। অতঃপর পর্ব্বতশিখরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃদত্ত শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে সেইখানে তাহারা লুক্কায়িত থাকে। অগণ্য দুর্গ সহিত সেই দূরাবস্থিত বঙ্গদেশ চারি বৎসরের মধ্যে আমার পিতা সম্পূর্ণভাবে হস্তগত, ও মানসিংহের পুত্রগণকে একে একে নিহত করেন। আর মানসিংহ শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া বিজয়ীর বশ্যতা স্বীকার করে।

নূতন মুদ্রা।

এক্ষণে আমি স্বর্ণ-রৌপ্য গালাইয়া স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচারিত করিবার আদেশ প্রদান করিলাম; এবং সে সকল মুদ্রার নব নব আখ্যা প্রদান করিলাম। দুই হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ-মোহরের নাম দিলাম—নুর-এ-সাহী (রাজ্যের আলোক); এক হাজার টাকা মূল্যের মোহরের নাম দিলাম—নুর-জাহান (পৃথিবীর আলোক); পাঁচ শত টাকার মূল্যের মোহরের নাম দিলাম—নুর-এ-দৌলৎ (বিভবের আলোক); একশত টাকা মূল্যের মোহর—নুর-মেহের (সূর্য্যের আলোক); এক টাকা মূল্যের মুদ্রার নাম—নুর উদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদ্‌সা (মহম্মদীয় ধর্ম্মের আলোক জাহাঙ্গীর সম্রাট্)। প্রত্যেক স্বর্ণ-মুদ্রার অনুরূপ আমি রৌপ্য-মুদ্রাও প্রস্তুত করাইলাম। প্রত্যেক মুদ্রার এক দিকে আমার রাজত্বকালের বর্ষ-সংখ্যা অঙ্কিত হইল, অপর দিকে আমাদের ধর্ম্মের স্বীকৃতিস্বরূপে নিম্নলিখিত কথাগুলি অঙ্কিত হইল—লা-ইলাহী-ইল্-উল্লা-মহম্মদ-উর্-রসুল্-উল্লা; অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই আর মহম্মদ ঈশ্বরের দূত।

আগ্রানগর।

আগ্রা সহর যে হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, এ কথা বলাই বাহুল্য। যে দুর্গ দ্বারা এই সহরটি রক্ষিত হইত, তাহা বহু পুরাতন হইয়াছিল। পিতা সেই দুর্গটি ভগ্ন করিয়া কর্ত্তিত প্রস্তর দ্বারা একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। সহরটি যমুনার উভয় কূলেই অবস্থিত। পশ্চিম কূলের সহরটি প্রস্থে দুই ক্রোশ, এবং পরিধিতে দশ ক্রোশ; অপর কূলের সহর প্রস্থে দুই ক্রোশ এবং পরিধিতে তিন ক্রোশ মাত্র। চতুর্দ্দিকেই সুবৃহৎ অট্টালিকা, মস্‌জিদ, পান্থশালা, এবং রাজপ্রাসাদ বিরাজিত। ইরাক, খোরাসান, এবং জেয়হুনএর (Jeyhoon) অপরদিকের রাজ্যের সুবিখ্যাত সহরসকলের সহিত তুলনায়, আগ্রা সহর হর্ম্ম-সম্পদে কিছুতেই হীন বলিয়া প্রতীত হইবে না। সাধারণ অধিবাসীদিগের গৃহগুলির অধিকাংশই ত্রিতল বা চতুস্তল। জনতার সংখ্যা এত অধিক যে, সান্ধ্য-উপাসনার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রির প্রথম ভাগের শেষ পর্য্যন্ত পথে লোকের যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

আগ্রার জনসংখ্যা।

আগ্রা সহরের জনসংখ্যা স্থূলভাবে নির্দ্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে আমি সহর-কোতোয়াল মৈলেক আলীকে একদিন

সহর ভ্রমণ করিয়া পালোয়ানদিগের প্রত্যেক আখড়ায় কত লোক উপস্থিত থাকে,তাহার গণনা করিতে বলিয়াছিলাম। সে গণনা করিয়া আমাকে বলিল যে, কোন আখড়ায় দুই বা তিন সহস্রের ন্যূনসংখ্যক লোক নাই। সে দিবস নববর্ষের প্রথম দিন বা অপর কোন আনন্দোৎসবের দিন ছিল না; সুতরাং ইহাতেই সহরের লোক-সংখ্যার একটা স্থূল হিসাব পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার দ্বারাও লোক-সংখ্যার একটি স্থূল ধারণা হইতে পারে। প্রতিদিন নৌকাযোগে যমুনা বাহিয়া দশ হাজার মোট্ জ্বালানী কাষ্ঠ বিক্রয় হইবার জন্য আসে। কাষ্ঠের কাট্‌তি এত অধিক যে, দরহাম মুদ্রা না দিতে পারিলে একখণ্ড কাষ্ঠও ক্রয় করিতে পারা যায় না। সমস্ত বৎসরের মধ্যে আট মাস বর্ষা থাকে না। এই আট মাসের প্রত্যহই কাবুল ও তন্নিকৃস্থ দেশসমূহ হইতে পাঁচ ছয় হাজার ঘোড়া সহরে বিক্রয়ার্থ আসে। ঘোড়াগুলি এত অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রীত হইয়া যায় যে, এক দিনের আমদানীর অবশিষ্ট পরবর্ত্তী দিনে একটিও থাকে না। মোট কথা, আয়-তনে এবং জনসংখ্যায় আগ্রার সহিত তুল-নীয় হয়, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন সহর আছে কিনা, তাহা আমি জানি না।

আগ্রার পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

আগ্রার পূর্ব্বসীমা কনোজ, পশ্চিমসীমা নগৌর, উত্তর সীমা সম্বল, এবং দক্ষিণ সীমা চান্দেরী। (এইখানে জাহাঙ্গীর সিরাজ-কবি কারুফ্‌ফি-রচিত আগ্রার প্রশংসাপূর্ণ একটি কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন)।

আফগানদিগের প্রাধান্যলাভের সময়ের পূর্ব্বেও আগ্রা একটি বৃহদায়তন সহর ছিল। সবক্তিজিনের বংশসম্ভূত ইব্রাহিমের পুত্র মামুদের সময়ে একজন গজনী-নিবাসী কবি আগ্রার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। হিন্দু-গণের গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যমুনা নদী যে সকল পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে, শীতাধিক্যবশতঃ সেখানে লোকে সহজে যাইতে অসমর্থ। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হাসেরাবাদ নামক স্থানে এই নদীটি প্রথমে লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। সেখানে ইহার স্রোত এত প্রখর যে, তাহাতে হস্তী পড়িলেও তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। আগ্রা দুর্গের পাদমূল হইতে এই নদীটি বক্রগতি হইয়া বাঙ্গালা প্রদে-শাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে।

গুয়ালিম বিরুদ্ধে গমন কালে সিকন্দর-লোদী স্বীয় রাজধানী দিল্লি হইতে যাত্রা করিয়া ফেলেন উপস্থিত হন, এবং অনতি-বিলম্বে দিল্লি হইতে রাজধানী উঠাইয়া আগ্রাতেই স্থাপিত করেন। পরিশেষে, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর যখন আমাদের সম্ভ্রান্ত বংশের হস্তে হিন্দুস্থান রাজ্য ন্যস্ত করেন, তখন আমার পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট্ বাবর, সিকন্দরলোদীর পুত্র ইব্রাহিমকে পরাভূত, দিল্লি নগর অবরুদ্ধ ও বঙ্গদেশ হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিলেন এবং আগ্রা সহরের জল-বায়ুর পক্ষপাতী হইয়া যমুনার অপর পারে একটি সুরম্য উদ্যান নির্ম্মিত করেন। তিনি উদ্যানের একাংশে হরিদ্বর্ণের প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি মনোহর অট্টালিকা প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন। অট্টালিকাটি চতুষ্কল; ইহার উপরে কুড়ি গজ পরিমিত একটি গম্বুজ বসান হয়; এবং ইহার চতুর্দ্দিকে চাক্‌-চিক্যময় মর্ম্মর স্তম্ভ সংযুক্ত একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হয়; সেই প্রকোষ্ঠের উপরাংশ স্বর্ণ ও লাপিজ-লাজুলি (Lapis Lazuli) নামক উপরত্নে খচিত এবং সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিসকল দ্বারা ভূষিত করা

হইয়াছিল। সেই উদ্যান মধ্যে সুপারী বৃক্ষ দ্বারা আবৃত একটি দুই ক্রোশ-ব্যাপী পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুপারীবৃক্ষগুলি এক একটি পঞ্চাশ হাত উচ্চ, এবং ইহার শাখাগুলি ছত্রের ন্যায় বিস্তৃত ছিল। বস্তুতঃ, আবৃত-পথ-রচনা-পক্ষে এই উচ্চ এবং মনোহর বৃক্ষের ন্যায় আর কিছুই নাই। উদ্যানের মধ্যদেশে এক ক্রোশ-ব্যাপী একটি জলাশয় খনন করা হইয়াছিল। পাথর দিয়া ইহার চারিদিক্ বাঁধান হইয়াছিল। জলাশয়ের মধ্যভাগে, আবশ্যক হইলে দুই শত লোকে বসিতে পারে,এইরূপ আয়তনের একটি দ্বিতল গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গৃহের দ্বার ও প্রাচীরগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সমন্বিত, এবং এই গৃহে আসিবার জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত ও খিলানযুক্ত একটি সেতু যোজনা করা হইয়াছিল। উদ্যানটি ২৫০ জরিব পরিমিত * ছিল, এবং "বেজুগ এ গুলাফ-সাওন" (গোলাপ বিস্তারকারী) এই নামে অভিহিত হইয়াছিল। উদ্যানের এক কোণে একটি বৃহৎ মস্জিদ নির্ম্মিত হয়, এবং উহার পার্শ্বে একটি আচ্ছাদন বিশিষ্ট কূপ খনন করা হয়। সম্রাট্ বাবর এই উদ্যানে নানাপ্রকার বিদেশীয় ফলের গাছ রোপিত করেন। ইহাদের মধ্যে "আনারস" উল্লেখযোগ্য। এই সুস্বাদু ফল ফিরিঙ্গীদিগের (পর্ত্তুগীজ) দেশে জন্মে। এইরূপ শোনা যায়, এক এক বৎসরে এই উদ্যানে প্রায় এক লক্ষ আনারস জন্মিত অন্য ফলের মধ্যে নানাজাতীয় আঙ্গুর, আপেল, সলেমান ও আব্বাসের খোবানী ও বে-আলু, উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত কাবুল বা পশ্চিমদেশজাত অনেক প্রকার ফলের গাছ রোপিত হইয়াছিল। এই

* এক জরিব এক একার (৩½ বিঘা) অপেক্ষা কিছু কম।

সকল ফল তৎকালে হিন্দুস্থানে অপরিচিত ছিল। জের (Zeir) বা জব্বরবাদ (Zubber bad) দ্বীপের প্রসিদ্ধ চন্দন গাছও রোপিত হইয়াছিল। আর, হিন্দুস্থানজাত ফলের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। ফুলের মধ্যে, সকল জাতীয় গোলাপ (বিশেষতঃ মস্ক ও ডামাস্ক জাতীয়) জেস্মিন ও গুল্ত্ চামেলী উল্লেখযোগ্য, শেষোক্ত ফুলটি হিন্দুস্থানে বিশেষ আদৃত। ফলতঃ, এই উদ্যানের ফল ও ফুল বর্ণনাতীত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পিতা আগ্রার দুর্গটি বুনিয়াদ হইতেই একেবারে সম্পূর্ণ নূতনভাবে রক্তবর্ণ প্রস্তরে গঠিত করিয়াছিলেন। ইহার চারিটি প্রধান প্রবেশদ্বার ও আক্রান্ত হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইবার জন্য পশ্চাদ্ভাগে দুইটি দ্বার (Sally ports) আছে। দুর্গটি পিতার শক্তির স্মরণস্তম্ভস্বরূপ। ইহার গঠনকার্য্য এতই নিখুঁত যে, মনে হয় বিশ্ব-শিল্পী বুঝি একখানি পাথরে এই দুর্গটি নির্ম্মিত করিয়াছেন। কেবল ইহার শিল্পকার্য্যেই ১৮৬ লক্ষ আসরফি ব্যয়িত হইয়াছিল।

* সম্রাটের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া দরবারের অমাত্যগণ ও প্রজাবর্গ স্ব স্ব মর্য্যাদা-অনুসারে সহরের মধ্যে এবং নিকটবর্ত্তী চতুর্দিকৃস্থ স্থানে সুবৃহৎ ও সুরম্য অট্টালিকা ও উদ্যানাদি নির্ম্মিত করিয়াছিল। বাস্তবিক, আগ্রা অতি আশ্চর্য্য সহর। লোকে ইহাকে গোয়ালিয়ার ও মথুরার সহিত এক শ্রেণীতে আসন দিয়াছে। হিন্দুরা ভ্রমবশতঃ যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, মথুরা সেই কৃষ্ণের জন্মস্থান। হিন্দুরাও এই তিনটি সহরকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর বলিয়া প্রশংসা করে।

প্রসঙ্গতঃ বলি, রাজা মানসিংহ

বেনারস সহরে প্রায় ৩৬ লক্ষ আসরফি ব্যয় করিয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরস্থ প্রধান দেবমূর্ত্তির মস্তকে তিন লক্ষ আসরফি মূল্যের একটি মুকুট ছিল। এই মূর্ত্তির সহচর বা অনুচর স্বরূপে চারিটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক মূর্ত্তির মস্তকে বহুমূল্য রত্নখচিত মুকুট ছিল। জাহান্নমবাসী হিন্দুগণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রধান মূর্ত্তির সম্মুখে কোন ভক্ত হিন্দুর শবদেহ স্থাপিত হইলে, দেহটি আবার জীবন প্রাপ্ত হয়। কথাটা নিতান্তই অবিশ্বাস্য বলিয়া আমি জনৈক বিশ্বাসী ব্যক্তিকে ইহার তথ্য জানিবার জন্য নিযুক্ত করি। অনুসন্ধানের ফলে জানিলাম, আমার ধারণাই সত্য; ব্যাপারটি প্রবঞ্চনা-মূলক। আমি এই প্রবঞ্চনার কার্য্যস্থান মন্দিরটি ভূমিসাৎ করিতে আদেশ দিলাম; এবং সেই স্থানে উহারই মাল মসলা লইয়া একটি বৃহৎ মুসজিদ নির্ম্মাণ করাইলাম। বেণারসে ইস্লাম ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত করিবার নিষেধ ছিল। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি যদি জীবিত থাকি, এই স্থানটি বিশ্বাসী লোকে পরিপূর্ণ করিব।

পৌত্তলিকতার লীলাভূমি হিন্দুমন্দির সম্বন্ধে পিতা হস্তক্ষেপ করিতে কর্ম্মচারিগণকে নিষেধ করিতেন। এক সময় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় পিতা আমাকে বলেন,—"বৎস! পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া-স্বরূপ আমি শক্তিশালী সম্রাট্। আমি দেখিয়াছি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তিনি সকলকেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ বিতরণ করেন। আমার উপরে যাহাদের ভার ন্যস্ত, তাহাদিগকে যদি আমি আমার স্নেহ ও দয়া হইতে বঞ্চিত করি, তাহা হইলে আমার সমুন্নত পদ-মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। ঈশ্বর-সৃষ্ট সমগ্র মানবজাতির সহিত আমার প্রীতি আছে; তবে কি জন্য আমি জাতি-বিশেষের উপর অত্যাচার করিব? আরও দেখ, সমস্ত মানবজাতির ছয় ভাগের পাঁচভাগ হয় হিন্দু, অথবা মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী অপর ধর্ম্মাবলম্বী; তুমি প্রশ্ন দ্বারা যাহা ইঙ্গিত করিলে, আমি যদি সেই ভাবে কার্য্য করি, তাহা হইলে ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে হনন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব বৎস, উহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়াই বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছি। আর একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যাহাদের কথা হইতেছে তাহারা আগ্রার অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায়, শিল্প, বিজ্ঞান, বা সাধারণ হস্তকর কার্য্যে নিযুক্ত আছে এবং বহুলাংশে রাজ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত আছে। এই সহরে সকল শ্রেণীর লোক এবং পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক বিদ্যমান আছে।"

কারারুদ্ধ খসরু।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে আগ্রা-দুর্গস্থ রাজপ্রাসাদের একটি দ্বিতল গৃহে বন্দীভাবে রাখিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। যদিও তাহার বিদ্রোহিতা ও অপুত্রোচিত আচরণ সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তথাপি আমি তাহার সহিত নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া কারা-গৃহে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম। তিন লক্ষ আসরফি তাহার মাসিক বৃত্তিস্বরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম; তাহার সন্তানেরা সপ্তাহে একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থাও করিলাম।

অত্যাচার-দমন-স্পৃহা।

সায়েদ খাঁ নামক জনৈক মোগল আমার পিতার নিকট কর্ম্ম করিত। ইহার পূর্ব্ব

পুরুষগণ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের অধীনে চিরদিনই কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। আমি সায়েদ খাঁকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ও লাহোরে অবস্থিত সেনাগণের অধ্যক্ষস্বরূপে নিযুক্ত করিলাম। এই নিয়োগ-উপলক্ষে আমি তাহাকে একটি হস্তী, একটি সুসজ্জিত ঘোটক, আমার নিজের পরিচ্ছদাগার হইতে একটি সম্মান-সূচক পরিচ্ছদ, রত্ন খচিত একটি কটিবন্ধ, একটি শিরপেঁচ, ও একটি কিরীচ প্রদান করিলাম। তাহাকে বিদায় দিবার অল্পকাল পরেই শুনিলাম যে, তাহার কোন কোন অনুচর দুঃস্থ ও অধীন ব্যক্তিগণের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। আমি কালবিলম্ব না করিয়া মহম্মদ ইয়াহেয়ার পুত্র খাজা সাদেককে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম এবং তাহাকে এই কথা বলিতে আদেশ করিলাম যে, আমার চক্ষে ছোট-বড় সকলেই সমান; আর অত্যাচার উপেক্ষা করা ন্যায়পরতার বিরোধী কার্য্য; "সলোমনের গৌরব কি পৃথিবীর সকল নৃপতির গৌরব অতিক্রম করে নাই? তাঁহার ন্যায়পরতাই সেই গৌরবের একমাত্র কারণ।" খাজা সাদেককে আরও বলিয়া দিলাম যে, অতঃপর সায়েদ খাঁর অনুচরগণের কৃত সামান্য অত্যাচার-কথা আমার শ্রুতি-গোচর হইলে আমি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনস্বরূপ অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিব। আমার আজ্ঞা পাইয়া সায়েদ খাঁ একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে অর্পণ করিল পত্রের মর্ম্ম এই যে, লেখক স্বয়ং কিংবা তাহার অধীন কোন ব্যক্তি যদি অত্যাচার বা অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে লেখক স্বীয় মস্তক দণ্ডস্বরূপ আমার হস্তে অর্পণ করিবে।

হস্তিশালা।

আহার্য্য ও পানীয় দানের সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশে আমি সরকারী প্রত্যেক সহস্র হস্তীর জন্য এক একটি তত্ত্বাবধায়ক (ফৌজদার) নিযুক্ত করিলাম। সরকারী হাতীর সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে; তবে যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী বার হাজার হাতী ছিল। সেগুলি আকারে ও স্বভাবে সমশ্রেণীয়। ইহাদের খাদ্যাদি যোগাইবার জন্য হাজার হাতী ছিল। ইহা ব্যতীত, রাজান্তঃপুরবাসিনীগণের বহনের জন্য, এবং রৌপ্যনির্ম্মিত বাসন, কার্পেট ও বস্ত্রাদি বহনের জন্য এক লক্ষ হাতী ছিল। আমার বাহিনীর অন্তর্ভূত সমস্ত হাতীর জন্য ৪৬০ লক্ষ আসরফি * প্রত্যেক বৎসরে ব্যয় হইত। ইহা ছাড়া, প্রত্যেক হাতীর পরি-চর্য্যার জন্য পনর জন লোক আর প্রত্যেক হাজার হাতীর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য হাজার সিপাহী নিযুক্ত ছিল।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিব। জনৈক হস্তি-তত্ত্বাবধায়ক একদিন আমাকে বলিল যে, আম্মাদী হোসেনী বেগের পুত্র সুলতান আমেদ, জৈনী খাঁ কুকার পুত্র সুক্কর আল্লাকে, ৬০,০০০ আসরফি মূল্যে একটি প্রথম শ্রেণীর হস্তী বিক্রয় করিয়াছে। কথাটি শুনিয়া আমি সুলতান আমেদকে হস্তি-পদতলে পাতিত করিয়া হনন করিবার সংকল্প করিলাম; কারণ এই শ্রেণীর হস্তীকে কেহ রাজকার্য্য ব্যতীত অন্য গুরুতর প্রয়োজনীয় কার্য্যে ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, এই মর্ম্মে আমি একটি বিধির প্রচার করিয়াছিলাম। কিন্তু এই বিধির উল্লঙ্ঘন জন্য ঈশ্বরসৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে

* আসরফির মূল্য ১৫ টাকারও কম হইতে পারে। আবুল ফজল তাঁহার রচিত ইতিহাসের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, আসরফির মূল্য নয় টাকা। হাতীর সংখ্যা নির্ণয় বা ব্যয় সম্বন্ধে মূলের অনুলিপিকার ভুল করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৮

বিনষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি অপরাধীর দোষ-প্রক্ষালন-অভিপ্রায়ে তত্ত্বাবধায়ককে বলিলাম, সুলতান আমেদ বেশ করিয়াছে; স্বীয় সম্পত্তি সম্বন্ধে সকলেরই কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত। তত্ত্বাবধায়ককে সুলতান আমেদের অযথা নিন্দাকারী বলিয়া তিরস্কার করিলাম, আর এইরূপ কথার আলোচনা আমার সমক্ষে পুনরায় করিলে তাহাকে যে কঠিনভাবে দণ্ড দিব, এ কথাও বুঝাইয়া দিলাম।

কর্ম্মচারিনিয়োগ।

বোখারাবাসী কেখ ফরীদকে আমার পিতা মীরবক্সী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে সেই পদেই বাহাল রাখিলাম, এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাকে একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও রত্ন-খচিত তরবারি দিলাম। উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে বলিলাম যে, তুমি লেখনী ও তরবারি চালনা এই উভয় কার্য্যেই তুল্যরূপে উপযুক্ত। পিতা মথীম খাঁকে "উজীর খাঁ" এই উপাধি দিয়াছিলেন। আমি এই উপাধি বাহাল রাখিয়া তাঁহাকে উজীরের কার্য্যেই নিযুক্ত করিলাম। খাজেকী ফতে উল্লাকে আমি প্রাসাদের প্রধান ভাণ্ডারীস্বরূপে নিযুক্ত করিলাম। আব্দর রেজাক মানমোরী নামে জনৈক গৃহনির্ম্মাণকুশল শিল্পী আমার নিকট হইতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পিতা তাহাকে বক্সী শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে সেই মর্য্যাদাই দান করিয়া সেনা-বিভাগে নিযুক্ত করিলাম এবং একটি সম্মান-সূচক পরিচ্ছদ দিলাম। স্থূল কথা, কি গৃহকার্য্যে, কি রাজকার্য্যে, পিতা যে যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস-পাত্র মনে করিয়া উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমি সেই সেই ব্যক্তিকে সেইরূপ মনে করিলাম ও সেই সেই কার্য্যেই নিযুক্ত রাখিলাম; অধিকন্তু তাহাদের গুণানুসারে পদ বা মর্য্যাদা বর্দ্ধিতও করিলাম।

চিত্রকর আবদুল হামিদের পুত্র সরিফ খাঁ আমার সমবয়স্ক এবং শৈশব হইতেই আমার সহচর। আমি যখন যুবরাজ ছিলাম, তখন উহাকে আমি "খাঁ" উপাধি দিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি তাহাকে "আমীর-উ-উলমরা" (সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রান্ত ব্যক্তি)—এই উপাধি দিলাম। আমার বিশেষ অনুগত বলিয়াই তাহাকে এই উচ্চ সম্মান দেওয়া হইল। আমি তাহাকে ভাই, কি বন্ধু, কি পুত্র, কি অবিচ্ছেদ্য সহচর বলিব, তাহা ভাবিয়া পাই না। আমার শরীরের প্রত্যঙ্গের ন্যায় সে আমার প্রিয়। কি গুণে, কি অভিজ্ঞতায়, এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহার সমতুল্য ব্যক্তি নাই। তাহার উপযুক্ত কোন্ উপাধি বা পদ আছে, তাহা আমি বিশেষ ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। পিতা কোন আমীরকে "পাঁচ হাজারীর অধিনায়ক" অপেক্ষা উচ্চতর সম্মান দেন নাই। কারণ যদি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি দেখে যে, অনেক সেনা তাহার অধীনে আছে, তাহা হইলে প্রায়ই সে বিশ্বাসহন্তা বা বিদ্রোহব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। পিতৃপ্রচলিত এই নিয়মটি যুক্তি-সঙ্গত মনে করিয়া আমি সরিফ খাঁকে "পাঁচ-হাজারী"র উচ্চ পদ দিলাম না। তথাচ আমি মনে করি যে, এই পদ আমীর-উল্-উমরার পক্ষে অনেক নিম্ন। আমি তাহাকে বলিলাম, আমার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই তোমার বলিয়া জানিবে। সে বলিল যে, যতদিন সে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, ততদিন সে আমার নিকট "পাঁচ হাজারী"র উচ্চ সম্মান লইবে না। অগত্যা আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম।

এখানে সরিফ খাঁ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিতেছি। আমি যে সময়ে এলাহাবাদ হইতে পিতার সন্নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করি, সেই সঙ্কটের সময়ে যে সকল বিশ্বস্ত আমীর আমার সমভিব্যাহারে ছিল, সরিফ খাঁই তাহাদের মধ্যে প্রধান। আমার সিংহাসন আরোহণের যোল দিন পরে সে যখন আমার সমক্ষে আসিয়া রাজকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার অভিপ্রায় জানাইল, তখন আমার মনে হইল, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমাকে নবজীবন দান করিলেন, আর আমার প্রতীতি হইল, তাঁহার চক্ষু আমার উপরে স্থাপিত আছে। আমার তখন আরও মনে হইল যে, এই আমীর-উল্ উমরার স্নেহাসক্তির প্রভাবেই আমি আজ রাজরাজেশ্বর। যদি কখন কোন বিপদে পড়ি, এই আমীর-উল্-উমরাই নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আমাকে রক্ষা করিবে। ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবমাত্রেরই রক্ষক, এ কথা সত্য; তত্রাচ আত্মজ্ঞান থাকা রাজগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমি আমীর-উল্ উমরাকে যে দিন "পাঁচ হাজারী" উপাধি দান করিয়া, বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত করিয়া, সঙ্গে বৃহৎ দামামা ও নিশান দিয়া, তাহার সামীপ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া, তাহাকে বিদায় দিলাম, সে দিনটি আমার জীবনের কি মসীময় দিন! সরিফ খাঁর পিতা সিরাজবাসী ছিলেন, এবং পিতামহ সিরাজের অধীশ্বর সাহ সুজার উজীর ছিলেন। সরিফের পিতার সহিত আমার পিতামহ হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি আমার পিতার রাজত্বকালে দরবারের জনৈক উচ্চতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাতৃপক্ষে হজরত মহম্মদের বংশধর বা সরিফ ছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত জাফ্‌র্ নামাও মৎলা-উল্-সাদীন নামক গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত আছে।

মহিষী ও পুত্রগণ।

রাজা মানসিংহের সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত হইলেও, কতিপয় কারণে আমি তাঁহাকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হই। এই উপলক্ষে তাঁহাকে একটি সম্মান-সূচক পরিচ্ছদ, একটি রত্নখচিত তরবারি, আর আমার হাজার আসরফি মূল্যের অশ্বগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্বটি (কুখ্ পারহ), প্রদান করিলাম। এই রাজা মানসিংহের পিতামহ ভারমল, * রাজপুত সামন্তগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই পিতার রাজ্য শাসনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ভারমল সাহসিকতা, বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতায় তাঁহার জাতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইবার অভিপ্রায়ে, ভারমলের কন্যাকে পিতা প্রাসাদান্তঃপুরে রাখেন, এবং পরিশেষে তাহাকে আমার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। আমার পুত্র খস্রু এই রাজকন্যারই গর্ভজাত। খসরুর জন্মকালে আমার বয়স ১৭ বৎসর; এক্ষণে তাহার বয়স ২০ বৎসর। ঈশ্বর করুন, সে যেন ১২০ বৎসর জীবিত থাকে; কারণ এখনও পর্য্যন্ত তাহার আচরণে আমি সন্তুষ্ট আছি, আর আশা করি, সকল সময়েই যেন তাহার আচরণ ঈশ্বরানুমোদিত হয়। এখনও পর্য্যন্ত তাহার নিকট অনুরক্তি এবং বিশ্বস্ততা ভিন্ন আর কিছুই পাই নাই। † খস্রুর জন্মের এক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত রাজকন্যার গর্ভে আমার একটি কন্যা জন্মে। সেইটিই আমার প্রথম সন্তান।

খস্রুর জন্মের পরে, কাসোবার

* বিহারীমল। রাজা মান সিংহ ইহার ভ্রাতষ্পুত্র বলিয়া বিদিত।

† ছয় মাস না যাইতেই পুত্র প্রশংসাকারী পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ইহার পূর্ব্বেই তাহার পিতৃভক্তির প্রতিকূল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

অধিপতি সুলতান গৌরঙ্গের পুত্র সায়েদ খাঁর কন্যার গর্ভে আমার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সে কন্যাটিকে আমরা উফৎবাণী বেগম এই নাম দিয়াছিলাম। সে কন্যাটি তিন বৎসর কালমাত্র জীবিত ছিল। তাহার পরে জৈনী খাঁ খুকার ভ্রাতুষ্পুত্রী সাহেবা জামালের গর্ভে, কাবুল সহরে আমার একটি পুত্র জন্মে। পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—পরভেজ। ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি, এই পুত্রটি যেন মনুষ্যের পরমায়ুর শেষ সীমা পর্যন্ত জীবিত থাকে; কারণ ইহার কার্য্য-কুশলতা ও চরিত্র-বল দেখিয়া আমার মনে হয় যে, ইহার নিকট আমি অনেক আশা করিতে পারি। ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন কার্য্যে উদয়-পুরের রাণার বিরুদ্ধে আমি পরভেজকে প্রথম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি। আজ ২৪ মাস হইল, তাহাকে পাঠান হইয়াছে। যে সকল আমীরকে তাহার অধীন করিয়া সঙ্গে পাঠাইয়াছি, তাহারা সকলেই তাহার আচরণের প্রশংসা করিয়াছে। এ কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহার সঙ্গে বিশ হাজার অশ্বারোহী আছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই তিনটি করিয়া অতিরিক্ত অশ্ব আছে।

তাহার পরে লাহোর পর্ব্বততলবাসী দরিয়া কম (Derya Comm) নামক জনৈক পরাক্রান্ত রাজার কন্যার গর্ভে আমার দৌলত-ই-নিসা নাম্নী একটি কন্যা জন্মে। কন্যাটি ৭ মাস মাত্র জীবিত থাকে। রায়পুর-বংশীয়া বিবি করমীতির গর্ভে, ইহার পর আর একটী কন্যা জন্মে। তাহার নাম বাহার বানু বেগম রাখা হইয়াছিল। সেটী দুই মাস কাল জীবিত ছিল। পরে জগৎ গোঁসাইনীর গর্ভে বেগম সুলতান নাম্নী একটী কন্যা জন্মে। সেটী এক বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিল না। লক্ষ্মৌ রাজার কন্যা সাহেবা জামালের গর্ভে ৭ দিন পরমায়ু লইয়া একটী কন্যা জন্মে। তাহার পরে মোটা রাজার * কন্যা জগৎগোঁসাইনীর গর্ভে আমার পুত্র খরম † জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটী যেরূপ মেধাবী, তাহাতে আমি আশা করি যে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সে সকল গুণে গুণবান্ হইয়া অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিবে। খরমের মাতামহ উদিসিংহ ৮০ হাজারি অশ্বের অধিকারী এবং হিন্দুস্থানের জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। খরম আমার পিতাকে সাতিশয় ভক্তি করিত; পিতাও আমার সকল সন্তান অপেক্ষা ইহাকে অধিক ভাল-বাসিতেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিয়া-ছিলেন যে, খরমের মত গুণবান্ পুত্র আমার আর নাই। বোধ হয়, তখন সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়াই খরম সকলের এইরূপ প্রীতিভাজন হইয়াছিল।

ইহার পরে, যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত কাশ্মীর-রাজকন্যার গর্ভে বৎসর কাল জীবিত একটী কন্যা জন্মে। মির্জা কামরাণের দৌহিত্র ইব্রাহিম হোসেনী মির্জার কন্যা সালী বেগমের গর্ভে একটী আট মাস কাল জীবিত কন্যা জন্মে। তাহার পরে পরভেজ-মাতার গর্ভে একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে; এটী পাঁচ মাসকাল জীবিত ছিল। পরে খরম-জননীর গর্ভে লজ্জৎ-উল্-নিসা নাম্নী একটী কন্যা জন্মে; এটী পাঁচ বৎসর কাল জীবিত ছিল। পরে পরভেজ-জননীর গর্ভে আর একটী পুত্র জন্মে। আমার সিংহাসন আরোহণ কালে ইহার নাম রাখা হয় জাহান্দর। সর্ব্বশেষে খরম-জননীর গর্ভে সাহরিয়র নামে আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জাহান্দর ও সাহরিয়র একই মাসে ভূমিষ্ঠ হয়।

* রাজা উদিসিংহের উপাধি।
† ইনিই পরে সাহজাহন নামে আখ্যাত হন।

ক্রমশঃ

শ্রীমধ্বাচার্য্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বৈরাগ্য।

যথাসময়ে মধ্যগেহ বাসুদেবের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। এই পাঠশালা বঙ্গদেশের "গুরুমহাশয়ের" পাঠশালা নহে। ইহা বৈদিক বিদ্যালয়। শ্রীমান্ বাসুদেব সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালকগণের সহিত সেই বিদ্যালয়ে বেদাভ্যাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পাঠে তাঁহার মন লাগিত না। পাঠাভ্যাস অপেক্ষা ব্যায়ামাদি ক্রীড়া-কৌতুকই তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল, সুতরাং তিনি প্রায়ই পাঠশালায় অনুপস্থিত থাকিতেন এবং সর্ব্বদাই হাডুডু, কপাটী, দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি প্রভৃতি খেলায় মগ্ন থাকিতেন। প্রত্যহ এইরূপ শারীরিক পরিশ্রমের ফলে বালকের দেহ অসাধারণ স্বাস্থ্য-শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল এবং বাসুদেব গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী বালক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। ব্যায়ামে, সন্তরণে, দৌড়াদৌড়িতে, লম্ফপ্রদানে, বাসুদেব সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠিলেন এবং সকলে তাঁহাকে "ভীম" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এই শারীরিক শক্তিবলেই বাসুদেব বাল্যে "ভীম" আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিলেন এবং বাল্যের উপাধিই পরে তাঁহার অবতারত্বলাভের কারণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। শৈশবে যাহা কেবল প্রশংসাত্মক বিশেষণমাত্র ছিল, উত্তরকালে ভক্তগণের উৎসাহ এবং আগ্রহের ফলে তাহাই অবতারত্বের প্রমাণরূপে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীমান্ বাসুদেব বাল্যকালে শরীর পরিচালনায় যেরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, মস্তিষ্ক পরিচালনায় সেরূপ পটুতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার আচার্য্য শিষ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান হইয়াছিলেন, এমন কি বাসুদেবের বিদ্যার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিভার অসাধ্য কিছুই নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পর বাসুদেবের মন ফিরিল। তখন তিনি পাঠে মন দিলেন এবং নিজ অলৌকিক প্রতিভাবলে অত্যল্পকালের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানের অর্গলস্বরূপ ব্যাকরণ-শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ বেদবেদান্তের মহিমা তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে লাগিল। শাস্ত্রানুশীলনের ফলে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল এবং সংসারের অসারতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে বৈরাগ্যবুদ্ধির উদয় হইল। বাসুদেব পুরাতন মুনিঋষিদিগের পদবী অনুসরণপূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং জনকজননীকে স্বীয় অভিসন্ধির কথা জানাইলেন।

বাসুদেবের এই বাক্য পিতামাতার মর্ম্মভেদ করিল, তাঁহারা কেমন করিয়া তাঁহাদের সেই অন্ধের নয়নমণি, অঞ্চলের নিধি, একমাত্র পুত্রকে বিসর্জ্জন দিবেন? এই সংবাদে তাঁহারা একেবারে আকুল হইয়া উঠিলেন, দশদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, ভয় দেখাইলেন, পুত্র তথাচ দৃঢ়সংকল্প; তিনি একটুকু বিচলিত হইলেন না। অবশেষে

নিরুপায় হইয়া পিতামাতা বলিলেন; "বাবা, তুমি সন্ন্যাসী হইলে আমাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া কে করিবে? আমাদিগকে এক বিন্দু জল কে দিবে? কে আমাদিগকে ঘোর নরকার্ণব হইতে পার করিবে? বাসুদেব গম্ভীর, অথচ মধুরস্বরে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, আপনারা কেন অনর্থক আশঙ্কা করিতেছেন? আমি সত্য বলিতেছি, অত্যল্পকালের মধ্যে আমার একটী ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই আপনাদিগের শ্রাদ্ধতর্পণাদি পুত্রোচিত কার্য্য করিবে। আপনারা দেখুন, আমার কথা সত্য হয় কিনা। আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আপাততঃ গৃহেই থাকিলাম; ভ্রাতা জন্মিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদিগের কোন আপত্তি থাকিবে না ত?" অগত্যা পিতামাতা নিরস্ত হইলেন এবং বাসুদেব ব্রহ্মচর্য্য পরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহে থাকিয়া নানাবিধ শাস্ত্রানুশীলনে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বাসুদেবের বাণী সফল হইল এবং অত্যল্পকালের মধ্যে মধ্যগেহ বৃদ্ধ বয়সে পুনশ্চ পুত্রমুখ সন্দর্শন করিলেন। এখন আর বাসুদেবের বৈরাগ্য-পথে কোন বাধা রহিল না। ঠিক এই সময়ে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ নামক এক বৈদান্তিক সাধু বাসুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বাসুদেব তাঁহার শিষ্যত্ব পরিগ্রহ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত-প্রমুখ ভক্তগণ বলিয়াছেন যে, শ্রীমান্ প্রভু নবম বৎসর বয়সে বৈরাগ্য গ্রহণ করেন; কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচকগণের মতে তিনি পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সেই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই শেষোক্ত মতই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। ভক্তগণ আচার্য্যদেবের অবতারত্ব অথবা অলৌকিকত্ব-স্থাপনের অভিপ্রায়ে অতি তরুণবয়সেই তাঁহাকে সন্ন্যাস দান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

নবীন সন্ন্যাসী বাসুদেব তাঁহার গুরু অচ্যুতপ্রেক্ষ স্বামীজির সহিত অনন্তেশ্বরের মঠে বাস করিতে লাগিলেন এবং গুরুশিষ্যে বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনে সময় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বাসুদেবের তীক্ষ্নবুদ্ধি ও সুপটু তর্কশক্তির প্রভাব গুরুকে অভিভূত করিতে লাগিল। বেদান্তের প্রচলিত অর্থ বাসুদেবের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইত না, এবং তিনি ঐ সকল পুরাতন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সকল গূঢ় প্রশ্নের অবতারণা করিতেন, গুরু সে সকলের সদুত্তর দিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ গুরুর মনেও সেই সকল সিদ্ধান্তের উপর সন্দেহ আসিয়া পড়িল এবং তিনি ঐ সকল সমস্যার নূতন মীমাংসা খুঁজিতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে অনন্তেশ্বরের মন্দিরে এক উৎসব-কাল উপস্থিত হইল। অসংখ্য নরনারী সেই উৎসবোপলক্ষে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমুপস্থিত। হঠাৎ দর্শকবৃন্দের মধ্যে এক ব্যক্তির উপর নারায়ণ আবির্ভূত হইলেন, সেই ব্যক্তি স্বামী অচ্যুতপ্রেক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বৎস! তুমি এত কাল যাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছ,—চাহিয়া দেখ, সেই বাঞ্ছিত বস্তু তোমার সম্মুখে। এই বাসুদেব আমার প্রিয় সখা,—তোমার গতিমুক্তির হেতু।" এই দৈববাণী ঘোষণা করিয়াই নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে স্বামীজির জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইল। কয়েক দিন পরেই স্বামী অচ্যুতপ্রেক্ষ নিয়মিত ভাবে শিষ্যকে "শ্রীস্বামী আনন্দতীর্থ বেদান্তরাজ" এই উপাধি দান করিয়া নিজে তাঁহার অধীনতা এবং আনুগত্য স্বীকার করিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য নিজ কৃত সমুদয় গ্রন্থে গুরুদত্ত নাম "আনন্দতীর্থ" ব্যবহার করিয়াছেন।

এখন হইতে আমাদিগের চরিতনায়ক অনন্তেশ্বরমঠের মঠাধিপ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মঠের সন্ন্যাসিগণকে শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম ও তপস্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

মানদা।

(১)

শশীর সহিত কিংবা চারুতার সহিত একাদশবর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী চারুশশীর কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য ছিল কি না, তাহা বলিতে আমরা সাহস করি না। চারু-শশীর রূপ-গরিমা-সম্বন্ধে তাহার পাড়া-বিজয়িনী মাতা যে সকল সাহঙ্কার অভিমত ঘোষণা করিয়াছিলেন, কাহার সাধ্য—কাহার একটি স্কন্ধের উপর দুইটি মস্তক আছে যে, সে মতের প্রতিবাদ করে; কিন্তু একটি বিষয়ে গগনবিহারী বিধুর সহিত বিধুবদনা চারু-শশীর খুব সৌসাদৃশ্য ছিল;—তাহার ক্ষুদ্র দেহটি শশিকলার ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যে আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং তাহার এই অযথা দেহ-সৌষ্ঠব দেখিয়া তাহার পিতা, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাভারের গুরুত্ব সবিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি ঘটকগণের স্তবস্তুতি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি একটি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা দেশে সুপাত্রগুলি দুষ্প্রাপ্য পণ্য হইলেও আমরা দেখিয়াছি, প্রায় সকল কন্যারই এক একটী বর মিলে। চারুশশীরও একটী বর মিলিল। বরকর্ত্তা, কন্যাকে দেখিবার একটা শুভ দিন স্থির করিয়া, গোবিন্দ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। চারুশশীকে, সমবেতা শশিমুখিগণের বিধানা-নুরূপ, মার্জ্জিত, ঘর্ষিত এবং বস্ত্র ও অলঙ্কার-ভারে সম্যক্ প্রপীড়িত করিয়া এবং তাহার চক্ষু দুইটী মুদ্রিত রাখিবার জন্য সবিশেষ উপদেশ দিয়া, বহির্বাটীতে উপস্থিত করা হইল। যে কক্ষে চারুশশী আনীতা হইল, তাহার গবাক্ষসকলের লৌহদণ্ড ধরিয়া, পাড়ার ও ওপাড়ার যাবতীয় বালিকাগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাদের কৌতু-হল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য তারার ন্যায়, চারুশশীকে ঘিরিয়া রহিল। এই সকল চক্ষুর মধ্যে একজোড়া চক্ষু অত্যন্ত বিশাল,—বর্ণনাতীত কমনীয়। সেই চক্ষুর দিকে বরকর্ত্তার দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হইল। তিনি চারুশশীকে বলিলেন, "বস, মা, বস।" তাহার পর গবাক্ষ-পথ-দৃষ্ট সেই দুইটী বিশাল চক্ষুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "গোবিন্দ বাবু, ঐটী কাহার কন্যা?" গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "ও অম্বিকা—ও পাড়ার কৃষ্ণ চাটুর্য্যের মেয়ে।"

বরকর্ত্তা। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে? কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কি করেন, মহাশয়?

গোবিন্দ। কিছুই করেন না। পাঁচ জনকে প্রবঞ্চনা করে, তাঁর বাপ কিছু টাকা রেখে গিয়াছিল, তাই ঘরে বসে বসে নবাবী করেন। এমন অহঙ্কারী আত্মম্ভরী লোক মহাশয়, দেখা যায় না। ভদ্রলোক গেলে কথা ক'ন না; চশমা নাকে দিয়া কেবল পড়েন। ছি! মেয়েটাকেও

মহাশয়, পড়াইয়া পড়াইয়া মাটী করিয়া দিয়াছেন।

বরকর্ত্তা কৃষ্ণ চাটুর্য্যের নিন্দাটা বিশেষ রূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি সেই মাটী-করা নলক-পরা ইন্দিরাক্ষি বালিকার দিকে চাহিয়াছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া মনে করিয়াছিলেন, যদি এই লক্ষ্মীস্বরূপাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার গৃহে আর কখন অপ্রাচুর্য্য থাকিবে না; এ লক্ষ্মীর পদক্ষেপে আমার সংসার নিশ্চিত ধনধান্যপূর্ণ হইবে। এই সকল কথা মনে করিয়া তিনি গোবিন্দ বাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার কন্যাকে দেখিলাম, দিব্য মেয়ে। কিন্তু আজ 'আশীর্ব্বাদ' করিব না। 'আশীর্ব্বাদ' সম্বন্ধে পরে আপনাকে সংবাদ দিব।"

জলযোগের পর বরকর্ত্তা অম্বিকা ও তাহার কতকগুলি সঙ্গিনী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া অহঙ্কারী আত্মম্ভরী কৃষ্ণ চাটুর্য্যের বাসগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় মূর্খ নহেন; বরকর্ত্তার অভিলাষ কি, তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইল না। তিনি গৃহিণীর নিকট সমাগত হইয়া নিজ বক্ষে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "বৃথা গোবিন্দ নাম ধরি যদি ইহার প্রতিকার করিতে না পারি।" গৃহিণী সা, নি, ধা, এই তিন সুরে তিন বার বলিলেন "কি, কি, কি?" গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "আবার কি? এই বয়সে এত বড় কলঙ্কিনী দেখা যায় না;—চোখ ঘুরাইয়া বরকর্ত্তাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।" পা, মা, গা,—এই তিন সুরে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, কে, কে?" গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "আবার কে? ও পাড়ার কৃষ্ণ চাটুর্য্যের মেয়ে অম্বিকা, গৃহিণী গর্জ্জন করিলেন—রে, সা।

তখন শ্রীগোবিন্দ ও তাঁহার শ্রীশ্রীমতী সপ্ত-সুরের সাধনা দ্বারা কল্পনা-দেবীর আরাধনা করিলেন। এবং তাঁহার বরে যে সকল সুমধুর কথামৃত রচনা করিলেন, তাহাতে বেচারা অম্বিকার বরপ্রাপ্তি রহিত হইয়া গেল। অম্বিকার স্বর্গগতা পুণ্যময়ী মাতার নামে যে সকল কলঙ্কের কথা প্রচারিত হইল, তাহা কেহ বিশ্বাস না করিলেও কেহ অম্বিকাকে বধূরূপে গ্রহণ করিয়া সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে সাহসী হইল না। লক্ষ্মীছাড়ারা লক্ষ্মীস্বরূপাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে?—তাহারা মিথ্যার পদে প্রণত রহিল। হায় মিথ্যাশাসিত বঙ্গসমাজ!

২

দ্বিপ্রহর! মা-গঙ্গার রৌদ্র-তরঙ্গময় গাত্রবসনে অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল হীরা জ্বলিতেছিল। পৃথিবীর ধনবিনিময়ে কোন রাজরাণী কি এরূপ আশ্চর্য্য বসন আহরণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন?

নন্দরাণীর কোলে শিশু শ্যামের ন্যায়, হীরকখচিত অঙ্গুরীয় মধ্যে মরকতমণির ন্যায়, আর হে আমার পেটুক পাঠক! তোমার হস্তস্থিত নীহারধবল সন্দেশ-গোলকের বিমল গাত্রে পেস্তার বুকুনির ন্যায়, গঙ্গা-উপকূলে তাল-তমাল-নারিকেল কাঁঠাল-ছায়া-সমাকুল শ্যামপল্লব সুশীতল পল্লীরাণী শোভা পাইতেছিল। মনুষ্য-কোলাহলশূন্য পল্লীমধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে সুধা-কণ্ঠ বিহঙ্গসকল গান গাহিতেছিল। বৃক্ষতলে শুইয়া সুরস তৃণপুষ্ট ধেনুসকল বিশ্রাম করিতেছিল।

গ্রামখানির নাম নাড়িচা। হায়! কোন্ কাব্যরসশূন্য বর্ব্বর এমন মনোহর

গ্রামটিকে এমন কর্কশ অমানুষিক নামে অভিহিত করিয়াছিল ?

নাড়িচা গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সামান্য ইংরাজি জানিতেন এবং পূর্ব্বে জেলা মেজিষ্টারের আপিসে চল্লিশ টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। কিন্তু এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, পেন্সন গ্রহণ করিয়া পল্লীর বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। যে বাটীতে তাঁহার বাস, তাহা অতি সামান্য ; তাহাতে কেবলমাত্র মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত দুইটী তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল।

সেই গৃহে মধুসূদন একমাত্র পুত্র এবং শ্রেষ্ঠ কুলীন হইলেও একমাত্র গৃহিণী সহ বাস করিতেন। মধুসূদনের পুত্রের নাম গদাধর, আর গৃহিণীর নাম—আঃ! তোমরা সেই কুলবতীর নাম নাই বা শুনিলে,—তাহাকে তোমরা গদার মা বলিও। আমার সন্দেহ হয়, তখনকার স্ত্রীলোকদিগের নামকরণের পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া যাইত ; তখন বাল্য-বিবাহ-সংহারক সংস্কারকগণের আবির্ভাব হয় নাই। গদার মারও কি নামকরণের পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল ?

মধুসূদনের যখন ত্রিশ বৎসর বয়স, তখন তিনি বাৎসরিক ছুটী উপলক্ষে একমাত্র আত্মীয়া মাতৃস্থানীয়া পিসিমাতাকে দেখিবার জন্য কর্ম্মস্থান হইতে নাড়িচা গ্রামে আসিয়াছিলেন। এবং সেই মাতৃস্থানীয়া বিধবা পিসিমাতার নির্ব্বন্ধাধিক্য জন্য একটি 'পুঁটি' নাম্নী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিয়া, পিসিমাতার সেবার জন্য গৃহে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুঁটি পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সেবাধর্ম্ম শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল। পুঁটি ভবিষ্যৎ জীবনে মধুসূদনকে কাব্যালাপে বা বাক্যালাপে সুখী করিতে পারে নাই ইহা সত্য, কিন্তু সেই হলুদমাখা হাতের সেই ঘণ্ট, সেই সুক্তনি ? আহা মধুসূদন তুমি ধন্য ! আমার মন্দাদৃষ্ট, এ বৃদ্ধ বয়সে আমার আর কাব্যালাপ সহ্য হয় না। তুমি আমাকে একবার তোমার বাটীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিও। তোমার পুঁটির,—তোমার গদার মার জয় হউক।

পুঁটির নামকরণ হইতে না হইতে এক দিন সে 'গদার মা' হইয়া বসিল। আরও কিছু দিন গত হইল, মধুসূদনের পিসিমাতা পরলোকগতা হইলেন, পল্লীগ্রামের বাটীতে একটি দুরন্ত নাবালক বালক লইয়া বাস করা গদার মার পক্ষে একটু কষ্টকর হইয়া পড়িল, কাজেই মধুসূদন 'পেন্সন' লইয়া গৃহে আসিলেন।

এক্ষণে মধুসূদনের বয়ঃক্রম ছাপান্ন বৎসর। সুতরাং গদার মার বয়স একত্রিশ বৎসর এবং স্বয়ং গদাধরের বয়ঃক্রম বেঠের কোলে চোদ্দ বৎসর।

এখন, আমি লেখক, আমি তোমাদিগকে একটা পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিব। আচ্ছা, এই চৌদ্দ বৎসরের গ্রাম্য গদাধরকে যদি আমি, আমার এই উপন্যাসের নায়ক করি, তাহা হইলে তাহাতে তোমাদের কোনও আপত্তি আছে কি না ? বাইশ বৎসরের নায়ক হইলেই বেশ সুবিধা হইত বটে ; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে উপন্যাসের সুবিধাজনক নায়ক হইবার জন্য কোনও কুলশীলসম্পন্ন বালকই অব্যূঢ় থাকে না। যাঁহারা অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া অত্যন্ত ঠকিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সম্প্রতি কেহ কেহ, বোধ হয় উপন্যাস-লেখকদের সুবিধার জন্য, পঞ্চবিংশ বৎসরের অনধিকবয়স্ক যুবকগণের বিবাহ রহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা যদি কার্য্যে

পরিণত হয়, তাহা হইলে, আহা! উপন্যাস লিখিবার কি সুবিধা! আমার চোদ্দ বৎসরের গদাধরকে নায়ক হইতে হইলেও সম্প্রতি আমি তাহাকে পরিণীত করিব না।—ষোল বৎসর পরে, তাহার ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে, তাহার পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইবে। অতএব বয়ঃক্রম সম্বন্ধে বোধ হয় আর তোমাদের আপত্তি নাই। এখন আপত্তি হইতেছে, নায়কের রূপ লইয়া। গদাধর কি সুরূপ? হায়! আমার গদাধর ত সুরূপ নহে। কদম্বপুষ্পতুল্য কেশদাম ত তোমরা পছন্দ কর না। মল্লিকাকুসুম সুন্দর বটে, কিন্তু হায়! তাহার মত দন্তত তেমন নয়নানন্দদায়ক নহে। সে বর্ণত গোলাপনিন্দিত নহেই, তাহা অপরাজিতাকেও পরাজয় করিবার অযোগ্য। সে নাসিকা দেখিয়া কখনও বংশী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। যাহা যাহা থাকিলে মানুষকে সুরূপ করে, গদাধরের তাহার কিছুই ছিল না। গদাধর মৎস্যজাতীয়গণের আততায়ী রূপে ছিপ্ নামক কার্ম্মুক হস্তে গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে পারিত; অভ্রভেদী তালবৃক্ষের শিখর-দেশে সমাসীন বাবুই-শিশুগণকে মুষ্টিগত করিতে সমর্থ হইত; কদলীবনাগত বানরকুলকে লোষ্ট্রবিক্ষেপে বিতাড়িত করিতে পারিত, কিন্তু মাতা সরস্বতী তাহার প্রতি বিমাতার ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। আমি এহেন গদাধরকে আমার উপন্যাসের নায়ক করিবার জন্য মানস করিয়াছি, পাঠকগণ তোমরা "তথাস্তু" বল।

কিন্তু মানুষমাত্রই কেবলমাত্র দোষের সমষ্টি হইতে পারে না। শত দোষের মধ্যে, কুরূপ মূর্খ গদাধরের দুইটি গুণ ছিল। তাহার শারীরিক বল অত্যন্ত অধিক ছিল। এবং সে মাতাপিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। রন্ধন সময়ে, সে মাতার নিকটে থাকিয়া কখন ইন্ধন, কখনও কলসীপূর্ণ গঙ্গাবারি নিমেষমধ্যে আহরণ করিত। পিতাকে তামাকু সাজিয়া দিবার সময়, সে আকাশের বাবুই পক্ষী এবং জলবিচরণকারী মৎস্যগণকে বিস্মরণ হইত।

মধুসূদনও একমাত্র পুত্র গদাধরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পল্লীবাসিগণ কহিত, "মধুমুখুর্য্যে পুত্রের মস্তকটি উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিতেছে।" মধুসূদন বলিতেন, "পিতাকে শ্রদ্ধা করায় যদি পুণ্য থাকে, তবে সেই পুণ্যের ফলে গদাধর সর্ব্বজয়ী হইবে।" পল্লীবাসিগণ কহিত, "মধুসূদন স্নেহপরবশ হইয়া পুত্রকে মূর্খ করিয়া রাখিল।" মধুসূদন বলিতেন, "আমার আশীর্ব্বাদে মাতা সরস্বতী আমার পুত্রকে আপনি বিদ্যাদান করিবেন।" পল্লীবাসিগণ কহিত, "মধুর মূর্খ পুত্রের সহিত আমাদিগের বালকগণের সংস্রব থাকিলে, তাহারাও মূর্খ হইবে।" মধুসূদন বলিতেন, "পিতৃভক্তি শিক্ষার জন্য পল্লীবাসীর পুত্রগণ গদাধরের নিকট আসুক।"

৩

আমরা পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে যে সময়ের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার দুই বৎসরের পরের ঘটনা বিবৃত করিতেছি। গদাধর এক্ষণে ষোড়শবর্ষীয় যুবক।

রন্ধনগৃহের বহির্ভাগে গদাধর দাঁড়াইয়াছিল। মাতা গৃহমধ্যে রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। গদাধরকে দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাই, তোমার হাতে কি?" গদাই বলিল, "একটা মাছ আনিয়াছি।"

মা। কর্ত্তা বারণ করিয়াছেন, তবে তুমি আবার মাছ ধরিলে কেন?

গদা। মাছ ধরিতে বারণ করেন নাই,

বলিয়াছিলেন চিরকাল মাছ ধরিলে চলিবে না, কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিতে হইবে। তা মা আমি লেখাপড়াও শিখব, মাছও ধরিব। তোমরা বারণ করিলেও ধরিব। তোমরা দুজনেই মাছ খাইতে ভালবাস; আর আমাদের মাছ কিনিবার পয়সা নাই।

মা। না গদাই, আমরা মাছ খাইতে ভালবাসি না; তুমি লেখাপড়া শিখ। দেখ, তুমি লেখাপড়া শিখিতে পার নাই বলিয়া সকল লোকেই কর্ত্তাকে নিন্দা করে। তোমার জন্য, লোকের কাছে তাঁর মাথা হেঁট হয়; লোকে যখন তোমাকে মূর্খ বলে, তখন তাঁর মনে কত কষ্ট হয়?

গদা। আমি মূর্খ বলিয়া, বাবার মনে যে কষ্ট হয়, তাহা মা, আগে আমি বুঝিতে পারি নাই; এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছি। বুঝিয়া বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছি।

মা। তুমি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছ, এ কথা কই আমাদিগকে ত বল নাই?

গদা। না মা, এখনও সে কথা কাহাকেও বলি নাই। কিন্তু অত্যন্ত যত্নের সহিত আমি বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। যদি বাঁচিয়া থাকি, একদিন সমস্ত লোককে দেখাইয়া দিব, আমার বাবা মূর্খ পুত্রের পিতা নহেন। না মা, আমার জন্য তাঁহার মাথা হেঁট হইবে না?

মা। গদাই, তুমি কাহার কাছে পড়া শিখিতেছ?

গদা। সে কথা, মা, আমি তোমাদের আরও কিছু দিন পরে বলিব। আমি যাঁহার নিকট বিদ্যাগ্রহণ করিতেছি, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁহার মত পণ্ডিত, বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে দুইজন নাই। তিনি কেবলমাত্র পণ্ডিত নহেন, তিনি বড় দয়ালু। তিনি বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার জন্য তিনি আমাকে কলিকাতায় পাঠাইবেন এবং কলিকাতায় আমার যাহা ব্যয় হইবে, তিনি নিজে তাহা বহন করিবেন। আরও কিছু দিন তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিয়া আমি কলিকাতায় যাইব। মা, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে ত'?

মা। আমাদের কষ্ট হইবে। কিন্তু কি করিব বাছা, তোমার উন্নতির জন্য, তোমার ভাল'র জন্য আমাদের সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

গদা। মা, এ সকল কথা তুমি এখন বাবাকে বলিও না। পরে, আমি নিজে সকল কথা তাঁহাকে জানাইব। আজ আমাদের কি রান্না হইবে মা?

মা। আজ বেশী কিছু রাঁধিব না। তুমি মাছ আনিয়াছ; তিনি মাছের ঝোল খাইতে ভালবাসেন; মাছের ঝোল রাঁধিব। আর যাহা হউক একটা অন্য তরকারি রাঁধিব।

গদা। কলার ঝাড়ে, একটা মোচা আছে, আনিয়া দিতেছি। মোচার ডালনা রাঁধিও।

এই বলিয়া, গদাই, মাতাকে নিমেষ মধ্যে একটি সদ্য আহৃত মোচা আনিয়া দিল। তাহার পর বঁটি লইয়া মৎস্যটি কুটিয়া দিল। পরে গাভিটিকে স্থানান্তরে বাঁধিয়া গো-গৃহটি স্বহস্তে সংস্কৃত করিল, এবং পরিষ্কার পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিয়া রাখিল।

পাঠকগণ! তোমরা আমার নায়কের প্রতি আর একবার ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত কর। তাহার পাদুকাবিহীন পদতল এবং তাহার উপরিভাগের দৃঢ়সংবদ্ধ মাংসপেশী অবলোকন কর। যানারোহণের জন্য নহে, এ চরণ ধরাতলে বিচরণের জন্য সৃষ্ট হইয়া-

ছিল। গদাধরের কটিতটে অপরিসর কর্কশ বস্ত্র পরিহিত ছিল; কিন্তু কটিতটের উপরিভাগ সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত থাকিত। সে অনাবৃত বক্ষ, সে অনাবৃত বাহু, কৃষ্ণমর্ম্মর-বিনির্ম্মিত সুনিপুণ ভাস্কর্য্যের চরম আদর্শ-স্বরূপ। সে বক্ষে, সে বাহুতে অমিত বল। সে অমিত বল,—সে বক্ষ সে বাহুতে পরিস্ফুট।

গদাধরের বৃহৎ মস্তক, মুক্তাসদৃশ ঘর্ম্মবিন্দুর দ্বারা অলঙ্কৃত,—সুবৃহৎ ললাট; ললাটতলে ক্ষুদ্র নিগূঢ় তীক্ষ্ণ চক্ষু। মস্তকোপরি কর্কশ, বিশৃঙ্খল কেশরাশি। তাহার দন্তসকল অসমান, বিশেষতঃ সম্মুখের দুইটি দন্ত কিছু অধিক বড় থাকা হেতু, তাহারা তাহার অধরের কিয়দংশ আবৃত রাখিত। দন্তনিবদ্ধ অধরে অমানুষিক সংকল্পসকল অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকটিত ছিল। তাহার হাস্যতরঙ্গিত কৃষ্ণ গণ্ড স্বাস্থ্যের আরক্তিম রাগে, রবি-রাগরক্ত কৃষ্ণতড়াগতরঙ্গস্বরূপ সর্ব্বদা প্রতীয়মান হইত।

পাঠকগণের রুচিবিকার ঘটিবার আশঙ্কা থাকিলেও আমি গদাধরের আহার-সম্বন্ধায় কিছু বিবরণ এস্থলে লিখিতে অভিলাষী হইয়াছি। অসভ্য বর্ব্বর গদাধর প্রভাতে উঠিয়া, কিংবা উঠিবার পূর্ব্বেই চা, ডিম্ব, বিস্কুট ইত্যাদি আহার করিত না মানুষে যে এ সকল উপাদেয় দ্রব্য আহার করে, তাহা বোধ হয়, গদাধর বা গদাধরের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেহই অবগত ছিল না। ইহা গদাধরের এবং গদাধরের চৌদ্দপুরুষের ইহজন্মের দুর্ভাগ্য এবং গতজন্মের পাপের ফল বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা সত্য যে, গদাধর এবং তস্য পিতা পিতামহগণ, কেহ কখন চা পান করেন নাই। গদাধর প্রভাতে উঠিয়া প্রচুর মুড়ি ও গুড় বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইত। এবং তাহা আহার করিতে করিতে ছিপ্‌হস্তে, মৎস্য-সংগ্রহের অভিলাষী হইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইত। দ্বিপ্রহরে গদাধর ভাত খাইত। বঙ্গ-সন্তান ভাত খাইয়া থাকেন; কিন্তু গদাধর বহু বঙ্গ-সন্তানের আহারের উপযুক্ত ভাত একা খাইতে পারিত। আহারান্তে সে কোথায় যাইত, তাহা কেহ অবগত ছিল না। আমাদের সন্দেহ হয়, গদাধর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' পাঠ করিয়া এই তত্ত্বটি অবগত ছিল না যে, রৌদ্রের সময় দৌড়াদৌড়ি করিতে নাই। আমাদের বিশ্বাস, গদাধর ত দূরের কথা, বাল্যকালে, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উল্লিখিত নীতিবাক্যানুযায়ী কার্য্যানুবর্ত্তী হইতেন না। গদাধর রৌদ্রের সময় শীতল, স্নিগ্ধ গৃহকোণে বসিয়া থাকিত না। দেবতা মরীচিমালী প্রখর সমরে তাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। বিকালে বাটি ফিরিয়া গদাধর আবার মুড়ি চর্ব্বণ করিতে বসিত এবং তৎসহ কখন শাঁকআলু, কখন শশা, কখন এবংবিধ অন্য উপকরণ পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে গলাধঃকরণ করিত। রাত্রে পিতৃসন্নিধানে বসিয়া আবার সেই অন্নের স্তুপ।

৪

গোবিন্দবাবুর উদ্যোগে, এবং কৃষ্ণ-চাটুর্য্যের অনুদ্যোগে অম্বিকার বিবাহ হইল না। ক্রমে তাহার বিবাহকালও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সে বিদ্যাবতী হউক, সুন্দরী হউক, সুশীলা হউক, কিন্তু সে ষোড়শী— এই পাপে, হিন্দু-সমাজের কোনও লোক এখন আর তাহাকে বিবাহ করিল না। পতিতা, বয়স্থা কন্যাকে কে বিবাহ করিবে?

কিন্তু কন্যার বিবাহ না হওয়ায় কৃষ্ণ-চাটুর্য্যে কিছুমাত্র দুঃখিত ছিলেন না। চির-অভ্যাসানুরূপ প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে

গাত্রোত্থান করিয়া, তিনি চিরনির্দ্দিষ্ট এক ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিতেন। যথা-সময়ে সামান্য ব্যঞ্জনের সাহায্যে স্তূপাকার অন্ন আহার করিতেন। তাহার পর, সকালে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যাকালে অবিরত অদম্য উৎসাহে বিদ্যালোচনা করিতেন। ইংরাজি, ফরাসী, জার্ম্মান, রুষ, আরব্য, পারস্য, চীনিয়, হিন্দী মারহাটী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই সংস্কৃত, পালী, লাটীন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি অপ্রচলিত ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন—কোন শাস্ত্রই তাঁহার অনধীত ছিল না। সংসারে তাঁহার একমাত্র ব্রত অধ্যয়ন; অন্য কোন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। কন্যার বিবাহ দেওয়া যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা বোধ করি, তিনি কখনও ভাবেন নাই।

অম্বিকাও কখন আপনার বিবাহের কথা চিন্তা করে নাই। পিতার শিক্ষকতায়, অবিরত বিদ্যাচর্চ্চায়, তাঁহার মানসিক প্রবৃত্তিসকল কর্দ্দমশূন্য, অন্যের অপরিচিত এক অভিনব পথে বিচরণ করিত। তাহার অতি বিশাল বিলোল চক্ষু দু'টি, চন্দ্রালোকিত নীল নির্ম্মল আকাশের ন্যায়, জ্ঞানালোকে প্রভাসিত থাকিত। তাহাতে ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের ছায়া কখন নিপতিত হইত না। সে নয়নতারা, ভ্রাম্যমান ভ্রমরের ন্যায়, সুখ-মধু অন্বেষণে কখন অপাঙ্গ-পথে বিচরণ করিত না। তাহা অগ্নিগর্ভ অঙ্গারের ন্যায় কেবলমাত্র অপরিসীম প্রতিভা-জ্বালায় প্রজ্বলিত থাকিত।

পিতার শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই অম্বিকা অদূরপ্রবাহিতা গঙ্গার জলে অবগাহন করিত। কখন, গঙ্গাতরঙ্গসকলকে আপন তরঙ্গিত বক্ষের তাড়নে সন্তাড়িত করিয়া সন্তরণ করিত। গ্রামের বালিকাগণত নহেই, যুবকগণের মধ্যেও কেহই তাহার মত সন্তরণ-পটু ছিল না। ক্রীড়ারত মীনগণের ন্যায়, বেগবান্ স্রোতের মধ্যেও সে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিত; উচ্চ ঊর্ম্মির পৃষ্ঠে তাহার সুকুমার দেহ দেবপূজার পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইত। কোথাও স্রোতোহীন গভীর জলে, সে ইন্দীবরনিন্দিত চক্ষু দু'টি, বাণীপদাশ্রিত পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিত। তাহার জলনিমজ্জিত বরদেহ অবলোকন করিলে মনে হইত, বুঝি পদ্মালয়া বরুণালয়ে দেবী বরুণানা কর্ত্তৃক সেবিতা হইতেছেন।

স্নান সমাপন করিয়া অম্বিকা গৃহকার্য্যে রত হইত। তোমরা তাহার নয়নে বিদ্যা-জ্যোতি অবলোকন করিয়াছ; গঙ্গাবক্ষে তাহার সন্তরণ-পটু সঞ্চালিত দেহ-সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে গৃহকার্য্যে তাহাকে ব্যাপৃতা দেখিয়া ধন্য হও। রবিকর-স্পর্শে পৃথ্বী যেরূপ আলোকময়ী হইয়া উঠে, অম্বিকার সুনিপুণ করস্পর্শে গৃহসামগ্রীসকল তেমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। যুদ্ধনিপুণ সেনাপতির শাসনাধীন সৈন্যশ্রেণীমধ্যে যে শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়, অম্বিকার সর্ব্বত্রসঞ্চালনী দৃষ্টিতলে গৃহমধ্যে সেইরূপ শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। তোমরা পাঠিকাগণ! তোমরা কি আমার এই অম্বিকার মত সুশিক্ষিতা হইতে পারিবে? এবং সুশিক্ষিতা হইয়া, শিক্ষা-সুনিপুণ পটুতা লইয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? হায়! গৃহকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিলে, তোমরা ত মনোমোহিনী হইতে পারিবে না। গৃহকার্য্যে অবহেলা করিলে, তোমাদের মনোমোহন-ব্রত বৃথা হইয়া যায়। মনের দ্বারস্বরূপ আমাদিগের যে পাঁচটি

ইন্দ্রিয় আছে, তদ্দ্বারা মনের মধ্যে সুখ আনিয়া দিতে হইলে, গৃহকার্য্যে শৃঙ্খলা এবং নিপুণতা একান্ত আবশ্যক। তোমাদিগের অমার্জ্জিত মলিন দেহ, কর্দ্দমলিপ্ত নন্দনাঙ্গ, শৃঙ্খলাবিবর্জ্জিত গৃহসামগ্রী, কলঙ্কিত তৈজস আমাদিগের নয়ন নামক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হয় না। তোমাদিগের ঐ কর্কশ ভাষা, পুত্রকন্যাগণের ঐ তন্দ্রাঘাতী মহাক্রন্দন, দাসদাসীগণের তুমুল রণনিনাদ, হে মধুমুখি আমাদের এ দুর্ব্বল কর্ণের পক্ষে একটুও তৃপ্তিদায়ক নহে। গৃহমধ্যে গন্ধপুষ্প আহরণ করিয়া, ধূপধূনার সুগন্ধি ধূম বিকীর্ণ করিয়া, চন্দনচর্চ্চিত কমনীয় দেহটি গন্ধপুষ্পমাল্যে পরিশোভিত করিয়া হে মোহিনি, আমাদের ঘ্রাণ নামক ইন্দ্রিয়টি বিমোহিত করিও। আমরা নিদ্রিত হইলে, আমাদিগের গ্রীষ্মতপ্ত অঙ্গোপরি তালবৃন্ত সঞ্চালন করিয়া ৺পুরীধামের সাগর-উপকূলে সংগৃহীত ক্ষুদ্র শুক্তি-অর্দ্ধের দ্বারা 'ঘামাছি'গুলির সংহার করিয়া এ ত্বগিন্দ্রিয়ের সেবা করিও। সর্ব্বোপরি, রসনার তৃপ্তিকর রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া, মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার ন্যায়, তোমাদের কৃপাভিখারী আমাদের সম্মুখে, তোমাদের এই দেবাধিদেব মহাদেবের সম্মুখে,—মসলা-সুবাসিত ব্যঞ্জনালঙ্কৃত অন্নপাত্র স্থাপন করিও।

গৃহকার্য্যসকল পরিসমাপ্ত করিয়া, অম্বিকা স্নেহময় পিতার পার্শ্বে বসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিত। অতি দুরূহ পাঠসকল সে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত। হার্বার্ট স্পেন্সার, মিল্, বেন প্রভৃতি ইংরাজ-দার্শনিকগণের আধুনিক যুক্তিসকল, সে এমন সহজে আলোচনা করিতে পারিত যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শনপ্রণালীর প্রত্যেক সূত্রের সহিত সে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের এরূপ সুন্দর তুলনা করিত যে, মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ও তাহা মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেন। অতি সূক্ষ্ম গণিততত্ত্বেও তাহার সূচ্যগ্রমুখী প্রতিভা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তাহার কোমল সুকণ্ঠে বেদমন্ত্রের বিশুদ্ধ আবৃত্তি শুনিয়া একজন বৃদ্ধ বেদান্তবাগীশ ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"চাটুর্য্যে, দেবী বীণাপাণি, তোমার কন্যারূপে জগতে আবার আবির্ভূতা হইয়াছেন।

সন্ধ্যাকালে অম্বিকা গৃহচ্ছাদে বসিয়া গান করিত। রাগিণীসকল আজ্ঞাধীনা কিঙ্করীর ন্যায় তাহার কিন্নরীনিন্দিত কণ্ঠেঙ্গিতে নৃত্য করিত। নীল আকাশে তারা উঠিত; মনে হইত, বুঝি স্বর্গের অপ্সরোগণ আপনাদের গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া, স্বর্গের স্বর্ণগবাক্ষ খুলিয়া, উজ্জ্বল রূপরাশি লইয়া, অম্বিকার অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে বসিয়াছে। সন্ধ্যাতিমিরাবৃত নীলাম্বরা নীরবা ধরা বুঝি অম্বিকার গান শুনিবার জন্য বিহঙ্গ-কাকলী বন্ধ করিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিত। তানভঙ্গভয়ে পবনদেব অতিধীরে সঞ্চালিত হইতেন।

(৫)

যে গ্রামে অম্বিকার বাস, তাহার নাম কালীদহ। কালীদহ গ্রাম গঙ্গাতীরে,—নাড়িচা গ্রামের প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে। নাড়িচা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম—বৃক্ষলতাসমাকুল নীরব নির্জ্জন পল্লী—ইহা আমরা পাঠকগণকে ইতঃপূর্ব্বে অবগত করিয়াছি। কিন্তু কালীদহ জনসমাকুল, দেবালয়-মন্দির-হর্ম্ম্যাদি-বিভূষিত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে এক ধনশালী জমীদার বাস করিতেন। এই জমীদার বাবুর কথা আমরা এই কাহিনীতে পরে কীর্ত্তিত করিব। কালীদহ

গ্রামে জমীদার বাবুদিগের অনেক সুকীর্ত্তি ছিল। উচ্চ দেবমন্দির, অতিথিশালা-সমন্বিত সুন্দর দেবালয়, ভাগীরথী-তীরে প্রশস্ত সোপানাবলীসম্বলিত বৃহৎ সুগঠিত চাঁদনি, রম্য উদ্যান, তন্মধ্যে সুরম্য আনন্দ-নিকেতন, কালীদহ গ্রামখানিকে, নগরের আকার প্রদান করিয়াছিল।

গ্রামমধ্যে এক সুরক্ষিত উদ্যান পরি-বেষ্টিত গৃহে, অম্বিকার পিতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁহার পিতা তেজা-রতির কারবার করিয়া, তাঁহার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের গৃহের সম্মুখে, উদ্যান মধ্যে বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর গদাধর। তপ্ত চারি ক্রোশ পথ পাদুকা-বিহীন পদে অতিক্রম করিয়া সে তথায় আসিয়াছে। রোজই আসিত। চারি বৎসর পূর্ব্বে কোনও লোকের মুখে কৃষ্ণ চাটুর্য্যের বিদ্যাগৌরবের কথা শুনিয়া সে বিদ্যালাভাভিলাষী হইয়া তথায় আসিয়াছিল। তদবধি প্রত্যহ আসিত। বিদ্যালাভাশায় প্রত্যহ আট ক্রোশ পথ বিচরণ করিবার দৃঢ়তা যে বালকের আছে, তোমরা জানিও যে, সে বালকের বিদ্যালাভ হয়। বিদ্যালাভে গদাধর কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহা তোমরা ক্রমে অবগত হইতে পারিবে।

পাঠ্য পুস্তক হইতে চশমা-নিবদ্ধ চক্ষু উত্তোলন করিয়া, গবাক্ষ-পথে গদাধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে তাহাকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"তোমাকে আমি যে ছত্র দিয়াছিলাম, তাহা কোথায় গেল?" গদাধর কহিল, "ছত্রটা, মহাশয়, গত কল্য একজন বৃদ্ধ মুসলমান ভিক্ষুককে দিয়াছি। তাহাকে দিবার জন্যই আমি ছাতাটী আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার নিজের ছত্র ব্যবহারের কোন আবশ্যক নাই।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে। জুতা?

গদাধর। জুতা পরিবার উপায় নাই। মহাশয় যে জুতা দিয়াছিলেন, তাহা পরিধান করিয়া আমার পদে কয়েকটি ফোস্কা বাহির হইয়াছে। মহাশয় কহিয়াছিলেন যে, পদদ্বয়কে রক্ষা করিবার জন্য পাদুকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমার পক্ষে ইহাতে বিপরীত ঘটিয়াছে। যে পদ চিরদিন নিরাপদ্ ছিল, জুতা পরিধান করিয়া, তাহার বিপদ্ ঘটিয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। কিন্তু কষ্ট স্বীকার করিয়াও পরে আমাকে জুতা পরা অভ্যাস করিতে হইবে।

কৃষ্ণ। কেন?

গদা। মহাশয় কহিয়াছিলেন যে, কলিকাতার স্কুলে পড়িতে হইলে, সহপাঠি-গণের ব্যঙ্গবাণিমুখরিত মুখগুলি বন্ধ রাখিবার জন্য জুতা—জুতাপরিধান করা একান্ত আবশ্যক হইবে।

কৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ। তোমাকে শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতে হইবে। তথায় যাইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি লাভ করা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

গদা। আমাকে তথায় কবে যাইতে হইবে?

কৃষ্ণ। এটা জুন মাস। আগামী ইংরাজি বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রবে-শিকাপরীক্ষা গৃহীত হইবে। তোমাকে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যত শীঘ্র তুমি কোন স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তি হইতে পার, ততই ভাল।

গদা। আপনি যেদিন অনুমতি করিবেন, আমি সেই দিনই কলিকাতায় যাইতে প্রস্তুত আছি।

কৃষ্ণ। বেশ, তাহা হইলে তুমি তোমার মাতাপিতার সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী সপ্তাহেই কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিও।

গদা। আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

কৃষ্ণ। তাহা হইলে আগামী সোমবারে বাটী হইতে কাপড় চোপড় গুছাইয়া লইয়া আমার এখানে আসিও। এখান হইতে নিত্য কলিকাতায় লোক যায়, আমি তাহাদের কাহারও সহিত তোমাকে কলিকাতা পাঠাইয়া দিব।

গদা। আমার পরিধানে এই যে কাপড়খানি দেখিতেছেন, ইহা ছাড়া বাটীতে আমার আর একখানি বস্ত্র আছে। 'চোপড়' আর কিছু নাই।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আচ্ছা, "চোপড়ের" বন্দোবস্ত আমি করিব। তোমাকে এই বেশে কলিকাতায় পাঠাইতে পারিব না।

এই বলিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে হাঁকিলেন, "অম্বা—অম্বিকা—মা! ওখানে আছ কি ?" অম্বিকা গৃহান্তরে বসিয়া অতি সূক্ষ্ম সূচিকার্য্যে নিরতা ছিল। তাহার সুদক্ষ অঙ্গুলি সকলের শিক্ষকতায়, জড় ধাতুনির্ম্মিত সূচি অপূর্ব্ব প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে বস্ত্র প্রান্তে বিচিত্র চিত্রসকল চিত্রিত করিতেছিল। অম্বিকা পিতার আহ্বান শুনিয়া কহিল, "যাই বাবা।" তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্টা দেখিয়া, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় কহিলেন, "মা অম্বিকা! গদাধর কলিকাতায় যাইবে। উহার বস্ত্রাদি ভালরূপ নাই। তুমি সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিও।"

অম্বিকা। হাঁ বাবা! আমি সমস্ত আনাইয়া রাখিব।

তাহার পর অম্বিকা গদাধরের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিল "গদাই, তোমার কি কি চাই!" গদাই যদিও অম্বিকা অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি অম্বিকা গ্রাম্য, পাদুকাবিহীন, সামান্য বস্ত্রপরিহিত এবং প্রথম সাক্ষাৎকালে মূর্খ গদাধরকে গদাই বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিল। গদাই সম্বোধনে গদাইএর প্রতি অম্বিকার কোন প্রকার অবজ্ঞাভাব ছিল না। সহপাঠী সহপাঠীকে যে ভাবে সম্বোধন করিয়া থাকে, এ সেই প্রকার সহজ সরল সম্বোধন। পণ্ডিতামান্যা অম্বিকাকে গদাধরও তুমি বলিয়া সম্বোধন করিত। সে বয়ঃকনিষ্ঠা এবং স্ত্রীজাতীয়া বলিয়া যে সে তাহাকে 'তুমি' বলিত এমত নহে। প্রথম সাক্ষাৎকালে অশিক্ষিত গদাধর 'আপনি' শব্দ ব্যবহারে সম্যক্‌প্রকার দীক্ষিত হয় নাই।

অম্বিকার প্রশ্ন শুনিয়া, গদাধর কহিল, "আমি কখন কলিকাতায় যাই নাই। তবে, তথায় ভদ্রসমাজে স্থান লাভ করিবার জন্য কি বেশের আবশ্যক হইবে, তাহা তোমাকে কিরূপে বলিব ?"

কৃষ্ণ। তুমি, মা, গদাধরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তোমার আপনার বুদ্ধিমত বেশাদি সংগ্রহ করিও।

অম্বিকা পিতার নিকট বসিয়া যে সকল জিনিষ গদাধরের আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে করিল, একখণ্ড কাগজে তাহা লিখিল। তাহার পর, আবার গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "গদাই, তোমার জন্য পিরাণ প্রস্তুত করিতে দিতে হইবে, তুমি উঠিয়া দাঁড়াও, আমি তোমার মাপ লইব।" ষোড়শবর্ষীয়া, এক পূর্ণায়তা যুবতী এক যুবকের কণ্ঠের, বক্ষের, হস্তের পরিমাণ স্বহস্তে গ্রহণ করিবে! তোমরা পাঠিকা! তোমরা হয়ত এই অসম্ভব ব্যাপারটাকে সন্দেহ-কুটিল-কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিবে। তোমরা অপাপবিদ্ধমনা, ললিতলোচনা অম্বিকার ছলনাবিরহিত মুখমণ্ডল

অবলোকন কর ; দেখিবে, তাহাতে স্বর্গের সারল্য বর্ণনাতীত প্রভা বিস্তার করিতেছে। সে অত্যন্ত সহজে গদাধরের কৃষ্ণভূধর-প্রতিম অনাবৃত দেহে তাহার অত্যন্ত সুন্দর, যেন পুষ্পদলবিনির্ম্মিত করতল বিন্যস্ত করিয়া এবং তাহা বেষ্টন ও পরিবেষ্টন করিয়া, পরিমাপক রজ্জুর সাহায্যে, তাহার পরিমাণসকল গ্রহণ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিল। গদাধরের অসিত গাত্রে স্মিতমুখী আম্বকার লাবণ্যময় বাহুযুগল কি অতুল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল! যেন জলদাবৃত নীরদগাত্রে সৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছিল ; যেন প্রস্তরময় ক্রোড়ে নির্ঝরিণীর শীতল রজতধারা নৃত্য করিতেছিল ; যেন কৃষ্ণশিলা-বিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির গলে বিচিত্র কুসুমদাম বিরচিত অপূর্ব্ব মালা দুলিতেছিল!

৬

অপরিমিত দেহগৌরব, কোনক্রমে পরিমিত বস্ত্রাদিতে পরিবেষ্টিত করিয়া, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের পরিচিত কতকগুলি কলিকাতাযাত্রী নৌকারোহীর সহিত গদাধর কলিকাতায় আসিয়াছিল। তথায় এক ছাত্রাবাসে সে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষিত হইয়া এক স্কুলে গৃহীত হইয়াছিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বুঝিয়াছিলেন যে, গদাধর অসাধারণ বালক ; তাহার মত বালককে ছাত্ররূপে পাইয়া, তাঁহাদের বিদ্যালয় ধন্য হইয়াছে। তাহার অসামান্য প্রতিভা শিক্ষকগণের পরিপক্ক বিদ্যাগৌরবও ম্লান করিয়া দিয়াছিল। তাঁহারা তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, সে অবাধে তাহার সম্যক্ সদুত্তর প্রদান করিতে পারিল ; বরং অনেক সময় তাহার কূট প্রশ্নের তাঁহারা সদুত্তর দিতে সমর্থ হইতেন না।

গদাধরকে পাইয়া সহপাঠী ছাত্রগণও সুখী ছিল। ক্রীড়া-ক্ষেত্রে তাহার অমিত বল অন্য বিদ্যালয়ের ক্রীড়া-প্রতিদ্বন্দী বালকগণকে সর্ব্বদা পরাজিত রাখিত। গদাধরের সহপাঠিগণ গদাধরকে লইয়া ফুটবল ক্রীড়ায় দুইবার দুইটি ক্রীড়া-দক্ষ বিখ্যাত ইংরাজদলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাতে তাহাদিগের গৌরব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কলিকাতায় কয়েক মাস অবস্থিতি করিবার পর সহসা একদিন গদাধরের মনে হইল যে, যদি কাহারও গলগ্রহ না হইয়া স্বাবলম্বন দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, সে তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিগণের মনে সুখ বিধান করিতে পারিবে। সে ভাবিল, কি উপায়ে পাঠের অনিষ্ট না করিয়া, সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট সে আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন তাহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার এক ধনাঢ্য পরিচিত ব্যক্তি আপন শিশু বালকদিগের জন্য একজন গৃহ-শিক্ষক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি গদাধরকে তথায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গদাধর এই ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে বাসস্থান, আহার এবং দশ টাকা হিসাবে বেতন প্রাপ্ত হইল। ইহাতে তাহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে মহাত্মা কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়কে পত্র লিখিতে বসিল ;—

"মহাশয়, আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আমি মহাশয়ের প্রেরিত পত্র ও কুড়িটি টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া একটা কাজ করিয়াছি, ভরসা করি, মহাশয় ইহার জন্য আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। এখানে

আমি একজন ধনাঢ্য ভদ্র ব্যক্তির গৃহে গৃহ-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছি। নিজের ভরণপোষণ জন্য আমি উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছি শুনিয়া, মহাশয় নিশ্চিত সন্তুষ্ট হইবেন ; কিন্তু আমি এইরূপে যে, একটি দরিদ্র বালকের ভরণপোষণের অত্যন্ত সুখ হইতে মহাশয়কে বঞ্চিত করিতেছি. তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না। মহাশয়ের নিকট হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্ত হইলে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পত্রের উত্তর দিয়া সুখী করিবেন। ভরসা করি, ভগবানের কৃপায় আপনি এবং অম্বিকা সুস্থ আছেন। আমি বেশ ভাল আছি। নিবেদন ইতি।”

কয়েক দিন পরে গদাধর কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের নিকট হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্ত হইল ;—“গদাধর, আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। অম্বিকা ভাল আছে ; কিন্তু আমার নিজের দেহ সবিশেষ সুস্থ নহে ; এ বয়সে ইহা অপেক্ষা অধিক সুস্থ থাকিবার ভরসা নাই। তুমি যে আপনার ভরণ-পোষণের ভার আপনিই গ্রহণ করিবে, ইহা আমি আগেই জানিতাম। পরান্নজীবী হইবার জন্য ভগবান্ তোমার মত বালককে সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কৃপায়, কেবল মাত্র আপনার নহে, অনতিবিলম্বে, বহু-লোকের ভরণ পোষণের ভার তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে। তোমার দেহের অমিত বল তিনি বৃথায় সৃষ্টি করেন নাই। তোমাকে তিনি অলোকসামান্য প্রতিভা অকারণ প্রদান করেন নাই। মনে রাখিও, দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য তাহা সৃষ্টি হই-য়াছে। বৎস গদাধর! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন তোমার দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হয় ;, যেন তোমার গৌরবে বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইতে পারে। তোমাকে এই গৌরবে গৌরবান্বিত দেখিবার আগে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, জানিও বৎস, মৃত্যুর পরপারে থাকিয়াও আমি ধন্য হইব। পরী-ক্ষার পর যখন বাটী আসিবে, তখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। ইতি। আশীর্ব্বাদক কৃষ্ণবিহারী।”

এই ক্ষুদ্র পত্রে গদাধরের উৎসাহ-অনল সবিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি অপরিমিত বল লইয়া, কি আবেগময় আগ্রহ লইয়া সে পাঠ্যপুস্তকসকলে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে, আমি ক্ষুদ্র লেখক চেষ্টা করিব না। পাঠের সময় তাহার আদরময়ী মাতাকে মনে পড়িত, সেই মাতাকে সুখী করিতে হইবে ; পিতার স্নেহপ্লাবিত মুগ্ধ মুখ মনে পড়িত, সেই পিতার সেই মুখ উজ্জ্বল করিতে হইবে ; জ্ঞানদাতা কৃষ্ণ চাটুর্য্যের পত্রের কথা মনে পড়িত, দশের কল্যাণ সাধিতে হইবে, বাঙ্গালা জাতিকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে, তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী সফল করিতে হইবে। এই চিন্তার সহিত গদাধরের হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইত। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম-সমরে একান্ত পরা-জিত হইয়া, অধীত পুস্তকসকল শ্লথদেহে বিরাজ করিত। নিশীথে, মৃৎপ্রদীপের তৈল-বক্ষ সে উৎসাহ-অনলে পরিশুষ্ক হইয়া যাইত। এক অচিন্ত্য অতি মহান্ গৌরব-শিখরে এক অচিন্ত্য শক্তি তাহাকে যেন অতি বলে আকর্ষণ করিতেছিল।

যে ধনাঢ্যের বাটীতে গদাধর স্থান পাইয়াছিল, তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসন্ন বসু মল্লিক। জ্ঞানদা বাবু প্রবীণ ব্যক্তি,—বয়সে, জ্ঞানে নহে। বাল্য-কালে তিনি মাতার আদর যে পরিমাণ

লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, মাতা সরস্বতীর তাদৃশ কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ইহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন, অর্থার্জ্জনের জন্যই বিদ্যার্জ্জনের আবশ্যক। তাঁহার মত ধনশালী লোকের পক্ষে বিদ্যার্জ্জনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহার বালকগণের পাঠনাসম্বন্ধে তিনি গদাধরকে বার বার বলিতেন,—"উহাদের চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না। পাঠের জন্য উঁহাদের প্রতি বিশেষ পীড়াপীড়ির আবশ্যক নাই।" জ্ঞানদা বাবু,—কলিকাতার অন্যান্য অনেক ধনী ব্যক্তিদিগের ন্যায়—একটু প্রচুরপরিমাণে—হুইস্কি-সুধা পান করিতেন। কিন্তু এই মদ্যপায়ী মূর্খ জমীদার বাবুর এক অসাধারণ গুণ ছিল। সমস্ত কলিকাতার মধ্যে তৎকালে তাঁহার মত, সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ অন্য কেহ ছিলেন না। তাঁহার সুশিক্ষিত সুদক্ষ করাঘাতে মৃদঙ্গসকল মেঘগর্জ্জন করিত, তাঁহার তান-লয়-মান-সংযোজিত গীতে, মুগ্ধ মোহপ্রাপ্ত শ্রোতার চক্ষুসকল বারি বর্ষণ করিত। সুরাপ্রমোদিত চিত্তে তিনি কোন কোন দিন গদাধরের নিকট আসিয়া বসিতেন। বলিতেন,"এস, পাখোয়াজ বাজাইতে শিক্ষা কর।" গদাধর অবকাশ পাইলেই তাঁহার উৎসাহে "তেটেকেটে" বাজাইতে অভ্যাস করিত। "ঠায়", "দুন", "চৌদুন" অভ্যস্ত হইল। অঙ্গুলিসকল সুশিক্ষিত হইল। কয়েক মাস মধ্যে মেধাবী কার্য্য-কুশল গদাধর মৃদঙ্গ-আলাপে জ্ঞানদা বাবুকে মোহিত করিয়া দিল। শিক্ষক ছাত্রকে যে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন, জ্ঞানদা বাবু তাঁহার বাদ্যশিষ্য গদাধরকে সেই স্নেহচক্ষে অবলোকন করিলেন। ইহাতে জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে অবস্থিতি করা গদাধরের পক্ষে বিশেষ সুখকর হইয়া উঠিল। পুত্রস্থানীয় হইয়া সে তাঁহার বাটীতে বাস করিতে লাগিল।

রতন সিং দোবে ভারি পালোয়ান। তাহার বড় আক্ষেপ যে, কলিকাতাতে তাহার এমন প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই যে,তাহার সহিত সে কুস্তি লড়ে। সে জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে থাকিত। বাবু তাহাকে মাসিক চল্লিশ টাকা হিসাবে দরমাহ দিতেন; পরন্তু তাহার আহারের জন্য পর্য্যাপ্তপরিমাণ চানা আটা, ঘিউ ইত্যাদি সরবরাহ করিতেন। বেতন দিতেন, আহার দিতেন, কিন্তু জ্ঞানদা বাবু এই পালোয়ানটিকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। বোধ হয়, তাহার সাহঙ্কার উক্তিসকল তাঁহার মনোমত হইত না। তবে, অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন কেন? কে বলিবে, কেন? তুমি কি অকারণ কোন কার্য্য কর না? অথবা তুমি যে সকল কার্য্য কর, তাহার সকলগুলিরই কি এক একটি কারণ খুঁজিয়া পাও? অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে শান্ত ঘোটক ক্রয় না করিয়া, লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, আরোহণ জন্য দুর্দ্দমনীয় অশ্ব ক্রয় করে কেন? একটা দুর্দ্দমনীয়তা দমনের যে অহঙ্কার আছে, তাহার সাফল্যলাভের জন্য। রতন সিঙের বীরত্বের অহঙ্কার এক দিন চূর্ণ করিতে পারিবেন, এই আশায় এই আনন্দের পরিণতিলাভের জন্য জ্ঞানদা বাবু অর্থব্যয় করিয়া রতন সিংকে গৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। এক দিন রতন সিং কৌপীন পরিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ধূলি অনুলেপন করিয়া, উরুপ্রদেশে চটাপট চপেটাঘাত করিয়া, "বৈঠক" করিতেছিল। উপরে, জ্ঞানদা বাবু একটি গুরু লৌহ-পেটক স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি রতন সিংকে উপরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "রতন সিং, এই বাক্সটি

ধরিয়া পার্শ্বের ঘরে রাখ।" রতন সিং জ্ঞানদা বাবুর মুখের উপর উত্তর করিল ;—"বাবুজী, ইহা কুলির কার্য্য, আমি ইহা করিব না, আমি কুলি নহি, আমি পালোয়ান।" সেই লৌহ-পেটকের গুরুত্ব পাঁচ মণের অধিক। গদাধর একক সেই পেটক অক্লেশে উত্তোলন করিয়া পার্শ্বের ঘরে রাখিল। জ্ঞানদা বাবু মুগ্ধনেত্রে তাহার কৃষ্ণভূধরপ্রতিম অবয়বের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনে করিলেন, ইহার দ্বারা রতন সিংএর দর্প চূর্ণ করিতে হইবে। তিনি গদাধরকে ডাকিয়া কহিলেন, "গদাধর তুমি ব্যায়াম অভ্যাস কর, মল্লযুদ্ধে রতন সিংকে পরাজিত করিতে হইবে।"

গদাধর। এক্ষণে পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পরীক্ষার পর, বাটী যাইব; বাটী হইতে ফিরিয়া, মহাশয়ের আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিব।'

৭

আমরা এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে চারুশশী নাম্নী এক বালিকার কথা বলিয়াছিলাম। বালিকারা চিরকাল বালিকা থাকে না। একদিন তাহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া, কৃষ্ণকেশের আন্দোলনে, ভ্রূর আকুঞ্চনে, নয়নের সম্মোহন-বাণবিক্ষেপণে এবং ললিত বিগ্রহের লাবণ্যহিল্লোলসঞ্চালনে সুস্থিরা স্থিরাকে সম্যক্‌প্রকারে অস্থিরা করিয়া তুলে। তখন আমরা তাহাকে যুবতী বলি। এক্ষণে চারুশশী যৌবনের সম্পূর্ণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ঢল ঢল যৌবন-নদী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া, কল কল নাদে উছলাইয়া পড়িতেছিল।

এক্ষণে সে আর পিতৃগৃহে বাস করিত না। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া বহুপূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সে শ্বশুরালয় শ্বশুর, শ্বশুর্শ্রা, এবং শ্বশ্রু-বিহীন। একটী শ্মশ্রুহীন বয়ঃপ্রাপ্ত বালক সেই আলয়ের কর্ত্তা। তিনি একক চারুশশীর ভর্ত্তা। চারুশশী ভাত খাইবার সময় ভর্ত্তার ভর্ত্তৃত্ব মানিত বটে, কিন্তু আমরা জানি, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা সে কখন আবশ্যক বিবেচনা করিত না। কেন করিবে? পীবরোন্নত যৌবনের মহিমা-শিখরে বসিয়া পুষ্পধন্বার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত কুসুমের রাগে অঙ্গরাগ করিয়া, কোন্ মহিমাময়ী, কবে কাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে?

সেই কর্ত্তৃত্বহীন ভর্ত্তার নাম শ্রীমান্ অতুলানন্দ চৌধুরী। তিনি কলিকাতা-নিবাসী; ঝামাপুকুরে তাঁহার বাস। কমনীয় রূপ এই অতুলানন্দের। শুভ্র অকুঞ্চিত ললাটে কৃষ্ণ, কুঞ্চিত সমবিভাগে বিভক্ত কুন্তলদল। কুন্তলতলে ভ্রমরসমাশ্রিত পদ্মের মত নয়নাভিরাম লোচনদ্বয়। সুদীর্ঘ—যেন শ্বেত মর্ম্মরবিনির্ম্মিত নাসা। মণি মধ্যে পদ্মরাগ সে অধরের তুলনা,—তেমনই রক্ত জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু কোমল। অষ্ট্রীচ্ পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সুগোল শুভ্র শ্মশ্রু-শূন্য কপোল। রূপের কথা শুনিলে; এইবার এই অতুলানন্দের গুণের কথা শুন। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি বি, এ, পড়িতেন, এবং বিবাহের পর তিনি বি, এ, পাশ করিতে সমর্থ না হইয়া চারুশশীর বাহু-পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু বি, এ, পাশ করিতে না পারিলেও তিনি সহজে নানা স্থানে চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বরূপ তাঁহার বিশেষ সহায় হইত। এক্ষণে ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি জ্ঞানদা বাবুর বিপুল জমিদারীর সহকারী ম্যানেজার হইয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন এক শত মুদ্রা। এবং বেতন ছাড়া এদিকে তাঁহার দু' পয়সা......ছিল।

অতুলানন্দ বাবু ব্রাহ্মণ হইলেও, তাঁহার কায়স্থ প্রভুর পানপাত্রের প্রসাদ একটু বেশী রকম পান করিতেন।

একদিন নিশীথকালে, আহারাদির পর চারুশশী, প্রদীপালোকিত গৃহে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিল। কখন অঙ্গুলি দ্বারা অধর টানিয়া ধরিয়া নিম্ননয়নে তাহার রক্ত-শোভা অবলোকন করিতেছিল। কখন পদদ্বয় দোলাইয়া পদতলের অলক্তরাগ নিরীক্ষণ করিতেছিল, কখন মণিবন্ধে নিবদ্ধ নূতন স্বুবর্ণ-কঙ্কণের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। "টং টং"। চারুশশী শব্দানুসরণ করিয়া ব্র্যাকেটের উপর স্থাপিত ক্লকের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এগারটা বাজিয়া গেল। ওগো চারুশশীর বর! শীঘ্র গৃহে ফির। এইবার তিনি ফিরিবেন। মনিবের বাড়ি আহারের নিমন্ত্রণ—তা' যদি নয়টার সময় আহারে বসিয়া থাকেন, সাড়ে নয়টার সময় আহার শেষ হইয়াছে। তাহার পর আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা ধর—দশটা। এখন এগারটা বাজিল, এইবার তিনি বাড়ি ফিরিবেন। চারুশশী বাতায়নপথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল; দেখিল, দূরে একটা গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, রাস্তা একান্ত জনতাশূন্য হইয়াছে। ঝি থাকিলে, তাহাকে ডাকিয়া চারুশশী গল্প করিত; কিন্তু সে বোনপোর পীড়া উপলক্ষ করিয়া পটলডাঙ্গার বাজারে বারওয়ারীর যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। বাড়িতে ছিল কেবলমাত্র একটী চাকর। সে অত্যন্ত বৃদ্ধ, এজন্য বহির্বাটীতে শুইয়াছিল। ঘরে একটী সামান্য শব্দ হইল। চারুশশী একটু আশঙ্কিত হইল। বোধ হইল যেন শব্দটা খট্টাঙ্গতল হইতে উত্থিত হইল। চারুশশী কি খট্টাঙ্গ-তলে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবে? না, না, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। তাহার বুকের ভিতর...তুমি জান আমার পাঠিকা!—কি হইতেছিল? বিলম্বে গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য যে সকল মধুমাখা বাক্য তাহার স্বামীর প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে, তা'হা খট্টাঙ্গপার্শ্বে বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে চারুশশী হৃদয় মধ্যে রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। হৃৎপিণ্ডের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এখন কোনও গতিকে তাহাকে এনে দাও ঠাকুর!

আমার এক মহানাস্তিক বন্ধু বলিতেন, "ঠাকুরের কান মলিয়া দিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ঠাকুরজাতীয়দের শ্রবণেন্দ্রিয় নাই।"

কাঞ্চনপল্লীর গুপ্ত কবিও গাহিয়াছিলেন,—

"হায় হায় ক'ব কায় ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হ'য়ে তুমি হ'লে কালা॥"

ঠাকুর বাস্তবিক শ্রবণেন্দ্রিয়-শূন্য কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। শুনিছি ডাকার মত ডাকিতে পারিলে দয়াল ঠাকুর শুনিতে পান। পুরাকালে—যখন স্বয়ং ভগবানেরও সম্পূর্ণ নরমূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই—তখন প্রহ্লাদ তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন, সে ডাক শুনিয়া, শুনিয়াছি সেই দয়াল ঠাকুর আসিয়াছিলেন; আসিয়া দয়া করিয়া প্রহ্লাদকে পিতৃহীন করিয়াছিলেন। যখন মাতার দুঃখে ক্ষুব্ধ শিশু ধ্রুব তাঁহাকে 'পদ্মপলাশ-লোচন' বলিয়া ডাকিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দেখা-দিয়াছিলেন। আর যখন কৌরব-সভায় দ্রৌপদী অপমানিতা হইয়া ক্ষোভে, দুঃখে লজ্জায় তাঁহাকে "লজ্জানিবারণ" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখনও তিনি আসিয়াছিলেন, আসিয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে আপনার অন্ত-হীনতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, এক্ষণে চারুশশী ঠাকুরকে ডাকার মত ডাকিয়াছিল। বোধ হয়, তিনি তাহা

শুনিতেও পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে শুনাটা একটু "উল্টা বুঝিলি "রাম"—গোছের না হইয়াছিল। কেননা, তিনি গৃহ-মধ্যে চারুশশীর মনোচোরের পরিবর্ত্তে একটী আসল সজীব চোরকে সশরীরে আনিয়া দিয়াছিলেন। চোর বিশ্রী ও কাল। অতুলানন্দ তাঁহার অতুল রূপ লইয়া চারুশশীর হৃদয় মধ্যে যে আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত করিতে পারিতেন, এ বিশ্রী, কাল চোর তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই। সে তাহার বক্ষের ভিতর দুরু-দুরু-ত্রাস অতি ভয়ঙ্করভাবে সঞ্চারিত করিয়াছিল।

দারুণ বিভীষিকায় চারুশশী যৌবন-দীপ্ত দেহের তপ্ত রক্ত জল হইয়া গিয়াছিল। সে অর্দ্ধস্ফুট বিকট চীৎকার করিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিন্নমূল কদলী-কাণ্ডের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। বর্ব্বর চোর স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ যুবতীর, সম্মান জানিত না। সে অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহার অনিন্দ্য অঙ্গ হইতে অলঙ্কারসকল সবলে সংগ্রহ করিল। অঞ্চল হইতে পরিমার্জ্জিত কুঞ্চিকাগুচ্ছ গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা পেটক সকল উদ্ঘাটিত করিল, এবং তাহার মধ্য হইতে যাবতীয় মূল্যবান্ দ্রব্য এবং প্রভুকে প্রবঞ্চনা করিয়া যে প্রচুর অর্থ অতুলানন্দ বাবু তন্মধ্যে সযত্নে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, তাহা অপহরণ করিল। অতি সহজে কৃতকার্য্য হইয়া, চোর অপহৃত দ্রব্যসকল বস্ত্রমধ্যে লইয়া আনন্দচিত্তে (চোরের চিত্তে কখন কি আনন্দ আসে ?) নিঃশব্দপদক্ষেপে বহি-র্বাটীতে আসিয়া, বহির্দ্বারের অর্গল উন্মোচন করিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া কে এ? চোর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল—পলাইবে। বৃথা চেষ্টা। যে ব্যক্তি বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, সে গদাধর। আহারের পূর্ব্বে এবং আহারের পর অতুলানন্দ বাবু একটু বে-আন্দাজ রকম পান করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এরূপ উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পদব্রজে বা শকটারোহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি গদাধরকে আহ্বান করিয়া বিজড়িতস্বরে কহিলেন—গদাধর ভাই, আমি আজ রাত্রে বাড়ি ফিরিতে পারিতেছি না। তুমি আমার বাটীতে যদি এ সংবাদ দিতে এবং বাটীর সংবাদ লইতে পার, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।" গদাধর তাহা শুনিয়া, অল্পকাল মধ্যে ঝামাপুকুরে অতুলানন্দ বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু অতুলানন্দ বাবুর ভৃত্যের নামটি সহসা স্মরণ না হওয়ায়, তাহা স্মরণ করিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত তথায় অবস্থিতি করিল। তৎপরে বিস্মিত হইয়া দেখিল, দ্বারটী আপনা হইতে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইল এবং উন্মুক্ত দ্বার-পথে এক অপরিচিত ব্যক্তি বস্ত্রমধ্যে কতকগুলি দ্রব্য লইয়া নির্গত হইবার সময় তাহাকে দেখিয়া সহসা অতিবেগে পলায়নপর হইল।

চোরের পলায়ন অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গদাধরের মনে প্রতীতি জন্মিল যে, এই অপরিচিত ব্যক্তি গৃহমধ্যে কোন গুরুতর অসৎকার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ তীরতীব্রবেগে তাহার অনুসরণ করিল, এবং অক্লেশে তাহাকে ধৃত করিয়া, অতুলানন্দ বাবুর গৃহদ্বারে ফিরিয়া আসিল। এবং তাহার ভৃত্যের সাহায্যে অপহৃত দ্রব্যসকল উদ্ধার করিয়া, অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় গদাধর মৃতকল্পা চারুশশীর চৈতন্য বিধান করিল।

অতুলানন্দ বাবুর নিকটে আসিয়া, গদাধর কহিল, "অদ্য রাত্রেই আপনাকে বাটী ফিরিতে হইবে। বাটীতে চোর প্রবেশ

করিয়াছিল, এজন্য আপনার স্ত্রী বিশেষ-রূপ ভীত হইয়াছেন।”

অতুলানন্দ স্বপ্নঘোরে গাহিল,—

“—গো শঙ্করি!
নৌকা হ’ল বাণচাল বল কি করি।

গদাধর দেখিল, এ সুরাপ্রমোদিতের চৈতন্য-সম্পাদন চেষ্টা বৃথা। অতএব সে, ভয়ব্যাকুলা চারুশশীর নির্দ্দেশমত অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভারতী মঙ্গল-কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রিপদী।

পদ্মযোনি যোড় হাতে, স্তব করে নানা মতে,
শ্রীহরিকে রাধিকার সনে।
শুন মাতা স্তুতি মোর, নিবেদি চরণে তোর,
স্বর্গপুরী হৈল জলহীনে।
তোমার দেখিয়া কোপ, গঙ্গাদেবী হৈলা লোপ,
সৃষ্টি নাহি থাকে গঙ্গা বিনে।
করহ অভয় মাতা, তবে গঙ্গা আইসে এথা,
আজ্ঞা কর যদি লয় মনে॥
শুনিয়া এমত বাণী, বলে রাধা ঠাকুরাণী,
কোপ ক্ষমা কৈল প্রজাপতি।
তবে স্রষ্টা হর্ষমনে, প্রভুর চরণ ধ্যানে,
পুন জন্মাইলা ভাগীরথী॥
গঙ্গা সেই পর পারে, আসিলা অবনীপরে,
শুন বিবরণ কালিদাস।
যেই শুনে দৃঢ়মনে, বাস তার স্বর্গস্থানে,
বলিহে অপূর্ব্ব-ইতিহাস॥
সূর্য্যবংশে অবতার, সগর আখ্যান যার,
মহাতেজা বস্ত ক্ষিতিপতি।
করি বহু মনোরথ, যজ্ঞ অশ্বমেধ শত,
আরম্ভিতে করিলা যুকতি॥
নানা দেশী মুনিগণ, কৈলা রাজা নিমন্ত্রণ,
আইল সব ভূপের স্মরণে।
ভক্ষ্য দ্রব্য ছিল যত, তাহারা কহিব কত
অন্নচয় পর্ব্বতপ্রমাণে
কুল্যাপূর্ণ মধু দধি, ঘৃত কৈল জলনিধি,
শর্করাদি এই অনুক্রমে।
অন্বেষণ করি অতি, আনাইলা নরপতি,
যত যোগ্য শত তুরঙ্গমে॥
আসি ঋষি মুনিগণ, কৈল লগ্ন শুভক্ষণ,
সংযমিতে রৈলা নরেশ্বর।
ইথে অবসরক্রমে, হরে এক তুরঙ্গমে,
নিশাকালে দেব পুরন্দর॥
অশ্বের রক্ষকগণে, আনাইল রাজস্থানে,
কেবা জানি নিল এক হয়।
শুনি অসম্ভব বাণী, চিন্তাযুক্ত নৃপমণি,
অন্তরে দুঃখিত অতিশয়॥
বাইট সহস্র সুতে, ডাকি বলে নরনাথে,
বাক্য মোর শুন পুত্রগণ।
যেবা ঘোড়া কৈল চুরি, অবশ্য তাহাকে মারি,
আনহ তুরঙ্গ এইক্ষণ॥
শুনি বাক্য অদ্ভুত, চলে সব নৃপসুত,
ঘোটকের করিতে তলাশ।
সকল পৃথিবী দেখি, ঘোড়া না পাইয়া দুঃখী,
রাজগণ হইল হতাশ
কষ্টমনে ভ্রমি ফিরে, দেখে এক হ্রদদ্বারে,
ঘোটকের পদচিহ্ন-দাগ।
প্রবেশিয়া সেই পথে, উত্তরিয়া পাতালেতে,
তুরঙ্গম পাইলেক লাগ॥
কপিল মুনির কাছে, দেখে ঘোড়া বান্ধা আছে,
মুনি চোর জানি নৃপসুতে।
কৈল তাঁকে অপমান, ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান,
নৃপগণ ভস্ম দৃষ্টিপাতে॥

সগর নিকটে আসি, বলেন নারদ ঋষি,
শুন রাজা বিষম ভারতী।
তব সুতে কৈল পাপ, কপিলে দিলেন শাপ,
ভস্ম হৈল সকল সন্ততি
শুনি রাজা হেন বাণী, বহু দুঃখ মনে গণি,
অংশুমানে ডাকি আনি বলে।
শুন বাপু মোর কথা, যাও কপিলের তথা,
এত শুনি অংশুমান চলে॥
নৃপাঙ্গজ লঘুগতি, গেল কপিলের তথি,
দেখে মুনি বসিয়াছে ধ্যানে।
অংশুমান নৃপবরে, বিস্তর মিনতি করে,
কপিলের ধরিয়া চরণে॥
মুনি বলে মহারাজ, মোর স্থানে কোন কাজ,
বিস্তারিয়া বল বিবরণ।
রাজা বলে কৃপাময়, দেও এই যজ্ঞ-হয়,
তবে বলি এই নিবেদন॥

এত শুনি মুনিবরে, তুরঙ্গম দিল তারে,
তবে রাজা যোড় করে বলে
নিবেদি চরণতলে, পিতৃ ন সকলে মোর,
পরিত্রাণ হবে কিবা কৈলে॥
মুনি তুষ্ট হৈয়া মনে, কহে অংশুমান স্থানে,
বিনা গঙ্গা না হবে নিস্তার।
বিধিমতে তপ করি, আন তুমি সুরেশ্বরী,
কহিল সকল সমাচার॥
মুনিকে প্রণাম করি, নিজ হস্তে অশ্ব ধরি,
লৈয়া গেল সগরের কাছে।
অংশুমানে কোলে লৈয়া, সগর পুলক হৈয়া,
দুটি বাহু তুলি রাজা নাচে॥
ক্রতু সাঙ্গ করি রাজা, বনে চলে মহাতেজা,
অংশুমানে অভিষেক করি।
সরস্বতী পদাম্বুজে, ভনে রাজসিংহ দ্বিজে,
কৃপা কর তায় মহেশ্বরী

ক্রমশঃ

জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস।

অতি প্রাচীনকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের স্ব স্ব দেশের অবস্থানুসারে তথাকার সাহিত্যের গতিও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। রামায়ণ মহাভারতের যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক সাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই কথা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। যে অখণ্ড শান্তিপ্রভাবে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি অমর কবির মধুর বীণাঝঙ্কার একদিন সমগ্র ভারতভূমি মাতাইয়া তুলিয়াছিল, বহু দিন পরে—বহু রাষ্ট্রবিপ্লবের অবসানে আবার সেই শান্তি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বৈষ্ণব কবিগণ আবার তান ধরিলেন।

বাস্তবিক ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন সাহিত্য-জগতে বৈষ্ণব-কবিগণের গীতিকবিতাই একমাত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই সকল কবির মধ্যে যে তিন জন সাধারণের হৃদয়মন্দিরে উচ্চ-আসনে সমাসীন রহিয়াছেন, তাঁহাদেরই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইবে।

উল্লিখিত কবিত্রয় আর কেহই নহেন, আমাদের শ্যামা বঙ্গজননীর আদরের সন্তান জয়দেব, বিদ্যাপতি* এবং চণ্ডীদাস।

* (১) "বিদ্যাপতি মৈথিলি কবি হইলেও, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা অন্যায় নহে; বল্লালসেন বাঙ্গালা দেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে মিথিলা এক ভাগ। * * * লক্ষ্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালী রাজা হইলেও বাঙ্গালীরা লক্ষ্মণ সম্বৎ ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু

তিন জনেই বিভিন্ন পথের পথিক, কিন্তু তাঁহাদের গন্তব্যস্থান এক। তিনি জনেই বিভিন্ন ভাষার কবি, কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। "কানুর পিরীতি" তিন জনেরই সম্বল। সেই "পিরীতি" যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তিনি তেমনি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

জয়দেব এবং বিদ্যাপতি এই প্রেমকে সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাস ইহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে।

পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয় বাহ্য প্রকৃতির সাহায্যে অন্তরের প্রেমকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে কার্য্য অপরের সাহায্যে সম্পাদন করিতে হয়, তাহার কৃতকার্য্যতার সম্বন্ধে অনেকটা সন্দেহ থাকিয়া যায়। কাজেই অনেক স্থলে তাঁহারা আপনার মনের ভাবটীকে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই।

চণ্ডীদাস এই প্রেমকে কিরূপ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়াছেন ঃ—

(১)

"পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন-মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল ভয় লাজে॥
দেব বিধিপর সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে॥
দুহুক অধর, সুধারস বাণী
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর॥"

(২)

"পিরীতি পিরীতি কিরীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগাল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা?
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল,
পরাণ-পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি-অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।

মৈথিলি পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-স্মারক লক্ষ্মণ সংবৎ বল্লালের যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালার অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইব? এতদ্ব্যতিরিক্ত বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালী হৃদয়, তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এবং সে রস চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মুর্ত্তিমান্ হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতা-কুসুম সাদরে বঙ্গ-কাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।"

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

(২) "পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশের লোকেরা ও বঙ্গদেশের লোকেরা আপনাদিগকে প্রায় এক দেশের লোক বলিয়া মনে করিত। মিথিলা পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেক দিন অবধি সেনবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তথায় বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের অব্দ এখনও প্রচলিত আছে! এই সকল কারণবশতঃ মিথিলা প্রদেশের লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের লোকদিগের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল।* * মিথিলার সঙ্গে যখন বঙ্গদেশের এতদ্রূপ নিকট সম্বন্ধ ছিল, তখন ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলি হিন্দীতে এবং কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছেন।"

রাজনারায়ণ বসু।

বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥"

(৩)

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব,
তা বিনু সকলি পর ॥
পিরীতি দ্বারের, কপাট করিব,
পিরীতি বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব,
পিরীতি গোঙাব কাল ॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি সিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি সরসে, সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসার, বেসর করিব,
দুলিবে নয়নকোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥"

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন স্থলে কবিত্বের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন;—"নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।" সুতরাং যথার্থ কবি হইতে হইলে ঐ সকল প্রাণের বাহিরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রাণের সরল অনাড়ম্বর ভাবগুলিকে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। জয়দেব এবং বিদ্যাপতি কাটা ছাঁটা ঝঙ্কারময়ী ভাষায় বাহিরের ভাবটীকে যেমন ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, প্রাণের কথা—অন্তরের ব্যথা ততটা বাহির করিতে পারেন নাই।

জয়দেব এবং বিদ্যাপতি কাঁদিতে জানেন না। তাঁহারা নায়ক-নায়িকার ক্রীড়ায়, ভ্রমণে, মানে, কলহে, অভিসারে, সৌন্দর্য্য খুঁজিয়াছেন, আর সেই সৌন্দর্য্য-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত মিশাইয়া তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। চণ্ডীদাস বাহ্য প্রকৃতির সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন না, তিনি সহজ কথায়—সহজ ভাষায় একটীর পর একটী করিয়া হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবগুলিকে বাহির করিয়া আনেন। চণ্ডীদাসের রাধা যখন প্রিয়া বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায় যখন সেই শ্যামের মূর্ত্তিই একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছে; শ্যামকে পাইলে তাহার পদে যখন আপনাকে উৎসর্গ করিতে উদ্যত, বিদ্যাপতির রাধা তখন মনোহর ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছেন:—

"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরখিব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরখিব
সুরতরু বাঁঝ কি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥

জয়দেব গাহিতেছেন:—

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল-
মলয়সমীরে,

মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিত-
কুঞ্জকুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সখি বিরহিজনস্য
দুরন্তে ॥"

প্রথমতঃ ভাষার অপূর্ব্বছটায় সুবিন্যস্ত অনুপ্রাস সমূহের মধুর ঝঙ্কারে চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার সম্মুখে প্রকৃতির সেই উন্মত্ত নর্ত্তন ক্রমশঃ মানস-নয়নে প্রতিভাত হইতে থাকে। হৃদয় অজ্ঞাতে অবসন্ন হইয়া আইসে। ভাষার অন্তরালে কোন্ ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইবার অবসর থাকে না।

মলয়ানিল এবং লবঙ্গলতার অনুরাগালিঙ্গন, পিকগণের কুহু রব, মধুকরের ঝঙ্কার এই সকল দর্শন ও শ্রবণের পর হরি যে অন্য 'যুবতীজনের' সহিত বিহার করিতেছেন, ইহা জানিবার সাধ না হওয়াই স্বাভাবিক।

বিদ্যাপতির ভাষানুরাগও জয়দেবের অনুরূপ, অনর্থক কতকগুলি উদাহরণ দিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই।

ফলতঃ বিদ্যাপতি এবং জয়দেব বক্তব্য বিষয়টিকে এতদূর অলঙ্কৃত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহার মর্ম্মলাভ আয়াসসাধ্য। সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনেকটা বিফল হইয়া পড়িয়াছে।

জয়দেব এবং বিদ্যাপতি যাহা পারেন নাই, চণ্ডীদাস তাহা পারিয়াছেন। তিনি আপনি কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইয়াছেন। জাগতিক দুঃখের মধ্যে অনুপম সুখজ্যোতির আভাস পাইয়াছেন; সেই অনন্ত দুঃখকে বরণ করিয়া আপন ঘরে তুলিয়াছেন। জয়দেব এবং বিদ্যাপতির ভাষার ও অলঙ্কারের গণ্ডী পার হইয়া ভাবের অনুসন্ধান করিতে হয়। চণ্ডীদাসের ভাব আপনি কোন্ অজানিত শক্তিপ্রভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

প্রিয় বস্তুকে আপনার করিয়া লইবার ইচ্ছার নাম অনুরাগ। এই অনুরাগ ব্যক্ত করা তিনজন কবিরই মুখ্য উদ্দেশ্য। একজনের চেষ্টা সফল হইয়াছে, অপর দুইজনের চেষ্টা অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে।

"যখন হৃদয় কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, কি স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে,সেইটুকু গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী।"

এ বিষয়ে একমাত্র চণ্ডীদাসই গীতি-কবিতার সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। যেখানে যে ভাবটী অব্যক্ত, সেইখানে সেই ভাবটীই চণ্ডীদাস অল্প কথায়—বিনা পরিশ্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন।

দৃষ্ট বস্তু পুনরায় দেখাইবার জন্য কবির প্রয়োজন নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আপনিই লোকের নয়ন আকৃষ্ট করে, সে সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার জন্য অপর কাহারও আবশ্যক হয় না। যে কবি তাহাই দেখাইতে যান, তাঁহার কবিত্ব ব্যর্থ হইয়া যায়।

আবার অনেক সময়ে মানুষ আপনার মন আপনি বুঝিয়া উঠিতে পারে না; অনেক সময় বুঝিতে পারে না প্রাণ কি চায়, তাহার কিসের অভাব। কবি দূরে থাকেন, অথচ চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেন। তাই কবির এত সম্মান।

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস মনের কথা বলিবার চেষ্টা যতটুকু করিয়াছেন, দৃষ্ট বস্তু

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে　　জীবনে মরণে
প্রাণবন্ধু হইও তুমি ॥

কলহের পর শ্যাম আত্মগোপন করিয়াছেন। রাধার মান অপমান সব লুপ্ত হইয়াছে। যিনি একদিন বলিয়াছিলেন ;—

"জনম অবধি　　মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।"

তিনি আবার সব ভুলিয়া সখীকে বলিতেছেন ;—

"সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র　　দৈবে শুকায়ল
তিয়াষে পরাণ যায় ॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনি বলিয়া　　বোলনা তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে,　　করিনু ভাবন,
বিহি সে করল বাদ ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন　　হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে,　　আইসে করিবে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ।"

জয়দেব ও বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কবিতার বিশেষত্ব কি, এতক্ষণ তাহাই দেখান হইল। এক্ষণে জয়দেব এবং বিদ্যাপতি উভয়ের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখা যাউক।

উভয়ের কবিতায় বাহ্যতঃ অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, মূলতঃ কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। উভয়েই প্রকৃতির দাস—সমান সৌন্দর্য্যগ্রাহী। ভিতরের সুখ-দুঃখ অনুসন্ধানের কষ্ট স্বীকার করিতে উভয়েই পশ্চাৎপদ।

বিদ্যাপতি এবং জয়দেবের পদের মধ্যে এমন অনেক পদ পাওয়া যায় যে, একটী আর একটীর প্রতিধ্বনি বলিয়া ভ্রম জন্মে। দুই একটী উদাহরণে বোধ হয় কথাটা স্পষ্টতর হইবে। জয়দেব মান ভাঙ্গাইবার জন্য বলিতেছেন :—

"সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়ন শরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং যেন বা
ভবতি সুখজাতম্ ॥"

বিদ্যাপতি বলিতেছেন ;—

"হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত ॥
ভুজপাশে বান্ধি,—জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি ॥
উরু কারাগারে বান্ধি রাখ দিনরাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি ॥"

জয়দেব গাহিতেছেন ;—

"হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দল-শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥"

বিদ্যাপতি গাহিতেছেন ;—

"কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর, হুঁউ বরনারী ॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতী মাল শিরে, নহ গঙ্গ ॥
মোতিম বদ্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন, নহ সিন্দুর বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ, উরে মণিহার ॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক ॥"

যেখানে উভয়ের মনের গতি বিভিন্ন পথে—উদ্দেশ্য বিভিন্নমুখী, সেখানে একজন

আর একজনের প্রদর্শিত পথ সহজে অবলম্বন করিতে চাহে না।

যে চাহে, হয় সে কবি নহে, নয় সে অপরের পরমভক্ত। বিদ্যাপতি যখন জয়দেবের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তখন জয়দেবের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্তি আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের ভাবসামঞ্জস্যের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জয়দেব এবং বিদ্যাপতির কবিত্বের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। একজন যেমন ভাবে যেমন ভঙ্গীতে গাহিয়াছেন, অপরেও তেমনি ভাবে তেমনি ভঙ্গীতে গাহিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাস যে ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব—সম্পূর্ণরূপে নূতন, অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কবির পরিচয় ভাষায় নহে—ভাবে। সুতরাং তিনজন কবির ভাষা তিন প্রকার হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের তুলনায় বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক দেখিতে পাই না। এই তুলনায় চণ্ডীদাসই প্রথম স্থান পাইবার অধিকারী। কারণ তিনি প্রাণের কথা কহিতে পারেন—পরকে আপন করিতে জানেন।

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী

পতি-সেবিকা।

নিবিড় বরষা জলদ সম
কুন্তল ঘন তার,—
কপোল চুম্বি ঈষৎ লম্বি
মৃদুল দুলিছে তার।
গুরু নিতম্বা— ক্ষীণা রমণী
সরল কদলী উরু;
কবজ কণ্ঠে ডাগর চক্ষু;
টানা টানা দুটি ভুরু
বরষা বুঝি রহিতে নারি—
আঁখি দেখি মনোহর,
কাঁদনের ছলে নয়নে পশি
ঝরিতেছে ঝর ঝর।
জানি না কেন যে কাঁদিছে দুঃখিনী
ঘন কম্পন হস্ত;
বুনো কচু, ঘাস, কাঁটা ভরা গাছে—
নেবু তুলিবারে ব্যস্ত।
গোয়ালে লতিকা ঝোপ্‌সা গাছ
ঘিরে আছে পরিপাটি;
বরষার জলে দীর্ঘ ঘাসে
জোঁকে করে ছুটাছুটি।

রঙ্গিন বসন আজানু টানি—
ভগ্ন ব্যথিত প্রাণে,
চেয়ে চেয়ে ঘাসে পা দু'খানি ফেলি
লতা ধরি জোরে টানে।
এধারে ক'টি ফড়িঙ ছিল
লাফ দিয়া পড়ে অঙ্গে;—
পালাতে ছুটে দর্দ্দুর শিশু
চরণে মরিল সঙ্গে।
দুঃখের উপর আবার পাপ,
কপাল ভারি মন্দ।
ভেকের মরণে— কাঁদিল সতী
আঁচলে নয়ন বন্ধ।
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝরিছে বাদল,
কেহ নাহি কোন খানে,
সিক্ত বসনে— রমণী পুন
নেবু ডাল গিয়া টানে।
ধীরে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে
কাঁটার ভিতরে ঢুকি,—
পিঞ্জরে ভরা পাখীটীর মত
চারিধারে মারে উঁকি।

আঁচলের খুঁটে গোটা দুই নেবু
বাঁধিয়া যুবতী হরষে
বাহিরে আসিল কোমল বাহুতে
রুধির দরদে বরষে।
বরষার সেই আবিল জলে
অঙ্গ-রুধির মুছিয়া—
চলিল বালা চঞ্চল পদে
বেলা হল' বেশী বুঝিয়া।
কহিলাম, ওগো বরবর্ণিনি
জানিতে কি যায় পারা,
ক'র লাগি আজ কণ্টকে বল
বহিল রুধির-ধারা?
সোণার বরণ চরণ দুটি
কণ্টকময় করি,
কি কারণে আসা, একা ফল পাড়া
নেবু ডাল নুয়ে ধরি?
আনত-নয়না বিষাদ অধরে
উঠিল গো যেন ফুটি—
কলেরায় পতি—মরণের দ্বারে;
তাঁরে দিব নেবু দুটি।
দারুণ পিয়াস, তীব্র যাতনা
উদরে বাড়ে গো দায়;
শুনেছি,—বলে; আশু উপশম—
নেবু-রসে হয় তার।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

আর্য্য-জ্বর-চিকিৎসা—

কবিরাজ ধনঞ্জয় নন্দী প্রণীত। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ নন্দী কর্তৃক পাইকপাড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

এই গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ মতে বিবিধ জ্বরের লক্ষণ ও তাহাদের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। জ্বর-চিকিৎসা-কার্য্যে সাধারণের সহজবোধ্য জ্বরের লক্ষণাদি ও জ্বরকালীন অবশ্য-প্রতিপাল্য কতকগুলি বিষয় অবগত হইয়া যাহাতে সকলে স্ব স্ব স্বাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ হন, এই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ। মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া গ্রন্থোক্ত উপদেশগুলি গ্রহণ করিলে অনেকেই উপকার লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

রত্নমালা প্রথম খণ্ড—

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

রাজনীতি অতীব জটিল বিষয়; এজন্য অনেকেই উহার আলোচনায় বিমুখ হইয়া থাকেন। কিন্তু জটিল হইলেও উহা সকলেরই জ্ঞাতব্য। কেবল যে রাজার বা রাজপুরুষগণেরই রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা আবশ্যক এরূপ নহে, অপর-সাধারণেরও উহাতে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রাজার সহিত প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ, প্রজার উপর রাজার কতদূর কর্তৃত্ব আছে, কিরূপ কার্য্য করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়, ইত্যাদি জ্ঞান রাজনীতির আলোচনা হইতেই উদ্ভূত হয়। সুতরাং সংসারী লোকমাত্রেরই এ বিষয়ের আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বকালে যখন হিন্দুরাজগণ কর্তৃক দেশ শাসিত হইত, তখন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে রাজনীতির বিধান করিয়া রাজাকে কর্ত্তব্য-পথে পরিচালিত করিতেন; রাজা-প্রজা উভয়েরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া সমাজকে বিশৃঙ্খলার হস্ত হইতে

রক্ষা ও তাহাকে উন্নতিশীল করিতেন। কালে রাজপরিবর্ত্তনের সহিত সেই সকল নীতির অনেকাংশে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলেও এখনও অনেক রাজকার্য্য সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারেই সম্পাদিত হইতেছে। স্থলবিশেষে ঐ সকল নীতির কিয়দংশ রূপান্তরিত হইয়াছে।"

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই প্রাচীন হিন্দু-রাজনীতিসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, মনুসংহিতা, অত্রিসংহিতা প্রভৃতি বহুবিধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইহা সঙ্কলিত। ইহাতে রাজার কর্ত্তব্য ও রাজকীয় যাবতীয় কার্য্য, বিচারাদি, যুদ্ধ-নীতি, সামদানাদি ব্যবহার, সৈন্য চালনা, ব্যূহরচনা, অস্ত্রাদি সংগ্রহ, সন্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ই বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার ভাষা অতি সরল। বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নে মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তাহা যে গ্রন্থের যে স্থান হইতে গৃহীত, তাহাও লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বোধ হয়, ইহার "রত্নমালা" নাম সার্থক হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর এরূপ উপাদেয় পুস্তক অতি বিরল। আশা করি, রত্নমালা সুধীসমাজে সম্যক্ সমাদৃত হইবে।

সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ—শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে এম, রঙ্গচারী এম, এ, রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য বার আনা।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রণীত সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহের কথা অনেকেই জানেন। ইহাতে বৌদ্ধ, আর্হত, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, প্রভাকর, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদব্যাস, বেদান্ত প্রভৃতি বাদিগণের মত আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃত ও ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল পুস্তকে যে সকল পাঠান্তর আছে, তাহাও নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিশেষে অগ্নিষ্টোম যাগ, অণিমা, কোষ, কর্ম্ম, উপনিষদ্ প্রভৃতি শব্দসমূহের বর্ণমালানুসারে ইংরাজী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্ম—শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এস্. কে, লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার মহাশয় সর্ব্বজনপরিচিত। যিনি স্বীয় বিদ্যাবলে এক সময় বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বুদ্ধি-নৈপুণ্য দর্শনে বৈদেশিকগণ পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী হইতে এই পুস্তক উদ্ভূত হইয়াছে। পুস্তকের আলোচ্য বিষয় যেমন গভীর, আলোচনাও সেইরূপ গভীরভাবে হইয়াছে। পুস্তকের উদ্দেশ্য কি, তাহা ইহার ভূমিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে।

"সকল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা, এবং নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা, মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আমরা বাহিরে যে বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাই, ও অন্তরে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাব অনুভব করি, তদ্দ্বারা সেই তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা নিরন্তর উত্তেজিত হইতেছে। * * * তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা আমাদিগকে জ্ঞানার্জ্জনে প্রণোদিত করে এবং উন্নতির চেষ্টা আমাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মানুষ্ঠানই মানবজীবনের প্রধান কার্য্য। জ্ঞান ও কর্ম্ম অসম্বদ্ধ নহে, ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ। অধিকাংশ স্থলেই জ্ঞানার্জ্জন জন্য নানাবিধ কর্ম্মের প্রয়োজন এবং কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য নানাবিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক। * * * জ্ঞানের লক্ষ্য তত্ত্ব বা

সত্য, কর্ম্মের লক্ষ্য ন্যায় বা নীতি। যেস্থলে যাহার উপলব্ধি হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া আমাদের অনেক সময়ে রজ্জুতে সর্পদর্শনবৎ ভ্রম হয়। সেই ভ্রম নিরাকরণ-পূর্ব্বক সত্যের উপলব্ধি জ্ঞানের লক্ষ্য, এবং যেস্থলে যে কর্ম্ম করা উচিত, তাহা না করিয়া আমরা অনেক সময়ে বর্ত্তমান ক্ষণিক দুঃখ এড়াইবার ও ক্ষণিক সুখ পাইবার জন্য ভাবী স্থায়ী মঙ্গলকর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অমঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। সেই অন্যায় প্রবৃত্তিদমনপূর্ব্বক সুনীতি অবলম্বনে অভ্যাস কর্ম্মের লক্ষ্য। * * * জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই চরম লক্ষ্য পরমার্থলাভ।"

এই জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। বিষয়সকল অতিশয় জটিল হইলেও যথাসম্ভব সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, তদানুষঙ্গিক বহু বিষয়ই প্রসঙ্গতঃ আসিয়া পড়ে। ঐ সকল আনুষঙ্গিক বিষয়ও বিবিধ অনুকূল যুক্তি ও প্রমাণের সহিত আলোচিত হইয়া গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করিয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশ ভাগই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ে সকলের মতের সামঞ্জস্য না থাকিলেও, ইহা যে গ্রন্থকারের অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকটে ইহা যথেষ্ট সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অলৌকিক রহস্য—

মাসিক পত্র। ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

পারলৌকিক তত্ত্ববিষয়ক এই মাসিক পত্রখানি সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিলাম। সুখের বিষয়, ইহা প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যত্ন সহকারে ও নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য, যমালয়ের ফর্দ্দ, প্রেতের উপদেশ, পুনরাগমন, দাদামহাশয়ের ঝুলি, যমালয়ের পত্রাবলী এই কয়টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যমালয়ের ফর্দ্দ—রুগ্ন, অপিচ তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় প্রাপ্ত বলিয়া অনেকেই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন। পুনরাগমন, দাদামশায়ের ঝুলি, যমালয়ের পত্রাবলী পূর্ব্ববৎ কৌতূহলোদ্দীপকভাবে চলিতেছে। আমরা এই পত্রিকার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

সাহিত্য সভার শাখাসমিতিসমূহ।

(১) প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাস-সমিতি

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত জে, এন, দাস গুপ্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি, আই, ই শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এচ, ডি, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, রায়

বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্ এ।

(২) গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, ব্রি, এস, আই ইত্যাদি।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী এম, এ, বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী এম, এ, বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণনাথ সেন বিদ্যানিধি, এম, এ, এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি, এবং শ্রীযুক্ত স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৩) পারিভাষিক সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য, শ্রীযুক্ত স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, রায় বাহাদুর, এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম, এস।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৪) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ, শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায় বি, এ, বি, এল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৫) সংস্কৃতভাষা-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ,বি, এল, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ, বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি,এ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি, এ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম, বি, এবং শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ সেন এম, এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৬) দর্শন-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী এম, এ, বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম, এ, এল, এম, এস।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৭) ইংরাজি সাহিত্য-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এম, এ, ডি, এল, সি, এস, আই।

সভ্যগণ শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত জে, এন, দাস গুপ্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ,বি, এল, সি, এস, আই, শ্রীযুক্ত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ,শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী, এম, এ, বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী এম, এ, বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর এম, বি, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি,এল, শ্রীযুক্ত স্যার প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম,এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ বি, এ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাস এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

(৮) পত্রিকা-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-বাহাদুর।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম. এ. বি, এল, শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম. এ, শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুনী-লাল বসু বাহাদুর এম, বি, শ্রীযুক্ত মনো-মোহন বসু, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ,শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার,শ্রীযুক্ত অমৃত-লাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি,এ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি,এল, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ বি, এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায় বি. এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র।

(৯) পুস্তকালয়-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সভ্যগণ—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ.শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বনোয়ারি আনন্দ দেব বাহাদুর শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি. আই, ই, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রলাল দে, শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার এবং শ্রীযুক্ত হরিধন দাঁ।

(১০) গ্রন্থপ্রচার-সমিতি।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

সভ্যগণ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্ক-বাগীশ, শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন এম, এ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণনাথ সেন বিদ্যানিধি এম এ. এল, এম, এস,শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ এম বি,শ্রীযুক্ত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু বি, সি, ই, শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ. শ্রীযুক্ত সুবল-চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পিএচ, ডি, শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড]   ১৩১৭ সাল, আষাঢ়।   [৩য় সংখ্যা।

ভারতে গোজাতির অবনতি ও তন্নিরোধের উপায়চিন্তা।

"নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য
এবচ
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো
নমো নমঃ ॥"

আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতভূমি সম্প্রতি নানাপ্রকার দুঃখ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিয়ত ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন; ইহার অশেষবিধ কারণ বিদ্যমান থাকিলেও গোজাতির অবনতি এবং ক্রমশঃ বিলোপই যে ইহার একটী প্রধান কারণ, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে। অভিনিবেশসহকারে আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, গো-কুলের রক্ষা ও উন্নতির উপরই ভারতবর্ষের কল্যাণ নির্ভর করে। ফলতঃ "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" এই প্রসিদ্ধ বাক্যের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। কৃষি, বাণিজ্য এবং পরিচালন, ভারবহন এবং নানাবিধ পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য উৎপাদনের মূলীভূত কারণই গোজাতি। ধর্ম্মকার্য্যেও গাভীই হিন্দুজাতির প্রধান অবলম্বন। গোসদৃশ মহোপকারী প্রাণীর অবনতিতে যে ভারতের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহার অসীম উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই ত্রিকালদর্শী আর্য্য মহর্ষিগণ এতাদৃশ জীবের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে নানাবিধ সুব্যবস্থা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গাভীকে সাক্ষাৎ ভগবতী-স্বরূপ ভক্তি করিবার আদেশ ও উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রাচীন মীসর (Egypt) দেশবাসী জ্ঞানিগণও গোজাতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মযাজকগণও বৃষভ-চিহ্নাঙ্কিত বস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের দেহ আবৃত করিতেন। ইহা গোজাতির প্রতি ভক্তির নিদর্শন বলিতে হইবে। সত্য বটে যে, স্মরণাতীত বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্য্যগণ গোমেধ-যজ্ঞে গোবধ করিতেন এবং খাদ্য স্বরূপ গোমাংসের ব্যবহারও তদানীন্তন কালে অপ্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এ বিষয়—দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার বেদ-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৈদিক কালে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল না। এ বিষয় আমার মতামত প্রকাশ করার শক্তি নাই; কারণ আমি বেদে লব্ধাধিকারী নহি। কিন্তু যাহাই হউক, অসীম জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ যখন গাভীর আত্যন্তিক উপকারিতা এবং গোমাংসের

যথেষ্ট অপকারিতা সম্বন্ধে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই ভারতে গোবধ পাপজনক বলিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইল এবং ধর্ম্মের শাসনে সকলেই সেই শাস্ত্রবাক্য অবনতমস্তকে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অদ্যাপি সেই ধর্ম্ম-শাসনের বল অপ্রতিহতভাবে হিন্দুর হৃদয়ে ক্রিয়া করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, গোমাংস ভক্ষণে মানুষ অন্ধতা, কুব্জতা, খঞ্জতা চক্ষুহীনতা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়, কেবল তাহাই নহে, এই সকল ব্যাধি পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চরক সংহিতা পাঠে জানা যায় যে, গোমাংস ভক্ষণ জনিতই প্রথমতঃ অতিসার রোগের উৎপত্তি হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও বহু গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, গোমাংসে এক প্রকার বিষাক্ত কীট জন্মে, তাহা মানবের উদরস্থ হইলেই বহু প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এবংবিধ কীট অধিক জন্মিয়া থাকে; অতএব ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস যে মানুষের অখাদ্য, ইহা বোধ হয় অবিসংবাদিত সত্য। এই অবস্থায় যদি কেহ বলেন যে, প্রাচীন আর্য্যগণ যখন গোমাংস ব্যবহার করিতেন, তখন বর্ত্তমান কালে তাহা কি অনিষ্টজনক হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা বহু অনুসন্ধান দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে, কূট তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাহার পুনঃ প্রচলনের প্রয়াস পাওয়া অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। একমাত্র গোমাংস ভক্ষণাভক্ষণ দ্বারাই ম্লেচ্ছ ও আর্য্যের মধ্যে পার্থক্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার প্রমাণস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:—

"গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সদাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ:—যে গোমাংস ভক্ষণ করে বেদবিরুদ্ধ বহু প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে এবং শাস্ত্রোক্ত সদাচার বিহীন হয়, তাহাকেই ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা যায়। প্রসাধীন আমি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিশেষ কোনও কারণাধীনেই এইরূপ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

গোজাতির অবনতির অনেক কারণ আছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই প্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, যথা:—

(১) অপালন
(২) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব
(৩) গোচারণ ভূমির ক্রমশঃ লোপ
(৪) গো-মড়ক
(৫) যথেচ্ছা গোবধ
(৬) চর্ম্ম ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক বিষাদি প্রয়োগে গোবধের আতিশয্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইবে। অতএব সমস্ত বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনার চেষ্টা করাই সমীচীন বোধ হয়।

প্রথমতঃ—অপালনজনিত গোজাতির অবনতিসম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশে এতন্নিবন্ধন বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। হিন্দুজাতি গোরক্ষক হইয়া গাভীর প্রতি যে প্রকার অনাদর ও অযত্ন করিতেছেন, তাহাতে নিতান্তই লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইতে হয়। যাঁহারা এই মহানগরীতে ও অন্যান্য সহরে গোজাতির দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতেছেন,

তাঁহারা নিশ্চয়ই নীরবে অশ্রুপাত করিবেন। তঃ, কলিকাতায় গাভীর দুর্দ্দশা দেখিলে আর আমাদিগকে গো-রক্ষকের জাতি বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। দূরস্থ পল্লীগ্রামেও অধুনা যেভাবে গো প্রতিপালিত হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, অচিরেই এই মহোপকারী প্রাণী বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং আমরাও দুগ্ধাদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে—ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবীর্য্য ও হীনবল হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইব। মহামতি মহর্ষি পরাশরের ব্যবস্থা এই যে—

"পিতুরন্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ অন্তঃপুর রক্ষার ভার পিতার অথবা পিতৃতুল্য ব্যক্তির উপর, পাকশালা পর্য্যবেক্ষণের ভার মাতার অথবা মাতৃতুল্য স্ত্রীলোকের উপর এবং আত্মসম ব্যক্তির উপর গোরক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং কৃষিকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিবে। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, অজাতশ্মশ্রু, অর্ব্বাচীন বালকের উপর এই গুরুতর ভারার্পণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিলাম ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন। এক্ষণে যেভাবে গোশালা নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে যে প্রকার অযত্নে গোসকল আবদ্ধ থাকে এবং বৎসগুলির প্রতি যে প্রকার অবহেলা প্রদর্শিত হয়, তাহাতে কখনই তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না। ইহার ফলে গাভীগুলি ক্রমে ক্ষীণকায় ও ষণ্ডগুলি হীনবীর্য্য হইতেছে এবং নিরীহ বৎসগুলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। * এই কারণে দুগ্ধাদির অভাব হইতেছে এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যাদিরও বিঘ্ন ঘটিতেছে; ভারতের দুঃখ ও দৈন্যও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

প্রসঙ্গাধীন এস্থলে বক্তব্য এই যে, ষণ্ড ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতি দুর্ব্বল হওয়ায়, ক্ষেত্রকর্ষণের কার্য্য রীতিমত সম্পাদিত হইতেছে না। পল্লীগ্রামে এখন অনেক স্থলে মহিষ দ্বারা হলচালন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে নানা অসুবিধা আছে। রৌদ্রের সময় মহিষগুলি একবারেই পরিশ্রম করিতে পারে না এবং ইহাদের মলে কোনও সার নাই। বিশেষতঃ মহিষগুলি দীর্ঘজীবী হয় না এবং সময় সময় যথেচ্ছ চলিয়া যায়। মহর্ষি পরাশর বলিতেছেন, যে—

"হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্‌গবং ব্যবসায়িনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাং।"

এখন প্রায়ই একটি হালের জন্য ২টী মাত্র ক্ষীণকায় বলীবর্দ্দ ব্যবহৃত হয় এবং সময় সময় গাভী দ্বারাও হল চালিত হয়, ইহা একান্ত অন্যায়। কৃতক্লীব ষণ্ড দ্বারাও হলচালন নিষিদ্ধ ছিল, ষণ্ডই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

ক্ষেত্রকর্ষণ সময়ে বলদগুলিকে কৃষকগণ যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাক, তাহা দেখিলে নিশ্চয়ই কষ্টানুভব হয়। ৮টী ষণ্ড দ্বারা একটী হল চালিত হওয়া এখন সহজ নহে, তথাপি ২টী দ্বারা হলচালন বড়ই অন্যায়, একথা বলিতেই হইবে।

পক্ষান্তরে ইয়ুরোপীয়গণ (যাঁহারা গোখাদক বলিয়া খ্যাত) গো পালন সম্বন্ধে কত প্রকার সুব্যবস্থা এবং কীদৃশ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পশু পালন (কৃষিকর্ম্মার্থ গো-অশ্বাদি-প্রতিপালন) ব্যাপারটা কৃষিকার্য্যেরই অন্তর্নিবিষ্ট হই-

* শাস্ত্রে কথিত আছে:—"দ্বৌ মাসৌ পায়য়েদ্‌ বৎসং দ্বৌ মাসৌ দ্বৌ স্তনৌ দুহেৎ। দ্বৌ মাসাবেকবেলায়াং শেষকালে যথা রুচিঃ॥" আপস্তম্ব সংহিতা ২১ শ্লোক।

য়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সুপালন জন্য এক একটী গাভী ॥৫ সের হইতে ১/ মণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে এবং একটী এক ষণ্ড ৪।৫ হাজার হইতে ১০০০০ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে দ্রোণদোগ্ধ্রা গাভী বর্ত্তমান ছিল (৩২ সের দুগ্ধদাত্রীকে দ্রোণ-দোগ্ধ বলা হইত)। একথা কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের গাভীগুলি যখন ২৫।৩০সের দুগ্ধ দিতেছে, তখন ভারতের ন্যায় শস্য-শ্যামল ও অযত্নসম্ভূত প্রভূত তৃণশস্যাদিপূর্ণ দেশে যে দ্রোণদোগ্ধ্রা গাভী বর্ত্তমান ছিল, তাহার সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি, তাই আজ ভারতে দ্রোণদোগ্ধ্রা গাভীর অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। ভারতের ব্রহ্মণ্যদেব 'গোব্রাহ্মণহিতায়' ছিলেন; আমাদেরই কর্ম্মদোষে তিনি এখন 'তত্তদ্বধায়' হইয়াছেন, কি বিড়ম্বনা। ভারতের এখনও পাঞ্জাব প্রদেশে, হিসারী, মুলতানী এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে গুজরাট দেশে, কাটেবারী, মধ্যপ্রদেশে নাগোরী এবং পাটনা অঞ্চলের গাভীগুলি প্রচুর দুগ্ধবতী। যত্ন করিলে ইহারা ২৫।৩০সের দুগ্ধ দিতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা উদাসীন। বঙ্গদেশের গাভীগুলি /২। বা /২॥ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না, ইহারা অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি এবং অস্থিচর্ম্মসার। বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তা সর্ব্বত্র খ্যাত, কিন্তু বঙ্গদেশীয় জীব জন্তুর অবনতি দেখিলে আর সে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা যায় না। পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের এক একটী ছাগীতেও ৫।৬ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। কেবল অপালনজন্যই বাঙ্গালী গাভীগুলির এই প্রকার হীন দশা উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য জলবায়ুর দোষও যে কতকটা না আছে তাহা নহে, কিন্তু যত্ন চেষ্টা করিলে, এই দোষ অনেকপরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে দুগ্ধাদির যে প্রকার অভাব হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি গোজাতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, নতুবা গবাদির অপালনজনিত ক্ষতি প্রত্যহ গুরুতর হইতে থাকিবে। শিক্ষিত লোক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে অনেক উপকারের আশা করা যায়, কারণ "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতো লোকস্তদ-নুবর্ত্ততে।" Example is better than precept, কেবল সভাসমিতি ও বক্তৃতা দ্বারা কোনও কার্য্য হয় না। গোপালনসম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে; বাঙ্গলা ভাষায় এবংবিধ গ্রন্থ ২।৪খানা মাত্র দেখিতে পাই। কোন্ কোন্ গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী, এ বিষয় প্রবন্ধের শেষাংশে বলা যাইবে।

গোজাতির অবনতির দ্বিতীয় কারণ— পুষ্টিকর খাদ্য ও গোচারণ-ভূমির অপ্রাচুর্য্য। কঙ্ক (খোল) ভুষি প্রভৃতি দেশে ক্রমে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইতেছে এবং তজ্জন্য খাদ্যদ্রব্যে নানাপ্রকার কৃত্রিমতা বাড়িতেছে, পক্ষান্তরে অন্য কোনও প্রকার পশু-খাদ্য উৎপাদনের রীতিমত চেষ্টা হইতেছে না, ইহার ফলে গো-কুল ক্রমে খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে এবং ইহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। ভারত-বর্ষে গোচারণ ভূমির অভাব ছিল না, এখন তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামেই গোচর রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং ইহা পুণ্যজনক ও ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া লোকের ধারণা ছিল; এখন অর্থই আমাদের পরমার্থ হইয়াছে; ধর্ম্ম হীনবল হইতেছেন এবং পুণ্যকার্য্যে আর আমাদের প্রবৃত্তি

নাই। প্রাচীন শাস্ত্রে গোচারণ-ভূমি রাখার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু সেগুলি আর আমরা পালন করিতে প্রস্তুত নহি। জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋষিসম্প্রদায় কাহারও কাহারও নিকট দ্রব্য-বিশেষসেবী বলিয়া আখ্যাত হই-তেছেন। এই প্রকার হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ "প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে ধিয়োঽপি পুংসাং মলিনীভবন্তি।" সে দিন উত্তর অঞ্চলের ছোট লাট বাহাদুর গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সমিতি করিয়া অনেক শুভজনক প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোচর ভূমি রক্ষার জন্য প্রত্যেক ভূস্বামীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয়, এ বিষয়ে রাজবিধিও সত্বরই প্রচারিত হইবে। ভরসা করি, বঙ্গদেশীয় রাজপুরুষ-গণও এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন। আমাদের দেশে (ময়মনসিংহের উত্তরাংশে) সুসঙ্গ ও সেরপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভূমি আছে, এবং তাহাতে এখনও গোচারণের সুবিধা আছে, কিন্তু কালে তাহাও লুপ্ত হইবে। অর্থ লোভ বাড়িলেই আর প তত ভূমি থাকিবে না। পাশ্চাত্যদেশে পশুখাদ্য নানাবিধ তৃণাদি জন্মানর অনেক চেষ্টা হইতেছে। Silage প্রথা দ্বারা (ঘাস ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া) ঘাস রাখিবার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। আমাদের দেশেও অনায়াসে তাহা অবলম্বিত হইতে পারে। অনেক স্থলে বিবিধ পুষ্টিকর তৃণ উৎপন্ন হয়, সে গুলি রীতিমত রক্ষা করিলেও গবাদির খাদ্যাভাব হয় না। এ বিষয়েও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগী হওয়া বিধেয়। খড় বিচালী হইতে Silage প্রথায় রক্ষিত ঘাস অনেক উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর। দুর্ব্বাঘাসের রীতিমত চাষ করাইলেও অনেক সুবিধা আছে। অতঃপর গিনি, বিয়ানা, সরঘোম প্রভৃতি বৈদেশিক ঘাসেরও চাষ করান যাইতে পারে। আমার বিবেচনায়, দুর্ব্বা, নল, খাগড়া, উলু, বিরণ এবং আরও অনেক প্রকার তৃণ প্রভৃতি ও এতদ্দেশজাত তৃণাদিই ভারতীয় গাভীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশু-খাদ্য নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে (শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S.) এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। কার্পাস বীজ দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য, অতএব কার্পাসের চাষে মনোনিবেশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহাতে দ্বিবিধ উপকার হইতে পারে, পশু-খাদ্য পাওয়া যাইবে এবং তুলাও উৎপন্ন হইবে। সর্ষপের কল্ক (খোল) ষণ্ড ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতির পক্ষে ভাল। কিন্তু দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে তিল এবং তিষির খোলই উৎকৃষ্ট। গবাদির খাদ্য সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা করিতে হইলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, অতএব তাহাতে বিরত হইলাম।

অতঃপর গো-জাতির অবনতির অপর কারণ—গোমড়ক সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলা যাউক। Rinderpest (গোবসন্ত), গলাফুলা (anthrax] পেটফুলা প্রভৃতি সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধিতের প্রতি বর্ষে যে কত গাভী বৎস ও ষণ্ড প্রভৃতি অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল ব্যাধি উপস্থিত হইলে এক একটী গ্রাম একবারে গোশূন্য হইয়া পড়ে, ইহাতে কৃষক ও গৃহস্থগণ যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে ২।৪ জন গো-বৈদ্য থাকিত, তাহারা অনেক গোকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিত, অধুনা

তাহাদের প্রতি হতাদর হওয়ায় গো-বৈদ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ভেটার্ণারী বিদ্যালয়ে যে সমস্ত যুবক শিক্ষালাভ করিয়া গো-বৈদ্য হইতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা দরিদ্র কৃষক ও গৃহস্থগণ বিশেষ উপকৃত হইতেছে না, তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধাদিও দুরস্থ গ্রাম সমূহে সহজলভ্য নহে এবং সকলের পক্ষে তাহা ক্রয় করাও সম্ভবপর নহে। এইরূপ অবস্থায় ইহাঁদের দ্বারা গো-চিকিৎসার বিশেষ সহায়তা হইতেছে না।

অতঃপর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অবগত না থাকাতে সামান্য কৃষক ও গৃহস্থগণ গোমড়ক উপস্থিত হইলে তাহার কোনও প্রতীকারই করিতে পারে না। Siggngation এবং উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় এবিষয়ে তাহারা একেবারেই উদাসীন। গো-মড়কে দেশ গোশূন্য হইয়া যাইতেছে, ইহার ফলে দুগ্ধাদির অভাব বাড়িতেছে এবং গোময় ও গোমূত্রাদির অল্পতা হেতু ক্ষেত্রের সার দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তজ্জন্য ভূমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হইতেছে, এবং শস্যাদি ক্রমে দুর্মূল্য হইতেছে, ভারতবর্ষ নিত্য দুর্ভিক্ষের আগার হইতেছে। এক গোজাতির অপচয়ে কি হইতে পারে তাহা নিম্নলিখিত Report এ ব্যক্ত হইয়াছে—

There is a fact much to be regretted in connection with Indian cattle *viz* that some of the best Breeds are deteriorating in quality and quantity. Among the many difficulties in the track of Indian Govt., I look to the degeneration of the indegenous Breeds, is likely to occupy a prominent place, * * * They are of far greater importance to India than they are to Great Britain. If by one fell swoop the Cattle of the British Isles were annihilated, the want of the public could be supplied from other sources,

* * * * * * * but it is not so in India. Cattle there supply nearly all the motor power of the farm. Conditions are alike unsuitable for the employment either of Horse or the Steam Engine. In short, nothing, not even the foreign cattle, can be substituted for Indian Cattle to do the work for which they are now mainly bred and kept.

ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে গোজাতির লোপাপত্তিতে যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। বিগত ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের আদম সুমারীতে (Cencuss Report) দেখা যায় যে, প্রায় ২০৭, ৮৪৯, ২৫৬ জন (অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬৯-৯২ জন) লোক কৃষিকার্য্য ও তৎসংসৃষ্ট নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত আছে এবং এবংবিধ কার্য্যাবলীতে গোই প্রধান সহায় এইরূপ অবস্থায় গোমড়কে লক্ষ লক্ষ গো শমন ভবনে গমন করিলে কৃষকের ও সমগ্র দেশের কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

এক্ষণে গোবধ ও চর্ম্ম-ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক বিষ প্রয়োগে গোহত্যাসম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মানুষের খাদ্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ভারতবর্ষে সম্প্রতি অতি যথেচ্ছভাবে গোবধ করা হইতেছে, ইহা নিবারণ করা আমাদের সাধ্য নহে। মুসলমান ভ্রাতৃগণ এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইলে অনেকটা উপকার হইতে পারে। ইদপ্রভৃতি পর্ব্ব-উপলক্ষে যে গোবধ করিতেই হইবে, কোরাণ সরিফের বোধ হয় ইহা অভিপ্রেত নহে। এসম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমার ধৃষ্টতামাত্র। গোমাংস এ দেশের উপযোগী নহে, একথা

ভাল রকম বুঝিতে পারিলে বোধ হয় অনেক গোমাংসভোজীই ইহার ব্যবহারে বিরত হন। মুসলমান-নরপতি মহামনস্বী আকবর এক সময়ে গোবধ রহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যথেচ্ছ গোবধ হইতে পারে না, খাদ্যস্বরূপে ষণ্ডের মাংসই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, ইহা মন্দের ভাল বটে। বলিতে লজ্জা হয় এবং দুঃখও হয় যে 'হিন্দু' নামধারী আমাদের গোপাল (গোয়ালাগণ) প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে গোবধের সহায় হইতেছে। ব্যবসায়ের লোভে তাহারা গোবৎসগুলিকে ৮।১০ দিবস বয়স্ক হইলেই কষায়ের নিকট বিক্রয় করিতেছে, অতঃপর ফুঁকা প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে গো-দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে ত্রিগুণ কি ততোধিক জল মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। ঐ জল সময় সময় এত দূষিত থাকে যে, তাহাতে নানা রোগোৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। গাভীটী বৃদ্ধা হইলে, অথবা দুগ্ধ ছাড়াইলে তাহাকেও কষায়ের নির্দ্দয় হস্তে অর্পণ করিতেছে। হায় রে অর্থ, তোর কি মোহিনী শক্তি! অর্থলোভে মানুষ কতই না অপকার্য্য করিতেছে। মাড়োয়ারী ভ্রাতৃগণ দয়াপরবশ হইয়া পিঞ্জরাপোল স্থাপন করিয়া এই নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে গাভীগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও আশানুরূপ ফল হয় নাই। দেশের সর্ব্বত্র পিঞ্জরাপোলের ন্যায় অনুষ্ঠান হওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর চর্ম্মব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনের লোভে বিষপ্রয়োগ দ্বারা অনেক গো-হত্যা করিতেছে। পল্লীগ্রামে এ প্রকার নিষ্ঠুরতার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। চর্ম্মব্যবসায়ে নিষ্ঠুরতা হয় বলিয়াই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রে দ্বিজাতির পক্ষে ইহার ব্যবসায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা আমরা সেই নিষেধ অমান্য করিতেছি, ইহার পরিণাম শুভজনক কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কঠোর রাজবিধি প্রচলিত সত্ত্বেও প্রতি বর্ষে বিষপ্রয়োগে অনেক গো-হত্যা হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি?

গোজাতির অবনতির প্রধান কারণগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এবার কি উপায়ে ইহার গতিরোধ হয়, তৎসম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলা প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

প্রথমতঃ শিক্ষিতসম্প্রদায় এবং বঙ্গীয় ধনীসম্প্রদায় ও ভূম্যধিকারিবর্গের মনোযোগ ব্যতীত গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি সুদূরপরাহত। আমার বিবেচনায়—

১। স্থানে স্থানে গোশালা (Dairy farm) প্রতিষ্ঠা।

২। গো-চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও গ্রামে গ্রামে গোবৈদ্য-প্রেরণ।

৩। গো-চিকিৎসা, ও পালন প্রভৃতি বিষয়ে সরল ভাষায় গ্রন্থাদি প্রচার।

৪। গোচারণ ভূমিরক্ষার উপায় উদ্ভাবন।

৫। সর্ব্বোপরি যথেচ্ছ গোবধ নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গোশালা (Dairy) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যৌথসম্প্রদায় (Joint stock) গঠিত করা প্রয়োজন এবং গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত কোনও বিখ্যাত Dairyতে কিছু কাল অবস্থান করিয়া কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত ;

নতুবা কেবল Theory (উপপত্তিতে) কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। আমরা অনেক সময়েই অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, পরিশেষে সফলতা লাভ না করিয়া হতাশ্বাস হই এবং কার্য্যে উৎসাহ ও উদ্যম ভগ্ন হয়। এবংবিধ নিষ্ফলতাই আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। Dairy farming সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী গ্রন্থ আছে; সেগুলি বঙ্গভাষায় অনুদিত করা উচিত।

সদ্যঃ পততি লৌহেন ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ

দুগ্ধ ও গাভী বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু এখন অনেক তথা-কথিত ব্রাহ্মণসন্তান চর্ম্মাদি ও বিনামা প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন, ইহাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। অত্রাবস্থায় দুগ্ধাদি বিক্রয় করা একান্ত অন্যায় হইবে না। চর্ম্ম বিক্রয় অপেক্ষা ইহাতে যে অধিক পাপ আছে, তাহা বোধ হয় না। গো-দুগ্ধাদি বিক্রয় করিলে ব্যবসায়-লোভে গবাদির প্রতি নিষ্ঠুরতা হইবে বিবেচনাতেই বোধ হয় তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রের ব্যবস্থা অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে।

গোপালন ও গোচিকিৎসা সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ প্রচার আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত গো-পালন নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথমস্থানীয়। অধুনা হুগলী (রাম নগর) নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ খণ্ডে গোজীবন নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গোজাতির উন্নতি ও গোধন রক্ষা নামক আরও দুই খানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোনটীই আমাদের অভাব পূরণে যথেষ্ট নহে। এতদপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশদ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী ভাষায় ভারতবর্ষের গো সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি গো-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ্য ঃ—

১৮৭১ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভারত-বর্ষে গবাদির মারাত্মক রোগবিষয়ক এক খানি পুস্তক বঙ্গ ভষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানিও পাঠ্য বটে।

1. Cow keeping in India (by Isa Tweed).
2. Cows in India (by E. B. T.)
3. Amature Dairy Farming (by Landolicies.)
4. Plain Hints to the Deceases of Cattle in India (by Vety. Captn. Jame's Miller.)
5. Indian Cattle (by J. Shortt)
6. Diary Farming in India (Govt. publication by Vaughan & Nash.)

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতেও গোপালন এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে।—

1. Every man his own Cattle Doctor (by Bomatage.)
2. Bovine prescriber (by George Grasswell.)
3. Anlmal plague (by Fleming George.)
4. Principles and practice of Bovine Medicine and Surgery (J. W. Hill.)
5. Cattle Breeds and Management (by W. Housman.)
6. Stock Keeping and Cattle Nursing (A. Roland.)
7. Treatise on the Diseases of ox (by J. H. Steel.)
8. Farm Live Stock in Great Britain (by Robert Wallace)

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ইংলণ্ডীয় গোজাতির

জন্যই লিখিত, তথাপি আবশ্যক বোধে গুলি হইতেও অনেক বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নাটক, নভেল প্রভৃতি বঙ্গভাষায় যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে (যদিও ইহারা অধিকাংশই পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না), অধুনা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ও ঐতিহাসিক গ্রন্থপ্রচারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যগণের এ বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত ভাষায় গোপালনসম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক পুরাণে অনেক প্রকীর্ণ শ্লোক আছে। সেগুলি একত্রিত করিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, সহদেব গো-চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট ভবনে তিনিই গোচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার পচারিত কোনও গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। বোধ হয় তাহা থাকিতে পারে, কারণ নকুলকৃত অশ্বশাস্ত্র পাওয়া যাইতেছে এবং Asiatic society কর্ত্তৃক তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বৃন্দাবনে গোধন চরাইতেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। আদর্শ মহাপুরুষ ভগবানের অবতার গোচারণ করিতেন, ইহা হইতে আমরা বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারি। ফলতঃ, এক সময়ে গোধনই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল।—

তৃণানি খাদন্তি বসন্ত্যরণ্যে
পীত্বাপি তোয়ান্যমৃতং স্রবন্তী।
যদ্‌গোময়াদ্যশ্চ পুণন্তি লোকান্
গোভির্ন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ ॥

"গাবঃ পবিত্রা মাঙ্গল্যা গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
শকৃন্মূত্রং পরস্তাসাং অলক্ষ্মীনাশনং পরম্ ॥"

আমাদের শাস্ত্রে সপ্ত মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; তন্মধ্যে গাভী একটী। যথাঃ—

আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজদারিকা।
গাভী ধাত্রী ধরিত্রী চ সপ্তৈতে মাতরঃ স্মৃতাঃ

বস্তুতঃ গাভী আমাদের মাতৃতুল্যা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পঞ্চগব্য ("দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র) আ মাদের প্রত্যেক দৈব ও পৈত্র্য কার্য্যে ব্যবস্থেয় হইয়াছে এবং হবির্ব্রহ্ম (ঘৃত ব্রহ্ম) এ কথাও বলা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রাদ্ধক্রিয়াতে গোদানের মন্ত্রগুলি অভিনিবেশসহকারে পাঠ করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, শাস্ত্রকারগণ গাভীকে কি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং কি পবিত্র ভাবে দেখিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে বাধ্য হইলাম। কুতূহলী শ্রোতৃবর্গ এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থগুলি একবার পাঠ করিবেন। গোদানের অনেক ফল শাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।

উপসংহারকালে Breeding বৈজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলা যাইতেছে। দেশে গো জাতির উন্নতি বিধান করিতে হইলে Breeding সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্বকালে শ্রাদ্ধবাসরে যে বৃষোৎসর্গ করা হইত, তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় গোবংশের বিস্তৃতিসাধন। হৃষ্ট পুষ্ট, সুস্থ ও উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতীর বৎসই উৎসর্গ করা শাস্ত্রের আদেশ। বৎসটী তিনি বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই, কারণ এই বয়স হইতেই ষণ্ড সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহা হইতে অপরিণত বয়স্ক ষণ্ডে বৎস ভাল হয় না। বর্ত্তমান কালে আমরা যে কোনও প্রকার একটা ষণ্ড উৎসর্গ করিতেছি এবং ইহাতেই অখণ্ড পুণ্য সঞ্চয় করিতেছি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের শাস্ত্রের মহান্ উদ্দেশ্য এই

প্রকারে বিফল হইতেছে। উৎকৃষ্ট জাতীয় ষণ্ড নিকৃষ্ট গাভীতে উপগত হইলে যে বৎস হয়, তাহা মাতা অপেক্ষা ভাল হয় এবং মাতার দুগ্ধও বাড়িয়া যায়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; কিন্তু তাদ্বিপরীতে ফল বিরুদ্ধ হয়। অতএব এ বিষয়ে Breeding কারীদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে যে অনুলোম বিবাহ বৈধ এবং প্রতিলোম অবৈধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহারও কারণ এই। রুগ্ন ষণ্ড, ৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক ষণ্ড, Bereding কার্য্যের অনুপযোগী। Breeding সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিতে দ্রষ্টব্য। গাভী পুষ্পবতী হইবার অব্যবহিত পরেই ষণ্ডোপগতা হইলে স্ত্রীজাতীয় বৎস এবং কালবিলম্বে হইলে পুং-বৎস হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অতএব এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া গাভীর পাল দেওয়াইতে পারিলে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায়, ইহা পরীক্ষিত সত্য। বঙ্গদেশীয় পল্লীগ্রামের ভূম্যধিকারিগণ ভাল ভাল ষণ্ড পালন করিলে নিজের গাভীসকল উন্নত হয় এবং প্রজাদেরও সুবিধা হয়। প্রত্যেক গ্রামে ২।১টী ভাল ষণ্ড মুক্তাবস্থায় রাখিতে পারিলে Breed ভাল হয়, ইহাতে শস্যহানির আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু যে ক্ষতি হয়, একটী উৎকৃষ্ট বৎস হইলে তাহার চতুর্গুণ লাভ হয়। অতএব এইরূপ সামান্য ক্ষতি গণনা করাই উচিত নহে। স্থানে স্থানে গো-রক্ষণী-সভা স্থাপন করিয়া কৃষক ও গৃহস্থগণকে গোপালন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও ভাল মনে হয়। কলিকাতা নগরীতে ও অন্যান্য সহরে যাঁহারা বাস করেন, স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশেও তাঁহাদের (অবশ্য যাঁহারা সমর্থ তাঁহাদের) ২।১টী ভাল গাভী পালন করা উচিত, ইহাতে নানাপ্রকার সুবিধা আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। বাজারের কৃত্রিম দুগ্ধ সেবনেই যে কলিকাতায় নানাপ্রকার পীড়ার প্রকোপ বাড়িতেছে, এ সম্বন্ধে রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয় সে দিন খাদ্যসম্বন্ধে বক্তৃতায় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি সাহিত্য সভায় ইতঃপূর্ব্বে দুগ্ধসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত কথা এই যে, গোপালন ব্যতীত আমাদের স্বাস্থ্য-সম্পত্তি কিছুই রক্ষিত হইতে পারে না, এই জন্যই গোজাতির অবনতিতে আমাদের কি কি অনিষ্ট হইতেছে এবং তাহা কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যথাশক্তি আলোচনা করিলাম।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অনেক অসম্বদ্ধ কথা থাকিতে পারে এবং অনেক কথা অনুক্তও আছে; কিন্তু ইহা দ্বারা যদি কাহারও গোপালনের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয় এবং গোজাতির অবনতি নিবারণ ও তাহার উন্নতিসাধনের ইচ্ছা বলবতী হয়, তবেই শ্রম সার্থক মনে করিব। উপসংহারে নিবেদন, গোমাতার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বঙ্গীয় হিন্দুগণ যেন তাঁহাদের হিন্দুনামের সার্থকতা রক্ষা করেন এবং "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" একথা যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন। একথা যেন মনে থাকে যে, গো-ব্রাহ্মণের রক্ষাতেই ভারতবর্ষ সুরক্ষিত, ইহাদের অবনতিতেই ভারতের দুর্দশা অবশ্যম্ভাবী। *

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

* সাহিত্য-সভার অধিবেশনে পঠিত।

ভারতী মঙ্গল-কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পয়ার।

সুখে রাজ্য করে, অংশুমান নরেশ্বর।
দিলীপ আখ্যান তার জন্মিল কুঞ্জর॥
রাজ্যে অভিষেক করি আপন নন্দন।
তপ হেতু অংশুমান চলে ঘোর বন॥
বহুকাল জাহ্নবীকে উগ্রতপ করি।
কালে বশ হয়ে রাজা গেলা স্বর্গপুরী॥
মহাসুর বীর হৈল দিলীপ রাজন্।
ভুজবলে জয় কৈল এ তিন ভুবন॥
পরম আনন্দে রাজ্য করেন ভূপতি।
যৎকিঞ্চিৎ মনে দুঃখ না হ'ল সন্ততি॥
মন্ত্রিগণ স্থানে রাজ্য করি সমর্পণ।
বিপিনে তপস্যা হেতু করিলা গমন॥
সহস্র বৎসর তপ গঙ্গাকে করিয়া।
লোকান্তরে গেলা ভূপ পঞ্চত্ব পাইয়া॥
তপোবনে নিরাশ্রয় রৈল দুই রাণী।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু এল সব মুনি॥
ঋষি সব দেখি দোঁহে প্রণাম করিল।
হইবা র পুত্রবতী মুনি বর দিল॥
শুনি অসঙ্গত বাক্য বলে দুই জনে।
পতিহীন জনে পুত্র হইবে কেমনে॥
মুনিগণ বলে ব্যর্থ না হবে ভারতী।
হবেক তনয় যেয়ে দুয়ে কর রতি॥
সে দোঁহার সংযোগেতে মুনিবাক্যফলে।
ভগীরথ নামে রাজা জন্মিল ভূতলে॥
কিছুমাত্র জ্ঞান দেহে জন্মিলে তাহার।
গঙ্গা আরাধনে চলে নৃপতি-কুমার॥
অনাহারে এক পদে সহস্র বৎসর।
বৃক্ষ ন্যায় তিষ্ঠি তপ করে নরেশ্বর॥
মুদ্রিত নয়নে থাকে করি মহাধ্যান।
শরীর হইল শুষ্ক কাষ্ঠের সমান॥

নিরবধি ভাবে গঙ্গা অন্য নাহি মনে
প্রসন্ন হইয়া দেবী আসিলা সেখানে॥
বর লহ বলি গঙ্গা কহিলা বচন।
ভগীরথ বলে মাতা শুন নিবেদন॥
ব্রহ্মশাপে পিতৃগণ হয়েছে সংহার।
অন্যের শকতি নাই করিতে উদ্ধার॥
তুমি যদি যেয়ে স্পর্শ কর কৃপা করি।
মুক্ত হৈয়া পিতৃ সব পাবে স্বর্গপুরী।
গঙ্গা বলে যেতে নারি শিব আজ্ঞাধীনে।
চল ভগীরথ ভূপ শিব-আরাধনে।
ইহা বলি গঙ্গামাতা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
হর-আরাধনে রাজা গেলা অন্য স্থান॥
মালুর পাদপতলে স্থান নিরূপিল।
শিবপদ ভাবি মনে তথায় বসিল॥
সকল শরীর কৈল ভস্মে আচ্ছাদিত।
হস্ত বক্ষ গ্রীবা শিরে রুদ্রাক্ষমণ্ডিত॥
লোচন মুদ্রিত সদা জপে হর হর।
হেন মতে উগ্রতপ করে নরেশ্বর॥
তপফলে সাক্ষাতে আসিলা শূলপাণি।
করিল প্রণতি ভূপ লোটায়ে অবনী॥
অতি তুষ্ট হৈয়া বাক্য বলে বিশ্বনাথে।
লও নৃপমণি বর যেই ইচ্ছা চিত্তে॥
রাজা বলে ব্রহ্মশাপে ম'ল পিতৃগণ।
বিনা গঙ্গা-জলে তার নাই উদ্ধারণ॥
যদি মোকে কৃপাযুক্ত হৈলা বিশ্বেশ্বর।
জাহ্নবীকে দেও পিতা চাই এই বর॥
ভকতবৎসল অতি প্রভু দয়াময়।
জটা খুলি গঙ্গাকে দিলেন সে সময়॥
গঙ্গা পেয়ে ভগীরথ অতি হৃষ্টমন।
যোড় করে করে রাজা গঙ্গাকে স্তবন॥

এই নিবেদন বলি পদযুগে তোর।
কৃপা করি চল মাতা সঙ্গে সঙ্গে মোর ॥
বলেন জাহ্নবী দেবী প্রসন্ন হইয়া।
আগে আগে চল তুমি শঙ্খ বাজাইয়া ॥
ধ্বনি শুনি পাছে আমি করিব গমন।
অজস্র করিবে বাদ্য শুনহ রাজন্ ॥
গঙ্গাকে বন্দিয়া ইহা শুনি ভগীরথে।
শঙ্খ বাদ্য করি বলে উল্লাসিত চিতে ॥
পশ্চাতে জাহ্নবী দেবী অতি দ্রুত চলে।
বিষম তরঙ্গ ঢেউ হিল্লোল কল্লোলে ॥
সঙ্গে গঙ্গা যান অগ্রে চলে নৃপবর।
আসিয়া সলিল বেগে ঠেকে মহীধর ॥
লঙ্ঘিতে না পারি গিরি কহে সুরেশ্বরী।
কহ ভগীরথ ভূপ কি উপায় করি ॥
বলে রাজা অগোচর কি আছে তোমার।
মোরে কৃপা করি আজ্ঞা কর যুক্তি সার ॥
মনে ভাবি ভাগীরথী বলিল বচন।
অতি তূর্ণ আন রাজা হস্তী ঐরাবণ ॥
দন্তে গিরি আসি যদি ভাঙ্গে করিবরে।
তবে মোর জল যেতে পারে সেই দ্বারে ॥
ইহা শুনি সুরপুরে চলিলা ভূপতি।
ঐরাবত কাছে উত্তরিলা দ্রুতগতি ॥
সব বিবরণ নৃপে কহে করি-স্থানে।
শুনিয়া উত্তর গজে দিল রঙ্গমনে॥
যদি গঙ্গা দান করে আমাকে রমণ।
তবে গিরি দশনে করিব বিদারণ ॥
ইহাকে জানিয়া তুমি এস শীঘ্রগতি।
নিশ্চয় কহিল আমি শুনহ ভূপতি ॥
বিষণ্ণ বদনে রাজা করিল গমন।
উত্তরিলা আসি পুন গঙ্গার সদন ॥
মলিন মূরতি দেখি পুছে ভাগীরথী।
একা এলে রাজা কেন না আইল হাতি ॥
অধোমুখে রহে রাজা অন্তরে দুঃখিত।
বলে ভূত ভবিষ্যৎ তোমার বিদিত।
অত্যন্ত অকথ্য কথা বলিছে কুঞ্জরে।
কি মতে কহিব আমি মুখে নাহি সরে ॥
নিঃসন্দেহে বল রাজা দোষ নাহি ইথে।
শুনি ভগীরথ কহে গদগদ চিতে ॥
তাকে রতি দান যদি কর অনুমতি।
তবে হাতি গিরি ভাঙ্গি দিবে দ্রুত অতি ॥
জানি যেতে আমাকে পাঠায়েছে দন্তবলে।
যত বিঘটনা ঘটে আমার কপালে ॥
বলিলা জাহ্নবী তুমি শুনি নৃপবর।
আনিতে দ্বিরদে তুমি চলহ সত্বর ॥
কহিবে হস্তীকে মোর এই এক পণ।
যদি মোর বেগ সহে করিবে রমণ ॥
ইহা শুনি ভগীরথ চলে হর্ষমনে।
উপস্থিত হৈল যাইয়া কুঞ্জর যেখানে ॥
বলে ভগীরথ ভূপে শুন বাক্য করি।
যে বচন আমাতে কহিলা সুরেশ্বরী ॥
যদি তুমি তাঁর বেগ পার সহিবার।
তবে সে পারিবে করি করিতে শৃঙ্গার ॥
আপনার বল বুঝি চলহ বারণ।
হাস্য করি যুথনাথে বলিল বচন ॥
অবলার সাথে যদি বলে নাহি পারি।
তবে ঐরাবত নাম ব্যর্থ কার্যে ধরি ॥
জাহ্নবীর পদযুগ বন্দি নিজ শিরে।
ভনে রাজসিংহ নাম মূর্খ ধরাধরে ॥

ত্রিপদী।

এই বলি হাতী, চলে দ্রুতগতি,
নৃপতি অগ্রজ সাথে।
আসিল সত্বর, গঙ্গার গোচর,
অধিক আনন্দ চিতে।
করি দেখে নীর, হ'য়েছে সুস্থির,
ঠেকি মহামহী ধরে।
ভিড়াইয়া দন্ত, গিরি কৈল অন্ত,
অতি মত্ত করিবরে ॥
পেয়ে সেই দ্বার, চলে গঙ্গাধার,
অতি বেগে যায় জল।
সলিল তরঙ্গে, পড়িয়া মাতঙ্গে,
ক্ষণেকে হইল তল ॥

গজেন্দ্র বিকল, খেয়ে বহুজল,
গঙ্গাকে কয়য়ে স্তুতি।
পশু বটি আমি, সুরধুনী তুমি,
কোপ ক্ষম ভাগীরথী॥
হস্তীর বচনে, গঙ্গা কৃপা মনে,
বেগে তুলি দিলা পারে।
ছাড়ায়ে মরণ, চলিল বারণ,
লজ্জিত হইয়া ঘরে॥
গঙ্গা বেগ ক্রমে, যথা স্তম্ভে রমে,
তুলি দিলা জল হনে।
হস্তিনা নগর, অতি মনোহর,
পুরী হইল সেইখানে॥
কৌরব পাণ্ডব, মহাযোদ্ধা সব,
পঞ্চাধিক শত ভাই।
এ স্থানে বসতি, কৈলা নরপতি,
জগতে তুলনা নাই॥
শুনি কালিদাসে, মুনিতে জিজ্ঞাসে,
কহ কেবা ছিল কুরু।
বলি শ্রীচরণে, কৃপা করি মনে,
বিস্তারিয়া কহ গুরু॥
শুনি দ্বিজ বাণী, কহে মহামুনি,
শুন বলি কালিদাস।
শুন উপাখ্যান, অমৃত সমান,
ভারত-প্রসঙ্গ ভাষ॥
শান্তনু নৃপতি, মহাধর্ম্ম মতি
জাহ্নবী রমণী যার।
দেবতার অংশে, জন্মে কুরুবংশে,
ভীষ্ম নামে পুত্র তার॥
নৃপে সুত দিয়া, গেলেন চলিয়া,
গঙ্গা আপনার ধামে।
পরে নৃপমণি, বিয়া কৈল আনি,
কন্যা সত্যবতী নামে॥
জন্মে কালান্তরে, তাহার জঠরে,
দুই সুত মহাতেজা।
বলে মহাবীর, সমরে সুধীর,
হৈল ভুবনের রাজা॥

দুই সহোদর, গেল যমঘর—
সুত নাই তা সবার।
ব্যস্ত প্রজাগণ, নৃপতি কারণ,
হবে কোন পরদার॥
পূর্ব্বে ভীষ্মবীরে, ধীবর গোচরে,
করিছে বিষম পণ।
সেই বাক্য লাগি, তিনি মহাযোগী,
রাজা হবে কোন জন॥
পরে দুই নারী, আনি ব্যাস মুনি,
দুই সুত জন্মাইলা॥
ধৃতরাষ্ট্র নাম, মহা গুণধাম,
জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্ধ হৈলা॥
দ্বিতীয় কুমার, পাণ্ডু নাম তার,
তিনি হৈলা যুবরাজ।
সবে করে পূজা, অন্ধ হৈলা রাজা,
হস্তিনা নগর মাঝ॥
গান্ধারী আখ্যান, অপ্সরা সমান,
ধৃতরাষ্ট্রে বিয়া কৈলা।
কুন্তীমাদ্রী নাম, রূপে অনুপম
পাণ্ডুর দয়িতা হৈলা॥
গান্ধারী নন্দন, হ'ল শতজন,
দুর্য্যোধন আদি করি।
পুরীর নায়ক, কুলের অন্তক,
কলি-অংশে দুরাচারী॥
পাণ্ডুর তনয়, পঞ্চ মহাশয়,
যুধিষ্ঠির সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ।
ধর্ম্ম অবতার, মহিমা অপার,
ক্ষত্রিয় ভিতরে শ্রেষ্ঠ॥
কৃষ্ণ বৃকোদর, দুই সহোদর,
এ তিন কুন্তীর সুত।
নকুল সুস্থির, সহদেব ধীর,
দুই ভাই গুণযুত॥
মাদ্রীর নন্দন, এই দুইজন,
শুন দ্বিজ কালিদাস।
বাণী ভাবি মনে, ভূপাত্মজে ভনে,
ভারতী মঙ্গল ভাষ॥

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

মানসিংহ।

বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, মানসিংহ আমার পিতার রাজ্যে একটী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে ছয় মাস সম্রাট্-দরবারে ও ছয় মাস তাঁহার জায়গিরে অবস্থান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি অপরিমিত ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন; তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের প্রমাণস্বরূপে বলিতেছি যে, যতবার তিনি পিতৃসমীপে উপস্থিত হইতেন, প্রত্যেক বারেই অন্যূন দুই লক্ষ আসরফি তিনি পিতাকে সম্মান-উপঢৌকনস্বরূপে দিতেন। পিতামহ ভারমলকে ঐশ্বর্য্য-সম্পদে তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের রাজগণমধ্যে ধনৈশ্বর্য্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না।

খসরুর বিবাহ-সম্বন্ধ।

নিম্নলিখিত বিষয়টি, উল্লেখের অযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি না। পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ খাঁ আমাকে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লেখেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, মির্জ্জাজান বেগের পুত্র গাজী বেগকে তিনি দত্তকস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাহাকে তৎসন্নিকটে যাইবার জন্য যেন আমি অনুমতি প্রদান করি। তাঁহার পত্রের উত্তরে আমি লিখিলাম যে, এই গাজী বেগের ভগিনীর সহিত আমার পুত্র খসরুর যাহাতে বিবাহ হয়, সে সম্বন্ধে আমার পিতা কথাবার্ত্তা পাড়িয়াছিলেন; সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে, গাজী বেগকে পাঞ্জাবে যাইবার অনুমতি দিব। গাজীবেগের পিতা মির্জ্জাজান (বা জানি বেগ) ফায়েদ্দা মহম্মদের পুত্র, মির্জ্জা বাকীর পৌত্র, মির্জ্জা আবীর প্রপৌত্র এবং মির্জ্জা আবদুল আলী তুর্খানের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। শেষোক্ত ব্যক্তি সুলতান মির্জ্জার রাজত্বকালে বোখারার অধীশ্বর ছিলেন, এবং উজবেগদিগের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সাহী বেগ খাঁ ও তাঁহার জ্ঞাতিগণ ইঁহার সামন্ত দলভুক্ত ছিলেন। এই আব্দুল আলী তুর্খান সুক্কিবেগ তুর্খানের বংশজাত। ইহার পিতা আয়গু তৈমুর তোকতেমাস খাঁর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন; সেই জন্য অজেয় তৈমুর আব্দুল আলী তুর্খানের কথিত পূর্ব্বপুরুষকে তাঁহার শৈশব অবস্থায়, "সুক্কি বেগ তুর্খান" —এই উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা আরঘুন খাঁর জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইঁহাদের উপাধি—"তুর্খান" ও আরঘুন"।

রাজা মুকসুদ খাঁর পুত্র।

বাঙ্গালা ও বিহারের বিদ্রোহ ব্যাপারে সংলিপ্ত, মুখসুস খাঁর পৌত্র ও মুকসুদ খাঁর পুত্র আমাকে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। তদুত্তরে আমি আমার কর্ম্মচারীকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিতে আদেশ করিলাম;—আমি যতদূর জানি, তাহাতে তুমি আমার উপরে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে, তোমার মনের অবস্থা তাদৃশ নহে; আমি তোমাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র, কিংবা মর্ত্ত্য সম্রাটের অনুরাগভাজন বলিয়া মনে করিতে পারি না।

ঈশ্বরের নাম ও মদ্যপান।

ঈশ্বরের সহস্র নাম যতগুলি সংগ্রহ

* Autobiographical Memoirs of the Emperor Jahangir নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

করা যাইতে পারে, ততগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য আমি কতকগুলি ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করি। তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ ৫২২টি নাম সংগ্রহ করে; এই সংখ্যা পিতার সংকলিত নামাবলীর ঠিক দ্বিগুণ। এই ৫২২টি নাম ২০টি সংখ্যাধীন হইয়া, আমার আদেশে আমার গাত্রাবরণে * লিখিত (সম্ভবতঃ সূচিকার্য্য খচিত) হইল। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমি সকল শ্রেণীর পণ্ডিত ও ধর্ম্মনিষ্ঠগণের সহবাসে অতিবাহিত করিতাম। সিংহাসনগ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, শুক্রবার রাত্রিতে আমি কিছুতেই মদ্য বা অন্য উত্তেজক পানীয় আস্বাদন করিব না। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, এমন কি সেই ভয়ঙ্কর সার্ব্বজনীন হিসাবনিকাসের দিন পর্য্যন্ত, যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকে, আশা করি, ঈশ্বর আমাকে সে সম্বন্ধে বল দিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় এ পর্য্যন্ত আমি প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করিতে পারিয়াছি; জীবনের অবশিষ্টাংশও যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়, ঈশ্বর সেইরূপ কৃপা করুন।

শোককালে উৎসবনিষেধ।

পাছে আমার অনবধানতাবশতঃ কর্ম্মচারিগণের স্ব স্ব পদোচিত বৃত্তিদানের ব্যবস্থা না হয়, সেই জন্য আমার পরিপার্শ্বিক অনুচরগণকে তদ্বিষয়ক অভাব জ্ঞাপন করিতে আমি উৎসাহ দিতাম। আমার পিতার মৃত্যুজনিত নির্দ্দিষ্ট শোককালমধ্যে সুফিদিগের অনুমোদিত ও ব্যবহৃত আহার্য্য-পানীয় ব্যতীত অন্যরূপ আহার্য্য-পানীয় ব্যবহার করিতে প্রজাগণকে নিষেধ করিলাম। আরও জানাইলাম যে, এই নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে আমার অধিকৃত রাজ্যে বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে কেহ ঢক্কা, ভেরী বা অপর কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিবে না। রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী আমার বিশেষ বিরাগভাজন হইবে।

কথিত আজ্ঞা প্রচলনকালমধ্যে এক দিন আমি শুনিলাম যে, হাকিম আলী নামক জনৈক ব্যক্তি, তাহার পুত্রের বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে কাজীর সমক্ষে এক দল বাদ্যকর নিযুক্ত করিয়া উৎসব-সভায় উপস্থাপিত করিয়াছে। আর নানারূপ যন্ত্রসম্ভূত শব্দে সমগ্র সহরটি প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আমি মহম্মদ তকীর দ্বারা হাকিম আলীকে তৎপ্রতি আমার পিতার বদান্যতা এবং তাহার বাধ্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। আর বলিয়া পাঠাইলাম যে, সমস্ত লোকের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্ব্বাধিক শোকাচ্ছন্ন হইবে, আমি এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম, পুত্রের বিবাহ দিবার এবং কোলাহলময় উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার ইহাই কি একমাত্র উপযুক্ত সময়? আমার দূত যখন সেই ব্যক্তির সভা-মধ্যে উপস্থিত হইল, তখন অভ্যাগতগণ আমোদে উন্মত্ত। আমার আজ্ঞা জ্ঞাপন করিবামাত্র তাহাদের মধ্যে যে ভয় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তাসূচক আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা অতীব কৌতুকপ্রদ। অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপবিদ্ধ হইয়া হাকিম আলী প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে আমার নিকট লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা স্থাপন করিল। অনুগ্রহপ্রদর্শন-অভিপ্রায়ে আমি সেটি তখন গ্রহণ করিলাম; কিন্তু কয়েক দিন পরে তাহাকে আনাইয়া আমি তাহারই গলে সেই মালা ছড়াটি পরাইয়া দিলাম। সত্য কথা বলিতে

* লিপিকরপ্রমাদে এ স্থানটি দুর্ব্বোধ্য। সম্ভবতঃ 'রেজাই"

কি, আমার অধীন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কোন প্রকারের উপহার গ্রহণ করা আমার প্রীতিকর নহে। পক্ষান্তরে তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বসময়ে আমার হস্তের উপরে নিক্ষিপ্ত রাখা কর্ত্তব্য; যতদিন আমার সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন তাহাদের গুণানুসারে আমার অনুগ্রহ ও পুরস্কার বিতরণ করা আমারই কার্য্য।

পুরস্কার বিতরণ।

মহম্মদ খাঁকে এক্ষণে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাকে লক্ষ টাকা, বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং রত্নখচিত তরবারি, কোমরবন্ধ ও পেশকবজ প্রদান করিলাম। এই ব্যক্তি কেরয়া নামক স্থানের খাঁ-বংশীয়। এই সময় গরীবদিগের এবং দিল্লির পবিত্র মঠবাসিগণের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য মহম্মদ রেজার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলাম। উজীর খাঁকে আমি সাম্রাজ্যের উজীর-পদে বসাইলাম। যখন আমি যুবরাজ ছিলাম, তখন ইহাকে "উজীর উলমুলুক" উপাধি দিয়াছিলাম এবং পাঁচ শত অশ্বের অধিনায়ক-পদ হইতে উন্নীত করিয়া এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিয়াছিলাম।

সেখ ফরীদ বোখারী, সেখ জল্লালের বংশসম্ভূত। সেখ জল্লাল, মুলতানের সেখ বেহা উদ্দীন জাখারিয়ার সুবিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। দিল্লির সায়েদ আবদুল গফুর, সেখ ফরীদের উচ্চতন চতুর্থ পুরুষ। এই আবদুল গফুর তাঁহার বংশধরগণকে কেবলমাত্র বিপদ্‌সঙ্কুল সৈনিককার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিতে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে বলিয়া গিয়াছিলেন। ইহারা বোখারা সৈয়দগণের মধ্যে প্রধান। সেখ ফরীদ পূর্ব্বে চারি হাজার অশ্বের অধিনায়ক ছিল; পরে আমি তাহাকে পাঁচ হাজার অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিয়াছিলাম, এবং বড় নাগরা ও নিশানও দিয়াছিলাম।

কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা মির্জা সুলতান হোসেনীর পুত্র মির্জা রুস্তমকে "খাঁ খানান" উপাধিকারী ও বৈরম খাঁ কজ্জলবাসের * পুত্র আবদার রহিম খাঁকে, তাহার পুত্রদ্বয় এরিদজী ও দারাবকে, এবং মির্জা আলীবেগ আকবর সাহী বংশ সম্ভূত সের খোজাকে, আমি তাহাদের স্ব স্ব পদোচিত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, রত্নখচিত তরবারি বক্ষোবেষ্টনকারী কোমরবন্ধ, অশ্ব এবং রত্নখচিত অশ্বপৃষ্ঠাসন প্রদান করিলাম। †

পক্ষান্তরে, আবদর রহমানের পুত্র বিনানুমতিতে কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে আমার অসন্তোষ জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে কর্ম্মচ্যুত করিলাম। কারণ আজ্ঞাবাহিতাই কর্ম্মশীলতার পরিচয়—মৌখিক অঙ্গীকার নহে।

আমার সিংহাসন অধিরোহণের পূর্ব্বেই কাবুলবাসী লাল বেগকে "বাজ বাহাদুর" উপাধি দিয়াছিলাম। সিংহাসন অধিরোহণের প্রায় এক মাস পরে, আমাকে সম্মান প্রদর্শন অভিপ্রায়ে সে আমার সমক্ষে উপস্থিত হইলে, আমি তাহাকে এক হাজার অশ্বের অধিনায়ক-পদ হইতে উন্নীত করিয়া দুই হাজার অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম এবং বেহারের শাসনকর্ত্তৃপদে বসাইলাম। এই সময়ে তাহাকে এক লক্ষ টাকা উপহার দিলাম। আর সকল শ্রেণীর সামন্তগণকে জানাইয়া দিলাম যে,

* আকবরের প্রথম মন্ত্রীর পক্ষে এ উপাধিটি অবজ্ঞাসূচক বলিয়া বোধ হয়। "কজ্জলবাস" অর্থে লাল টুপি। এটি সাধারণ পারস্যবাসীর উপাধি। ।

† সম্ভবতঃ এই উপহারগুলি সম্রাটের অভিষেক-উপলক্ষে বিতরিত হইয়াছিল।

যে তাহার প্রভুতা উপেক্ষা বা প্রতিরোধ করিবে, রাজা বাহাদুর ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিহত করিতে পারিবেন। আরও ব্যবস্থা করিয়া দিলাম যে, তাহার অধীন কর্ম্মচারিগণের বৃত্তি বা জায়গীর অপেক্ষা তাহার বৃত্তি বা জায়গীর অধিকতর মূল্যের হইবে, কারণ সে যে আমার বংশের অতি বিশ্বস্ত সেনানী-শ্রেণীর অন্তর্ভূত, একথা আমি ভুলি নাই। তাহার পিতার উপাধি ছিল "নিজাম এ কাবাব" *; আর সেও আমার পিতৃব্যের চিরাগ্‌চী বা বাতি-প্রজ্বালন-বিভাগের কর্ত্তা ছিল।

কাবুলবাসী মহম্মদ হাকিম মির্জার একমাত্র পুত্র পূর্ব্বে পাঁচশত অশ্বের অধিনায়ক ছিল। এক্ষণে আমি তাহাকে এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। আর কানাজন নামক জনৈক রাজপুত মাহারাট্টাকে আট শত অশ্বের অধিনায়ক পদ হইতে উন্নীত করিয়া পঞ্চদশ শত অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। সমশ্রেণীস্থ সকলের অপেক্ষা এই ব্যক্তি আমাতে অধিকতর অনুরক্ত।

মীরণ সদর উদ্দিন পূর্ব্বে কেবলমাত্র তিন শত অশ্বের অধিনায়ক ছিল; আমি তাহাকে এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। এই ব্যক্তি আমার পিতার কর্ম্মচারিগণের নামের তালিকায় কার্য্যকাল হিসাবে সকলের শীর্ষস্থানীয়। যখন সেখ আবদুল নবী আমাকে "চল্লিশ হদিশ" পাঠ করাইতেন, সেই সময়ে সে (মীরণ সদর উদ্দীন) রাজকীয় পুস্তকাগারে কর্ম্ম করিত। সত্যই বলিতেছি, আমি এই ব্যক্তিকে "খলিফা" বা সর্ব্বপ্রধান ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু পিতার বিবেচনায় যদি মকদুম-উল মুলকের নাম ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে আমার গুরুগণমধ্যে আবদুল নবীই সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী; এই শেষোক্ত ব্যক্তির আদিম নাম সেখ আবদুল্লা। এই ব্যক্তি বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং বিষয়বর্ণনা ও বাক্‌-পটুতায় তাহার সমসাময়িকগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল।* লোকটির অনেক বয়স হইয়াছিল। বাল্যকালে, আফগানী সের খাঁ ও তাহার পুত্র সেলিম খাঁর উপর ইহার অমিত প্রভাব ছিল। গ্রহগণ সম্বন্ধে ইহাঁর জ্ঞান অতুলনীয় ছিল, কিন্তু পিতার সময়ে ইহার গ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল না। ফলতঃ সেখ আবদুল নবীরই পদোন্নতি ঘটিয়াছিল।

যখন হাকিম হাম্মামকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মা-ওয়ের-অন নেহের (Trans-oxiana) প্রদেশে পাঠান হয়, সে সময়ে মীরণ সদর জাহানকে (পূর্ব্বকথিত সদর উদ্দীনকে) উজবেগগণের অধিপতি আবদুল্লা খাঁর পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে তাহার সমীপে সহানুভূতি-জ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করা হয়। তিন বৎসর পরে সে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলে, পিতা তাহাকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করেন। সময়ে সময়ে সে দুই হাজার অশ্বের অধিনায়ক-পদে এবং সাম্রাজ্যের "সদর" অর্থাৎ দাতব্য অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষের-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, সকল অবস্থাতেই সে সমভাবে আমার মঙ্গলকামী। প্রকৃত বীরত্ব ও সদ্‌গুণ সম্বন্ধে সে অপর অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন নহে। তাহার শিশুকাল হইতেই আমার প্রতি স্নেহানুরাগ তাহার হৃদয় মধ্যে প্রতি-ষ্ঠিত আছে। সকল সময়েই সে তাহার কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছে। যুবরাজ অবস্থায়, আমি তাহাকে অভিলষিত পদ প্রদান বা পরিমাণ

* রন্ধনশালার অধ্যক্ষ।

নির্ব্বিশেষে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন, এক্ষণে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে প্রস্তুত আছি, একথা তাহাকে লোক দ্বারা জানাইলাম। বক্সীগণের দ্বারা সে আমাকে জানাইল যে, চারি সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলে, সে আপনার আয় হইতেই তাহার দেনা শোধ করিতে সমর্থ হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে কাহাকেও এক শতের অধিক অশ্বের অধিনায়ক করিব না, এই আমার নিয়ম ছিল; কিন্তু সদর্ উদ্দীনের অনুকূলে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। হৃদয়ই প্রকৃত ভক্তি-অনুরাগের আবাস; সহস্র তীর্থ দর্শন অপেক্ষা একটি বিশ্বস্ত হৃদয় অধিকার করা আমি অধিকতর পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করি। আমাদের ধর্ম্মে আস্থাবান্ হউক বা না হউক, আমি কাহারও ন্যায়মূলক প্রর্থনা পূর্ণ করিতে সাধ্যমত অনবহিত হইব না। এই বহু যুগাগত পৃথিবীতে আমার মত অনেক লোক আসিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে; পরকালে প্রয়োজনে লাগিতে পারে, এমন কোন পুণ্য এই দ্রুতগামী সময়ে সঞ্চিত করা অপেক্ষা আর কি অধিকতর বাঞ্ছিত হইতে পারে? এই পৃথিবীতে সৎকার্য্য এবং লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করার ফল অমূল্য। নিজের কথা বলিতেছি। চরিত্রহীন উত্তরাধিকারী উড়াইয়া পুড়াইয়া দিবে, এমন ধনরত্ন রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা একটি হৃদয়ের প্রীতিসাধন করা আমি অধিকতর সন্তোষের বিষয় বলিয়া মনে করি।

পুত্রের উদ্দেশে উপদেশ।

স্মরণ রাখিও, বৎস! এই পৃথিবী চিরকালের জন্য অধিকৃত বস্তু নহে। ইহা নির্ভরতা ও আশার আবাসস্থল নহে। সকল পুরুষের আশীর্ব্বাদভাজন সলমনে সিংহাসন বাতাসে অর্পিত হইয়াছিল—এ কথা কি শ্রবণ কর নাই? যিনি জ্ঞান ও ন্যায়ের পরিচালনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাঁহার চেষ্টা মানবজাতির শক্তির অনুকূলে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী, সেই ব্যক্তিই সকল সম্মানের অধিকারী। জ্ঞানীই ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করে; কিন্তু তুমি যাহাই কর, স্মরণ রাখিবে যে, পৃথিবী তোমার নিকট হইতে অপসৃত হইতেছে। কেবলমাত্র সেই বস্তুই প্রয়োজনীয়, যাহা তুমি কবরে লইয়া যাইতে পার—তোমার সঞ্চিত ও পরিত্যক্ত ধনরাশি কোনই প্রয়োজনে আসিবে না। বিজ্ঞানুমোদিত কার্য্যই তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য। জানিবে শিকারী যেমন কৌশলী, বৃদ্ধ ব্যাঘ্রও তদ্রূপ। শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে, অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। ব্যাঘ্রই সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। যুবক সেনানীর তরবারি যতই তীক্ষ্ণধার হউক না কেন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হইও না। যুদ্ধকুশল বহুদর্শী রণবীরকে সাবধান। সিংহ বা হস্তীর সহিত মল্ল-যুদ্ধ করিবার শক্তি একজন যুবা ব্যক্তির থাকিতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ শৃগালের ধূর্ত্ততা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাহার কোথায়? ভূয়োদর্শনে, পর্য্যায়ক্রমে শীত ও গ্রীষ্মের প্রভাব অনুভব করিয়া, লোকে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। তোমার রাজ্য যদি সুখসমৃদ্ধিশালী দেখিতে চাও, ভুঁই-ফোড় লোকের উপর গুরুতর কার্য্যের ভার বিশ্বস্তচিত্তে কদাপি ন্যস্ত করিবে না। বিপদসঙ্কুল ব্যাপারে বহু-যুদ্ধে পরীক্ষিত সৈন্য ভিন্ন অন্য লোক নিযুক্ত করিবে না। সুশিক্ষিত

শিকারী কুকুর ব্যাঘ্র দর্শনে ভয়কম্পিত না। সিংহ অদৃশ্য থাকিলে, শৃগাল যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। মৃগয়াকার্য্যে তোমার সন্তানকে সুশিক্ষিত কর; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সে ভয় দমন করিতে সমর্থ হইবে।

সুখের ক্রোড়ে লালিত হইলে, সাতিশয় সাহসী ব্যক্তিও যুদ্ধক্ষেত্রদর্শনে কম্পিত-কলেবর হয়। পৃথিবীতে দুইটি জীব আছে, যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণঘোটকের অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাদিগকে বালকেও সহজে আঘাত করিয়া ধরাশায়ী করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধস্থলে যাহার পৃষ্ঠদেশ দর্শন করিবে, সে উহাদের অন্যতর; ভাগ্যক্রমে যদি সে শত্রুহস্ত হইতে অব্যাহতি পায়, তুমি তাহাকে তরবারির আঘাতে নিহত করিবে। যে আপনার ভীরুতা স্বীকার করে, সে বরং ভাল, যে অসিধারী শত্রুসংঘর্ষে রমণীর ন্যায় মস্তক ঘুরাইয়া লয়, সে সাতিশয় ঘৃণ্য।

দেওয়ান।

মির্জ্জা ঘিয়াস বেগের * গুণ সম্যক্‌ভাবে বর্ণনা করা আমার অসাধ্য।

আমার পিতার সময়ে ইনি প্রাসাদের প্রধান ভাণ্ডারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা ইহাঁকে "এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক" এই উপাধি দিয়াছিলেন। আমার রাজত্বগ্রহণের কিছু কাল পরে আমি ইহাঁকে "দেওয়ান" করিয়া উজীর খাঁর পদে বসাইলাম এবং "এত্তেমদ উদ্ দৌলা—এই উপাধি এবং সঙ্গে সঙ্গ বৃহৎ জামামা ও নিশান দিলাম। পাটীগণিতবিদ্যায় এ সময়ে ইহাঁর সমকক্ষ কেহই নাই; লিপিকুশলতায় ইনি অদ্বিতীয়; পুরাকালের সকল শ্রেণীর কাব্যের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতায়, এবং অবলীলাক্রমে উহার আবৃত্তি বিষয়ে ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই; এমন গীতিকাব্যসংগ্রহ নাই, যাহা ইনি সযত্নে রক্ষা করেন নাই, এবং যাহার উৎকৃষ্টতম অংশগুলি ইনি প্রতিলিপি করেন নাই। সহস্র মুক্তো ইয়াকুতি * অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক বিষয় এই যে, উহাদের আবৃত্তিকালে ইহাঁর মুখ মধুর হাস্যে উদ্ভাসিত হয়। রাজকার্য্য বিষয়ে যে সকল বিধি ইহাঁর পরামর্শানুমোদিত নহে, সে সকল বিধির অসম্পূর্ণতাবশতঃ সেরেস্তায় স্থায়ী স্থান পাইবার সম্ভাবনা সাতিশয় অল্প।

(এই স্থানে মন্ত্রীর প্রশংসাবাচক পাঁচটি বয়েদ আছে। তাহাদের অনুবাদ বিরক্তিকর হইবে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।)

নুরজাহান।

বলা বাহুল্য, এই এত্তেমদ্ উদ্ দৌলা আমার সহধর্ম্মিণী নুরজাহান এবং আসফ খাঁর পিতা। আসফ খাঁকে আমার সহকারী সেনাপতি (Liuetenant-General) করিয়াছি এবং পঞ্চ সহস্র অশ্বের অধিনায়ক এই উপাধি দিয়াছি। আমার অন্তঃপুরবাসিনী চারি শত রমণীর মধ্যে নুরজাহান প্রধানা, ইহাকে আমি ত্রিংশ সহস্র অশ্বের অধিনায়িকা, এই উপাধি দিয়াছি। আমার রাজ্যমধ্যে এমন কোন সহর নাই, যেখানে ইনি স্বীয় রুচি ও বদান্যশীলতার পরিচয়স্বরূপ কোন বৃহৎ প্রাসাদ বা উদ্যান প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। আমার বিবাহ করিবার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়া

---

* ড্রাউ সাহেবের মতে ইহার নাম "মাজা আইয়াস"।

* রিচার্ডসনের অভিধানে এই নামের একটি উত্তেজক পানীয়ের উল্লেখ আছে; চুনি ইহার উপাদানের অন্যতম.

পূর্ব্বে ইনি আমার পরিবার মধ্যে স্থান পান নাই। আমার পিতার সময়ে ইনি সের আফগানের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধা হন। সেই ব্যক্তি নিহত * হইবার পরে, আমি কাজীকে ডাকাইয়া নুরজাহানের সহিত যথারীতি বিবাহিত হই। যৌতুক স্বরূপ আমি ইহাঁকে আশী লক্ষ আসরফি দান করি। জহরত ক্রয় করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ইনি এই টাকা আমাকে দিতে অনুরোধ করেন। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া এই টাকা ইহাঁকে দান করি। ইহা ব্যতীত চল্লিশটি মুক্তায় গ্রথিত এক ছড়া মালা ইহাঁকে উপহার দিলাম। ইহার এক একটি মুক্তার মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা। † ·

যে সময়ে আমি এই কাহিনী লিখিতেছি, সে সময়ে কি গার্হস্থ্য ব্যাপারে, কি ধনরত্নরক্ষণে, ইনিই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। ইনি সম্পূর্ণভাবে আমার বিশ্বাসভাজন। বলিতে কি, আমার সাম্রাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এই সুশিক্ষিত, মেধাসমন্বিত বংশের কন্যারত্ন। ইহাঁর পিতা আমার দেওয়ান, পুত্র আমার অসীম ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী সেনাপতি, এবং কন্যা আমার সকল চিন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশভাগিনী।

রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র।

রাজা বিক্রমাদিতের পুত্রকে আমি তোপখানার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলাম। ইনি রায় রেঁয়ে "উপাধিধারী। আমার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যত কামান গোলন্দাজ আছে, তাহা ব্যতীত বিভাগে যে ষাট হাজার উষ্ট্রচালিত কামান ও প্রতি কামানের জন্য দশ সের করিয়া বারুদ ও কুড়িটি গোলা আছে, আর বিশ হাজার অন্য প্রকার কামান আছে, উপযুক্ত বারুদাদি লইয়া সে সকল সময়েই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিবে—আমি তাহাকে এইরূপ আদেশ দিলাম। এই বিভাগের ব্যয়ভারবহনার্থ আমি পনরটী পরগণার আয়—এক লক্ষ * বা পাঁচ ডাঁক্ষি আসরফি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম। এই সজ্জিত আগ্নেয়াস্ত্র সম্রাট্‌বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সকল স্থানেই যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

কথিত রায় রেঁয়ে আমার পিতার সময়ে কিছু কাল দাওয়ান-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পিতার জনৈক পুরাতন কর্ম্মচারী। এক্ষণে ইনি সাতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে ইহাঁর রাষ্ট্রনীতিক ও সৈনিক ব্যাপারের অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধবিদ্যায় ইনি ছয় বিভাগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার সহিত ইনি প্রভূত ধনরাশিও সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহাঁর সমশ্রেণী কোন হিন্দু ইহাঁর অপেক্ষা ধনী নহে। যে সময়ে আমি এই কাহিনী লিখিতেছি, সে সময়ে এককালে সহরের কতকগুলি স্বজাতীয় মহাজনের নিকট ইহাঁর দশ ক্রোর টাকা গচ্ছিত ছিল। পিলখানার তত্ত্বাবধায়ক-পদ হইতে উন্নীত হইয়া এক্ষণে ইনি উজীরউল্‌-ওমরা"—এই উপাধি পাইয়াছেন।

* সম্রাটের কৌশলে যে ইনি নিহত হন, এ কথার প্রসিদ্ধি আছে। ঘটনাটি কতকটা ডেভিড রাজা ও বাথসেবার গল্পের অনুরূপ।

† এইখানি আটটি কি নয়টি পদ বিশিষ্ট একটি বাক্য আছে। বাক্যটি পাঠ করা অতীব কঠিন। সম্ভবতঃ অহিফেনের চাষ বা বিক্রয় জনিত রাজস্ব সম্বন্ধে কোন কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

* প্রায় নয় লক্ষ টাকা। এই বিভাগের পক্ষে ইহা নিতান্তই অপ্রচুর বলিয়া বোধ হয়।

পদপ্রদান।

একটি সুযোগ পাইয়া আমি বোখারা নিবাসী সৈয়দচাঁদের পুত্র সৈয়দকাম্মালকে সাত শত অশ্বের অধিনায়ক-পদ হইতে উন্নীত করিয়া, এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম, এবং হিন্দুস্থানের প্রাচীন সম্রাট্‌গণের রাজধানী দিল্লি নগর জায়গীর-স্বরূপ তাহাকে দান করিলাম। আফগান দিগের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ কাম্মালের পিতা পেশোয়ারে নিহত হয়। খেরন এ আজ্জিমের পুত্র মির্জা খোররেমকে দুই হাজার অশ্বের অধিনায়কের পদ হইতে উন্নীত করিয়া তিন হাজার অশ্বের অধিনায়ক পদে বসাইলাম।

সতীদাহ।

হিন্দু বিধবারা মৃত স্বামীর সহিত চিতানলে ভস্মীভূত হয়—এরূপ মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। পূর্ব্বে আমি এই নিয়ম করিয়াছিলাম যে, সম্মত থাকিলেও কোন পুত্রবতী বিধবাকে এইভাবে 'বলি' দেওয়া হইবে না। এক্ষণে আমি আদেশ করিলাম যে, লোকে যাহাই বলুক, কিঞ্চিৎ মাত্রও বলপ্রয়োগে এ কার্য্য করিতে দেওয়া হইবে না। অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন বাধা দেওয়া বা কোন প্রকার অত্যাচার করা হইবে না। ঈশ্বর আমাকে তাঁহার মঙ্গলময়তার ছায়াস্বরূপ গঠিত করিয়াছেন। জাতিবিশেষের সমস্ত লোকের নির্দ্দয়ভাবে হনন-চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্য করা আমার ঈশ্বরদত্ত চরিত্রের অনুরূপ হইবে না। সমস্ত হিন্দুস্থানবাসীর ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ* প্রতিমা-পূজক হিন্দু। সমস্ত ব্যবসায় বস্ত্র তন্ত্র বয়নপদ্ধতি হস্তজাত শিল্প, ও অন্যান্য লাভজনক কারবার, সমস্তই হিন্দুগণের নেতৃত্বাধীন। ইহাদিগকে যদি সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। ইহাদের ধর্ম্ম যাহাই হউক, ইহারা সেই ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। ইহারা আপনাদের নির্ম্মিত জালে আপনারাই পড়িবে। ঈশ্বরদত্ত দণ্ড হইতে ইহাদের অব্যাহতি নাই; কিন্তু একটা সমগ্র জাতি ধ্বংস আমার কার্য্য নহে।

* এখনও এই অনুপাত অক্ষুণ্ণ আছে। বিসপ হীর তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন যে, আয়র্ল্যাণ্ড দেশে Protestant ও Roman Catholic গণের অনুপাত ঠিক মুসলমান ও হিন্দুর অনুপাতের অনুরূপ।

অবসরদান।

নিম্নতর বিধির মধ্যে আমি আদেশ করিলাম যে, কোন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী স্বীয় জন্মভূমি দর্শনাভিলাষী হইলে, মীর বক্‌সী সেখ ফরীদের নিকট সে আবেদন করিবে; সহজেই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে।

সনন্দ দান।

বৃত্তি সম্বন্ধে যে সকল সনন্দ দেওয়া হইত, তাহা সিন্দূরে লিখিবার রীতি ছিল। আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিলাম।

বাঙ্গালার দেওয়ান।

আমি অসীম ক্ষমতা দান করিয়া উজীর খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করিলাম এবং সেখানকার রাজস্বের অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহাকে সেই দেশে পাঠাইলাম। বিগত দশ বৎসরের প্রকৃত হিসাব এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মর্য্যাদাদান।

বাদাক্‌সনের অধিপতি মির্জা সাহোখের পুত্রগণের মধ্যে মির্জা সুলতান সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত। আমি তাহাকে পুত্রের ন্যায় দেখিয়া থাকি। আমি তাহাকে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি করিয়া, আমীর-

উল্‌-ওম্‌রাহের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলাম। খান-এ-আজ্‌মের পুত্র মির্জা সেমসের দাবীর তদন্ত করিতে আমি বাজ বাহাদুরকে নিযুক্ত করিলাম। মানসিংহের প্রীতি-সম্পাদন-অভিপ্রায়ে আমি তাঁহার পুত্র ভাও সিংহকে পঞ্চদশ শত অশ্বের অধিনায়ক —এই সম্মান দান করিলাম। মানসিংহের পনের শত পত্নীর প্রত্যেকের গর্ভে দুই তিনটি করিয়া পুত্র জন্মিয়াছিল, এইরূপ প্রসিদ্ধি; তন্মধ্যে কেবল এই ভাও সিংহই জীবিত আছে। পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে পারে, ইহার এমন কোন গুণ নাই। তত্রাচ আমি ইহার পদোন্নতি করিয়া দিলাম। আমার পিতার সময় এই ব্যক্তি পাঁচ শত অশ্বের অধিনায়ক ছিল।

কাবুলবাসী খোর বেগের পুত্র জেমানাবেগ বাল্যকাল হইতেই আমার অধীনে কার্য্য করিত। আমার সিংহাসন অধিরোহণের পূর্ব্বে সে পাঁচশত অশ্বের অধিনায়ক হইয়াছিল। এক্ষণে আমি তাহাকে পঞ্চদশ শত অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম ও "মহবত খাঁ" এই উপাধি দিলাম; সেই সঙ্গে তাহাকে সাগ্‌রেদ বীসার উজীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। কারখানার শিক্ষানবীসগণের তত্ত্বাবধান করাই এই কর্ম্মচারীর কার্য্য। জিয়া-উদ্দীনকেও এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক এই সম্মান প্রদান করিলাম।

আমার অশ্বারোহী সৈন্যগণ ও অপর অনুচরগণ মধ্যে বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে, আমি অশ্বালয়ের অধ্যক্ষ ভিকন্‌ দাসকে প্রত্যহ দুই শত অশ্ব আমার সমক্ষে উপস্থিত করিতে বলিলাম। খঞ্জ, জরাজীর্ণ বা শ্রমক্লিষ্ট অশ্বসমূহ যে আমার বাহিনীর অন্তর্গত ছিল, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

পরভেজের বিবাহ।

হিজিরা ১০১৯ বৎসরে, শ্রাবণ মাসের ১১ই তারিখে, * বৈরম মির্জার পৌত্র মির্জা রুস্তমের কন্যার সহিত আমি আমার প্রিয় পুত্র পরভেজের বিবাহ দিলাম।

যৌতুকস্বরূপ এক লক্ষ আসরফি দান করিলাম। উৎসব উপলক্ষে যে সকল আমীর ও অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল, তাহাদিগকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার দেওয়া হইল। উৎসবক্ষেত্রে প্রায় ১০০ হিন্দী মণ চন্দন, মৃগনাভি, অম্বরগ্রীশ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ভস্মীভূত করা হইল। ইহা হইতে অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার অনুমিত হইবে। সন্ধ্যাকালে পাত্রী প্রাসাদে আগমন করিলে, আমি তাহাকে ষাটটি মুক্তাগ্রথিত এক ছড়া মালা উপহার দিলাম; এক একটি মুক্তা আমার পিতা দশ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। আমি বরকন্যাকে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের একটি মাণিক দিলাম। পুত্রবধূর ব্যয়নির্ব্বাহকল্পে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম, আর তাহার পরিচর্য্যার জন্য এক শত সুরঠবাসিনী রমণী নিয়োজিত করিলাম।

কর্ম্মনিয়োগ।

মির্জা আলী আকবর সাহীকে চারি সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম ও কাশ্মীরের সীমান্ত প্রদেশে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠাইলাম। সেই সময় উপহারস্বরূপে তাহাকে এক লক্ষ টাকা, রত্ন-খচিত পৃষ্ঠাসনসজ্জিত একটি মূল্যবান্‌ অশ্ব, রত্ন-খচিত কোমরবন্দ ও পেশ-কবজ, ও একটি শিরোভূষণ (শির-পেঁচ) প্রদান করিলাম।

* খ্রীষ্টাব্দ ১৬১০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর।

বথের খাঁ মুজ্জুম সানী আমার পিতার ...য়ে তিন শত অশ্বের অধিনায়ক ছিল। আমি ক্রমশঃ তাহার পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দুই সহস্র অশ্বের অধিনায়ক এই উপাধি দিলাম, এবং পরিশেষে মূলতানের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলাম। আলী খাঁ নামক নদীর ও তৎপার্শ্বস্থ পরগণাসমূহের "ফৌজদারী" ভারও তাহাকে দিলাম। ইহা ব্যতীত, তাহাকে নূরজাহান বেগমের ভগিনী-কন্যার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিবার মনন করিলাম। সেইজন্য, তাহার কর্ম্ম নিয়োগ পত্রে তাহাকে "পুত্র" আখ্যায় অভিহিত করিলাম। সামরিক কার্য্যে সে বিলক্ষণ সাহসের পরিচয় দিয়াছে। সুযোগ পাইলেই তাহার আরও পদোন্নতি করিয়া দিব, মনে মনে আমার এই সংকল্প রহিল।

তিন সহস্র টাকার বৃত্তি দিয়া, আমি রাণ সিংহকে আমার পিতার সমাধিস্থানের তত্ত্বাবধারক-পদে নিযুক্ত করিলাম। সমাধিস্থানে আগ্রা সহরের পশ্চিমদিকে তিন ক্রোশ দূরে *। আমার এইরূপ আজ্ঞা আছে যে, শ্রেণীনির্ব্বিশেষে আমীরগণ অগ্রে সেই পবিত্র স্থানে সম্মান প্রদান করিয়া না আসিলে, আমাকে অভিবাদন করিবার অনুমতি পাইবে না।

আমীর উল্-ওমরা এক দিন আমাকে ইঙ্গিতে একটা কথা বলেন। সে কথাটি আমার অভিপ্রায়ের অনুকূল বিবেচনায়, আমি এই মর্ম্মে নিয়ম করিলাম যে, বহুদর্শিতার কষ্টি-পাথরে অগ্রে পরীক্ষিত না হইলে, কোন ব্যক্তিকে রাজকার্য্যের ভার দেওয়া হইবে না। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কার্য্যবিশেষ সুসিদ্ধ হইবার সম্ভব কি না, পূর্ব্বে তাহার একটা আনুমানিক নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। জনৈক গণ্ডমূর্খ গুরুতর কার্য্য সুচারুভাবে সম্পাদন করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। আর অতি সামান্য বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা, মশকের বিরুদ্ধে বাজপক্ষীকে নিযুক্ত করার তুল্য। এবরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে, রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। সম্রাটের নিকটে যাহারা অবস্থান করে, তাহাদের চরিত্রের উপর রাজ্যের মঙ্গল ও সুশৃঙ্খল-কার্য্য বহুলভাবে নির্ভর করে।

(এইখানে চারিটি বয়েদ্ আছে। ইহার হস্তলিপিপাঠ দুঃসাধ্য।)

যুদ্ধ-কল্পনা।

যে সময়ে এই কাহিনী লিখিতেছি, সে সময়ে শুনিলাম যে, সমরকন্দ দেশ (যাহা ইতিপূর্ব্বে উজ্‌বেগজাতীয় বকী খাঁর শাসনাধীন ছিল) ওয়ালী খাঁ নামক জনৈক সর্দ্দারের হস্তে পতিত হইয়াছে। তাহার প্রভুতার প্রথম অবস্থায়, সে আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিবে, এইটি সম্ভবপর বলিয়া আমার মনে হইল। তাহাকে বাধা দিবার জন্য পরভেজকে পাঠাইব, এবং পরে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশ (দাক্ষিণাত্য) আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ং মা-ওয়ের-উন্-নেহের (Transoxiana) প্রদেশে যুদ্ধ যাত্রা করিব,—প্রথমে আমি এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলাম। দাক্ষিণাত্য করগত করিয়া আমার বিজয়ী সেনাকে সমরকন্দ দেশাভিমুখে লইয়া যাইব, এই ইচ্ছা আমি বহুদিন হইতে মনে পোষণ করিতেছিলাম। পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির লোভ আমি পিতা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সৈন্য-সহায়হীন কোন পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করা অযৌক্তিক, এইরূপ মনে করিয়া

* সেকেন্দ্রায় অবস্থিত। এই সুন্দর সৌধের বিবরণ ১৮২৫ খ্রীঃ রচিত বিসপ হীবরের পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

আমি পরভেজকে পুনরায় উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে পাঠাইলাম। জায়গীরস্বরূপে ঐ প্রদেশটি পরভেজকে, এবং মূলতান ও আগ্রা প্রদেশ অন্যান্য পুত্রকে দিব এইরূপ স্থির করিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় যদি আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি, তাহা হইলে আমি এই বৎসরেই দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে যাত্রা করিবার অবসর পাইব। কুগ্রহচালিত হইয়া রাণা যদি আরও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে আমার সমবেত সৈন্যকে তাহাকে সবংশে ধ্বংস করিবার জন্য নিযুক্ত করিব।

যে সকল আমীরকে পরভেজের আজ্ঞাধীন করিয়া দিলাম, তাহাদের মধ্যে আসফ খাঁ সর্ব্বপ্রধান। এই ব্যক্তি আমার পিতার উজীর ছিল। এক্ষণে আমি ইহাকে পাঁচ হাজার অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম, এবং বৃহৎ দামামা ও নিশান দিলাম। হীরক খচিত একটি তরবারি, একটি রণ-হস্তী ও একটি সুসজ্জিত অশ্বও এই সময়ে ইহাকে উপহারস্বরূপে দান করিলাম। ইহাকে "আতাবেক," অর্থাৎ আমার পুত্রের তত্ত্বাবধায়ক, এই পদে নিযুক্ত করিলাম। ইহার নিবাস কাজবীন দেশে। ইহার পূর্ব্বনাম জাফর বেগ। ইহার পিতার নাম বদিয়া-উজ্‌জেম্‌মান, এবং পিতামহের নাম আগা বেল্‌লাল। শেষোক্ত ব্যক্তিটি পারস্যের মৃত সম্রাট্ তামাস্পের উজীরগণের অন্যতম ছিল। পিতাই জাফর খাকে, "আসফ্ খাঁ" নাম দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সে মীর বক্সীগণের অগ্রণী ছিল; পরে অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য গুণের প্রভাবে সে "উজীর" পদে উন্নীত হইয়াছিল। অসীম প্রভুতা লইয়া সে দুই বৎসর যাবৎ উজীর-পদে আসীন ছিল। তীক্ষ্ণ-ধী-সম্পন্ন দেখিয়া, তাহাকে আমি আমীর শ্রেণীতে উন্নীত করি। এই সময়ে আমি সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণকে বিনা আপত্তিতে এই ব্যক্তির বিচার-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলাম। ইহার বিচার-মীমাংসা যে সততা-প্রণোদিত হইবে, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

এই সময় সাহজাদা পরভেজকে পাঁচ লক্ষ টাকার মূল্যের এক ছড়া মুক্তার মালা উপহার দিলাম। রাণার রাজ্যমধ্যে বেণারসের তুল্য একটি নূতন সহর নির্ম্মাণ করাইতে এবং তাহার নাম "পরভেজাবাদ" রাখিতে পুত্রকে বলিয়া দিলাম। সৌধনির্ম্মাণশিল্পী আবদর রেজাককে, এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক আখ্যা দিয়া সাহজাদার বক্সীস্বরূপে নিযুক্ত করিলাম। আসফ খাঁর পিতৃব্য আট-শত অশ্বের অধিনায়ক মোখতাওর বেগকে সাহজাদার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলাম। সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্ব্বেই আমি আফগানী রোকণ-উদ্দীনকে "সের খাঁ" এই উপাধি দিয়াছিলাম। এখানে কেবল এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই ব্যক্তি অসাধারণ সাহসসম্পন্ন। কাশ্মীর দেশের কতকগুলি সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া ইহার পানদোষ জন্মিয়াছিল; কিন্তু লোকটির বিচক্ষণতা অতুলনীয়।

আবুল ফজল্।

আবুল ফজল অসংযতচরিত্র ছিল, ইহা বিলক্ষণ অবগত হইয়াও, তাহার পুত্র সেখ আবদর রহমনকে আমি দুই সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। আবুল ফজল্ আমার পিতার রাজত্বকালের শেষ ভাগে তাঁহার উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন আমার জীবনের ন্যায় সহস্র জীবনেও সম্যক্‌ভাবে করিতে অসমর্থ, সেই মহম্মদ কেবলমাত্র অসাধারণ বাগ্মিতা-সম্পন্ন জনৈক আরব-বাসী, এবং কোরাণের পবিত্র উপদেশাবলী

কেবলমাত্র তাঁহারই কল্পনা-প্রসূত, আবুল ফজল আমার পিতার মনে এই প্রকার ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল। এই সকল কারণে আমিই তাহাকে নিহত করিতে ও তাহার মস্তক আমার সমীপে আনিতে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, এবং তজ্জন্য পিতার বিশেষ বিরাগভাজন হইয়াছিলাম।* সেই জন্যই হজরতের পবিত্র নামে শপথ করিয়াছিলাম যে, তাঁহারই সাহায্যে, আমি হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসিবার পথ পরিষ্কার করিয়া লইব। বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, এই কার্য্যে পিতা আমার উপর এতাদৃশ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি আমা অপেক্ষা আমার পুত্র খসরুকে অধিকতর স্নেহ-যত্ন দেখাইতে ও মান-মর্য্যাদা দান করিতে লাগিলেন, এবং স্পষ্টতঃ বলিলেন যে, তাঁহার দেহাবসানের পরে খসরুই সম্রাট্ হইবে। সেখ সাদী বলিয়াছেন—"ঈশ্বর যাহাকে লইয়া যাইবেন, তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন; নাস্তিকেরা বলিয়া থাকে, আমরাই তাহার মৃতদেহকে বস্ত্রাবৃত করিলাম।" যাহা হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিশেষে পূর্ণ হইল; আবুল ফজলের মৃত্যুর পরে পিতার মতি-গতি সুপথে ফিরিল; তিনি আবার বিশ্বাসী হইলেন।

পুরস্কারদান।

তুর্কমান কারাখাঁর উজীর সাদেক মহম্মদ খাঁর পুত্র, জাহেদ খাঁকে আমি দুই সহস্র অশ্বের অধিনায়ক করিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি আমার পিতার অধীনে কামান-বিভাগের সেনাপতির কার্য্য করিত, এবং আসেরী অবরোধের সময় অশেষ কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিল; এই সব কারণেই এখন তাহার পদোন্নতি হইল। এই সময়ে আমি তাহাকে ত্রিশ হাজার টাকা ও একটি বুজুর্গ আদেম * প্রদান করিলাম।

মহাপুরুষ-চরিত।

রাধাস্বামী মতের প্রতিষ্ঠাতা

স্বামীজি মহারাজ।

১৮৭৫ সংবতে (১৮১৮ খৃঃ) জন্মাষ্টমীর দিবসে আগ্রা নগরের পল্লী-গলিতে স্বামীজি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর বাল্য নাম লালা শিবদয়াল সিংহ। ইহাঁর পিতার নাম লালা দিলওয়ালী সিংহ। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহাপুরুষগণের প্রতিভা ও কার্য্যাবলীর চিহ্ন শৈশবাবস্থা হইতেই বিকশিত হইয়া থাকে। স্বামীজিরও তাহাই হইয়াছিল। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিলে, তিনি স্নানান্তে কোন নিভৃত স্থানে গিয়া একান্তচিত্তে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইতেন বলিয়া শুনা যায়। আরও শুনা যায় যে, তিনি অল্পবয়সেই নাগরী, গুরুমুখী ও পার্শী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই সময়েই পার্শী ভাষায় উচ্চভাবযুক্ত ঈশ্বরবিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

* জাহাঙ্গীর যে তাঁহার পিতার রাজত্বের ইতিহাস লেখকের হত্যাকার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন, তাহা সকলেই সন্দেহ করিত। এইখানে সম্রাট্ স্বয়ং সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন।

* কেহ কেহ বলেন, "আদেম" অর্থে মাণিক (চুনী), তাহা হইলে একটা বড় চুনী দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

ইহার পর তিনি আরবী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি পণ্ডিত ও মৌলবিগণকে পারমার্থিক উপদেশসূচক অনেক দোঁহা শুনাইতেন। তাহাদের মধ্যে একটী এই—

কবীর শোতা ক্যা করে, জাগন্‌কী কর চৌপ।
ইহ দম্‌ হীরালাল হ্যায়, গিন্‌ গিন্‌ গুরুকা সোঁপ॥

অর্থাৎ কবীর, তুমি শুইয়া কি করিতেছ? জাগরিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। তোমার এই শ্বাস প্রশ্বাসকে হীরা ও মাণিক্যের ন্যায় মূল্যবান্‌ জানিবে, এই শ্বাস প্রশ্বাসকে বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়, ইহাকে গণনা করিয়া গুরুকে অর্পণ কর, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ভগবানের নাম জপ কর।

এই সকল কথায় অনেকেই আস্থা স্থাপন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ মহাপুরুষগণের জীবনকথা অনেক সময়েই অতিরঞ্জিতভাবে লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে। তবে এই সকল অতিরঞ্জিত বাক্য দ্বারা স্বামীজির বাল্য-জীবন সম্বন্ধে অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। উত্তরকালে তিনি যে সকল শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সেই সকল শক্তির কিয়দংশে স্ফুরণ হইয়াছিল।

দিল্লীর সন্নিকটস্থ ফরিদাবাদ নগরে স্বামীজির বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশুরের নাম লালা ইজ্জৎ রায়, এবং স্ত্রীর নাম রাধা। স্বামীর ন্যায় স্ত্রীও অশেষগুণে গুণবতী ছিলেন।

মথুরার নিকটবর্ত্তী হাথরাস নামক স্থানে তুলসী সাহেব নামে এক সিদ্ধ-পুরুষ অবস্থান করিতেন। স্বামীজির পিতা ও মাতা উভয়েই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তুলসী সাহেব এক[illegible] স্বামীজিকে দেখিয়া তাঁহার মাতাপিতাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিব-দয়াল কালে অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবে; ইহাঁকে সত্যপুরুষের অবতারস্বরূপ জ্ঞান করিবে, কদাচ অবহেলা বা অনাদর করিবে না।" গুরুর উপদেশানু-সারে পরিবারবর্গ সকলেই স্বামীজিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন।

স্বামীজি প্রথমতঃ নিজ বাটীতে থাকিয়া প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালক-গণকে বিনা বেতনে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। কোন দরিদ্র বা ধনী ব্যক্তি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি পরম সমাদরের সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেন, এবং সাধ্যমত তাহাদের প্রার্থনা পূরণে যত্নবান্‌ হইতেন। তাঁহার স্ত্রী রাধাজিও সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি নিজ অঙ্গের প্রায় সহস্র মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া অনাথ আতুরদিগকে ভোজন করাইতেন, এবং এইরূপ কার্য্যে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন।

স্বামীজি কিছুদিন আগ্রা অযোধ্যা যুক্তরাজ্যের বাঁদা সহরে সরকারী ডাক-বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি লোকসকলকে নূতন ধর্ম্মপথ দেখাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অন্যের দাসত্ব করা তাঁহার পোষাইবে কেন? সুতরাং অল্পদিন পরেই তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুনর্ব্বার চাকরি করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু স্বামীজি তাহাতে সম্মত হইলেন না; তিনি বলিলেন, "চাকরি

করিলে আমার ভজনপূজনের ব্যাঘাত হ'বে।" পুত্রকে কিছুতেই সম্মত করিতে না পারিয়া পিতা পরিশেষে কৌশলক্রমে তাঁহাকে ফরিদাবাদে শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার শ্বশুরকে গোপনে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "যাহাতে শিবদয়াল চাকরি করিতে সম্মত হয়, তদ্বিষয়ে আপনি সাধ্যমত বুঝাইবেন।" শ্বশুরও জামাতাকে নানাপ্রকারে বুঝাইবেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বামীজি বলিলেন, "যদি দুই তিন ঘণ্টার জন্য কোন কার্য্য পাই, তবে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই সময়ে তাঁহার শ্বশুর সংবাদ পাইলেন যে, নিকটস্থ বল্লভগড় রাজবাটীতে রাজপুত্রকে পারসী পড়াইবার জন্য একটী লোকের প্রয়োজন। শ্বশুর ঠাকুর চেষ্টা করিয়া শিবদয়ালকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তদবধি স্বামীজি রাজবাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি বেতন ব্যতীত রাজবাটী হইতে প্রত্যহ একটী করিয়া রসদ (সিধা) পাইতেন। সে রসদের পরিমাণ এরূপ যে, আহারাদি বাদে তাঁহার যে উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা বিক্রয় করিলে কিছু কিছু অর্থাগমও হইত। রাজবাটীর অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এইরূপে উদ্বৃত্ত রসদ বিক্রয় করিত। কিন্তু স্বামীজি এই রসদের কিছুমাত্র নিজের জন্য রাখিতেন না, সমস্তই দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। কোন দীন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া কখনও রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইত না।

বাল্যকাল হইতে ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া স্বামীজির প্রকৃতি এরূপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়কর্ম্মেই তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না, কোন কার্য্যই তাঁহার ভাল লাগিত না। রাজবাটীর শিক্ষকতা কার্য্যও তাঁহার ভাল লাগিল না। হঠাৎ এক দিবস তিনি চাকরিতে জবাব দিয়া আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা কোন বিবাহ উপলক্ষে সিকোহাবাদ নগরে গিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুই দিন পরেই দেহত্যাগ করেন। স্বামীজি যেন পিতার এই আসন্নমৃত্যু পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই যেন সহসা চাকরিতে জবাব দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু-দিবসের পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি সমস্ত রাত্রি ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও ভজনা করিয়া পিতাকে সৎভাবে সংযুক্ত ও ঈশ্বরধ্যান-পরায়ণ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর স্বামীজি নিজ বাটীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তিন সহোদর ছিলেন। স্বামীজি জ্যেষ্ঠ। দ্বিতীয়ের নাম লালা বৃন্দাবন সিংহ। ইনি পরে বাহার বৃন্দাবন নামক এক মত চালাইয়া ছিলেন। কনিষ্ঠের নাম লালা প্রতাপসিংহ। দ্বিতীয় ভ্রাতা পোষ্ট্যাল বিভাগে ৫০৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন। কনিষ্ঠও ঐ বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের বংশপ্রথানুসারে তেজারতি কারবারও চলিত। কিন্তু এই কারবার স্বামীজির মনোমত ছিল না। তিনি একদা কনিষ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন, "এক্ষণে সংসার চলিবার মত এক প্রকার আয় যখন রহিয়াছে, তখন আর টাকার সুদ গ্রহণ করা কেন? এ কার্য্য নিতান্ত ঘৃণিত। অতএব আমার বিবেচনায় দেনাদারদিগকে ডাকাইয়া বল, তাহারা যদি দেনা পরিশোধ করিতে পারে ভাল, নচেৎ তাহাদের সম্মুখেই ষ্ট্যাম্প কাগজ পত্রাদি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও।"

কনিষ্ঠ দ্বিরুক্তি না করিয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।

ইহার পর হইতে স্বামীজি এক নির্জ্জন বাটীর মধ্যে অভ্যন্তরস্থ গৃহে অন্ধকারময় স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে তিনি একাদিক্রমে চারি পাঁচ দিবস একাসনে বসিয়া থাকিতেন; আহারের নিমিত্ত বা মলমূত্র ত্যাগের জন্য একবারও উঠিতেন না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি অল্প সময় মাত্র সৎ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে সাড়ে সতর বৎসর কাল এই উপদেশ প্রদানে দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। এই উপদেশের ফলে অনেকেই তাঁহার শিষত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে চারিদিকেই তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে নানাদেশীয় হিন্দু, মুসলমান ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রায় আট দশ সহস্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রায় এক সহস্র নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীও ছিলেন। অনেক বাঙ্গালীও তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন ও আছেন। তন্মধ্যে মেট্রপলিটন কলেজের অধ্যাপক ও ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রের সম্পাদক সুবিখ্যাত পরলোকগত এন্ ঘোষ একজন।

স্বামীজি হিন্দুধর্ম্মপ্রচলিত দেবদেবীসমূহকে কাল্পনিক ও তদর্থ ব্রতাদিকে মিথ্যা বলিতেন। এজন্য অনেক লোক তর্ক করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিতেন, কিন্তু তাঁহার সামান্য উক্তিতেই তর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত, এবং তার্কিকগণকে বাধ্য হইয়া নিস্তব্ধভাব ধারণ করিতে হইত। কেহ বা ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন, কেহ বা তাঁহার বাক্যে ও উপদেশে মুগ্ধ হইয়া সত্য পথ বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। এক সময়ে কাশী হইতে কোন এক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত স্বামীজির নিকট করেন। স্বামীজি তাঁহার সহিত ক্রমাগত এক সপ্তাহ কাল সৎ আলোচনা করিয়া তাঁহার সকল সংশয় দূর করিয়া দেন, এবং অবশেষে নানক প্রণীত গ্রন্থসাহেবের পাঠ ও অর্থ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলেন। পরে সেই পণ্ডিত স্বামীজির উপদেশ গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইয়া ছিলেন।

স্বামীজি সকল সম্প্রদায়েরই সৎ সাধকদিগকে যথেষ্ট মান্য করিতেন, ও তাঁহাদিগের সেবা করিতেন। পরমহংস, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি সকলকেই তিনি দীনভাবে সেবা করিতেন। পরন্তু তিনি মিথ্যার খণ্ডনে সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর ছিলেন।

সাধু আনন্দগিরি নামক এক অল্পবিদ্য সন্ন্যাসী আগ্রা সহরে বাস করিতেন। তিনি এক দিবস বিচারে স্বামীজির নিকট পরাজিত হইয়া আপনাকে অপমানিত জ্ঞানে সহরের থানেদার সুদর্শন দাসের সাহায্যে স্বামীজির "সৎসঙ্গ" বন্ধ করিবার আয়োজন করিলেন। স্বামীজির দরজায় দুই চারিজন কনষ্টেবল আসিয়া পাহারা দিতে লাগিল, বাহিরের কোন স্ত্রী বা পুরুষকে ভিতরে যাইতে দেওয়া হইল না। ইহা দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন, 'আমি কাহাকেও আসিতে বলি না; তোমরা যদি পার, ইহাদের যাতায়াত বন্ধ কর।' দুই তিন দিবস লোকজনের যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ রহিল। কিন্তু তাহার পর থানেদার একটী মোকদ্দমায় এমন বিপন্ন হইয়া পড়িল যে, সে স্বামীজির দরজা হইতে পাহারা উঠাইয়া লইল। ইহার পর সাধু আনন্দগিরির এমন একটী দুষ্কর্ম্মের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া গোপনে আগ্রা হইতে পলায়ন করিতে

হইল। স্থানীয় অন্যান্য অনেক লোকও নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। তাঁহারা কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আলয়ে সভা করিয়া, যাহাতে কোন বাড়ীর একটী লোকও স্বামীজির বাটীতে যাইতে না পারে, তাহার জন্য পরামর্শ ও অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ স্বামীজির উপদেশ শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, এবং সৎসঙ্গে যোগ দিয়া ও তাঁহার অমৃতায়মান উপদেশ পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিল।

রাধাস্বামী নামের অর্থ এই যে, স্বামী শব্দে অখণ্ড মণ্ডলাকার জগতের আদিপুরুষ জগদীশ্বরকে বুঝায়; এবং চৈতন্যধারার বিপরীত অর্থাৎ উর্দ্ধমুখী স্রোত রাধা শব্দ বাচ্য। প্রকৃতপক্ষে কোন মনুষ্যের নাম রাধাস্বামী নহে *। রাধাস্বামী মতে চারিটী কথা আছে; যথা—সত্যনাম, সত্য অনুরাগ, সত্যগুরু ও সৎসঙ্গ। নাম দুই প্রকার—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। বর্ণ অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা যাহা লিখিত হয়, এবং যাহার কোন অর্থ আছে, তাহাই বর্ণাত্মক। যেমন গিরিধারী অর্থাৎ যিনি গিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন; রাম অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতব্যাপী। এই সকল নাম বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক নামের অর্থ হয় না, এবং তাহা অক্ষর দ্বারা স্পষ্ট লিখা যায় না। যেমন ঘণ্টার শব্দ, শঙ্খের শব্দ, মেঘগর্জ্জন, ইত্যাদি। দেহাভ্যন্তরে সুষুম্না নাড়ীতে যে চৈতন্যশক্তি জাগ্রদবস্থায় আত্মশক্তির মুখ্য তাণ্ডার শ্বেতবর্ণ মস্তিষ্কের আধার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধারাক্রমে সর্ব্বশরীরে ব্যাপৃত হয়, সেই চৈতন্যধারার প্রবাহজনিত যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহাকে অনাহত শব্দ বা ধন্যাত্মক নাম বলে। পরন্তু সেই চৈতন্য ধারার নিম্নমুখী স্রোত হইতে যে দশ প্রকার অনাহত শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাতে সাধকের প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা ইন্দ্রিয়কে জাগরিত করে। সেই চৈতন্যধারার উর্দ্ধমুখী স্রোত হইতে যে দশ প্রকার অনাহত নাদ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাই ধ্বন্যাত্মক নাম এবং যথার্থ পথপ্রদর্শক। ইহাই সত্যনাম বাচ্য। ইহা দ্বারা মনের চাঞ্চল্য সহজে স্থিরীভূত হয়। ব্যষ্টিবাচ্য এই শরীরাভ্যন্তরে যে সাধক যতদূর অগ্রসর হন, মৃত্যুর পর তিনি সমষ্টিবাচ্য এই ব্রহ্মাণ্ডের ততদূর পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র মনুষ্যশরীর সমগ্র জগতের ক্ষুদ্র নমুনাস্বরূপ। আত্মা জগৎপতি পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মশক্তির বৃহৎ ভাণ্ডারের চৈতন্যধারা হইতে যতগুলি শ্রেণীবিভাগে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সামান্য মনুষ্য শরীরেও ততগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। আত্মার ভাণ্ডার অতি ক্ষুদ্র হইলেও পরমাত্ম-শক্তির অংশ বলিয়া উহা ক্ষুদ্রাকারে একই প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ। সত্য অনুরাগ ভিন্ন কেহই এ পথে অগ্রসর হইতে পারেন না।

যিনি পূর্ব্বোক্ত চৈতন্যধারার অনাহত শব্দ অবলম্বনে মায়াতীত নির্ম্মল চৈতন্য-মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা জীবগণের উপকারার্থ সেই মায়াতীত মণ্ডল হইতে

* যেমন গোবিন্দসিংহ শিখদিগকে বাহগুরু নাম প্রচার করিতে বলিয়া ছিলেন, তদ্রূপ সদ্গুরু আপনার ইচ্ছানুসারে নাম চালাইয়া থাকেন। প্রত্যেক নামেরই অর্থ আছে। যে নামে পরব্রহ্ম পরমাত্মা অনুমিত হয়, তাহাই ভগবানের নাম, নচেৎ কোন নামই তাঁহার নাম নহে। কেননা তিনি নাম-রূপাদিবিহীন।

অবতীর্ণ হইয়া অবতাররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরু শব্দবাচ্য। তিনি পূর্ণ ভক্ত ও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। এইরূপ সদ্‌গুরুর সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ ও ভক্তির আদর্শ দর্শন করিয়া তদনুরূপ শিক্ষা করার নাম সৎসঙ্গ। নতুবা রাজাদিগের যুদ্ধ বা কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করাকে সৎসঙ্গ বলা যাইতে পারে না। উপরোক্ত সাধন প্রণালী রাধাস্বামী মতে এবং কবীর, নানক, পল্‌টু, দাদূ, জগজ্জীবন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের মতে সুরত-শব্দ-যোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুরত অর্থে আত্মা ও আত্মকিরণ শক্তি, তাহা হইতে উত্থিত অনাহত শব্দকে অবলম্বন করিয়া চলার নাম সুরত শব্দ সাধনা। সুরত-শব্দ-সাধনমার্গই সামবেদে দেবযান পন্থা নামে বিবৃত হইয়াছে। এই সাধনা ব্যতীত কেহই যথার্থ কৈবল্য ও নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে সমর্থ হন না। মুসলমানদিগের তরীকৎ-কারীরা এই 'সাধনাকে সুলতান উলজ্‌কার' বলিয়া থাকেন। বেদে লিখিত আছে, শব্দ ব্রহ্ম, নিঃশব্দ ব্রহ্ম ও প্রণব ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্ম ধ্বন্যাত্মক, নিঃশব্দ ব্রহ্ম বর্ণাত্মক ও তাহা ধ্বন্যাত্মকের অতীত স্থির অবস্থা। প্রণব ব্রহ্ম অর্থাৎ বর্ণাত্মক ওঁকার ও ধ্বন্যাত্মক ঘণ্টানাদরূপ ওঁকার। বাইবেলে লিখিত আছে, Word is God অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম। বৌদ্ধেরা ওঁকারকে হুং এবং মুসলমানেরা হু বলিয়া থাকে।

রাধাস্বামী পন্থীরা কবীর ও নানকের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। (বর্ত্তমান কবীর ও নানক পন্থীগণের মধ্যে অনেকেই কবীর ও নানকের গ্রন্থলিখিত সুরত শব্দ সাধনা অবগত নহেন)। রাধাস্বামী মতের অপর নাম সন্তমৎ। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত সদ্‌গুরুর অপর নাম সন্ত (নানা সম্প্রদায়ের সাধুগণ পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি সন্তজি নামে অভিহিত হন, পরন্তু তাঁহাদের অনেকেই এই নামের উপযুক্ত নহেন বলিয়া বোধ হয়)। কবীর, নানক, তুলসী সাহেব, জগজীবন সাহেব, পলটু সাহেব প্রভৃতি মহাত্মগণ সন্ত পদবী লাভ করিয়াছিলেন।

স্বামীজির জীবনী কথা পুনরায় আলোচিত হইতেছে। একদিন প্রাতঃকালে তিনি নিজ বাটীতে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময় বুক্কীজি নাম্নী তাঁহার এক বিধবা শিষ্যা তাঁহাকে বলিল, 'আমাদের উদ্যানে (১) যে সকল সাধু দিবারাত্র সাধনায় মগ্ন আছেন, তাঁহাদের প্রতি কৃপা করুন।' স্বামীজি বলিলেন, 'আমি কিরূপে তাঁহাদিগের উপর কৃপা করিতে পারি? কারণ আজি উদ্যানমধ্যস্থ সাধুদের মধ্যে কেবল সাধু বিমল দাস ও দয়াল দাস প্রাতে ছয়টার সময় সাধনায় বসিয়াছেন। অপর সকলেই নিদ্রিত রহিয়াছে।' সায়ংকালে সাধুরা স্বামীজির বাটীতে সৎসঙ্গ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্তা শিষ্যা সাধুদের বলিলেন, তোমরা সকলে সত্য করিয়া বল, আজি প্রাতঃকালে কে কোন্ সময়ে সাধনায় বসিয়াছিলে? তদুত্তরে সকলেই বলিল, কেহ সাতটার সময় কেহ বা আটটার সময় সাধনায় বসিয়াছিল, কেবল দয়াল দাস ও বিমল দাস ছয়টা হইতে সাধনা

(১) আগ্রা সহর হইতে এই উদ্যান প্রায় তিন মাইলউত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এক্ষণে তথায় স্বামীজির স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটী সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। মহারাজা গোয়ালিয়রের সাহায্যে সমাধি মন্দিরটী রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা উহা ভাঙ্গিয়া পুনরায় শ্বেতমর্ম্মরে মণি মাণিক্য জড়িত হইয়া নির্ম্মিত হইতেছে।

আরম্ভ করিয়াছিল। বুকীজি ইহা শুনিয়া তিশয় চমৎকৃতা হইল।

স্বামীজির সম্বন্ধে আরও এমন অনেক জনরব শুনা যায়, যাহা অনেকেই কাল্পনিক উপন্যাস বোধে উড়াইয়া দিতে পারেন। সুতরাং এস্থলে আর সে সকল প্রবাদের উল্লেখ করা হইল না। তবে স্বামীজির উদারতা সম্বন্ধে একটী ঘটনা এস্থলে বিবৃত হইল। আগ্রা সহরস্থ যমুনা নদীর তীরে সুস্বাদু জলবিশিষ্ট দুইটী কূপ আছে। শিষ্যেরা স্বামীজির সেবার জন্য সেই কূপ হইতে জল আনিতেন। একদিন অতিরিক্ত লোকসমাগম হেতু উক্ত সাধুদিগকে সর্ব্বপ্রথমে জল লইতে না দেওয়ায় তত্রস্থ কয়েকটী ব্রাহ্মণের সহিত সাধুদিগের বিরোধ হয়। পরে সাধুরা প্রত্যাগত হইয়া স্বামীজিকে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করে। শুনিয়া স্বামীজি তাহাদিগের হস্তে একশত মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "তোমরা অবিলম্বে যমুনাতীরে গমন কর, এবং এই মুদ্রাগুলি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া যোড়হস্তে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আইস।" গুরুর আদেশানুসারে শিষ্যগণ সেইরূপই করিল। তখন ব্রাহ্মণেরা স্বামীজির মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া রীতিমত উপদেশ শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিল।

স্বামীজির সর্ব্বপ্রধান শিষ্যের নাম রায় সালিগ্‌রাম বাহাদুর। তিনি আগ্রা নগরীর পিপলমণ্ডি নামক স্থানে কোন প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, শৈশবাবস্থায় যখন তিনি দ্বিতল গৃহে কক্ষতলস্থ শয্যায় নিদ্রিত থাকিতেন, তখন এক বৃহৎকায় সর্প আসিয়া তাঁহার মস্তকোপরি ফণা ধরিয়া দাঁড়াইত। এই ঘটনায় প্রথমতঃ তাঁহার মাতাপিতা ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার মাতা প্রত্যহ একটি পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া সর্পকে পান করিতে দিতেন, সর্প ঐ দুগ্ধ পান করিয়া চলিয়া যাইত।

সালিগ্‌রামের কুলপ্রথানুসারে সকলেই বাল্যকালে গোকুলবাসী গোঁসাইদিগের দীক্ষিত হইত। পিতামাতা সালিগ্‌রামকেও দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু সালিগ্‌রাম তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি তৎকালিক ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রথমতঃ সরকারি ডাকবিভাগে ত্রিশ টাকা বেতনে কার্য্য গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার বেতন বর্দ্ধিত হইয়া আঠার শত টাকা হইয়াছিল। তিনি রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও আগ্‌রা অযোধ্যাযুক্ত প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ এবং রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

স্বামীজির দেহান্তের পর রায় সালিগ্‌রাম তাঁহার পদাঙ্কানুকরণ করিয়া রাধাস্বামী মতের নেতা হন। তাঁহার সময়ে ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোক এই মতানুবর্ত্তী হইয়াছিল। নানক পন্থী অনেক শিখও এই মত অবলম্বন করিয়াছিল। এই সময়ে এই মতাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ হইয়াছিল। বেলুচিস্থান, বর্ম্মা ও ইউরোপের কতিপয় ব্যক্তিও এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন।

সালিগ্‌রামের প্রধান শিষ্যের নাম পণ্ডিত ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র। ইনি কাশীর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদে তিন শত টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন।

রায় সালিগ্‌রাম বাহাদুর স্বামীজির ভ্রাতা প্রতাপের নিকট মিরাট সহরে স্বামীজির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে

দেখিবার জন্য প্রতাপের সহিত আগ্রার উপস্থিত হন, এবং পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারময় নির্জ্জন গৃহে স্বামীজির সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই সাক্ষাতে তিনি চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল স্বামীজির উপদেশ শ্রবণ করিয়া যারপর নাই পরিতৃপ্ত ও সংশয়বিহীন হন। ইহার পর তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বামীজির জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সুকঠোর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বৈশাখের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে নগ্নপদে প্রস্তরাকীর্ণ প্রায় এক মাইল পথ অতিবাহন করিয়া গুরুসেবার জন্য কূপ হইতে জল আনিতেন। তদ্ব্যতীত দাঁতন কাটিয়া আনা, মৃত্তিকা যে পান, জাঁতায় গম পেশা প্রভৃতি নিকৃষ্ট কার্য্যসমূহও অবিকৃতচিত্তে উল্লাসের সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার আদর্শে অনেক শিষ্যই সেবা ভক্তি শিক্ষা করিত। তিনি যাহা কিছু বেতন পাইতেন, সমুদয় আনিয়া স্বামীজির চরণে সমর্পণ করিতেন; স্বামীজি ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা কিছু উঠাইয়া দিতেন, তদ্দ্বারাই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কখন কখন শীতের গভীর রজনীতে গুরুশিষ্যে লণ্ঠন হস্তে যমুনাতীরে উপস্থিত হইতেন, এবং নিদ্রিত অনাথ দীন দরিদ্রের নিদ্রিতাবস্থাতেই তাহাদের গাত্রোপরি কম্বলাদি শীতবস্ত্র ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেন।

এক সময়ে আগ্রা অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের হেড কোয়ার্টার কিছুকাল আগরাতেই ছিল। সে সময় রায় সাহেবকে দুই তিন ঘণ্টা মাত্র আফিসের কাজ করিতে হইত, অবশিষ্ট সময় স্বামীজির সহবাসে যাপিত হইত। পরে এই আফিস এলাহাবাদে উঠিয়া গিয়াছিল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রায় সাহেবের কুলগুরু গোকুলবাসী গোঁসাইজিও স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কোন সময়ে স্বামীজি কিছুদিন নির্জ্জন বাসের ইচ্ছা করিয়া সকল লোককে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করেন। স্বামীজির অনভিমতে কেহই তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করে নাই। কিন্তু রায় সাহেব পূর্ব্বোক্ত আদেশ অবগত থাকিয়াও এক দিন তাঁহার নিকট গমন করেন। ইহাতে স্বামীজি নিজের খড়ম লইয়া তাঁহাকে ছুড়িয়া মারেন। রায় সাহেব তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথা প্রকাশ না করিয়া করযোড়ে আদেশ অবহেলার জন্য গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। স্বামীজি তখন তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। বস্তুতঃ স্বামীজি রায় সাহেবকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন; তাঁহার কৃপায় রায় সাহেব পূর্ণ ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন,—

সৎগুরু আউর পারশ্ মে, বড়ো অন্তরা জান্।
ওহ লোহেকো কাঞ্চন করে, এ করলে
আপ্ সমান॥

অর্থাৎ পরশমণি ও সৎগুরুতে অনেক প্রভেদ। পরশমণি লোহাকে সোণা করে বটে, কিন্তু তাহাকে পরশমণি করিতে পারে না; কিন্তু সৎগুরু শিষ্যকে আপনার ন্যায় গুণসম্পন্ন করিয়া থাকেন।

স্বামীজি মধ্যে মধ্যে রায় সাহেবকে বলিতেন, তোমার জন্য অমৃতের সমুদ্র পূর্ণ করিতেছি; তুমি নিজে উহা প্রচুর পান করিবে, এবং অপর সকলকেও বণ্টন করিয়া দিবে। রায় সাহেব যে ভবিষ্যতে গুরুর এই অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কতিপয় বিধবা স্ত্রীলোক স্বামীজির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণা ছিল। তন্মধ্যে খিল্লোজি, শিব্বোজি, বুক্কিজি ও বিষ্ণোজিই প্রধান। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায়

আগ্রা প্রদেশে দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। সেই [illegible]য়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইয়া অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। স্বামীজি তাহাদের কোন উত্তর না দিয়া মৌনভাবে অবস্থান করেন। এমন সময় তাঁহার শিষ্য বিষ্ণোজি গ্রামবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা গৃহে গমন কর, কল্য অবশ্য বৃষ্টিপাত হইবে। শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজি তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে জগতের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যখন গ্রামবাসীদিগকে বৃষ্টি হইবার কথা বলিয়াছ, তখন বৃষ্টি হওয়া অবশ্য উচিত। অতএব সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের নাম গান কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের কৃপায় কল্য বৃষ্টি হইতে পারিবে।" তখন গ্রামবাসী ও শিষ্যবৃন্দ সকলে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। পরদিবস সকলে বিস্ময় ও আনন্দ সহকারে দেখিল যে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া গেল।

আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এক সময়ে স্বামীজি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কয়েক দিবস ধর্ম্মালোচনার পর, তিনি স্বামীজির উপদেশ শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করেন। স্বামীজি তাঁহাকে চিত্তনিরোধের উপায় স্বরূপ যোগের সাধনা করিতে বলেন। তদুত্তরে স্বামী দয়ানন্দ বলেন যে, ভারতীয় হিন্দুগণ এক্ষণে বৈদিক ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির উপদেশ অনুসারে বিবিধ কাল্পনিক নীতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন পথে চলিতেছে। হিন্দুসমাজের আধুনিক নেতৃগণ স্বার্থসাধনের জন্য ব্যগ্র। এজন্য চতুরতাপূর্ব্বক নানা কাল্পনিক দেবমূর্ত্তি ও তীর্থস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা মহান্ হিন্দুসমাজকে নিবিড় ভ্রম-জালে আবৃত করিয়া তাহার রুধির শোষণ করিতেছে। সেই সকল শঠ সমাজ নেতৃগণের চাতুরী-জাল উদ্ঘাটনপূর্ব্বক যথার্থ বৈদিক মতের পুনঃ প্রচার করি, ইহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং এক্ষণে আমি চিত্তনিরোধের জন্য যোগ-পথের পথিক হইতে পারিব না।

স্বামীজি তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সঙ্কল্পসাধনে অগ্রসর হইতে বলিলেন। দয়ানন্দের জীবিতকাল এই উদ্দেশ্যেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে ৬০ বৎসর বয়সে স্বামীজি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য হইতে এক পক্ষ কাল গতে আমি দেহত্যাগ করিব। ইহা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, করজোড়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল, আপনি জগতের উপকারের নিমিত্ত আরও কিছুকাল দেহ ধারণ করুন। কিন্তু স্বামীজি তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন না। এই পঞ্চদশ দিবস তাঁহার ভক্তমণ্ডলী সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া সৎসঙ্গে উপদেশ শ্রবণে যাপন করিলেন। ক্রমে মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। সেই দিন তিনি প্রাতঃকাল ৭টার সময় একবার সমাধিস্থ হইয়া ১৫ মিনিট পরেই উত্থিত হইলেন, এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য মধ্যাহ্নের পর আমি দেহত্যাগ করিব। অতএব তোমাদের যাহার যে কিছু জিজ্ঞাসা আছে, জিজ্ঞাসা করিয়া লও।

স্বামীজির কথা শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুদর্শন সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর যদি কিছু জানিবার আবশ্যক হয়,তবে আমরা তাহা কাহার নিকট জানিব ? স্বামীজি উত্তর করিলেন, অতঃপর যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিবে, তাহা সালিগ্‌রামের নিকট জানিয়া লইও। পরে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি সত্য-নাম ও সত্য-পুরুষের আরাধনা করিতাম। আমার দেহত্যাগের পর রায় সালিগ্‌রাম রাধাস্বামী মত প্রচার করিবে, তোমরা তাহাতে কোন বাধা দিও না।

স্বামীজি সকলের প্রার্থনার যথাযোগ্য উত্তর দিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ও অন্যান্য গৃহী ভক্তগণ তাঁহার চরণে অর্থ উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিল। তাহাতে একজন শিষ্য বলিলেন, তোমরা এখন সরিয়া যাও, স্বামীজির আরাধনায় বিঘ্ন প্রদান করিও না। তখন স্বামীজি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে সেই শিষ্যকে বলিলেন, তোমরা সকলেই জান যে, আমি ছয় বৎসর বয়স হইতে এই পথের পথিক, এক্ষণে আমার বিঘ্ন করিতে পারে, এমন কেহই নাই। গত কল্য রাত্রিতেই আমি আমার অন্যান্য সমস্তই পাঠাইয়া দিয়াছি, এক্ষণে যাইতেই যাহা কিছু বিলম্ব। এই বলিয়া স্বামীজি পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলেন, এবং বেলা দুইটার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অমর আত্মা নিত্যধামে চলিয়া গেল।

গুরুর দেহত্যাগে শিষ্যবৃন্দ শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রধান শিষ্য বুক্কিজি এক সপ্তাহ কাল অনাহারে থাকিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে রায় সালিগ্‌রাম বাহাদুর সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজির প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি এগার বার বৎসর কাল দিবা[illegible] পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও উপদেশ প্রদান দ্বারা সৎ-ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তদীয় প্রধান শিষ্য পণ্ডিত ব্রহ্মশঙ্কর মহারাজ উক্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নায়ক হন। ইনি দশ বৎসরকাল এই সম্প্রদায়ের নায়কতা করিয়াছিলেন। ইঁনি ইংরাজী ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রায় সালিগ্‌রাম-প্রণীত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তাহা চারি পাঁচ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। স্বামীজি-প্রণীত দুইখানি সার গ্রন্থ তাঁহার সময় হইতেই প্রচলিত আছে। ঐ গ্রন্থ দুইখানি হিন্দি ভাষায় লিখিত, এবং উহাদের নাম সার বচন নজ্‌ম্ (পদ্য) ও সার বচন নস্‌র (গদ্য) বর্ত্তমান কালে রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের শাখা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। তদ্ব্যতীত বেলুচিস্থান, বর্ম্মা ও আমেরিকা প্রদেশেও উক্ত মতাবলম্বী দুই এক ব্যক্তি আছেন। মহানগরী কলিকাতার মধ্যে উক্ত সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। এক্ষণে উক্ত মতাবলম্বীর সংখ্যা অন্যূন দুই লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে বঙ্গবাসীর সংখ্যা এক সহস্রের ন্যূন হইবে না। তবে সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা, অযোধ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজেই এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

রাধাস্বামী মতে তামাক ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার নেশা ও মৎস্য মাংস আহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই মতাবলম্বীরা নিজ সৎ গুরুর চরণামৃত ও প্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করেন বলিয়া অনেকেই তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন ; এবং অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার আলোচনা না করিয়াই রাধাস্বামী মতের নিন্দা প্রচার করেন। এরূপ

কার্য্য, সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা তাঁহারাই [illegible]ত পারেন, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চরণামৃত সেবন ও প্রসাদী গ্রহণ তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নহে, ভক্তগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারেই ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয়।

সম্প্রতি গাজীপুরনিবাসী লালা কামতা প্রসাদ উকিল সাহেবের হস্তে রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত ভার ন্যস্ত আছে। ডুমুরাও রাজ্যের মুরারে গ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি এক সম্ভ্রান্ত জমীদার-বংশের সন্তান; এবং বি, এ, বি, এল উপাধিধারী। ইহাঁর বয়স এক্ষণে অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে।

শ্রীমনোমোহন মিত্র।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

(৮)

উপন্যাস-লেখকদিগের প্রধান কার্য্য, একটি আগ্রহময়ী প্রেম-লীলা সবিস্তারে বর্ণনা করা। আমি এ যাবৎ এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি নাই বলিয়া পাঠকগণের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে এই ক্রটীর নিরাকরণ জন্য চেষ্টা পাইব।

কিন্তু আমার একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। আমার উপন্যাসের নায়কটি রূপ এবং অর্থ হীন। আমরা জানি, প্রেমিকার মন, ভ্রমরের মত রূপ-পদ্মের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অর্থ ব্যতীত প্রেম-একবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক, জগৎসিংহকে, প্রতাপকে, গোবিন্দলালকে, নগেন্দ্রনাথকে রূপৈশ্বর্য্যসনাথ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার এক একটি নায়ক করিতে, আমি যদি সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা-সকলকে আমার এই উপন্যাস-মধ্যে সমবেতা করিয়া, ইহার বিশেষরূপ উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিতাম। এবং পাঠকগণের মন বিনোদনার্থে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও জল-তরঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া, কাহাকেও বা তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া একটা কৌতুকাবহ মজার অবতারণা করিতাম। হায়! আমার মন্দাদৃষ্ট, আমার গদাধর কাল। তুমি, আমি "কালা আদমী"র মত কাল নহে— তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাল।

তবে কি আমার এই কাল নায়কটিকে তোমরা কেহ ভালবাসিবে না? তবে রাজাধিরাজ হারুন্-উল্-রসিদের বিপুল, ভাস্করপ্রভ ঐশ্বর্য্য এবং মোহন রূপ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার মহিষীরা কেন কদর্য্য কাফ্রি ক্রীতদাসের অনুরক্তা হইয়াছিল?—তুমি বলিবে, ইহা প্রেম নহে, ইহা মূর্ত্তিমান্ পাপ। তবে মহারাজ মান্ধাতার কমনীয়া কন্যাগণ কেন উদ্গ্রীব হইয়া বৃদ্ধ, দরিদ্র, তপঃক্লিষ্ট-দেহ, বহুজলবাসে নির্ব্বাপিত-প্রেমাগ্নি সৌভরিকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিল?— তুমি বলিবে, মহর্ষির তপঃ প্রভাবে রাজ-কন্যাগণ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে জগতের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভাপ্রসূতা অপূর্ব্বা দেস্‌দিমনা কেন কৃষ্ণকায় মুর ওথেলোকে ভালবাসিয়াছিল?—তুমি বলিবে, ভ্রান্তি,

ভ্রান্তি, ওথেলোর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া দেস্‌দিমনা এই ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। তবে কৃষ্ণকায় ত্রিভঙ্গ রাখাল-বালকের অদর্শনে মূর্ত্তিমতী প্রেম যমুনাতীরে কেন গাহিয়াছিল,—

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতা ; দিক্ষু তারকা
ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥ *

* * *

তুমি বলিবে, ইহাও প্রেম নহে, ইহা ঈশ্বরানুরক্তি বা ভক্তি।

তা, পাপে হউক, মোহে হউক, ভ্রান্তিতে হউক বা ভক্তিতে হউক, তোমরাত দেখিলে যে কালকে—দরিদ্রকে ভালবাসিবার লোক এ পৃথিবীতে আছে। তোমরা আবার দেখিবে, গদাধরকেও ভালবাসিবার লোক এ পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য নহে।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, ভয়-ব্যাকুলা চারুশশীর নির্দ্দেশমত গদাধর অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল। বহির্বাটীতে উপযুক্ত শয্যাদি প্রস্তুত না থাকায়, এবং দূরে থাকিলে, চারুশশীর বিভীষিকা বর্দ্ধনের সম্ভাবনা থাকায়, গদাধর অনন্যোপায় হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে চারুশশীর শয্যাগৃহে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল। গৃহতলে আপন শয্যার অনতিদূরে চারুশশী গদাধরের জন্য একটি শয্যা রচনা করিয়াছিল। তাহাতে শয়ন করিয়া গদাধর অবিলম্বে নিদ্রিত হইল।

চারুশশী খট্টাঙ্গের উপর, আপন শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু সে সহসা নিদ্রিতা হইতে পারে নাই। সে অনিদ্রিতা থাকিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। কে তাহার মত দুর্ভাগা? কাহার স্বামী আপন পত্নীকে দুরন্ত চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি সুরাপান করিয়া অচেৎ থাকে? ভয়-ব্যাকুলা যুবতী পত্নীকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া তাহার নিষ্ঠুর স্বামী কিরূপে পর-গৃহে নিশাযাপন করিতেছে? কিরূপে হতভাগ্য, তাহার মত সুন্দরী এবং প্রেমিকা প্রণয়িনীর আহ্বান উপেক্ষা করিল? কিরূপে পাষণ্ড এই মহা বিপদের সময় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রহিল? হা ধিক্! ধিক্ তাহার দুরদৃষ্ট! তাহার এ দুঃখ মরিলেও যাইবে না। মৃত্যুও এ অপমান অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবে না!

ভাবিতে ভাবিতে ক্ষোভ-বিক্ষুব্ধ-হৃদয় চারুশশী আপন শয্যা-নিম্নে তাহার যৌবন চক্ষু দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিল, গদাধর আপন প্রশস্ত বক্ষঃ সুবিস্তৃত করিয়া শুভ্র শয্যার উপর শয়ান রহিয়াছে। তাহার নিরুদ্বেগ সুগঠিত কৃষ্ণ মূর্ত্তি, ক্ষীরোদ-সাগরশায়ী কমলাপতির ন্যায় প্রদীপালোকোজ্জ্বল শুভ্র শয্যার উপর শোভা পাইতেছে। চারুশশী ভাবিল, "এই মহাপুরুষ আজ আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়াছে। আমাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ইহার জয় হউক। দেবতাগণ ইহাকে রক্ষা করুন।" চারুশশী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উদ্ধারকর্ত্তার শত মঙ্গল কামনা করিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

স্বামীর প্রতি ঘৃণা এবং গদাধরের প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া, চারুশশী আপনার চঞ্চল নয়ন স্থির করিয়া, নিদ্রিত, শান্ত গদাধরের প্রশান্ত এবং পীবর বক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহা শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত উন্নত ও অবনত হইতেছিল। প্রত্যেক আকুঞ্চনে এবং প্রত্যেক সম্প্রসারণে তাহাতে অসীম বল ক্রীড়া করিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া, মুগ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে চারুশশী তাহা অবলোকন করিল

* ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। ৩১ অধ্যায়।

সাবধান চারুশশী! নির্জ্জনে, নিশীথে ন শয্যাগৃহে পাইয়া, গদাধরকে দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইও না। সেই বক্ষঃ পৌরুষের আধার হউক, তাহার জন্য তুমি কুল-ললনার পুণ্য অধিকার অতিক্রম করিও না। আর তোমার স্বামীর নিন্দনীয় আচরণে যদি তুমি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে আমরা করযোড়ে মিনতি করিতেছি, তুমি আপনাকে হিন্দু জানিয়া, তোমার মন হইতে সেই ক্ষোভকে দূর করিয়া দাও। তোমার ধর্ম্মের সেই পবিত্র কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিও ;—

"নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা
শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি
চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা ॥*"

তুমি সীমন্তিনী, তুমি আপন লোলুপ লোচনকে সংযত করিয়া সনাতন পুণ্যের পথ অবলম্বন কর।

কিন্তু পিতামাতার সমস্ত আদরের আদরিণী, ভর্ত্তার মস্তকের মণি, কর্তৃত্বাভিমানিনী চারুশশী কখনও আপনার মন শাসিত করিতে শিক্ষা করে নাই। সে ভাবিল, 'যদি নির্জ্জনে স্ত্রীজনদুর্লভ যুবকের সুগঠিত অবয়ব নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তবে তাহা দেখিয়া কেন চক্ষু সার্থক না করিব? ইহাতে ত পাপ নাই। আমি ত কুলত্যাগিনী হইতেছি না।' মূর্খা, পাপিষ্ঠা সে জানিত না যে, আমাদের মানসিক পাপগুলি, শারীরিক পাপ অপেক্ষা কোনক্রমে কম উপেক্ষণীয় নহে। নরকের পথ সুগম করিতে শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ পাপই তুল্য শক্তিশালী। মানসিক পাপে আমরা কখনও কখনও লোকলজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু দারুণ অন্তর্দাহে হৃদয়মধ্যে ভীষণ নরক-জ্বালার সৃষ্টি করি। অনেক সময় আমাদের শারীরিক পাপগুলি, মানসিক পাপের স্ফুরণমাত্র।

গদাধরকে দেখিতে দেখিতে চারুশশীর বার বার মনে হইল, কেন সে ঐ প্রশস্ত বক্ষের আশ্রয় লাভে বঞ্চিত থাকিল? কেন তাহার নির্ব্বোধ পিতা তাহাকে এক মদ্যপায়ী হৃদয়হীন কাপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিল? আরও অনেক কথা তাহার মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কুৎসিত বাক্য আমার পাঠকগণের শ্রবণযোগ্য নহে; এজন্য আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রাখি না।

(৯)

আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, আমাদের আখ্যায়িকার মধ্যে চারুশশীর ন্যায় এক পাপিষ্ঠার কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার কথা না কহিলে আমার এ কাহিনী অঙ্গহীনা হইবে। আমার সকল কথা আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। এজন্য তাহার কথা আবার বলিব।

স্বপ্নশূন্য নিদ্রার পর, পরদিন সুন্দর প্রভাতে আমাদের গদাধর গাত্রোত্থান করিল। গবাক্ষ পথে প্রভাত-আলোক প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গৃহ-কোণে প্রদীপ-রশ্মি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। সারা নিশা অনিদ্র থাকিয়া, নিশাশেষে চারুশশী নিদ্রার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছিল। তাহার শুভ্রদেহ খট্টাঙ্গের উপর শোভা পাইতেছিল। তাহার বিশৃঙ্খল কেশে অসংযতবেগে প্রভাত-বায়ু ক্রীড়া করিতেছিল। বায়ুর ক্রীড়ায় যুবতীর লাবণ্য-নদীতে তরঙ্গ উঠিতেছিল। নিদ্রিতার মুদ্রিত নয়ন কমল-কোরকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। নিশ্বাস-বায়ুতে তাহার বেশরবিলুম্বিত

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। ৮ম উল্লাস।

নাসিকা বিকম্পিত হইতেছিল। তাহার তাম্বুলরাগরঞ্জিত রক্তাধর মধুরতায় মণ্ডিত ছিল। তাহার অবশ অলস বাহুতে সরসতা সঞ্চিত ছিল। গদাধর ভাবিল, এ দৃশ্য নয়নাভিরাম বটে, কিন্তু ইহা দর্শন করিবার অধিকার তাহার নাই; অতএব সে ত্বরিত পদে গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবুর বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া, গদাধর দেখিল, তখনও অতুলানন্দ বাবু তন্দ্রাঘোরে অচেতন রহিয়াছেন। তাহার পূর্ব্ব নিশীথের সুখ-স্বপ্ন তখনও ভঙ্গ হয় নাই।

বেলা দশটার সময়, যখন গদাধর বিদ্যালয়ে যাইবার উদ্দেশে বাহির হইতেছিল, তখন অতুলানন্দ বাবু জাগরিত হইয়াছিলেন। তিনি গদাধরকে দেখিয়া কহিলেন, "গদাধর, স্কুল যাইবার পথে আমাদের বাড়িতে যদি তুমি সংবাদ দাও যে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি বাড়ী ফিরিতে পারিব না, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তাহা না হইলে, বাটীতে বোধ হয় আমার আগমন অপেক্ষায় আহার করিতে বিলম্ব করিবে।" গদাধর স্বীকৃত হইয়া, অগ্রসর হইল।

কিন্তু সে আপন অঙ্গীকার রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। পথে এক বৃহৎ জনতা অবলোকন করিয়া, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, নিম্নজাতীয় এক আতুর ব্যক্তি কদর্য্য রোগে আক্রান্ত হইয়া, একান্ত অসহায় অবস্থায় পথমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। রোগ-যন্ত্রণায় বিকৃত শব্দ করিতেছে। কিন্তু সেই বৃহৎ জনতার এক ব্যক্তিও তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয় নাই। রোগ-ব্যথিতের ব্যথায় তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যথা অনুভব করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় হিন্দু হইয়া কিরূপে অতি অস্পর্শীয় নীচ জাতীয়ের দেহ স্পর্শ করিবে? কিরূপে আপনাদের পুণ্য দেহ কলঙ্কিত করিবে? গদাধর আপনার সমস্ত দেহগৌরব লইয়া রুগ্নের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। এবং অতি সহজে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল। তাহার পর, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া অতি দ্রুতবেগে বিদ্যালয়ের সময়ের অব্যবহিত পরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে যাইতে হইলে, সে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইত না। এজন্য সে তথায় যাইতে পারে নাই।

বিদ্যালয় হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, সে দিবাবসানে অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে আসিয়াছিল। বহির্বাটীতে ভৃত্যকে, বাবুর বাটী প্রত্যাগমনের সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া সে গমনোন্মুখ হইলে, ভিতর বাটী হইতে দাসী আসিয়া কহিল, "আপনাকে মা ঠাকুরাণী একবার বাটীর ভিতর আসিবার জন্য বলিতেছেন।"

"কেন, কি আবশ্যক?"

"বলিতেছেন যে, আপনি এখানে জল-খাবার খাইয়া, পরে বাড়ী যাইবেন।"

"এ কথা ভাল; চল যাই।

ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র, চারুশশী গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এস, ঠাকুর পো।"

গদাধর। বা, আপনি যে আমার সহিত একটা নিকট সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন।—আমি আজ হইতে, আপনার 'ঠাকুর পো' হইলাম।

চারুশশী। হাঁ ভাই! আজ হইতে আমার ঠাকুর পো হইলে। তুমি যে বিপদ্ হইতে আমাকে বাঁচাইয়াছ, তাহাতে আমি তোমাকে আমার পরম আত্মীয় বলিয়া জানিয়াছি; এখন কিছু জল খাবার খাও।

গদাধর। দিন। উদরমধ্যে ক্ষুধার মাত্র অপ্রতুল নাই।

চারুশশী স্বহস্তে পাত্রপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া গদাধরের সম্মুখে রাখিল। নিজে অলক্ত অধরে, বিলোল লোচনে, বলয়কঙ্কণ-মুখরিত বাহুতে তীব্র বিলাসাগ্নি জ্বালিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া গদাধরের বিশাল বীরমূর্ত্তি দেখিল। গদাধর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আহারে সবিশেষ মনোনিবেশ করিল। আহার সমাপ্ত হইলে, চারুশশী আপন হস্তে করঙ্ক ধরিয়া কহিল, "পান খাও।"

গদাধর। পান খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। কখনও খাই নাই।

চারুশশী। আমি স্বহস্তে সাজিয়াছি; আজ আমি অনুরোধ করিতেছি, একটি খাও। খাইলে আমি সুখী হইব।

গদা। আপনি অনুরোধ করিবেন না। উহা খাইতে আমার ভাল লাগিবে না।

চারুশশী। আমার হাতের সাজা পান ত কখনও খাও নাই; খাইলে জানিতে পারিবে কত মিষ্ট।

গদাধর। আমি কাহারও হাতের সাজা পান কখনও খাই নাই। উহা তিক্ত কিংবা মিষ্ট, তাহা জানিবার ইচ্ছা আমার নাই। তথাপি আমি স্বীকার করিতেছি, উহা দেখিতে মিষ্ট বটে। এখন তবে আমি যাই। অতুলানন্দ বাবু সন্ধ্যার পরই আসিবেন।

চারুশশী। না, না ঠাকুরপো! এখনই যাইও না। উপরে চল; সেখানে একটু বসিবে, গল্প সল্প করিব।

গদাধর। আমার গল্প করিবার কিছু মাত্র অবকাশ নাই। চলিলাম

মুহূর্ত্তমধ্যে গদাধর চলিয়া গেল। চারুশশী নির্ব্বাক্ থাকিয়া গমনশীল গদাধরের সরল সুদৃঢ় মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। সে ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। আকুঞ্চিত কৃষ্ণ ভ্রূ-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ম কটাক্ষের বাণসকল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। প্রদীপ্ত যৌবনের লাবণ্য পরিপ্লুত দেহের সমস্ত আকর্ষণ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। হায়! বিমূঢ়া বিবশা নারী আর তুমি এ লাবণ্যের—এ কটাক্ষের অহঙ্কার করিও না।

কিন্তু চারুশশী ভিন্নপ্রকৃতির যুবতী। সে তাহার কদর্য্য প্রকৃতিকে সংযত করিতে চেষ্টা করিল না। বল্গাবিচ্যুত অশ্বের ন্যায় তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি গদাধরের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। সে ভাবিল, "আবার চেষ্টা করিব; এ কমনীয় দেহতটে নূতন শ্রী সঞ্চারিত করিয়া, পলাতক গদাধরকে ধরিবার নূতন ফাঁদ পাতিব। নয়নজ্যোতিতে প্রবল প্রমত্ততা পুরিয়া পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ-সন্ধানে পলাতককে জর্জ্জরিত করিয়া দিব।

(১০)

নাড়িচা গ্রামে গদাধরের মাতা আজ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। গদাই কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়াছিল যে, তাহার পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, সে আজ বেলা বারটার সময় নৌকাযোগে বাটী ফিরিবে। কত দিন পরে প্রাণাধিক পুত্র আবার মাতার অঞ্চল-তলে ফিরিয়া আসিবে! আনন্দে মাতা সারারাত্র জাগিয়াছিলেন। জাগিয়া, প্রত্যূষে উঠিয়া পুত্রের জন্য কি কি আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিবেন, মনে মনে শত শত বার তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন।

অতি সত্বর গৃহ-কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি জেলে-বৌএর পথ-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। জেলে বৌ রোজ কত সকালে

আসে; আজ আর তা'র বার হয় না। ঐ যে জেলে বৌ আসিতেছে। মাতা ডাকিলেন, "আয় জেলে বৌ! শীঘ্র আয়। আজ তুই বাছা এত দেরী করিয়া কেন আসিলি? তোর ঝুড়ি নামা, দেখি কি মাছ আছে। ও মা! তোর ঝুড়িতে যে একটিও ভাল মাছ নাই। আজ যে আমার গদাই বাড়ী আসিবে! কত দিন পরে বাছা আমার বাড়ী আসিবে, বল্ দেখি তাহাকে কি রাঁধিয়া দিব?

জেলে বৌ। আমি ত জানিনি মা যে দাদাবাবু আজ বাড়ী আসিবে; নহিলে কত ভাল ভাল মাছ লইয়া আসিতাম।

মাতা। তা' মা, যা' এনেছিস্ তাই দিয়া যা'। এই পুঁটি মাছগুলি ভাজিব। আর এই খড়িকা-বাটাগুলি ঝাল দিয়া রাঁধিব। আর এই কয়লা মাছগুলি তেঁতুল দিয়া অম্বল রাঁধিব।

জেলে বৌ বেশী দামে মৎস্য বিক্রয় করিয়া আনন্দিতা হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর দুধের কেঁড়ে লইয়া, এবং কেঁড়ের মুখে, দুগ্ধপরিমাণজন্য সুমার্জ্জিত কাংস্য নির্ম্মিত ঘটীটি লইয়া এবং নিজের মুখে একটি মুখ দোক্তা ও পান লইয়া আতরের মা আসিল;—রোজের দুধ দিবে। গদাধর কলিকাতা যাইবার পর মধুসূদন মুখোপাধ্যায় গৃহে গাভী রাখিবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। কে তাহাকে দোহন করিবে? কে তাহার সেবা করিবে? আর গদাধরের প্রবাসকালে তত দুগ্ধের আবশ্যকতাই বা কি? মাতা আতরের মাকে দেখিয়া বলিলেন;—"ও আতরের মা! শুনেছ, আজ আমার গদাই আসিবে।"

আতরের মা বলিল, "তা'ত শুনিনি। দাদাবাবু কখন্ আস্‌বে?

মাতা বলিলেন, "এই বারটার সময় আসিবে। এখানে আসিয়া খাইবে।" আজ বাছা! রোজের দুধে হইবে না; এক বেশী দুধ দিতে হইবে।"

আতরের মা, রোজের দুধ এবং বেশী দুধ দিয়া, অন্য বাড়িতে যোগান দিতে গেল। তাহার পর ধোপা মিন্সে আসিল, তাহাকে মাতা বলিলেন, "বাবা, আজ আমার গদাই বাড়ী আসিবে, অন্য কাপড় দিতে না পার, আজ বিছানার চাদরখানি দিয়া যাইও।"

মাছ কিনিয়া, দুধ লইয়া, ধোপাকে চাদরের কথা বলিয়া, মাতা রন্ধন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রন্ধনকার্য্যে গদাইএর মাতা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একণে এই পারদর্শী পাককুশলার প্রত্যেক ব্যঞ্জনটি পুত্রস্নেহের সঞ্চিত সুধারসে পরিপ্লুত হইয়া আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। পরিচ্ছন্ন পাত্রে সুধাপূর্ণ ব্যঞ্জনগুলি শোভা পাইল। তাহাদের জিহ্বাসরসকারী সৌরভ দিক্‌সকলকে আমোদিত করিল।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সকালে উঠিয়া কোথায় গিয়াছিলেন। একণে বেলা এক প্রহরের সময় তিনি রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধের মাথায় রঙ্গিণ গামছার পাগড়ি, বাহুতলে ছিপ্, এবং বাম হস্তে অতি সুদর্শন, গোলাপ-বর্ণ-বিনিন্দিত-উদর-বিশিষ্ট-রোহিত মৎস্য। মরি, মরি, কি সুন্দর বর্ণ সে রোহিত মৎস্যের। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ সে পুচ্ছ, নধর সে দেহ, রজত-বিগঠিত কোমল সে অধর, তাহার মধুর মর্ম্ম, হে আমার বাঙ্গালী পাঠক! তুমি যদি বুঝিতে সমর্থ না হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি বৃথায় বাঙ্গালী নাম গ্রহণ করিয়াছ। জানিও ভাই, এই রোহিত মৎস্যই, তাহার মুণ্ডপাত করিয়া, তোমাকে পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ করিয়া রাখিয়াছে।

[illegible]ছ দেখিয়া গদাইএর মার আর আহ্লাদ ধরে না।

মধুসূদন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ওগো, এই মাছের ঝোল রাঁধিতে হইবে; আর পেটীর মাছ দুই চারি খানা ভাজা রাখিও, গদাই ভাজা মাছ খাইতে ভালবাসে। আর মুড়োটা দালে দিও। এখন আমি একটা মোচা সংগ্রহ করিবার জন্য চলিলাম; মোচার দাল্না রাঁধিতে হইবে, গদাই মোচার দাল্না খাইতে বড় ভালবাসে।"

গদাইএর মা কহিলেন,—"না, না, তোমার মোচার জন্য যাইতে হইবে না। এই দেখ আমি মোচার দাল্না রাঁধিয়া রাখিয়াছি।"

মধুসূদন বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহ'লে এখন আমি গঙ্গাতীরে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকি; গদাইএর নৌকা দেখিতে পাইলেই আমি শীঘ্র আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিব।"

এই বলিয়া নগ্নপদ এবং গামছার দ্বারা বিরচিত সেই অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারী মধুসূদন ভাগীরথী তীরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। পথে এক গ্রামবাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাহাকে গদাধরচন্দ্রের পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে এবং বাটী শুভাগমন সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। বলিলেন,—"দেখ, তোমরা বলিতে গদাধর মূর্খ হইবে, আমি বলিতাম, আমার আশীর্ব্বাদে সে বিদ্যালাভ করিবে। এখন আমার আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে; গদাধর পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিতেছে।"

উমাকালী চক্রবর্ত্তীর সহিত গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ হইলে, মধুসূদন কহিলেন, "উমাকালী ভাই! গদাই আমার পরীক্ষা দিয়াছে; আজ বাটী আসিবে।"

কালীকৃষ্ণ ঘোষ গঙ্গাস্নানের পর বাটী ফিরিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া মধুসূদন সংবাদ দিলেন, "ঘোষজা, তুমি বলিতে গদাই-এর লেখা পড়া হইবে না; দেখ, আজ সে পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিতেছে।"

গঙ্গাবগাহন-অভিলাষী শ্রীযুক্ত হরিহর সিংহ মহাশয়, হরিনামের ঝুলিটি লইয়া হরিনাম জপ করিতে করিতে মন্থরগমনে অগ্রসর হইতেছিলেন। সহসা তাঁহার জপ-ভঙ্গ হইল। মধুসূদন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"সিঙ্গি ম'শায়, আজ গদাই আমার বাটী ফিরিবে।"

এইরূপে মধুসূদন সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার সুখসংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বনের পাখীরা কিংবা জলের মৎস্যেরা যদি মানুষের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, বুঝি বা তিনি তাহাদিগকেও গদাধরের আগমন-বার্ত্তা প্রদান করিতেন। যদি গ্রাম্য বৃক্ষসকলের কিংবা বৃক্ষবিলম্বিতা লতাসকলের শ্রবণেন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকেও আহ্বান করিয়া কহিতেন, "ওগো! আজ আমার গদাই বাটী ফিরিবে।" ফলতঃ গদাধরের আগমনবার্ত্তা ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রত্যেক কুটীরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। একটি লোকের হৃদয়ানন্দে সমস্ত গ্রামখানি আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু হায়! পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের যেমন একটা সীমা আছে, বৃদ্ধ মধুসূদনের আনন্দেরও একটা সীমা ছিল। গঙ্গাতীরে বসিয়া, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি দেখিলেন, দূরে—গগনপটে সহসা এক খানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ উদিত হইয়াছে। দেখিয়া মধুসূদন চিন্তিত হইলেন।

ক্রমশঃ।

তুমি ও আমি।

কাছে তুমি রয়েছ সতত,
তব কাছে আমিও সদাই
দুই—এক, দেখিতে না পাই!
মাঝে যেন ব্যবধান কত!
প্রাণে প্রাণে রয়েছ মিশিয়া,
তবু যেন কত দূরান্তরে—
আমা হ'তে আছ তুমি সরে,
পরভাবে পৃথক্ হইয়া।
মনে ভাবি তুমিই উত্তম,
তুমিই অসীম রূপবান্,
তুমিই গো অনন্ত মহান্
ক্ষুদ্র আমি কুৎসিত অধম।

ভাবি বুঝি ডাকিলে তোমায়,
তুমি কভু সাড়া নাহি দিবে।
কাছে গেলে ফিরে না চাহিবে,
অবসন্ন প্রাণ আশঙ্কায়।
মাঝখানে এত ব্যবধান—
তাই তোমা দেখিতে না পাই।
কাছে থেকে যেন কাছে নাই!
ভাবি শুধু 'তুমি আমি' আন।
ভেঙ্গে দিয়ে এই ব্যবধান
এস, হয় আমি হই 'তুমি'—
আর নয় তুমি হও 'আমি'—
এক হ'য়ে করি অবস্থান।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

প্রাপ্তিস্বীকার।

ভক্ত মনোরঞ্জন-

শ্রীকৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

ইহা একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ। ভক্তিমূলক ও নানাবিধ রাগরাগিণীসংযুক্ত কতকগুলি গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ গানেরই ভাব ও ভাষা সুমধুর। পরিশেষে কয়েকটী বিরহ-সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে।

পুরাণ দর্শন সূত্র—উপক্রমণিকা, (অথবা আর্য্য ধর্ম্ম, হিন্দু ধর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ)— শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। গ্রন্থকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, এবং শিক্ষিত সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা এই গ্রন্থ সমালোচনা কার্য্য হইতে বিরত রহিলাম। গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রণয়নে বিশেষরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া যদি কেহ আমাদের শাস্ত্রীয় বক্তব্যসমূহের উদ্ঘাটন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা সুখী ভিন্ন অসুখী হইব না।

INDIAN INDUSTRIES AND POWER. No 80, Vol VII, No 8. এই মাসিক পত্রিকাখানি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। ইহাতে শিল্প বিদ্যা ও ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত আছে। বার্ষিক মূল্য ৯৲ টাকা।

CO-OPERATOR. Vol I. No 11, May, 1910. এই মাসিক পত্রিকাখানি ২৮৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ বোরো হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনের আর একটী প্রথম শ্রেণীর তারকা খসিল। সাহিত্য-রথী চন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই! সাহিত্য-সেবীর কালস্বরূপ বহুমূত্র-রোগে বর্ত্তমান বর্ষের ৬ই আষাঢ় সোমবার চন্দ্রনাথ মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন। পার্থিব দেহে তিনি বর্ত্তমান নাই; কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তি-কলাপ, তাঁহার স্মৃতি বঙ্গবাসীর মনে বহুকাল জাগাইয়া রাখিবে।

একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়াছেন;—কাব্য বুঝিতে হইলে কবিকে জানিতে হইবে। উক্তিটি কেবল কাব্য ও কবি সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। কার্য্যমাত্রেই বুঝিতে হইলে, কর্ত্তাকে বুঝা আবশ্যক। পক্ষান্তরে কর্ত্তাকে বুঝিতে হইলে, তৎকৃত কার্য্য দিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হয়। মোট কথা, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরস্পর-সাপেক্ষ। সেইজন্য চন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবন-বিবরণ জানা আবশ্যক। সেই প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে স্থূলভাবে চন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবনের আলোচনা করা হইল।

জন্ম ও শিক্ষা।

সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল থানার অধীন কৈকালা গ্রামে চন্দ্রনাথের জন্ম হয়। গ্রাম্য-দৃশ্য-মধ্যে শিশুজীবন অতিবাহিত ও গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া চন্দ্রনাথ কলিকাতায় জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট হন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুবংশোদ্ভূত ও হিন্দু আচারে অভ্যস্ত চন্দ্রনাথ খৃষ্টান-পরিচালিত বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া পাছে খৃষ্টান-ধর্ম্মে অনুরাগী হন, এই ভয়ে তাঁহার অভিভাবকগণ মনে মনে সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন। ছয়মাস পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর অন্যতম শাখা-বিদ্যালয়ে ইনি প্রবিষ্ট হইলেন। এণ্ট্রাস ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে 'ব্রাঞ্চ' স্কুল পরিত্যাগ করিয়া "মেন" বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থে প্রবেশ করেন। সুবিখ্যাত সেক্স-পীয়র-ব্যাখ্যাতা রিচার্ডসন্ সাহেবের নিকট চন্দ্রনাথ দুই তিন দিন মাত্র শিক্ষা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ ইহার অব্যবহিত কাল পরেই সাহেব বিলাতে চলিয়া যান। এখানে "ওরিয়েণ্টাল ডিবেটিং ক্লব" নামে একটি ছাত্র-সমিতি ছিল। এই সমিতির সহিত চন্দ্রনাথ বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চন্দ্র-নাথ দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে, অতঃপর আর অধ্যয়ন চলিবে না, চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার

অভিভাবকগণ ইহাই স্থির করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার এট্‌কিনসন সাহেব ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয়কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ একটি ছাত্রকে আট টাকা করিয়া একটি মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইবে। আঢ্য মহাশয় চন্দ্রনাথকে সেই বৃত্তিটি দেওয়াইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট করাইলেন। এখানে চন্দ্রনাথ ৺ প্যারীচরণ সরকার, কারণ্ডফ সাহেব ও কাউয়েল সাহেবের নিকট শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। যখন ইনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-সমিতিতে যোগ দিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রগণ মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। সেবারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন-সময়ে চন্দ্রনাথ সতীর্থ-সহযোগে Calcutta University Magazine নামক একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। এই পত্রে চন্দ্রনাথ "On the importance of the Study of History" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখেন, তৎসম্বন্ধে Englishman পত্র লিখিয়াছিলেন—We trust this article is from a native pen, though we doubt it, অর্থাৎ "আমরা আশা করি, এ প্রবন্ধটি দেশীয় লেখনী কর্ত্তৃক লিখিত। পরন্তু সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ইহা যে উচ্চ প্রশংসা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রবন্ধটি মৌলিক চিন্তাপূর্ণ, এ কথাও উক্ত পত্রে উল্লিখিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চন্দ্রনাথ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইবারে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন ইনি, আর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ও ব্লক্‌মান সাহেব। এই ব্লক্‌মান সাহেব পরে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ-পদ লাভ করেন এবং পারস্যভাষায় লিখিত আইন আকবারী নামক মূল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন চন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি পরীক্ষায় ব্লক্‌মান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে, কিন্তু ব্লক্‌মান আইন আকবরীর ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন, তুমি কি কাজ করিলে?" তখন চন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। উত্তরকালে কার্য্য দ্বারা ইহার কি উত্তর দিয়াছিলেন, পরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এম, এ, এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শেষোক্ত পরীক্ষায় রাসবিহারী প্রথম এবং চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এইখানে ইহাঁর ছাত্রজীবন শেষ। এই জীবনে ইনি মানসিক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার পর কর্ম্মজীবন আরম্ভ। এই জীবনে ইহাঁর উচ্চ শিক্ষা কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং ইহাঁর মনোবৃত্তির বিকাশ কি ভাবে ঘটিয়াছিল, তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

কর্ম্ম-জীবন।

"গোলামী করিয়া স্বাধীনতা নষ্ট করিব না"—এই ধুয়া এখন যেমন গীত হইয়া থাকে, তখনও সেইরূপ গীত হইত। চন্দ্রনাথ চাকুরী করিবেন না,—স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন। সুতরাং বি, এল পরীক্ষোত্তীর্ণের একমাত্র লক্ষ্য-স্থল হাইকোর্টের অভিমুখে চন্দ্রনাথ ছুটিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, অন্যায়ের দাসত্ব

করা অনিবার্য্য। ফলে, ওকালতি করা সুবিধাজনক নয় দেখিয়া, তিনি চাকুরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শিক্ষা-বিভাগের সহৃদয় অধ্যক্ষ উডরো সাহেবের নিকটে আসিয়া তিনি দুই শত টাকা বেতনে কটক কলেজের অধ্যাপকের পদ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উড্‌রো সাহেব কিন্তু বলিয়া দিলেন—"আমি যদি তোমার পিতা হইতাম, তাহা হইলে এ বিভাগে আসিতে তোমায় নিষেধ করিতাম, এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না।" এই সময়ে চন্দ্রনাথের একটি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া, সাহেব বলিলেন—"অধ্যাপকতা লইও না, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী লও।" চন্দ্রনাথ তাহাই লইলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঢাকায় গেলেন। এ কাজও তাঁহার ভাল লাগিল না। ছয় মাস কাজ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় দেওয়ান কান্তিচন্দ্রের অনুরোধে ইহাঁকে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ করিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। পৌঁছিবার পর দিনেই কান্তিচন্দ্র চন্দ্রনাথকে বলিলেন, "কলেজের কর্ম্মে কিছুই হইবে না, শীঘ্রই আপনাকে শাসন-বিভাগে আনিব।" কিন্তু জয়পুরের রাজসভার হাওয়া বড় স্বাস্থ্যকর নয়, আর স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে প্রতিকূল, এই ভাবিয়া চন্দ্রনাথ তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। চন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, 'Conscienceটাকে একটু মুচড়াইয়া' পাঁচ সাত বৎসর জয়পুরে থাকিতে পারিলে, তিনি বিলক্ষণ ধনবান্ হইতে পারিতেন। কিন্তু চন্দ্রনাথের "Conscience" নামক দ্রব্যটি তত নমনীয় ছিল না। আর না ফিরিতে হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি তিন মাসের ছুটি লইয়া গৃহে ফিরিলেন। এই সময়ে Lawber সাহেবের পরলোক প্রাপ্তি ঘটাতে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ-পদ শূন্য হয়। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের অনুরোধে তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ক্রফ্ট সাহেব চন্দ্রনাথকে সেই পদে বসাইতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, চন্দ্রনাথ অতি অল্পদিনমাত্র কাজ করিয়া ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রেটী ও জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি কৃষ্ণদাসকে বলিলেন—"সে যদি আবার অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তোমাকে ও আমাকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী হইতে হইবে।" ইহার উত্তরে কৃষ্ণদাস বলেন—"উহাতে চন্দ্রনাথের দোষ ছিল না; যে কাজ তাহার প্রীতিকর নহে, সে কাজে সে মনঃসংযোগ করিতে পারে না"। ক্রফ্ট্ সাহেব ছুটি লইয়া বিলাতে গমন করিলে, চন্দ্রনাথের শিক্ষা-গুরু টনি সাহেব তাঁহার পদে বসিলেন। তাঁহারই সময়ে, খৃষ্টীয় ১৮৭৯ সালের ৭ই অক্টোবর চন্দ্রনাথ ২০০ হইতে ২৫০ টাকা বেতনে বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। পরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তরিত হইলে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী চন্দ্রনাথ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৭ বৎসর কর্ম্ম করিয়া, এবং কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রভূত প্রশংসালাভ করিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ইনি পেন্‌সন গ্রহণ করেন। অনুবাদকের কার্য্য সাতিশয় পরিশ্রম-সাপেক্ষ; বিশেষতঃ এই কার্য্য করিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং তৎপূর্ব্বে রবিন্‌সন সাহেব, উভয়েই বহুমূত্র-রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন; এই নিমিত্ত চন্দ্রনাথ এই কার্য্য লইতে

প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, এবং লইয়াও দুই বার পরিত্যাগ-পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। পরিত্যাগ করিলে ক্রফ্‌ট সাহেব গভর্ণমেণ্টের নিকট অপ্রতিভ হইবেন, শিক্ষা-গুরু টনি সাহেবও ক্ষুণ্ণ হইবেন, এই সকল কারণে চন্দ্রনাথ প্রথমে একপ্রকার বাধ্য হইয়া অতি কষ্টে কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পরে কাজ করিতে করিতে তাঁহার "স্থৈর্য্য আসিল, ধৈর্য্য আসিল, সাহস আসিল, কষ্টসহিষ্ণুতা আসিল, শ্রমে শক্তি বাড়িতে লাগিল, আর এই ধারণা জন্মিল যে, এ কাজ ভগবানের কাজ, গভর্ণমেণ্টের বা মানুষের কাজ নয়। তখন এই কাজ ভাল লাগিতে লাগিল, আর আলস্য গেল, শ্রমকাতরতা গেল, শ্রমে আনন্দ ও উৎসাহ হইতে লাগিল।" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "চাকরী করিয়া স্বাধীনতা নষ্ট করিব না," উচ্চশিক্ষা-গর্ব্বিত চন্দ্রনাথের এই সংকল্প কোথায় রহিল? তদুত্তরে চন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

স্বাধীন-ভাব।

"স্বাধীন বৃত্তিরূপ মাকাল ফলের প্রয়াসী হইয়া সুখশান্তি, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সমস্ত স্পৃহনীয় পদার্থে জলাঞ্জলি না দিয়া ধর্ম্ম-জ্ঞানে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী করিও। ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা আপনাদের অভাব আপনারা মোচন করিতে পার, অগ্রে তাহাই করিও, তাহা না পার, চাকরী করিও। সচ্চিদানন্দের আনন্দের আস্বাদ পাইবে, সংসারযাত্রার সুচারু নির্ব্বাহ যে সকল গুণ না থাকিলে হয় না, তাহা লাভ করিবে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে এবং প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিবে।" ফলে, চাকরী করিয়া যে চন্দ্রনাথ স্বাধীনতা নষ্ট করেন নাই, সে সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত "পৃথিবীর সুখ দুঃখ" নামক গ্রন্থের আর এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরিচয় দিব। তিনি লিখিয়াছেন—"প্রকৃত অধীনতা চাকরীতে নাই। উহাতে হীনতাও নাই। আমাকে একবার একটা হীন কাজ করিতে বলা হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ ফোঁস করিয়া উঠিয়া একটা ছোবল মারিয়াছিলাম। আর আমাকে কেহ কখনও হীন কাজ করিতে বলিতে সাহস করে নাই।" আর একটা উদাহরণ দিব—এটি তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ হইতে নহে। বঙ্গবাসী পত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন হাইকোর্টে "সিডিসন" অভিযোগে বিচারাধীন, তখন অনুবাদক চন্দ্রনাথকে আসামিগণের কৌন্‌সুলী জ্যাক্‌সন্ সাহেব জেরার সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"সম্মতি-আইন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকূল কি না?" চন্দ্রনাথ প্রথমে বলিলেন, "ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে আমি অক্ষম।" জ্যাকসন সাহেব বলিলেন—"চূড়ান্ত মীমাংসার কথা রাখিয়া দিন; এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?" চন্দ্রনাথ নির্ভীক-চিত্তে বলিলেন—"আমার ধারণা এই যে, এ আইন হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী।"

চাকরি করিয়া চন্দ্রনাথ স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন, কিংবা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, সে তর্ক ছাড়িয়া দিয়া, ফলে দেখা যায় যে, তাঁহার চাকরি করার সময়ে তাঁহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের এবং হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক।

সাহিত্য-চর্চ্চা।

পাঠ্যাবস্থায় চন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা কিছুই করেন নাই, একথা বলিলে অন্যায় হইবে না। সংস্কৃতও সেইরূপ। চন্দ্রনাথ এক স্থলে বলিয়াছেন—"পাঠ্য নয় এমন

ইংরাজী পুস্তক আমি বহুল পরিমাণে পড়িতাম। ইংরাজীতে বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় মনটা কতক ইংরাজী-ভাবাপন্ন হইয়াছিল। একদিকে যেমন দেবদেবীতে বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই বাঙ্গালা লিখিতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত। যখন বি, এ, পাশ করি নাই, তখন ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের Bengali কাগজে লিখিতাম। এম, এ, পাশ করিয়াই "On the life and character of Oliver Cromwell" নামক একটি প্রবন্ধ পড়িয়া ছাপাইয়াছিলাম। এইরূপ যাহা লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। বঙ্গদর্শন পড়িতে ভাল লাগিত; ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি, কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গালায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীব বাবুর হাতে। বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। * * * শকুন্তলা-তত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাঙ্গালা লিখি, তখন যাহা লিখি, তাহা সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ দেখি; যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখান পর্দ্দা বিলম্বিত দেখি।" কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। লাইব্রেরিয়ান পদে অধিষ্ঠান কালে বহুলপরিমাণে বাঙ্গালা পুস্তক-পাঠের অবসর কি এই পরিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ নহে?

ধর্ম্মমত।

তাহার পর ধর্ম্মের কথা। কলেজে পাঠ করিবার সময় অনেকেরই যাহা ঘটিয়া থাকে, চন্দ্রনাথেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তখন তাঁহার দেবদেবীতে বিশ্বাস ছিল না। সত্যধর্ম্ম অন্বেষণে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। কিন্তু তাহাতে ইউরোপীয় দার্শনিকগণের কথা অধিক পরিমাণে থাকিত বলিয়া, তাহা সম্যক্ভাবে বুঝিতে পারিতেন না। কোমত্ দর্শন পাঠে দেখিলেন যে, তাহাতে আমাদের সমাজ-প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে। তাঁহার আনন্দ হইল, কিন্তু উক্ত দর্শনে নিরীশ্বরবাদ দেখিয়া তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। পরে পণ্ডিত শ্রীশশধর তর্ক-চূড়ামণির উপদেশ শুনিয়া, হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ হইলেন এবং সাকার পূজার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। হিন্দুত্ব নামক গ্রন্থের আলোচনায় বিষয়টি বিস্তারিত-ভাবে বিবৃত হইবে।

দুর্গা পূজা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— "আমাদের দুর্গোৎসব, দুর্গোৎসব নয়, আমাদের দুর্গোৎসব পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।" আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—"আত্মাশক্তির মর্ম্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ভুলিয়া গিয়া আমরা বেজায় মোলায়েম হইয়া পড়িয়াছি, মোলায়েম হইয়া আমরা আর কষ্ট সহিতে পারি না, সুতরাং কঠোর হইতেও পারি না। তাই আজ মাতাপিতৃবিয়োগে একমাস কাল কষ্টকর অশৌচ পালন করিতে অশক্ত ও অনিচ্ছুক বলিয়া সভা করিয়া অশৌচকাল কমাইয়া ১২ দিন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। তাই আমরা ভীষণতা দেখিয়া

পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দে ভরপুর না হইয়া ভীত ত্রস্ত হই—বলিয়া থাকি, ও ছাগলবলি বন্ধ কর, ও রক্তপাত বড় নিষ্ঠুরতা। আরে দেবার্চ্চনায় রক্তপাত যদি নিষ্ঠুরতা, তবে উদরার্চ্চনার জন্য রক্তপাতে নিষ্ঠুরতা দেখ না কেন?” অন্যত্র বলিয়াছেন:—“যদি জগতে আবার উঠিতে হয়, আমাদিগকে তান্ত্রিক সাধক হইতে হইবে। সে সাধনায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বাড়ে, ওটা বড় ভুল কথা। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্যই সে সাধনা। আমরা বড় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়াছি। তাই আমাদের তান্ত্রিক সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদিগকে লোহার সমান কঠিন হইতে হইবে।” দুর্গা পূজার বলিদান সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ আর এক স্থলে বলিয়াছেন—“এমন তন্ন তন্ন করিয়া যাঁহারা ভীষণতার সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালী হইলেও তাঁহারা প্রকৃত মানুষ, মনুষ্য মধ্যে যথার্থ আর্য্য।” উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত দেবদ্বেষী চন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মত-বিবর্ত্তন একবার প্রণিধান করুন।

সমাজসম্বন্ধে মত।

তাহার পরে সমাজতত্ত্ব। কলেজ হইতে সদ্য-নিঃসৃত চন্দ্রনাথ আমাদের ধর্ম্মে ও সমাজে সবই মন্দ দেখিতেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৮৭৭ সালে তিনি Bethune Society নামক সভায় High Education নামক প্রবন্ধে আমাদের জাতিভেদ প্রণালীর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। পরে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া এবং সামাজিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই প্রণালীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পরে তিনি নবজীবন নামক পত্রিকায় “জাতীয় চরিত্র ও বর্ণভেদ-প্রণালী” শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—“আমিও জাতিভেদটাকে অতি জঘন্য জিনিস মনে করিতাম, কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মত উল্টাইয়া গিয়াছে।” এই প্রবন্ধটি চন্দ্রনাথের “ত্রিধারা” নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে চন্দ্রনাথ প্রথমাবস্থায় অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। উত্তরকালে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, চিন্তাশীল ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

ভাষাসম্বন্ধে মতামত।

ভাষা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথের কি অভিমত, সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব। তিনি “In the Life and Character of Oliver Cromwell,”নামক যে প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠ করেন, তাহাতে অনেক দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ সন্নিবিষ্ট ছিল। এই কথা জনৈক ছাত্র তাঁহাকে বলিলে, চন্দ্রনাথ একটু বিরক্তির সহিত উত্তর দিয়াছিলেন—“তবে কি দুরূহ শব্দগুলি কেবল অভিধানভুক্ত হইয়া থাকিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে?” কালে এ মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তিনি কথিত ভাষার (Colloquial) পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, কিন্তু এই কথিত ভাষা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে নীচতা-দুষ্ট (Slang) ভাষায় পর্য্যবসিত হইতে দেখিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যখন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে ছিল, সেই সময়ে ইহার এক অধিবেশনে চন্দ্রনাথ “বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গের সকল স্থানের সুবিধা ও উন্নতির জন্য এবং বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার একতা বৰ্দ্ধনার্থ সাধু ভাষাই অবলম্বনীয়।

বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার একতাবর্দ্ধন সম্বন্ধে প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। বঙ্গবিভাগের

অব্যবহিত পরে পূর্ণিমামিলন উপলক্ষে এক স্থানে জনৈক শিক্ষিত যুবক পূর্ব্ব বঙ্গবাসীর ভাষা ও স্বর অনুকরণ করিয়া অভ্যাগতগণের প্রীতি সম্পাদনে আপনাকে নিযুক্ত করেন। পরে এ কথা চন্দ্রনাথের শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"এ অর্ব্বাচীন্‌টী কে? এ সময় কি ভ্রাতৃ-ভেদকর কোন কথা বলিতে আছে?" বিষয়-ভেদে যে ভাষাপ্রয়োগের তারতম্য প্রয়োজন, তাহা তৎপ্রণীত গ্রন্থনিচয়ে দেখাইয়াছেন। পরে সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। প্রথমে যাহাই থাকুন, শেষ জীবনে চন্দ্রনাথ ঈশ্বর-পরায়ণ বলিয়া সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঘোর মঙ্গল-বাদী (Optimist) ছিলেন। সংসারকে আনন্দময় দেখিতেন। "পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ" নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার পত্নী-ভাগ্য বড়ই বেশী ছিল। এ কথার তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য পরিবার সম্বন্ধেও তিনি সুখী ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন :—

"আমার সুখের সীমা নাই। আমি বড় ভাগ্যবান্। আমার উপরি বিধাতার বড়ই কৃপা। আমার কর্ম্মফলে দুই চারিটা শোক পাইয়াছি বলিয়া বিধাতার নিন্দা করিলে বা তাঁহার উপর রাগ করিলে আমার নিমকহারামীর সীমা থাকিবে না, পরকালে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। বিধাতা পরম সুখদাতা—পৃথিবী নানা সুখে পরিপূর্ণ। কে বলে জগতে সুখ নাই? যে বলে, সে সংসারের শত্রু, ভগবানের শত্রু।"

সাহিত্য-সমালোচনা।

সাহিত্যে চন্দ্রনাথের প্রভাব কিরূপ, তাহা দেখাইতে হইলে, তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতে হয়। সংক্ষেপে চন্দ্রনাথের পুস্তকগুলি আলোচিত হইতেছে।

কাব্য অনেকেই পাঠ করেন, কিন্তু কাব্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় সৌন্দর্য্য অনুভব করা সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না, ঘটিলেও তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিতে অনেকেই অক্ষম। সাধারণতঃ, কোন কাব্য পাঠ করিলেই হৃদয়ে একটী নির্ম্মল আনন্দের উদ্রেক হয়। সে আনন্দ কোথা হইতে আসে? কাব্যের সৌন্দর্য্যই এই আনন্দের মূল কারণ। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য সমষ্টীভূত। ব্যষ্টিরূপে এই সৌন্দর্য্যকে অনুভব করিতে হইলে বহু বিচক্ষণতার প্রয়োজন। কাব্যের কোন্ ঘটনাটীর মধ্যে কোন্ সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত আছে, কোন্ কথাটী দ্বারা কোন্ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোন্ বিষয়টী অস্ফুটভাবে থাকায় কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার বা দেখাইবার শক্তি সকলের নাই। সে শক্তি সমালোচকের আছে। প্রকৃত সমালোচক কাব্যের এই সকল গুণ বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণের কাব্য মুরাগ বর্দ্ধন করেন, এবং কবিকে অমরত্ব প্রদান করিয়া তাঁহাকে যশের মণিময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখেন। এইরূপ সমালোচক না থাকিলে কত বড় বড় কবিকেও চিরদিনের জন্য মানব-সমাজের অজ্ঞাতে বা উপেক্ষিত ভাবে থাকিতে হইত।

চন্দ্রনাথও এই শ্রেণীর সমালোচক, এবং তাঁহার 'শকুন্তলা তত্ত্ব' এই শ্রেণীর সমালোচনা। অভিজ্ঞান শকুন্তলের অমর সৌন্দর্য্যকে এমন করিয়া দেখাইতে, তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি ধরিয়া এমন করিয়া বুঝাইতে বুঝি আর কেহ পারে নাই। চিত্রকর চিত্র অঙ্কিত করে, কিন্তু লোকে

তাহার মধ্যে একটা ধূসর বর্ণের পাগাড় এবং কয়েকটা গাছ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু কবি যখন সেই চিত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন, কোথায় পাহাড়ের কোন্ শৃঙ্গটী অস্তোন্মুখ রবি-কিরণ-সংস্পর্শে রক্তিম রাগ ধারণ করিয়াছে, কোথায় কোন্ শৃঙ্গমূল বিধৌত করিয়া স্বচ্ছসলিলা তটিনী রজতসূত্রবৎ ধীর-মন্থর-গমনে চলিয়াছে, কোথায় তাহার তটের কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া বাসন্তী-পুষ্প স্তবকাবনম্রা লতিকা স্বচ্ছ সলিলদর্পণে আপনার মুখ দেখিতেছে, কোথায় কোন্ সমতল ক্ষেত্রে শ্যাম দূর্ব্বাদলের উপর শয়ন করিয়া চমরী রোমন্থন করিতেছে, কোথায় কোন্ বৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট পক্ষী উড্ডীয়মান হইবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিতেছে, এই সকল মনোরম দৃশ্য যখন একে একে দেখাইয়া দেন, তখন সকলেই সেই চিত্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। চন্দ্রনাথও কালিদাসের মধুর চিত্রখানিকে আমাদিগকে এইরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছেন, এমনই তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। দেখাইবার এমনই কৌশল যে, তাহাতে চিত্রের কোন অংশটীই বাদ পড়ে নাই; বৃহৎ বৃহৎ চরিত্র হইতে ধীবরের ও প্রহরীর সামান্য চরিত্রও আমাদের নয়ন মধ্যে ধরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্লেষণে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রত্যেক চরিত্র আমাদিগের নিকট পরিস্ফুট।

অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা চিরদিনই উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকৃত, তাহার আবার এত বিশ্লেষণ দ্বারা উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার আবশ্যক কি? ইহার উত্তর এই যে, মণি স্বভাবতই মণি, কিন্তু সুনিপুণ মণিকারের হস্তে মার্জ্জিত হইয়া বাহির হইলে তাহার উজ্জ্বলতা ও গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এই বিশ্লেষণে চন্দ্রনাথ মানবের মনোবৃত্তিসমূহের অবস্থা ও গতি যেরূপে দেখাইয়াছেন, তাহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। পুরুষ ও নারীর প্রকৃতি কি ভাবে গঠিত, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে উভয়ের মন কিভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই মন জাগতিক নিয়মের একটু এদিক ওদিকে যাইলে কিরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা যেরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দেখাইয়াছেন, অভিজ্ঞান শকুন্তলা কেবল উৎকৃষ্ট কাব্য নহে, ইহা নীতি ও সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহা হইতে এই কয়েকটী তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় যে, (১) ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়; তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ। (২) দম্পতির পবিত্র প্রণয় নিন্দনীয় নহে সত্য, কিন্তু সেই প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া যদি তাঁহারা সাংসারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হন, তবে তাহা ঘোরতর অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং শিক্ষা দ্বারা দাম্পত্য প্রণয়কে সমাজের অনুকূল করা কর্ত্তব্য। (৩) সমাজ মনুষ্যচরিত্রের উন্নতির প্রধান কারণ। এজন্য সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া, সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক; গুপ্ত-বিবাহ অনিষ্টের হেতু। (৪) রিপুর শাসন অতি ভয়ানক; সুপণ্ডিত ও মহাবীরেরাও রিপুতাড়নায় স্খলিতপদ হইয়া থাকেন। (৫) ঋষি তপস্বীর ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিতে হয়, কিন্তু সংসারাশ্রমে

থাকিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে তির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষের দ্বারা প্রকৃতি শাসিত হয়; সংসারাশ্রমে প্রকৃতি দ্বারা পুরুষ শাসিত হয়। (৬) ঐন্দ্রিয়িক শক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহাশক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে।

ফল কথা, শকুন্তলা-তত্ত্ব পাঠ করিয়া আমরা অভিজ্ঞান-শকুন্তলকে আর এক নুতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাই; যেন আর এক নুতন ভাব আসিয়া আমাদের হৃদয়কে মাতাইয়া তুলে। সে ভাব চন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ,—"যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা প্রথমে আমাদের দৃষ্টিপথে আবিভূত, তখন উভয়কেই আমরা স্ফোটনোন্মুখ মুকুলের মত দেখিতে পাই। উভয়েই যেন একটী বিশেষ অবস্থার দিকে যাইতেছেন, যেন একটী বিশেষ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন পড়িলেন, যেন প্রণয়ানুরাগে মুগ্ধ হইলেন হইলেন, যেন ঊষা ভাঙ্গিয়া দিবালোক হয় হয়। দেখিতে দেখিতে মুকুল যেমন ফুটিয়া উঠে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সেই অস্ফুট রাগও তেমনি পূর্ণ গৌরবে প্রদীপ্ত হইল, যেন ঊষার অস্ফুট রাগ মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরূপে রাগিয়া উঠিয়া দিগ্‌দিগন্ত অগ্নিময় করিয়া তুলিল—দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা সেই বিষম অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া তৃণনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছেন—যেন তাঁহাদের চেতনা নাই, জ্ঞান নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই—যেন তাঁহারা জড়জগতের জড়তামাত্র। সহসা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন। কোথা হইতে যেন এক অসীম তেজঃসম্পন্ন, জ্ঞানময় অনন্ত পুরুষ আসিয়া সেই অগ্নিরাশি নিবাইয়া দিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন প্রলয়-তিমিরে ডুবিয়া গেল, সেই মহাপ্রলয়ে শকুন্তলা কোথায়, তাহার ঠিকানা নাই, দুষ্মন্ত প্রলয়যন্ত্রণার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় প্রলয়াধীন। অকস্মাৎ এক মহাবাক্য শ্রুত হইল—দেবলোক শত্রুপীড়িত। দুষ্মন্ত প্রলয় ভেদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাসিয়া উঠিল, স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল, অপূর্ব্ব প্রভায় প্রভাসিত হইল। সেই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে, সেই স্বর্গীয় আলোকে, সেই হেমকূট শিখরস্থিত বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যাশ্রমে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পতিপত্নীভাবে দণ্ডায়মান—উভয়েই পাণ্ডুবর্ণ, উভয়েই শীর্ণদেহ, উভয়েই বিমর্ষ; যেন অতি নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাস্থিত দুইখানি পবিত্র চেতনা-খণ্ড। কি দেখিয়াছিলাম, আবার কি দেখিতেছি! বসন্তের রাগগর্ভ মুকুল, শরতের ম্রিয়মাণ কুসুমে পরিণত হইয়াছে। রাগময় জড়তা বিস্ময়ভাবে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই অদ্ভুত নাটকের রঙ্গভূমি। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাকবির মহাস্বপ্নের আকার। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাদর্শকের মহাদৃষ্টির পরিমাণ।"

কাব্যের সমালোচনায় চন্দ্রনাথের যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা দেখিতে পাই, ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলনেও তাঁহার সেইরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রণীত হিন্দুত্ব, সংযমশিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার উদাহরণ স্থল। চন্দ্রনাথ খাঁটী হিন্দু ছিলেন; হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন; হিন্দুধর্ম্ম যে একটা বিরাট্ ধর্ম্ম, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর রীতিনীতি, হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথা, সকলই যে সেই

বিরাট্ ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায়, ইহা তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন; পারিয়াছিলেন বলিয়াই এমন করিয়া সোজা কথায় হিন্দুধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি খাঁটী হিন্দু-ভাবে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন একটা অসাধারণত্ব আছে, যাহা অন্য কোন ধর্ম্মে নাই, এমন একটা উদারতা ও বিশ্বজনীনতা দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম অনুপ্রাণিত যে, তাহা অন্য ধর্ম্মে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিক্ষা ও চেষ্টার অভাবে আমরা এখন আর এই সকল ভাব দেখিতে পাই না বলিয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত সমস্বরে হিন্দুধর্ম্মের অশেষবিধ দোষ-কীর্ত্তন করিয়া থাকি, জাতিভেদপ্রথা, সমাজনীতি, প্রতিমাপূজা প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া বিরাট্ হিন্দুধর্ম্মকে ক্ষুদ্র অপধর্ম্মে পরিণত করিতে চাই। বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ করিতে চেষ্টা করি।

যে কোন বিষয় কেবল বুঝাইতে গেলেই হয় না, বুঝাইবার শক্তি থাকা আবশ্যক। চন্দ্রনাথের সে শক্তি ছিল। তাই তিনি অল্প কথায় সহজভাবে এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার বুঝাইবার পদ্ধতি কিরূপ, তাহা হিন্দুত্ব গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। অনেকে হিন্দু ধর্ম্মের ব্যবস্থাসমূহের বড় কড়াকড়ি দেখিয়া বিরক্ত হন। এত কড়াকড়ি কেন? একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই ধর্ম্মের হানি হইবে, একটু পদস্খলনেই জাতি যাইবে, একটু স্পর্শদোষেই অশুচি হইবে; এ সকল বড়ই অসঙ্গত ব্যবস্থা। যাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

"ভগবান্ কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। আর ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডও কড়াক্রান্তিটি ছাড়ে না। আপন কক্ষপথে ভ্রমণ করিতে যে গ্রহের যত সময় আবশ্যক, তাহার পলানুপলের কোটি অংশ কম সময়ে সে গ্রহের সেই কক্ষপথে ভ্রমণ করিবার যো নাই। যে নক্ষত্ররশ্মিটির যে গ্রহে পঁহুছিতে যত সময় আবশ্যক, তাহার পলানুপলের কোটি অংশ কম সময়ে সে রশ্মিটির সে গ্রহে পঁহুছিবার উপায় নাই। যে বজ্রনিনাদ দুই পলে তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে, সাধ্য কি তাহা দুই পলের কোটি অংশ কম সময়ে তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে? এইরূপ দেখিবে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কড়াক্রান্তিটির ব্যতিক্রম হয় না; যে কোন প্রাকৃতিক ক্রিয়া বল, তাহার কড়াক্রান্তিটি বাদ পড়ে না, বাদ পড়িবার যো নাই। আর হিন্দু বলেন, ধর্ম্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান্ কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।"

হিন্দুর বড় একটা অপবাদ আছে যে, হিন্দু মূর্ত্তিপূজক বা পৌত্তলিক। এই প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ যে সুন্দর যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"জড়মূর্ত্তিতে ঐশী শক্তির অর্চ্চনা করিবার নাম প্রতিমা বা মূর্ত্তি পূজা। সে শক্তি মূর্ত্তি-পূজক আপন মনে আপন মানসিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধ করিয়া থাকেন। সেইরূপ উপলব্ধ করার নাম idealisation বা ভাবাভিনয়ন। অতএব প্রতিমা বা মূর্ত্তি নির্ম্মাণের অর্থ artistic idealisation বা শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়ন। এখন দেখিতে হইবে যে, দেবপ্রতিমা যদি শিল্পব্যক্ত ভাবাভিনয়নই হয়, তবে ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত লোক সাধারণের দেবপ্রতিমা আবশ্যক কি

না। বোধ হয় হৃদয়ের শিক্ষা idealisation বা ভাবাভিনয়ন দ্বারা যত সাধিত হয়, আর কিছুরই দ্বারা তত হয় না। উচ্চ কাব্য পড়িয়া হৃদয়ের যত শিক্ষা হয়, দর্শন বা নীতিশাস্ত্র পড়িয়া তত হয় না। দর্শন বা নীতিশাস্ত্রের ক্রিয়া বুদ্ধিবৃত্তির উপর হইয়া থাকে। কাব্যের ক্রিয়া হৃদয়ের উপর হয়। দর্শন বা নীতিশাস্ত্র বিচার করিবার, তর্ক করিবার ও বুঝাইবার শক্তি দেয়। কাব্য—হাসায়, কাঁদায়, আহ্লাদে উৎফুল্ল করে, শোকে অভিভূত করে, দুঃখে গলাইয়া দেয়, রাগে আগুন করিয়া তুলে। যাহা করিতে পারিলে মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রবল হয়, এবং মানুষ সেই ভাবের অনুযায়ী কার্য্যের দিকে প্রধাবিত হয়, কাব্য তাহাই করে। নীতি বা দর্শনশাস্ত্রে তাহা সহজে করিতে পারে না। ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে পারে; কিন্তু কাব্য যত, তত নয়। তাই সাহিত্যে কাব্যের পদ এত উচ্চ। তাই বাল্মীকির রামায়ণ, বেদব্যাসের মহাভারত, দান্তের ইন্‌ফার্ণো, সেক্ষপীয়রের নাটক, শেলির গীতি, বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের প্রধান রত্ন। তাই অর্কিয়সের সঙ্গীত, ফিদিয়নের প্রস্তরমূর্ত্তি, টর্নর, টিশিয়ান বা রাফেলের চিত্র মানুষের মানসিক সম্পত্তির মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই অমূল্য। অতএব যে ভাবাভিনয়নের গুণে কাব্য, চিত্র এবং সঙ্গীত এত মহিমাময় এবং শিক্ষোপযোগী, সে ভাবাভিনয়নের গুণে মূর্ত্তি-পূজাই বা কেন মহিমাময় বা শিক্ষোপযোগী না হইবে। একটু খুলিয়া বলি। * * * * প্রতিভাশালী কবি যে চিত্র আঁকিলেন, প্রতিভাশালী চিত্রকর যদি সেই চিত্র চিত্র-পটে ফুটাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই পটই বা কি অপরূপ অপূর্ব্ব কাব্য হইয়া পড়ে, সেই পটেই বা কত অমূল্য শিক্ষা অঙ্কিত হইয়া যায়! কাব্য অপেক্ষা চিত্র অনেক সময়ে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে শিক্ষা সম্বন্ধে বেশী উপযোগী। কেন না কাব্য শব্দরচিত; শব্দ সঙ্কেতমাত্র, অতএব কাব্য বুঝিয়া লইতে হয়; চিত্র শরীরী, অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই হয়। কাব্যে অনেক জিনিস বুঝান যায় না, বা বুঝান সহজ হয় না,—যেমন হৃদয়ের অবস্থাবিশেষে দেহের মূর্ত্তিবিশেষ; চিত্রে তাহা সহজেই বুঝান যায়। কবি বলিয়া দিলেন—তখনও (ভূগর্ভ প্রবেশ কালে) সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত। ইহাতে পতিভক্তির তুমি একটী অপূর্ব্ব আভাস পাইলে। কিন্তু তখন সীতার সেই মুখের, সেই নয়নের কিরূপ ভাব, কবি তাহা ফুটাইয়া দিতে অক্ষম। কিন্তু তাহা চিত্রিত দেখিলে পতিভক্তির মানসিক মূর্ত্তি কত গাঢ়তর, কত বেশী মোহকর হইয়া উঠে বল দেখি! তুমি কবির কথা কয়টী পড়িয়া সে মুখের, সে নয়নের, সে দৃষ্টির সম্যক্ চিত্র কি মনে ফুটাইতে পার? কিন্তু রাফেলের তুল্য কোন হিন্দু চিত্রকর যদি সেই মুখের, সেই নয়নের, সেই দৃষ্টির অভিব্যক্তি চিত্রপটে আঁকিয়া দেখান, তাহা হইলে পতিভক্তির মানসিক মূর্ত্তি কেমন অলৌকিক ভাবে ফুটিয়া মনকে মজাইয়া তুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাই-তেছে যে, হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে কাব্য বল, চিত্র বল, প্রতিমা বল যাহাতে idealisation বা ভাবাভিনয় আছে, তাহাই মানুষের আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী। আবার শুধু আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী নয়—অপূর্ব্ব মহিমাময়। জ্ঞান (বুদ্ধিবৃত্তি-মূলক জ্ঞান) বল, বুদ্ধি বল, যাহাই বল, প্রতিভার ন্যায় মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে স্বর্গ দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিভার আবির্ভাব।

স্বর্গ কেমন? যেমন রামায়ণে সীতা, ভারতে ভীষ্ম, সেক্সপীয়রে দেস্‌দেমনা, শিলরে থেক্‌লা, সফক্লিসে অন্তাইগনি। আবার ভাবাভিনয়ন সেই প্রতিভার একচেটিয়া বস্তু। তবেই দেখ, ভাবাভিনয়মূলক কাব্য বা চিত্র বা প্রস্তরমূর্ত্তি কেমন স্বর্গীয় বস্তু—কেমন মহিমাময়! তাই বলি, যদি শিল্প-ব্যক্ত ভাবাভিনয়ন এতই মহিমাময় হয়, আর হৃদয়ের অপরাপর ভাব পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনার্থ এতই আবশ্যক, উপযোগী ও উপকারী হয়, তবে ধর্ম্মসম্বন্ধে কেনই বা মহিমাশূন্য হইবে এবং হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব বা ধর্ম্মভাব পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ে অনাবশ্যক, অনুপযোগী এবং অপকারী হইবে? মানবের গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা যদি আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইয়া দেয়, তবে ঐশীশক্তি আমি নিজে যেমন বুঝিয়া উঠিতে পারি, প্রতিভা কেন আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইতে পারিবে না? আর প্রতিভা যদি তাহাই পারে—কাব্যে হউক, চিত্রে হউক, প্রস্তর-প্রতিমাতে হউক—প্রতিভা যদি তাহাই পারে, তবে কি জন্য আমি প্রতিভার কাছে তাহা বুঝিয়া না লইব? কি জন্য আমি আপনাকে সে শিক্ষায় বঞ্চিত করিব? মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষাগ্রহণ না করিলে আমি যেমন পাপগ্রস্ত হই, ঐশীশক্তি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে শিক্ষাগ্রহণ না করিলে আমি কি তেমনি পাপগ্রস্ত হইব না?"

কেমন সুন্দর যুক্তি! অধিকার অনধিকারের তর্ক না তুলিয়া, শাস্ত্র-বচনের দোহাই না দিয়া, কেমন সহজ কথায় পরিষ্কাররূপে মূর্ত্তিপূজার উপযোগিতা বুঝান হইল। এরূপে বুঝাইবার শক্তি সাধারণ পাণ্ডিত্যের কার্য্য নয়। এই মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে আর এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জগদীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে লোকে মূর্ত্তিকেই জগদীশ্বর মনে করিতে পারে। এ দেশে জগদীশ্বর মূর্ত্তিতে পূজিত হন। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ বুঝিয়াছি যে, কেহই জগদীশ্বরের মূর্ত্তিকে জগদীশ্বর মনে করে না। সকলেই এইরূপ বুঝে যে, মূর্ত্তি হইতে জগদীশ্বর স্বতন্ত্র, মূর্ত্তিতে তাঁহার আবির্ভাব হয় মাত্র। তবে এমনও হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের মন যখন বড়ই বিভোর হইয়া উঠে, তখন সে জগদীশ্বরের এবং জগদীশ্বরের মূর্ত্তির প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া বোধ হয় যেন সেই মূর্ত্তিকেই জগদীশ্বর মনে করিতে থাকে। কিন্তু যেখানেই প্রকৃত উদ্বোধন হয়, হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, সেইখানেই ত এইরূপ হইয়া থাকে। ওথেলো দিস্‌দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে ওথেলো দিস্‌দেমনাকে ত কল্পনামাত্র বলিয়া মনে থাকে না, সত্য সত্যই রক্তমাংসবিশিষ্ট নরনারী মনে হয়। উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে অভিনেতাদিগকে অভিনেতা বলিয়া মনে থাকে না, অভিনীত নরনারীই মনে হয়। ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া যদি তেমনি ভেদাভেদ বিস্মৃত হইয়া বিভোর মনে মূর্ত্তিতে কেবল ঈশ্বরই দেখি, তবেই ত জানিব যে, মূর্ত্তি গড়া সার্থক হইয়াছে। মূর্ত্তি যদি ভেদাভেদ জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিতে পারে, ঈশ্বরভক্তিতে মন ভুলাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে মূর্ত্তিকে পূজা করা ঈশ্বরকে পূজা করা বই আর কি হইতে পারে? তাহা হইলে মূর্ত্তির সম্মুখে প্রণত হওয়া ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হওয়া বই আর কি হইতে পারে? * * * তুমি হয় ত বলিবে যে, ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে করিতে হয়

ও আমি নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই—হাত [redacted] নাক কাণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিব। ইহার উত্তরে আমি এই বলিতে পারি যে, আমি যদি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে সহস্র সহস্র বৎসর তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিলেও তাঁহাকে হাত পা নাক কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না। এই যে ঈশপের গল্পের ন্যায় গল্প, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের ন্যায় রূপক, সাধারণ লোকে চিরকালই শুনিতেছে, কিন্তু কেহ কখন কি তাই বলিয়া এমন বুঝিয়াছে যে, পাখী মানুষের মত কথা কয়, আর কাম ক্রোধ মোহ মাৎসর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের ভাবগুলা এক একটা হাত-পা-ওয়ালা মানুষের মত বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়, বা থিয়েটারে নাটকাভিনয় করে? সাকার উপাসকদিগের মধ্যে এমন লোক থাকিতে পারে, যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করে। কিন্তু সে সব স্থলে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে, তাহারা ঈশ্বরকে কখনই প্রকৃত নিরাকার বলিয়া বুঝে নাই, যে রকম শিক্ষা এবং মানসিক শক্তি, তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিতে অক্ষম, এবং সেই জন্যই মূর্ত্তি সম্মুখে না রাখিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলেও তাহারা বোধ হয় ঈশ্বরকে হস্ত-পদ-বিশিষ্ট ভাবিয়া তাঁহার পূজা করে। তাহাই যদি হয়, তবে তাহা-দিগকে কোন মূর্ত্তি না দিয়া—এবং মূর্ত্তি দেখিলে তাহারা যেরূপ ঈশ্বরভক্তিতে উত্তেজিত হইতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ উত্তেজিত হইতে না দিয়া—এবং ঈশ্বর-ভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া তাহারা যতটুকু ধর্ম্মানুরাগী হইতে পারে, তাহাদিগকে সেই পরিমাণ ধর্ম্মানুরাগী হইতে না দিয়া লাভ কি? ঈশ্বর কি জন্য? শুধু কি প্রকৃষ্ট উপলব্ধির জন্য, না ধর্ম্মোন্নতির জন্য? যে নিরাকার উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং নিরাকার উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরানুরাগে উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মপথে যাইতে প্রধাবিত হয় না, তাহাকে শুধু এক উচ্চ নিরাকার প্রণালীর খাতিরে নিরাকার উপাসনায় জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা ভাল, না মনকে ঈশ্বরানুরাগে রঞ্জিত করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে প্রবৃত্তি প্রদানার্থ একটি মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে দেওয়া ভাল?...আমরা ঈশ্বরভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগ চাই; আমরা চাই যে, সকলেরই মন যে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বরভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক। নিরাকার পদ্ধতি দ্বারা যে আপন মনে ঈশ্বরানুরাগ ফলাইয়া তুলিতে অক্ষম এবং সেই জন্য ধর্ম্মপথে চলিতে উৎসাহিত বোধ করে না, তাহাকে নিরাকার-পদ্ধতি দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা; তাহাকে সাকার-পদ্ধতি না দিলে শাস্ত্রকার এবং সমাজনেতার মহাপাতক হয়। তাই ধর্ম্মভীরু হিন্দুশাস্ত্রকার লোকসাধারণের জন্য বহির্মুখ প্রণালীতে জগদীশ্বরের প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছেন।”

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে চন্দ্রনাথের সহিত অনেকের মতানৈক্য ঘটিলেও সকলকেই যে তাঁহার যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এইরূপ অকাট্য যুক্তি তাঁহার প্রতি পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-কলেবর বাহুল্য-ভয়ে আমরা সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। তাঁহার সংযম শিক্ষা, হিন্দুত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে যেমন তাঁহার ধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই আবার মনস্তত্ত্বসম্বন্ধেও তাঁহার প্রকৃষ্ট সূক্ষ্মদর্শনের পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। তাঁহার যুক্তিতর্কের এমনই গুণ

যে, যখন যে বিষয়টী ধরিয়াছেন, তখনই তাহার সকল দিক্ দেখিয়া সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া একটা চূড়ান্ত মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন; তাহাতে কোন অংশটীই বাদ পড়ে নাই, কড়াক্রান্তিটী ছাড়িয়া দেন নাই। চন্দ্রনাথ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পাণ্ডিত্য, শক্তি, চিন্তা, সকলই ইহার উদ্দেশে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু আবার কিসে প্রকৃত হিন্দু হয়, কিসে হিন্দুসমাজ প্রতিকূল সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পায়, তাহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল, এবং সেই চিন্তা তাঁহার গ্রন্থের প্রতি পত্রে পরিস্ফুট। তাঁহার হিন্দুত্ব, তাঁহার সংযম শিক্ষা, তাঁহার ত্রিধারা, তাঁহার সাবিত্রী-তত্ত্ব, তাঁহার ফুল ও ফল, সকলই এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লিখিত।

বর্ত্তমান কালে এদেশের হিন্দুসমাজের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। যে দেশ এক সময়ে সংযম ও শিক্ষায় সমগ্র পৃথিবীর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অধুনা সেই দেশ আত্মগৌরব বিস্মৃত হইয়া বিলাসের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে; যেরূপে ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে শেষে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, কোন্ মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ গর্ভে চিরনিমজ্জিত হইবে, তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। চন্দ্রনাথ সমাজের এই ভীষণ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, এই ভীষণ অবস্থার ভয়াবহ পরিণাম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। কেবল অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নীরবে একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। সমাজহিতৈষী চন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাণপ্রিয় হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় তাহার রোগনির্ণয়ে তৎপর হইলেন। কেবল রোগ নির্ণয়েই তাঁহার আন্তরিক চেষ্টার বিরাম হইল না, রোগনির্ণয়ের সহিত রোগের উপযুক্ত ঔষধেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই এই দুরন্ত ব্যাধি আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, এবং মাতাপিতার পরিমাণাতীত স্নেহ ও ব্যবহাররূপ কুপথ্য সংযোগে সেই রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া অবশেষে ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে। সুতরাং এই দুরন্ত ব্যাধির প্রতীকার করিতে হইলে ইহার প্রথম অবস্থা হইতে মনোযোগী হইতে হইবে—আপনাদিগকে সংযমী হইতে হইবে, এবং পুত্রকন্যাদিগকে শৈশবকাল হইতে সংযম শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাঁহার সংযম শিক্ষাকে তেমন আদর করিতে পারি নাই।

এবার ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। চন্দ্রনাথের ভাষা খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা, নির্জ্জল গব্য দুগ্ধ। সে দুগ্ধ—একটু জ্বাল দিয়া শুধু খাও, বেশ মিষ্ট; একটু চিনি মিশাইয়া ঘন ক্ষীরে পরিণত কর, গুরুপাক হইলেও অমৃতোপম; সামান্য জল মিশাইয়া একটু অম্লরস দিয়া পাঁচ জনের পাতে দাও, একটু মুখে দিলেই প্রাণ মন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। শকুন্তলাতত্ত্ব পাঠ কর, খাঁটি দুগ্ধের আস্বাদ পাইবে; হিন্দুত্ব পাঠ কর, দেখিবে সেই খাঁটি দুগ্ধই ক্ষীররূপে পরিণত হইয়াছে; ত্রিধারা পাঠ কর, সেই দুগ্ধই ঈষদম্ল রস-সংযোগে সুস্বাদু দধিরূপ ধারণ করিয়াছে দেখিতে পাইবে। কিন্তু যেখানে যেরূপেই পরিবর্ত্তিত হউক, সর্ব্বত্র সেই খাঁটি দুগ্ধের গন্ধটি ঠিক আছে, মিশ্রণের গুণে অম্লযোগেও তাহা বিকৃত

হইয়া টকিয়া যায় নাই। ত্রিধারা বঙ্গ-সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব বস্তু। ত্রিধারার অনন্ত মুহূর্ত্ত, বউ কথা কও, কেতাব কীট, জীবন-কথা, বর্ণভেদ প্রভৃতি পাঠকের চিরপ্রিয় উপভোগ্য প্রবন্ধ। ত্রিধারার একটু নমুনা না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

"আর ঐ ছোট দাদা? উনিও অন্নপূর্ণা। দশ ঘর জ্ঞাতির মধ্যে উনিও এক ঘর। কিন্তু এক ঘর হইয়াও উনি সকল ঘরেই সমান। আপনার ঘরেও যেমন জ্ঞাতির ঘরেও তেমনি। ওঁর আপনার ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপো যেমন, জ্ঞাতির ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপো তেমনি। জ্ঞাতি সুখী হইলে ওঁর সুখ উথলিয়া উঠে। জ্ঞাতি কষ্ট পাইলে ওঁর প্রাণ কাঁদিতে থাকে। জ্ঞাতিও যেমন ওঁর আপনার, গ্রামশুদ্ধ লোকও তেমনি ওঁর আপনার। উনি সকলেরই ছোট দাদা। বাপও উঁহাকে ছোট দাদা বলে, ছেলেও উঁহাকে ছোট দাদা বলে। উনি "কোম্পানির ছোট দাদা'। ওঁর গুণে সমস্ত গ্রামখানি একটী কোম্পানি এক পথে চলে, এক সুরে কাঁদে, এক সুরে হাসে। উহাঁকে ধরিয়া গ্রামখানি বাঁচিয়া আছে। উনি গ্রামখানির প্রাণ। উনি গ্রামের অন্নপূর্ণা। কিন্তু হায়! উহাঁকে এখন আর বড় দেখিতে পাই না। তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে কোম্পানির দাদা, কোম্পানির কাকা দেখিতে পাইতাম। এখন আর বড় পাই না। বঙ্গদেশ এখন দেবতাশূন্য হইতেছে। সত্যই বঙ্গের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে!"

এখানেও সেই কান্নার সুর—সমাজের দুর্দ্দিন দর্শনে এখানেও সেই মর্ম্মভেদী তপ্তশ্বাসের সহিত উষ্ণ অশ্রুবিন্দু। এমনই সর্ব্বত্র। আর কত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। সমাজের জন্য চন্দ্রনাথ যেমন অন্তরের সহিত কাঁদিয়াছেন, এমন কান্না এখন আর কেহ বুঝি কাঁদে নাই। চন্দ্রনাথের শেষ গ্রন্থ "পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ"। এই গ্রন্থখানি "সাহিত্য" নামক মাসিক পত্র হইতে পূর্ণমুদ্রিত। গ্রন্থখানি "আত্মকাহিনী" স্বরূপে কতকটা রচিত। ইহাতে পল্লিজীবনের যে উজ্জ্বল চিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহা অতীব উপাদেয় ও উপভোগ্য। পল্লি-কাহিনী, দুর্গাপূজার বিবরণ, এবং আত্ম-জীবনচরিত যে এই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইল, তাহা নহে। কিন্তু এরূপ গুছাইয়া পাঠকের মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ করিয়া, আত্মবিবরণ লিখিতে অতি অল্প লোককে দেখা যায়। গ্রন্থের "পূর্ব্বভাষ" পাঠে জানা যায় যে চন্দ্রনাথ এই গ্রন্থখানিকে "আমার শেষ কথা" এই আখ্যা দিতে স্থির করেন। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায়ও হেডিংস্বরূপে এই তিনটী শব্দ বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে। কিন্তু গ্রন্থকারের পুত্রদ্বয় ও কয়েক জন বন্ধুর ইচ্ছা ছিল না যে, ঐ তিনটি শব্দ থাকে; সেই জন্য মলাটে শব্দ তিনটি দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের ভয়, পাছে সত্য সত্যই গ্রন্থখানি রচয়িতার শেষ কথা হয়। কিন্তু তাঁহাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্যের দুর্ভাগ্যক্রমে বাস্তবিকই এই গ্রন্থখানি চন্দ্রনাথের "শেষ কথা"!

আজি আর চন্দ্রনাথ ইহলোকে নাই। তাঁহার অমর আত্মা নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছে। সেখানে—সেই নিত্যানন্দময় ধামে, নিত্যপুরুষের চরণপ্রান্তে বসিয়া হয়তো তিনি তাঁহার চিরপ্রিয় হিন্দুসমাজের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন,—সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের চরণে আপনার কাতর প্রাণের অরুন্তুদ বেদনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছেন। তাঁহার কামনা কি পূর্ণ হইবে না!

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

চিত্রকরী।

(১)

স্থান।—দিল্লি; চৌকের উত্তর প্রান্ত-ভাগে রাজবর্ত্মের উপর রিপুকর্ম্মওয়ালা দরিদ্র চিকণলালের দোকান।

কাল।—দিল্লীশ্বর-জগতীশ্বর-আকবর-সাহের রাজত্বের শেষার্দ্ধ।

চিকণলালের মুখ্য বিশেষণ—সে দরিদ্র; তাহাই প্রয়োগ করিলাম। তৎপক্ষে গৌণ বিশেষণ,—চিকণলাল বৃদ্ধ, কুব্জ এবং কদাকার। তবে বহিঃকৃষ্ণ আম্রের সিন্দুর-লোহিত সুমিষ্ট অভ্যন্তরের ন্যায় চিকণলালের অন্তঃপ্রদেশ অতিশয় শুভ্র এবং সদানন্দ। বৃদ্ধ জীবনে কখন অসন্তোষ ভোগ করে নাই—জগতে যাঁহারা বড়লোক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের কয়জন এ কথা স্বপক্ষে প্রয়োগ করিতে পারেন?

চিকণলাল রিপুকর্ম্ম করিত। হালের রিপুকর্ম্মওয়ালাদিগের মত সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত না। তাহার ক্ষুদ্র দোকানে বসিয়া উদয়াস্তকাল সে ছিন্ন-বস্ত্রাদির সংস্কার করিত। তাহাতে সে যাহা পাইত, তাহাতে তাহার এবং তাহার ততোধিক বৃদ্ধা পরিচারিকা বা সহচরী রূপালীর জীবিকা সম্পন্ন হইত। দোকানের উপরে শয়ন-ভোজনের যে সামান্য-পরিসর একটী ঘর ছিল, তাহার ভাড়া উঠিত, এবং (আর কাহাকেও বলিও না যে আমি বলিয়াছি) হাত তুলিয়া কখন কচিৎ অতি সামান্য কিছু দেওয়া-থোয়াটাও চলিত। এ শেষের ব্যাপারটা সে অবশ্য প্রাণান্তেও স্বীকার করিবে না—জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তাহার মুখ প্রগাঢ়ভাসে নবোঢ়া কিশোরীর মুখের মত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিবে। জীবিকা সম্পন্ন হওয়া অর্থে ক্ষীর, সর, নবনী ভোজন বুঝিও না—যে কোন প্রকারে বা কৌশলে ক্ষুন্নিবৃত্তিমাত্র।

চিকণলাল চিরকাল ভাবুক। বৃদ্ধ জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিত। দোকানের সম্মুখে অনতিদূরে জলপ্রপাত-স্তম্ভে স্ফটিকের খোদিত একটী শিশুমূর্ত্তি ছিল; তাহার সহিত চিকণের কতই না ভাব! হাতের ছুঁচ, হাতের সুতা, হাতে থাকিত—অন্যমনস্কে চিকণ সেই স্ফটিক-শিশুর সহিত হাসি-তামাসা করিত। কখন তাহার উদ্দেশে পাণিপথে হিন্দুভাগ্য-বিপর্য্যয়ের নাট্যাভিনয় বা হইত, কোন দিন বা সে কুরুক্ষেত্রের সমারোহ হইতে সুরু করিয়া পদ্মিনীর আখ্যানের চারণী করিয়া শেষ করিত। কয়েকজন প্রতিবাসী একদিন তাহাদিগের মধ্যে বলাবলি করিতেছিল—

"চিকণ আপনা আপনি বকে, আপনা আপনি হাসে, ওর একটু ছিট্ আছে, না? শেষ কথাটি চিকণের কাণে যাইল—চিকণ বলিয়া উঠিল, "না ভাই! গজটাক্ থাকিলেও অন্তত একটা ফতুয়া তৈয়ার করিতে পারিতাম।"

দিল্লি চিকণের পক্ষে অমরাবতী অপেক্ষা উজ্জ্বল, বারাণসী অপেক্ষা পবিত্র! দিল্লির বৃক্ষপত্র মৃত্তিকা সমস্তই চিকণের চক্ষে সজীব বলিয়া বোধ হইত। দিল্লির বক্ষের ভিতর অতীত কাহিনীর এত অসংখ্য আগ্নেয়-গিরি নিমজ্জিত আছে যে, তাহাদের বিস্ফারণে ভূকম্পন হইয়া কোন্ দিন দিল্লির বক্ষ বিদীর্ণ বা হয়, স্বপ্নমুগ্ধাবস্থ বৃদ্ধ সত্য সত্যই কখন কখন এমন ভয় করিত। দিল্লির ধূলি প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষগণের চিতাভস্ম

ভাবিয়া চিকণ তাহা প্রত্যহ মস্তকে ধারণ করিত।

দিল্লির যাবতীয় সম্ভ্রান্ত নাগরিকাবাসে চিকণের অবারিত দ্বার। বৃদ্ধ ভাবুক চিকণকে সকলেই ভালবাসিত। পিতৃ-পৈতামহিক স্বর্ণসৌধের মালিকানী সত্ত্বাবত যাঁহারা সম্ভ্রান্তমাত্র, তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না—প্রাণে, কর্ম্মে, কীর্ত্তিতে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত, আমি তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে বলিতেছি।

চিকণের পিতা দিল্লির ভিক্ষুক-দলপতি ছিল। চিকণ সাত-ভাইএর এক ভাই। পিতা সকালে পুত্রদিগকে ভিক্ষাকার্য্যে সহরে পাঠাইয়া দিত, সন্ধ্যায় প্রায় চিকণ ব্যতীত সকলেই বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া আনিত। পিতা সাদরে সকলের উদর পূর্ত্তি করাইত, কেবল চিকণের আহার্য্য উদরে না পড়িয়া কতক পৃষ্ঠে এবং কতক বা গাত্রের অন্যান্য স্থানে প্রবল বেগে পড়িত। চিকণের ভ্রাতৃগণ ভদ্রোচিত ভোজ্য-পেয়ে পূর্ণোদর হইয়াও কার্য্যের সময় কেমন অনশন-ক্লিষ্ট কঙ্কালসার সাজিয়া লোকের করুণা আকর্ষণ করিত, প্রকৃত অনশন-দগ্ধ চিকণের তাহা দেখিয়া বিস্ময়ের সীমা থাকিত না! ভিক্ষার অভিনয়ে তাহার ভ্রাতৃগণের দর্শন-ডালি তাহাদিগের বিশেষ উপকারে লাগিত—তাহাদিগের পানে নেত্রপাত করিলেই লোকের করুণা স্বতঃ ফুটিয়া উঠিত। চিকণ কুৎসিত অবয়ব—যাহার দর্শন-ডালি নাই, তাহার গুণ-বিচার করিবে কে?

একদিন একটী অতি সুন্দর আট নয় বৎসরের বালিকার নিকট সাত বৎসরের ভিক্ষুক চিকণ অর্থ ভিক্ষা করিল। অর্থের বিনিময়ে বালিকা সদ্য-প্রস্ফুটিত মনোরম গোলাপফুলের একটী তোড়া তাহাকে দিয়া বলিল, "এই ফুল কয়টী বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে, লইও। ভিক্ষা করিয়া বেড়াও কেন? চোর এবং অলস অকর্ম্মণ্যেরাই ত ভিক্ষা করিয়া খায়!"

চিকণ সেটী বিক্রয় করিতে পারিল না—আর সে দিন এক কপর্দ্দকও সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিতে পারিল না। তাহার ফলে চিকণের অস্থিমাংস সেদিন রীতিমত তাহার পিতৃস্নেহ অনুভব করিল। বালক তিন দিন শয্যাশায়ী রহিল; পরে গাত্র-বেদনা অপসৃত হইলে সে নগরপ্রান্তে এক দরিদ্র দরজীর নিকট গিয়া আবেদন করিয়া বলিল, "আমি আর ভিক্ষা করিব না—আমাকে তোমার কার্য্য শিখাও, আমি তোমার দাসত্ব করিব।"

দরজী বলিল—তুমি বাপু বড় মূর্খ দেখিতেছি। দিবারাত্র অঙ্গুলি ব্যথিত করিয়া শ্রম করিলেও আমাদের যাহা উপার্জ্জন হয় না, দিল্লির মত সহরে ভিক্ষাবৃত্তিতে এক ঘণ্টার ভিতর তাহার অধিক আসে। এমন রাজকীয় ব্যবসা ছাড়িয়া তুমি এ তুচ্ছ বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাও কেন?

বালক বলিল—"আমি ভিক্ষা করিতে জানি না—সুস্থ অঙ্গ ছিন্ন বস্ত্রে বাঁধিয়া আমি ক্ষত সাজাইতে পারি না—বাবা না মারিলে আমার কান্না আসে না—সেই জন্য কেহ আমাকে ভিক্ষা দেয় না।"

দরজীর শুনিয়া দয়া হইল। সে বলিল, "সে কথা স্বতন্ত্র। চৌর্য্যবৃত্তি অর্থকরী না হইলে, অবশ্য সাধুতার অনুশীলনে আপত্তি হইতে পারে না!" সেই অবধি চিকণ দিল্লির একজন রিপুকর্ম্মওয়ালা— দরিদ্র, শান্ত সরল এবং সানন্দ। কুলমর্য্যাদা এবং বংশ-কৌলীন্যে কালি দিয়াছিল বলিয়া তাহার পিতা এবং ভ্রাতৃগণ কেহ কখন তাহার মুখ দর্শন করিত না।

২

দোকানের স্তূপীকৃত ছিন্ন-বস্ত্রে মাথা রাখিয়া চিকণ উন্মীলিতনেত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেদিন মধ্যাহ্নে দিল্লির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী সুরনাথ বাবু তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাদসাহের চিত্রশালা দেখাইতে গিয়াছিলেন। বাদসাহের চিত্রশালায় চিকণের মত ব্যক্তির প্রবেশ-নিষেধ। তবে সুরনাথের সঙ্গে—কাবেই কথা নাই। বাদশাহের মস্‌নদ্‌ হইতে দরিদ্রের আঙ্গিনা পর্য্যন্ত দিল্লির সর্ব্বত্রই সুরনাথের সমান সম্মান।

এখন অপরাহ্ণ। পরাহ্ণ কি অপরাহ্ণ বৃদ্ধের তাহা ধারণায় অতীত। তাহার মনোরাজ্যে তখন চিত্রশালার চিত্রসমূহ চেতনা-প্রবল হইয়া তাহাকে যেন তাহাদের মধ্যে লোফালুফী করিতেছিল। বৃদ্ধ নিশ্চল এবং নির্ব্বাক্‌—স্বপ্নতরঙ্গে গা ভাসাইয়া ঐতিহাসিক আলেখ্যের ইতিবৃত্ত উপলক্ষে অতীতের কালপ্রবাহে সন্তরণ করিতেছিল।

"দেখ ভাই স্ফটিক! দেখ দেখ!" জলপ্রপাতের প্রস্তরশিশুকে সম্বোধন করিয়া চিকণ সহসা বলিয়া উঠিল, "স্বর্গের কোন্‌ দেবতার ক্ষমার এমন শক্তি আছে, যাহাতে নৃশংসের এ পাপ ক্ষালিত হইতে পারে? ঐ দেখ; সমগ্র রাজোয়ারা অন্ধকার করিয়া তাহার সমস্ত পদ্মফুলগুলি কাতারে কাতারে আসিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিতেছে! রাজোয়ারা চিরদিনই মান চায়, প্রাণ চায় না! হায় পাতকী—হায় আলা-উদ্দীন!"

এমন সময় করুণকণ্ঠে কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি পথ ভুলিয়া গিয়াছি—কোন্‌ দিকে যাইব বলিয়া দিবে?

চিকণ তাহার অচেতন-দৃষ্টি আগন্তুকের প্রতি ন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও মা! তুই যে সোণার কমল—বড় কচি, তুইও আগুনে পুড়িতে আসিয়াছিস্‌? পালা মা পালা—কোথাও গিয়া লুকাইয়া থাক্‌! এ দেশে কেন আসিয়াছিস্‌—এখানে কেন আসিয়াছিস্‌? এখানে আসিলেই পুড়িতে হইবে, তাহা জানিস্‌ না—পালা মা! পালা!

আগন্তুক পুনশ্চ কহিল,—"আমি পথ ঠাওর পাইতেছি না—আমি পূর্ব্বে কখন দিল্লীতে আসি নাই। দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দাও, আমি কোন্‌ পথে যাইব?"

চিকণ উদাসদৃষ্টিতে উত্তর করিল, "পালা মা! পালা! এ অগ্নির দেশে থাকিলে এমন যে নধর ফুল তুই, পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবি!"

আগন্তুক বালিকা। বাল্যের মাধবী জড়তা অতিক্রম করিয়া যৌবনের সবে মাত্র ফাল্গুনী-শোভায় সজ্জিত হইতেছে। মলিন বস্ত্রপরিহিতা—দেখিলেই পথ-শ্রমে অতিশয় কাতরা বলিয়া বোধ হয়। তাহার কুসুম-কোমল অতি সুন্দর পা দু'খানি স্থানে স্থানে বিক্ষত হইয়া রক্তমুখী হইয়াছে। চিকণের কথা বুঝিতে না পারিয়া বালিকা পুনশ্চ সম্মুখে চলিবার উপক্রম করিল।

চিকণের চমক ভাঙ্গিল—দুই হাতে চক্ষু দুইটীর মার্জ্জনা করিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিল। বালিকা তখন খানিকদূর চলিয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে যাইয়া চিকণ তাহাকে ফিরাইল।

দোকানে আনিয়া চিকণ তাহাকে বসাইল—বলিল, "মা! আমি বুড়া মানুষ—ঘুমন্ত কি বকিতেছিলাম, কিছু মনে করিস্‌নি। আমাকে তুই কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলি বল্‌।"

বালি। আমি অতি বাল্য হইতে দিল্লির নাম শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু আজিকার পূর্ব্বে দিল্লি কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। এই দিল্লি?

বালিকার প্রশস্ত ললাট, সরলতাব্যঞ্জক ভ্রূযুগল, দেবোপম কান্তি দেখিয়া বৃদ্ধ আবার অন্যমনস্ক হইবার উপক্রম করিতেছিল। বালিকা যখন নিশ্বাস ফেলিয়া হতাশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, যে দিল্লির কথা সে আশৈশব শুনিয়া আসিতেছিল, তাহা কি এই?—তখন বৃদ্ধের আবার চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল, "হাঁ মা! দিল্লি এই। শত শত বৎসরের ঘাতপ্রতিঘাতে, শত শত পুত্র-পৌত্রাদির উষ্ণ রক্তপাতে, শত শত প্রভঞ্জন, বজ্র উল্কা মস্তকে ধারণ করিয়া, আমার প্রাচীনা জন্মভূমি জননীর আজ এই অবস্থা! তুই কোথা হইতে আসিয়াছিস্ মা!"

বালি। বিশ ক্রোশ উত্তরে গিরিপাদ-মূলে লোহিয়া গ্রামে আমার পিতৃভবন। সম্প্রতি আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সেথায় আমার আর কেহ নাই। দিল্লিতে আমার মাতামহ আছেন, তাই এখানে আসিয়াছি,—যদি তিনি আমাকে আশ্রয় দেন।

চি। কেমন করিয়া এত পথ আসিলি?

বা। হাঁটিয়া। আমাদের গ্রামের আরও দুই চারিজন লোক এখানে আসিতে-ছিল, তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছি। তাহারা দিল্লিতে পৌঁছিয়া যে যার গন্তব্য স্থলে চলিয়া গেল। আমার গন্তব্য স্থানের যে ঠিকানা তাহারা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আমি গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছি—পথের ঠিক পাইতেছি না।

চি। হাঁটিয়া? ওমা দুধের বাছা তুই—এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিস্?

বা। তাহাতে কি? আমি ত দুর্ব্বল নই—

চি। তোর মাতামহের তুই বাদে আর কেহ আছে?

বা। বলিতে পারি না। আমি জন্মাবধি তাঁহাকে দেখি নাই।

চি। তবে তোর মাতামহ তোকে চিনিবে কেমন করিয়া?

বা। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া বাবা আমার কথা লিখিয়া তাঁহাকে চিঠি দিয়াছেন।

বালিকা পথশ্রান্তিতে যত না কাতর হইয়াছিল, তাহার পিতৃ-স্মৃতি তাহাকে ততোধিক কাতর করিল। জলভারে আরক্ত লোচনদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত হইল।

বালিকা পুনশ্চ বলিল, "বাবা বড় গরীব ছিলেন—আমাকে বড় ভালবাসিতেন।"—

চি। তোদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত কিসে?

বা। বাবা পট আঁকিতেন—আমাকেও পট আঁকিতে শিখাইয়াছিলেন,—আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতাম। তাহাতেই কষ্টেস্রেষ্টে এক রকম করিয়া আমাদের দিন চলিয়া যাইত। গরীবের গ্রাম, সেখানে পট কিনিবার বেশী লোক নাই।

চিকণের ভিতর এমন কিছু ছিল, যাহাতে ক্ষণেকের আলাপে লোকে তাহাকে বিশ্বাস করিত, ভালবাসিয়া ফেলিত, আপনার ভাবিয়া লইত। ক্ষণেকের পরিচয়ে বালিকা ভুলিয়া গিয়াছিল, সে পথিকমাত্র—চিকণ দিল্লির একজন অধিবাসী—মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহাদিগের পরস্পরে আদৌ পরিচয় ছিল না। সে চিকণের ভাবে, কি বুঝিয়া বলিতে পারি না, তাহার উপর সরল বিশ্বাসে মনের দ্বার একেবারে সরাইয়া দিয়াছিল।

চিকণ বালিকাকে বসিতে বলিয়া, উপরে আপনার ঘরে চকিতের মত গিয়া, কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন আনয়ন করিল। বালিকাকে বলিল, "মা! আগে একটু কিছু দাঁতে কাট্, তাহার পর আমি তোকে তোর ঠিকানায় রাখিয়া আসিব।"

অপরিচিত স্থলে খাইবার কথায় বালিকার আপন অবস্থা মনে পড়িল। কি কারণে বলিতে পারি না, তখন সকল শিরা পরিত্যাগ করিয়া তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে উঠিয়া মুখ ছাইয়া ফেলিল। গোলাপী গণ্ডদ্বয়ে আরও গোটাকয়েক টাট্‌কা গোলাপ ফুটিয়া উঠিল। চিকণ তাহা লক্ষ করিয়া ভাবিল—এ মেয়ের এমন একটা তেজ আছে, যে তেজ এর এত রূপৈশ্বর্য্য রাস্তার ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়াছে! কিন্তু দিল্লির নাগরিক দস্যুদের হাতে তাহা টিকিবে কি?

লজ্জা দাঁড়াইতে পারিল না—বৃদ্ধের সাদর এবং স্বাভাবিক প্ররোচনায় বালিকা দুই একটী ফলে পিপাসা নিবৃত্তি করিল। অন্য কিছু খাইতে পারিল না।

চিকণ জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার বল্‌তো মা! তোকে কোন্ ঠিকানায় যাইতে হইবে?"

বালিকা বলিল,—"ঠারিয়া বাজার। সেইখানে আমার মাতামহ বাস করেন।

চিকণের কপালে ঘর্ম্মবিন্দু প্রকাশ পাইল। যাবতীয় ইতর, অকর্ম্মণ্য, অপরিষ্কার, নরকৃমি ঠারিয়ায় বাস করে। ঠারিয়া দিল্লির নরক।

এমন রত্নের অধিকারী ঠারিয়ায় বাস করে শুনিয়া চিকণের মনে বড় ব্যথা লাগিল। তাহার সম্মুখস্থা এ উজ্জ্বল তারকা-কিশোরীর নিশ্বাসে মলয় নন্দনকাননের বার্ত্তা নির্ঘোষিত করিতেছে—চিকণ বুঝিতে পারিল না, এ স্বর্গের নিধি কেমন পাপের প্রায়শ্চিত্তকল্পে ঠারিয়ার নরকান্ধকারে আশ্রয়ভিক্ষা করিতে যায়। চাঁদনী চৌকের ধূলি, জনতা, এবং কোলাহল, যাহার কোমল দিল্লি-কল্পনায় আঘাত করিয়াছিল—তাহাতেই যাহার আকুল দীর্ঘশ্বাস [illegible] হাঃ শব্দে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "দিল্লি এই?"—সে ঠারিয়ায় যাইবে কেমন করিয়া, তাহাকে সে ঠারিয়ার পথে কেমন করিয়াই বা লইয়া যাইবে?

তাহাকে ভাবিত দেখিয়া বালিকা বলিল—"বাস্তবিক, তুমি কেমন করিয়া দোকান ফেলিয়া যাইবে—আমাকে পথ দেখাইয়া দাও—আমি একাকী যাইতে পারিব।"

চিকণ ক্ষিপ্রহস্তে ছিন্ন বস্ত্ররাশি সিন্দুকে পূরিয়া বালিকার হস্ত ধরিয়া গন্তব্যপথে প্রস্থান করিল।

চিন্তামগ্ন চিকণ পথে বালিকার সহিত অধিক কথা কহিল না—একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নামটী কি মা?" বালিকা উত্তর করিল, "বাবা আমায় 'নীলা' বলিয়া ডাকিতেন।" চিকণ শুনিয়া ভাবিল, হীরা চুণি ছাড়িয়া পিতা তাহার এ উজ্জ্বল মাণিককে 'নীলা' নামে ডাকিত কেন? অল্পক্ষণেই তাহারা ঠারিয়ার সম্মুখ সীমান্তে প্রবেশ করিল। অন্ধকার, পূতিগন্ধপূর্ণ, পাপ-কর্দ্দমাবিল পথে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল।

বীভৎস পিশাচমূর্ত্তিসমূহের অট্টহাস, কদাকার বর্ষীয়সী বারাঙ্গনাগণের অশ্রাব্য শ্লেষ, দারিদ্র্যের বিকট ধ্বংসকার্য্য—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া নীলা ত্রস্ত হইল। অনাথা বীর-বালিকা বিংশতি ক্রোশ পদব্রজে আগমন করিয়া কাতর হয় নাই, এখন কিন্তু অতি কাতর হইয়া সে ভয়ে বৃদ্ধ চিকণলালের হস্ত জোরে আপন হস্তে বেষ্টন করিল—এবং ক্ষীণতম কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি দিল্লি? দিল্লি যে পুণ্য এবং প্রতিষ্ঠার রঙ্গভূমি।"

অকারণ পরুষকণ্ঠে চিকণ উত্তর

করিল—"এ দিল্লি নয়। দিল্লি স্বর্গ—দিল্লির এ ভাগ, দিল্লির যমদূতগণের অধিকৃত দিল্লির নরক!"

বালিকা উত্তর করিল না। বৃদ্ধের হাত ছাড়াইয়া সে যমপুরীর জনৈক পথিককে জিজ্ঞাসা করিল, "হেথায় শঙ্কর সুবাজী কোথায় থাকেন?"

পথিক বলিল, "বুড়া সুবাজীর কাছে যাইবে? এই আগে বাঁ দিকে গলির ভিতর যাও।"

বালিকা কলের মত সেই গলির পথপানে চলিল। চিকণ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ও মা শোন্! থাম্। আমি আগে তার কাছে যাই—এ স্থান তোর মত দেবতার পদ-স্পর্শের যোগ্য নয়।" পাগলের মত বালিকাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বৃদ্ধ আবার বলিল, "কোথায় যাইবি মা! তুই পাগল! ফিরিয়া চল্। আমি গরীব, বৃদ্ধ, নগণ্য—তুই আমার ঘরে চল, সেখানে থাকিবি। সে সামান্য কুটীর বটে, কিন্তু আমাদের সে অঞ্চলে চুরি-ডাকাতী নাই, খুনোখুনি নাই, কদাচার নাই, বেশ্যা-বিভীষিকা নাই। তুই নিশ্চয় দেবতার দেশের,—কোন অভিশাপে পৃথিবীতে নামিয়া পড়িয়াছিস্, তাই বলিয়া এখানে তোর স্থান হইতে পারে না। আয় মা, ফিরিয়া আয়!

এক বাটীর বারান্দায় দুইজন বর্ষীয়সী বেশ্যা বসিয়াছিল, তাহারা বালিকাকে দেখিয়া অকথ্য বাক্যে পরিহাস করিল।

হস্তে শ্রবণ রোধ করিয়া বালিকা চিকণকে বলিল, "অভাগিনীর প্রতি তোমার দয়া অসীম—আমি কখন তাহা ভুলিব না। কিন্তু আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আমি একাকিনীই তাঁহার নিকট যাইব। তাঁহার মনে কি আছে জানি না, অপর ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে দেখিলে তিনি তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়ত সঙ্কোচ বোধ করিবেন। আমি যাই—যদি ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয়, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

কথান্তে বিদ্যুদ্গতিতে বালিকা সেই গলির পথে ছুটিয়া নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃদ্ধ কিছুক্ষণ সেই স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিল, এবং অবশেষে ভগ্নান্তঃকরণে আপন পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

(৩)

বিষণ্ণচিত্তে চিকণ যখন তাহার দোকানের নিকটস্থ হইল, তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। দোকানের সম্মুখে দুই চারি জন লোক কথোপকথন করিতেছিল। তাহারা সকলেই চিকণের প্রতিবাসী।

একজন বলিল, "আজ সকাল হইতেই চিকণকে দেখিতে পাইতেছি না। জামার অভাবে কাল দেখিতেছি বৈবাহিকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "ঐ রোগেইত চিকণের ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে। আছেত বেশ—বিগ্‌ড়াইলে রক্ষা নাই। কোথায় ছুটিয়া পলাইবে, কেহ সন্ধান করিতে পারিবে না।

তৃতীয় ব্যক্তি চিকণের মাথার কথার উল্লেখ করিয়া বলিল। "মাথার রোগ সঙ্গের সাথী, একবার ধরিলে ছাড়ে না। আজ বোধ হয়, খেয়াল চাপিয়াছে। নয় কোথাও রামায়ণ শুনিতেছে, নয় কোথাও গান করিতেছে, নয় নদীতীরে বসিয়া নৌকা গণিতেছে। কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, এমন সময় দুনিয়ার কোন কথা তাহার মাথায় থাকে না।"

শেষের লোকটীও তাহার মন্তব্য প্রকাশ

করিতে ছাড়িল না। বলিল, "তোমাদের সব কথা মানিয়া লইলাম—কিন্তু চিকণ তাহার কর্ম্মে যে অদ্বিতীয়, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার শক্তি নাই। চিকণ যে কাপড় রিপু করিয়া দিবে, তাহার 'কাছে নূতন কাপড় টাকবে না। তাহার মাথার সন্দেহ করিতে পার, কিন্তু তাহার সততায় সন্দেহ করে কাহার সাধ্য ?"

কথা কহিতে কহিতে তাহারা অগ্রসর হইলে চিকণ দোকানে প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধা রূপালী আসিয়া তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, উত্তর পাইল না, চলিয়া গেল। বৈবাহিক-গৃহে নিমন্ত্রিত তাহার সেই প্রতিবাসী ফিরিয়া আসিয়া জামার বিস্তর তাগাদা করিল, তাগাদা শুনিতে শুনিতে চিকণ ঝিমাইতে লাগিল। ধোবানী আসিয়া কাচিবার কাপড় চাহিল, বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িল—অশৌচ হইয়াছে, কাপড় দিবে না। যে সুরনাথ বাবুর সহিত সে মধ্যাহ্নে চিত্রশালায় গিয়াছিল, তিনি আসিয়া চিত্র-বিশেষের আলোচনা করিবার উদ্যোগ করিলে চিকণ কপালের দুই দিক্ টিপিয়া বুঝাইয়া দিল—বড় মাথা ধরিয়াছে। এমন কি, সকলের চক্ষের নিধি,—রূপে, মানে, ধনে, বিধাতঃপুরুষের মানস-পুত্র, স্বয়ং বাবু পূর্ণচাঁদ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যাইতে যখন তাহার দোকানের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আপনার বাগানের দুইটী বসরাই গোলাপ তাহাকে উপহার দিলেন, এবং পরদিন তাঁহার গান শুনিতে তাঁহার বাগানবাটীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন, চিকণ তাঁহাকে রাশীকৃত ছিন্ন বস্ত্রের স্তূপ দেখাইয়া দিল। এত কাজ ফেলিয়া সে যায় কেমন করিয়া ?

শেষ, তাহার পরিচিত জনৈক মৎস্য-বিক্রেতা আসিয়া তাহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "রিপুকর্ম্ম! আজ বিকালে ঠারিয়া বাজারে ঘুরিতেছিলে কেন ?"

চিকণ সোদ্বেগে মৎস্য-বিক্রেতার দিকে চাহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

মৎস্য-বিক্রেতা বলিল, "আমি সে পথ দিয়া মাছ বেচিতে যাইতেছিলাম; একটী সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে তুমি পথ দেখাইয়া দিতেছিলে, না ?" চিকণ ঘাড় নাড়িল—হাঁ। মৎস্য-বিক্রেতার একটা কথা তাহার কাণে খট্ করিয়া উঠিল। সে দুধের বাছা—"যুবতী স্ত্রীলোক ?" মৎস্যের আঁশ গন্ধে অভ্যস্ত হইলে লোকের ঘ্রাণেন্দ্রিয় দূষিত হইবার কথা,—এ হতভাগা দর্শনেন্দ্রিয়ের মস্তকও দক্ষিণ হস্তের কার্য্যে সমাধা করিয়া বসিয়া আছে!

মৎস্য-বি। যুবতী শঙ্কর সুবাজীর কাছে যাইল—না ?

চি। হাঁ।

মৎস্য-বি। বুড়া শঙ্করের কাছে যাওয়ার পরিণাম-ফল যাহা ঘটিবে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তোমাকে তখনই তাহা বলিয়া দিতাম। ঠারিয়ার ন্যায় স্থানেও সে বুড়ার মত কাফেরের জোড়া নাই। তুমি সে স্ত্রীলোকটীকে সেখানে রাখিয়া আসিয়া ভাল কাজ কর নাই, রিপুকর্ম্ম! সে বেচারার অবস্থা দেখিয়া আমার এমন কষ্ট হইয়াছিল।—সে নিরাশ্রয়কে আমি আমার বাটীতেই আশ্রয় দিতাম, কিন্তু অমন সুন্দরী রমণী সঙ্গে দেখিলে আমার সন্দিগ্ধা সহধর্ম্মিণী গৃহপ্রবেশের কালেই সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে তাহার সম্ভাষণ করিবে, এই আশঙ্কায় আমি তাহা করিতে পারিলাম না।

সোৎকণ্ঠায় চিকণ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন হইয়াছে কি ?"

মৎস্য-বি। যাহা হইবার তাহাই হই-

য়াছে। গালি দিয়া কাকের তাহাকে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিয়াছে। রূপসী তাহার নিকট কি প্রয়োজনে গিয়াছিল ?

চিকণের মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। সে বলিল—"বালিকার কথায় বুঝিয়াছিলাম, শঙ্কর সুবা তাহার মাতামহ। বালিকার অন্য আশ্রয় নাই, তাই তাহার কাছে সে আশ্রয়ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল।

মৎস্য-বিক্রেতা হাসিয়া উঠিল। "শঙ্কর আশ্রয় দিবার পাত্রই বটে! তাহার উপর বার্দ্ধক্যে সে নিজেই দুর্ভিক্ষকাতর। তবে অমন সুন্দরী নারী—শঙ্কর আশ্রয় না দিলেও ঠারিয়া বাজারে তাহার আশ্রয়ের অভাব হইবে না! অল্প দিনেই দেখিবে, তাহারই জন্য পাঁচজনকে আশ্রয় দিবার যোগ্যতা আসিবে।"

মৎস্য-বিক্রেতা চলিয়া গেল। তাহার শেষের কথাগুলি কিন্তু চিকণের কাণে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল। "অমন সুন্দরী নারী—ঠারিয়া বাজারে তাহার আশ্রয়ের অভাব হইবে না। অল্প দিনেই সেই আবার অন্য পাঁচ জনকে আশ্রয় দিতে পারিবে।" সহরের ধারাই এই। দিল্লির মত সহরে এ কিছু নূতন কথা নয়। কিন্তু তবু চিকণের মন কর্‌কর্‌ করিতে লাগিল। আহা! সে যে নিষ্পাপতার সজীব প্রতিমা!

চিকণের সে আত্মীয়-কুটুম্ব নয়। কে সে? পথিকমাত্র—অজ্ঞাত-কুল-শীলা। সে কোথায় যায় না যায়, কি করে না করে, তাহাতে চিকণের কি? তা বটে, কিন্তু চিকণের অবাধ্য মন তাহার জন্য তথাপি কাঁদিতে লাগিল!

বোতাম আঁটিতে আঁটিতে চিকণ ঠারিয়ার রাস্তায় চলিল। যাইতে যাইতে একবার ক্রোধোচ্চস্বরে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "আমি গাধা, আমার কাণ্ডজ্ঞান নাই!"

ক্ষুৎপিপাসা-কাতর চিকণ ঠারিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেখানে কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুই ঠিক করে নাই। একটু আগে রূপালি খবর দিয়া গিয়াছিল, রান্না হইয়া গিয়াছে। রুটী, দাউল, তরকারীর উপর আবার কোথা হইতে সেদিন রূপালী সুমিষ্ট দধি সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়াছিল। সে সমস্ত ফেলিয়া, সন্ধ্যার অন্তে মুদির দোকানে তাসের কাস্ত ফেলিয়া, আপনার উপর বিরক্ত হইয়া চিকণ আবার বলিল, "বুড়া হইলে বাস্তবিকই লোকে গাধা বনিয়া যায়।"

আপনাদিগের ব্যাপার লইয়া দিনরাত্রি ব্যস্ত থাকা যাহাদিগের স্বভাব, মরিয়া যাইলেও যাহারা পরের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তাহারা হিংসার পাত্র সন্দেহ নাই। স্বার্থপরতাই জগতে সুখের মূল-ভিত্তি। ছিন্ন বস্ত্রের সংস্করণে চিরদিন নিযুক্ত থাকিয়া চিকণলাল জীর্ণের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল, তাই বুঝি আর্ত্তের উপর সহানুভূতি তাহার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছিল।

ঠারিয়ায় পৌঁছিলে সেই বর্ষীয়সী বারাঙ্গনাদ্বয় তাহাকে দেখিয়া বলিল, "জানি না বাবু! কোথায় গেল। আমরা এত করিয়া তাহাকে আমাদের কাছে আসিতে ডাকিলাম—আমাদিগের দিকে একবার সে ফিরিয়াও চাহিল না। মেয়েটা অহঙ্কারে মটমটে! গোঁ-ভরে ঐ দিকে চলিয়া গেল। তুমি বুঝি তাহাকেই খুঁজিতে আসিয়াছ? ঐ পথে গিয়া দেখ। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহারা চিকণকে পথ দেখাইয়া দিল।

নির্দ্দিষ্ট পথে চিকণ চলিতে লাগিল। তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। আকাশে বড়, ছোট, মুক্তা, মণি-মাণিক সব ফুটিয়া উঠিয়া

ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। চিকণ কাহার এক উপবনপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং অন্যমনস্কে তাহাতে প্রবেশ করিল।

সেই উপবন-মধ্যস্থ সরোবর-সোপানে—নির্জ্জনে—সান্ধ্য-নিস্তব্ধতায়—নীলা বসিয়াছিল। জানুদ্বয় হস্তে বেষ্টিত—সেই বেষ্টনের মধ্যে তাহার শ্রান্ত মস্তক নত হইয়া পড়িয়াছে। সকলের পরিত্যক্তা—অসীম জগতীতলে আপনার বলিয়া দাবী করিবার প্রাণিমাত্র নাই,—অজ্ঞাত প্রদেশে অপরিচিতা,—নিশান্ধকারে, তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিবামাত্র অনুমিত হয়, দুঃখিনী এই বিপুল লোকপূর্ণ লোকালয়ে কি ভয়ঙ্কর একাকিনী, কি ভয়ঙ্কর অসহায়া! অন্য কেহ তাহার অবস্থায় পড়িলে চক্ষে সমুদ্র বহিত—নীলা কাঁদে নাই।

আপনার চক্ষু মুছিয়া চিকণ পশ্চাৎ হইতে সস্নেহে তাহার মস্তক স্পর্শ করিল। ত্রস্তে বালিকা মস্তক তুলিয়া চিকণের পানে চাহিয়া দেখিল।

করুণার্দ্রস্বরে চিকণ বলিল, "মা! যাহা শুনিলাম, সত্য কি? সত্য কি তোর মাতামহ তোকে তাড়াইয়া দিয়াছে?"

"আমি তাঁহার কন্যার কন্যা, তিনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না"—নীলা উত্তর করিল।

"তোর বাবার পত্র তোর কাছে ছিল তো?"

পত্র তিনি গ্রহণ করেন নাই—এই আমার কাছেই রহিয়াছে।

চিকণ। পত্রখানি আমাকে দে।—নীলা পত্রখানি চিকণের হস্তে অর্পণ করিল।

চিকণ রাগে অন্ধকার দেখিল। বলিল, "সে তোকে আশ্রয় দিতে বাধ্য, তোর ভরণপোষণ করিতে সে বাধ্য। আমি তাহাকে বাধ্য করিব—না পারি, আইনের দ্বারা বাধ্য করাইব।" সকলে কথাটা ব্যবহার করে, চিকণও রাগের মাথায় ব্যবহার করিল,—কিন্তু আইন শব্দের অর্থ কি, তাহা সে আদৌ জানিত না।

আস্তে আস্তে নীলা উত্তর করিল, "আমি তাহা ইচ্ছা করি না। হয়তো তাঁহার ধারণাই ঠিক—হয়তো আমি তাঁহার কেহই নই—হয়তো এ সমস্তর মধ্যে কোথাও বড় একটা ভুল আছে।"

"তুই যাইতে সে কি বলিল, কি করিল, আমাকে বিস্তারিত করিয়া বল্।—আমি শুনিলে বুঝিতে পারিব।" "তাহাতে লাভ কি? হাঁ, তিনি আমাকে পরুষ কথায় বিদায় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহার কেহ নই, এই বিশ্বাসে। "অতি কষ্টে, ক্ষীণতম কণ্ঠে, নীলা কথা কয়টী উচ্চারণ করিল।

"ভাল, এখানে না আসিয়া একেবারে আমার দোকানে চলিয়া যাইলি না কেন, মা!"

এ কথায় সে কোন উত্তর করিল না। তাহার স্থিরদৃষ্টি, শুষ্কচক্ষু দেখিয়া চিকণের ভয় হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় কি? সে নির্ম্মমের কাছে আমি একবার যাইয়া দেখিব, যদি কিছু করিতে পারি।

"না"। নীলা চিকণের মুখের উপর তাহার কাতর দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল, "না"। তিনি আমার মাকে আমার সম্মুখে গালি দিয়াছেন—তিনি ডাকিলেও আর আমি তাঁহার নিকট যাইব না। বাল্য হইতে পিতার নিকট দিল্লির গল্প শুনিতাম"—নীলার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতে লাগিল—"অনেক আশায় দিল্লি আসিয়াছিলাম—কিন্তু যেখানে গিয়াছিলাম, সে স্থল যদি দিল্লির অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে দিল্লিতে আমার কাজ

নাই।—আমার জীবনে—"বালিকার চক্ষে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। সে নিবিড় মেঘমধ্য হইতে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ হইলে কি আর রক্ষা আছে? ভীষণ বৃষ্টিপাত সুরু হইল। চিকণ দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিল, "ঐ দুটী চক্ষে এত জল ধরিয়াছিল কেমন করিয়া?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংস্কৃত নাটক ও তাহার বিশেষত্ব।

নাটকের উদ্দেশ্য।

আজি কালি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, নাটক জিনিসটী লোক-শিক্ষার একটী প্রশস্ত উপায়। বাস্তবিক নীরস উপদেশ-বাক্য অপেক্ষা এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদান অধিক ফলপ্রদ। লোকশিক্ষাপক্ষে বাক্য অপেক্ষা জীবন্ত দৃষ্টান্ত যে অধিক কার্য্যকর, তাহা বোধ হয় বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। নাটকাভিনয় দর্শনে মানব-মনে স্বতঃই যে ভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে, অপর সহস্র চেষ্টাতেও তাহা সৃষ্টি করিতে পারা যায় না।

নাটকের ক্রমোন্নতি।

সুতরাং দেশের সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত নাটকেরও যে সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী নাটককারগণের নাটকগুলির সহিত আধুনিক নাটকগুলির তুলনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ।

নাটকের ন্যায় এত বড় একটা বস্তুর উৎপত্তি কোথায়, এবং কোন যুগেই বা ইহা প্রথম আবির্ভূত হয়, তাহার অনুসন্ধান জন্য বহু পণ্ডিত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। এখনও সে পরিশ্রমের বিরাম নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক উত্তর অদ্যাপি পাওয়া গেল না। সকল জাতিই নিজের নিজের দেশের নাটকের ইতিহাস একরূপ স্থির করিয়া লইয়াছেন। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট আছেন; কিন্তু ভারতীয় নাটকের ইতিহাস আজি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইল না।

গ্রীক নাটকের ইতিহাস।

পণ্ডিতগণ বলেন, একমাত্র Baccpus দেবের পূজা-পদ্ধতি হইতেই তাঁহাদের দেশে নাটকের সূত্রপাত। ক্রমেই উন্নতিলাভ করিয়া ইহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

ইংরাজী নাটকের ইতিহাস

মধ্য যুগে খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ অভিনয়প্রথার সাহায্যে লোকের মনে ধর্ম্মবিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। ইংরাজ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, নাটক বা অভিনেয় গ্রন্থগুলির উৎপত্তি এইখানে।

ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।

ভারতীয় নাটকগুলি কিরূপ সৃষ্ট হইল, তাহার শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ বলেন, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অতি সহজে এই দ্রব্যটী পাইয়াছিলেন। গ্রীক নাট্যাচার্য্যগণ হিন্দুগণের মহত্বে পরিতুষ্ট হইয়া এই জিনিসটী

তাঁহাদিগকে "শিরোপা" দিয়াছিলেন। * অনুকরণপ্রাবল্যে ক্রমশঃ ইহার পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, সংস্কৃত নাটকগুলি সাধারণ নৃত্যেরই পরিণত অবস্থা। মূক নৃত্য ক্রমশঃ কথোপকথনের ভাষা ও সঙ্গীত সংযোগে বর্ত্তমান নাটকরূপে পরিণত হইয়াছে। † যাঁহারা এ সকল মত একেবারেই মানিতে চাহেন না, তাঁহারা বলেন, ভারতীয় নাটকগুলি জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিমণ্ডলীর উর্ব্বর মস্তিষ্কের অন্যতম ফল। যাহা হউক সংস্কৃত নাটকগুলির উৎপত্তি স্থান কোথায়, তাহা লইয়া তর্কের কোন প্রয়োজন দেখি না। এই সকল নাটকের বিশেষত্ব কি, আমরা কেবল তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃত নাটকের সামঞ্জস্য।

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সমগ্র নাট্যশাস্ত্রটী যেন কোন একটী অবিচ্ছেদ্য সামঞ্জস্য-সূত্রে সংগ্রথিত।

প্রত্যেক নাটকেরই আখ্যান বস্তু হইতে বর্ণনভঙ্গি পর্য্যন্ত সকল বস্তুই যেন এক ছাঁচে ঢালা। একজন নাট্যকার যাহা দেখাইতে চাহিলেন, পরবর্ত্তী নাট্যকারও তাহারই প্রতিচ্ছবি আনিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেরই আখ্যান-বস্তু একমাত্র প্রণয়। এই প্রণয়ের প্রথম সঞ্চার হইতে শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের সূক্ষ্ম বর্ণনাই নাট্যকারগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বর্ণনায় যিনি যতদূর কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন, তিনিই ততদূর যশোলাভে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রায় সকল নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'সর্ব্বস্বামিগুণোপেত' দিব্যকান্তি বহু মহিষীসমন্বিত জনৈক যুবা নরপতি নায়কের পদটী অধিকার করিয়াছেন। নায়িকাও সেইরূপ নবোদ্ভিন্নযৌবনা চপলা-লাঞ্ছিতরূপা অনিন্দ্যসুন্দরী কোন রাজকুমারী অথবা কোন পদস্থ ব্যক্তির কন্যা। দৈবক্রমে উভয়ে উভয়ের রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। দুজনেই মিলনের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। এই মিলন যে আয়াসসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কত আশা, কত নিরাশা, তাঁহাদের মনে উদিত হইতে থাকে; কত বিপদ্ কত অন্তরায় তাঁহাদিগকে বরণ করিয়া লইতে হয়। লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাঁহাদের শিরোভূষণ হইয়া পড়ে। অবশেষে—বহুদিন পরে তাঁহাদের সেই চিরকল্পিত মিলনের পথ ক্রমশঃ পরিসর হইয়া আইসে; নায়ক

---

* 'যবনিকা' শব্দ হইতে এই বিশ্বাসের প্রথম উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ তদানীন্তন গ্রীকগণকে 'যবন' নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চে যে আবরণী (Screen) ব্যবহৃত হইত, তাহার নাম 'যবনিকা।' পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই আবরণীর (Screen) ন্যায় ভারতীয় নাটক জিনিসটীও গ্রীক নাটকের অনুকরণ। সম্ভবতঃ ইহা গ্রীক থিয়েটারের আবরণীর আদর্শেই নির্ম্মিত। এই জন্য ইহার নামও 'যবনিকা' দেওয়া হইয়াছে।

† কেবলমাত্র ভাষা অনুশীলন দ্বারাই এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত 'নাটক' এবং 'নট' শব্দ—দুইটীই 'নট্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই নট্ ধাতুর অর্থ নৃত্য করা।

প্রবাদ এইরূপ যে, ভরত নামক জনৈক মুনি দেবসভা মধ্যে একদা লক্ষ্মীর স্বয়ংবর অভিনয় করিয়াছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস তিনিই ভারতীয় নাটকের প্রবর্ত্তক। এই 'ভরত' শব্দেরও সংস্কৃত অর্থ নর্ত্তক বা অভিনেতা।

এই সকল মতের বিরুদ্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু আবশ্যক বোধ না হওয়ায় এস্থলে আর সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

নায়িকা স্ব স্ব প্রিয়জনকে পাইয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকেন।

উদাহরণ

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তল।

কালিদাসের দুষ্যন্ত তপোবনে বৃক্ষ-বাটিকার মধ্যে শকুন্তলার রাজান্তঃপুর-দুর্ল্লভ অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশো র্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

যখন 'মধুকরোদ্বেজিতা' শকুন্তলা নিতান্ত বিব্রত হইয়া পরিয়াছে এবং প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া সখীদ্বয় অবিরত বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেছে, সেই সময়ে রাজা স্বয়ং শকুন্তলার সম্মুখীন হইয়া ভ্রমরকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। শকুন্তলা ও রাজার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। শকুন্তলার প্রাণে মলয় বাতাস প্রবাহিত হইল। অনুরাগে, সঙ্কোচে, ভয়ে শকুন্তলা কেমন একরূপ হইয়া গেল। মহাকবির তুলিকা স্পর্শে এই ভাবটী সুন্দর ফুটিয়াছে। শকুন্তলা যে রাজার দর্শনমাত্র তাঁহার পদে আপনার প্রাণ সমর্পণ করিল' তাহা তাহার সেই সলজ্জ এবং মৌন ভাব দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রিয়ংবদা ও রাজার কথোপকথন কালে শকুন্তলা আপনার হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতেছে—

"হিঅঅ মা উত্তম্ম এসা তুএ চিন্তিদাই অনুসূয়া মন্তেই।"

প্রিয়ংবদা এবং অনসূয়া এই সখীদ্বয়ের সহায়তায় উভয়ের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু দুর্ব্বাসার অভিশাপ, রাজার শকুন্তলা বিস্মৃতি, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়কের স্থানচ্যুতি, শকুন্তলার অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া উভয়ের মিলনের পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। বহুদিন পরে বিধাতার আনুকূল্যে তাঁহাদের এই দীর্ঘ বিরহের অবসান হইল।

(২) মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশী।

মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশী গ্রন্থদ্বয়ের আখ্যানভাগও এইরূপ।

বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের মহিষী ধারিণীর মালবিকানাম্নী জনৈকা পরিচারিকা ছিল। দৈবক্রমে রাজা একদা মালবিকার চিত্র অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। একদা অগ্নিমিত্র একাকী উদ্যান ভ্রমণে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় সহসা মালবিকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ সুযোগ ত্যাগ করিতে না পারিয়া উভয়ে প্রেমালাপে মত্ত হইলেন। অগ্নিমিত্রের অপরা মহিষী ইরাবতী এই সংবাদ ধারিণীকে প্রদান করিলে ধারিণী ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই ক্রোধের ফলে মালবিকা কারারুদ্ধ হইলেন। বহুদিন পরে মালবিকার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি রাজা মাধব সেনের ভগিনী। অতঃপর ধারিণী স্বয়ং ঘটক হইয়া মালবিকা এবং অগ্নিমিত্রের মিলন সংঘটিত করিয়া দিলেন।

বিক্রমোর্ব্বশী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরূরবা একদা উর্ব্বশীকে দৈত্যহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া আপনিই তাহাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া ফেলিলেন। পরস্পর ব্যষ্টি-ভাবে অবস্থান করায় উভয়ের প্রণয়বহ্নি দিন দিন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। দৈবক্রমে ভরতের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া উর্ব্বশী পুরূরবার সহিত মিলিত হইলেন।

কেবল মাত্র কালিদাসই যে এইরূপে তাঁহার নায়ক নায়িকার মিলন সংঘটিত করিয়াছেন তাহা নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের

মধ্যে যাঁহাদের নাটক প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা সকলেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কাশ্মীররাজ হর্ষদেব তাঁহার প্রণীত রত্নাবলী নাটকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই।

(৩) রত্নাবলী।

সিংহলরাজ স্বীয় কন্যা রত্নাবলীকে আপন মন্ত্রিসমভিব্যাহারে বৎসরাজ উদয়নের রাজ্যে প্রেরণ করেন। তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, রত্নাবলীকে বৎসরাজের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিবেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় প্রবল ঝটিকাঘাতে রত্নাবলীর অর্ণবযান বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি একাকিনী সেই অকূল সাগরে ভাসিতে ভাসিতে উদয়নের রাজ্যে আসিয়া পতিত হইলেন। উদয়নের মন্ত্রী তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়া গোপনে তাঁহাকে বৎসরাজ-মহিষী—বাসবদত্তার পরিচারিকারূপে রাখিয়া দেন। কালক্রমে বৎসরাজ ও রত্নাবলীর প্রণয় সঞ্চার হইল। মহিষী বাসবদত্তা এই সংবাদে ব্যথিত হইলেন। ঈর্ষার জ্বালায় অস্থির হইয়া তিনি রত্নাবলীকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিলেন। এদিকে সিংহলরাজ-মন্ত্রী সমুদ্র তরঙ্গ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া রত্নাবলীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বাসবদত্তার নিকট তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বৎসরাজের সমীপে তাঁহার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন। রত্নাবলীর দারুণ যন্ত্রণার অবসান হইল। তিনি বৎসরাজের অপরা মহিষীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

(৪) মালতী মাধব।

কবিবর ভবভূতিও তাঁহার মালতী মাধব নাটকে এই শ্রেণীর আখ্যায়িকারই অবতারণা করিয়াছেন।

কুণ্ডিনপুর নগরের নৃপতির দেবরাত ও ভূরিবসু নামক দুইজন মন্ত্রী ছিলেন। দেবরাতের পুত্রের নাম মাধব এবং ভূরিবসুর কন্যার নাম মালতী। এই পুত্র-কন্যাদ্বয়ের বিবাহ সম্পাদন করিয়া আপনাদের আত্মীয়তা বন্ধন দৃঢ় করিতে উভয়ে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ হইতে নানা অন্তরায় উপস্থিত হইল। রাজার অপর মন্ত্রী নন্দন মালতীর পাণি-প্রার্থী হইলেন। রাজাও তজ্জন্য ভূরিবসুকে অনুরোধ করিলেন। ভূরিবসুর প্রতিজ্ঞা-রক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

মাধব এত দিন তাঁহার সহচর মকরন্দের সহিত কামন্দকী নাম্নী জনৈকা পরিব্রাজি-কার আশ্রমে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। কামন্দকী কৌশলক্রমে একদিন মালতী ও মাধবের সাক্ষাৎ সংঘটন করাইয়া দিল। উভয়ের প্রাণে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইল। নন্দন এবং মালতীর বিবাহ যাহাতে সংঘটিত হইতে না পারে, কামন্দকী তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল।

কামন্দকীর চেষ্টা বিফল হইল। মালতী এবং নন্দনের বিবাহের দিন সন্নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। মাধব হৃদয়ের যন্ত্রণায় একদিন রজনীযোগে আশ্রম ত্যাগ করিয়া এক শ্মশানে আশ্রয় লইলেন। ঐ শ্মশানে করালা নামে এক কালী বিরাজ করিতেন। অঘোরঘন্ট নামক জনৈক কাপালিক এই কালীর পূজায় নিযুক্ত ছিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহার শিষ্যা। যে রাত্রিতে মাধব শ্মশানে পলায়ন করিলেন, সেই রাত্রিতে অঘোরঘন্ট কপালকুণ্ডলার সাহায্যে নিদ্রিতা মালতীকে বলিদানার্থ তথায় উপস্থিত করিল। মাধব কাপালিককে বিনাশ করিয়া মালতীর উদ্ধার সাধন করিলেন। কামন্দকীর কৌশলে মালতীবেশী মকরন্দের সহিত নন্দনের বিবাহ হইয়া গেল। ব্যাপার

অপ্রকাশ রহিল না। সত্বর রাজসৈন্য আসিয়া মকরন্দকে ধরিয়া ফেলিল। মাধব সহচরের সাহায্যার্থ তথায় আগমন করিলেন। উভয়ের ভীম পরাক্রমে রাজসৈন্যগণ পরাজিত হইল। ইত্যবসরে কপালকুণ্ডলা পুনরায় মলতীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। কামন্দকীর সৌদামিনী নাম্নী জনৈকা শিষ্যা এবারে মালতীর উদ্ধার সাধন করিল। অতঃপর মালতী মাধবের পরিণয় সংঘটিত হইল।

অধিক উদাহরণের আবশ্যক নাই। যে নাটক কয়খানির বিষয় আলোচিত হইল, তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, নায়কনায়িকার প্রণয় সঞ্চার হইতে মিলন পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনার যথাযথ বর্ণনা ভিন্ন সংস্কৃত নাট্যকারগণ ভিন্ন পথ অবলম্বন ভালবাসেন না।

বিদূষক।

সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে যে কেবলমাত্র আখ্যান-বস্তুরই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, নাটকমধ্যস্থ কয়েকটী চরিত্রবর্ণনাতেও ইহার অস্তিত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বিদূষক সকল নাট্যকারেরই অত্যন্ত আদরের বস্তু। গ্রন্থমধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই পরপিণ্ডোপজীবী, আত্মসুখ-পরায়ণ, উদরবিলাসী, শূন্যমস্তিষ্ক, সদাভীত ব্রাহ্মণতনয় (!) ভোজনের অসুবিধার কথা বিজ্ঞাপন করিতে করিতে সসঙ্কোচে রঙ্গ-মঞ্চের একপার্শ্বে প্রবেশ করিতেছেন। হাস্যরস উদ্রেক করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। তাঁহার ভাবভঙ্গি এবং বেশ বিন্যাস দেখিলেই দর্শকগণের হাস্য-সমুদ্র আপনা হইতেই উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

এই বিপুলোদর বিদূষকের চরিত্র সকল নাটকেই এক প্রকার। নাট্যকারগণ এই অদ্ভুত চরিত্রের সমাবেশ দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লন। প্রথমতঃ এই বিদূষকের অভিনয় দ্বারা নাটক মধ্যে রসান্তরের সমাবেশ করা হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ নায়ক নায়িকার মিলনসংঘটনে এই বিদূষকের শক্তি দৈবশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে বিদূষক যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে! 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' বিদূষকের কার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, এই চরিত্রটী একেবারেই অনাবশ্যক না হইতে পারে। মহিষী ধারিণীর আক্রোশে মালবিকা যখন কারারুদ্ধা, তখন একমাত্র বিদূষকের সাহায্যেই রাজা তাঁহার উদ্ধার সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।

সূত্রধর ও নটী।

এই বিদূষকের ন্যায় চরিত্রও অনেক নাট্যকার অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থারম্ভে সূত্রধর ও নটী নামক চরিত্র দুইটীর পরিহার একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই সূত্রধার এবং নটীর প্রধান কাজ নান্দী বাক্য উচ্চারণ এবং অভিনয়ের প্রারম্ভে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিনেয়-গ্রন্থ এবং তাহার রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান। এই সকল কাজ সমাপ্ত হইলে গ্রন্থের প্রধান নায়কের সঙ্গে দর্শকগণের সামান্য পরিচয় সম্পাদন করিয়া দিয়া তাঁহারা একে একে অন্তর্হিত হইয়া পড়েন।

ভাষা।

এই সকল ব্যতীত সংস্কৃত নাটকগুলির ভাষার মধ্যে কেমন একটা সামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকের

ন্যায় সংস্কৃত নাটকগুলির আদ্যোপান্ত এক সুরে বাঁধা নহে। কোথাও গদ্য, কোথাও কবিতা, আবার কোথাও প্রাকৃত ভাষার ছড়াছড়ি। এক 'শকুন্তলা' নাটকের সমস্ত গীতি কবিতাগুলি যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধাংশই এই সুললিত গীতি কবিতায় পূর্ণ। এই গীতি কবিতা-গুলি চারিপংক্তি বিশিষ্ট এবং নানাবিধ ছন্দে রচিত। শকুন্তলা নাটকের প্রথম চতুস্ত্রিংশ শ্লোকের মধ্যে প্রায় একাদশ প্রকার বিভিন্ন ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এই রূপ মিশ্র ভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী।

নাটকের মধ্যে প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে একটী নিয়ম প্রচলিত আছে। গ্রন্থোল্লিখিত সকল চরিত্রের মুখেই প্রাকৃত ভাষা প্রযুক্ত হইতে পারে না। চরিত্র বিশেষে এই ভাষার ব্যবহার হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে Macdonell সাহেব তাঁহার রচিত Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন :—

"In accordance with their social position, the various Characters in a Sanskrit play speak different dialects. Sanskrit is employed only by heroes, kings, Brahmans, and men of high rank; Prakrit by all women and by men of lower orders. Distinctions are further made in the use of Prakrit itself. Thus women of high position employ Maharashtri in lyrical passages, but otherwise they, as well as children and the better class of servants speak Gauraseni. Magadhi is used, for instance, by attendants in the royal palace, Avanti by rogues or gamblers, Abhiri by cowherds, Paicachi by charcoalburners and Apabhramsa by the lowest and most despised people as well as barbarians." P. P. 349.

সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে এইরূপ সামঞ্জস্য থাকার কারণ কি? অনুসন্ধান আলোচনা করিলে দুই চারিটী কারণ আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব নহে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরাই এই সামঞ্জস্যের প্রধান কারণ। নাটক প্রণয়ন সম্বন্ধে তাঁহারা যে নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিতে কোন নাট্যকারই সাহস করেন নাই। কাজেই তাঁহারা নিজের ইচ্ছামত পথে চলিতে পারেন নাই। গ্রন্থের নায়কের সম্বন্ধে আলঙ্কারিকেরা নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন :—

প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষি র্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্ নায়কো মতঃ॥

সুতরাং সমস্ত নাটকের নায়কের পদ যে নৃপতিদিগের একচেটিয়া হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

বিদূষক সম্বন্ধে তাঁহারা বলিতেছেন :-

কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপু র্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাসকরঃ কলহরতিঃ বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ॥

কাজেই বিদূষক এক মূর্ত্তিতেই সকল গ্রন্থকারের নিকট ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গ্রন্থের রস সম্বন্ধে আলঙ্কারিকেরা বলিতেছেন :—

এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্য্যনির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্॥

এস্থলেও গ্রন্থকারদিগের স্বাধীনতা অনেকটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহজ দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, শৃঙ্গার অথবা বীর রসের উপরেই আলঙ্কারিকগণের প্রবল অনুরাগ। সুতরাং এই দুইটী রসই নাট্যকারগণের প্রধান অবলম্বন।

সেকালে দেশে বীরের অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ হাস্যরসের ততদূর অনুরক্ত ছিলেন না। 'রাম রাবণ,' 'ভীমার্জ্জুন,' প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী লোকমুখে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মধ্যে সহসা কোন নূতনত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কাজেই শৃঙ্গার রস ভিন্ন নাট্যকারগণের আর গত্যন্তর রহিল না। প্রণয়ই যে সকল নাটকের একমাত্র বর্ণনীয় বিষয়, তাহার প্রধান কারণ ইহাই।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা।

শৃঙ্গার রসকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়ার আর একটী প্রধান কারণ, সংস্কৃত নাট্যকারগণের চির সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা। কামের মৃত্যুতে রতিদেবী যখন ধূলায় বিলুণ্ঠিত, তাঁহার মর্ম্ম-ভেদী করুণ রোদনে যখন দশদিক শোকে মুহ্যমান, কবিবর কালিদাস তখন রতির তদানীন্তন অবস্থার মধ্যেও সৌন্দর্য্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি দেখিতে-ছেন, রতি তখন "বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী" এবং "বিকীর্ণমূর্দ্ধজা"।

ইংরাজীতে যাহাকে এস্থেটিক বৃত্তি বলে, সংস্কৃত নাট্যকারগণ পূর্ণমাত্রায় তাহার অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা জগতের যেখানে যে সৌন্দর্য্যটুকু পাইতেন, সমস্তই গ্রন্থ মধ্যে রাশীকৃত করিয়া ফেলিতেন। সংস্কৃত নাট্যকারগণের গ্রন্থের যে পৃষ্ঠাই পাঠ করা যাউক, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে; যেন সৌন্দর্য্যের হাট বসিয়া গিয়াছে। শৃঙ্গার রসের অবতারণা করায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ সফল হইয়াছে, অন্য রসের অব-তারণায় বোধ হয় তাহা হইতে পারিত না। পাছে পাঠকের হৃদয়ে আঘাত লাগে, এই ভয়ে তাঁহারা করুণ বা তদ্রূপ কোন রসের সমাবেশ করেন নাই। ফলে সংস্কৃত ভাষায় বিয়োগান্ত নাটকের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, একেবারে নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আলঙ্কারিকেরাও বোধ হয় তাঁহাদের এই সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার সাহায্যের জন্যই রঙ্গমঞ্চে অভিশাপ প্রদান, নির্ব্বাসন, জাতীয় বিপত্তি, দংশন, নখাঘাত আহার, নিদ্রা প্রভৃতি ব্যাপারের অভিনয় একেবারেই নিষেধ করিয়াছেন।

নাটকের বিভাগ।

সংস্কৃত নাটকগুলি সাধারণতঃ এক হইতে দশ অঙ্কে বিভক্ত। সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে নাটিকা বলে, তাহাতে সচরাচর চারিটীর অধিক অঙ্ক দৃষ্ট হয় না। প্রহসন-গুলি প্রায় এক অঙ্কেই সমাপ্ত।

এই অঙ্কগুলির মধ্যে আবার কয়েকটী বিভাগ আছে। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে যেগুলিকে গর্ভাঙ্ক আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, এই বিভাগগুলি প্রকৃত পক্ষে তদ্রূপই প্রভেদের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের এই বিভাগ-গুলি বাঙ্গালা নাটকের গর্ভাঙ্কের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত থাকে না। সাধারণতঃ পাত্র কিংবা পাত্রীবিশেষের প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বারা ইহা সূচিত হইয়া থাকে।

সমগ্র অঙ্কব্যাপী অভিনয়ের মধ্যে রঙ্গ-মঞ্চ একেবারেই শূন্য পড়িয়া থাকিতে পায় না। আধুনিক নাটকগুলির প্রত্যেক গর্ভাঙ্কের অভিনয়ের পর সকল অভিনেতাই যেমন এককালে রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং পরের দৃশ্যে নূতন পাত্র পাত্রীর আগমন ঘটে, সংস্কৃত নাটকে সেরূপ হয় না। প্রত্যেক দৃশ্যগুলির মধ্যে এমন একটা সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত অঙ্কের অভিনয়ের মধ্যে একেবারেই বিশ্রামের অবসর পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে আর একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজন।

সংস্কৃত নাটকের একটী সমগ্র অঙ্ক অভিনয়ের মধ্যে ঘটনাস্থল পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। আধুনিক নাটকে দর্শকগণ একই অঙ্কের মধ্যে বিভিন্নস্থানের দৃশ্যাবলী দেখিতে পান। প্রথম দৃশ্যে তাঁহারা যে স্থানের ঘটনাবলী দেখিতেছিলেন, পরের দৃশ্যে হয়ত তাঁহাকে বহু দূরে গিয়া পড়িতে হইল। এই মাত্র যিনি হস্তিনাপুরের ঘটনাবলী দেখিতেছিলেন, দ্বিতীয় দৃশ্যে হয়ত তাঁহাকে মগধে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে হইল। সংস্কৃত নাটকে দর্শকগণকে এতদূর কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। তাঁহারা যে স্থানের ব্যাপার দেখিয়া চলিতেছেন, এক অঙ্কের মধ্যে তাঁহাদিগকে আর স্থানান্তরিত হইবার আশঙ্কা করিতে হয় না।

"শকুন্তলা" নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে, তপোবনের অতি সন্নিকটে উদ্যত-কার্ম্মুক দুষ্মন্ত নৃপতি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। ঐ অঙ্কের শেষ ভাগেও সেই তপোবনেরই অপর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শকুন্তলা ছলক্রমে কুরুবক শাখায় আপনার পরিধেয় বল্কল সংযুক্ত করিয়া সখীদ্বয়ের অনুসরণে বিলম্ব করিতেছেন এবং সেই অবসরে দুষ্মন্তকে আর একবার দেখিয়া লইতেছেন। সমগ্র অঙ্কের মধ্যে এক তপোবনের চিত্র ব্যতীত অপর কোন স্থানের চিত্র পরিলক্ষিত হয় না।

শুধু 'শকুন্তলা' নহে, অন্যান্য নাটকের অঙ্ক বিভাগও এইরূপ। বাহুল্য-ভয়ে সে সকল আর এ স্থানে প্রদর্শিত হইল না।

বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক।

সমগ্র নাটকখানির আদ্যোপান্ত সংযোগ রাখিবার অভিপ্রায়ে অঙ্কদ্বয় মধ্যে কতকগুলি চরিত্র বিন্যস্ত হইয়া থাকে। দর্শকগণের অলক্ষিতে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইল, এই সকল চরিত্র দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা হয়। সুতরাং সমগ্র ঘটনাটী পরিষ্কাররূপে বুঝিতে দর্শকের কোন ক্লেশ হয় না। অলঙ্কারশাস্ত্রে এই অবান্তর চরিত্রসমাবেশের নাম—'বিষ্কম্ভক' বা 'প্রবেশক'। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Prelude বা Interlude বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থ শেষ।

সাধারণতঃ রচয়িতার আরাধ্যদেবতার স্তুতি করিয়া এবং দর্শকগণকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই রীতিটী প্রায় সকল নাটকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

স্থান ও কালের ঐক্য। গ্রীক ও সংস্কৃত নাটক।

গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল্ নাটকের স্থান ও কালের ঐক্য (Unity of place and time) সম্বন্ধে যে নিয়মসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, গ্রীক নাট্যকারগণ তাহার বিশেষ অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থোক্ত সমগ্র ঘটনাটী যেন একটী মাত্র দিনের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে; অন্ততঃ এই সকল ঘটনা সংঘটিত হইতে অভিনয়োপযোগী কালের অধিক সময় আবশ্যক হয় নাই। কালের ঐক্য বিষয়েও গ্রীক নাট্যকারদিগকে সেইরূপই অবহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত নাট্যকারগণের নিকট এই বিষয়টী সমধিক সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। সংস্কৃত নাটকগুলির সমগ্র আখ্যানভাগটী বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদের মধ্যে এই সময়ের ঐক্য জিনিষটীর সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের প্রথম ও শেষ অঙ্কের মধ্যে যে অনেকগুলি বৎসর অতি-

বাহিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত 'উত্তর রামচরিতের' প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান।

স্থানের ঐক্য সম্বন্ধেও সংস্কৃত নাট্যকারগণ এইরূপই উদাসীন। তাঁহারা মর্ত্তভূমির দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে সহসা দেবলোকে উপস্থিত হইতে পারেন। ভ্রমণ দৃশ্য দেখাইতে হইলে অনবরত দৃশ্য পরিবর্ত্তনের অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃশ্য পরিবর্ত্তন অবশ্য পাত্রপাত্রীর ভাবভঙ্গি এবং কথাবার্ত্তা-দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

নাটক ও কাব্য।

যতদূর দেখা গেল, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় নাটক এবং কাব্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তবে কাব্যের মধ্যে যত সহজে কবির নিজের পরিচয় পাওয়া যায়, নাটকের মধ্যে তত সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একটু অনুসন্ধানের আবশ্যক করে। কাব্যের মধ্য দিয়াই কবি আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু নাটকে পাত্রপাত্রীর অন্তরালে থাকিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হয়। কবি এখানে ছদ্মবেশে থাকেন।

সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাই সংস্কৃত কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নাটকের মধ্যেও এই উদ্দেশ্যেরই চিহ্ন পাওয়া যায়। এইজন্য কাব্যের ন্যায় প্রকৃতি ও পাত্র পাত্রীর সৌন্দর্য্য বর্ণনাতেই নাট্যকার অধিক মনঃসংযোগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার কাব্য ও নাটকগুলি একই সুরে বাঁধা। যদি এই নাটকগুলিকে নাটক না বলিয়া দৃশ্যকাব্য বলা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় নাট্যকারগণের প্রতি অবিচার করা হয় না। ফলতঃ সংস্কৃত নাটকগুলি কাব্যেরই প্রকারান্তর।

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

ভারতী-মঙ্গল কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতের ভাষা শুন দ্বিজ কালিদাস।
শুনিতে মধুর অতি অন্তে স্বর্গবাস ॥
পঞ্চ দেব অংশে হৈল এ পঞ্চ কুঙর—।
ব্রহ্মশাপে পঞ্চত্ব পাইল নৃপবর ॥
কুন্তী পঞ্চ শিশু সাথে আইলা হস্তিনাতে।
পঞ্চাধিক শত ভাই রৈল হরষিতে ॥
দ্রোণে গুরু করি সব লাগে পড়িবার।
হৈল মহাবল সব অতুল যুবার ॥
অতি খল দুর্যোধন পাপে মন্দ মতি।
সতত করয়ে হিংসা পাণ্ডবের প্রতি ॥
উভয়তঃ বৈরী ভাবে বাড়িতে লাগিল।
শুন দ্বিজ কালিদাস অপরে যে হৈল ॥
জতু গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দুর্যোধনে।
রাখিল পাণ্ডব তাতে মারিতে কারণে ॥
পূর্ব্বে বার্ত্তা পাইয়া তারা গেল পলাইয়া।
পঞ্চ ভ্রাতা চলি যায় জননীকে লৈয়া ॥
পর্ব্বত কন্দর বহু সলিল কানন।
নানা স্থানে ভ্রমি ফিরে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
জননীর আজ্ঞামত পঞ্চ সহোদরে।
দ্রৌপদীকে বিয়া কৈল ব্যাসের গোচরে ॥
সাপক্ষ করিয়া পাছে পঞ্চাল নৃপতি।
হস্তিনা নগরে আসি হৈলা উপস্থিতি ॥
বৃদ্ধ নৃপে রাজ্য ধন দিল অংশ করি।
সুখে রৈল পঞ্চ ভাই নির্ম্মি দিব্যপুরী ॥
নারদেতে বার্ত্তা পাইয়া—রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কৈলা রাজসূয় ক্রতু অতুল সম্ভারে ॥

না হয়েছে না হইবে চারি যুগ মাঝে।
হেন মহোৎসব কৈল ধর্ম্ম মহারাজে ॥
অপার ঐশ্বর্য্য তার দেখি সুযোধনে।
কিরূপে হইবে নাশ চিন্তে অনুক্ষণে ॥
কর্ণ দুঃশাসন দুই তৃতীয় শকুনি।
মন্ত্রণা করেন রাজা এ তিনেকে আনি ॥
রাজা বলে তুমি তিন সাপেক্ষ আমার।
বলে কোন মতে হবে পাণ্ডব সংহার ॥
কর্ণ বলে মহারাজ কর অবধান।
বলে না পারিব তারা মহাবলবান ॥
এমত শুনিয়া বাণী বলেন শকুনি।
শুন কুরুকুলনাথ বলি হিতবাণী ॥
দ্যূত ক্রীড়া কর রাজা ইথে হবে জয়।
কপটে লইব রাজ্য কহিনু নিশ্চয় ॥
ইহা শুনি হর্ষ হৈয়া রাজা দুর্যোধন।
পাশক সংহতি লৈয়া করিল গমন ॥
যুধিষ্ঠির কাছে গেল অতি তূর্ণ করি।
দেখিয়া বসিতে আজ্ঞা দিলা অধিকারী ॥
দুর্যোধন নতি করি ধর্ম্ম নৃপতিরে।
বাসল হরিষ চিত্তে আসন উপরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি সব মহারথী।
কর্ণ দুঃশাসন আর শকুনি প্রভৃতি ॥
চারি ভ্রাতা সঙ্গে বসি আছে ধর্ম্মরাজে।
হেন কালে দুর্য্যোধন কহে সভা মাঝে ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির আমার বচন।
দ্যূত ক্রীড়া করিবারে কৈল আবাহন ॥
ধন পণ করি চল খেলি পাশা সারি।
ই বলিয়া পুনঃপুনঃ ডাকে দুরাচারী ॥
বুঝিলা কপট কর্ম্ম ধর্ম্ম নৃপমণি।
তথাপি প্রবর্ত্ত হৈলা নিজ ধর্ম্ম জানি।
নানা ধন করি পণ খেলে দুই জনে।
হারে রাজা যুধিষ্ঠির জিনে দুর্য্যোধনে ॥
শুন গো ভারতী মাতা নিবেদন মোর।
অনুক্ষণ রৌক মন পদযুগে তোর ॥
সুসঙ্গ নগরবাসী রাজসিংহ দ্বিজে।
ভারতী মঙ্গল গীত ভণে ভূপালুজে

ত্রিপদী।

নানা জাতি ধন জন, জিনে রাজা দুর্য্যোধন,
ধর্ম্মসুত হারে পুনঃ পুন।
কপট প্রকার খেলে, সর্ব্বস্ব লইল ছলে,
কি বলিব অদৃষ্টের গুণ ॥
রাজ্য ধন দাস দাসী স্বর্ণ রৌপ্য রাশি রাশি
তুরঙ্গম মহিষ কুঞ্জর।
কপট পাশার তরে, ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে হারে
জিনে দুর্যোধন নৃপবর ॥
অন্য কিছু লক্ষ্য নাই, অবশিষ্ট চারি ভাই,
ইহা পণ কৈল ধর্ম্মরাজে।
অনায়াসে চারি বারে, ছল ক্রমে জয় করে,
দুর্যোধন ভূপে সভা মাঝে ॥
পরে বলে পাপমতি, শুন ধর্ম্ম নরপতি,
দ্রৌপদীকে কর রাজা পণ।
এত শুনি সভ্যগণ, সবের বিবশ মন,
হর্ষ চিত্তে হাসে দুর্য্যোধন ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জানি, পণ কৈল নৃপমণি,
ধার্ত্তরাষ্ট্র জিনে কুতুহলে।
প্রেষিয়া অনুজ বারে, আনাইল দ্রৌপদীরে
সভা মধ্যে তিরস্কার বলে ॥
পাপ মতি কুলাঙ্গারে, ডাকি কহে অনুজেরে,
বিবসন করহ ইহাকে।
শুনি বাক্য দুঃশাসনে, অম্বর ধরিয়া টানে,
সভ্যগণ রৈল অধোমুখে ॥
বহু স্তুতি কৈল নারী, শুনি কৃপা করি হরি
বস্ত্ররূপে দেবকী নন্দন।
কৃপান্বিত দয়াময়, যত টানে তত হয়,
ক্লান্ত হৈল বীর দুঃশাসন ॥
সাধু পাণ্ডু পুত্রগণ, পূর্ব্বের স্মরিয়া পণ,
না বলিল সত্যনাশ ভীতে।
তের বর্ষ সংখ্যা করি, পঞ্চ ভাই সঙ্গে নারী,
গেল চলি ঘোর বিপিনেতে ॥
এথা ভূপ দুর্য্যোধন, পরম উল্লাস মন,
অকণ্টকে রাজ্য ভোগ করে।

দরী গিরি বন জল, নানান অগম্য স্থল,
পাণ্ডু পুত্রগণ ভ্রমি ফিরে ॥
ই তীর্থ পায়, তথাতে পাণ্ডব যায়
তপস্বী সমান হৈল বেশ।
পরিধান বৃক্ষ ছাল, শিরে হৈল জটা জাল,
ভ্রমেন বিস্তর পল্লী দেশ ॥
পার্থে কৃপা করি হর, দিলা পাশুপত শর,
পরে পার্থ গেলা ইন্দ্রপুরে।
দৈব যত অস্ত্র ছিল, সাবধানে পড়াইল,
পুত্রস্নেহে দেব পুরন্দরে ॥
যুধিষ্ঠির আদি করি, সঙ্গে সতী কৃষ্ণানারী,
অষ্ট অব্দ অরণ্যে আছিল।
বার বর্ষ বনে গেল, অজ্ঞাত সময় হৈল,
ইহা জানি অর্জ্জুন আসিল ॥
সবে পরামর্শ করি, নানা মতে বেশ ধরি,
ছয় জনে করিল গমন।
অতি সঙ্গোপন মতে, চলিল কানন পথে,
উদ্দেশিয়া বিরাট ভবন ॥
শুন মাতা নারায়ণী, বলি মাতা এই বাণী
তব নিজ গুণে কর দয়া।
ভণে ভূপানুজ দ্বিজে ভারতীর পদাম্বুজ
ভৃত্যজনে দেও পদছায়া॥

ক্রমশঃ।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিধায় গৌড়দেশস্থ ভাষা সমূহের সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

সাংসারিক দ্রব্যের নামোল্লেখ করিতে যে সমস্ত সাজ বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা অন্য ভাষায় প্রযুক্ত হয় কিনা উহা দেখাইবার কিছু আবশ্যকতা নাই। গৌড়ীয় ভাষার ভিতর ঐ শব্দগুলি কি প্রকারে আসিল এবং তাহার প্রকৃতিই বা কি উহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমরা পরম্পরা সম্বন্ধে দেখিতে পাই, প্রাচীন কালে সভ্য শ্রেণীর ভাষা সংস্কৃত। সাধারণ জনের ভাষা প্রাকৃত। ঐ দুয়ের অপভ্রংশে ক্রমশঃ শব্দ সকল রূপান্তরিত হইয়া মৌলিক শব্দের সহিত পৃথকত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। এক্ষণে উহার সকল গুলির মূলান্বেষণ করিয়া প্রকৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি লেখা সহজ ব্যাপার নহে। তবে যাহা চলিত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা সর্ব্ব সাধারণের পরিজ্ঞাত, তাহাই লিখিত হইল। যথা—

সংখ্যা বাচক ও পূরণ বাচক শব্দের অধিকাংশই সংস্কৃতমূলক। তবে যথায় বিভিন্ন হইয়াছে তাহারই গুটি কতক শব্দ দেখান গেল।

পূরণ বাচকের প্রায়ই রূপান্তর হয় না, উহা সংস্কৃত বিভক্তিহীন এই মাত্র। যথা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। তবে মাস গণনায় পহেলা দোশরা প্রভৃতি শব্দ পূরণ বাচক প্রাকৃতের অপভ্রংশ মাত্র।

সংখ্যাবাচক দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, এগার, বারো, তের, চৌদ্দ, পোনের, ষোল, সতের, আঠার, উনিশ, কুড়ি, উনত্রিশ, একত্রিশ, উনচল্লিশ, একচল্লিশ, উনপঞ্চাশ, একান্ন, বায়ান্ন, তিপান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপান্ন সাতান্ন আটান্ন সোত্তর, একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়াত্তর, চুয়াত্তর, পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তর আটাত্তর, উনসোত্তর প্রভৃত। দিঙ্‌মাত্র দেখান গেল।

পরিমাণ বোধক যথা—আঙ্গুল মুটো বিঘত হাত, মুটুম হাত বাহু অথবা বাউ। ইত্যাদি

তুল. দাঁড়ী, নিক্তির পরিমাণ (ওজোন) রতি মাসা তোলা, ছটাক, পোয়া সের, পশুরি বিশে মোন। ইত্যাদি।

মাপ—মুটো, আঁজল, দ্রোণ, আড়ী কাটা পালি ধামা তোল। ইত্যাদি।

ভূমির পরিমাণ সূচক যথা—আড়, দীর্ঘ, কাঠা, বিঘা, নল ছটাক পোয়া ইত্যাদি।

গৃহস্থালীর দ্রব্য—হাঁড়ী কলসী ঘড়া ঘটী বাটি থালা ফেরো, বগুনা, বাটা পিলসুজ হাতা বেড়ী। ইত্যাদি।

লৌহ দ্রব্য—কড়া, গজাল, পেরেক, স্ক্রুপ, কবজা, শিকল হাঁক, হাঁসকল, ঝুমনি, দা, কুড়ুল, খন্তা, সাবল নিড়ানী কোদাল বোঁটি খাঁড়া তলোয়ার শড়কী, করাত, নিন, চিমটা সাঁড়াসি, হাতুড়ী, নেহাই, খাইস রেঁদা, বাটালি, কাস্তে ছুরী, ফাল, ছুঁই বা ছুচ, বিদাকাটি। ইত্যাদি।

কৃষি কর্ম্মের দ্রব্য—লাঙ্গল, জোয়াল, মৈ, বিদা, দড়া, দড়ী রসা রসী। ইত্যাদি।

গাড়ীর দ্রব্য—চাকা, ধুরা, খিল ব নখিল (রন্ধ্র খিল)। নৌকা—হাল মাস্তল দাঁড়, লগী, পাল গুণ, দাঁড়ী, মাঝি, আংসী; নোঙ্গর। ইত্যাদি।

শয্যা সম্বন্ধীয়—শেজ বিছানা বালিশ তোষক লেপ তাকিয়া খাট পালঙ্গ চৌকী তক্তাপোষ পেটরা বাক্স পাল্কী সিন্দুক। ইত্যাদি।

পূজার দ্রব্য—কোষা, কোষি, ঘণ্টা টাট তাম্রকুণ্ড করঙ্গ শাজী ডালা। ইত্যাদি।

ব্যবহারিক দ্রব্য—কড়ী, পয়সা টাকা আধুলী, সিকি, আনি, দুয়ানী, মোহর গিনি, কাগজ, কলম, দোয়াত, শ্লেট, পেন্সিল, কালি। ইত্যাদি।

কাপড়, ধুতি, চাদর, আঙরাখা, পীরান মোজা, গেঞ্জী, কোর্ত্তা, পেণ্টুলেন ইজের চাপকান পাগড়ী জ্যাকেট শ্যামিজ কোট। ইত্যাদি।

ভাত ব্যঞ্জন তরকারী ঝোল ঝাল চড়চড়ী ঘণ্ট ভাজা পান (পর্ণ) গুয়া (গুবাক সুপারি) ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলি লইয়া বঙ্গ ভাষার পুষ্টি হইয়াছে।

গৌড়ীয় ভাষার নামই বঙ্গ ভাষা। বঙ্গভাষা রূপান্তরিত হইয়া মৈথিল উৎকল ও আসামী ভাষায় পৃথক্ আকার ধারণ করিয়াছে। বস্তুতঃ মৌলিকতায় বিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায় না। যদি কেহ এমন বলেন যে ঐ তিন ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া বঙ্গ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তবে তাঁহার ভ্রান্তি নিরাস করিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইল। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, বঙ্গ ভাষা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন এবং সংস্কৃতের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। মৈথিল উৎকল ও আসামী ভাষা ইহার কোনটিই কি শব্দ চাতুর্য্য, কি রস মাধুর্য্য, কি ভাব চমৎকারিত্ব কি ছন্দোবন্ধের বাহুল্য কিংবা বেশ ভূষার সৌন্দর্য্যে ইহার কোনটিতেই সমকক্ষতা দেখাইতে সমর্থ নহে। পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থ ঐ তিন ভাষার আংশিক সামঞ্জস্য দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যথা

সর্ব্বনাম শব্দ ;—

বঙ্গভাষা		আসামী ভাষা
একবচন	বহুবচন	বঙ্গভাষা মত
আমি	আমরা	
তুমি	তোমরা	
তিনি	তাঁহারা	
মৈথিল ভাষা		উৎকল ভাষা
হাম	হামসব	মু, মই = অহ্মমান
তুম	তুমসব	তুম্ভে = তুম্ভমান
সে	অসব	সে = সেমানে

মৈথিল ভাষায় কারকের সমুদায় পদ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ পৃষ্ঠপোষণ মাত্র। তাহা পাঠকের পক্ষেও রুচিকর নহে। আসামী

ভাষার সর্ব্বনাম প্রায় বঙ্গভাষার মত। তবে গ্রাম্য শব্দের সঙ্গেই সমতুল। এখানে প্রথমতঃ আসামী ভাষায় কারক নির্দ্দেশপূর্ব্বক একটি আসামী "পদ" (পয়ার ছন্দ) দেখান যাইতেছে। আসামী ভাষায়, শ্রীমদ্ভাগবতের যে অনুবাদ আছে তাহা হইতেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। যথা—

মহাভাগবত কথা শুনা সর্ব্বজন।
অষ্টম স্কন্ধর সায় বলিক ছলন॥
যার উল কোটি শত পাতক নির্য্যান।
সি সি জনে কৃষ্ণর কথাও পাতে কান॥
ভাগবতে কথা ইটো অমৃত সাক্ষাত।
বামন পুরাণ কিছু মিশ্র দিল তাত॥
দুয়ো কথা পদ নিবন্ধিলো একঠাঁই।
যেন মধু মিশ্রে দুগ্ধ স্বাদ বাঢ়ি যাই॥ (১)
সমরত লোক নিপাতিলা শতক্রতু।
দুনাই উপজিলো মই তোমারে সে হেতু॥ (২)
দানবকুলের তুমি বিনে গতি নাই।
তুমি প্রাণদাতা পিতা মাতা সমুদায়॥ (৩)

যদ্যপি পুরুষোত্তম সমস্ত প্রাণীতে সম তথাপি ভক্ত করে দয়া এড়াঁও দারুণ শোক চাহিবার লাগে মোক, মুইসি তামায় নিজ জায়া॥ (৪)

কশ্যপ স্বামীক তুমি থাকিয়ো উপাসি।
তোমায় গর্ভত মই উপজিবো আসি॥
বলিক ছলিয়া কাঢ়ি লেবোঁ রাজ্যভার।
উপায়ে করিবো মই ইন্দ্রক উদ্ধার॥
কাতো নকহিবা তুমি হেন গোপ্য কথা।
মোর আরাধন একোকালে নোহে বৃথা॥ (৫)

(১) সংখ্যক কবিতায় শুনা বঙ্গভাষায় শুন এই অনুজ্ঞা। "অষ্টম স্কন্ধর কথা" র =সম্বন্ধ জ্ঞাপক বিভক্তির চিহ্ন। "সি সি"= সেই সেই। উল=হইল। ইটো=ইহাতে। তাত=তাতে। (২) দুই সংখ্যক কবিতায় সমরত সমরে তে—"ত" সপ্তমী বিভক্তি জ্ঞাপক চিহ্ন। মোক—আমাকে। মই— আমি। ক=কর্ম্মের চিহ্ন।

(৩) সংখ্যক কবিতা=প্রকৃত বাঙ্গালার সহিত বিভিন্নতা নাই।

(৪) চতুর্থ কবিতায় "চাহিবার লাগে মোক"=আমাকে দেখিতে হয়।

(৫) পঞ্চম কবিতায় স্বামীক=স্বামীকে। উপাসি=উপাসনা কর। কাতো=কাহা-কেও। নকহিবা=না কহিবা। "একো কালে নোহে বৃথা"=কোন কালে বৃথা হয় না।

আসামী ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সঙ্গে গুটিকতক শব্দের পার্থক্য ব্যতীত অন্যরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় না। আমরা যদি প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে কেবল বঙ্গ দেশেই বঙ্গভাষার নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সময়ে সময়ে অবাক হইয়া থাকি। রংপুরের ইতর জাতির কথা বার্ত্তা, বাঁকুড়ার সাধারণ লোকের বাক্যালাপ ও পূর্ব্ববঙ্গের লোক মাত্রের প্রচলিত কথোপকথনের সহিত কি পরস্পরের কথাবার্ত্তার সর্ব্বাবয়ব সাম্য আছে? সামান্য বিভিন্নতা দৃষ্টেই পরস্পরের কথোপকথনের অনৈক্য দেখা যায়। কখনও কখনও উচ্চারণবৈষম্য নিবন্ধন একপ্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আসামী ভাষার সহিত তদ্রূপ পৃথকত্বই অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উৎকল ভাষার সঙ্গেও তদ্রূপ বিভিন্নতা মাত্র। তবে শব্দ রূপ করিতে গেলে কারকের বিভক্তি ও ক্রিয়ার পুরুষগত ও কালবাচকের বিভক্তির রূপের বিভিন্নতা থাকায় ভাষার অর্থগত সামান্য ইতর বিশেষ আছে মাত্র। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই বাঙ্গালা ও উৎকল ভাষার বিভক্তিযুক্ত পদ ও বাক্যের সাম্য কি বৈষম্য তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। উদাহরণ যথা; উড়িয়া ভাষার নীতিকথা হইতে উদ্ধৃত।

১ কথা মৃগ আউ সিংহ।

কোনসি সময়ে গোটিএ মৃগ ব্যাধ ভয়রে পলাই এক গর্ত্ত উদরে প্রবেশ হেলা। তহিঁ উত্তারে গোটাএ সিংহ সেঠারে তাঁহাকু ধরিয়া কলা। তহিঁরে সে মৃগ মরণ সময়বে কহি বাকু লাগিলা। হায় হায় আম্ভর কি দুর্ঘটন হেলা। আম্ভে মনুষ্য ভয়রে পলাই—তাহা চারু অধিক বলবন্ত আউ এক শত্রু হাতরে পড়িলুঁ।

ইহাকু তাৎপর্য্য এহি সাবধান হোই ন চলিলে এমন্ত ঘটে। কি মনুষ্য এক আপদর পলাই তহিঁক অধিক ভয়ানক অন্য আপদরে পড়ে। অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ—

মৃগ আর সিংহ।

কোন সময়ে এক মৃগ ব্যাধভয়ে পলাইয়া এক গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। তথায় এক সিংহ তাহাকে সেইস্থানে ধরিয়া বধ করিল। তথায় সেই মৃগ মরণ সময়ে কহিতে লাগিল, হায় হায় আমার কি দুর্ঘটনা হইল। আমি মনুষ্য ভয়ে পলাইয়া তাহা হইতে অধিক বলবত্তর শত্রুর হাতে পড়িলাম। ইহার তাৎপর্য্য এই, সাবধান হইয়া না চলিলে এরূপ ঘটে। মনুষ্যও কখন কখন একটা আপদ হইতে পলাইতে তদপেক্ষা বলবত্তর আপদে পড়ে।

এখন বাঙ্গালা এবং উৎকল ভাষার কারক ও বিভক্তির তারতম্য দেখ।

উৎকল

	একবচন (০)	বহুবচন (মানে)
১মা	আম্ভে	আম্ভে মানে
২য়া	আম্ভকু	আম্ভমানঙ্কু
৩য়া	আম্ভদ্বারা	আম্ভমানঙ্কদ্বারা

বাঙ্গলা

একবচন (০)	বহুবচন (রা)
আমি	আমরা
আমাকে	আমাদিগকে
আমাদ্বারা	আমাদিগের দ্বারা

	১ বচন	বহুবচন
চতুর্থী	আম্ভকু	আম্ভমানঙ্কু
পঞ্চমী	আম্ভঠারু	আম্ভমানঙ্কঠারু
ষষ্ঠী	আম্ভর	আম্ভমানঙ্কর
সপ্তমী	আম্ভঠারে	আম্ভমানঙ্কঠারে

১ বচন	বহুবচন
আমায় বা আমাকে	আমাদিগকে
আমা হইতে	আমাদিগের হইতে
আমার	আমাদিগের
আমাতে	আমাদিগেতে

যুষ্মদ্ শব্দ যথা

১মা	তুম্ভ	তুম্ভেমানে
২য়া	তুম্ভকু	তুম্ভমানঙ্কু
৩য়া	তুম্ভদ্বারা	তুম্ভমানঙ্কদ্বারা
৪র্থী	তুম্ভকু	তুম্ভমানঙ্কু
৫মী	তুম্ভঠারু	তুম্ভমানঙ্কঠারু
৬ষ্ঠী	তুম্ভর	তুম্ভমানঙ্কর
৭মী	তুম্ভঠারে	তুম্ভমানঙ্কঠারে

তুমি	তোমরা
তোমাকে	তোমাদিগকে
তোমাদ্বারা	তোমাদিগের দ্বারা
তোমায় বা তোমাকে	তোমাদিগকে
তোমা হইতে	তোমাদিগ হইতে
তোমার	তোমাদিগের
তোমাতে	তোমাদিগেতে

উৎকল ভাষায় যদ্ শব্দে যে যাহা প্রয়োগে বিভক্তির চিহ্ন যোগ করিলে কিপ্রকার রূপ হয় দেখ।

উৎকল।

	একবচন	বহুবচন
১মা	যে	যেমানে
২য়া	যাহাকু, যাকু	যেমানঙ্কু
৩য়া	যাহাদ্বারা	যউমানঙ্ক দ্বারা
৪র্থী	যাহাকু	যেউঁমানঙ্কু
৫মী	যাহাঠারু	যেউঁমানঙ্ক ঠারু
৬ষ্ঠী	যাহার	যেউমানঙ্ক ঠার
৭মী	যাহা ঠারে	যেউমানঙ্ক ঠারে

বাঙ্গালা।

একবচন	বহুবচন
যে, [illegible], যাহা	যাহারা
যাহাকে	যাহাদিগকে
যাহাদ্বারা	যাহাদিগের দ্বারা
যাহাকে	যাহাদিগকে
যাহা হইতে	যাহাদিগ হইতে
যাহার	যাহাদিগের
যাহাতে যাতে	যাহাদিগতে

তদ্‌শব্দের রূপ দেখ।

	১ বচন	বহুবচন
১মা	সে	সেমানে
২য়া	তাহাকু	সেমানঙ্কু
৩য়া	তাহাদ্বারা	সেমানঙ্ক দ্বারা
৪র্থী	তাহাকু	সেমানঙ্কু
৫মী	তাহা ঠারু	সেমানঙ্কঠারু
৬ষ্ঠী	তাহার	সেমানঙ্কর
৭মী	তাহা ঠারে	সেমানঙ্ক ঠারে

১ বচন	বহুচন
তিনি	তাঁহারা, তাহারা
তাহাকে	তাহাদিগকে
তাহাদ্বারা	তাহাদিগের দ্বারা
তাহাকে	তাহাদিগকে
তাহা হইতে	তাহাদিগ হইতে
তাহার	তাহাদিগের
তাহাতে	তাহাদিগতে

বঙ্গভাষার সঙ্গে উৎকল ভাষার যদ্‌ ও তদ্‌ শব্দের বিভিন্নতা কেবল বিভক্তির প্রত্যয়ের আকারগত পার্থক্য ব্যতীত আর কিছুই অনুভব হয় না।

উৎকল

ইদম্‌	শব্দে	এ	এহি
কিম্‌	শব্দে	কে	কেহ
প্রশ্ন	বোধক	কিস,	কি কিণ

বঙ্গ

এ এই

কে কেহ

কি, কোন, কে, কেন

ইদম্‌ ও কিম্‌ শব্দের প্রয়োগ প্রায় উভয় ভাষায় একপ্রকার। অন্যান্য শব্দের বিভিন্নতা প্রায় দেখা যায় না। তবে রাজা পদে রজা বলিয়া থাকে। বঙ্গ ভাষায় ক্রিয়া প্রকরণের বিভক্তিগত প্রত্যয়ের আকারের সঙ্গে উৎকল ভাষার কি তারতম্য ও পার্থক্য আছে তাহার বিচার করিলে বোধ হইবে বঙ্গ ভাষার রচনার পারিপাট্য অতি মনোহর।

বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়া প্রণালী

	বর্ত্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
১ম পুরুষ	ইতেছেন	ইলেন	ইবেন
মধ্যম পুরুষ	ইতেছ	ইলে	ইবে
উত্তম পুরুষ	ইতেছি	ইলাম	ইব

উৎকল ভাষার ক্রিয়া প্রণালী

বর্ত্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
উথছ, উছ	ইলা ইথিলা উথিল	ইব
উথছ উছ	ইল ইথিল উথিল	ইব
উথছুঁ উঁছু	ইলু ইথিলু উথিলু	ইবুঁ

এখন দেখা গেল সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় ও অস্‌ ধাতুর রূপান্তর ভূ এবং অস্‌ ধাতু মিলিয়া হইয়াছিল ক্রিয়া নিষ্পন্ন বলিতে হইবে। ভবিষ্যৎ অর্থে তব্যের ইব বঙ্গ ভাষায় প্রয়োগ হয়। মধ্যম পুরুষে ইতেছ ইয়াছ উত্তম পুরুষে থ ইলে ইয়াছিলে ইতেছিলে। ভবিষ্যৎ তিনি হইবেন তুমি হইবে আমি হইব। এখন দেখা গেল, যে উৎকল ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়া নিষ্পাদন প্রণালী একই প্রকার।

পাঠকগণ একটী উদাহরণ দেখিলেই অনুভব করিতে পারিবেন। যথা—উৎকল ভাষা

১। কোনসি স্ত্রী গোটাএ হংসী পোষে (১) [illegible]ত কাল (১) সেই হংসী প্রতি-

দিন এক এক রূপার ডিম্ব প্রসব করে (২) (ঐ) তহিঁবে সে স্ত্রী মনে মনে কহিলা আত্ত যেবে এ হংসীর আহার বড়ই দিবু (৩) তেবে প্রতিদিন দুই দুই ডিম্ব লেখাএ অবা পাড়িব (৪) (ভবিষ্যৎ) এহি আশারে সে তাহাকু পূর্ব্ব ঠারু অধিক আহার দিবাকু লাগিলা মাত্র যথেচ্ছা ভোজনরে হংসী পেট কাটীবাকু সে মরি গেলা।

এইত উৎকল ভাষা। ইহার বঙ্গানুবাদ করিলে অতি সামান্য ভাবেই বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। মাত্র এই প্রস্তাব মধ্যে কোনসির পরিবর্ত্তে কোন। গোটাএ এক। তাইরে—তাহাতে। আত্তে—আমি। যেবে —যবে। তেবে—তখন। অবা—অথবা। তাহাকু—তাহাকে। পূর্ব্বঠারু—পূর্ব্ব পেক্ষা। দিবাকু—দেওয়াতে। গলা—গেল। এইরূপ অর্থ লক্ষিত হইবে।

এক্ষণে আসামী ভাষা হইতে যে সকল ক্রিয়ার বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে মিল নাই তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে... দেখিলে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিবেন যে, বঙ্গভাষাই পূর্ব্বাপর কাল হইতে আদি ভাষা জগৎপ্রসূতি সংস্কৃতের প্রধান অপত্য। যদিও সংস্কৃত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জননী নহে, তথাপি তাহার স্তন্যপানে বিশিষ্ট রূপে সংবর্দ্ধিত লালিত পালিত এবং সৌন্দর্য্য-ভূয়িষ্ঠ। অপিচ সর্ব্বপ্রকার বচন রচন চাতুর্য্য মধুর ভাবসম্পন্ন। প্রাকৃত ইহার জননী বটে, কিন্তু প্রসব করিয়াই ইহাকে নিজ মাতৃক্রোড়ে রক্ষা করেন ইহা সকলেই অনু-ভব করিতে পারেন।

এখন মৈথিল ভাষার ব্যাকরণ দেখ। প্রায় বাঙ্গালার সঙ্গে সমানই দণ্ডায়মান হইবে। উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।

রায় মনোহরের জ্ঞান।

রায় মনোহর জাতিতে হিন্দু এবং কোচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে আমার পিতা ইহাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। ইহাঁরা পরস্পর পারস্য ভাষায় কথোপকথন করিতেন। রায় মনোহর অশেষ প্রকার জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রাজসরকারে কার্য্য করিতে-ছেন। আরবী ভাষায় তাঁহার অনন্যসাধারণ লিপিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তাঁহার বংশে উন্নত কবি-কল্পনার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না, তথাপি আরবী শ্লোকের অনুবাদ হইতে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

পহর খাঁ ও তাঁহার ভগ্নীর দুরদৃষ্ট।

রাজা মানসিংহের পিতৃব্য পহর খাঁ দুই সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব করিতেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিলেও তিনি যুদ্ধবিদ্যা ও রণকৌশলে নিতান্ত অপারদর্শী ছিলেন না। তাঁহার এক ভগ্নী অপরূপ লাবণ্যবতী ছিলেন। আমার পিতার অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াও তাঁহার অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন হয় নাই। ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের কারণ নাই, কারণ প্রবাদ আছে, "অঙ্গসৌষ্ঠবহীনা কুরূপাদিগের অদৃষ্টই সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে।" এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিবৈচিত্রের মধ্যে আমি ইহাই

অবলোকন করিয়া আসিতেছি যে, যোগ্য স্থানে যোগ্য বস্তুর সমাবেশ কচিৎ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃত ধার্ম্মিক ও দীনহৃদয় ব্যক্তিগণ অভাবের তীব্র যাতনায় হাহাকার করে, অথচ বাহ্যভাবে ধর্ম্মাচরণশীল ব্যক্তিগণ ক্রমাগতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

দৌলত খাঁর উৎকোচগ্রাহিতা।

আমার পিতার অন্তঃপুররক্ষক খোজাদিগের মধ্যে দৌলত খাঁই প্রধান ছিল। এই লোকটী যদিও শেষে নাজির-উদ্-দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হয়, তথাপি উৎকোচ গ্রহণে এবং কর্ত্তব্য অবহেলায় ইহার মত আর একটী লোক তৎকালে দেখা যাইত না। মৃত্যুকালে তাহার ভাণ্ডারে নগদ দশ কোটী আসরফি এবং তদ্ব্যতীত তিন কোটী আসরফি মূল্যের মণিমুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তর, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, চীনা বাসন এবং পিত্তল ও তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সঞ্চিত দেখিতে পাওয়া গেল। এ সমস্তই আমার পিতার রাজভাণ্ডারে আনীত হইয়াছিল।

জাফর খাঁ ও খাঁ-ই-আজিম। খাঁ-ই-আজিমের সূক্ষ্ম-দর্শন ও অপূর্ব্ব ধারণা-শক্তি।

জিন খাঁ কোকার পুত্র জাফের খাঁর সম্বন্ধে আমার পিতা অনেক প্রকারে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাকে ও খাঁ-ই-আজিমকে তিনি পুত্রবৎ দেখিতেন, কিন্তু শেষোক্ত খাঁ-ই-আজিমই তাঁহার চক্ষে অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাফের খাঁ একজন প্রকৃত পক্ষে বিচক্ষণ ব্যক্তি; তাঁহার উৎসাহ ও কর্ম্মকুশলতা অবলোকন করিয়া আমার মনে হয় যে, তাঁহার সম্বন্ধে আমি যতদূর আশা করিতে পারি, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। তাঁহার পিতার সূক্ষ্মদর্শিতা তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অনন্যসাধারণ দর্শন ও ধারণাশক্তি এত প্রখর যে, শূন্যমার্গে গমনশীল একদল পারাবত দেখিয়া তিনি নির্ভুলভাবে তাহাদিগের সংখ্যা বলিয়া দিতে পারেন। হিন্দু-সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা বিদ্যমান আছে; যুদ্ধবিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

দস্যুদমন।

এই সময়ে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে আমি ফেঁদিয়া নামে দস্যুদল দমন করিয়াছিলাম। ইহারা অনেক কাল ধরিয়া আগ্রার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পথিকদিগের উপর অত্যাচার করিত। ইহাদিগকে ধৃত করিয়া আমি হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।

রায় দুর্গার বীরত্ব।

আমার সিংহাসনারোহণ কালে রায় দুর্গা সাত শত সেনার অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অসামান্য সাহসিকতাগুণে তিনি একাধিক যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়-মাল্য লাভ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বয়স কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া আমি তাঁহাকে সহস্র সেনার অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করি।

মোকাম খাঁর প্রকাশ্য রাজ-গৌরবলাভ।

সুজায়েত খাঁর পুত্র মোকাম খাঁকে সপ্ত শত হইতে এক সহস্র সাদী-সৈন্যের অধিনায়ক করিয়াছিলাম। সুজায়েত খাঁ আমার পিতার সময়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওমরাহ স্বরূপে পরিগণিত ছিলেন। আমার বেশ

স্মরণ হইতেছে, বাল্যকালে তাঁহার অধীনে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য আমি আমার পিতার নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাকে পাঁচ সহস্র সৈন্যের নায়ক এবং ওমরাহ পদ প্রদান করিয়াছিলাম। এই রাজসম্মান-প্রদান-কার্য্য তৎকালে প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল।

রূপখোঁয়াসের ক্ষমালাভ।

রূপখোয়াস নামক একজন সামান্য ব্যক্তি তৎকালে আমার পিতার এক শত কুড়ি জন ক্রীতদাসকে প্রলোভন দ্বারা কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া তাহাদের সঙ্গে নিজেও পলায়ন করে। হিম্মতপুর বিজয়ের কালে তাহাকে পুনরায় ধৃত করা হয়। এ ব্যক্তি অসামান্য সাহসী ও ভয়ানক মদ্যপায়ী ছিল এবং সমস্ত জীবনে এক দিনের জন্যও নমাজ অথবা রমজানের উপবাস রক্ষা করে নাই। এই সকল দোষ সত্ত্বেও আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিলাম।

সাবাজখাঁর অধোগতি।

সাবাজ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বাজার হইতে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। তাহাকে কেহই জানিত শুনিত না; তাহার সর্ব্ববিষয়ে দক্ষতা ছিল। রুচিবিগর্হিত কথাবার্ত্তায় সে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, আমার পিতাকেও অনেক সময়ে গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমার পিতা তাহাকে পাঁচ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক স্বরূপ উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন। সে তুর্কী ভাষা বুঝিত এবং সামরিক রীতি-নীতির প্রধান প্রধান সূত্রগুলিও পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিল। পরন্তু যুদ্ধ কালে শত্রুর সম্মুখীন হইলে তাহার চিত্ত বিকল হইয়া পড়িত। এই জন্য আমি তাহাকে পঞ্চ সহস্রের অধিনায়কত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দুইশত সেনার নায়ক স্বরূপে প্রধান শীকারীর পদ প্রদান করিলাম।

মনসবদার হইতেও হিদি সৈন্যের পদগৌরব বৃদ্ধি। অতিরিক্ত হিদিসৈন্য।

অতঃপর পাঁচশত সৈন্যের অধিনায়ক মনসব্দার হইতে চারিটী মাত্র অশ্বের অধিকারী "ওহিদী" পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কার্য্যকুশলতা ও পদগৌরবানুযায়ী বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলাম। আমি আরও আদেশ করিয়াছিলাম যে, রাজসভার বিধানানুসারে রাত্রিকালে প্রহরা দেওয়ার জন্য ত্রিশ সহস্র "ওহিদি" সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে।

মির্জা-সা-রকের সরলতা ও পদগৌরব লাভ।

মির্জ্জা সুলিমানের পৌত্র, বাদাক্সানের যুবরাজ, মির্জা সা রক্ আমার আত্মীয় ছিলেন। আমার পিতার সময়ে ইনি পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমার সিংহাসন আরোহণের পর, নিয়মিত প্রথার কিয়দংশ ব্যতিক্রম করিয়া আমি তাহাকে সপ্ত সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলাম। কারণ রাজবিধানানুসারে কোন তুরকীবাসীই পাঁচ সহস্রাধিক সৈন্যের অধিনায়ক-পদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। সা-রকের মন অত্যধিক সরলতায় পরিপূর্ণ ছিল। আমার পিতা ইঁহাকে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, এমন কি পুত্রদিগের সহিত তাঁহার সম্মুখে একাসনে বসিবার অনুমতি প্রদান করিতেন। তাতারজাতির স্বভাবসুলভ সরলতা তাঁহার মধ্যে এত অধিকপরিমাণে

বিদ্যমান ছিল যে, একাদিক্রমে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিবার ফলেও তিনি এদেশের একটী কথাও উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। বাদাকৃশান দেশীয় লোক বুদ্ধি বৃত্তিতে নিতান্ত অপকৃষ্ট নহে; কিন্তু সকল জাতি অপেক্ষা ইহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্তু বাদাকৃসান-বাসীর সহিত তাহার এত অল্পই সাদৃশ্য ছিল যে, সা-রক্‌কে কেহ বাদাকৃসাহ বলিতে পারিত না।

আল্লাউদ্দীনের চক্রান্ত ও কাবুলের বিদ্রোহ।

এই প্রকার অযাচিত প্রসাদ লাভ করিয়াও যুবক সা-রক্ বাদাক্‌সানবাসী মির আল্লা-উদ্দীনের প্ররোচনায় আমার পিতার অপ্রীতি-ভাজন হইলেন। ফলে কাবুলনিবাসী খোজা আবদুল্লার অধীনে তাহাকে কাবুলে প্রেরণ করিবার আদেশ প্রদান করা হইল। এই সময়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় চারি শত কাবুলীকে আফগানিস্থানের প্রধান নগর কাবুলে বন্দী করা হয়। খোজা আবদুল্লার নিকট তাহাদিগের সম্বন্ধে এই আদেশ প্রদান করা হয় যে, নিয়মিত শপথ গ্রহণ ও অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া রাজধানীতে আনয়ন করিতে হইবে। আবদুল্লা কাবুল পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আলাউদ্দীন তৎস্থানবাসী করদ-মিত্র রাজগণকে সংবাদ প্রদান করিল যে, বাদসাহ এই বন্দীদিগকে যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধাশ্ব এবং এমন কি খেলাত উপঢৌকন দিয়া তাহার সহিত রাজধানীতে পাঠাইয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এতাদৃশ অসত্যসন্ধ ব্যবহার ও চক্রান্তের কিছুমাত্র রহস্যভেদ করিতে না পারিয়া কাবুলের শাসনকর্ত্তা নিঃসন্দেহচিত্তে আদেশ প্রতিপালন করিলেন। যখন সেই চারি শত বন্দীকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ ও খেলাত প্রদান পূর্ব্বক বিদায় প্রদান করা হইল, তখন তাহারা বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করিল। অনতিবিলম্বে বিশ্বাসঘাতক আল্লা-উদ্দীনের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা নগর আক্রমণ করিল এবং যথেচ্ছভাবে বাজার ও দোকান লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যতদূর সম্ভব লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত করিয়া তাহারা বাদাকৃসানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আল্লাউদ্দীনের ক্ষমালাভ ও পদগৌরব-বৃদ্ধি।

দুই সহস্র সেনার অধিনায়কত্ব লাভ করিবার কয়েক বৎসর পরেই বিনা কারণে নীচতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আলা-উদ্দীন এইরূপ অসম্ভব রাজদ্রোহকর ব্যাপারের অভিনয় করিল। অতঃপর সর্ব্ব প্রকার দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পিতার নিকট এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন প্রদান করিয়া সে কিরূপে আমার নিকট মুখ দেখাইতে আসিয়াছে। উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার মুখচ্ছায়ায় এরূপ একটী দীনতা ও আত্মানুশোচনার ভাব অবলোকন করিলাম যে, তাহার দুঃখে দয়ার্দ্র না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে আমার পিতার সময়ের পদগৌরব পুনরায় প্রদান করিলাম এবং দ্বিসহস্রের স্থলে সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র সেনার অধিনায়কত্বে উন্নীত করিলাম। আমীর উল্ উমরা আমার এই কার্য্যের সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, লোকটী যেরূপ সাহসী তাহাতে এই একটী মাত্র অপরাধের জন্য তাহাকে বিতাড়িত করা নিরাপদ নহে;

এতদ্ব্যতীত ইতঃপূর্ব্বেই তাহাকে অপরাধের অনুরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছে।

সাদি সৈনের কলঙ্ক।

আমার আত্মজীবনচরিত লিখিতে লিখিতে মনে হইতেছে যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেও রাজকীয় সমর-বিভাগে ন্যূনকল্পে দেড় লক্ষ সাদি সৈন্য আছে; ইহাদিগের প্রায় সকলেই এক হইতে শতসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের নায়কতা করিয়া থাকে। সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে যে, যুদ্ধকালে যতই সাহসিকতা প্রদর্শন করুক না কেন, অতি সামান্য কারণেই ইহারা প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, ইহাদিগের এ কলঙ্ক অপনোদিত হইবার নহে।

মোকাবের খাঁ। রাজভ্রাতা দানিয়েলের পরিত্যক্ত সম্পত্তিলাভ।

সিংহাসনারোহণের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সেখ হোসেন বুলনায়কে আমি মোকাবের খাঁ আখ্যা প্রদান করিয়াছিলাম। আমার পরলোকগত ভ্রাতা দানিয়েলের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কন্যাদিগকে কঙ্কনের শিবির হইতে আনয়ন করিবার জন্য যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সেখ হোসেনকে তত্রত্য রাজমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য মনে হইয়াছিল। সে এরূপ অসামান্য দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল যে, আমি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আমার পরলোকগত ভ্রাতার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণও নিতান্ত কম নহে; নগদ দুই কোটী এবং অলঙ্কারাদিতে প্রায় পাঁচ কোটী আসরফি। এ সমস্তই সেই সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহার হস্তিশালায় বৃহদাকারের দুই শত হস্তী এবং আস্তাবলে দুই সহস্র শ্রেষ্ঠ পারস্যদেশীয় ঘোটক প্রাপ্ত হওয়ায়। মোকাবের খাঁর মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ বিদ্যমান ছিল, ন্যায়ের অনুরোধে বলিতে হইবে যে, তৎকালীন অনেক নরপতিও সেই সকল সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। অতঃপর আমি তাহাকে হীরকখচিত সম্‌সের (তরবারি), বহুমূল্য আস্তরণে সুসজ্জিত যুদ্ধাশ্ব, মণিমুক্তাখচিত কিরীট, প্রচুর পরিমাণ খেলাত এবং একটী পোষা হস্তী পুরস্কারস্বরূপে প্রদান করিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণাপূর্ব্বক তাঁহাকে পাঁচ সহস্র সাদি সৈন্যের অধিনায়কত্ব এবং গুজরাট প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিয়াছিলাম।

অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক নকীব খাঁ।

কজ্‌বিনের সৈয়দবংশাবতংশ নকীব খাঁকে আমি দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। আমার পিতার সময়ে তাহার এই নামকরণ হইয়াছিল; ইতঃপূর্ব্বে তিনি এনায়েত-উল-রেমলি বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। ইতিহাসে তাহার এরূপ অসামান্য অধিকার ও অভিজ্ঞতা ছিল যে, অতীতের সম্বন্ধে তাহাকে যে কোন ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইত, তিনি তদ্দণ্ডেই তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন। প্রকৃত পক্ষে তাহার স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রখর ছিল। নকীব খাঁর সমতুল্য ঐতিহাসিক পৃথিবীর আর কোন রাজার রাজসভায় যে নাই, ইহা বেশ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। বাল্যকালে যে আমি এমন একজন উপযুক্ত ব্যক্তির অধীনে কিছুকাল শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, ইহা আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

ভগবান্ দাসের তিন পুত্রকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ।

সাবান মাসের সপ্তম দিবসে রাজা মানসিংহের পিতৃব্য ভগবান্দাসের তিন পুত্র রামজি, বুচারাম ও শ্যাম তাহাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। তাহারা যে নারকীয় কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাদিগকে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিয়া নরকে প্রেরণ করিলাম। ইহাদিগের মধ্যে রামজীই বিশেষভাবে অলস ও বাচাল বলিয়া পরিচিত ছিল। যখন ইহার অন্যতম আত্মীয় মানসিংহের পুত্র পহর্ সিং এলাহাবাদে দুই সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন এই হতভাগ্যই তাহাকে নিষ্ঠুর পাপাচরণে উত্তেজিত করিতে লাগিল; ফলে পহর সিংহকে বিশেষভাবে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, রামজী তাহার দুষ্কার্য্যের সূচনাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তাহার পাপানুষ্ঠানের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

বিদ্রোহাশঙ্কায় এলিচ্রাম ধৃত।

ভগবান্ দাসের তিন পুত্রের প্রাণদণ্ডের পর উক্ত বংশের এলিচ্রাম কতকটা সংশয় ও আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল। এই ব্যক্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করিবার জন্য আমি বঙ্গদেশের রাজস্ব-সংগ্রাহক মহম্মদ আমিনের প্রতি আদেশ প্রদান করিলাম। এ দিকে মহম্মদ আমির পিতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হইল, যে এলিচ্রাম বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেই তাহাকে যেন মানসিংহের হস্তে অর্পণ করা হয়। সুকৌশলে ধৃত করিয়া হস্তপদ বদ্ধ পূর্ব্বক একখানি গোযান সাহায্যে মহম্মদ আমিন তাহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে আগমন করিতে লাগিলেন।

এলিচ্রামের পলায়ন ও গ্রেপ্তার।

একদিন দ্বিপ্রহর রজনীতে সেরাজুল ও গাজীপুরের মধ্যস্থলে যখন সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, তখন হস্তপদবদ্ধ এলিচ্রাম কোনও প্রকারে মুক্ত হইয়া রাণার সহিত যোগদানেচ্ছায় পলায়ন করিল। পলায়নকালে সামান্য ভাবে গোলযোগ হওয়ায় মহম্মদ আমিনের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি অনতিবিলম্বে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার পদাঙ্কানুসরণ করিলেন। যমুনার তীরদেশে পৌঁছিয়া এলিচ্রাম দেখিল পার হইবার উপযোগী কোন তরণী ঘাটে সংলগ্ন নাই। সে তখন নিরুপায় হইয়া যমুনা বক্ষে ঝম্প প্রদান করিল। অপর তীরে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় কতিপয় ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং সুদৃঢ় রজ্জুতে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া তাহাকে আহম্মদের নিকট আনয়ন করিল।

এলিচ্রামের মুক্তিকামনায় দিলওয়ার খাঁ ও শান্ওয়াজি খাঁর অভ্যুত্থান।

এলিচ্রামকে পুনরায় ধৃত করিয়া মহম্মদ আমিন্ আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, এলিচ্রাম মুক্ত হইলে সম্ভবতঃ রাণার সহিত যোগদান করিতে পারে। রাণার সহিত যোগদান করিলে এলিচ্রাম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবে এই আশঙ্কায় তাহার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য মহম্মদ আমিন তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। উত্তরে আমি বলিয়া পাঠাইলাম যে, রাজপুতবংশের মধ্যে যদি কেহ তাহার জন্য প্রতিভূ হইতে পারেন, তবে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি ও জায়গীর প্রদান করিতে পারি। তাহার উদ্দাম

ও অসংযত প্রকৃতির কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল; বোধ হয় এই কারণেই সাহস করিয়া কেহ তাহার প্রতিভূ হইতে স্বীকার করিল না। যদি তাহাকে মুক্তি প্রদান করা যায়, তবে অগণিত পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ রাজপুত্জাতির সহিত মিলিত হইয়া সে হয়ত এমন গণ্ডগোল উপস্থিত করিবে যে, তখন সব দিক রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, আমীর-উল-উমরাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, হয় তাহাকে কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী স্বরূপে প্রেরণ করিতে হইবে; এতদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা বিদ্যমান নাই। এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি, এমন সময়ে সংবাদ পাইলাম যে, দিলওয়ার খাঁ (ইহার পূর্ব্বের নাম ইব্রাহিম গাজুর) ও শানওয়াজ খাঁ (ইহার পূর্ব্বের নাম হাসাম মঙ্গলি) উভয়ে তাহাদিগের স্ব স্ব অনুচরদিগকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিয়া মহম্মদ আমিনের হস্ত হইতে এলিচ্রামের উদ্ধারসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে।

যুদ্ধারম্ভ ও আমিন মহম্মদের পরাজয়।

এলিচ্রামের মুক্তি।

এই সকল গণ্ডগোলের মধ্যে আমি আমার শরীররক্ষক সৈন্য ব্যতীত আরও চারি সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই সহস্র গোলন্দাজ সৈন্য, সকল সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিলাম। আমার নিজের জীবন বিপদাপন্ন করিবার জন্য যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, তাহা হইলে হিন্দু অথবা মুসলমান যাহাই হউক না কেন, ভীষণভাবে তাহার উপর আপতিত [illegible] হইবে এবং এলিচ্রামকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে সৈন্যসমূহের উপর এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। মহম্মদ আমিনকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, হৃদয়ে শেষ শোণিত-বিন্দু থাকিতে সে যেন এলিচ্রামকে হস্ত-চ্যুত হইতে না দেয়। আদেশ প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমির-উল-উমরা আমাকে গোপনে সংবাদ প্রদান করিলেন যে, আমিন মহম্মদ পরাজিত হইয়া ঝিল অথবা হ্রদের চতুর্দ্দিকস্থ তৃণক্ষেত্রে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং এলিচরাম মুক্তিলাভ করিয়াছে। তিনি বলিলেন যে, নওরেজ্ খাঁ ঘটনার অব্যবহিত পরেই এই সংবাদ বহন করিয়া আসিয়াছে।

আমীর-উল-উমরা ও বক্সীকে সাহায্যার্থ প্রেরণ।

অশান্তি ও কোলাহলের বেগ অপেক্ষাকৃত ভীষণভাব ধারণ করিয়া আগ্রার রাজ-প্রাসাদের অভিমুখীন হইতে লাগিল দেখিয়া আমি প্রধান অমাত্যকে বলিলাম, "ব্যাপার যেরূপ ঘনীভূত হইয়াছে, তাহাতে আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। আপনার নেতৃত্বাধীনে যে সকল সৈন্য আছে, তাহাদিগকে সংগৃহীত ও সুসজ্জিত করিয়া দুষ্কৃতকারীদিগকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদানে অগ্রসর হউন।" আমার এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমির-উল-উমরা তৎক্ষণাৎ শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। অতঃপর বক্সী সেখ ফরিদকে আহ্বান করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম যে, বিদ্রোহিদল অবিলম্বে পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুতজাতির সহিত মিলিত হইবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ফলে আমাদের অবস্থা অধিকতর

সঙ্কটাপন্ন হইবে। বক্‌সী অতঃপর তাহার অনুচরবর্গকে সঙ্গে করিয়া আমির-উল-উ[illegible]ার্থে অগ্রসর হইলেন।

যুদ্ধের ভীষণতা ও অতিরিক্ত তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ।

বক্‌সী বিদায় গ্রহণ করিবার পর যুদ্ধ-কোলাহল অধিকতর ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া আমার কর্ণে পৌঁছিতে লাগিল। আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া উচ্চ প্রাসাদ-চূড়ে আরোহণপূর্ব্বক অবলোকন করিলাম যে, দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। ন্যূন পক্ষে বিংশ সহস্র রাজপুত পদাতিক সৈন্য বিদ্রোহি-দলে যোগদানপূর্ব্বক তরবারি ও ছুরিকা হস্তে আমীর-উল-উমরার সৈন্যো-পরি আপতিত হইয়াছে। আমির-উল-[illegible] পূর্ব্বক বিপক্ষ সৈন্যের গতিরোধ করিতে-ছেন। কুতুব খাঁ নামক তাহার একজন সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সাহসী কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য অনেক সাহসী সৈনিক পুরুষ আমার চক্ষের সম্মুখে বিপক্ষের তরবারী-আঘাতে নিহত এবং এতদ্ব্যতীত অনেকেই আহত হইলেন। কুতুব খাঁর সাহায্যের জন্য দিল ওয়ার খাঁ তাহার অনুচরবর্গের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন; তিনি ও তাহার অনুচরবর্গের একজনও অবশিষ্ট রহিল না। অতঃপর আমির-উল-উমরার সাহায্যের জন্য আমি যে তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলাম, তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমির-উল-উমরা ভীষণভাবে শত্রুসৈন্যো-পরি আপতিত হইলেন এবং বহুসংখ্যক রাজপুত তরবারির মুখে উৎকীর্ণ হইয়া

ক্রমশঃ।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

১১

সেই ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘের আকার ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আকাশে আরও মেঘসকল উদিত হইল। তাহারা দিগন্ত-প্রান্ত চুম্বন করিয়া, বনমধ্যে করি-যূথের ন্যায়, নীল গগন মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিল। তাহাদের কৃষ্ণচ্ছায়া মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রভাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের কৃষ্ণমূর্ত্তি গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া রজত তরঙ্গসকলকে মলিন করিয়া দিল। পৃথিবীর উপর স্বর্গের যে শুভদৃষ্টি অহরহ বর্ষিত হইতেছিল, তাহাদের বিকট ছায়া, তাহাও যেন আচ্ছা-দিত করিয়া ফেলিল। তাহাদের ধূম্র বক্ষ, মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া, বজ্রাগ্নি উদ্গীরণ করিল। বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পর্জ্জন্য-দেব সুনীল যোদ্ধৃবেশে সম্যক্ সুসজ্জিত হইয়া অসংখ্য নারাচরাশির ন্যায় তীব্র জলধারা বর্ষণ করিয়া মেদিনীর শ্যাম মেদুর বক্ষঃ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন। কেবল মাত্র বৃষ্টিপাত নহে।

তাহার সহিত প্রবলবেগে ঝড় বহিল। বৃক্ষসকলকে বিতাড়িত করিয়া, গঙ্গাতরঙ্গ-সকলকে বিক্ষুব্ধ করিয়া, পল্লীর শ্যামল শ্রী বিদীর্ণ করিয়া, প্রভঞ্জন-দেবতা অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলেন। গদাধরের মাতা পুত্রের জন্য পরিচ্ছন্ন পাত্রে যে সকল শোভন সুস্বাদু ব্যঞ্জন সজ্জিত করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন, পবনসঞ্চালিত ধূলিতে, বৃক্ষবিচ্যুত পত্রখণ্ডে তাহা প্লাবিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ মধুসূদন গঙ্গাতীরে গদাধরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া যে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহাও মহাশব্দে উন্মূলিত হইয়া তট ভূমিতে শয়ন করিল।

মধুসূদন গদাধরকে না লইয়া গৃহে ফিরিতে পারেন না, এজন্য এ পর্য্যন্ত তাঁহার আহার হয় নাই। তা' না হউক। তিনি সেই রঙ্গিন গামছার উষ্ণীষ মাথায় বাঁধিয়া, অন্য এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া, বৃক্ষবিধৌত বৃষ্টিজলে স্নাত হইতে লাগিলেন।

হায়! এই দুর্দিনে, দুর্যোগে কোথায় গদাধর!

মধুসূদন ভাবিলেন, "নিশ্চিত গদাধরের নৌকা ভাগীরথীর কোন নিরাপদ্ নিভৃত উপকূলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে; দুর্যোগের অবসানে সে নির্ব্বিঘ্নে বাটী আসিয়া পৌঁছিবে।"

কিন্তু সে ত আসিল না!

বৃষ্টিপাত বন্ধ হইল। বায়ুর প্রবলতা মন্দীভূত হইল। পল্লীর বিদীর্ণ শ্যামল শ্রী আবার প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হইল। মধুসূদনের বৃষ্টিজলসিক্ত বসনখানি অঙ্গেই বিশুষ্ক হইল। কিন্তু গদাধর ত আসিল না!

কোথায় সে?

গঙ্গা! মা আমার! তোমার করুণ বুকে থাকিয়াও কি গদাধর নিরাপদ্ নহে? —মাতার বক্ষঃ কি পুত্রকে সমস্ত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে?

আমরা পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, মধুসূদন গদাইকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি তাহার শাসন জন্য কখনও তাহাকে সামান্য প্রহার করিতে পারেন নাই। কখনও তাহার প্রতি একটি দুর্ব্বচন প্রয়োগ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার গদাধরের পীড়া হইয়াছিল। তখন ক্রমান্বয়ে তিন দিন কাল অভুক্ত থাকিয়া, এবং ক্ষণকালের জন্য একটিবার [illegible] হইয়া, বৃদ্ধ পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায় বৃদ্ধ আপনি মরণাপন্ন হইলে; তাঁহার শীর্ণ অবয়ব, কোটরগত চক্ষু এবং বিশুষ্ক গণ্ড দেখিয়া, আমাদের পূর্ব্বকথিত পল্লীবাসী উমাকালী চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বলিয়াছিল, "মধু, ভাই! তোমার মত স্নেহশালী পিতা আমি কখনও কোনও স্থানে নয়নগোচর করি নাই। তুমি আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছ।" উমাকালী চক্রবর্ত্তীর এই বাক্যের উত্তরে মৃতকল্প মধুসূদন, বিশুষ্ক অধরে ম্লান হাসি হাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ভাই, প্রাণটা কি এমন বড় জিনিষ যে, পুত্রের জন্য তাহা বিসর্জ্জন করা আমরা একটা অসাধারণ কার্য্য বলিয়া মনে করিব। গদাইএর পায়ের একটি ক্ষুদ্র কণ্টক উদ্ধারের জন্য আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকিত, তাহা হইলে আমি এই সহস্র প্রাণ দিতে পারিতাম। আর এই সহস্র প্রাণ দিয়াও আমার মনে হইত না যে, উহার জন্য আমি কিছু করিতে পারিয়াছি। তোমার সন্তান নাই, থাকিলে আমার কথা বুঝিতে পারিতে।"

যাহার পায়ের একটি কণ্টক উদ্ধারের জন্য মধুসূদন সহস্র প্রাণ প্রদান করিতে পারিতেন, সেই স্নেহের পাত্র, সেই প্রাণাধিক প্রাণ কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্থবির দেহ প্রাণহীন কাষ্ঠমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার অস্পন্দ দৃষ্টি দিগন্তসীমায় নিবদ্ধ হইল। তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়, তাঁহার স্পন্দিত বক্ষঃ পঞ্জরে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্লুন বিহঙ্গমের ন্যায় বারু বার আঘাত করিল।

ঐ—ঐ—ঐ দূরে দিগন্তপ্রান্তে, গঙ্গ-গর্ভপ্রান্তে কৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায় যে ক্ষুদ্র কৃষ্ণ... জাহ্নবীর গগনচুম্বিত বক্ষে নয়নগোচর হইতেছে, দেখ, দেখ, উহা একখানি তরণী; বৃদ্ধ মধুসূদন ভাবিলেন, 'নিশ্চিত তরণী মধ্যে গদাধর আছে।' তরণী নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার ক্ষেপণীসকল উজ্জ্বল মুক্তাদল সৃষ্টি করিয়া, তাহার মালা গাঁথিয়া গলায় পরিল। কিন্তু তাহাতো নাড়িচার ঘাট ভিড়িল না; তাহাতো গদাধরকে আনিয়া বৃদ্ধের বক্ষে তুলিয়া দিল না। তাহা একান্ত নির্দ্দয়ার মত কল কল হাসিয়া, তরঙ্গ তাড়নে নৃত্য করিয়া চলিয়া গেল।

আবার দেখ, আবার একখানি তরণী এক বৃহৎ শ্বেত রাজহংসের ন্যায় দূরে গঙ্গাবক্ষে দেখা গিয়াছে। মধুসূদনের মনোমধ্যে আবার আশা সঞ্চারিত হইল। তিনি আবার ভাবিলেন,—"হয়ত এই তরীতেই তাঁহার গদাধর আছে।" কিন্তু না, ইহাতেও গদাধর নাই।

দিবা অবসান হইল, তবু গদাধর আসিল না!

তা' না আসুক। বৃদ্ধ তেমনই ভাবে, মস্তকে সেই রঙ্গিন্ গামছাখানি বাঁধিয়া, পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় চিরদিন জাহ্নবী-উপকূলে দাঁড়াইয়া থাকিবে। চিরদিন তাহার নিশ্চল দৃষ্টি, পুত্রের দর্শনলালসায় দিগন্তপ্রান্তে নিবদ্ধ থাকিবে।

গদাধরের মাতা বাটীতে কি করিতেছেন, চল, আমরা তথায় গিয়া দেখি। তাঁহার রন্ধনকার্য্য বহুপূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি রন্ধন-গৃহের দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া, তাঁহার গদাই আসিয়া তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিবে। সে সময় তিনি কি করিবেন? তাহাকে কি বলিবেন? ভাবিতে ভাবিতে তিনি গগনপটে ঘনঘটা দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রবল ঝঞ্ঝা যখন প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র পাকশালাটি আলোড়িত করিয়া দিল, তখন তিনি গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে দেবতাদিগকে উদ্দেশে ডাকিলেন, "দোহাই বাবা তারকনাথ, দোহাই মা কালী, আমার বাছাকে, আমার অঞ্চলের নিধিকে নির্ব্বিঘ্নে ঘরে আনিয়া দাও।"

তাহার পর ঝড় থামিয়া গেল, কিন্তু কই গদাধর ত বাড়ী ফিরিল না। হায়! হায়! দেবতারা স্নেহময়ী মাতার অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা কিরূপে উপেক্ষা করিল? এ পাষাণময় দেবতাগণ কি নির্ম্মম! যাহারা প্রস্তর দিয়া এ দেবমূর্ত্তিসকল গঠিয়াছিল, তাহারা বুঝি বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এ দেবতাগণ ঐ প্রস্তরের মত নির্ম্মম! প্রস্তরময় দেবতারা মানুষের কাতর-ক্রন্দন শ্রবণ করে না। তথাপি অনন্তপদাশ্রয়প্রার্থিনী ঊর্দ্ধমুখী আমাদের ভক্তিকে আপনাদের পাষাণভারে বদ্ধ করিয়া রাখে।

যে নরদেহ আশ্রয় করিয়া, ভূতভাবন ভগবান্ দুষ্কৃতদিগকে দমিত করিয়া, সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিয়া বার বার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, যে নরদেহ বহুবৎসর যাবৎ পরমাত্মার পবিত্র আধারস্বরূপ বিরাজ করে, এস, প্রস্তর ছাড়িয়া, আমরা সেই পুণ্যময় মানব-দেহের মধ্যে দেবত্বের অনুসন্ধান করি। তিনি কতবার মানুষের দেহের মধ্যে বিরাজ করিয়াছেন; অনুসন্ধান করিলে হয়ত এখনও তাঁহাকে নরদেহ মধ্যে দেখিতে পাইব। তাঁহার কথাত কখন মিথ্যা নয়!—সত্যসিন্ধু নিজে বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

১২

বৃষ্টির পর, আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, গঙ্গার উপকূলের রাস্তা অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ জন্য বাহির হইলেন। তাঁহার যুবতী কন্যা অম্বিকা তাঁহার সঙ্গিনী হইল। তিনি অনেক সময়ই, কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতেন। এজন্য পল্লীগ্রামবাসীরা হয়ত গোপনে তাঁহার নিন্দা করিত। কিন্তু কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় লোক-নিন্দায় বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। যাহা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইত, স্তুতি বা নিন্দার অপেক্ষা না করিয়া, তাহা তিনি সম্পাদন করিতেন। লোক-বাক্যের দ্বারা কখনও তিনি অভিভূত হন নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কালীদহ গ্রামের জমিদারদিগের, গঙ্গাতীরে একটি সুরম্য চাঁদনি ছিল। এই চাঁদনি হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণ দিকে, গঙ্গার উপকূলাশ্রিত এক রাজপথ প্রসারিত ছিল। এই রাজপথ নাড়িচা এবং অন্য অনেক পল্লীগ্রাম অতিক্রম করিয়া হাওড়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে "গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড" নামক বিখ্যাত রাজবর্ত্মে মিলিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়, কন্যা সহ আজ এই রাজপথে পদচালনা করিতেছিলেন।

কথোপকথন সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে তিনি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, অম্বিকা, তোমার বাল্যকালের কথা মনে আছে? তুমি যখন চারি বৎসর বয়সের বালিকা, তখন একদিন আমাদের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন; তাঁহার গৈরিক বসন এবং মস্তকের কেশ দীর্ঘ, তিনি ফলমূলমাত্র আহার করিতেন; তাঁহার কথা কি তোমার স্মরণ আছে?

অম্বিকা। হাঁ, বাবা, আমার সে কথা মনে আছে। পরে তোমার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ঐ সন্ন্যাসীর নিকট তুমি ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ।

কৃষ্ণ। হাঁ, আমি তাঁহার একজন শিষ্য।

অম্বিকা। তাঁহাকে ত আর কখন দেখি নাই।

কৃষ্ণ। না, তিনি সেই আসিয়াছিলেন, তাহার পর, আর কখনও এখানে আসেন নাই।

অম্বিকা। তিনি কোথায় থাকেন?

কৃষ্ণ। তাহা, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহই অবগত নহেন।

অম্বিকা। আমরা আবার কবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব?

কৃষ্ণ। তাহা বলা আমার সাধ্যাতীত। বোধ হয়, এ জীবনে আর কখনও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব না।

অম্বিকা। একদিন তোমার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি।

কৃষ্ণ। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানী এবং পরম পুণ্যাত্মা, আমার মনে হয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার মত জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর দ্বিতীয় নাই।

অম্বিকা। শুনিয়াছিলাম, তিনি কৃপা করিয়া, আমার কোষ্ঠী সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ। হাঁ, তিনিই তোমার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অম্বিকা। তুমিত বাবা, সে জন্মপত্রিকা আমাকে কখনও দেখাও নাই।

কৃষ্ণ। না, না দেখাইবার বিশেষ কারণ ছিল, এজন্য দেখাই নাই। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনতত্ত্ব অবগত থাকা, তরলমতি বালকবালিকার পক্ষে অনেক সময় মঙ্গলদায়ক নহে। এক্ষণে তুমি বিদ্যাচর্চ্চার

দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছ। এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির পরিণতি ঘটিয়াছে। এক্ষণে এই কোষ্ঠীর দুইটি বিশেষ কথা তোমাকে জানাইব।

অম্বিকা। সে কি কথা বাবা?

কৃষ্ণ। সে তোমার জীবনের কথা, সে তোমার মৃত্যুর কথা। ভগবানের ইচ্ছায় তোমার এমনই মুহূর্ত্তে জন্ম হইয়াছিল, যাহাতে তোমাকে চিরজীবন কুমারী থাকিতে হইবে, যাহাতে জলনিমজ্জনে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। তোমার প্রসূতি মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আমার চরণস্পর্শ করিয়া মিনতি করিয়াছিলেন, "আমার এই মাতৃহীনা কন্যাকে তুমি যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিও।"—হায়! মা, আমার যদি রক্ষা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনিই কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন? তাঁহাকেও রক্ষা করিতে পারি নাই, তোমাকেও রক্ষা করা আমার সাধ্য নহে।—যিনি সর্ব্ব জীবের পরম রক্ষক, সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্য যদি তিনি তোমাকে রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন। আমি মানুষ, আমি তোমার রক্ষার জন্য চেষ্টামাত্র করিতে পারি; কিন্তু সেই চেষ্টার ইচ্ছানুযায়ী সাফল্য লাভ করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত। জলের বিপদ্ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি অতি যত্নে তোমাকে সন্তরণ-কৌশল বিশেষরূপ শিক্ষা দিয়াছি। হায়! ইহা ছাড়া, তোমাকে জল নিমজ্জন হইতে রক্ষা করার কোনও উৎকৃষ্টতর পন্থা উদ্ভাবন করিতে আমি সক্ষম হই নাই।

অম্বিকা। বাবা, তুমি আমার জন্য কাতর হইও না। জল নিমজ্জনেই যে আমার প্রাণনাশ ঘটিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? তোমার গুরুদেব অসাধারণ জ্ঞানী হইলেও মানবমাত্র;—মানুষের কথা অভ্রান্ত নহে।

কৃষ্ণ। কিন্তু আমার গুরুদেবের কথা মানুষের কথা নহে। মানুষ যখন জ্ঞানের শেষ সোপানে আরোহণ করেন, তখন তিনি দেবত্ব লাভ করেন। তখন তিনি যাহা বলেন, তাহা মানুষের কথা নহে, তখন তাহা দেবতার অমোঘ আদেশ। আমাদের শাস্ত্রের লিখিত অধিকাংশ ঋষির মহাজ্ঞানোত্থিত বাক্যগুলি যেরূপ অভ্রান্ত সত্য, ঋষিতুল্য আমার গুরুদেবের বাক্যগুলিও সেইরূপ সত্য। তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

অম্বিকা। তা, সত্য হউক। কিন্তু কবে আমি জলমগ্ন হইব, তাহাত তুমি জান না! হয়ত অতি বৃদ্ধ বয়সে—

কৃষ্ণ। না। গুরুদেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিবে না।

অম্বিকা। অতিবৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য, পরমুখ-প্রত্যাশী হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা, অল্প বয়সে শরীরের সমস্ত সামর্থ্য লইয়া মনের সমস্ত বল লইয়া মরা, স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল। তাহার পর, মরণই যদি ঘটিল, তবে তাহা জলের ভিতর ঘটিলে ক্ষতি কি? যখন মরিতেই হইবে, তখন তাহা তুলার রাশির উপর না হইয়া, শীতল কোমল জল-রাশির উপর হইলে ক্ষতি কি? আসন্ন মৃতের পক্ষে, তুলার বিছানাটা কি গঙ্গার এই তরল, তরঙ্গিত জলশয্যা অপেক্ষা সুখপ্রদ? যখন মরিতেই হইবে, তখন শয্যায় না মরিয়া এই তর তর স্রোত মধ্যে মরণই ভাল। আমাদের শেষ শয়নটা শঙ্করমৌলিনিবাসিনীর বিমল ইন্দ্রমুকুট-মণিরাজিতচরণে হওয়াই সুখদ, শুভদ।

কৃষ্ণ। তোমার সে সুখদ শুভদ শয়ন দেখিবার পূর্ব্বেই যেন আমি দেহত্যাগ

করিতে পারি।—হে ভগবন্, সে দুর্দ্দিন আমার ভাগ্যে অর্পণ করিও না।

পিতা পুত্রীতে কথোপকথন করিতে করিতে পাদচারণা করিতেছিলেন; সহসা তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সহসা তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। সহসা দূরে স্রোতোজলে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। গঙ্গার চঞ্চল স্রোত মধ্যে এক খানি নিমগ্ন নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছিল। নৌকার সহিত গুণরশ্মির দ্বারা বিজড়িত একটি নরদেহ স্রোত মধ্যে কখন ডুবিতেছিল, কখন ভাসিতেছিল। অম্বিকা তাহার অতি বিশাল চক্ষুর সমস্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলে যে, নরদেহ এখনও একেবারে প্রাণশূন্য হয় নাই। এখনও বিজড়িত গুণরশ্মি হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য তাহার অতি ক্ষীণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছিল।

১৩

অম্বিকা। বাবা!

কৃষ্ণ। কেন?

অম্বিকা। আমি যাইব, তুমি বারণ করিও না।

কৃষ্ণ। তুমি আমার সংসারের সব। আমি মায়াবদ্ধ জীব; তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। কর্ত্তব্যময়ী তুমি আপন কর্ত্তব্য স্থির কর। সন্তরণ বিদ্যায় তুমি অসীম পারদর্শিনী; জলমধ্যে হয়ত কাহারও একমাত্র সন্তান, হয়ত কাহারও প্রাণাধিক পুত্র, হয়ত কাহারও বৃদ্ধ পিতা বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছেন; তুমি তাহাকে উদ্ধার করিতে যাইতেছ; তুমি সর্ব্বশক্তিমানের আদেশে পরিচালিত হইয়াছ। মূঢ়, মুগ্ধ আমি, আমার কি সাধ্য যে আমি তোমাকে নিষেধ করি। তথাপি আমার গুরুদেব বলিয়াছিলেন যে, জলনিমজ্জনে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। জানি না মরণে কেহ লাভ করিতে পারে কি না। কিন্তু পরকে মরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে মরণ, সে মহামরণ; ইহা যাহার ভাগ্যে ঘটে, সে অমরতা লাভ করে। আমি পিতা হইয়া তোমাকে এ অমরতা হইতে কিরূপে বঞ্চিত করিব?

পিতার বাক্যের দিকে অম্বিকার লক্ষ্য ছিল না। সেই স্থিরনেত্রা অপূর্ব্বা বালিকা আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া তখন গঙ্গাজলে অবতরণ করিতেছিল। সে দেবীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, কৃষ্ণচাটুয্যে মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও অম্বিকা, মা আমার, বৎস আমার, দাঁড়াও আর একবার তোমাকে ভাল করিয়া দেখি। আমার সংসারের তুমিই একমাত্র অবলম্বন, দাঁড়াও, তোমাকে একবার ভাল করিয়া দেখি। হয়ত জীবনে আর কখনও তোমাকে দেখিব না। হায়! ভগবন্, মানুষের কর্ত্তব্য কেন তুমি এত কঠিন করিয়া নির্দ্দেশ করিলে! আমি চিরজীবন কেবলমাত্র যদি বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত না করিয়া কন্যা অম্বিকার ন্যায় সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে পরের জীবনোদ্ধারের জন্য তাহাকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ না করিয়া, নিজেই এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতাম।

বৃষ্টিজল-বিধৌত শ্যাম-তরু-লতা-সুশোভিত তটিনী গঙ্গা দিবাবসানকালের ম্লান সূর্য্যরশ্মিতে স্নাতা হইয়া অত্যন্ত শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল; এক্ষণে কুমারী অম্বিকার লাবণ্যে উজ্জ্বল স্বর্গীয়াবয়ব বুকে লইয়া তাহার নৈসর্গিক শোভা শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। গঙ্গাজলে অম্বিকার সন্তরণশীল দেহ, চাক্চিক্যময় সুবর্ণহারের সুখদর্শন মধ্যমণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই পবিত্র

সেই ক্রোড়ে করিয়া পুণ্যসলিলার সলিলও ......র পবিত্রতা প্রাপ্ত হইল। অম্বিকা জলস্রোতের সহায়তায়, এবং আপন সুদক্ষ বাহুসঞ্চালনের নিপুণতায় অতি শীঘ্র নিমগ্ন তরণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার চরণপ্রক্ষিপ্ত জলকণাসকল, সূর্য্যকরে রঞ্জিত হইয়া, দেবতার পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহার অঙ্গে বর্ষিত হইল।

কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া সজলনেত্রে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিলেন।

নিমগ্ন তরীর সন্নিকটে আসিয়া, নিমগ্ন ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া, অম্বিকার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অদর্শনকালে যাহার কথা সে শতবার ভাবিয়াছিল, যাহার কালমূর্ত্তি তাহার পুষ্পিত হৃদয় মধ্যে অতি ধীরে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতেছিল, পিতার আদেশক্রমে একদিন সে যাহাকে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিয়াছিল, এবং পরে তাহার পিতার শিক্ষকতায় যে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, এবং একদিন যাহাকে স্বহস্তে সাজ্জিত করিয়া, উন্নতির পথ অবলম্বন জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিল, এ যে সেই গদাধর! ধন্য জনার্দ্দন! আজ গদাধরের উদ্ধার কার্য্যে অম্বিকাকে নিয়োজিত করিয়া তুমি তাহাকে ধন্য করিলে!

গদাধরের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এক্ষণে পরিচিতা অম্বিকাকে তাহার উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী এবং নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। সে কহিল, "অম্বিকা দেবী, তুমি আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনি বিপদাপন্ন হইয়াছ; কিন্তু আমাকে উদ্ধার করা সহজ নহে। কিরূপে জানি না, কিন্তু দেখ, গুণ রজ্জুতে আমার সর্ব্বাঙ্গ এরূপ বদ্ধ হইয়াছে যে, ইহা হইতে মুক্ত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, হনুমানের ন্যায় আমাকে এই নাগপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।"

অম্বিকা। না, গদাধর, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব। যদি না পারি, তোমার উদ্ধার উদ্যোগে বরং মরিব, তথাপি তীরে ফিরিব না।

গদাধর। কিন্তু কিরূপে উদ্ধার করিবে? ঝড় নৌকাখানা উল্টাইবার আগে, আমি এবং দুই জন মাঝি জলে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু তৃতীয় মাঝি নৌকার মধ্যে ছিল; তাহাকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া নৌকাখানা তাহার উপর উল্টাইয়াছিল। দুইজন মাঝি ও আমি সন্তরণ করিয়া তীরের দিকে যাইতেছিলাম। কিন্তু আমরা ক্ষিপ্ত তরঙ্গের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্ত বাধা প্রাপ্ত হইতেছিলাম। সহসা একজন মাঝি বলিল যে, তৃতীয় মাঝি আসিতে পারে নাই, নিমগ্ন নৌকার মধ্যে বদ্ধ হইয়া আছে। একটা লোকের প্রাণ যাইবে? বড় কষ্ট হইল। নিজের কথা আর মনে রহিল না। ফিরিলাম। তরঙ্গের শত বাধা ছিন্ন করিয়া ফিরিলাম। নৌকার নিকটে আসিয়া, ডুব দিয়া, নৌকার অধোমুখী বক্ষের মধ্যে অনুসন্ধান করিলাম। বহু কষ্টে মরণোন্মুখ মাঝিকে ধরিয়া বাহিরে আনিলাম। কিন্তু এই সময় নৌকামুখ তরঙ্গচালিত হইয়া সবলে আমার মস্তকে প্রহৃত হইল। তাহার পর আমার আর কিছু স্মরণ ছিল না। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, নিমগ্ন তরীর সহিত আমি ভাসিয়া চলিয়াছি। আমার হস্তপদ গুণরজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ এই রজ্জু ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু যাহার হস্তপদ বদ্ধ, তাহার চেষ্টায় কোনও ফল হয় নাই। তাহার পর, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মরণের

প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এক একবার স্বপনের মত তোমাদের সব মনে পড়িতেছিল। * * * এ কি? আমার দক্ষিণ হস্ত তুমি কিরূপে মুক্ত করিয়া দিলে?

গদাধর যখন নিজের বিপদের বিবরণ বিবৃত করিতেছিল, অম্বিকা তখন গদাধরের দক্ষিণ হস্তবদ্ধ রজ্জুর এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া, আপনার মুক্তাসদৃশ দন্তের দ্বারা সবলে চর্ব্বণ করিতেছিল। বহুক্ষণ জলমধ্যে থাকিয়া রশ্মিসকল অপেক্ষাকৃত কোমল হইয়াছিল। চর্ব্বণে তাহারা অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তথাপি সে কর্কশ রজ্জু অম্বিকার কোমল মুখ মধ্যে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল। দক্ষিণ হস্ত মুক্ত পাইয়া, আপনাকে বন্ধনমুক্ত করা গদাধরের পক্ষে মুহূর্ত্তের কার্য্য হইল। সে অবশ মৃতকল্প দেহেও যথেষ্ট বল ছিল। রজ্জুসকল সামান্য সূত্রের মত মুহূর্ত্ত মধ্যে খণ্ডিত হইয়া গেল।

তাহার পর গদাধর ও অম্বিকা সন্তরণ করিয়া তীরাভিমুখে ফিরিল।

তীরে কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাহু প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন উভয়কে পাইয়া আনন্দে তাঁহাদিগকে বক্ষ মধ্যে নিপীড়িত করিলেন;

তাহাদের গাত্র, গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র স্নেহাশ্রুর দ্বারা বিধৌত করিলেন। তাহার পর গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি আমার বাটীতে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন কর।" পরে আমি এবং অম্বিকা দুজনে মিলিয়া, তোমাকে লইয়া তোমার পিতা মাতার কাছে নাড়িচা গ্রামে উপস্থিত হইব।"

গদাধর। না, না, আপনাদের আর কষ্ট দিব না। এই ক্লান্তির পর অম্বিকা দেবীর কিছু বিশ্রাম আবশ্যক। আমি একাকী যাইব।

অম্বিকা। তোমার শরীরের এই অবস্থায় আমরা তোমাকে একাকী ছাড়িয়া দিতে পারি না।

গদাধর। কেন? আমার শরীরের কি অবস্থা?

এই বলিয়া গদাধর আপনার বিশাল শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

গোতমের অবয়বীবাদ ও পরমাণুবাদ।

অবশ্য পরমাণুবাদ সম্বন্ধে যেরূপ বিশিষ্ট বিচারণা বৈশেষিক দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ ন্যায় দর্শনে নাই, তথাপি আন্বিক্ষিকীবিদ্যার প্রবর্ত্তক ভগবান্ গোতম ঋষি এই বিষয়ে যে অভাবনীয় বিচারশক্তির পরিচয় দিতে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। নিরবয়ব প্রকরণে পরমাণুতত্ত্ব অধিকার করিয়াও তাঁহার সূত্র রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞান আণবিক কার্য্য সম্বন্ধে অধিক অগ্রসর হইলেও অণুর মৌলিক তত্ত্ব গবেষণায় বৈশেষিকী ও আন্বিক্ষিকী বিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিভিন্ন অসংখ্য নিত্য অণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া এই বিদ্যাযুগলের ন্যায় তাহাকেও সম্ভাবনা বা অনুমিতির শরণ লইতে হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত জড় বিজ্ঞান এইরূপ কোন উপকরণ উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, যাহা দ্বারা ঐরূপ অণুকে প্রত্যক্ষত ধরিতে পারা যায়। আর কেবল সম্ভাবনা বা অনুমিতির উপর নির্ভর করিয়া এই যুগের অনেকেই প্রামাণ্য সংশয় ধুইয়া ফেলিতে পারেন না। বিশেষতঃ সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ ও বেদান্তের মায়াবাদ যখন বিশেষদর্শীর মনে জাগিয়া উঠে, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া পরমাণুবাদের উপর ভক্তি সঙ্কোচ করিতে হয়। এই পরমাণুবাদ লইয়া আর্য্য ও বৌদ্ধ দার্শনিকের মধ্যে পরস্পর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদার্শনিকেরা পরমাণুকে ক্ষণিক ও কার্য্য জগৎ অর্থাৎ মণিমুক্তাদি পদার্থকে তৎসমষ্টিরূপ মানিয়াছেন। কিন্তু কণাদ ও গোতম ঋষির মতে তাহা নিত্য, ও কার্য্য জগৎ তাহা হইতে ভিন্ন অবয়বীরূপ। আবার বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যেও যে সকলেই এক বাক্যে এইরূপ পরমাণু স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে। বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদী সৌত্রান্তিক বৈভাষিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ দার্শনিককে বাদ দিয়া যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের বাহ্যার্থ ভঙ্গবাদী ও শূন্যবাদী দার্শনিকেরা ঐরূপ বাহ্য পরমাণু অঙ্গীকার করেন নাই। যাহা হউক এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তি অকাট্য না হইলেও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আর ইহাই বা কোন্ উদারচেতা বিচারশীল ব্যক্তি না মানিয়া থাকিতে পারেন যে, বৌদ্ধ যুক্তি দার্শনিক জগতে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

মহর্ষি গোতম পরমাণুবাদকে অবয়বী প্রকরণের অন্তঃপাতী করিয়াছেন। এই জন্য পরমাণু আর অন্তিম অবয়ব অভিন্ন জিনিষ। তিনি ২য় অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ৩১ সূত্র হইতে ৩৪ সূত্র পর্য্যন্ত প্রসঙ্গত যুক্তিমূলক বিচার দ্বারা অবয়বীকে অবয়ব হইতে ভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—

"সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহঃ।" ২য় অ ১ম আ ৩১ সূত্র।

গ্রন্থকার ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব সূত্রে একদেশোপলব্ধিরূপ আপত্তি পরিহারের জন্য যে অবয়বী সদ্ভাবকে হেতু করা হইয়াছে, তাহাকে প্রতিপন্ন করিবার ব্যপদেশে উপোদ্ঘাত সঙ্গতিক্রমে অবয়বী প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অবয়বী অসিদ্ধ বলিয়া তাহাতেই সন্দেহ অর্থাৎ সকম্পত্ব ও নিষ্কম্পত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মের এক বৃক্ষাদি অবয়বীতে সমাবেশ হয় না। এই জন্য পরমাণুরূপ বিভিন্ন অবয়বই মানা উচিত. কিন্তু তদ্ভিন্ন ও তদ্বিশিষ্ট এক অখণ্ড অবয়বী নহে।

সিদ্ধান্ত সূত্র—

"সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ।" ২য় অ ১ম আ ৩২ সূত্র।

স্বতন্ত্র অবয়বী সিদ্ধ না হইলে পর দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না।

তাৎপর্য্য—বৃক্ষাদি অবয়বী অতীন্দ্রিয় পরমাণু সমষ্টি রূপ হওয়াতে তাহার ও তদাশ্রিত গুণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অসম্ভব, কেন না ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষই মহৎপরিমাণ কারণ। আর তোমার মতে বহির্দ্রব্য মাত্রই অণুসমষ্টি রূপ হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে ঐ পরিমাণটা কোন প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যাপারটাকে সুসিদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া পরমাণু সমষ্টি হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত পক্ষে অবয়বী স্বীকার করার অন্য কারণ "ধারণাকর্ষণোপপত্তেঃ।" ঐ ঐ ৩৩ সূত্র—

ধারণ ও আকর্ষণ ক্রিয়াকে সুসিদ্ধ করিবার জন্য স্বতন্ত্র অবয়বী মানা উচিত।

তাৎপর্য্য—বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু মাত্রই অণুপুঞ্জ রূপ হওয়াতে এক অংশের ধারণ ও আকর্ষণে অপরাপর অংশের তাহা কি প্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে? কিন্তু কুম্ভ ধারণে তদভ্যন্তরস্থ দধি ধারণ ও নৌকার আকর্ষণে তন্মধ্যস্থ বস্তুর আকর্ষণ যেরূপে হইয়া থাকে, সেই রূপে উক্ত ব্যাপারটা সুসম্পন্ন হইতে পারে। এইজন্য বক্ষ্যমাণ সূত্রে প্রতিবাদী এই সম্বন্ধে কিছু সমাধান না করিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষের নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

"সেনাবনবদ্‌গ্রহণমিতিচেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাং।" ঐ ঐ ৩৪ সূত্র।

অতি দূরস্থ এক মনুষ্য ও এক বৃক্ষ প্রত্যক্ষ না হইলেও যেরূপ দূর হইতেও মনুষ্য সমূহ রূপ সেনা এবং বৃক্ষসমূহ রূপ বন প্রত্যক্ষত দেখা যায়, তদ্রূপ এক পরমাণু প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তৎসমষ্টিরূপ হীরক স্বর্ণ প্রভৃতি কেন প্রত্যক্ষ হইবে না, তুমি এইরূপ আপত্তি করিতে পার না, যেহেতু ঐ সমষ্টির উপাদানরূপ অণু অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের অগোচর।

এই সূত্রের ভাষ্য সারগর্ভ ও গবেষণাপূর্ণ। এজন্য তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে—

'যেরূপ সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গের দূর হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যক্ষতঃ গ্রহণ করিতে না পারিলেও ঐ সেনাঙ্গ, ঐ বনাঙ্গ এইরূপ একটা একাকার সাধারণ জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ সমষ্টিভাবাপন্ন পরমাণুর পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক পরমাণুর উপলব্ধি না হইলেও সাধারণত একাকার রূপে তৎসমষ্টিকে প্রত্যক্ষত জানিতে পারা যায়। যেরূপ সামান্যভাবে দেখিয়াও কোন কারণে নিকটবর্ত্তী সেনা ও বনের অঙ্গগত পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না, যেরূপ নিকটস্থ পলাশ ও খদির বৃক্ষকে সামান্য ভাবে দেখিয়াও এই পলাশ জাতীয় বৃক্ষ, এই খদির জাতীয়

বৃক্ষ এইরূপ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সেইরূপ সমীপবর্ত্তী কোন জিনিষের প্রকৃষ্ট স্পন্দন অনুভূত হইলেও সূক্ষ্ম স্পন্দন জানিতে পারা যায় না,, কিন্তু এই রূপ স্থলে সামান্যভাবে বিষয়গুলিকে জানিয়াও পৃথক্ ভাবে জানিতে না পারায় একটা একাকার ভ্রান্ত জ্ঞান হইয়া থাকে। পরমাণুসম্বন্ধে সেইরূপ খাটে না, কারণ তাহা অতীন্দ্রিয় বলিয়া পৃথক্ ভাবে জানিয়া লওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এইক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক্ যে, ঐ একাকার জ্ঞানটা অণুসমষ্টিকে বিষয় করে কি না। সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ তোমার মতে অণুসমষ্টি রূপ, সুতরাং অসিদ্ধ বলিয়া পরীক্ষণীয় বিষয়কে উদাহরণে রাখা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। আর যদি বল যে, সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ স্থলে অণুসমষ্টির একাকার জ্ঞানটা দৃষ্ট হইয়াছে, তবে তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। আর যদি বল যে, আমরা সেনাঙ্গ ও বনাঙ্গ স্থলে পৃথক্ জ্ঞানের অভাবমূলক যে অভিন্ন ভাবে একাকার জ্ঞান হয় তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাকে পরীক্ষার হেতুবাদ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। তথাপি কিছুতেই পরীক্ষাটাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না, কারণ আমরা দৃষ্ট বিষয়েরই পরীক্ষা করিতেছি অর্থাৎ তুমি যে উক্তস্থলে একাকার জ্ঞান হয় দেখিয়াছ তাহার পরীক্ষা করা যাইতেছে যে, উহা অণুসমষ্টিকে বা অপর দ্রব্যকে বিষয় করে। এই স্থলে তোমার দর্শন ক্রিয়ার এমন কোন প্রভাব নাই যে, তাহা অণুপুঞ্জ অনেক হইলেও পরস্পর পার্থক্য জ্ঞানের অভাবে এক অখণ্ড জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি বলা যায় যে, স্থাণুতে পুরুষভ্রান্তির ন্যায় ঐরূপ একাকার জ্ঞানটা ভ্রান্তিমাত্র, তথাপি প্রশ্ন উঠিতেছে যে, তদভাব বিশিষ্টে তৎজ্ঞান রূপ অপ্রমাটা প্রধান (তৎজ্ঞান) সাপেক্ষ বলিয়া কি উহা হইতে ঐ প্রধান সুসিদ্ধ হইতেছে। ইহার ভাবার্থটা এইরূপ যে, স্থাণু পুরুষ স্থলে পুরুষের যথার্থ পুরুষজ্ঞান হইলে পরই পুরুষত্বজ্ঞানমূলক ইহা পুরুষ বটে এইরূপ জ্ঞান স্থাণুতে যে রূপে হয়, সেই রূপে বহু বস্তুর সমষ্টি স্থলেও একাকার জ্ঞানটা এক অখণ্ড বস্তুতে না হইলে তাহা ঐ সমষ্টি সম্বন্ধে হইতে পারে না। কিন্তু এক অখণ্ড বস্তুতে ইহা এক অখণ্ড বস্তু এইরূপ জ্ঞানটা যখন এইস্থলে প্রধান হইতেছে, তখন ভৌতিক বস্তুমাত্রই অণুসমষ্টিরূপ হওয়াতে এক অখণ্ড বস্তু খুঁজিয়া না পাওয়ায় উহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এই স্থলে যদি বলা যায় যে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বস্তুতে যে এক অখণ্ডজ্ঞান হয়,তাহা অনেকের সমষ্টিভূত পদার্থ সম্বন্ধে এক অখণ্ড জ্ঞানের প্রধানপদে অভিষিক্ত হউক, না, বলবৎ প্রমাণের অভাবে দৃষ্টান্ত ব্যবস্থা হয় না বলিয়া তাহা ঠিক নহে। ইহার বিশদ অর্থ এই যে, অণুসমষ্টিতে একাকার জ্ঞানটা স্থাণুতে পুরুষজ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তি অথবা শব্দে একত্ব জ্ঞানের ন্যায় যথার্থ এইরূপ সন্দেহের উৎসাদন কল্পে কোন বিশেষ হেতু নাই, সুতরাং ঐ উভয় দৃষ্টান্তই সন্দেহাস্পদ। গন্ধাদি গুণগুলিও কুম্ভের ন্যায় সমষ্টিরূপ, এই জন্য উহাকেও উদাহরণে রাখা যাইতে পারে না। আর বৌদ্ধমতে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়বেদ্য গুণকে পুঞ্জীভূত রূপস্কন্ধ বলা হইয়াছে। এইরূপে পরিমাণ, সংযোগ, স্পন্দ ও জাতি বিশেষের জ্ঞানকে অণুযুক্ত করা যাইতে পারে, কেন না ঐ গুলিকে উদাহরণে রাখিলেও গন্ধ প্রভৃতির উদাহরণকল্পে যে দোষ দেখান গিয়াছে তাহারই পুনরভ্যুত্থান হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে একত্ব বুদ্ধি যে

প্রমা তাহার কারণ ইহা এক মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট। এইরূপ মহত্ত্ব সমানাধিকরণ একত্ব বিষয়ক জ্ঞান; সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, যাহা মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট তাহাই ইহা এক এইরূপ একত্ব জ্ঞানের বিষয়। এইরূপও বলা যাইতে পারে না যে, প্রত্যেক অণুর জ্ঞান হইতে অণুসমূহের যে একটা ভিন্ন—বিশেষ জ্ঞান হয় তাহাই মহৎ পরিমাণের জ্ঞান; কেন না তাহা হইলে অমহৎ অণুতে মহৎ জ্ঞানটা "অতস্মিন্ তৎ" প্রণালীতে ভ্রান্তি হইয়া পড়িল। পক্ষান্তরে "অতস্মিন্ তৎ" জ্ঞানটা প্রধান সাপেক্ষ বলিয়া মহৎ পদার্থে ইহা মহৎ এইরূপ জ্ঞান না হইলে প্রধানের সিদ্ধিই সুদূর পরাহত।

এইস্থলে অণুশব্দ মহান্ এইরূপ যে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইতে প্রধান প্রতিপন্ন হউক এইরূপ বলাও উচিত নহে, কেন না ইয়ত্তা অবধারণ হয় না বলিয়া যেরূপ দ্রব্যে অণুশব্দের অর্থ অল্প বা মন্দ এবং মহান্ শব্দের অর্থ পটু বা তীব্র হয়, সেইরূপ শব্দাদি গুণ সম্বন্ধেও মহান্ শব্দ ও অণুশব্দের ঐরূপ অর্থই হইয়া থাকে। আর ইয়ত্তার অনবধারণকে কারণ এইজন্য বলা যাইতেছে যে, কেহই এই শব্দ মহান্ এইরূপ প্রয়োগ করিয়া "অয়ং ইয়ান" এইরূপ অবধারণ করিতে পারে না। যদি বলা যায় যে, যখন বদর, আমলক, বিল্ব প্রভৃতি বহু বস্তু সম্বন্ধে ও এই দুইটি জিনিষ সংযুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে এইরূপ বস্তুদ্বয়াশ্রিত সংযোগের বোধ হইয়া থাকে, তখন এইরূপ স্থলে দুইটি সমুদায়কেই ঐ সংযোগের আশ্রয় বলিতে হইবে, তবে প্রশ্ন উঠে যে, ঐ সমুদায় জিনিষটা কি? ইহার উত্তরে অনেক জিনিষের প্রাপ্তি বা এক জিনিষের অনেক রূপ প্রাপ্তিই সমুদায় বটে এইরূপ বলিলেও নিস্তার নাই, কেন না যখন সংযোগ ও সমুদায়ের প্রাপ্তিরূপ অর্থ হইতেছে, তখন, এই দুই বস্তু সংযুক্ত রহিয়াছে এইরূপ স্থলে প্রাপ্তি আশ্রিত, প্রাপ্তি [illegible] না বলিয়া দুইটি প্রাপ্তি সংযুক্ত রহিয়াছে এইরূপ বোধ হওয়া অসম্ভব। অনেক সমূহকে সমুদায় বলিলেও এই দুই বস্তু সংযুক্ত রহিয়াছে এইরূপ স্থলে সংযোগ বস্তুদ্বয়াশ্রিত প্রতীয়মান হওয়ায় উহা অনেক সমুদায়াশ্রিত এইরূপ বোধ হইতে পারে না। আর দুই অণুর প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া দুই [illegible] পরিমাণ বিশিষ্ট পদার্থই সংযোগের আশ্রয় ইহা প্রাপ্ত ও অবগত হওয়া যাইতেছে।

ইহা হইতে এইরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে, সংযোগ এক অতিরিক্ত গুণ নহে, কেন না উহা শব্দ, রূপ ও স্পন্দন প্রভৃতির কারণ হইয়া থাকে। আর সংযোগের অপেক্ষা ব্যতীত তাহার আশ্রয়ভূত দ্রব্য যুগলকে উক্ত শব্দাদির কারণ বলা যাইতে পারে না, কেন না অসমবায়ী কারণ উৎপন্ন না করিয়া দ্রব্য ঐ গুণের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সংযোগ গুণান্তরই সিদ্ধ হইল। পক্ষান্তরে প্রতীতির বিষয় অতিরিক্ত গুণ বা তাহার নিষেধ এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। কুণ্ডলশালী গুরু ও কুণ্ডলহীন শিষ্য এরূপ স্থলে কুণ্ডল সংযোগ বিশিষ্ট গুরু ও তৎশূন্য শিষ্য এইরূপ প্রতীতির বিষয় যদি অতিরিক্ত গুণ না হয়, কিন্তু তাহার নিষেধ হয়, তবে যাহার নিষেধ হইতেছে তাহাকে ব্যক্ত করা উচিত। কেন না, অন্য স্থলে সংযুক্ত দ্রব্যে যে অতিরিক্ত গুণ দৃষ্ট হইয়াছে এই স্থলে তাহার নিষেধ করিতেছে। এই সম্বন্ধে বিবেচ্য যে, অন্যস্থলে উহা দুই মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুর দেখা গিয়াছে, কিন্তু পরমাণুর নহে। এইরূপে অণুগত প্রতীতির নিয়ামক ঘটত্বাদি জাতিবিশেষ দ্বারাও অবয়বী প্রতিপন্ন হয়। আর ঐ জাতিবিশেষকে উপেক্ষা

করিতেও পারা যায় না, কেন না, উহাকে প্রত্যাখান করিলে "সোঽয়ং ঘটঃ" ইত্যাদি প্রতীতির ব্যবস্থা হইতে পারে না। আর আশ্রয় ব্যতিরেকে ঐ জাতি বিশেষটা অভিব্যক্ত হয় না বলিয়া তাহার কোন না কোন আশ্রয় অবশ্যই বলিতে হইবে।

এই স্থলে যদি অণুসমষ্টিকে তাহা বলা যায়, তবে আবার প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত অধিকার করিয়া বিকল্প উঠে অর্থাৎ অপ্রাপ্ত অণুসমষ্টিতে বা প্রাপ্ত অণুসমষ্টিতে জাতি বিশেষ প্রতীয়মান হয় এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। এইরূপ সমস্যায় যদি বলা যায় যে, অপ্রাপ্ত অণুসমষ্টিতে জাতি বিশেষের উপলব্ধি হয়, তবে ব্যবহিত (দূরস্থ) অণুসমষ্টিরও প্রত্যক্ষ হওয়ার আপত্তি আসিয়া পড়ে। এইজন্য অব্যবহিত অণুসমষ্টিতেই তাহার প্রতীতি হওয়া বিধেয়। পক্ষান্তরে প্রাপ্ত অণুসমষ্টিতে জাতিবিশেষের প্রতীতি হয় এইরূপ বলিলে মধ্যভাগ ও অপর ভাগের প্রাপ্তি হয় না বলিয়া ঐ দুই ভাগেরই অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এই প্রকার বিষম সঙ্কটে যদি বলা যায় যে, যে সকল অংশের প্রাপ্তি হইয়া থাকে সেই সেই প্রাপ্ত অংশই উহার আশ্রয়, অপর অংশ নহে। কিন্তু ইহাকে যুক্তিযুক্ত বলা যাইতে পারে না, কারণ এক সমষ্টিতে উহার আশ্রয়ত্ব ও অনাশ্রয়ত্ব ভেদে পদার্থের ভিন্নতা হইয়া পড়িল। আর এইরূপ হওয়াতে যে অণুসমষ্টি এক বৃক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, উহা অনেক বৃক্ষরূপে প্রতীয়মান হইয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ যে বিভিন্ন অণুভাগে বৃক্ষত্ব জাতির উপলব্ধি হইয়াছে, সেই বিভিন্ন ভাগগুলিই কেবল বৃক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। অতএব তোমার মতে অণুসমষ্টিতে অবস্থিত অতিরিক্ত পদার্থ রূপ যে জাতিবিশেষ তাহার অভিব্যক্তিই বুঝাইয়া দিতেছে যে, অবয়বী অণুসমষ্টি হইতে এক অতিরিক্ত পদার্থ।"

কুশাগ্রবুদ্ধি গোতম ঋষি এই চারি সূত্র দ্বারা অবয়ব হইতে অতিরিক্ত স্বতন্ত্র অবয়বী সংস্থাপন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকদিগের মতের সমাচার লইবার জন্য অবয়বী প্রকরণ অধিকার করিয়া ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় আহ্নিকে অপূর্ব্ব যুক্তিরাশির অবতারণ করিয়াছেন।

আশঙ্কা সূত্র—

"বিদ্যাবিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ।"

৪র্থ অ ২য় আ ৪ সূত্র।

যদি অবয়বী প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথাপি ভ্রম প্রমাভেদে জ্ঞান দুই প্রকার বলিয়া ঐ প্রত্যক্ষটা ভ্রম বা প্রমা এই রূপ সংশয় হওয়ায় অবয়বীতে সন্দেহ হইতেছে।

সমাধান সূত্র—

"তদসংশয়ঃ পূর্ব্বহেতুপ্রসিদ্ধত্বাৎ।"

ঐ ঐ ৫ সূত্র।

অবয়বীতে সন্দেহ হইতে পারে না, যে হেতু ২য় অধ্যায়ে প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা তাহা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

আশঙ্কা—

"বৃত্ত্যনুপপত্তেরপি তর্হি ন সংশয়ঃ।"

ঐ ঐ ৬ সূত্র।

তবে অবয়বীর অবস্থিত অসঙ্গত হয় বলিয়া তাহা যে অভাবগ্রস্ত ইহাতেও কোন সন্দেহ আসিতে পারে না।

ঐ আশঙ্কাটা স্পষ্ট হইতেছে—

"কৃৎস্নৈকদেশবৃত্তিত্বাদবয়বানামবয়ব্যভাবঃ।"

ঐ ঐ ৭ সূত্র।

প্রত্যেক অবয়বে অবয়বীর সর্ব্বাংশ দ্বারা বা একাংশ দ্বারা অবস্থিতি অসম্ভব বলিয়া তাহার অভাবই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ইহার তাৎপর্য্য—যদি প্রত্যেক অবয়বে

অবয়বীর সমস্ত অংশেই বর্ত্তমান ইহা মানা যায়, তবে প্রত্যেকে উহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হওয়ার বস্তুর বিষম পরিমাণ হইয়া পড়ে, আর যদি উহাতে অবয়বীর একাংশ বর্ত্তমান এইরূপ স্বীকার করা যায়, তবে প্রশ্ন হয় যে, ঐ একাংশের আধার রূপ অবয়বটা তাহা হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন। প্রথম পক্ষে বিষম পরিমাণের আপত্তি ও অন্তিম পক্ষে আত্মাশ্রয় দোষ।

"আশঙ্কা সূত্র—

তথাপি কি প্রকারে অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হয় এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইতেছে—

"তেষু চাবৃত্তেরবয়ব্যভাবঃ।"

ঐ ঐ ৮ সূত্র।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে অবয়বে অবয়বী বর্ত্তমান না হওয়ায় তাহার অভাব সিদ্ধ হইতেছে।

এই সূত্র ও ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব সূত্র বৃত্তিকার ভাষ্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অবয়বী বৃত্তিশূন্য হউক এই আশঙ্কায় সূত্র

"পৃথক্ চাবয়বেভ্যোঽবৃত্তেঃ।" ঐ ঐ ৯ সূ

অবয়ব হইতে পৃথক্ কোন অবয়বী নাই, যে হেতু উহা বৃত্তিশূন্য।

তাৎপর্য্য—বৃত্তিশূন্য স্বীকার করিলে তাহার নিত্যত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, আর নিত্য অবয়বী আজ পর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টিপথে আ:স নাই। এই স্থলে কাহারও মতে 'অবৃত্তে' এইরূপ সূত্রের স্বরূপ।

অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হউক এই আশঙ্কায় সূত্র—

"নচাবয়ব্যবয়বাঃ।" ঐঐ ১০ সূত্র।

অবয়বীকে অবয়ব বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে আধার আধেয়ভাব অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

সিদ্ধান্ত সূত্র—

"একস্মিন্ ভেদাভাবাদ্ভেদশব্দা প্রয়োগানুপপত্তেরপ্রশ্নঃ।" ঐ ঐ ১১ সূত্র।

তাৎপর্য্য—অনেকের অশেষস্বরূপে সর্ব্বাংশত্ব ও সমুদায় বিশিষ্টের কিঞ্চিৎ অংশস্বরূপ একদেশত্ব এই উভয়েই এক অখণ্ড বস্তুতে অসম্ভব।

প্রকারান্তরে সিদ্ধান্ত—

"অবয়বান্তরভাবেঽপ্যবৃত্তেরহেতুঃ।"

ঐ ঐ ১২ সূত্র

অবয়বী নিজ অবয়বে অংশত থাকিতে পারে না, যে হেতু আধারভূত অবয়ব হইতে অন্য কোন অবয়ব নাই, প্রতিবাদীর এইরূপ অনুমিতি বাক্যে অন্য কোন অবয়ব নাই ইহাকে প্রকৃত হেতু বলা যাইতে পারে না, কারণ অন্য অবয়ব থাকিলেও ঐ থাকিতে না পারাটার কোন প্রতিবন্ধক নাই। তাৎপর্য্য—ঐ হেতুটা অপ্রযোজক।

উক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তিকারীর দোষ প্রদর্শন—"কেশসমূহে তৈমিরিকোপলব্ধিবদুপলব্ধিঃ।" ঐ ঐ ১৩ সূ।

যেরূপ তিমিরগ্রস্ত লোকের এককেশ প্রত্যক্ষ না হইলেও কেশপুঞ্জ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক পরমাণু প্রত্যক্ষ না হইলেও তৎসমষ্টিরূপ মণিমুক্তাদি বস্তুগুলির প্রত্যক্ষ কেন হইবে না?

এই স্থলে "তদসংশয়ঃ পূর্ব্বহেতুপ্রসিদ্ধত্বাৎ" সূত্রদ্বারা ২য় অধ্যায়ের "সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ" সূত্রের যুক্তি যে, পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে, প্রতিবাদী তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।

সমাধান—

"স্ববিষয়ানতিক্রমেণেন্দ্রিয়স্য পটুমন্দভাবাদ্বিষয়গ্রহণস্য তথাভাবো নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ।" ঐ ঐ ১৪ সূত্র।

নিজের বিষয়কে অতিক্রম না করিয়া ইন্দ্রিয়ের যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ তাহাই বিষয়োপলব্ধির উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ, কিন্তু যে ইন্দ্রিয়ের যাহা যোগ্য বিষয় নহে তাহাতে তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়া চক্ষুর অগোচর, তখন সমষ্টি-ভাবাপন্ন উহাকে চক্ষু কি প্রকারে গ্রহণ করিবে।

আশঙ্কা সূত্র—

"অবয়বাবয়বিপ্রসঙ্গশ্চৈব মাপ্রলয়াৎ"। ঐ ঐ ১৫ সূ।

সপ্তম সূত্রোক্ত প্রণালীতে অবয়ব ও অবয়বীর পরস্পর অবস্থিতি নিষিদ্ধ হওয়ায় উহাদের অভাব প্রসঙ্গটা নিখিল বস্তুর অভাবকে ডাকিয়া আনে অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বীর অভাব হেতু কোন পদার্থের ভাব (অস্তিত্ব) সিদ্ধ হয় না।

সিদ্ধান্ত সূত্র

"ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ"। ঐ ঐ ১৬ সূ

নিখিল বস্তুর অভাব প্রতিপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু পরমাণুর সদ্ভাব সিদ্ধ হইতেছে।

ভাষ্যানুবাদ—

অবয়ব বিভাগ অধিকার করিয়া অবস্থিতি নিষেধমূলক অভাব প্রসঙ্গটা নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইতেছে অর্থাৎ পরমাণুর অভাব সিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং উহাদ্বারা সকল বস্তুর অভাব প্রতিপন্ন হয় না। আর পরমাণুকে এইজন্য নিরবয়ব বলা যাইতেছে যে, যে অংশ হইতে আর সূক্ষ্মতর অংশ হইতে পারে না সেই অংশেই বিভাগীয় সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গের সমাপ্তি। এই বিষয়টাই দৃষ্টান্তদ্বারা সুস্পষ্ট করা যাইতেছে। লোষ্ট্রের অবয়ব বিভাগ করিতে যাইয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রমশঃ পরে পরে উহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এই সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গটা যাহা হইতে আর সূক্ষ্ম নাই অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর, সেই স্থলে সমাপ্ত হয়। আর যাহা হইতে অপর সূক্ষ্মতর অংশ প্রমাণ করিতে পারা যায় না, তাহাকেই পরমাণু বলা হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত পক্ষে ঐ পরমাণু জিনিষটা কি এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইতেছে—

"পরং বাত্রুটেঃ"। ঐ ঐ ১৭ সূত্র।

ত্রাসরেণু হইতে অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ তাহার অবয়ব যে দ্ব্যণুক তদীয় অবয়বকে পরমাণু বলা হইয়া থাকে।

এই স্থলে বৃত্তিকার বলিয়াছেন যে, "পরমাণুরেব ক ইত্যত্রাহ ত্রুটেঃ পরং যদতি-সূক্ষ্মং তৎ পরমাণুঃ বাশব্দো হ্যবধারণে অথবা ত্রুটেরবয়বস্তদবয়বো বা পরমাণুরিতি বিকল্পার্থো বা শব্দঃ যদ্বা ত্রুটেঃ পরং সূক্ষ্মং পরমাণুঃ ত্রুটাবেব বা বিশ্রাম ইতি বিকল্পো-ঽভিমতঃ।" অর্থ সহজ।

মহামুনি গৌতম অবয়বী প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া নিরবয়ব প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। ইহাতে শূন্যবাদীর সমালোচনা হইয়াছে।

আশঙ্কা সূত্র

"আকাশব্যতিভেদাত্তদনুপপত্তেঃ।" ঐ ঐ ১৮ সূত্র।

ঐ নিরবয়ব পরমাণু যুক্তিসঙ্গত নহে, কেন না উহার অভ্যন্তরে ও বাহিরে আকাশ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

তাৎপর্য্য—যাহার অভ্যন্তরে ও বাহিরে আকাশ রহিয়াছে তাহা সাবয়ব সুতরাং অনিত্য।

অপর আশঙ্কা—

"আকাশা সর্ব্বগতত্বং বা।" ঐ ঐ ১৯ সূ।

আর যদি বল যে নিরবয়ব বলিয়া পরমাণুর অভ্যন্তরে আকাশ নাই, তবে তাহার সর্ব্বমূর্ত্ত-সংযোগিত্ব রূপ সর্ব্বব্যাপিত্ব সিদ্ধ হয় না।

সিদ্ধান্ত—

"অন্তর্ব্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তর বচনাদকার্য্যে তদভাবঃ।" ঐ ঐ ২০ সূ।

অবয়ব বিশেষের অভিধায়ক বলিয়া অন্তর শব্দ ও বহিঃশব্দ কার্য্যদ্রব্যেই প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু নিত্য দ্রব্যে নহে।

সিদ্ধান্ত পক্ষ—

"অব্যূহাবিষ্টম্ভ বিভুত্বানি চাকাশধর্ম্মাঃ।" ঐ ঐ ২২ সূ। ব্যূহ শূন্যতা (প্রতিহত হইয়া পশ্চাৎ চলিয়া না আসা) বিষ্টম্ভ শূন্যতা আগের দিকে রুদ্ধ গতি না হওয়া ও ব্যাপকত্ব এই তিন আকাশের ধর্ম্ম।

তাৎপর্য্য—আকাশে স্পর্শ গুণ নাই বলিয়া ব্যূহ ও বিষ্টম্ভ তাহাতে কল্পনা করা যাইতে পারে না।

আশঙ্কা সূত্র—

"মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়ব সদ্ভাবঃ।" ঐ ঐ ২৩ সূত্র।

পরমাণুর অবয়ব সদ্ভাব সিদ্ধ হইতেছে, কেন না মূর্ত্ত পদার্থ মাত্রই অবয়ব সন্নিবেশ বিশিষ্ট।

অন্য আশঙ্কা—

"সংযোগোপপত্তেশ্চ।" ঐ ঐ ২৪ সূ

পরমাণুর সংযোগ স্বীকার করা হইয়াছে এই জন্যও তাহার অবয়ব সদ্ভাব সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

এই স্থলে পূর্ব্ব সূত্র হইতে অবয়ব সদ্ভাবের অধিকার হইয়াছে। আর সংযোগ অব্যাপ্য বৃত্তি বলিয়া তাহার অবচ্ছেদক রূপ অবয়ব সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

সিদ্ধান্ত সূত্র—

"অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেশ্চা প্রতিষেধঃ।" ঐ ঐ ২৫ সূত্র।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব নিষেধ নির্যুক্তিক, কেন না ইহা অনবস্থা দোষ আনয়ন করে এবং উহা বিশেষ অনিষ্টজনক অর্থাৎ তাহার অবয়ব ইত্যাদি প্রণালীতে কোন স্থলে অবয়ব ধারার বিশ্রাম না হওয়ায় মেরু সর্ষপের তুল্য পরিমাণাপত্তি হইয়া থাকে।

এই স্থলে বিবেচ্য যে, যখন পরমাণু পর্য্যন্ত মেরু সর্ষপের অবয়ব ধারায় স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অন্তর রহিয়াছে, তখন পরমাণুর উপরবর্ত্তী অবয়ব ধরিয়া ঐ উভয়ের তুল্যতা-পত্তি কি প্রকারে হয়।:তাৎপর্য্য—দৃষ্ট-অবয়ব-গত ভিন্নতা কি প্রকারে অদৃষ্ট অনন্ত অবয়বের মহিমায় দূর হইবে?

ফলতঃ পরমাণুর নিরবয়বত্ব সম্বন্ধে ২৩ ও ২৪ সূত্রে যে দোষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা "বজ্র লেপয়তে" নীতিরই অনুসরণ করে বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক মহর্ষি গোতম যে, এই সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তদীয় লোকোত্তর মহত্বই সূচিত হইয়াছে। আর ইহাও অসত্য নহে যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্বিক্ষিকী বিদ্যা অপর অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে প্রদীপ স্বরূপই বটে। এই স্থলে ইহা বলিলেও অন্যায় হইবে না যে, আন্বিক্ষিকী বিদ্যার সহিত পরিচয় না ঘটিলে কোন আর্য্য বিদ্যারই অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও এই বিদ্যাকে কথার তর্ক বলিয়া উপহাস করিতে অন্যায় মনে করেন না। তবে ইহা সত্য যে, এই বিদ্যার ব্যুৎপত্তি লাভ করা সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ।

অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেখ ফরিদকে প্রেরণ, যুদ্ধ-জয়, বিদ্রোহীদিগকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ। বাখ্‌তরাম বন্দী।

এই সময়ে বর্ম্মাচ্ছাদিত দশ সহস্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী এবং পাঁচ সহস্র উষ্ট্রারোহী বন্দুকধারী সৈন্য সঙ্গে লইয়া সেখ ফরিদ আমির-উল-উমরাওয়ের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনে বিপক্ষ-সৈন্যের প্রবল বেগ প্রতিহত হইল। যখন উভয় পক্ষে এইরূপ ঘোরতর ও অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন একজন রাজপুত তরবারি হস্তে সেখ ফরিদকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। সেখ ফরিদ এই সময়ে কোনও অগ্রবর্ত্তী পতাকাতলে অবস্থান করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক অনুচরের হস্ত হইতে তাহার শূল কাড়িয়া লইয়া সেখ ফরিদ আততায়ীর বক্ষের প্রতি এমন অব্যর্থ সন্ধান করিলেন যে, বক্ষঃ ভেদ করিয়া শূলের অগ্রভাগ পৃষ্ঠদেশে বাহির হইয়া পড়িল। হতভাগ্য তাহাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। রাজকীয় সৈন্যের উন্নততর বীর্য্য-পরাক্রম এইবার প্রতিভাত হইল। তাহাদিগের তরবারি-মুখে বহুসংখ্যক রাজপুতের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যাহারা ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইল, তাহারাও বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদিগের মধ্যে প্রায় চারি সহস্র বন্দী হইয়া আমার আদেশে হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত হইল। যাহাতে অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ইহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পুনরায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদানের জন্যই আমি উল্লিখিত আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল ও চক্রান্তকারী ব্যক্তিগণ পুনরায় এইরূপ রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত না হয়, তাহার জন্য এই বিদ্রোহি-দলের নায়ক বাখ্‌তরামকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

দুষ্কৃতিকারিগণই দণ্ডার্হ

বাহাদুর খাঁ নামক জনৈক উজবেক দলপতি এই উপলক্ষে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার নিজের দেশে যে কোন রাজার অধীনে এইরূপ বিদ্রোহ-ব্যাপার সংঘটিত হইলে সমগ্র জাতিকে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উন্মূলিত করিয়া ফেলা হইত। তাহার কথার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমার পিতার রাজত্বে এই রাজপুত জাতি বিশ্বস্ততার সহিত রাজসরকারে কার্য্য করিয়া অন্যান্য জাতির তুলনায় অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে যদি তাহারা আপনাদিগকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষত্রিয়-বল-সম্পন্ন ও উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাতে বিশেষ কোন বিস্ময়ের কারণ নাই। অপর পক্ষে বিপথে পরিচালিত কতিপয় দুষ্কৃতিকারীর অপরাধের জন্য সমগ্র জাতির মূলোচ্ছেদ করা কখনও ন্যায় ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। দুর্ব্বৃত্তের শাস্তি প্রদান দ্বারা অন্যান্য দুষ্কৃতিপরায়ণদিগকে শিক্ষা দান ব্যতীত দণ্ড প্রদানের আর কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।

পদগৌরব প্রদান ও কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

আমার রাজত্বকালে যে সমস্ত বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীর পদোন্নতি হইয়াছে এবং

যাহারা তাহাদের বিশ্বস্ততার নিদর্শনস্বরূপ উপযুক্ত পুরস্কার ও রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি এক্ষণে তাহাদিগের কথাই বিশদভাবে উল্লেখ করিব।

খোজা জাকেরিয়ার ক্ষমালাভ।

খোজা মহম্মদ যাহেয়ার পুত্র খোজা জাকেরিয়া অনেক কারণে আমার বিরাগভাজন ও রাজসম্মানলাভে বঞ্চিত হইলেও অকলঙ্ক-চরিত্র প্রখ্যাতনামা ঋষিতুল্য সেখ হোসেন জামির অনুরোধে আমি তাহাকে পাঁচ শত সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলাম। আমার সিংহাসন আরোহণের ছয় মাস পূর্ব্বে এই পূতচরিত্র মহাত্মা আমার নিকট একটী আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমি সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইব। আর যদি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়, তাহা হইলে এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরোধে আমি যেন খোজা যাহেয়ার পুত্রকে ক্ষমা করি। এই জন্যই আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলাম।

বীরবিক্রম তোষ খাঁ বেগ।

তোষ খাঁ বেগ নামক আমার একজন অনুচরের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। এই ব্যক্তি আমার পিতামহ হুমায়ুনের রাজত্বকালে সৈনিকের কার্য্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে এবং আমার খুল্লতাত মহম্মদ হাকিম মির্জার অধীনে আমীর পদ প্রাপ্ত হয়। তোষ খাঁ কাবুলের অধিবাসী ছিল এবং আমার পিতা তাহাকে এই উপাধি প্রদান করেন। তাহার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ আমি তাহাকে বহুমূল্য প্রস্তরখচিত জিঘা ও কিরীচ এবং বহুমূল্য সুসজ্জিত অশ্বের সহিত দুই সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দিলাম। যদিও তাহার বয়স কথঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে, এবং নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাজির মধ্যে দুই একটী পক্ককেশ পরিলক্ষিত হইতেছে, তথাপি তাহার অপূর্ব্ব বীরোচিত কান্তি ও মুখশ্রী এখনও বহুলাংশে বিদ্যমান আছে।

বেহাজ বেগ খাঁর কার্য্যতৎপরতা ও ধর্ম্মবিশ্বাস।

বেহাজ বেগ খাঁ নামক অপর একজন কাবুল নিবাসী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে আমি সার্দ্ধৈক সহস্র হইতে ত্রিসহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্বে নিয়োগ করিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমার খুল্লতাত মহম্মদ হাকিমের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহাঁর পার্শ্বচর আমীরগণের মধ্যে ইনি পদগৌরবে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কার্য্যকরী ক্ষমতা এত অধিক যে, কচিৎ অন্য কাহারও মধ্যে সেরূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উপযুক্ত সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি সর্ব্বত্র সুযশ ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অটল ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে। বলিতে কি, ইহার পর কয়েক দিবসের মধ্যে আমি অনূ্ন এক শত কাবুলবাসীকে উপযুক্ত রাজসম্মানের সহিত উন্নত পদগৌরব প্রদান করিয়াছিলাম।

মীর্জ্জা আবুল কাসেমের প্রতিপত্তি ও পুরস্কার।

আমার পিতার প্রাচীন অনুচরবর্গের মধ্যে মীর্জ্জা আবুল কাসেমকে এক সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্ব হইতে সার্দ্ধ এক সহস্রের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। সৈন্যবিভাগে এবং অন্যান্য কার্য্যে তাহার বেশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাহার

ত্রিশটী পুত্রের মধ্যে একটীও তাহার সামান্য মাত্র উপকারে আসিল না। আর ইহাও বড় দুঃখের বিষয় যে, বহু পুত্রের পিতা হইয়া পুত্রজনিত সুখভোগ করা অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

সেখ আলি ও তাহার মিতাচার।

আজমীরনিবাসী সেখ সলিমের পৌত্র সেখ আলিকে দুই সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক-স্বরূপে আমি আমির-পদ প্রদান করিলাম। এতদ্ব্যতীত উচ্চ রাজসম্মানসূচক খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহার জনৈক শ্রদ্ধেয় আত্মীয়ের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য এককালে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করিলাম। আমার জন্মের এক বৎসর পরে সেখ আলি জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মাবধি একই প্রকোষ্ঠে লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার বংশের মধ্যে তাহার ন্যায় সাহসী যোদ্ধা একজনও বিদ্যমান নাই। সে আজীবন কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে নাই। বলিতে কি, আমি তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহের চক্ষে অবলোকন করি এবং আশা করি, এক দিন না এক দিন তাহার সম্বন্ধে আমার উচ্চ আশা বাস্তব সত্যে পরিণত হইবে।

সৈয়ফ খাঁর কর্ম্মতৎপরতা ও মিতাচার।

প্রকৃত সৈয়দ-বংশাবতংস সৈয়দ মামুদ আমার পিতার সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ আমির বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইহাঁর উপযুক্ত বংশধর ও পুত্র সৈয়দ আলি আসুফকে অতঃপর সৈয়ফ খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিলাম। মনোমুগ্ধকর বাগ্‌জালে প্রতারিত করা ইহার প্রকৃতি নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহার ন্যায় একজন কর্ম্মতৎপর ব্যক্তি আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। অপরিণামদর্শী ও দ্রুতভাষী লোকদিগকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। সমস্ত জীবনের মধ্যে সৈয়ফ খাঁ একটীমাত্র অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই এবং মাদক দ্রব্য তিনি জীবনেও স্পর্শ করেন নাই। বর্ত্তমান বৎসরেই আমি তাঁহাকে যে কোন শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি।

ফেরী দৌনের সিংহের সহিত যুদ্ধ ও রণবিক্রম।

অতঃপর মহম্মদ কুলী খাঁর পুত্র ফেরী দৌনকে এক সহস্র মাদলী সৈন্যের অধিনায়কত্ব হইতে দুই সহস্রে উন্নীত করিলাম। এই ব্যক্তি একটী প্রাচীন ও প্রখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তাহার বদান্যতা ও সাহসিকতা জনপ্রসিদ্ধ। এক হস্ত কম্বলে আচ্ছাদন করিয়া অন্য হস্তে তরবারী ধারণ পূর্ব্বক সে একাধিকবার দুর্দান্ত সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। প্রতিবারেই দেখা গিয়াছে যে, সিংহের মুখমধ্যে এক হস্ত প্রবেশ করাইয়া অন্য হস্তে তাহাকে ক্রমাগত তরবারি দ্বারা আঘাত করিতে করিতে সে সেই হিংস্র পশুকে একেবারে নিহত করিয়া ফেলিয়াছিল। গানাম পাল- পরগণার অধিপতির সহিত শত্রুতা আরম্ভ হইলে সে এক সময়ে একমাত্র আত্মবাহুর প্রতি নির্ভর করিয়া ইহার ও ইহার অনুচরবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। এই ব্যাপারে যদিও তাহার দেহ বহু স্থানে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি উপযুক্ত সাহায্য আগমন কাল পর্য্যন্ত সে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল।

বন্ধুত্ব ও সাধারণ স্বার্থের সংঘর্ষ। হত্যাপরাধে মীর্জা নূর।

এই সময়ে আমার উপর এক গুরুতর

দায়িত্বভার অর্পিত হইল। ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য এই উভয়বিধ স্বার্থের সংঘর্ষে আমাকে এই সময়ে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। খাঁ-ই-আজিমের পুত্র মীর্জা নুর নরহত্যার অভিযোগে আমার সম্মুখে আনীত হইলে আমি তাহার অভিযোক্তাদিগের সহিত তাহাকে প্রধান বিচারপতি ও কাজির নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিলাম যে, ন্যায় ও আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহার সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি যেন তাহারই সাহায্যে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করেন। এরূপ করিবার হেতু এই যে, এই ব্যক্তি আমার পিতার নিকট হইতে চিরকাল পুত্রবৎ স্নেহ লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং বহুবিধ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াও পিতা তাহাকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন। ইহার সন্তোষ সাধনের জন্য আমার পিতা সর্ব্বদা চেষ্টিত ছিলেন।

প্রাণদণ্ডের আদেশ।

যথাকালে সংবাদ আসিল যে, বিচারকেরা তাহাকে নরহত্যাপরাধে অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডই মহম্মদীয় শাস্ত্রের বিধান, সুতরাং এই হতভাগ্য ব্যক্তির প্রতি অত্যধিক স্নেহ এবং তাহার পিতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করিলেও আমি ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলাম না, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে ঘাতকের হস্তে প্রদান করিলাম।

রাজার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব।

এই সময় হইতে এক মাস কাল ধরিয়া আমি তাহার মৃত্যুজনিত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম, ঈদৃশ অল্প বয়সে এরূপ বহু কর্ম্মকুশল যুবকের মৃত্যু গভীর পরিতাপের বিষয় হইলেও অন্য কোনও উপায় ছিল না। আমাদিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক নীরস ও অপ্রীতিকর কার্য্যে বাধ্য করিলেও আমরা তাহার পরিহার করিতে পারি না। বর্ত্তমান ঘটনায় যুবকটীকে মুক্তি প্রদান করিলে তাহার পরিণাম এই দাঁড়াইত যে, সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই প্রত্যেকে অবাধ নররক্তপাত দ্বারা ব্যক্তিগত ক্ষতির প্রতিশোধ লইত। ইহা রাজ্যের মঙ্গলের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। যে ব্যক্তি নিজ দেশের আইন লঙ্ঘন করে, তাহাকে অবিলম্বে ন্যায়-ধর্ম্মানুমোদিত শাস্তি প্রদান করাই শাসনদণ্ড-পরিচালনকারী ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

ঐতিহাসিক খাঁ-ই আজিম।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে পিতা খাঁ-ই আজিম কিছুকাল দুঃখে অতিবাহিত করিলেন। ভগবানের বিধান কিছুতেই লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না, সুতরাং দুঃখ বৃথা; এই চিন্তা করিয়া অল্প দিন পরেই তিনি এই বিষাদজনক স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। প্রখ্যাতনামা আমীর খাঁ-ই আজিম নেস্তালিক ভাষায় সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার চিত্তদ্রবকারিণী কোরাণের আবৃত্তি শুনিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। অতীত ইতিহাস স্মরণ রাখিতে তিনি নকীব খাঁর পরে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

আসফ খাঁর কলঙ্ক।

খাঁ-ই আজিমের ন্যায় আসফ খাঁও কোরাণের সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রখর বাগ্মিতাশক্তি ছিল; কথোপকথনকালে সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আনন্দপূর্ণ ও জীবন্তভাব বিতরণ

করিতে তাঁহার ন্যায় আর কেহ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইতেন না। আমার পিতার সময়ে যে সকল আমীর তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে প্রখ্যাতনামা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার প্রতি আমি উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এরূপ শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ গুণের অধিকারী হওয়া কচিৎ কাহারও অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। বলিতে দুঃখ হয়, তাঁহার চরিত্রের একটীমাত্র কলঙ্ক তাঁহার সদ্‌গুণরাশিকে কালিমামণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে। বদান্যতারূপ সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত হওয়া চরিত্রের পক্ষে একটী মহা-কলঙ্কের বিষয়। তাঁহার ন্যায় একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা আরও দোষের কারণ হইলেও তিনি আদৌ মুক্তহস্ত ছিলেন না। সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুসুমের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধি সমস্তই হরণ করে, সেইরূপ অর্থলালসা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার ইহকাল ও পরকালের পথ কণ্টকময় করিয়া তুলে। আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, দানশীলতাই মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ এবং এই দানশীলতার জন্যই মানবহৃদয় অশেষ সৌন্দর্য্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। আসফ খাঁর আর একটী কলঙ্ক এই যে, তিনি কখনও উপাসনা করেন না। এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে বলিতে শুনিয়াছি যে, নানা প্রকার প্রলোভনের দ্বারা পরিবৃত ও আক্রান্ত হইতে হয় বলিয়া তিনি উপাসনা করিতে পারেন না। আমার পিতার অনুমতিক্রমে যদিও তিনি মক্কায় গমন করেন এবং বাহ্য ভক্তির সহিত যথারীতি বিহিত কর্ম্মাদি সম্পন্ন করেন, তথাপি তাঁহার চরিত্রের কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত হয় নাই। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমার পিতার সহিত পুনর্ম্মিলন কালেও তাঁহার এই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যপ্রণালী পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

মোয়েজ-উল-মোল্কের সরলতা ও সত্যবাদিতা।

মোয়েজ-উল-মোল্ক পাঁচ শত সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে সহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পদগৌরব বৃদ্ধি করিলাম। আমার পিতার সময়ে উল্লিখিত উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি মোয়েজ-উল্-হোসেন বলিয়া পরিচিত এবং স্বর্ণকার-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আমি তাঁহাকে দেওয়ান অর্থাৎ রাজপরিবারের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহার অন্য কোন সদ্‌গুণ না থাকুক, তাঁহার অসামান্য সরলতা আন্তরিক সত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তিনি বেশ সুন্দরভাবে লিখিতে পারেন। এই দুইটী গুণের জন্য আমি তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সেখ বায়েজিদ।

আজমীরনিবাসী সেখ সলিমের অন্য একটী পৌত্র সেখ বায়েজিদকে দ্বি-সহস্র হইতে ত্রিসহস্র সৈন্যের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। আমি সর্ব্ব প্রথমে ইহারই মাতার স্তন্যপানে জীবনধারণ করিয়াছিলাম। তাহার এমন অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতা আছে যে, তাহাকে যে কোন কার্য্যে নিয়োগ কর না কেন, সে সেই কার্য্যেই নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিবে।

ক্রমশঃ।

ভারতী মঙ্গল-কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রক শিতের পর)

পয়ার

পঞ্চ ভাই কৃষ্ণা সনে গোপনীয় বেশে।
দ্রুতগতি চলি যায় বিরাটের দেশে ॥
সকল দিবস গেল এমত প্রকারে।
হেন কালে গেলা সূর্য্য অস্ত গিরিপরে ॥
পঞ্চ ভ্রাতা মিলি তথা করেন যুকতি।
হইল ত্রিযামা অদ্য এথা করি স্থিতি ॥
বিস্তারিত নহে পথ সঙ্কীর্ণ শরণি।
অনুমানে বুঝি দূরে হবে রাজধানী।
এত জানি সেই রাত্রি তথাতে বঞ্চিয়া।
বিরাট নগরে চলে প্রভাতে উঠিয়া ॥
প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামধারী।
স্বর্ণময় পাশা সারি কক্ষস্থলে করি ॥
বিরাটের কাছে অতি দ্রুত উত্তরিল।
দ্বিজ বলি-নৃপতিকে আশীষ করিল।
নতি করি পুছে রাজা করিয়া বিনয়।
কোথা ধাম কিবা নাম দেও পরিচয় ॥
পাণ্ডব বলেন তাঁরে কঙ্ক নাম মোর।
দ্বিজ জাতি বটি আমি হস্তিনাতে ঘর ॥
বিশিষ্ট বিধান মতে জানি পাশা সারি।
রহিব এখানে যদি রাখ দয়া করি ॥
বিরাট এমত শুনি অতি সমাদরে।
সভার প্রধান করি রাখিল তাহারে ॥
বল্লভ রাখিয়া নাম মরুত আত্মজে।
মল্লবেশে দর্ব্বী হস্তে আইল সভা মাঝে ॥
রন্ধনে পাটব অতি ভূপে জানাইয়া।
রহিলেন বৃকোদর সূপকার হৈয়া ॥
বৃহন্নলা নাম রাখি ক্লীব রূপ ধরি।
হৃদয়ে কাঁচুলী দিব্য রক্ত বস্ত্র পরি ॥
উত্তম সুনাদ যন্ত্র লয়ে ধনঞ্জয়।
নাচিতে গাহিতে আইল ভূপের আলয় ॥
সঙ্গীতের অধ্যাপক হৈয়া রৈলা তিনি।
সৌরিন্ধ্রী হইয়া আইলা দ্রুপদনন্দিনী ॥
গাভী অশ্ব এই দু'য়ের চিকিৎসক হৈয়া।
মাদ্রীসুত দুইজন মিলিল আসিয়া ॥
গোপনেতে ছয় জন তথা করে বাস।
দ্রৌপদীর যোগে হৈল কীচক বিনাশ ॥
লক্ষে লক্ষে অনুচর প্রেরি দুর্য্যোধনে।
পাণ্ডব বিচারি না পাইল কোন স্থানে ॥
গান্ধারীনন্দন কাছে সুশর্ম্মা কহিল।
কীচকের ভ্রাতা সনে গন্ধর্ব্বে মারিল ॥
অসংখ্য আছয়ে গাভী বিরাট রাজার।
রণে হরি আনি আজ্ঞা পাইলে তোমার ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত চিতে।
বিরাট নগরে চলে বাহিনী সহিতে ॥
কিছু সেনা সঙ্গে লয়ে সুশর্ম্ম আপনে।
আসিল ত্বরিতে অতি গোগৃহ দক্ষিণে ॥
লইল সকল গাভী বলেতে কাড়িয়া।
জানাইল বিরাটের রক্ষকে আসিয়া ॥
কঙ্ক আদি চারি বীর সংহতি করিয়া।
সৈন্য সনে রণে চলে বিরাট সাজিয়া ॥
মহা যুদ্ধ হৈল তথা সুশর্ম্মার সনে।
তাতে অব্যাহতি হৈল ভীমের কারণে ॥
উত্তর গোগৃহে দুর্য্যোধন হেন কালে।
কৌরব বাহিনী সনে তূর্ণ আসি মিলে ॥
হরিয়া লইল গাভী অতি রঙ্গ মনে।
রক্ষকে কহিল আসি বৈরাটীর স্থানে ॥
শুনি কোপে রণে চলে উত্তর নৃপতি।
এক রথে বৃহন্নলা করিয়া সারথি।
দৃঢ় করি কালীপদ নিজ চিত্ত মাঝে।
ভারতী মঙ্গল গীত ভণে ভূপাত্মজে ॥

ত্রিপদী।

বিরাট নন্দন রঙ্গে, বৃহন্নলা করি সঙ্গে
উত্তর গোগৃহে উত্তরিলা।
দেখি কৌরবের দল; ভয়ে চিত্ত টলমল
বলে ফিরি চল বৃহন্নলা ॥

পার্থ বলে নৃপসুত বাক্য বল অদ্ভুত
শক্র তোকে কৈল কোন্ পীড়া।
পলাইয়া গেলে ঘরে, অপযশ পরস্পরে,
লোকমুখে পাবে বড় ব্রীড়া॥
না শুনে পার্থের ভাষ পাইয়া অতিশয় ত্রাস
রথ ছাড়ি যায় পলাইয়া।
অর্জ্জুন বিদ্যুত প্রায়, পাছে তার ধাইয়া যায়
রথে আনি তুলিল ধরিয়া॥
দেখিয়া কৌরবগণে, অত্যন্ত বিরস মানে
দেখে সবে বিপরীত অতি।
রথ ছাড়ি যোদ্ধা যায়, তাড়া দিয়া ধরি তায়,
রথোপরে তুলিল সারথি॥
বলে সব বীরগণ, এক রথে কোন জন,
আসিবেক এমত সাহসে।
কিবা দেব পশুপতি, কিবা দেব বলারাতি,
নহে বীর ধনঞ্জয় আইসে॥
তথা বৈরাটীর স্থানে, বলে পার্থ সাবধানে
ভূপাঙ্গজ না ভাবিও ভয়।
সারথি হইলে তুমি, সমর করিব আমি,
মোর নাম বটে ধনঞ্জয়॥
উত্তর এমত শুনি, মহা ধন্য ধন্য মানি,
বলে আমি হইব সারথি।
আসিল আকাশ হতে, তুরঙ্গ সজ্জন সাথে,
পার্থ তাহে চড়ে শীঘ্রগতি।
বৈরাটী সারথি হৈয়া, তাড়িল পাঁচনী দিয়া,
খঙ্গ সম চলে চারি হয়।
বাম হস্তে ধনু ধরি, আটোপে টঙ্কার করি,
শঙ্খ বাদ্য করে ধনঞ্জয়॥
গেল অতি তূর্ণ গতি, যথা আছে নরপতি
উভয়ত পরিচয় হৈল।
অতি কোপে দুই বীরে, পূর্ব্বে বাক্যযুদ্ধ করে
অস্ত্ররণ পরে আরম্ভিল॥
অর্জ্জুন কুপিয়া মনে, চণ্ড শরাসন টানে,
উল্কা সম নিক্ষেপয় শর।
দ্রৌপদীর দুঃখ স্মরি, হানে সিংহনাদ পুরি,
চমকিত অম্বরে অমর॥

দৃঢ় কোপে হানে তূর্ণ, রথে কেতু কৈল চূর্ণ
মূর্চ্ছিত হইল দুর্য্যোধন।
অর্জ্জুনের বাণাঘাতে বীর পড়ে শতে শতে,
ত্রাসে ঘন কাঁপে সেনাগণ॥
হেন দেখি কর্ণবীরে, অর্জ্জুনের সগোচরে
রথ আনি দিল শীঘ্রগতি।
কর্ণ বলে পার্থ বীর, ক্ষণ মাত্র হও স্থির
খণ্ডাইব যুদ্ধের আরতি॥
সুসঙ্গ নগরে বাস, হর পার্ব্বতীর দাস,
রাজসিংহ অভিধান দ্বিজে।
যেন মত আছে জ্ঞান, পদ করি নিরমাণ,
ভণে ভারতীর পদাম্বুজে॥

পয়ার।

কর্ণের বচনে হাসি বলে ধনঞ্জয়।
স্থির হও সূতপুত্র ঘুচাব সংশয়॥
ইহা বলি তীক্ষ্ণ ইষু যুড়ি শরাসনে।
কর্ণের হৃদয়ে হানে আরক্ত লোচনে॥
পঞ্চ বাণে ধ্বজ ঘোড়া রথ দশ শরে।
দ্বাদশে কার্ম্মুক নাশি সিংহনাদ করে॥
কর্ণে অন্য চাপ লৈয়া আকর্ণ পুরিয়া।
হানিল পার্থের বক্ষে অত্যন্ত কুপিয়া।
নিক্ষেপে অসংখ্য ইষু নাহি অবসান।
গাণ্ডীবের গুণ ছেদে ক্ষেপি তিন বাণ॥
বিশিষ্ট আয়ুধে পুন এই অবসরে।
পার্থের ললাটে কর্ণ হানিল নির্ভরে॥
প্রমত্ত পন্নগ পুচ্ছে যেন দিলে হাত।
তেমত অর্জ্জুনে কুপি গর্জ্জয়ে নির্ঘাৎ॥
কম্পিত অধর 'গণ্ড আরক্ত লোচনে।
অমোঘ আয়ুধ পার্থে কর্ণ প্রতি হানে॥
ক্ষণেকে বিরতি হৈল কর্ণ মহাবীর।
বাণাঘাতে জর্জ্জরিত সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
প্রাণ লৈয়া পলায়ন কৈল সেনাপতি।
এই ছিদ্রে পার্থে করে বাহিনী দুর্গতি
কৃপ দুঃশাসন দ্রোণ দ্রৌণী শান্তনবে।
বৈর[redacted]র হারে ক্রমে ক্রমে সবে॥

কুপিত অর্জ্জুন কাছে কেহ যাইতে নারে।
যাকে দেখে বিদ্যমানে তাহাকে সংহারে॥
কুলিশ সমান ইষু যুড়িয়া গাণ্ডীবে।
স্মরি বনবাস দুঃখ হানয়ে পাণ্ডবে॥
কৌরব বাহিনী যেন শুখান ইন্ধন।
তাতে ধনঞ্জয় হৈল মহা হুতাশন॥
ক্ষণেকে নাশিল সেনা বাণ বরষিয়া।
না রহে সমরে কেহ যায় পলাইয়া॥
অনায়াসে করি জয় লৈয়া গাভীগণ।
বৈরাটীর সঙ্গে পার্থ আসিল ভবন॥
উত্তরে কৌরব জিনে শুনিয়া নৃপতি।
আনন্দে পুলক অতি হরষিত মতি॥
কঙ্কাদি পাণ্ডব হেন পাইয়া পরাজয়।
আর্জ্জুনিতে উত্তরাকে দিল পরিণয়॥
শ্রীহরিকে আনি পরে রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দূত করি পাঠাইল হস্তিনা নগরে॥
অতি তূর্ণ গেলা প্রভু দুর্য্যোধন স্থানে।
কহিলা সম্বাদ সব বিশিষ্ট বিধানে॥
দুর্য্যোধন বলে বাক্য শুন গদাধর।
না দিব রাজ্যেতে ভাগ না হৈলে সমর॥
ধর্ম্মসুত স্থানে আসি কহে চক্রপাণি।
শুনি ভূপে আরম্ভিল সজ্জ বাহিনী॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা কৈলা যুধিষ্ঠিরে।
একাদশ অক্ষৌহিনী দুর্য্যোধন করে॥
উভয়তঃ যুক্তি করি কুরুক্ষেত্রে গেলা।
দুই সেনা সুসজ্জিত সমরে থাকিলা॥
রণভেরী কাড়াপড়া বাজে ঢাক ঢোল।
তুরঙ্গ বারণ নাদে হৈল মহারোল॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এক বারে।
শঙ্খ সিংহনাদে অতি ঘোর শব্দ করে॥
কৌরব বাহিনীপতি ভীষ্ম মহাবীর।
সর্ব্ব অগ্রে রথে তিষ্ঠে সেনা করি স্থির।
ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল পাণ্ডবের সেনাপতি।
দিব্য রথে চলি আইল অতি তূর্ণ গতি॥
বাহিনীর মধ্যভাগে রাজা যুধিষ্ঠির।
চারি দিকে ভূপ সব মহাশূরবীর॥

শত ভ্রাতা সঙ্গে স্বর্ণ রথে দুর্যোধন।
সমরে আইল সাথে বহু নৃপগণ॥
অগ্নিদত্ত রথে পার্থ শ্রীহরি সারথি।
নক্ষত্র ভিতরে যেন শোভে নিশাপতি॥
কৃষ্ণ স্থানে ধনঞ্জয় বলিলেন বাণী।
দুই সেনা মধ্যে রথ রাখ চক্রপাণি॥
এত শুনি মধ্যে প্রভু নিলেন স্যন্দন।
ধনঞ্জয় বলে প্রভু শুন নারায়ণ॥
কুটুম্ব বান্ধব বন্ধু বিনাশি সকল।
এমতে রাজত্বে প্রভু কহ কোন্ ফল॥
বিস্তর কহিলা যোগ হরি অর্জ্জুনেতে।
ভ্রম ভাঙ্গি ধনঞ্জয় ধনু লৈল হাতে॥
তবে আরম্ভিল রণ কুপি দুই দলে।
মহাঘোর অন্ধকার হৈল দিবাকালে।
ভারতী চরণ অব্জে করি শত নতি।
ভণে পদ নাম দ্বিজ রাজ মৃগপতি॥

ত্রিপদী।

ভীষ্ম চড়ি দিব্য রথে, প্রকাণ্ড কার্ম্মুক হাতে,
তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে বরিষণ।
লক্ষে লক্ষে বীর পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
অশ্ব রথ সংহারে বারণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন হেন দেখি, কোপে রক্তবর্ণ আঁখি,
ভীষ্মকে হানিল বহু শরে।
অষ্টাধিক শতরথী, নাশি অতি তূর্ণগতি,
ঘোর শব্দে সিংহনাদ করে॥
দেখি কর্ম্ম অদ্ভুত, লজ্জিত জাহ্নবীসুত,
তীক্ষ্ণ শর কোপ চিত্তে হানে।
নিক্ষেপে অসংখ্য শর, কৈল তনু জর জর,
কার্ম্মুক কাটিল চারি বাণে॥
কোপ করি ভীষ্মে হানে, গগন ভরিল বাণে,
মূর্চ্ছান্বিত দ্রুপদ কুমার।
সারথি শতাঙ্গে লৈয়া, ত্রাসে গেল পলাইয়া,
ভীষ্ম করে সেনার সংহার॥
হেন দেখি নারায়ণে, কহে অর্জ্জুনের স্থানে,
দেখ ভীষ্ম বাহিনী বিনাশে।

অর্জ্জুনে এমত শুনি, অতি কোপে কহে বাণী,
নেও রথ শান্তনব পাশে ॥
সারথি ত্রৈলোক্যপতি, ক্ষিপ্র কর রথের গতি,
ভীষ্ম কাছে উত্তরিল তূর্ণ।
ধনঞ্জয় দেখি বীরে, হানে বহু দিব্য শরে,
যুগল লোচন কোপে ঘূর্ণ ॥
পার্থ দিব্য দুই বাণে, ভীষ্মের চরণে হানে,
পুন দশে হানিল ললাটে।
হৃদে হানে সপ্তদশে, তিন বাণে ধ্বজ নাশে,
সপ্ত শরে শরাসন কাটে ॥
অন্য চাপ লৈয়া করে, স্থির হৈয়া ভীষ্মবীরে,
অতি কোপে অর্জ্জুনকে হানে।
মহাবীর ধনঞ্জয়, সে বাণ করিল ক্ষয়,
আসিতে আকাশে তীক্ষ্ণ বাণে ॥
কোপিয়া জাহ্নবী সুতে, [illegible] অলক্ষিতে,
পঞ্চবাণে করিল সংহার।
বজ্রসম শত বাণে, পার্থের হৃদয়ে হানে,
শিরে দশে করিল প্রহার ॥
দ্বাদশ নারাচে পুনি, নির্ঘাতে কৃষ্ণকে হানি,
ভল্লবাণে হানিল বানর।
ক্ষেপি ইষু তূর্ণ অতি, সংহারে সহস্ররথী,
মৃগপতি যেন করিবর ॥
কৃষ্ণ বলে ধনঞ্জয়, করিল বাহিনীক্ষয়,
শান্তনবে তব বিদ্যমানে।
দ্রুপদ সুতার ঋণ, উদ্ধারিবে কোন্ দিন,
আর যত দুঃখ পাইলে বনে ॥
কোপে কহে পার্থবীর, ক্ষণমাত্র হও স্থির,
দেখ হরি মোর বিদ্যাবল।
এত বলি কুন্তীসুত, ধনু টানে দুই হাতে,
ঘোর শব্দে সিন্ধু টলমল ॥
এক বাণ চাপে যুড়ে, শত সংখ্য হৈয়া উড়ে,
পড়িতে সহস্র পুনি হয়।
দ্রৌপদীর দুঃখ মনে, অমোঘে আয়ুধে হানে,
অসংখ্য বাহিনী হৈল ক্ষয় ॥
পুন পার্থ ভীষ্মবীরে, মহাকোপে রণ করে,
দেবাসুরে যেন পূর্ব্বকালে।
আশ্চর্য্য হইল রণ, মৈল বহু সেনাগণ,
শোণিতে সরিৎ হৈয়া চলে ॥
বৃদ্ধ কালে ভীষ্মবীরে, অসম সাহস করে,
অতি কোপে অর্জ্জুনকে হানে।
শ্রীহরির হৃদে পুনি, পঞ্চদশ শরে হানি,
ধনুর্গুণ নাশি তিন বাণে ॥
শুন বাণী ঠাকুরাণী, বলি আমি এই বাণী,
নিজ গুণে মোকে কর দয়া।
ভারতী চরণে আশ, দুর্গাপুর গ্রামে বাস,
ভূপাস্থজে দেও পদছায়া ॥

পয়ার।

অস্ত্রগুণ দিয়া চাপে বীর ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত কোপিয়া করে সেনাগণ ক্ষয় ॥
ভীষ্মে নিবারিয়া বাণ হানে অর্জ্জুনেকে।
চারি ক্ষুর বাণে হানে শ্রীহরির বুকে ॥
অর্জ্জুন এমত দেখি অত্যন্ত কুপিয়া।
হানয়ে ভীষ্মকে দৃঢ় আকর্ণ পূরিয়া ॥
পঞ্চ বাণে চাপ কাটি দ্বাদশ বেলকে।
ভীষ্মের হৃদয়ে পার্থ হানিল ক্ষণেকে ॥
স্থগিত জাহ্নবীসুত, বৈসে রথ ধরি।
স্থির হৈয়া উঠে পুন সিংহনাদ পুরি ॥
ব্রহ্মমন্ত্র পড়ি ইষু ক্ষেপে বাহু বলে।
স্বল্প পাশুপতে পার্থ নাশিল তৎকালে ॥
অসংখ্য অমোঘ ইষু অর্জ্জুনে কোপিয়া।
অতি তূর্ণ নিক্ষেপয় আকর্ণ পূরিয়া ॥
মহামন্ত্র পড়ি সব নিক্ষেপে অর্জ্জুনে।
আকাশে অনলময় দেখে সর্ব্বজনে ॥
অগ্নিদত্ত রথ হরি আপনি সারথি।
পার্থ যোদ্ধা তাহে যেন নবমৃগপতি ॥
নিবাত কবচ জিনে আপন সাহসে।
সমরে অমরে হারে কি সবে মানুষে ॥
বিরথী হইলা রণে ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনের বাণাঘাতে সর্ব্বাঙ্গে রুধির ॥
সিংহনাদ করি হানে প্রমত্ত পাণ্ডব।
অচৈ[illegible]য়া ভূমে পড়ে শান্তনব।

দুর্য্যোধন আইল তুর্ণ বাহিনী সংহতি।
অর্জ্জুনকে বেড়ি হানে সব মহারথী॥
ভীম আদি করি সব পাণ্ডবের গণ।
আসিয়া সমরে হানা দিলেক তখন॥
লক্ষে লক্ষে সেনা পড়ে উভয় বাহিনী।
অন্ধকার হৈল বাণে ঢাকি দিনমণি॥
দশ দিন ভীষ্ম রণ করি এই মতে।
অপরে ত্যজিলা তনু শিখণ্ডীর হাতে॥
ভীষ্ম মৈলে দ্রোণ দ্বিজ হৈল সেনাপতি।
বিষম সংগ্রাম করে পাণ্ডব সংহতি॥
লোহার নির্ম্মিত গদা লৈয়া ভীমসেনে।
ভূপতির ভ্রাতৃবর্গ নাশে রঙ্গমনে॥
দুর্য্যোধন আসি কহে দ্রোণ বিদ্যমানে।
তোমার সাক্ষাতে ভীমে নাশে ভ্রাতৃগণে॥
দ্রোণাচার্য্য বলে স্থির হও নরপতি।
অবশ্য মারিব অদ্য এক মহারথী॥
এত বলি চক্রব্যূহ করিয়া ব্রাহ্মণে।
মহারথিগণ সব রাখে স্থানে স্থানে॥
পার্থের অঙ্গজ বীর অভিমন্যু ধীর।
ব্যূহ ভেদি মধ্যে পশে সমরে সুধীর॥
মেঘে যেন জল ফেলে তেন ক্ষেপে শর।
কৌরব বাহিনী হানি করিল জর্জ্জর॥
ইহা দেখি কর্ণ আইল অত্যন্ত কোপিয়া।
আর্জ্জুনিকে আচ্ছাদিল বাণ বরষিয়া॥
নিমিষে সে সব নাশি ধনঞ্জয়সুতে।
কর্ণের ললাটে হানে আয়ুধ নির্ঘাতে॥
নারাচে নাশিল বাজি ক্ষুরে শরাসন।
ভল্লে কাটে সারথিকে বেলকে স্যন্দন॥
সর্প মতে শত পরে সন্ধান পূরিয়া।
কর্ণের কপালে হানে কার্ম্মুক টানিয়া॥
মূর্চ্ছা হৈয়া সূতসুত পড়িলা ভূমিতে।
নিজ বধ্য নহে জানি ক্ষমা দিল চিতে॥
অশ্বত্থামা কৃপ দ্রোণ যত সব বীরে।
দ্বৈরথ সমরে সবে শিশু সনে হারে॥
আর্জ্জুনিকে অনিবার্য্য নিষ্কর্ষ বুঝিয়া।
অন্যায় মারিল রণে সকলে বেড়িয়া॥
মহা হর্ষে সিংহনাদ করে দুর্যোধনে।
শুনিয়া বিমর্ষ হৈল পাণ্ডবের গণে॥
অর্জ্জুন শুনিল আসি সুতের মরণ।
অচৈতন্যে রথে পড়ে ফেলি শরাসন॥
হেন মতে কোপে খেদে বঞ্চি বিভাবরী।
সমরে চলিল প্রাতে সঙ্গে করি হরি॥
দুই দলে মহা কোপে প্রবেশিল রণে।
শক্তি নিক্ষেপিয়া সবে প্রাণপণে হানে॥
হেন কালে পার্থ পাশে বিষম সংগ্রামে।
নক্ষত্র জিনিয়া বেগে চলে তুরঙ্গমে॥
সুত শোকে শক্রসুত শমন সমান।
তনু ত্যজে যেই তার বায় বিদ্যমান॥
নেত্র ঘূর্ণি তুর্ণ পূর্ণ কোপে ক্ষেপে শর।
রুধিরে হইল নদী অতি খরতর॥
ধরাধরে ধরাধর ধারা যেন পড়ে।
ধনঞ্জয় ধনু ধরি তেন বাণ ছাড়ে॥
লক্ষে লক্ষে বীর পড়ে অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমে লোটে যোদ্ধা সব অস্ত্র আভরণে॥
উলটি লোচন চাপি দশনে বসন।
বাণাঘাতে পড়ে বাজী অচল স্যন্দন॥
নিক্ষেপে প্রকাণ্ড কাণ্ড চণ্ড চাপে যুড়ি।
ছিন্নমুণ্ড শুণ্ড খণ্ড খণ্ড পড়ে করী॥
কোপে জলে ধনঞ্জয় যেন ধনঞ্জয়।
হানিয়া অসংখ্য ইষু সৈন্য করে ক্ষয়॥
জয়দ্রথে না দেখিয়া চিন্তিত অন্তরে।
বায়ু সম ভ্রমি ফিরে বাহিনী ভিতরে॥
অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ কথা শুন কালিদাস।
ভূপাত্মজে বলে বাণী পূর মোর আশ॥

ক্রমশঃ।

সরযূ-তীরে মোক্ষ-ধাম "অযোধ্যা-পুরী" দর্শনে।

১

আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাম ?
তেজোময় ভাস্করের যে পবিত্র কুল,
(লোক-চক্ষুঃ দিনেশের যেমন কিরণ)
উদ্ভাসিত করেছিল এ তিন-ভুবন,
বসিয়া কনকাসনে রতন-খচিত,
সরযূর কূলে যেথা মর্ম্মর-প্রাসাদে,
শাসিতে সাগরাম্বরা ধরিত্রী-সাম্রাজ্য ?

২

সগর, দিলীপ যার—জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল ;
হরিশ্চন্দ্র—ধ্রুবতারা ; সোম—ভগীরথ ;
রঘু, দশরথ যার ছিল ছায়া-পথ !
কোশলে বিচিত্র সেই নয়নাভিরাম
যে সূর্য্য-মণ্ডলে করে ধরা অংশুমান্,
আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাম ?

৩

আজি রে গগন-তলে দেখি যে সকল
স্নিগ্ধ-জ্যোতি কান্তিময় সপ্তর্ষি-মণ্ডল,
বশিষ্ঠ তাঁদের এক মহা-পরন্তপ
ছিল যে রাজ্যের নেতা, গুরু নিরমল ;
সাধিয়া প্রজার হিতে রাজার কল্যাণ
শান্তিময় করেছিল যে অযোধ্যা-ধাম,
আসিলাম আমি কি রে সেই পুণ্য-স্থান ?

ঝিকিমিকি আহা মরি ! কিরণ ছড়ায়ে
ওই যে রে অরুন্ধতী গগনের গায়
আছে বসি' হাস্যাননা স্বামি-পাদ-মূলে;
বিতরি ললনা-কুলে ধর্ম্ম উপদেশ
ধর্ম্ম-ময় করে যেই অযোধ্যার প্রাণ,
আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা ধাম ?

৫

বিশাল ধরণী-বক্ষে রমণীয় স্থান
সরযূ-বিধৌত, আহা ! যেথা সত্য-কাম
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম সুন্দর "শ্রীরাম"
বসি' রাজ-সিংহাসনে শাসিতেন ধরা,
প্রকৃতি-রঞ্জন-ব্রতে হ'য়ে সদাব্রতী !
বিষ্ণু-অবতার সেই—আজিও যাঁহার
উচ্চ-রবে ধরা-বাসী করে যশোগান
ভূতলে আদর্শ-নৃপ হইয়া যেথায়
প্রচার করেন মোক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কাম !
আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাম ।

৬

মহা-প্রাণ আহা ! সেই রাজন্যের দল
অত্যাচার অবিচার করি' পরিহার,
অদৈন্য করিয়া রাজ্য,—ঢালি শান্তিজল ;
ভেদাভেদ নাহি রাখি, জ্ঞানের গৌরবে
যথা-মান দিয়ে সবে,—রাখিয়া সন্তোষে ;
পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালি' যে অযোধ্যা-দেশ
পুণ্য-ভূমি ভারতেরে করে তীর্থ-স্থান !
আসিলাম আমি কি রে সেই নিত্য-ধাম ?

৭

ব্রহ্মার মানস-পুত্র বশিষ্ঠ মহান্,
পরমাত্ম-মহত্ত্বে যিনি গরীয়ান্,
জ্ঞানের মধুর-তত্ত্ব ঢালি' প্রাণে প্রাণে
প্রখর ক্ষত্রিয়-বীর্য্য করিতে কোমল,
পদ্ম-রাগ হীরকের সৌন্দর্য্য-প্রভায়
নীলকান্ত মাণিক্যের মিলিত ছটায়
সমুজ্জ্বল সভা-তলে "শ্রীরামে" যেখানে
দিতেন সে অনন্তের পরম সন্ধান !
আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাম

৮

পুণ্য-তোয়া ব্রহ্মময়ী ওই ভাগীরথী
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে আজো গাহিছে যাঁহার
অনন্ত যশের গীতি, গাহিবে রে আর
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য ভ্রমে কক্ষ-পথে !
যাঁর তীব্র-তপস্যায় হইয়া প্রসন্না
আনন্দ-কল্লোলে গঙ্গা আসে এ মহীতে,
উদ্ধারিতে সূর্য্য-কুল, মানব-মণ্ডলী ;
তপোধন নরপতি সেই ভগীরথ

প্রভাময় করেছিল যে অযোধ্যা-ধাম,
আসিলাম আমি কি রে সেই মোক্ষ-স্থান ?

৯

আদি-কবি বাল্মীকি রে আসিয়া যেখানে
কুশী, লব সুকুমার দু'টি শিশু-মুখে
"রামায়ণ"—রসায়ন মুমুক্ষুর কাছে—
ললিত-উদাত্ত-স্বরে করেন প্রচার ;
অশ্বমেধ—প্রাণ যজ্ঞে যদবধি নর'
জ্ঞানের সমিধে মাখি' পীযুসের রস—
ভকতি, আহুতি দেয় যেথা রামনাম !
আসিলাম আমি কিরে সে অযোধ্যা-ধাম ?

১০

তপস্বীর বেশে আহা ! শরীর বিকল,
ধরিয়া মস্তকে জটা, পরিয়া বল্কল,
রাজ-ভোগ ছাড়ি' যেই "ভরত" সুঠাম
ঐশ্বর্য্য নশ্বর জানি' থাকিয়া নিষ্কাম,
মাতার মর্য্যাদা রাখি, পিতার আদেশে,
ভ্রাতৃ-ভক্তি-মহাব্রত শিখাতে জগতে,
রাজ দণ্ড ল'য়ে করে সাম্রাজ্যের হিতে
রাজ-প্রতিনিধি-রূপে "রাম-পাদুকায়"
পূজিতেন যেথা সদা জ্যেষ্ঠের সম্ভ্রমে !
পুণ্য-ভূমি ভারতের মহা-পুণ্য স্থান,
আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাম ?

১১

অনন্তের অবতার "লক্ষণ" সুঠাম,
শীলতায় কমনীয়, বিক্রমে উদ্দাম,
শ্রীরামের বনবাসে হইয়া সহায়,
রাজ-আভরণ ছাড়ি, পরি' চীর-বাস,
অনাহারে, জাগরণে—বর্ষ চতুর্দ্দশ
থাকি যে নারীর মুখ না দেখি নয়নে,
সাধেন দেবের কার্য্য গূঢ়তম এক
মহারণে রাক্ষসের মারি' "ইন্দ্রজিৎ",
ইন্দ্রজয়ী ছিল যেই রাবণ-কুমার !
শূরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণের সেই মহিমায়
ভূতলে আছে রে খ্যাত অদ্যাপি যে স্থান,
আসিলাম আমি কি রে সে অযোধ্যা-ধাম ?

১২

সূর্য্য-বংশে লভি' জন্ম, দিয়ে নিজ-আভা
প্রখর করে যে রাম-রবির সে প্রভা ;
যৌবরাজ্য-অভিষেকে ছাড়িয়া মুকুট
পিতৃ-সত্য পালিবারে ফেরে বন-দেশে,
জটাধারী চীর-বাসে ভিখারীর বেশে !
সীতা সতী হরণের ঘৃণিত-আচারে
মহাযোধী সেই রাম "রাবণে" সংহারি
রেখেছ অমর করে যে অযোধ্যা-ধাম
অনন্ত-কালের পটে, বাল্মীকির আঁকা,
শোভিছে যাহার ছবি নয়ন-আরাম !
আসিলাম আমি কি রে সেই মোক্ষ-ধাম ?

১৩

কেন তবে মহাপুরি ! নাহি দেখি আর
সৌধ-মালা কণ্ঠ-দেশে—চন্দ্রকোটী-হার ?
বিপুল-নিতম্বে তোর নাহিক বসন—
সুন্দর কানন-রাজি অম্বর-বরণ ?
মহাপথ, উপপথ—দীর্ঘ-ভুজাবলি,
মহার্ঘ্য-বিপণি তাতে—হীরক-অঙ্গুরি ?
পৃষ্ঠ-দেশে কারুময় মন্দিরে গোপুর,
পরিখা-চরণে নাহি তরঙ্গ-নূপুর ?
বল বল কোথা ওগো ! রেখেছ গোপন
সুচারু বঙ্কিম-ভুরু—মহোচ্চ-তোরণ ?
সুশীতল নীলজল উৎপল-শোভন
মহাসরোবর গুলি—আয়ত-লোচন ?
লুকায়েছ কোথা বা সে "কনক-ভবন"
প্রশস্ত-হৃদয়ে তোর কৌস্তুভ রতন ?
বল দেখি ! বল মোরে, বিলম্ব না সয়,
হও যদি মহাপুরী, দাও পরিচয় ?
এসেছি শুনিতে তোর কোদণ্ড-টঙ্কার,
দেখি হায় ! মৃত-দেহ—কেবল কঙ্কাল !
লভ শান্তি, যেবা হও, সুধাব না তোরে,
প্রসার অনন্ত-জ্যোতি ভারত-আঁধারে !!!

১৪

কোথা যাই ওরে, কেহত নাহি রে,
কে বলে আমারে পুরীর সন্ধান ?

দেখিব কি বলে বিহঙ্গের দলে,
যারা নভস্তলে উড়ে করে গান ?
কি বলে কাননে, ধীর সমীরণে,
ঝরণার তানে ধরণী-প্রাণ ;
বিলোল বল্লরী, বৃক্ষ সারি সারি,
শুনিব কি কহে সরসীর জল।
অম্বরে জলদ, ভূমে চতুষ্পদ
সকলে সুধাব অযোধ্যা কোথায় ?
কেহ ত না বলে, সুধাই বিফলে,
রহিল নীরবে সকলে হায় !
নাহি তবে কি রে জগতে কেহ রে
বলিতে আমারে পুরীর সন্ধান ?
ওই যে দেখি রে প্রবাহ অদূরে,
বহে ক্ষীণ স্বরে, যাই ওর স্থান ;
পারে কি না পারে বলিতে আমারে
অযোধ্যা যে এরে, ভয় পাই তাই ;
সুধাইলে তারে, বলে যা আমারে
তরঙ্গের সুরে, কেঁদে ভেসে যাই।
"আমি রে সরযু, কেন যে দীর্ঘায়ু
পেয়েছি রে হায় ! কপালের দোষে !
আছি আমি একা মোক্ষ-ধাম-রেখা,
গিয়াছে চলিয়া আর যত দেশে ;
এখানে যে আসে, আমারে জিজ্ঞাসে
কাতর-পরাণে অযোধ্যার কথা ;
কি কহিব আমি সে গৌরব বাণী,
ক্ষীণ প্রবাহিণী পাই মনে ব্যথা।

আমার এ তীরে, থাকিত শিবিরে
দেবতা অসুরে, কত আর্য্য-সেনা ;
যারা দলে দলে অশ্বমেধ-কালে
ফেরে কোলাহলে, নাহি তার চেনা।
নাহি আর মনে বয়সের সনে,
না দেখি নয়নে, শ্রবণ বধির !
শোকে জর জর আমার অন্তর,
তাই কলেবর এতই অধীর !
নাহি সেই "রাম" রূপে অভিরাম,
প্রাণের পুত্তলি অনন্তে মিশেছে !
এই সে অযোধ্যা পরমা আরাধ্যা,
প্রাণ-হীনকায়া পড়িয়া আছে।
না পাবি রে দেখা, কৃষ্ণ যবনিকা
পড়েছে কালের সেই রাজ-পাটে ;
কর হে তর্পণ "শ্রীরাম, লক্ষণ"
অশ্রু বরষণে বসি' "রাম-ঘাটে" !

১৫

শুনিয়া এ বাণী, মহা-শূন্যে আমি
ডুবিলাম হায় ! সৃষ্টির সহিতে ;
ঘোর অন্ধকার, কেন্দ্রোপরি তার
মহা-জ্যোতি এক দেখিরে জ্বলিতে !
গায়ে তার আঁকা "পূর্ণচন্দ্র" রেখা,
সৃষ্টি স্থিতি লয় লেখা অবিরাম !
সে ঘোর আঁধারে, জ্যোতির মণ্ডলে,
গম্ভীর নিনাদ শুনি শুধু "রাম" !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চিত্রকরী।

রোদনের প্রথম প্রবাহ সমাপ্ত হইলে, নীলা কতকটা শান্ত হইল। তখন চিকণ তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিল, "ওঠ্ মা ! আর এখানে নয়—আমার সঙ্গে আমার কুটীরে আয়। পথশ্রম, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন, ঐ কচি প্রাণটুকুতে তোর আর কত সহিবে, বল্। এখন তোর আহার-নিদ্রার প্রয়োজন ; পরের কথা পরে। আমার ঘরটি গরীবের ঘর বটে, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিশেষ রাস্তায় দাঁড়াইয়া এমন করিয়া কথা-বার্ত্তা [illegible] অপেক্ষা সেখানে কথাবার্ত্তার

সুবিধা হইবে। আর আমাকে তোর ভয় বা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণও থাকিতে পারে না।—আমি বুড়া রিপুকর্ম্মওয়ালা চিকণ—আধ্-পাগলা, কিম্ভূত কিমাকার। আয় মা! আয়।"

শ্রান্তি এবং চিন্তায় নীলা তখন তাহাতে ছিল না। চিকণলাল তাহার হাত ধরিয়া রাজপথে আসিলে, নির্জ্জীব পুত্তলিকার মত সে যেন আভ্যন্তরিক কলের জোরে পা ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। চলিতে চলিতে বৃদ্ধ তাহার সহিত অনেক কথাই কহিল, কিন্তু কোনও কথারই উত্তর পাইল না। এ কথা নিশ্চিত বলা যায়, তাহার একটী কথাও বালিকার কর্ণগোচর হইয়া তাহার মর্ম্মস্থলে উপস্থিত হয় নাই। ক্রমে কলের জোরও খাটিল না; চিকণ প্রকৃতপক্ষে বালিকাকে টানিয়া লইয়াই চলিল। পায়ে দুই একবার হোঁচট্ লাগিল; অবশেষে যখন বাসায় পৌঁছিয়া বৃদ্ধ তাহাকে উপরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠাইল, তখন হস্তদ্বয় শূন্যে তুলিয়া অভাগ্য-ক্লিষ্টা অনাথা, চিকণলালের বক্ষঃস্থলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা রূপালি তাহার কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিল, এবং দুই জনে ধরাধরি করিয়া আপাততঃ নীলাকে নীচে রূপালীর শয্যায় শয়ন করাইল। বৃদ্ধা রূপালীর মন বড় মিষ্ট, কিন্তু মেজাজ বড় তিক্ত। তাহাকে রূপালীর জিম্মায় রাখিয়া, চিকণ বাহিরে রাস্তায় আসিয়া বায়ু এবং তাম্রকূট * সেবনে মনোনিবেশ করিল।

কিংবদন্তী,—গুড়ুকে বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করে—বুঝি চিকণের তাহাই করিল। কিং-কর্ত্তব্য-অনিশ্চিত চিকণ তামাকু-সেবনান্তে নিশ্চিত-ক্রিয় হইয়া উপরে আপনার শয়ন-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধনীর চক্ষে সামান্য হইলেও, চিকণের অবস্থার লোকের চক্ষে তাহার শয়নগৃহের সাজ-সজ্জা অসামান্য। উপায়াভাবে যে ব্যক্তি দরজীর ব্যবসায় না করিতে পারিয়া রিপুকর্ম্মে জীবন কাটাইয়া দিল, তাহার গৃহের পক্ষে সে সমস্ত শিল্প-সৌন্দর্য্য এবং কারু-বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ অসাধারণ সজ্জা বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। বেলোয়ারী ও স্ফটিকের ক্ষোদিত মনোহর আলোকাধার এবং নরনারীর অবয়ব-বৈচিত্র্য, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক উৎকৃষ্ট আলেখ্যসমূহ, মনোমোহন সুগন্ধ-পুষ্প-সংবলিত পুষ্পাধার প্রভৃতি, সে গৃহ সজ্জিত রাখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে রুচি-সম্পন্ন (একেবারে ধনী না হউক, অন্ততঃ) প্রকৃষ্টাবস্থ মধ্যবিত্তের গৃহ বলিয়া প্রতিপন্ন করে। দীন চিকণের এ মূল্যবান্ সংগ্রহকার্য্যের রহস্য ভেদ করা দুরূহ নহে। আবাল্য চিকণলালের শিল্প সৌকুমার্য্যে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, এবং প্রীতি অপরিসীম, এবং নির্ধন হইলেও (তাহার চরণযুগল দীর্ঘায়ু হউক) সে একজন প্রথম শ্রেণীর পর্য্যটক। দেশ-বিদেশে যখন যেখানে সে দেখিয়াছে, অশিক্ষিত চক্ষে দুর্লভ শিল্প-সৌন্দর্য্য হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে—অসাবধান হস্তস্থিত ঠোঙ্গার মিঠাই চিলে যেমন ছোঁ মারিয়া লইয়া পালায়, চিকণ তেমনি তাহা চকিতের ন্যায় নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিল। তাহার সেই গৃহসজ্জাগুলি তাহার চিরন্তন নয়নানন্দ। চিকণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া অনেকে বলিত, লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা থাকিলে চিকণ একজন প্রথম-শ্রেণীর পণ্ডিত হইতে পারিত; শিল্পে তাহার দৃষ্টি দেখিয়া অন্যান্য

* ঐতিহাসিকবিশেষের মতে সম্রাট্ আকবর সাহের সময়ে নাকি ভারতবর্ষে তাম্রকূটের প্রচলন সুরু হয় নাই। আমাদিগের ন্যায় ভাবুক লেখকগণের একথা কল্প ধারণার অতীত; লেখক।

অনেকে বলিত, অন্ততঃ বিক্রী-ওয়ালার দোকান করিলেও চিকণকে নিঃসন্দেহ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট হইতে হইত না। বস্তুতঃ, তাহার গৃহ-সজ্জার মধ্যে অনেকগুলি, সে ইচ্ছা করিলে, তাহার আশাতীত মূল্যে বিক্রয় করিয়া এ জন্মের মতন ছুঁচ সুতার ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু সে প্রলোভনের মোহ তাহার তীব্র কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া কখনও তাহার চিত্তের নিকটস্থ হইতে পারে নাই। দৈনিক অর্দ্ধোদরপরিমাণ আহার শ্রেয়ঃ জানিয়া সে তাহার আদরের দ্রব্যগুলির মূল্যে অশ্রম পূর্ণোদরতার কথা কল্পনা করিতে পারে নাই।

চিকণ জানিত, অধিকার রূপজ অনুরাগ নিহত করে বটে, কিন্তু শিল্পানুরাগ চির-জাগরূক থাকে।

অথচ চিকণলাল চির-দরিদ্র! তাহার কারণ, মাননীয় রাষ্ট্রসচিব হইতে নগণ্য জুতা-শেলাইওয়ালা, সকলের মধ্যে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, ছিদ্র-নির্ম্মাণে যে কুশলী, জগতে তাহারই অন্ন—ছিদ্র-নিষেধকের অন্নের সংস্থান নাই!

চিকণের আহাম্মুকী যে তাহার দুরবস্থার কারণ, তাহা উপলক্ষ করিয়া এক দিবস তাহার এক সহযোগী ব্যবসায়ী তাহাকে বলিয়াছিল—"দেখ ঈশ্বরের ইচ্ছায়, আমিত স্বচ্ছন্দে সপরিবারে খাইয়া পরিয়া যাইতেছি, অথচ তোমার অপেক্ষা খরিদ্দার আমার কিছু অধিক নয়। ইহার হেতু কি জান? একটু বুদ্ধির চালনা। জামার এক স্থল সারিয়া অন্য স্থল আমি ক্ষিপ্রতার সহিত বেমালুম কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিই! লইয়া যাইবার সময় লোকে তাহা জানিতে পারে না—সুতরাং দুই চারি দিন পরে আবার সে জামা আমার দোকানে আসে। আমি তখন বস্ত্রের অসারতার কথা তুলিয়া দুঃখ করি। কিন্তু তুমি কি কর? পুরাতন ছিদ্র সারিয়া তৎসঙ্গে আমার মত নূতন ছিদ্র করিয়া দাও না। কাজেই তুমি গরীব! তোমার নিজের কথা ছাড়িয়া দাও, ও রকম করিয়া কাজ করিলে ব্যবসা মাটী হইয়া যায়, তাহাও তুমি ভাব না। তোমার শেলাইয়ের স্থায়িত্ব দেখিয়া লোকে আমাদের মত অন্য শেলাইকারকে অকর্ম্মণ্য বা প্রবঞ্চক ভাবিতে পারে, তাহার কি? এমন করিলে ব্যবসায়ীদের ভিতর সহযোগিতা বা পরস্পরে সহানুভূতি কেমন করিয়া থাকিতে পারে?

ব্যবসায়ের এ সব নিম্ন স্তর ছাড়িয়া দাও—শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি, যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, তুমি সৎপথে চলিবার চেষ্টা করিলে সকলেই তোমাকে ঐ রকমে ধমকাইয়া বলিবে—"খবর্দ্দার! ব্যবসা মাটী করিও না।"

চিকণ কাহারও কথা শুনিত না—আপনি মাটী হইয়াছিল, ব্যবসায়ও মাটী করিতেছিল!

সে ভাবিল, "একটী বালিকার দিন কয়েক গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে কতই বা পড়িবে। আমার এবং রূপালীর সঙ্গে ও অনাথারও যে রকম করিয়া হউক চলিয়া যাইবে। এ অবস্থায় উহাকে ত রাস্তায় ছাড়িয়া দিতে পারি না। বালিকা প্রকৃতিস্থা হইলে, যাহা হউক উহার একটা ব্যবস্থা করিব।"

শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চিকণ নীচে আসিল। রূপালীকে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন, এখন একটু সুস্থ হইয়াছে?"

রূপালী ঘাড় নাড়িল,—"হইয়াছে।"

"তবে তাহাকে অন্ততঃ আজিকার রাত্রি আমার বিছানায় শোয়াইয়া রাখ।"

"[illegible]তোমার পরিচিতা নয়?"

মহাভারত! আজ অপরাহ্নের পূর্ব্বে তাহার সহিত কখনও আমার চাক্ষুষ হয় নাই। কিন্তু তা বলিয়া কি করিব। রূপালি! তোমার কন্যা জীবিতা থাকিলে, এ অবস্থায় তাহাকে ঘর বার করিয়া রাস্তায় পাঠাইয়া দিতে পারিতে কি?"

"কখনও না।"—রূপালী সতেজে উত্তর করিল। "কখনও না। চিকণলাল, তোমার দয়ার শরীর। কিন্তু তোমার বিছানায় তাহাকে শয়ন করাইলে, তোমার উপায় কি হইবে। তুমি নিদ্রা যাইবে কোথায়?"

"দোকানে।"

রূপালী হাসিয়া বলিল, "দোকানে বসিতে কুলায় না—সেখানে শুইবে কেমন করিয়া?"

নাই শুইলাম। বসিয়া বসিয়া আমি এক যুগ নিদ্রা যাইতে পারি, এক রাত্রির কথা কি বলিতেছ?

"মুসলমানী নয় ত?" তাহা হইলে রূপালী তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

"পাগল! চেহারায় ধরিতে পার না। যবনী নয়, তাহা আমি অন্য কারণেও জানিয়াছি। পল্লী-বাসিনী অনাথা হিন্দু বালিকা।" চিকণ এই বলিয়া রূপালীকে আশ্বস্ত করিল।

রূপালী বলিল, "বালিকা পরমসুন্দরী।"

চিকণ বলিল, "ঐ ত অভাগ্য। রূপালি! বালিকাকে তুমি উপরে লইয়া যাও।"

পাড়ার পাঁচ জনে ব্যাপার দেখিয়া কাণাকাণি সুরু করিয়াছিল। চিকণ বাহিরে আসিয়া তাহাদিগের সঙ্গ লইল। অম্লানবদনে মিথ্যার অবতারণা করিল। "আমার দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতৃকন্যা। পূর্ব্বে কখনও দিল্লীতে আসে নাই। ভায়ার হালে স্বর্গলাভ হওয়ায় বেচারা আমার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে। ছেলে মানুষ, শোকের এবং পথশ্রমের অবসাদে আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল"—ইত্যাদি।

দোকানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রূপালীকে ডাকিল। থালা হাতে করিয়া রূপালী আসিল। থালায় খাদ্যদ্রব্যাদি কিছুই ছিল না। চিকণ তাহা দেখিয়া বলিল—"খাইতে পারিয়াছে, ইহা সুলক্ষণ।"

রূপালী বলিল, "খাইয়াছে কে? এক বিন্দুও গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। এক থালা খাবার ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। হিন্দু হইলেও অপরিচিতা—তাহার উচ্ছিষ্ট খাইবে কে? অতটা খাবার ফেলিয়া দিতে মন কেমন করিতে লাগিল।"

হায় কপাল! কৃষকের দ্বাদশ প্রহর-ব্যাপী ক্ষেত্রকর্ষণ-ক্লান্ত বলদের ন্যায় ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর চিকণের চক্ষে সে কথা শুনিয়া প্রকৃতই জল আসিল। কোন্ মুখে সে তখন রূপালীকে তাহার জন্য রুটী গড়িতে বলিবে? বিশেষতঃ বিকালে রূপালী বলিয়াছিল, জ্বালানী কাঠ একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। চিকণের নিকটে একটী তাম্র-মুদ্রাও নাই।

"একটু কিছু দাঁতে কাটিল না?"

রূপালী উত্তর করিল, "না। গা গরম, বোধ হয় জ্বর হইয়াছে।"

চিকণ বিনয় করিয়া বলিল, "রূপালি! তুমি সে গরীবের নিকট আজ রাত্রিতে থাকিবে? অপরিচিত স্থানে একাকিনী সে ভয় পাইতে পারে।"

"জ্বর আসলে তাহার ঘোরেই আচ্ছন্ন থাকিবে—ভয় ভরসা কিছুই পাইবে না। যাহা হউক, আমি তাহার ঘরে, মাটীতে এক কোণে পড়িয়া থাকিব।"

রূপালীর কথায় চিকরণ স্থির হইল। কোথাকার কুড়ানো একটা পথের মেয়ের জন্য সে আপনার উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং অস্থিরতা অনুভব করিয়া আপনি আশ্চর্য্য হইল।

রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত দোকান খুলিয়া

রাখিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর বৃদ্ধ চিকণলাল কার্য্য করিতে লাগিল। রাস্তার লোকের যাতায়াত বা কথোপকথন, কোনও দিকেই লক্ষ ছিল না। তাহা দেখিয়া জনৈক পথিক অন্য পথিককে বলিল, "বুড়া আজ খেয়ালে আছে, দেখিতেছি। এখন যদি তুমি উহাকে মাথা কুটিয়া ডাকাডাকি কর, ও ভ্রূক্ষেপ করিবে না।" চিকণকে না ডাকিয়া, তাহারা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

লোকের 'খেয়ালী' বলিয়া একটু খ্যাতি থাকা, মন্দ নয়। বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতিবাসীর হস্ত হইতে অনেক সময় খেয়ালী লোকেরা নিস্তার পাইয়া চিন্তা বা শান্তির অবসর প্রাপ্ত হয়।

রাত্রি একটা বাজিলে, কার্য্য সারিয়া বৃদ্ধ দোকানের আগড় বন্ধ করিল, এবং তন্মধ্যে বসিয়া ঢুলিতে লাগিল।

৫

অতি প্রত্যূষে চিকণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দোকানের ঝাঁপ খুলিতেই রূপালী আসিয়া বলিল, "তোমার পোষ্য কন্যার ত প্রবল জ্বর —সারারাত্রি আবোল তাবোল বকিয়াছে। গায়ে ধান দিলে খই ফুটিয়া উঠে, গা এত গরম।" বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া কবিরাজের সন্ধানে ছুটিল।

তাহার পরিচিত এবং সমবয়স্ক এক কবিরাজ অবিলম্বে আহূত হইয়া রোগীকে পরীক্ষা করিতে বসিলেন। কবিরাজের কথায় চিকণ আশ্বস্ত হইল—"প্রাণের আশঙ্কা নাই—তবে কিছু সময় লইবার সম্ভাবনা। আজকাল সহরের ঘরে ঘরে ঐ রকম হতভাগ্য ভুতুড়ে জ্বরের প্রাদুর্ভাব।"

রূপালী বলিল, "সারারাত্রি বকিয়াছে। সব কথাতেই দিল্লী। দিল্লী তাহার কাল, দিল্লী তাহাকে গ্রাস করিবে—আম্বাদান-ব্যপদেশেই নিয়তি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সে দিল্লীতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইত্যাদি।" কবিরাজ রূপালীর কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। পথ্যৌষধাদির ব্যবস্থা হইল। কবিরাজ চলিয়া গেলেন।

চিকণ রূপালীকে বলিল,—"মুস্কিলের কথা, কিন্তু করিব কি? অচেতন রুগ্নাকে কোথাও ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারি না ত। নিজের খাওয়া বন্ধ করিয়াও রোগের খরচ চালাইতে হইবে।"

জনৈক প্রতিবাসীর নিকট বৃদ্ধের বহু দিনের সঞ্চিত কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রা গচ্ছিত ছিল। দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চিত অর্থ তাহার সেই দুর্দ্দিনে সংগৃহীত হইল। তাহার একটী ভাঙ্গাইয়া তন্মধ্য হইতে কিছু সর্ব্বাগ্রে চিকণ রূপালীকে দিয়া বলিল, "রোগীর সেবায় খাওয়া দাওয়ার সময়ের ঠিক থাকিবে না; তুমি ইহাতে অবরে সবরে একটু আধটু জলটল খাইও। চিকণ রূপালী-চরিত্র ভাল রকমই অধ্যয়ন করিয়াছিল। চিকণ জানিত, ভারতী আপনি আপন বীণার তারে তাঁহার দেবকণ্ঠ মিলাইয়া স্বরচিত কবিতা গান করিলেও রূপালীর হৃদয় যত না গলিবে, ঐ সামান্য কয়টী মুদ্রার ভাষা তাহাকে ততোধিক মুগ্ধ করিতে পারিবে। ধরণীর বিভিন্ন খণ্ডে, বিভিন্ন প্রদেশে, কেবলমাত্র মুদ্রার ভাষাতেই বৈচিত্র্য নাই। এ ভাষা সাধারণ। পণ্ডিত এবং মূর্খ—সকল দেশের সকলেরই এ ভাষা সমান অধীত। কেবলমাত্র এক এই ভাষাতেই অভিধানের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

চিকণের প্রতিবাসীরা সে কয় দিন সাশ্চর্য্যে নিরীক্ষণ করিল, একাকী বৃদ্ধ দশ জন অপ্রতিহত-তেজ যুবকের শ্রম করিতেছে। কার্য্য-সংগ্রহ এবং সমাধায় তাহার ক্লান্তি নাই। পূর্ব্ব, মধ্য, পরাহ্ন, এমন কি, দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত তাহার হস্তের বিরাম থাকিত

না। বৃদ্ধের আহারের সময় ছিল না—বিশ্রামের কথা দূরে রক্ষা কর।

একজন বলিল, "চিকণ অশ্বের পৃষ্ঠে চাবুক পড়িয়াছে—তাই সে ঐ চার পা তুলিয়া ছুটিতেছে, দেখ!"

অন্য কেহ বলিল, "বৃদ্ধ এত দিন কুঁজের ভারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর জ্বালাময় ব্রণের উদ্গমে যন্ত্রণায় অমন ছট্‌ফট্ করিতেছে!"

পুনশ্চ আর একজন বলিল, "খ্যাপা এবার পূর্ণমাত্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে!"

যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহা বলিতে লাগিল। বধির চিকণ কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিল না। কারণ তাহার স্ফটিক-শিশু চক্ষে ইঙ্গিত করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিল, "ঐ সব খ্যাপারা যাহাকে খ্যাপা ভাবে, সেই যথার্থ প্রকৃতিস্থ! আর বৃদ্ধের অন্তঃকরণের নিগূঢ় আশ্রমে যে এক চিরজাগরূক অনাদি চেতনা বাস করিয়া থাকেন, তিনি অভয় দিয়া তাহাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "পরে তোমাকে খ্যাপা বলিলই বা, তুমি ক্ষেপিও না; তোমার কার্য্য করিয়া যাও।"

রুগ্নার চেতনা নাই। জ্বরের প্রবল প্রকোপ, প্রলাপ অনর্গল। রোগ-পরিচর্য্যায় রূপালীর পরার্থপরতার পরিচয়ে স্বর্গ-দেবতারাও লজ্জা পাইতে লাগিলেন! তবে সে পরার্থপরতার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তাহার মূলে চিকণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে যে উৎকোচ-রূপ সার মাটীর প্রলেপ প্রদত্ত হইত, সহস্রচক্ষু দেবরাজও তাহা দেখিতে পাইতেন না!

এই অবস্থায় শঙ্কর সুবাজীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করা এবং এ সমস্ত ব্যাপার তাহাকে বিদিত করা উচিত ভাবিয়া, চিকণ এক দিন ঠারিয়ার দিকে যাত্রা করিল। সম্ভবতঃ শুভক্ষণে যাত্রা করে নাই, কারণ, সে যাত্রার ফল কোনরূপ কার্য্যকরী হইল না। দুই বৃদ্ধে খানিকক্ষণ গালিগালাজ চলিয়াছিল মাত্র;—চিকণ নীলার পক্ষ হইয়া ওকালতীর ক্রটী করে নাই—কিন্তু কিছুতেই সে দুরাত্মা বৃদ্ধ শঙ্করকে আপনার কোটে আনিতে পারিল না। সুবাজী কিছুতেই তাহার দৌহিত্রীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিল না। শেষে ধিক্কারের সহিত চিকণ সে পাপিষ্ঠের দিকে পশ্চাৎ করিয়া তাহার পাপালয় পরিত্যাগ করিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া যমুনার শীতল সুপবিত্র জলে স্নানান্তে তাহার মুখদর্শন-পাতক হইতে মুক্ত হইল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে রূপালী প্রসন্ন অন্তঃকরণে চিকণকে আসিয়া সংবাদ দিল, "আর ভয় নাই, বালিকার চেতনা আসিয়াছে।" চিকণ নিশ্বাস ফেলিল, বুকের ভিতর যেন হাল্কা বোধ করিল।

আরও চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। নীলা নীরোগ হইলেও বড় দুর্ব্বল—এখনও তাহার শয্যা ত্যাগ করিবার শক্তি আসে নাই।

ইহার দুই এক দিন পরে এক প্রাতে নীলা সহসা নামিয়া আসিয়া চিকণের সম্মুখস্থা হইল। চিকণ দেখিল, সে মলিন এবং অতিশয় দুর্ব্বল, কিন্তু সেই পবিত্র দেবতা-মূর্ত্তি! মানবের অর্চ্চনার, অভিলাষের নহে! তাহার করুণ এবং অতি সরল চক্ষু দুইটী টল্‌টল্ করিতেছিল!

"আমি তোমাকে ধন্যবাদ করিতে আসিয়াছি। কিন্তু যে কথায় তোমাকে ধন্যবাদ করিলে আমার মন তৃপ্ত হয়, এমন কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমরা আমার জন্য কত না করিয়াছ—কত না আমার জন্য তোমাদের কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি—আমি অপরিচিতা,—অনাথা,—নিঃস্ব—"

তাড়াতাড়ি তাহার কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধ অনেক অবান্তর কথার অবতারণা করিল। এমন কিছুই তাহারা করে নাই, যাহার জন্য ধন্যবাদ আবশ্যক—রূপালী তাহাকে যদি এমন কোনও কথা বলিয়া থাকে, নীলার বুঝা উচিত, সে কথার কিছুমাত্র অর্থ নাই। রূপালী আকারে মানুষী হইলেও, সে নিশ্চিত গর্দ্দভ-বংশোদ্ভূতা। একটা খালি ঘর—কাহারও কোনও কাজে লাগিত না—তাহা সে কয় দিন অধিকার করিয়াছিল মাত্র, তাহাতে তাহার মস্তক বিক্রীত হইতে পারে না। দুর্ব্বল অবস্থায় নীচে নামিয়া আসা ভাল কাজ হয় নাই—ইত্যাদি।

নীলা সমস্ত শুনিয়া বলিল, "অতি প্রত্যূষে আজ নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে—বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ভাল লাগিল না। তোমার সঙ্গে আর দেখা না করিয়া—দুইটা কথা না কহিয়া—তোমাকে এবং রূপালীকে আমার কৃতজ্ঞতা—"

বৃদ্ধ চেঁচাইয়া উঠিল,—"চুপ—চুপ—অত দুর্ব্বল অবস্থায় অত কথা কহা উচিত নয়। দাঁড়াইয়া থাকিও না—পড়িয়া যাইবে—এখানে উপবেশন কর।" শেষের কথা কয়টা নিতান্ত নিরর্থ নয়—ঐটুকু দাঁড়াইয়া থাকিয়াই তাহার গা কাঁপিতেছিল। নীলা চিকণের নিকট উপবেশন করিয়া, একটু দম লইয়া বলিল —

"আমার জন্য তোমাদের বিলক্ষণ ভোগ ত হইয়াছে—আমি তোমাকে আরও একটু ভোগাইব। আমি দিল্লী যাত্রা করিবার সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে লোহিয়ায় আমার যাহা অতিসামান্য কিছু জিনিসপত্র ছিল, আমাদের গ্রামের ডাকওয়ালার মারফৎ এখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। দিল্লীর পূর্ব্বোত্তর ফটকের গায়ে যে কোতোয়ালী আছে, সে সেইখানে তাহা রাখিয়া গিয়াছে। এই কাগজখানি দেখ, ইহাই সেগুলির রসিদ। তুমি এই রসিদখানি সেই কোতোয়ালীতে লইয়া যাইলে, আমি আমার জিনিসগুলি পাইতে পারি।"

চিকণ শুনিয়া বলিল,—"মুটিয়া সঙ্গে লইব ?"

মেঘাবিল জ্যোৎস্নার মত নীলার ওষ্ঠে একটু অতি মলিন হাস্য চমকিয়া যাইল। নীলা বলিল, "না, তুমি নিজেই সেগুলি আনিতে পারিবে। কতকগুলি পট মাত্র—বাবার, এবং দুই একখানি আমার অঙ্কিত। তৈজসপত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহার বিক্রয়ে পিতার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করিয়াছি। তোমাকে এ তুচ্ছ ব্যাপারে কষ্ট দিতাম না—কিন্তু দিল্লীতে তুমি ভিন্ন এখন আমার আর কে আছে! দিল্লীর মত সহরে যদি সেগুলির বিক্রয় হয়, এবং তাহাতে অন্ততঃ আমার পিতার জন্য যে ঋণ হইয়াছে, যদি তাহার পরিশোধ হয়, কেবল এই আশায় তোমাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম। কত দিন আমি শয্যাশায়িনী ছিলাম ?"

চি। সপ্তাহ দুই তিন, আর কত ? তুমি ঘরে উঠিয়া যাও মা! দিল্লীর গ্রীষ্ম তুমি জান না—দাবাগ্নি তদপেক্ষা তপ্ত নয়। পাগল মেয়ে, ঋণের কথা কি বলিতেছ—উপরের ঐ খুবরী আঁস্তাকুড়টা অসুখের কয় দিন অধিকার করিয়াছিলে বলিয়া তোমাকে কি তাহার ভাড়া দিতে হইবে? রূপালীর কথা, বলিতেছ ? তোমার সেবার কারণ তাহার পারিশ্রমিক ? অমন কথাটী মুখে আনিও না, মা! অভাগী রূপালী ঠিক তোমার বয়স্কা তাহার একমাত্র কন্যাটীকে গত বৎসর এমন সময় যমের হাতে ধরিয়া দিয়াছে। আর বিশেষ কথা এই, বৃদ্ধা রূপালী জীবনে কখন অর্থ চিনে নাই।"

নীলার মুখ যথাসম্ভব লাল হইয়া উঠিল

—সে বলিল—"তুমি যে ভাবে আমার কথাগুলি গ্রহণ করিলে, আমি ঠিক ও ভাবে কথা বলি নাই। আমার ইচ্ছা এই,—অর্থাৎ আমার জন্য যাহা কিছু খরচ হইয়াছে—তুমি গরীব, আমি সেই ঋণ পরিশোধের কথা কহিতেছি মাত্র। তুমি কি মনে করিলে, দুই দশটা মুদ্রার সাহায্যে আমি তোমাদের স্নেহের এবং যত্নের ঋণ পরিশোধ করিব, ভাবিতেছ? তোমরা না থাকিলে আমি ত রাস্তায় পড়িয়া মরিয়া থাকিতাম—কে আমার দিকে চাহিয়া দেখিত? দিল্লীতে আমার কে আছে—অথবা সে কথা তুলিলে ধরণীতে কাহার স্নেহ আমার দাবী করিবার আছে?"

দারিদ্র হইতে যে গর্ব্ব উদ্ভূত, উপেক্ষায় তাহার বিদ্রোহ সম্ভাবনা, চিকণ আপনার অবস্থায় তাহা বেশ বুঝিত। সে উত্তর করিল, "আচ্ছা মা! তুই যেমন বলিবি, আমি তেমনি করিব।"

"যে ঘরে আমি ছিলাম, ওটী তোমার শয়ন করিবার ঘর, আমি রূপালীর মুখে শুনিয়াছি। এত দিন, শয়নের স্থানাভাবে, সম্ভবতঃ তুমি অনিদ্রায় কাটাইয়াছ। আমি তোমাদের অনুকম্পায় এখন রোগমুক্ত হইয়াছি। তোমাদের এমন করিয়া কষ্টের কারণ আর আমার হওয়া উচিত নয়। যে রকম করিয়া হউক, আমি আমার জীবিকা অর্জ্জন করিব—সামান্য একটু পট আঁকিতে শিখিয়াছি—কোনও পটুয়ার দোকানে দাসী-বৃত্তি করিয়া—"

চিকণ দুর্বৃত্ত চক্ষুকে বর্ষণ-দুর্ব্বিপাক হইতে প্রাণপণে নিবৃত্ত করিয়া, নীলাকে বলিল, "আর দুর্ব্বল অবস্থায় বকিস্‌নি মা! উপরে যা'। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুই ছাড়া এ ক দিন আমরা কেহ কোন কষ্টই পাই নাই। আমি যাই, তোর জিনিসগুলি আনি। তুই যা' বলিবি, আমরা তাহাই করিব। তবে দিনকতক আমাদিগের এখানে থাকিয়া তোকে তোর লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে হইবে। ইহার মধ্যে আমাকে না বলিয়া যদি পলাইয়া যাস্, তাহা হইলে তোকে এ বৃদ্ধের আত্মহত্যা—অপঘাতের পাতকিনী হইতে হইবে, এ কথা মনে রাখিস্। আর এখানে নয়—এখন উপরে চল।"

নীলাকে ধরিয়া চিকণ উপরের ঘরে লইয়া গেল। বেলা হইয়া যাইতেছে—লোকজন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কি জানি, বলিতে পারি না কেন—বৃদ্ধের ভয় হইয়াছিল, তাহার সে পথিপ্রাপ্ত অমূল্য নিধি পাছে কোনও কুদৃষ্টির আকর্ষণে তাহার হস্ত-বিচ্যুত হইয়া যায়।

নীলাকে উপরে রাখিয়া আসিয়া, চিকণ যে কাজটা করিতেছিল, তাহা সমাপ্ত করিয়া কোতোয়ালীতে যাইবে, স্থির করিল। বড় জোর সে কাজটা শেষ হইতে আধ ঘণ্টা লাগিবে,—তাহার অধিক নয়।

অনতিবিলম্বে দ্রুতগামী অশ্বপদশব্দে বৃদ্ধ পথপানে চাহিয়া দেখিল। ধাবমান অশ্ব নিমেষমধ্যেই তাহার দোকানের সম্মুখে আসিলে, আরোহী পূরণচাঁদ বাবু অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া অবতরণপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি তোমার সহিত দেখা করিয়া যাইবার জন্যই এই পথে ঘুরিয়া আসিলাম, চিকণ!"

"গ্রীষ্মে দিল্লী অসহ্য?" না না, তা নয়। পাগলের খেয়াল, আমি পাগল ছাড়া আর কি বল? কাল রাত্রিতে ভাবিতেছিলাম,—সম্মুখের শীতে, আমার নূতন গোলাপের ক্ষেতে ফসল হইবার পূর্ব্বে, দেবতা আসিয়া সাধিলেও আমি দিল্লী পরিত্যাগ করিব না—আবার আজ এই এক ঘণ্টা হইল, আমার

দেবতাবিজয়ী অসুর মন হুকুম করিয়া বসিলেন, 'এখুনি চল—আর দিল্লি ভাল লাগে না;—সম্মুখের শীত, সে এখন অনেক দিনের কথা। গোলাপ ফুটিবার আশায় ততদিন এখানে থাকিলে, অন্য অসুখে না হউক, কেবল হাই তুলিয়া চোয়াল ধরাইয়া তোমাকে মারা যাইতে হইবে। 'কবে আসিব?' মনো-মহারাজ বলিতে পারেন—কিন্তু এখন তিনি বড় গম্ভীর, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর পাইবার আশা অল্প। আমার বাগানবাটীতে তুমি যাইও—যখন ইচ্ছা যাইও—কিশোর পুষ্পতরু লতাগুলিকে দেখিও—দেখিও কোনও কারণে যেন তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ না ঘটে। আমি থাকিতে পারিতেছি না, আমার হইয়া তুমি না হয় দিল্লীর ধূল্যগ্নিময় গ্রীষ্মকালটা আমার অপেক্ষাকৃত শীতল এবং সুরভি কুসুমকাননে অতিবাহিত করিলে? তবে আমি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তোমাকে যেন তোমার এই দোকানে দেখিতে পাই—না দেখিতে পাইলে মনে হইবে, পথ ভুলিয়া দিল্লীভ্রমে বুঝি আর কোনও দেশে আসিয়াছি। চিকণ ছাড়া দিল্লী আমার ন্যায় কবির কল্পনারও বহির্ভূত।"

পূরণচাঁদ পুনর্ব্বার অশ্বারূঢ় হইয়া চকিতের ন্যায় প্রস্থান করিল। চিকণ কথা কহিবার অবসরও পাইল না। পূরণচাঁদের ধারাই এই। উজ্জ্বল উল্কার মত পলকের ভিতর স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণই তাহার স্বভাব। বৃদ্ধ নানা কারণে সে দিন বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িল। পূরণে তাহার অপরিসীম আনন্দ, এবং অহংকার। সে পূরণ দিল্লী আঁধার করিয়া আবার কোন দেশ আলো করিতে চলিল—এই ভাবনার সঙ্গে, দুঃখিনী নীলার ভাবনা আবার তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। স্বতঃ সেই উপরের ক্ষুদ্র ঘরটীর পানে চিকণের দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত হইল এবং তাহাতে তাহার বিমর্ষ অন্তঃকরণে পুনর্ব্বার প্রসন্নতার আলোকাংশু প্রতিফলিত হইল। উপরে তাহার অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে যে, সে পুণ্য, সারল্য, এবং করুণার শুভ্রতায়, আলোক-সুন্দরী পবিত্র দেবীপ্রতিমা;—আর অশ্ব-পদ-ধূলিতে রাজপথ অন্ধকার করিয়া এইমাত্র তাহার চক্ষের অদৃশ্য হইয়া যাইল, সে কে? সে পূরণ, যে পূরণ—

৬

আট দশ বৎসর পূর্ব্বে পূরণচাঁদ বাবুর সহিত চিকণের প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন পূরণচাঁদের সবেমাত্র প্রথম অথবা অতি-কিশোর যৌবন—তখন সে অষ্টাদশ অথবা ঊনবিংশের মুনি-মনোহর সুন্দর যুবক! বিধাতা পুরুষ তাহার কোমল শরীর যেন মাখন হইতে কাটিয়া তুলিয়া তাহাতে রং ফুটাইবার জন্য অলক্ত-রস ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পাতলা ঠোঁট দু'খানিতে দিবানিশি আলতা ফাটিয়া থাকিত;—তাহার অনতি-স্থূল গণ্ডদ্বয়ে সদা সর্ব্বদাই গোলাপ ফুটিয়া থাকিত;—তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নদ্বয়,—যখনই চাও—প্রেমে যেন ঢল ঢল করিতেছে বোধ হইত!—তাহার সুগৌর মসৃণ ললাটে অতি কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলরাশি বিন্যস্ত দেখিলে মনে হইত, যেন সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সিতস্থলপদ্মকান্তিতে কৃষ্ণ ভ্রমরের পাঁতি অঙ্কিত রহিয়াছে! কিন্তু তাহার সে সমস্ত সৌন্দর্য্যে সেই অল্প বয়সেই যেন একটা শ্রান্তির ছায়া পড়িয়া, সেই অতুল শ্রী নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছিল!

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। চাঁদনী চৌকের ভিতর বার-ইয়ারী উপলক্ষে নাচ গান তামাসার সমারোহ। ধনী এবং সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহের উপস্থিতিতে সভামণ্ডপ

সমুজ্জ্বল। চিকণলাল সভা-বহির্ভাগে দরিদ্র জনমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ গান শুনিতেছিল; এক্ষণে রজনীর গভীরতা উপলব্ধি করিয়া, দোকানে ফিরিল।

সে সময় দিল্লীতে ভয়ঙ্কর মড়ক—প্রত্যহ শত সহস্র লোক "বিশুলী" রোগে আক্রান্ত হইয়া জীবলীলা সংবরণ করিতেছিল। বিভীষণ "বিশুলী" সংহারে অতিশয় ক্ষিপ্র-হস্ত। আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে হৃদয়ে একটা বেদনা অনুভব করে—পরক্ষণেই বেদনার অসহ্য যন্ত্রণা—প্রবল জ্বরে চেতনার বিকার—দুই ঘণ্টার মধ্যে কার্য্য শেষ।

হইলে কি হয়—যে মরে সে ত মরেই—তা' বলিয়া জগতের কোনও কার্য্য বন্ধ থাকে কি? যাহারা মরে, তাহারা মরে;—যাহারা মরে না, তাহারা দৈনন্দিন কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া নাচ গানও করে—কেমন না?

চিকণ গান শুনিয়া দোকানে ফিরিতেছিল। কতক দূর আসিয়া দেখিতে পাইল, একজন পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া অতি কষ্টে পথাতিবাহন করিতেছে। স্ত্রীলোকের কণ্ঠে মর্ম্মভেদী বেদনার আর্ত্তস্বর।

চিকণ্ তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলে পুরুষ সাগ্রহে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখ, এই স্ত্রীলোককে বোধ হয় 'বিশুলী' আক্রমণ করিয়াছে। ইহাকে লইয়া আমি চাঁদনী চৌকে বার-ইয়ারি নাচ দেখিতে গিয়াছিলাম; এখনও আমার গাড়ী ঘোড়া বা ভৃত্যাদি আসে নাই। সেখানে ইহাকে কেহ স্পর্শ করিল না। ইহাকে বাড়ী পৌঁছাইতে হইবে; একাকী আমি পারিতেছি না—আমাকে তোমার এ কার্য্যে সাহায্য করিবার সাহস হইবে?"

অনুরোধমাত্রেই চিকণ কার্য্যে অগ্রসর। যুবতীর দেহলতা চিকণ তাহার স্কন্ধে ফেলিয়া লইয়া চলিল। তম্বঙ্গীর ময়ূরের মত অঙ্গ-সজ্জারই আড়ম্বর অধিক; প্রকৃত দেহভার অতি অল্প। তাহার চেতনা ছিল না, মধ্যে মধ্যে সে কেবল অব্যক্ত ভাষায় মর্ম্মান্তিক যাতনাসূচক শব্দ করিতেছিল। ইহার মধ্যেই সে সুন্দর মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়া তাহাতে যেন নীল মাড়িয়া দিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে প্রতিভাত তাহার বহুমূল্য অলঙ্কারাদির ঔজ্জ্বল্য সে মুমূর্ষুকে যেন বিকট বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করিতেছিল। যুবতীর বয়ঃক্রম বিংশতির অধিক নয়। তাহার সহচর প্রায় তাহারই সমবয়সী।

তাহারা দুই জনে ভাগাভাগি করিয়া অবশেষে যুবতীকে তাহার বাটীতে আনয়ন করিল। বৃহৎ অট্টালিকা; গৃহসজ্জা উচ্চ রুচির পরিচায়ক, ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসের পুষ্টিকর জলবায়ুতে প্রত্যেক কক্ষ স্বাস্থ্যবান্। চারি দিকেই স্তূপীকৃত বহুমূল্য দ্রব্যাদি অযত্নে ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে;—সে সমস্ত দ্রব্যের রাশি এই জাতীয় যুবতীদিগকে এই জাতীয় যুবকেরাই অকাতর দান করিয়া থাকে—এবং তৎসমস্ত, সেরূপ স্থলে, মুক্ত হস্তের দান বলিয়াই যেন যত্নের পরিবর্ত্তে তাচ্ছীল্যে ব্যবহৃত হয়।

তাহাকে পালঙ্কে শয়ন করাইয়া, এবং যুবককে তাহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, চিকণ হাকিমের উদ্দেশে ছুটিল। হাকিম আসিয়া রোগিণীকে একবার আপাদ-মস্তক দেখিল মাত্র, তাহাকে স্পর্শ করিল না। ব্যাধি যে "বিশুলী," তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; রোগিণীর রক্ষাও নাই। মৃত্যু আশু এবং অনিবার্য্য; তথাপি যথারীতি ঔষধ-প্রয়োগ হইল। কিছুতেই ফল দর্শিল না। এক ঘণ্টার মধ্যে যুবতীর মৃত্যু হইল। নিদারুণ যন্ত্রণাভোগে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে শবমূর্ত্তি গলিত এবং বিকৃত দেখাইতে লাগিল।

প্রণয়িনীর মৃত্যুতে প্রণয়ী যে বিশেষ কাতর হইল, চিকণ এমন বোধ করিল না। সে সুন্দর বালক—এখনও বিংশতিতে পদার্পণ করিয়াছে কি না সন্দেহ; কিন্তু ইহারই মধ্যে সে যেন বহুদর্শী অশীতিপর বৃদ্ধের চক্ষে এই বিয়োগ অভিনয় দর্শন করিতেছিল। জগতে সে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনই বিচরণ করিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এই অল্পদিনেই তাহার দৃষ্টিতে করুণার অস্তিত্ব বিলোপ পাইয়াছিল—তাহার তরুণ অন্তঃকরণের নিভৃত কেন্দ্রে কে যেন এক প্রাচীন নৈতিক সমালোচকের বিচার-পিপাসু মন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল।

পীড়িতাবস্থায় রমণীর মধ্যে মধ্যে সামান্য চেতনার সমাবেশ হইলে, দুই জনের ভিতর মমতা বা স্নেহের কথার অণুমাত্র আদান-প্রদান ঘটে নাই। যুবতী তাহার দুর্ভাগ্যকে গালি দিয়াছিল মাত্র—আর যুবক বড় জোর তাহার যাতনা দেখিয়া দুই একবার বলিয়া উঠিয়াছিল, "আহা!" তা পথিপার্শ্বে পতিত পীড়িত পশু দেখিলেও সে তাহার উপর যে পরিমাণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিত, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হইলে, যুবক চিকণের নিকট উঠিয়া আসিয়া বলিল,"তুমি আজ আমার বড় উপকার করিয়াছ, তোমাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ করি! ও অবস্থায় তুমি আমাকে ওরূপ সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলে, বোধ হয় আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতাম না। তাহার পরে চোখের উপর এই বীভৎস ব্যাপারের সংঘটন—বিশেষ আমি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত—

"বেচারীর ভবলীলার শেষ হইল। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বার-ইয়ারী সভায় পান চিবাইতে চিবাইতে পান্নার আংটীর ভাগাদায়, বকাইয়া সে আমার প্রাণান্ত করিতেছিল! এইরূপ রমণীর এইরূপ মৃত্যু দেখিয়া কে অস্বীকার করিতে পারে, জাগতিক ধ্বংস কার্য্যের শেষ সোপান মৃত্যু—তাহার পর আর কিছু নাই—কেবল ধোঁয়া, বা শূন্য বা ব্যোম, যাহা খুসি বল।" পুনশ্চ রমণীর প্রেতদেহের উদ্দেশ করিয়া যুবা কহিল, "এরূপ জীবাত্মার,—স্বর্গ থাকিলে, তাহার কথা ত ছাড়িয়াই দাও—নরক থাকিলে, তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহারও মর্য্যাদা নষ্ট করিবার অধিকার নাই। তবে? মৃত্যুই ইহার সমস্তর শেষ সীমা বলিতে হইবে—তাহা হইলে তোমার শাস্ত্রীয় 'আত্মা অমর'—তাহার গতি কি দাঁড়ায়?"

মৃতার কর্ণবিচ্যুত বহুমূল্য রত্ন-পরিশোভিত একটী কর্ণালঙ্কার শয্যা হইতে কুড়াইয়া যুবক অতি উপেক্ষার স্বরে বলিল, "এই তুচ্ছ মূল্যে, আমি উহার আত্মা প্রথমে ক্রয় করি—সেই আত্মার সহিত ইহাও ভস্মীভূত হউক!" যুবক পুনর্ব্বার শয্যায় সেই কর্ণভূষণ ফেলিয়া দিয়া হাসিল।—"চল, আমরা কক্ষান্তরে যাইয়া বিশ্রাম করি।"

চিকণ এতক্ষণ কোনও কথা কহে নাই, অথবা কহিবার অবকাশ পায় নাই। শেষের কথা কয়টী শুনিয়া সবিস্ময়ে সে জিজ্ঞাসা করিল, "মৃতাকে এখানে এ অবস্থায় একাকিনী ফেলিয়া আমরা অন্যত্র যাইব?" চিকণ অবাক্ হইয়া ভাবিল, সেই দেবশ্রীর ভিতর এমন দানবের নির্ম্মমতা কেমন করিয়া প্রবেশ করিল?

যুবক বলিল, "তা' হইলই বা! উহার জীবিতাবস্থায়ই আমি উহাকে বড় একটা মানুষ বলিয়া ধরিতাম না, এখনত ও জীবন-হীন। প্রজাপতি বর্ণ-বৈচিত্র্যে দৃষ্টি মুগ্ধ করে, তা বলিয়া মরা একটা প্রজাপতি পথে পড়িয়া থাকিলে কে সেখানে বসিয়া

তাহার শোকে মাথা আছড়াইয়া কাঁদিতে থাকে?"

"ভাল বা মন্দ, বিবেচ্য-পরিমাণে উহাতে কিছুরই বিশেষত্ব ছিল না। আলস্যে আদর করিবার, সুন্দর সোহাগী কুকুর বিড়ালের ভিতর,—উহার গুণ-বাহুল্যের মধ্যে দেখিয়াছি, ক্ষুধাগ্নির আতিশয্য। অনেক দিয়াছিলাম, তথাপি উহার অবিশ্রাম 'দেহি দেহি' ঘুচাইতে পারি নাই। স্বভাব সকলকে সৃষ্টি করিয়া থাকে, কিন্তু উহাকে না সৃষ্টি করিলেও পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হইত না। যাহা হউক, সেই স্বভাবই যে সকাল সকাল উহাকে সৃষ্টিচ্যুত করিল—তাহা পরম মঙ্গলের কথা; এ বিষয়ে তোমাতে আমাতে একমত হইব কি না, জানি না। তিন মাস পূর্ব্বে উহার রূপে আমি প্রথম আকৃষ্ট হই—তিন মাস পরে আজ উহার সে রূপেরই যদি লয় হইল, তবে আর কিসের আকর্ষণে এখানে বসিয়া থাকিব, বল? ঐ আমার লোকজনেরা আসিয়াছে; চল, আমরা বাহিরে যাই।"

অনেকগুলি কক্ষ অতিক্রম করিয়া তাহারা নীচে সেই গৃহসংলগ্ন এক উন্মুক্ত উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তথায় মৃদু জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধালোকে শষ্প-শয্যায় উপবেশন করিল। যুবক তখন বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী সরাবের বোতল বাহির করিয়া পাত্রে সরাব ঢালিল, এবং পানার্থ চিকণকে আমন্ত্রণ করিল।

চিকণ যে সে আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিল, তাহা বলাই বাহুল্য। একে অতি কচিৎ কখন ভিন্ন পানে সে আদৌ অভ্যস্ত ছিল না—দ্বিতীয়তঃ যুবকের তাহার সহিত এ সৌজন্য সামান্যে মহত্ত্বের কৃপামাত্র ভাবিয়া, সে খানিকটা মর্ম্মাহতও হইয়াছিল।

"কেন, সামান্য পানে তোমার আপত্তি কি?" ক্ষুব্ধ হইয়া যুবক চিকণকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার তালুকে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষায়, আমার লোকেরা প্রাণপণ যত্নে আমার নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত এ সরাব তৈয়ারী করিয়াছে। তুমি কি ভাবিলে, আমি তোমাকে যে সে সরাব দিতেছি?—যে আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ।"

চিকণ চটিয়া কহিল, "তুমি কে, আমি জানি না, সম্ভবতঃ তুমি কোন ধনবানের অধঃপতিত বংশধর। সম্মুখের এ গৃহ আপাততঃ মৃত্যুর পাদস্পর্শে পবিত্র এবং শুদ্ধ—এখানে বসিয়া তুমি পানানন্দে উন্মত্ত হইতে পার—আমি তাহা পারি না। তুমি বালক, আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের মত শুকাইয়া ঝামা হইয়া যায় নাই—এখনও করুণা এবং কোমলতা আমার হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ মরিলে তোমার মত আমার মুখে হাসি, মনে স্ফূর্ত্তি আসে না। তোমার সহিত আলাপ করিয়া, তোমার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, আমি তোমার জন্য দুঃখিত ভিন্ন আর কি হইতে পারি?"

"হাসিয়াছি? কই, মনে নাই। মানুষ মরিলে দুঃখ করা স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও মৃতা মানুষী ছিল না। আকারের কথা বলিতেছি না, চরিত্রে এবং ব্যবহারে উহার ভিতর মানুষের লক্ষণ আমি মোটেই দেখি নাই। এইমাত্র তোমাকে যা' বলিলাম, ঐ জাতীয়ারা জীব-জগতের নিম্নস্তর; সোহাগ করিবার, আদর করিবার খেলা করিবার সামগ্রী। তোমার ঘাড়ে, পিঠে উঠিয়া বেড়াইবে, জলৌকার মত তোমার শরীরের সমস্ত রক্ত শোষণ করিবে—কিন্তু সে শোষণের প্রণালী এমন তৃপ্তিকর যে, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে

না।—জানিতে পারিবে না—আরামে তোমার নিদ্রা আসিবে। প্রকৃত মানুষী দেবতার নামান্তর, তাঁহারা জননী, ভগ্নী, বা দয়িতা রূপে সংসারে স্বর্গ রচনা করেন, এবং স্নেহ মমতার অভেদ্য বেষ্টনে গার্হস্থ্য নন্দন-কানন মধ্যে আপনার জনকে পাপ তাপের ব্যাধিময় স্পর্শ হইতে রক্ষা করাই তাঁহাদিগের চিরকাল সঙ্কল্প থাকে। জগতে এমন মানুষী বিরল—অনেক খুঁজিলে অল্পসংখ্যক পাওয়া যাইতে পারে, শুনিয়াছি। তুমি কখনও কোনও সুকাব্য পড়িয়াছ?"

তখন কাব্য, কবি, সহানুভূতি, প্রেম,—যুবক নানা বক্তৃতা আরম্ভ করিল। তাহার জমীদারীতে উৎপন্ন দ্রাক্ষারস তখন তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছিল। সে যাহা হউক, যুবকের অনন্যসাধারণ গবেষণা, বস্তু এবং বিষয় বিশেষে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সরল তেজস্বিনী বাগ্মিতা, বাস্তবিকই চিকণকে স্তম্ভিত করিল। তাহার স্বীয় আলাময়ী প্রতিভায় স্বতই সে অলোক-সুন্দর শ্রী, যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্ত লাবণ্যে প্রতিভাসিত হইতে লাগিল।

কথান্তে চিকণ বলিল, "তুমি এক জন নিপুণ বক্তা স্বীকার করি—কিন্তু আমি মূর্খ এবং বৃদ্ধ, সাদাসিধা ব্যাপার বুঝিবার শক্তি মাত্র ধারণ করি। আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি এইটুকু বলিতে পারি, উপরে তোমার প্রেমপাত্রী কাল-কবলে পতিত হইবামাত্র, তুমি তাহাকে কুকুর বিড়াল ভাবিয়া ঘৃণায় তাহার পানে চক্ষু ফিরাইলে, না—পরক্ষণেই নীচে আসিয়া সুরার সাহচর্য্যে কাব্য, এবং প্রেমের বক্তৃতা জুড়িয়া দিলে, এই উভয়-বিধ কার্য্যের মধ্যে যেন একটা কদাকার বিদ্রূপ মুখব্যাদান করিয়া হাসিতেছে বলিয়া আমার বোধ হয়।"

চিকণের কথায় অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, যুবক হাসিয়া উত্তর করিল, "তা হইতে পারে। আমি স্বয়ং কবি—অন্ততঃ আমার ধারণা এইরূপ। বোধ হয়, সেই জন্য এমন সময় ও সব কথা পাড়িলাম। কবিগণ কবিতাতেই কেবল আপনাদিগের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে, অন্য কিছুতে নয়।"

"তাহা হইলে অন্য কাহাকেও না শুনাইয়া, গোপনে তাহা আপনি শুনাই ভাল। সে কথা যাক্—আমি এখন চলিলাম। তোমার মত লোকের সঙ্গীর অভাব হইতে পারে না; কেন না, তুমি যে লক্ষ্মীর কোনও বরপুত্র, তাহা আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি। তাহা না হইলে ঐ হতভাগ্যা তোমাকে আশ্রয় করিত না। আর অধিকক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকিয়া আমার মেজাজটাকেও নিমের মত তিক্ত করিয়া লাভ নাই।"

চিকণ উঠিয়া দুই পা চলিতে না চলিতে যুবক আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

"না না,—আমাকে ছাড়িয়া যাইও না। তুমি আমার উপকারী বন্ধু। তুমি আমাকে ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু আমি তোমার সরল কথায়—তোমার সরল আকারে,—এই অল্প সময়েই তোমাকে ভালবাসিয়াছি। আমার ভৃত্যেরা আসিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গীদের আসিবার বিলম্ব আছে—যতক্ষণ বারোয়ারীর আমোদ প্রমোদ না শেষ হয় ততক্ষণ তাহারা আসিবে না—ততক্ষণ তুমি থাক। দোহাই তোমার, আমাকে ও মড়ার কাছে একাকী পরিত্যাগ করিয়া যাইও না।"

হঠাৎ তাহার স্ত্রীজনোচিত কোমল স্বর এবং কাতরতায় চিকণ তাহার পানে ফিরিয়া চাহিল। আশ্চর্য্য আকস্মিক পরিবর্ত্তন! নেত্রযুগলে জলাভাস, আবেগে ওষ্ঠ কম্পিত। চিকণ বুঝিতে পারিল না, কোন্‌টা তাহার প্রকৃত বা স্বাভাবিক—এখনকার এই কোম[illegible] না কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বের সেই নিষ্প্র-

ণতা নির্মলতা! অনেক দিন পরে, যুবক এবং চিকণলাল পরস্পরে যখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তখন চিকণ বুঝিয়াছিল, সে নিষ্প্রাণতা তাহার স্বাভাবিক, সে কোমলতাও তাহার প্রকৃতিগত!

যুবকের একটী পালিত কুকুর ছিল। এক দিন এক চপেটাঘাতে সে তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে। পর দিন পথিপার্শ্বে তাহাকে সমাধিস্থ করিয়া তাহার উপর উজ্জ্বল স্ফটিকের স্মৃতিস্তম্ভে সে যে কয় ছত্র কবিতায় আপন মর্ম্মোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া পথিকমাত্রেই অশ্রুবিসর্জ্জন করে। যুবকের চরিত্রে এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরে চিকণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

যুবক পুনর্ব্বার চিকণকে ধরিয়া বসাইল, এবং আপনি বসিল। তাহার চাঁদমুখ তখন কোথাকার অদৃষ্ট এক মেঘান্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছিল। যুবা শ্রান্ত এবং কাতর হইয়া পড়িল, এবং দুই হস্তে মুখ আবৃত রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে সুরাপাত্র পুনর্ব্বার পূর্ণ করিয়া বিনয়ের সহিত চিকণকে বলিল,—"একটু খাও, আমার কথা রাখ।" পূর্ব্বে তাহার প্রদত্ত সুরা চিকণ স্পর্শ করে নাই—অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু এখন, যখন চিকণ দেখিল, যুবকের দুই গণ্ডে দুইটী বড় বড় অশ্রুর মুক্তা দুলিতেছে, তখন তাহার প্রদত্ত সুরা, সমস্তই সে পান করিয়া ফেলিল।

এই যুবকই পরে বিধাতার মানস পুত্র. লক্ষ্মীর দুলাল, সরস্বতীর শুভাশীর্ব্বাদের অধিকারী, দিল্লীর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবি, ইত্যাদি মনোজ্ঞ বিশেষণসমূহে বিভূষিত হইয়া বাবু পূরণচাঁদ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তবে প্রতিষ্ঠাবান্ হইলেই যে প্রকৃত প্রতিভাবান্ হইতে হইবে, এমন কোনও নির্দ্দেশ নাই। পূরণের প্রতিভার ন্যায় আলাময়ী প্রতিভা আলেয়ার মত গতিশীল, এবং সময়ে জ্বলিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই নিবিয়া যায়। প্রকৃত প্রতিভার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র—তাহা সকল সময়ে স্থির—তাহার দীপ্তি স্থায়ী এবং শীতল।

সেই রাত্রির পরিচয় পূরণ এবং চিকণকে মৈত্রীর কুসুমরজ্জুতে বন্ধন করিল। স্বভাব চরিত্র অবস্থা এবং বয়সের সমুদ্র ভেদে দুইটী মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব যত দূর দৃঢ় হইতে পারে, তাহাদের তাহা হইয়াছিল। চিকণ পূরণকে অত্যন্ত ভালবাসিতে শিখিল—পূরণকে না ভালবাসিয়া কে থাকিতে পারে? পূরণকে ভালবাসিতে হইলে পাত্র-বিচারের অপেক্ষা করিবার যো নাই। আর চিকণের ন্যায় হীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ, কুব্জের প্রতি পূরণের ন্যায় ব্যক্তির আশ্চর্য্য আন্তরিক অনুরাগ এবং তাহার রূপ, সম্পদ্, জ্ঞান, বহুদর্শিতা, বাগ্মিতা,—এই সমস্ত একত্রীভূত হইয়া বৃদ্ধ চিন্তাশীল চিকণকে যে সহজেই তাহার একান্ত বশীভূত করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কিছু থাকিতে পারে না। বৃদ্ধ পূরণের নিকট আপনাকে ঋণী বিবেচনা করিত, কারণ, পূরণের ভাব এবং চিন্তার ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বিস্তর সামগ্রী সে আপনার ভাণ্ডারে অপহৃত করিয়া আনিয়াছিল।

পূরণচাঁদের জীবন-তরণী সংসার-সমুদ্রে বরাবর সু-বাতাসেই বহিয়া যাইতেছিল। সে অগাধ সম্পত্তির মালিক—তাহার মাথার উপর কোনও লোক ছিল না। তাহার কথার উপর কথা কহিতে কেহ কখন সাহস করে নাই। বুঝি আশৈশব একাদিক্রমে জীবনের সেই সমতায়, জীবন তাহার সকল সময় প্রীতিকর বোধ হইত না। সে বৈচিত্র্য খুঁজিয়া বেড়াইত; কোথাও তাহা মিলিত না। সংসারের ঝঞ্ঝা ঝটিকায় পড়িলে, হয় ত তাহার

প্রতিভা প্রকৃত অবিনশ্বর প্রতিভায় পরিণত হইতে পারিত। পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন—"খাও পর হাস খেল"—এ কালের পূরণচাঁদেরা সে কথার সারবত্তা উপলব্ধি করে না। তাহারা বলে কি লইয়া হাসিখেলি? হাসাইবার কে, খেলিবারই বা খেলনা কই? সংসারে একে রূপ বড় বিরল, তাহাতে আবার উপভুক্ত রূপে মাধুর্য্য থাকে না। সুতরাং যদি হাসিতে খেলিতেই না পারিলাম—তবে খাইব পরিব কিসের জন্য? দুই দিনেই তো চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবে।

পূরণ ভ্রমণপ্রিয়—অধৈর্য্য; এক স্থানে অধিক দিন থাকিতে পারে না। প্রায়ই দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত—সে সময় দিল্লী চিকণের চোখে নির্জ্জীব বোধ হইত—পূরণ যে দিল্লীর জীবনী শক্তি! কিন্তু আজ সে ভাল বুঝিতে পারিল না, অথবা বুঝিবার চেষ্টা করিল না,—আজ এইমাত্র খামখেয়ালী পূরণ দিল্লীত্যাগ উপলক্ষে তাহার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, কেন সে আপনাকে দুঃস্থ বোধ করিল?

পূরণ মধ্যে মধ্যে চিকণের সহিত তাহার দোকানে দেখা করিতে আসিলে, একবার তাহার উপরের ঘরে গিয়া সে গৃহসজ্জা, শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করিয়া যাইত না। আজ ব্যস্ততা প্রযুক্ত সে উপরে যাইতে ভুলিয়া গেল বলিয়াই কি চিকণের স্ফূর্ত্তি? বলিতে পারি না।

আজিকার পূরণ, চিকণের প্রথম পরিচয়ের পূরণ অপেক্ষা অষ্টাদশ বৎসরের বড়। ঘরে ঘরে এ পূরণের নাম—এ পূরণের কবিতায়, এ পূরণের গানে, জগৎ আজ উন্মত্ত! এ পূরণের মূর্ত্তির উপর যে নারীর চক্ষু পড়িয়াছে, জাহান্নমে তাহার গতি অবধারিত! এ পূরণের সহিত আলাপে সহরের ওমরাহবৃন্দ আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিত। এ পূরণ শত্রুর শমন এ পূরণ যথেচ্ছাচারী, ধরণীর প্রলয় তাহার একটী খেয়াল মিটাইবার মূল্য হইলে, এ পূরণ তাহাও তুচ্ছ বোধ করিত! (ক্রমশঃ)

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

১৪

কালীদহ গ্রামের জমীদার বাবুর নাম শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। রত্নেশ্বর বাবু মনে করিলে, হয় ত অম্বিকার বর মিলিত। কিন্তু তিনি ভীরুস্বভাবের লোক ছিলেন। জাতিচ্যুতা, নিন্দিতা, বয়োপ্রাপ্তা অম্বিকার বিবাহ দিবার জন্য যে সৎসাহসের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। অথবা বিধিলিপি অন্যরূপ বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি এই সৎকার্য্যে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। তথাপি তিনি অম্বিকার পিতাকে একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে লইয়া, বা তাঁহার কন্যা অম্বিকাকে লইয়া, আহারাদি করিতে গ্রামের অধিকাংশ লোকের ন্যায় তিনিও কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে আপন বাটীতে আহ্বান করিয়া যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন।

রত্নেশ্বর বাবুর আস্তাবলে গাড়ি ও বলবান্ অশ্বসকল ছিল। আবশ্যক হইলে,

কানাত সামিয়ানা, পালিচা, ঝাড় লণ্ঠন তৈজসাদির ন্যায়, গাড়ি এবং জুড়ি তিনি গ্রামবাসীদিগকে ব্যবহার করিতে দিতেন। এখনও বাঙ্গালার অনেক মান্য জমীদার গ্রামবাসিগণের বিবাহাদি উৎসবের জন্য কানাত সামিয়ানা প্রভৃতি বহু দ্রব্য আপনাদিগের তোষাখানায় মজুত রাখিয়া থাকে, কিন্তু এই প্রকারের পরোপকার ক্রমে বিলুপ্ত হইবার সম্ভব ঘটিয়াছে।

রত্নেশ্বর বাবুর গাড়ি চড়িয়া, সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণ চাটুয্যে, অম্বিকা ও গদাধরকে লইয়া নাড়িচা অভিমুখে চলিয়াছিলেন। গদাধর পিতা মাতার কথা ভাবিতেছিল। আর তাহার চক্ষে জল আসিতেছিল। হায়! যদি তাহার জীবন নাশ ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়া যাইতেন। এতক্ষণ তাহাকে বাড়িতে আগত না দেখিয়া, না জানি তাঁহারা কত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন।

গদাধরের হাতে একটি পুটুলি দেখিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধর তুমি পুটুলিটি কোথায় পাইলে? উহাতে কি তোমার পরিধেয় বস্ত্রাদি আছে? তাহা হইলে, তুমি তোমার দ্রব্যসকল রক্ষা করিতে পারিয়াছ! সেরূপ বিপদের সময় বস্ত্রাদি রক্ষা করা আশ্চর্য্য বটে।"

গদাধর। আজ্ঞা, বস্ত্রাদি আমি কিছুই রক্ষা করিতে পারি নাই।

কৃষ্ণ। তবে তোমার এ পুটুলিতে কি রাখিয়াছ?

অম্বিকা। বাবা, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি বলিব, পুটুলিতে কি আছে আমি উহা খুলিয়া দেখিয়াছিলাম।

গদাধর। হাঁ, তুমি আমার পুটুলি খুলিয়া দেখিয়াছ? এটা [illegible] তোমার নিতান্ত স্ত্রীলোকের মত কার্য্য হইয়াছে।

কৃষ্ণ। পুটুলিতে আছে কি?

অম্বিকা। আছে এক টিন তামাক, আর দশটি বেগুন, আর দশটি মূলা।

কৃষ্ণ। এ সকল লইয়া তুমি কি করিবে গদাধর? সমস্ত ছাড়িয়া, প্রাণনাশকর বিপদের মধ্যে, কেন তুমি এইগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলে?

গদাধর। আমাদের গ্রামে ভাল তামাক পাওয়া যায় না। বাবা বলিতেন, কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানার তামাক বড় ভাল। তাই বাটী আসিবার সময় কিছু তামাক লইয়াছিলাম।

অম্বিকা। আর বেগুন ও মূলা?

গদাধর। উহাও বাবার জন্য। এ সময় আমাদের গ্রামে বেগুন ও মূলা পাওয়া যায় না। বাবা বেগুন মূলার তরকারি খাইতে বড় ভালবাসেন।

কৃষ্ণ। তাই, প্রাণসংশয় অবস্থাতেও তুমি উহা ত্যাগ কর নাই। তুমি শুন, গদাধর! মা, অম্বিকা! গদাধর যেমন তাহার পিতাকে ভালবাসে, তুমিও কি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে তেমনই ভালবাস?

পিতার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অম্বিকা সক্ষম হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার অতি মধুর চক্ষুতে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ পূর্ণ করিয়া, এমন একটি অদ্ভুত দৃষ্টি পিতার মুখের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্যেক অবয়ব এক স্বর্গীয় সুধায় আপ্লুত হইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই একটি দৃষ্টিতে, তিনি পৃথিবীতে থাকিয়া, দেবতাদিগের বাঞ্ছিত স্বর্গীয় সুধা উপভোগ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময়, তাঁহারা নাড়িচা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। বড় রাস্তায় গাড়ি রাখিয়া, ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ অনুসরণ করিয়া, তাঁহারা গদাধরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এখনও গঙ্গাতীরে পুত্রের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন; বাটীতে প্রত্যাগত হ'ন নাই। গদাধর শয়নগৃহের দাওয়ায় একটী মাদুর বিস্তৃত করিয়া, তাহাতে অম্বিকা ও অম্বিকার পিতাকে বসিতে বলিয়া, মাতার অনুসন্ধানে পাকগৃহের দিকে দ্রুতপদে ধাবিত হইল।

পাকগৃহের দাওয়ায় গদাইএর মাতা বসিয়াছিলেন। তিনি গদাইকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর, গৃহের বংশস্তম্ভ ধরিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "গদাই, বাবা আমার, বাড়ি আসিলে?" গদাই দাওয়ার উপর উঠিয়া, মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, "মা, আমি আসিয়াছি।"—"মা, আমি আসিয়াছি," এই তিনটি সামান্য শব্দে না জানি কি অপ্রমেয় মধুরতা সিঞ্চিত ছিল; তাহাতে মাতার কর্ণ, বক্ষঃ সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিল; স্নেহরস মনোমধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

গদাধর আবার কহিল, "মা, বাবা কোথায়?" মাতা বলিলেন, "তোমার চক্রবর্ত্তী কাকা বোধ হয় বাড়িতেই আছেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। বোধ হয়, তিনি এখনও গঙ্গাতীরে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। সেই সকালে গিয়াছেন, আর বাড়ি ফিরেন নাই। সমস্ত দিন তাঁহার আহার হয় নাই।" গদাধর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি যাই মা, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনি। আমার অপেক্ষায় সমস্ত দিন উপোষ করে থাকা তোমাদের মোটেই ভাল হয় নাই।"

পুরাতন পরিচিত পথ সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্ণয় করা গদাধরের পক্ষে কিছু মাত্র ক্লেশদায়ক হয় নাই। সে সহজেই তাহার চক্রবর্ত্তী কাকার বাটিতে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। চক্রবর্ত্তী কাকা অন্য কেহ নহেন, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত উমাকালী চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী কাকার বাটীতে উপস্থিত হইয়া গদাধর ডাকিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা।" উমাকালী তাঁহার হস্তধৃত মৃৎপ্রদীপের আলোক সাধ্যমত উজ্জ্বল করিয়া, এবং তাহা উর্দ্ধে তুলিয়া তাহার পূর্ণ রশ্মি গঙ্গাধরের উপর নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "আরে কে,ও? গদাধর নাকি? কখন আসিলে? এস বাবা এস।"

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বলিতে পারেন কি বাবা কোথায় আছেন? এখনও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে নাই।"

উমা। তুমি এই দাওয়ায় বসিয়া তোমার খুড়িমার নিকট কলিকাতার গল্প কর। আমি মধুসূদন ভায়াকে ডাকিয়া আনিতেছি। এখনও বোধ হয় বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

গদাধর। না, আপনার যাইতে হইবে না, আমিই গঙ্গাতীরে যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি। আপনি বরং আমাদের বাটীতে গমন করুন; সেখানে কালীদহ গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় এবং তাঁহার কন্যা আসিয়াছেন।

উমা। তোমাদের বাটীতে ত যাইবই। কিন্তু তাহার আগে আমিই মধুসূদন ভায়াকে ডাকিয়া আনিব। তোমাকে হঠাৎ তাঁহার কাছে যাইতে দিব না। তোমার বাবাকে ত তুমি চিন না। তোমাকে হঠাৎ দেখিলে, অত্যন্ত আহ্লাদে হয় ত কি একটা ভয়ঙ্কর রকম কেলেঙ্কারি করিয়া বসিবে।

গদাধর বুঝিল, কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে, বহুদিন, এবং বহু নিরাশার পরে হঠাৎ তাহাকে দেখিলে, তাহার অত্যন্ত স্নেহময় পিতা, [illegible]নের মনকষ্ট এবং অনাহারের

পর, মূর্চ্ছিত হইতে পারেন। অতএব সে পিতাকে আহ্বান করিতে যাইবার জন্ম আর উদ্যত হইল না। উমাকালী চক্রবর্ত্তী একটি পুরাতন ধুচনির মধ্যে মৃৎপ্রদীপটি লইয়া এবং স্কন্ধদেশে গামছাখানি বিলম্বিত করিয়া মধুসূদনের সন্ধানে গঙ্গার উপকূলাভিমুখে প্রস্থান করিল। এবং অল্প সময় মধ্যে মধুসূদনকে লইয়া আপন গৃহে প্রত্যাগত হইল।

গদাই পিতার পদে প্রণত হইল। মধুসূদন তাঁহার মস্তক হইতে সেই রঙ্গিন গামছার উষ্ণীষটি খুলিয়া, তাহার দ্বারা পুত্রের মুখ মার্জ্জিত করিয়া দিলেন, তাঁহার স্নেহাপ্লুত প্রকম্পিত দুহস্তের দ্বারা পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। আমার পাঠক বর্গের মধ্যে যদি কেহ গদাধরের ন্যায়, পিতার স্নেহস্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া, পৃথিবীতে ত্রিদিবের সুখ লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে সে বুঝিবে, গদাধর আজ কি পরিমাণে অতুলনীয়, অভাবনীয় সুখে অভিভূত হইয়াছিল। সে স্পর্শ মোহিনীর সুধাকাঙ্ক্ষিত সুধা অপেক্ষা সুধাময়। তাহা সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়া, অক্ষয় কবচের ন্যায়, বুঝি বা স্বয়ং মৃত্যুকেও পরাজয় করিতে সক্ষম হয়।

গদাই, পিতাকে ও তাহার চক্রবর্ত্তী কাকাকে লইয়া বাটিতে ফিরিল। তথায় শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীমতী অম্বিকা দেবীর নিকট তাঁহাদিগকে পরিচয় করিয়া দিল। তাহার পর, সে নিজের বিপদ্ ও তাহা হইতে উদ্ধারের কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল।

মধুসূদন, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে ও তাঁহার কন্যা অম্বিকাকে দেখিয়া ধন্য হইলেন। ইঁহার জন্য পরিবর্ত্তন করিয়া গদাধর কর্তৃক কলিকাতা হইতে আনীত সেই বাজারটির তামাকু কলিকাতে সজ্জিত করিয়া, স্বহস্তে ধরিয়া তিনি কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়কে তামাকু খাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণবিহারী কহিলেন, "মহাশয়, আমি এখনও তামাকু খাইতে অভ্যাস করি নাই।"

মধুসূদন। বলেন কি? আপনি তামাকু খা'ন না।

কৃষ্ণ। না, মহাশয়, ওটা এপর্য্যন্ত অভ্যাস হয় নাই। যদি উৎকৃষ্ট তামাকু বালাখানা হইতে আনিবার জন্য এবং নিজে জলমগ্ন হইয়া মরণাপন্ন অবস্থাতেও তাহা রক্ষা করিবার জন্য, আমার গদাধরের ন্যায় একটি পুত্র থাকিত, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। কেননা এরূপ পুত্রের আদর-মাখা তামাকুটা আর তামাকু থাকিত না। তাহা অমৃত হইত। সে অমৃত পানে পৃথিবীতে থাকিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারিতাম।

মধুসূদন। আপনি সত্য বলিয়াছেন, গদাধর আমাকে বড় ভালবাসে। আর আমি? আমিও উহাকে খুব ভালবাসি। আপনি দেবত্বলাভের কথা বলিতেছেন, কিন্তু পুত্রের মুখ দেখিতে দেখিতে যদি আমি মরিতে পারি, তাহা হইলে, আমি দেবত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না।

কৃষ্ণ। আপনি স্নেহবান্ পুরুষ। মানুষের মন যতদিন স্নেহরসে পরিপ্লুত না হয়, ততদিন তাহা নরকে থাকে;—আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহাকে পুন্নামক নরক কহিয়াছেন।

মধুসূদন। পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করে বলিয়াইত ইহার নাম পুত্র হইয়াছে।

মধুসূদন ও কৃষ্ণ চাটুর্য্যে যখন কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন উমাকালী চক্রবর্ত্তী মধুসূদনের হস্ত হইতে হুকাটি লইয়া নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতে

ছিলেন। শুভ্র সুগন্ধি ধূপ দীপালোকে আলোকিত হইয়া, চন্দ্রালোকিত শারদ নীরদমালার ন্যায়, তাহার মুখের চারি পার্শ্বে শোভা পাইতেছিল। তাম্রকূটের সুমধুর মধুরতায় বিজড়িত, অর্দ্ধনিমীলিত তাহার লোচনদ্বয়, অম্বিকার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য অবলোকনে নিতান্ত নিযুক্ত ছিল। তাম্র-কূটের ধূমের মধ্য দিয়া এবং ক্ষীণ দীপা-লোকে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল বলিয়া এবং নিরীক্ষণকালে তাঁহার চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত থাকায়, উমাকালীর বক্ষে অম্বিকার মধুর মূর্ত্তি, ধূপ ধূনার ধূমমধ্যবর্ত্তিনী স্বপ্নদৃষ্টা এক অপূর্ব্ব দেবী-প্রতিমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। মূর্ত্তি দেখিয়া, মুগ্ধ উমাকালী ভাবিতেছিলেন, "কে এ বালিকা? শরীরিণী বীণাপাণির ন্যায়, দেব চিত্রকরের মূর্ত্তিমান্ চিত্রাঙ্কণের ন্যায়, কুসুমসুষমাবিগঠিত জীবন্ত পুত্তলিকার ন্যায়, কে এ বালিকা? মহিমাময়ীর ন্যায়, পরমারাধ্যার ন্যায়, কমলা পতির শিরোভূষণ ললিত পুষ্পমালার ন্যায়, কে এ বালিকা? ইনি কি দেবী সরস্বতী, মধুসূদনের পুত্রকে বিদ্যাদান করিবার জন্য জগতে আবার আবির্ভূত হইয়াছেন? মধুসূদন আমাদিগকে সত্য বলিত যে, তাহার আশীর্ব্বাদে দেবী বীণাপাণি তাহার পুত্রকে আপনি বিদ্যাদান করিবেন। তাহার আশী-র্ব্বাদ সফল হইয়াছে; গদাধর বিদ্যালাভ করিয়াছে; স্বয়ং বিদ্যাদেবী তাহাকে বিদ্যা-দান করিয়াছেন।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যের সহিত কথা কহিতে কহিতে মধুসূদন বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "উমাকালী ভাই, হুকাটা এদিকে।" কথাটা শুনিয়া, উমাকালীর স্বর্গের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর অম্বিকা দেবীও গদাধরের মাতার আহ্বানে গৃহ মধ্যে অন্তর্হিতা হইল। মধুসূদন তামাকু খাইতে খাইতে কৃষ্ণ চাটুর্য্যেকে প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কন্যাটির বিবাহ দিয়াছেন কোথায়? যেরূপ রূপ দেখিতেছি, তাহাতে রাজমহিষীও ইহার নিকট লজ্জিতা হইবেন।

কৃষ্ণ। আমার কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই।

মধুসূদন। কেন? বিবাহের বয়সত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কৃষ্ণ। এ পর্য্যন্ত, আমার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য আমি সুপাত্র প্রাপ্ত হই নাই। আর—

মধুসূদন। আর কি মহাশয়?

কৃষ্ণ। আমার কন্যার কোষ্ঠীর এই ফল যে, উহার কখন উদ্বাহ হইবে না।

মধুসূদন। বলেন কি? এরূপ কখনও শুনি নাই।

কৃষ্ণ। না। কিন্তু উহাই বিধিলিপি। গদাধর পিতার পার্শ্বে বসিয়া শুনিল যে, অম্বিকার কখনও বিবাহ হইবে না; কেননা, উহাই অখণ্ডনীয় বিধিলিপি। বিধাতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অম্বিকাকে বিবাহ করিতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে নাই। যদি সে অর্থবান্, রূপবান্, বিদ্বান্, হইয়া অম্বিকা লাভের উপযুক্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত সে বিধিলিপি লঙ্ঘনের জন্য একবার সেই চেষ্টা করিত; কিন্তু না।—এই কদর্য্য দেহ লইয়া, এই অসম্ভব অর্থহীনতা লইয়া, এই রাজমুকুটের মণি লাভ করিবার আশা করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম। গদাধর তাহার পত্নি হওয়া অপেক্ষা, অম্বিকার চিরদিন কুমারী থাকা শ্রেয়ঃস্কর। না।—অম্বিকাকে পত্নী-রূপে লাভ করিবার দুরাশা গদাধরের হৃদয়-মধ্যে আর কখন স্থান লাভ করিবে না।

রাত্রি নয়টার পর, আহারাদি করিয়া,

জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গাড়ি চড়িয়া, গদাধর এবং গদাধরের পিতা এবং মাতার নিকট বিদায় লইয়া, অম্বিকা এবং তাহার পিতা কালীদহ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উমাকালীও বিদায় লইল। যাইবার সময় মধুসূদন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমাকালী ভাই, তামাকটা কেমন খাইলে বল দেখি?"

১৫

চলি, চলি, পা, পা।

পাঠকগণ! তোমরা সমাহিত হও। আমার সুন্দরী নায়িকা আমার এই গল্পের আসরে অবতীর্ণা হইতেছেন। এত দিন তিনি আসেন নাই বলিয়া, তোমরা কত খুঁজিয়াছ। তাঁহার নূপুরমুখরিত চরণ ধ্বনি শুনিবার জন্য কত উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া আছ। এখন ঐ দেখ, ঐ তিনি আসিতেছেন। পদ্মিণী সমাশ্রিত ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায়, রুণু রুণু ঐ শুন তাহার মধুর নূপুর-ঝঙ্কার। বেলাপ্রতিহত নিনাদিনী তটিনীর তরঙ্গের ন্যায়, ঐ শুন তাহার কল কল হাসি। মধুবসন্তের প্রথম কোকিল-কুহুরবের ন্যায়, ঐ শুন তাহার সরস মুখের মধুর ভাষণ।

চলি, চলি, পা, পা।

মরালের গতিকে নিন্দিত করিয়া, তালে তালে, কদলীকাণ্ড বানিন্দিত অনিন্দ্য পদ-যুগল মাতা বসুমতীর বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া এস আমার মানময়ী মানদা। এস, আমার এই উপন্যাস-উদ্যানের সৌরভময়ী বসরাই গোলাপ। এস হে আমার সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বাধিকা নায়িকা।

চলি, চলি, পা, পা।

ঐ দেখ, ঐ আমার নায়িকা আসিয়াছে। দিক্‌সকল তাহার আগমনে ঐ দেখ আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত মেদিনীর বক্ষের ন্যায়, আমার এ উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চ, আমার এ নায়িকার রূপালোকে প্রভাসিত হইয়াছে। দেখ, দেখ, তাহার চরণের কি চমৎকার শোভা;—কি কোমল ফুল্ল কুসুমবৎ চরণ দু'খানি; তাহাতে—আমরি—আভরণের কি সুমধুর অস্ফুটধ্বনি। তাহার পীবর নগ্ন কটিতট, দেখ, দেখ, সুচারু সুবর্ণ অলঙ্কারে কিরূপ অপরূপ বিভূষিত হইয়াছে। তাহার লালা-প্লাবিত উন্মুক্ত উরসে, দেখ, দেখ, দলদলায়মান কনক কণ্ঠভূষা সুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যায় কেমন দুলিতেছে। তাঁহার বিকচ ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া, দেখ, দেখ, তাহার নলকের স্ফীত মুকুতাটি কেমন কাঁপিতেছে। তাহার কেশাগ্রভাগ ধরিয়া, কেশনিবদ্ধ সুবর্ণ-বিজড়িত রত্নমালা দিক্‌সকলকে রোমাঞ্চিত করিয়া, দেখ, দেখ, কেমন কোমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে।

পরিচারিকা করতালি দিয়া ডাকিতেছিল, 'চলি, চলি, পা, পা।' আর মানদা—এই উপন্যাসের নায়িকা—তাহার করতালির তালে তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অল্প অগ্রসর হইয়াই, বারান্দার মেজের উপর বসিয়া, চুড়ি ও বালার দ্বারা পরিশোভিত হস্ত উত্তোলন করিয়া, সঙ্কেতে পরিচারিকাকে আহ্বান করিল এবং জানাইল, "আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ কর।"

কে এ মানদা?

আমি তোমাদিগকে কালীদহ গ্রামের কথা বলিয়াছি। আর বলিয়াছি যে, উক্ত কালীদহ গ্রামে একজন জমীদার ছিলেন। এবং ইহাও বলিয়াছি যে, উক্ত জমীদার বাবুর নাম শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। মানদা রত্নেশ্বর বাবুর কন্যা; একমাত্র কন্যা;

চারি বৎসর ধরিয়া জোড়া কার্ত্তিক পূজার একমাত্র পুণ্যফলস্বরূপ কন্যা; এবং তাঁহার ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক আয়ের জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী কন্যা।

মানদা পরিচারিকা ও পরিজনগণের গলার হার; জমিদার-গৃহিণীর বক্ষের নিধি এবং স্বয়ং জমিদার বাবুর নয়নের মণি। মানদা হাসিলে সকল লোক মনে করিত যে, হাসিরাশির সহিত রাশি রাশি কোহিনুর বর্ষিত হইতেছে, আর কাঁদিলে মনে করিত যে, অশ্রুধারার সহিত গজমুক্তার বৃষ্টি হইতেছে। মানদা কথা কহিলে মনে হইত, কর্ণবিবরে যেন বাগবাজারের রসগোল্লা প্রবিষ্ট হইতেছে। মানদা অঙ্গসঞ্চালন করিলে মনে হইত, যেন ক্ষীরসমুদ্রে মণিমণ্ডিত তরঙ্গ উঠিয়াছে।

কিন্তু এ হেন মানদাকে নায়িকারূপে পাইয়াও তোমাদের দুঃখিত হইবার কারণ বিদ্যমান আছে। তাহার বয়সের কথা শুনিলে তোমরা সবিশেষ হতাশ্বাস হইয়া পড়িবে। বুঝি বা আমার এ নীরস কাহিনী পড়িতে বিরত হইবে। তবু এ অকথ্য কথা তোমাদিগকে শুনাইতেই হইবে। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও। মানদার বয়ঃক্রম দুই বৎসর মাত্র।

হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! নায়িকার বয়স দুই বৎসর মাত্র। তথাপি তোমরা হতাশ হইও না। তোমাদের আশা ক্ষীণ অগ্নিকণার ন্যায় হইলেও, কালে ঐ অগ্নিকণা হইতেই বিশাল অনল-শিখা গগন স্পর্শ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। ধৈর্য্য ধর। এই দুই বৎসরের ক্ষুদ্র নায়িকার মধ্যে প্রেম-মহীরুহের অঙ্কুর বিদ্যমান আছে। এ অঙ্কুর কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। যে মেহের উন্নিসা বিবি, নুরজাঁহান নাম গ্রহণ করিয়া, আপন চম্পক-কলিবিনিন্দিত ক্ষুদ্র তর্জ্জনী সঞ্চালনে বিশাল ভারত রাজ্য,—অপিচ ভারত-সম্রাট্‌কে প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, তিনিও একদিন মরুপথ-পার্শ্বে পরিত্যক্তা অসহায়া ক্ষুদ্র বালিকা ছিলেন। ভারত-শাসনের সমস্ত মন্ত্র, বীজরূপে সেই সদ্যঃপ্রসূতের ক্ষুদ্র দেহ-মধ্যে নিহিত ছিল। এক্ষণে মানদা নায়িকার অঙ্কুর। কিন্তু এই অঙ্কুরই একদিন বড় হইবে। বড় হইয়া ভারত-সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহৎ এবং আকাশের ন্যায় উদার এক মনোরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। সেই শুভদিনের শুভাগমনের জন্য, তোমরা পথপানে চাহিয়া থাক।

আপাততঃ—'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল'—এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া, তোমরা মানদার কিঞ্চিৎ মধুর ভাষ শ্রবণ কর। নায়িকারা বয়োধিকা হইলে তাহাদের,—"তেল নাই, ঘি নাই"—ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ভাষা শ্রবণ করা অপেক্ষা, আমার মতে, নায়িকাদিগের নাবালিকা অবস্থার কথা শ্রবণ করা অনেক সুখকর।

মানদার ভাষাশিক্ষয়িত্রী—শ্রীমতী লাবণ্যসুন্দরী দাসী। কিন্তু লাবণ্যসুন্দরী নামটা তাহার নামকরণের পর আর ব্যবহার হয় নাই। না, না, তাহার বিবাহের সময় নামটা আর একবার ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা আমার পূজনীয় ঠাকুর-দাদা মহাশয় কহিয়াছিলেন। তদতিরিক্ত সময়ে শ্রীমতী লাবণ্যসুন্দরী, "সুলি," এই অপূর্ব্ব আখ্যায় অভিহিত হইত। লাবণ্যসুন্দরী কিরূপে 'সুলি'তে পরিণত হইল, তদ্বিষয়ে আমার নিজ অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র নাই। আমার এক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বন্ধু কহিয়াছিলেন যে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে লাবণ্যসুন্দরীর [illegible]ীব, বেঙাচির ল্যাজের ন্যায়

খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল; পরে লাবণ্য শব্দের 'লাব' স্থানে 'লু' এবং 'ণ্য' স্থানে 'ণু' হইয়া লাবণ্যটা 'লুনি' হইয়াছিল। পরে 'লু'টা "নু" আর "নি"টা "লি"তে সহজেই পরিণত হইয়াছিল; "লবণ" হইতে এই রূপে "নুন" হইয়াছে। নুলির উননমুখ, হতচ্ছাড়া, হাড়জ্বালানে মিন্সে যখন তাহাকে জন্মের মত মৎস্যাহারে বঞ্চিত করিয়া, নূতন প্রেতিনীর অনুসরণে প্রেতাত্মা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন নুলির বয়স আঠাইশ বৎসর। সে সেই আঠাইশ বৎসর বয়সে কালীদহ গ্রামের জমীদার বাবুদিগের গৃহে দাসীরূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। যে বৎসর সে পরিচারিকা নিযুক্ত হইল, সেই বৎসরেই বর্ত্তমান জমীদার শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর বাবু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নুলি রত্নেশ্বর বাবুকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। আজ রত্নেশ্বর বাবুর বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, এবং নিজের ষাটি বৎসর বয়সে সে রত্নেশ্বর বাবুর কন্যা মানদাকে কোলে করিয়া ভাষা শিক্ষা দিতেছিল। নুলি নিরক্ষর। তথাপি উপাধিধারী মহাপণ্ডিতগণ সিবিল সার্ভিসের ছাত্রগণকে বাঙ্গলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিতে যে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, নুলি দুই বৎসরের শিশু কন্যাকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রমও স্বীকার করিত না। নুলির শিক্ষাপ্রণালী বিচিত্র। সে মানদার সম্মুখে বসিয়া, শত প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া, দন্তহীন মুখবিবরে লালাবিজড়িত হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিত, "চলি, চলি, পা, পা।" আর মানদা অরুণালোকিত শিশিরকণার ন্যায় ছয়টি নূতন দন্ত বাহির করিয়া, নুলির অঙ্গভঙ্গির তালে তালে পা ফেলিয়া বলিত, "তলি তলি, তা।" নুলি করতালি দিয়া তালে তালে বলিত, "ভাই, ভাই, ভাই, মামার বাড়ী যাই।" মানদা দুলিয়া, দুলিয়া ক্ষুদ্র করপল্লবের উপর ক্ষুদ্র করপল্লব স্থাপন করিয়া বলিত, "তা, তা, তা।"

এইরূপে মানদার ভাষাশিক্ষা হইতেছিল। আর আমরা ত বলিয়াছি—ঘি নাই, তেল নাই—ইত্যাদি ভাষা অপেক্ষা এই ভাষা অনেক শ্রুতি-সুখকর।

(১৬)

গুরু শিষ্যকে ভালবাসেন। কেন? শিষ্যের শিক্ষার জন্য যত্ন করিয়া পরিশ্রম করিয়া তাঁহার শিক্ষিত মনটি গুরুর নিকট একটি পরিশ্রমলব্ধ যত্নের জিনিস হইয়া পড়ে। তাই তিনি শিষ্যকে ভালবাসেন। তুমি গুরু না হইয়াও যদি কাহারও শিক্ষার জন্য এইরূপ যত্ন কর, তাহা হইলে, তোমারও তাহার প্রতি শিষ্যের ন্যায় একটা ভালবাসা জন্মিবে। এই হিসাবে অম্বিকা গদাধরকে একটু ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তখন ভালবাসার বীজটিমাত্র তাহার কোমল হৃদয়োদ্যানে রোপিত হইয়াছিল; তাহা অঙ্কুরিত হয় নাই। তাহার পর অম্বিকা সেই একটু ভালবাসার সামগ্রীকে আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, সঙ্কটাপন্ন এবং প্রাণনাশক বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। যাহার প্রাণটা আমরা প্রাণ দিয়া বাঁচাইতে যাই, তাহার প্রতি আমাদের মনের কেমন একটা টান আসিয়া উপস্থিত হয়। অম্বিকার মনে এই টান উপস্থিত হইয়াছিল। এই টানে পড়িয়া, পূর্ব্বরোপিত ভালবাসার বীজটি তাহার করুণাসরস হৃদয় মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর গদাধরের কৃষ্ণমূর্ত্তিকে স্বর্গীয় প্রভায় প্রভাসিত করিয়া, তাহার অন্তরাভ্যন্তরস্থ অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি অম্বিকার বিস্ফারিত লোচনাগ্রভাগে প্রতিভাত হইয়া উঠিল; তাহার অন্তরের শোভা বাহিরের কর্কশ দেহ আচ্ছন্ন

করিয়া শত সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইল; অমনি অম্বিকার হৃদয়নিহিত ভালবাসার অঙ্কুরটি শোভন পল্লব-দলে পরিশোভিত হইয়া, বৃক্ষের আকার ধারণ করিল। এই রূপে গদাধরের প্রতি অম্বিকার ভালবাসা জন্মিল। এইরূপে ভালবাসার বীজ অতি গুণবতী অতি বিদ্যাবতী অতি রূপবতী অম্বিকার অতি পবিত্র হৃদয়োদ্যানে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইল। এখন দেখা যাউক, এ গাছে কি ফুল ফোটে, কি ফল ফলে।

যে দিন অম্বিকা গদাধরের পুঁটুলি খুলিয়া, তাহার মধ্যস্থিত তামাকুর কৌটা প্রভৃতি দেখিয়াছিল, সেই দিন, তাহার নিকট তৎকার্য্যের সংবাদ পাইয়া গদাধর তাহাকে বলিয়াছিল যে, সে কার্য্যটা নিতান্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়াছে। সেই দিন হইতে গদাধরের বাক্যে সে আপনাকে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিয়াছিল। আপনার পরিচয় পাইয়া, সেই দিন হইতে, নারী-হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মন ভাল-বাসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। একটি চিরপূজ্যকে ভক্তিবিনির্ম্মিত পূজার আসনে বসাইয়া, শ্রীচরণে শোভাময় সৌরভময় প্রেমপুষ্প উপহার ঢালিয়া পূজা করিবার বিপুল বাসনা তাহার মনের মধ্যে যেন পূজার বাদ্যোদ্যমে জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই যে পূজা করিবার সাধ, ইহাই নারীধর্ম্ম।

কিন্তু অম্বিকা জানিয়াছিল যে, তাহার বিবাহ হওয়া বিধিলিপি নহে। পিতার যে গুরুদেবের বাক্য দেববাক্যের ন্যায় আমোঘ, সেই গুরুদেব এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। বিধিলিপি খণ্ডন করিতে মানবশক্তি কি সমর্থ নহে! অম্বিকার অনুরোধে গদাধর যদি তাহাকে বিবাহ করে? কে তাহ নিবারণ করিবে? বিধাতা আপনি আসিয়া তাহা নিবারণ করিবেন। কিরূপে? বিবা-হের দুই দণ্ড পূর্ব্বে গদাধরকে লোকান্তরে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া, তিনি আপনি অম্বিকার ভাগ্যলিখন অক্ষুন্ন রাখিবেন। তখন অম্বিকা কি করিবে? না না, গদাধর চিরজীবী হউক। অম্বিকা তাহাকে কখন বিবাহ করিবে না। তবে বিবাহ না করিয়া, সে কিরূপে গদাধরকে পূজা করিবে? তাহাত সম্ভব নহে। সে আপনার কলঙ্কের কথা ভাবে না। কিন্তু সে তাহার নির্ম্মল পূজার সামগ্রীটি কিরূপে কলঙ্কিত করিবে? অম্বি-কার চক্ষে প্রেমের এমনই মহিমা,—গদাধর তখন স্বর্গের দেবতা অপেক্ষা মহৎ। এই মহৎ স্বর্গস্থ দেবতাকে তাহার স্বর্গের উচ্চ আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া, কিরূপে সে আপনার দীনবক্ষে, পূজার জন্য লইয়া আসিবে? না, ইহা হইবার নহে। তাহা অপেক্ষা অম্বিকার দেবতা স্বর্গে থাকুক। আর অম্বিকা পৃথিবীতে থাকিয়া, উদ্দেশে, আপনার সুখ তাহার চরণে নিবেদন করিবে। অতএব অম্বিকা প্রতিজ্ঞা করিল সে, তাহার ভালবাসার কথা কাহাকেও জানিতে দিবে না। সে তাহার প্রেম পেটিকবদ্ধ রত্নের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক হৃদয়মধ্যে গোপন রাখিবে।

অম্বিকা ভুল বুঝিয়াছিল। ভালবাসা গোপন করিতে পারা যায় না। অন্য সকলের নিকট হইতে হয়ত তাহা গোপন রাখিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু যাহাকে ভাল-বাসিবে, তাহার নিকট হইতে ভালবাসা গোপন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। মাতা কিছু বলেন না, বলিলেও তাঁহার ভাষা তাহার বোধগম্য নহে, তথাপি ছয় মাসের শিশুটিও মাতার কোলে শুইয়া বুঝে যে,

ইহা মাতৃক্রোড় বটে। মাতার অন্তরের ভালবাসা তাহার অন্তরকে বুঝাইয়া দেয় যে, হাঁ, এই ক্রোড় স্নেহসিক্ত বটে। ছয় মাসের শিশুটি যদি মাতার ভালবাসা অনুভব করিতে পারিল, গদাধর কি বহু কথা কহিয়া একত্র গ্রন্থালোচনা করিয়া, একত্র ভ্রমণ করিয়া এবং আপনার হৃদয়ের আকর্ষণ লইয়া, অম্বিকার ভালবাসা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না? হইবে। অথবা হইয়াছে। সে দিন যখন বিধিলিপি লঙ্ঘন করিয়া অম্বিকাকে বিবাহ করিবার দুরাশা তাহার হৃদয় মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল, তখনই তাহার অজ্ঞাতে অম্বিকার গোপন প্রেম আসিয়া তাহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়াছিল। বসন্তের অদৃশ্য বায়ুর স্পর্শে, কুসুমের অস্ফুট কলিসকল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, অম্বিকার অদৃশ্য প্রেমের স্পর্শে গদাধরের হৃদয়মধ্যে তেমনই সৌরভময় ফুলসকল ফুটিয়াছিল।

তথাপি, প্রেম গোপন রাখিবার জন্য অম্বিকা সাধ্যমত চেষ্টা করিল। পূর্ব্বে সে গদাধরের সহিত যে ভাবে কথা কহিত, এক্ষণে তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন করিল না। আপনার চক্ষুর দৃষ্টিকেও সে বিশেষরূপ প্রশমিত রাখিয়াছিল। হায়! তখন ত সে বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার এই বদ্ধ প্রেম, গিরিনিরুদ্ধ নির্ঝরিণীর ন্যায় অসীম শক্তি সঞ্চয় করিয়া, তাহার সংযমের সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি।

A LIFE OF ANANDA MOHAN BOSE, by Hem Chandra Sarkar M. A., Editor of the Indian Messenger, and Published by A. C. Sarkar at 16 Raghu nath Chatterji's Street. স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর জীবনচরিত বাঙ্গালীমাত্রেরই আদরের বস্তু। বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বদেশ-প্রেম, পরোপকার, ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত হইয়া যে আনন্দমোহন বঙ্গদেশের একজন প্রধান নেতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই আনন্দমোহনের নাম বঙ্গবাসীমাত্রেরই গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইবে। অন্ধকারময় পথে আলোকরশ্মির ন্যায় আনন্দমোহনের স্মৃতি বঙ্গবাসীকে চালিত করিবে। হেমচন্দ্র বাবু সেই আনন্দমোহনের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া, তাঁহার জীবনের একটী জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার স্মৃতি আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনের সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনার বিষয় লিখিত আছে। তাঁহার শৈশব জীবন, বিদ্যাশিক্ষা, ইউরোপ গমন, র‍্যাংলারশিপ্ প্রাপ্তি, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, সিটিকলেজ স্থাপন, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে তিনি জাতীয় মহা-সমিতিতে এবং মিলন-মন্দিরে যে সকল যুক্তি ও গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত একটী ভূমিকা এবং সিষ্টার নিবেদিতা লিখিত আনন্দমোহনের সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ হেমবাবু তাঁহার গ্রন্থখানিকে সাধারণের অতি উপযোগী করিয়াছেন। আনন্দমোহনের চরিত্র সুনিপুণ চিত্রকরের হস্তেই চিত্রিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থ সর্ব্বত্রই আদৃত হইবে।

ধর্ম্মপ্রচারক—মাসিক পত্র। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা। শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত।

এই মাসিক পত্রে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক সারবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আলোচ্য সংখ্যাগুলিতেও কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাঙ্গ, শ্রীপঞ্চমী, ভাবতত্ত্ব, সম্পাদকীয় টিপ্পনী, জাতিভেদ, সম্রাটের মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি।

রাজসাহী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ ও পঠিত প্রবন্ধ—দ্বিতীয় বর্ষ। সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত শশধর রায় ও শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল ইহার সম্পাদক। ইহাঁদের সম্পাদকতায় দ্বিতীয় বর্ষে (১৩১৫) ১৮ই ও ১৯শে মাঘ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতি ও অন্যান্য বক্তৃগণ যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা ও সভার কার্য্য-বিবরণ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। পঠিত প্রবন্ধগুলি বিবিধ তথ্যপূর্ণ ও মনোরম হইয়াছে। এই বিবরণীর ৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী শুদ্ধিপত্র দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

নাট্যমন্দির—মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

ইহা বঙ্গীয় রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। রঙ্গালয়, অভিনয় ও নাট্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা ইহাতে প্রকাশিত

হইতেছে। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় নাট্যও এক প্রকার শিল্প। অধুনা বঙ্গে ইহার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। "নাট্যমন্দির" সেই উন্নতির পরিপোষক হইলে ইহার আবির্ভাব সার্থক হইবে। আলোচ্য সংখ্যাদ্বয়ে রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রবন্ধ, সম্পাদক রচিত একটী উপন্যাস ও কয়েকখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরাণ দর্শন সূত্র উপক্রমণিকা (অবশিষ্টাংশ)—শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা প্রণীত। দ্বিতীয় অংশ। এই অংশে নানাবিধ যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, চিতোরাধিপতি বাপ্পাদিত্যই শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আর কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর রামচন্দ্রও দশরথের পুত্র নহেন, এবং তিনি পিতৃসত্যপালনার্থ বনগমন করিয়া রাক্ষস বধাদি কার্য্য করেন নাই। প্রসিদ্ধ শিলাদিত্য বা শালিবাহনই রামচন্দ্র নামে পরিচিত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বা বাপ্পাদিত্য ৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং রামচন্দ্র বা শালিবাহন ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থ সমস্তই কাল্পনিক ইহা অত্যল্প দিনের গ্রন্থ। এমন কি, রামায়ণ গ্রন্থ, 'রঘুবংশে'র পরে রচিত। সমস্তই রূপকে পূর্ণ। হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র—ভুল নাই। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয়ের অদ্ভুত ও অলৌকিক যুক্তি এবং পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; উহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি, ভরসা করি অন্যান্য পাঠকগণও বিস্ময় রসের অধীন না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

সূত্রধর তত্ত্ব (পরিশিষ্ট)—শ্রীবিহারিলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

ইহাতে সূত্রধর জাতির উৎপত্তি, উচ্চপদ প্রাপ্ত সূত্রধরগণের বিবরণ, সূত্রধর তত্ত্ব সম্বন্ধে সংবাদপত্র সমূহের অভিমত, গ্রন্থকারের আত্ম পরিচয় প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। সূত্রধর জাতিকে বৈশ্য প্রতিপন্ন করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সূত্রধরের ইহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদর্শন—মাসিক পত্র। এস্ মজুমদার কর্ত্তৃক মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ১০ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

এই নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শন দক্ষতার সহিত নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। অনেক চিন্তাশীল লেখকের গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধরাজিদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকে। আলোচ্য সংখ্যাদ্বয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর রচিত উপন্যাসগুলির সৌন্দর্য্য ও ভাব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এক আধটু ত্রুটি থাকিলেও বিশ্লেষণ মন্দ হয় নাই; আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ ও বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অনেকেই উপকার লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয়, এদেশে অধিকাংশ লোক কেবল মাত্র পাঠ দ্বারাই প্রয়োজনীয় প্রবন্ধের সার্থকতা সম্পাদন করেন, ইহার অধিক অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হন না। মানবের জন্মকথা প্রবন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

তন্ত্রের প্রাচীনত্ব।

অতি অল্প দিন হইল তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, শিক্ষিতসম্প্রদায়ের এইরূপই বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন, বৈদিক যুগের পরে ঔপনিষদিক যুগের, ঔপনিষদিক যুগের পরে পৌরাণিক যুগের, পৌরাণিক যুগের অনেক পরে তান্ত্রিক যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তন্ত্রশাস্ত্রের আধিপত্য বা প্রচার নাই, একমাত্র বঙ্গদেশেই তন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভাব। বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা মহাযানসম্প্রদায় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম পুস্তককে আদর্শ করিয়া তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। বঙ্গের আদিমনিবাসী অসভ্যদিগের উপাস্য শক্তি-দেবতার পূজাও তন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রের জন্মকাল সহস্র বর্ষের অধিক নহে। তিন শত বৎসরের ভিতরেও অনেক তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যোগিনী-তন্ত্রে কোচবিহার রাজবংশের আদি-পুরুষের নামোল্লেখ আছে, কোচবিহারের রাজবংশ তিন শত বৎসরের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উল্লিখিত কথার বিশ্লেষণ করিলে তন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা চারিটিমাত্র আপত্তি বুঝিতে পারি।

১। তন্ত্রের প্রতিপত্তি যখন ভারতের সর্ব্বত্র নাই, একমাত্র বঙ্গদেশে আছে, তখন বুঝিতে হইবে, তন্ত্র আর্য্যজাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, উহা বাঙ্গালীর আদৃত—বাঙ্গালীর রচিত।

২য়। বৌদ্ধ মহাযানদিগের ভিতরে তারা, বজ্রযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত। সেই সেই দেবতার পূজায় ও জপে বীজসংযুক্ত মন্ত্র আছে। তন্ত্রেও যখন সেই সেই দেবতার পূজা আছে, বীজ-মন্ত্রের বাহুল্য আছে, তখন তন্ত্র মহাযান-দিগের ধর্ম্মপুস্তকের আদর্শে রচিত।

৩য়। আদিমনিবাসীরা শক্তির উপাসক; ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষবিশেষের পূজক। তন্ত্রেও যখন শক্তির উপাসনা আছে, ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষবিশেষের পূজা আছে, তখন বলা আবশ্যক যে, সেই অসভ্য-দিগের নিকট হইতেই তন্ত্রের সেই সমস্ত পূজা গৃহীত হইয়াছে। অসভ্যদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া তন্ত্র আধুনিক।

৪র্থ। তিন শত বৎসরের ঘটনা যাহাতে থাকিবে, কি করিয়া তাহাকে প্রাচীন বলিব? সেই ঘটনার পরবর্ত্তী সময়ে তাহা লিখিত, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রথম আপত্তির বিরুদ্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, কেবল বঙ্গদেশেই তন্ত্রের প্রভাব নয়, ভারতের সর্ব্বত্র তন্ত্রের প্রতিপত্তি আছে। বাঙ্গালীর মত কামরূপবাসী, মিথিলাবাসী, উৎকল ও কলিঙ্গবাসী ব্রাহ্মণেরা ও অন্য উচ্চ জাতীয়েরা শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত।

শক্তি মন্ত্র, শিব মন্ত্র ও বিষ্ণু মন্ত্র যে তন্ত্রোক্ত, তাহা বোধ হয়, আর বুঝাইতে হইবে না। কাশীর পণ্ডিতদিগের ভিতরে অনেকে শৈব, অনেকে বৈষ্ণব, অনেকে শাক্ত রহিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় দাক্ষিণাত্য সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি শাক্ত, লোকান্তরগত মহামহোপাধ্যায় রাম মিশ্র শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় রাম শাস্ত্রী ভাগবতাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব, মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী প্রভৃতি শৈব। শ্রীবৃন্দাবনের অনেক সেনাঢ্য ব্রাহ্মণ শাক্ত আছেন, বৈষ্ণব আছেন। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণ প্রদেশের ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভিতরে শাক্তের সংখ্যা অল্প, শৈব ও বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক। পাশুপত ও জঙ্গম পন্থীরা সমস্তই বিষ্ণুদ্বেষী শৈব, মাধ্বাচার্য্যের ও রামানুজাচার্য্যের সম্প্রদায়ীরা শিবদ্বেষী বৈষ্ণব। উত্তর পশ্চিমের অধিবাসীদিগের ভিতরে অনেকে রামমন্ত্রেও দীক্ষিত আছেন। শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রও একমাত্র তন্ত্রে উল্লিখিত। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীপুরুষোত্তমের পাণ্ডারা সকলেই শাক্ত। কামাখ্যাদেবীর পাণ্ডারা সকলেই বৈষ্ণব।

দ্বিতীয় আপত্তির মর্ম্মার্থ অবধারণে আমি একান্ত অসমর্থ। মতদ্বয়ের সাদৃশ্য থাকিলে এক মতের অনুসরণে বা অনুকরণে অপর মত যে সৃষ্ট, তাহার প্রমাণ কই? সাদৃশ্য প্রমাপক হেতু নয়। কারণ সাদৃশ্য একমাত্র পদার্থে অবস্থিত নয়, দুই বা বহুতে অবস্থিত। সুতরাং প্রথমে যে সাদৃশ্য আছে, দ্বিতীয়েও সেই সাদৃশ্য আছে; সাদৃশ্য আছে বলিয়া প্রথমও দ্বিতীয়ের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে বলিবার উপায় নাই। কারণ সাদৃশ্য একমাত্র দ্বিতীয়ে নাই, প্রথমেও আছে, দ্বিতীয় প্রথমের অনুকরণে সৃষ্ট হইলে প্রথমও দ্বিতীয়ের অনুকরণে সৃষ্ট বলিতে হয়। প্রথমের অনুকরণে দ্বিতীয়ের সৃষ্টি ও দ্বিতীয়ের অনুকরণে প্রথমের সৃষ্টি বলিলে কিছুই অর্থ হয় না। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষের ভিতরে তারা, হয়গ্রীব, বজ্রযোগিনী ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা ধ্যান, বীজসংযুক্ত মন্ত্র আছে, তন্ত্রেও তৎসমস্ত পূজা ধ্যান বীজসংযুক্ত মন্ত্র আছে; সুতরাং বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপুস্তকের বিষয় লইয়া তন্ত্র লিখিত হইয়াছে বলিলে সেই সিদ্ধান্তের বৈপরীত্যে আমরাও বলিতে পারি যে, তন্ত্রে ঐ সমস্ত পূজা, ধ্যান, বীজসংযুক্ত মন্ত্র আছে, বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষেও ঐ সমস্ত পূজা, ধ্যান, বীজসংযুক্ত মন্ত্র আছে; সুতরাং তন্ত্রের বিষয় লইয়া সেই সম্প্রদায়বিশেষের সেই সমস্ত পদ্ধতি গঠিত। এইরূপ বলিলে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তর কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি? নবীন সিদ্ধান্তের অনুকূলে অনুকূল তর্ক কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি? বিনিগমনা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি? বৌদ্ধধর্ম্মের হৃদয়স্পর্শী ভাবে যদি হিন্দুর মনে উন্মাদনা আসিয়া থাকে, সেই দিকে যদি আকর্ষণ আসিয়া থাকে, তবে হিন্দুর কোন্ গুণে বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা মূলভিত্তি, সে দিকে না যাইয়া বহিরাবরণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে? আত্মার নির্ব্বাণের জন্য লালায়িত না হইয়া বৌদ্ধপ্রতিমার আদর্শে গঠিত প্রতিমার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি," বলিয়া সৌন্দর্য্য দেও, জয় দেও, যশঃ দেও, এবং শত্রুদিগের সংহার সাধন কর এইরূপ প্রার্থনা করিবে? কোথায় বৌদ্ধধর্ম্মে বাসনাবিলোপের জন্য তাদৃশ যোগসাধনা, কোথায় বৈদিক ধর্ম্মের মত শত্রুবিজয় ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য আরাধ্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা ও কামনা!!! ভগ-

বদ্‌গীতায় নিষ্কাম ধর্ম্মাভ্যাসের উপদেশ আছে, তাদৃশ সাধনায় তত্বজ্ঞানের আলোচনায় তত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয় ও তত্বজ্ঞানের উপলব্ধিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়, এইরূপ আছে। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মতে এ ভগবদ্‌গীতাও বৌদ্ধধর্ম্মের আদর্শ লইয়া সঙ্কলিত। তন্ত্রে কামনা আছে, গীতায় নিষ্কামধর্ম্মের উপদেশ আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে কি আছে? কামনার উপদেশ কি নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ? একটি হইলে অন্যটি হইতে পারে না; কারণ এ দুইটি পরস্পর পরস্পরের ঠিক বিপরীত। হিন্দুধর্ম্মের মত অন্য ধর্ম্মে অধিকারিভেদে ধর্ম্মের অংশ কল্পনা নাই; বৌদ্ধধর্ম্মেও যদি হিন্দুধর্ম্মের মত অধিকারিভেদে ধর্ম্মভেদের কল্পনা আছে মনে করা যায়, তবে বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য হইবার কারণ, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধালোপের কারণ ও জরা-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য নূতন পথ আবিষ্কারের কারণ অবধারণ করিতে পারা যায় না। বুদ্ধদেব যে ভূত-দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া যজ্ঞে পশুহিংসা নিবারণ করিয়াছেন, তান্ত্রিকেরা সেই বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণে তন্ত্রের—নূতন শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকরণে দেবদেবীর পূজা, প্রতিমা অর্চ্চনার ব্যবস্থা দিয়া সেই প্রতিমার অগ্রে ছাগ মহিষাদি বলির ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার, আশ্চর্য্যজনক বিষয় কি হইতে পারে? মানুষের দয়া একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, যতই কেন নিষ্ঠুর হউক না, তাহারও অন্তঃকরণের এক কোণে দয়ার কিঞ্চিৎ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের জটিল দার্শনিকতা বুঝিতে সকলে সমর্থ হইবে আশা করা যায় না। যদি বৌদ্ধধর্ম্মে আকর্ষণের কিছু থাকে, তবে তাহা পশুহিংসা নিবারণ। এই পশুহিংসা নিবারণেই হিন্দুর মন গলিয়া গিয়াছিল ও দলে দলে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই মূল চিত্তাকর্ষক পদার্থটিকে বাদ দিয়া যে বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অস্বীকৃত, সেই বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক মহাযানসম্প্রদায় মাত্রের কল্পিত দেবদেবীর পূজা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণয়ন দ্বারা হিন্দুধর্ম্মে গৃহীত হইল, ইহা অপেক্ষা অপসিদ্ধান্ত কি হইতে পারে, তাহা বুঝি না। বরং আধুনিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভিতরে যে দেবপূজা ও যজ্ঞে পশুহিংসা বর্জ্জন হইয়াছে, বলিলে বলা যাইতে পারে, উহা বৌদ্ধধর্ম্মের "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই ভাবে কতকটা অনুপ্রাণিত। শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত শৌনকাদি ঋষি সুতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতেন ও সেই যজ্ঞে পশু হিংসা করিতেন। * শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় কৃষ্ণভক্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে অশ্ব আলম্ভিত, হুত ও ভুক্ত হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের আজ্ঞায় শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশে মৃগয়ায় বরাহ বধ করিয়াছিলেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে, যজ্ঞে পশুহিংসা হিংসা নয় + ইত্যাদি ইত্যাদি। মথুরাবাসী বৈষ্ণদিগের ভিতরে অনেকে বৌদ্ধ ও অনেকে জৈন হইয়াছিল। তাহারা যখন চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের মহনীয় মহিমায় মোহিত হইয়াছিল, ও সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, অথচ পশুহিংসা আছে বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছিল, হয়ত সেই সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্মে ও পশুহিংসা নাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; তাহা দ্বারা সেই সেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া-

* শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ দেখুন।

\+ ১১শ স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়, ১৩ শ্লোক।

ছিলেন। হয়ত সেই অবধি গৃহী বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও দেবপূজায় পশুহিংসা রহিত হইয়াছে; সাধারণ বৈষ্ণবদিগের ভিতরে মৎস্যাহারের ব্যবহার থাকিলেও মাংসাহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গ, উৎকল প্রভৃতি দেশনিবাসী বৌদ্ধাচার্য্যেরা হিন্দু ধর্ম্মের নিকট হইতে দেবপূজা, প্রতিমা স্থাপন ও বীজসংযুক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া "মহাযান" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, আমি প্রবন্ধান্তরে যুক্তি ও তর্ক দ্বারা এই মতের সমর্থন করিয়াছি। এস্থলে আর সেই সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ভগবান্ শাক্যসিংহের তিরোধানের অনেক পরে বৌদ্ধসম্প্রদায় হীনযান ও মহাযান এই নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ললিত বিস্তর শাক্যসিংহের প্রামাণিক জীবন বিবরণ। ললিত বিস্তরে আছে, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ প্রভৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। * নিগম বলিয়া যখন পুনরায় বেদ বলা হইয়াছে, তখন বলিতে হইবে, নিগম শব্দের অর্থ তন্ত্র। আগম ও নিগম শব্দে তন্ত্রকে বুঝায়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আবার আছে, ভিক্ষুকদিগকে শাক্যসিংহ বলিতেছেন, "সেই সকল মূঢ়েরা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী, কার্ত্তিকেয় মাতা কাত্যায়নী প্রভৃতির ও গণপতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে ও তাহাদিগকে নমস্কার করে, কেহ কেহ শ্মশান, চত্বর, চতুষ্পথের আশ্রয়ে তপস্যা করে। † পাষণ্ডদিগের আচারের উল্লেখ করিতে যাইয়া শাক্যসিংহের মুখ হইতে মদ্য, মাংস, সুরাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত তন্ত্রোক্ত উপাসনা পূর্ব্বে না থাকিলে শাক্যসিংহ কি করিয়া জানিলেন? কি করিয়াই বা শাক্যসিংহ তাহার নিন্দা করিলেন? বৌদ্ধপুরাণ ললিত বিস্তর দেখিয়া আর কি করিয়া বলিব, তন্ত্রশাস্ত্র বৌদ্ধ মহাযানের আদর্শে গঠিত?

৩য় আপত্তিটি ২য় আপত্তির সম্পূর্ণ তুল্য। ২য় আপত্তির উপরে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, ৩য় আপত্তিতেও সেই সমস্ত দোষের সম্ভাব আছে; সুতরাং এ আপত্তিটিও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য যে, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া অসভ্য আদিম নিবাসী বলা হইতেছে? ইংরাজী হিসাবে ত দ্রাবিড়, ওড্র ও পৌণ্ড্রকেরা ভারতের আদিম নিবাসী। সুদূর দক্ষিণাপথের দ্রাবিড় জাতির আচারের অনুকরণে কি বঙ্গীয় পণ্ডিতেরা তন্ত্রের প্রণয়ন করিলেন? অথবা মুণ্ডা, সাঁওতাল, (সমতল দেশবাসী) আসামের * আদি নিবাসী গারো (গিরিবাসী) মেচ, কোচ, খাসিয়া (খস্) প্রভৃতির নিকট হইতে তান্ত্রিকতা গ্রহণ করিয়া তন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন? আমরা যখন ভারতের সর্ব্বত্র শক্তি পূজা, ও স্থাপিত শক্তি দেবতা দেখিতে পাই, তখন এই কলঙ্কপূর্ণ গুরুভারের ডল্লক বঙ্গীয় পণ্ডিতের মস্তকে চাপাইতে কেমন সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। উৎকলে এক পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিমলা নিত্য অর্চ্চিত হইতেছেন। সরস্বতী, ভুবনেশ্বরী, কালী, লক্ষ্মী পুজিত হইতেছেন, "কাত্যায়নি

* "—নিগমে পুরাণে ইতিহাসে বেদে—বোধিসত্ত্বএব বিশিষ্যতে স্ম। ১২শ অধ্যায় ললিত বিস্তর।

† —শ্মশান, চত্বর, শৃঙ্গাটকা—চাশ্রয়ন্তে। ১৭ অ, ললিত বিস্তর।

* "আসমতল" শব্দ হইতে আসাম শব্দের সৃষ্টি, হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে।

"সাঁথিতল" শব্দ হইতে "সাঁওতাল" শব্দের সৃষ্টি, ইহাও অনুমেয়।

নমোস্তুতে" এই মন্ত্রে সুভদ্রা নমস্কৃত হইতেছেন। ভুবনেশ্বরে ভুবনেশ্বরী, ধবলেশ্বরে ধবলেশ্বরী, যাজপুরে অষ্টশক্তি ও ইন্দ্রাণীর সহিত বিরজা, কটকে কটকচণ্ডী অর্চ্চিত, বন্দিত ও সেবিত হইতেছেন। কামরূপে কামাখ্যা, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনী, শ্রীবৃন্দাবনে যোগমায়া ও পৌর্ণমাসী, কাশীক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা, সকটা, ত্রিপুরভৈরবী, চতুঃষষ্ঠি যোগিনী, কাল ভৈরবী, দুর্গা, শীতলা, মঙ্গলা প্রভৃতি দেবীবৃন্দ, কৌশলিতে কুশলী, পুনার অন্তর্গত সহ্যাদ্রিতে পার্ব্বতী, নেপালে গুহ্যেশ্বরী, রাজপুতনায় গায়ত্রী ও সাবিত্রী, প্রয়াগে ললিতা (আলোপীদেবী), ত্রিহুতে উগ্রতারা, হরিদ্বারে মায়াদেবী (যাঁহা দ্বারা হরিদ্বারের নাম শাস্ত্রে মায়াপুর কথিত হইয়াছে), হরিদ্বারের নিকটে চণ্ডী-পর্ব্বতে চণ্ডী, জলন্ধরে জ্বালামুখী, জ্বালামুখী হইতে ২০ ক্রোশ দূরে ছিন্ন-মস্তা, দিল্লি হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে পৃথ্বীরাজের পূজিত কালী, বোম্বাই নগরে মুম্বা, বোম্বাইর উপকণ্ঠে মহাসমুদ্রের তীরে মহালক্ষ্মী, হর্ষদ্বীপে (মহাকালেশ্বরের নিকটে পশ্চিমে) কালিকা, কাশ্মীরের নিকটে ক্ষীর ভবানী, মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে মীনাক্ষিদেবী অবিদিত অতীত যুগে স্থাপিত, ও অদ্যাপি অর্চ্চিত হইতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি করিয়া সাঁওতালদিগের নিকট হইতে তন্ত্র গৃহীত বলি? কি করিয়াই বা বাঙ্গালী পণ্ডিতদিগকে তাহার গ্রন্থকার বলি? শক্তিপূজার বিধান আছে বলিয়া তন্ত্রকে আধুনিক বলিলে পুরাণ, মহাভারতকে আধুনিক বলিতে হয়, উপনিষদ্, বেদকে আধুনিক বলিতে হয়। মহাভারতে দেবীর স্তোত্র আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে উমা পূজার ব্যবস্থা আছে, ব্রজকুমারীরা কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্য (চণ্ডী) বর্ণিত আছে, স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণ হইতে শক্তিপূজার প্রমাণার্থ কত বচন উদ্ধৃত করিব? পুরাণের সর্ব্বাংশেই শক্তিমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। শারদীয়া দুর্গা পূজার উল্লেখ অনেক পুরাণে রহিয়াছে। একমাত্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই দুর্গা পূজার ব্যবস্থা লিখিয়াছেন, মনে করা কর্ত্তব্য নয়। রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীদত্ত, হরিনাথ, বিদ্যাধর, রত্নাকর, ভোজদেব, জীমূতবাহন, হলায়ুধ, রায় মুকুট ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারেরাও দুর্গাপূজার ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের অনেক পূর্ব্বের লিখিত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, সংবৎসর প্রদীপ, কাল কৌমুদী, জ্যোতিষার্ণব, স্মৃতিসাগর, কল্পতরু, কৃত্যমহার্ণব, কৃত্য-রত্নাকর, কামরূপীয় নিবন্ধ, স্মৃতিসাগর, কৃত্যতত্ত্বার্ণব, চক্র নারায়ণী, ক্রিয়াযোগোপ-সংবাদ, দুর্গাভক্তি প্রকাশ, দাক্ষিণাত্য কাল নির্ণয়, কৃত্য মহার্ণব, পূজারত্নাকর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থেও দুর্গা পূজার ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। যদিও বঙ্গদেশের মত ভারতের অন্যত্র মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া আড়ম্বরের সহিত দুর্গা পূজা সম্পন্ন হয় না, তথাপি ঘটে দেবীর পূজা বা প্রসিদ্ধ স্থাপিত দেবীমূর্ত্তির দর্শন, তাহাতে দেবীর পূজা, নব রাত্রিব্যাপী ব্রতধারণ, মহাষ্টমীর দিবস উপবাস ও চণ্ডীপাঠ সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজবাসিনী রমণীবৃন্দ আশ্বিন শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যমুনায় অবগাহন করিয়া যমুনার সৈকত পুলিনে দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ছান্দোগ্য,

তলবকার প্রভৃতি উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, ইন্দ্রাদি দেবতা তেজঃপুঞ্জের ভিতরে সিংহস্কন্ধারূঢ়া হৈমবতী উমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, ও নিজের শক্তি দ্বারা কিছুই হয় না, সেই মহাশক্তির প্রভাবেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহা অবধারণ করিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। বেদে সরস্বতী সূক্ত আছে, যজুর্ব্বেদে লক্ষ্মী সূক্ত আছে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেবী সূক্ত আছে। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে গ্রীশে পর্য্যন্ত মিনার্ভা নামে পরিচিতা সরস্বতী দেবীর সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইত। জানি না, "মীনাক্ষি ভারতী" এই নামের বা অন্য কোন সংস্কৃত নামের অপভ্রংশে "মিনার্ভা" এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে কি না। কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক মিষ্টার জনফ্রায়ার "হার্পাস ম্যাগাজিনে" একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কলম্বসের বহু পূর্ব্বে কোনও বৌদ্ধ ভারতবাসী আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন ও সে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মেক্সিকো দেশে ইতস্ততঃ অনেক বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও অনেক বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, এখনও অনেক গ্রাম ও নগরের নামের সহিত ভগবান্ বুদ্ধদেবের নাম (Guatemala ; Sacapuras) বিজড়িত রহিয়াছে। মেক্সিকো দেশের অনেক স্থানে অনেক বৌদ্ধ মূর্ত্তিপাওয়া গিয়াছে। সেকল যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেক গুলি গণেশমূর্ত্তি আছে। আমেরিকায় গণেশমূর্ত্তির অবস্থান দেখিয়া অনুমান করিতে পারি কি—বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা ভারতের পরিচিত ও নানা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ? অনুমান করিতে পারি কি—যখন গণেশ আছেন, তখন গণেশজননী শক্তিও ছিলেন বা আছেন, একদিন আবিষ্কৃত হইতে পারে? এক্ষণে ভাবিবার ও অবধারণ করিবার বিষয়,—শক্তি-পূজার প্রভাব কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ ও অতীত কালে আচরিত এই সকল অনুষ্ঠান দেখিয়া শক্তি-পূজার সমর্থক বলিয়া আর তন্ত্রকে আধুনিক বলিতে সাহস হয় না। মনসা-দেবীর পূজাও তন্ত্রোক্ত নহে, পৌরাণিক বিধি দ্বারা প্রবর্ত্তিত, তুলসী, বিল্ব ও অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজাও সেইরূপ তন্ত্রে উল্লিখিত নহে, পুরাণে কথিত; সুতরাং অন্যকৃত অপরাধ অন্যের স্কন্ধে নিয়োজিত করা সভ্যতা-বিগর্হিত বলিয়া দুঃখিত হইতে পারি। বঙ্গদেশ হইতে সুদূরে অবস্থিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরে মনসাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অহিংসাপ্রধান ব্রজভূমির কুত্রাপি পশুহিংসা নাই, কিন্তু সেই মনসাদেবীর সম্মুখে ছাগ-বলিদানের ব্যবহার আছে। সর্পপূজার জন্য তন্ত্র ত নির্দ্দোষ, বলিতে পারি, একমাত্র বঙ্গদেশও দোষী নহে।

৪র্থ আপত্তির উত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিন শত বৎসরের ভিতরে যোগিনী তন্ত্রের সৃষ্টি হইলে মহাপ্রভুর সমসাময়িক স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতত্ত্বে ও তন্ত্রসারে কি করিয়া যোগিনীতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বহু স্থানে বহু বচন উদ্ধৃত করিলেন? সুতরাং যোগিনীতন্ত্র তিন শত বৎসরের ভিতরে রচিত বলিবার সম্ভাবনা নাই। যদি কোন অজ্ঞাত বংশে কোন মহাপুরুষের বা ধারাবাহিক মহাপুরুষদিগের জন্ম হয়, তাহা হইলে কোন প্রখ্যাত বংশের সহিত সেই বংশটিকে মিলিত করিবার জন্য

বংশধরদিগের * বা তাঁহাদিগের উপাসকদিগের একান্ত চেষ্টা হয় ;— সর্ব্বত্র ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। হয়ত সেই ভাবেই কোচবিহারের রাজবংশ যোগিনী তন্ত্রোক্ত শিববংশে উন্নীত হইয়াছে। বেদের ভাষ্য (শায়ন মাধবীয়) কার মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের পাতঞ্জল দর্শনে তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ষড়্ দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পাতঞ্জল দর্শনের টীকায় তন্ত্রোক্ত দেবতার ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শারীরক ভাষ্যে তন্ত্রোক্ত ষট্চক্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য,বাচস্পতি মিশ্র এই সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষত্রয়ের ভিতরে একটীও বাঙ্গালী নহেন। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার প্রণয়নের পূর্ব্বে রাঘবানন্দ, রাঘব ভট্ট, বিরূপাক্ষ, গোবিন্দ ভট্ট প্রভৃতি তন্ত্রের সংগ্রাহক অনেক গ্রন্থকার ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে নীল সরস্বতীর মন্ত্র লিখিতে যাইয়া "শ্রীশঙ্করাচার্য্যেণাপুক্তং" এইরূপ লিখিয়াছেন। অবশ্য এ শঙ্করাচার্য্য কে· নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আনন্দলহরী নামক সুপ্রসিদ্ধ শক্তিস্তোত্র শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ও সেই ভাবে দেবতার সম্মুখে সর্ব্বত্র ভক্তের গদ্গদ স্বরে উচ্চারিত ও ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে পঠিত হইতেছে। রামার্চ্চন চন্দ্রিকা* মন্ত্র মুক্তাবলী, সার সংগ্রহ, ভুবনেশ্বরী পারিজাত, শারদা তিলক, ত্রিপুরা সার সমুচ্চয়, স্বচ্ছন্দসংগ্রহ, সারসমুচ্চয়, তন্ত্র মন্ত্র প্রকাশ, সোমভুজগাবলী প্রভৃতি তন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ কৃষ্ণানন্দ ও রঘুনন্দনের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের রচিত। কৃষ্ণানন্দ ও রঘুনন্দন স্ব স্ব গ্রন্থে এই সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। দীপিকা নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষের গ্রন্থে বিদ্যারম্ভ ও উপনয়নের দিন নির্ণয় আছে, আবার পৃথক্ করিয়া দীক্ষার দিন নির্ণয় আছে, সুতরাং এ দীক্ষা বৈদিকী দীক্ষা উপনয়ন নয় বলা আবশ্যক, ইহা তান্ত্রিকী দীক্ষা। মূলগ্রন্থরচনার অনেক পরে সংগ্রহগ্রন্থের সৃষ্টি হয়। যে সময়ে মূলগ্রন্থ উৎপাদনে কাহারও সাহস বা সামর্থ্য থাকে না, অথচ রাশি রাশি মূলগ্রন্থ সমূহ দেখিয়া সেই সকল বচনের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্যবস্থা নির্ণয় করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখনই আবশ্যকতার উপলব্ধি করিয়া ক্ষণ-জন্মা প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ সংগ্রহ গ্রন্থের সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত সংগ্রহ গ্রন্থে ব্যবস্থা নির্ণয় আছে, শাস্ত্রীয় আপত্তির খণ্ডন আছে, বচন সমূহের সামঞ্জস্য প্রদর্শন আছে, বিরোধের পরিহার আছে। মূল গ্রন্থ ও সংগ্রহ গ্রন্থের সৃষ্টির ভিতরে অন্ততঃ সহস্র বৎসরের ব্যবধান স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল সংগ্রহকারের উল্লেখ করা হইল, তাঁহাদিগের ভিতরে অনেকেই সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং তন্ত্র যে অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু মাত্র কারণ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে আছে, তন্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা করিবে* জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যেরা বেদোক্ত

* রামার্চ্চন চন্দ্রিকা নামক সংগ্রহ গ্রন্থের ধৃত বচন বাচস্পতি মিশ্র কৃত্য চিন্তামণির বাসন্তী পূজা প্রকরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাহা দ্বারা রামার্চ্চনা চন্দ্রিকার প্রাচীনত্ব অব্যাহত রহিয়াছে।

* শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ৪৭,

বিধানে ও তন্ত্রোক্ত বিধানে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।* কলিকালে নানাবিধ তন্ত্রের বিধানে যে প্রকারে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে, তাহা শ্রবণ কর।† আমার যাত্রা বিধান (দোলযাত্রা রথযাত্রা প্রভৃতি), বলিদান, বৈদিকী, তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ এবং আমার ব্রত ধারণ করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম পুরাণে আছে, একাম্র কাননে (ভুবনেশ্বরে) অবস্থিত ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত বিধানে মহাদেবের পূজা করিবে। এই বচনটি রঘুনন্দন তাঁহার পুরুষোত্তমতত্ত্বেও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কূর্ম্মপুরাণে আছে, "পৃথিবীতে শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ অনেক শাস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে। সেই সকলে শাস্ত্রের ব্যবস্থা তামসী। করাল ভৈরব ও যামল প্রভৃতি বামমার্গ অবলম্বনে রচিত"ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই কূর্ম্ম পুরাণের বচনটিও রঘুনন্দন প্রভৃতি সংগ্রহকারের ধৃত। বলা বাহুল্য, করাল ভৈরব ও যামল তন্ত্র-শ্রেণীর অন্তর্গত পুস্তক বিশেষ, বামমার্গও তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। রামায়ণে বলা ও অতিবলা বিদ্যার‡ উল্লেখ আছে। বলা ও অতিবলা বিদ্যা তন্ত্রোক্ত; তন্ত্রসারে পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার প্রণালী লিখিত রহিয়াছে। রাঘবভট্ট ও রঘুনন্দন নারদের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য, অশৌচী ব্যক্তির পক্ষে তন্ত্রোক্ত, পূজার ব্যবস্থা বলিতেছি,—বাহ্য পূজা ক্রমে ধ্যানযোগে পূজা করিবে। পরাশর ভাষ্যে গোবিন্দ ভট্ট ধৃত বলিয়া একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, শূদ্রকে স্বাহা প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিবে না ইত্যাদি। ভোজরাজের ব্যবহার সমুচ্চয়ে একটি বচনের উল্লেখ আছে—; তাহার অর্থ—বৃহস্পতি রাহু যুক্ত হইলে উপনয়ন ও দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। বরাহ পুরাণে আছে, বেদোক্ত বিধিদ্বারা বা আগমোক্ত (তন্ত্রোক্ত) বিধিদ্বারা পণ্ডিতদিগের জনার্দ্দন অর্চ্চনীয়* পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে লিখিত আছে, বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ ভিন্ন মনুষ্য কি করিয়া ভাগবত হইবে?† নারদপঞ্চ রাত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাখ্যা এই ষট্‌চক্রের চিন্তা করিয়া সহস্রদল পদ্মে অবস্থিত ভগবানের নিজ-শক্তি কুণ্ডলিনীর সহিত সংযুক্ত নবমেঘ-প্রভ পীতকৌশেয় বাসাঃ দ্বিভুজ সুন্দর শুদ্ধ সস্মিতমুখ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। আবার নারদ পঞ্চরাত্রের চতুর্থাধ্যায়ে "লক্ষ্মীর্ম্মায়া কামবীজং" ইত্যাদি বলিয়া তন্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাক্ষর বীজপুটিত মহামন্ত্রের উদ্ধার আছে। পূর্ব্বোক্ত ষট্‌চক্রভেদ, সেই সেই চক্রের নাম ও কুণ্ডলিনীর সত্তা ও তাহার তাদৃশ নাম সমস্তই যে তন্ত্রোক্ত, তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তন্ত্রোক্ত প্রাণায়ামের কথা পাতঞ্জল দর্শনেও আছে, ভগবদ্গীতাতেও আছে, মহাভারতের অন্যান্য

৪৮ শ্লোক। "তন্ত্রমাগমঃ চকারাৎ বৈদিকেন সমুচ্চয়মাহ" শ্রীধর স্বামী।

* ঐ, ঐ ৫ম অধ্যায়, ২৮ শ্লোক। "বৈদিকেন আগমিকেন চ মার্গেণ।" শ্রীধর স্বামী।

† ঐ, ঐ ৩১ শ্লোক। "নানা তন্ত্র বিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যম্ সূচয়তি।" শ্রীধর স্বামী।

‡ রামায়ণ, বালকাণ্ড, ২২ সর্গ, ১২, ১৩, ১৫ শ্লোক।

* বিধিভিঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ। বেদোক্ত বিধিনা তন্ত্রে আগমোক্তেন বা পুনঃ।

† বিনা শ্রীবৈষ্ণবীং দীক্ষাং—কথং ভাগবতো ভবেৎ।

স্থানেও আছে * এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে মহাভারত শান্তি পর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মের ২৫৯ অধ্যায়ের ৭, ৮, ৯ শ্লোক দ্বারা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ তন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলেও ভাবতঃ যেন তন্ত্র শাস্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। সেই সেই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এই, শুনিয়াছি বেদোক্ত বিধান যুগানুসারে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সত্য যুগে ধর্ম্ম অন্য, ত্রেতায় অন্য, দ্বাপরে অন্য, কলিতে অন্য; যেন মনুষ্যের শক্তি যাদৃশ, বেদোক্ত ধর্ম্মও তাদৃশ কল্পিত হইয়াছে। আম্নায় বচন (বেদবচন) সত্য —সেই আম্নায় সমূহ (বেদ সমূহ) হইতে পুনরায় সর্ব্বতোমুখ (সর্ব্বতোব্যাপ্ত) বেদ সমূহ প্রসৃত হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে বেদ সমূহ হইতে যে সর্ব্বতোমুখ বেদ-সমূহ প্রসৃত হইয়াছে, সেই বেদ সমূহ কি? উত্তরে তন্ত্র ভিন্ন, অন্য কিছুরই নাম করিবার সম্ভাবনা নাই। বেদ যেমন সর্ব্ব বর্ণের সমান অধিকার দেয় নাই, শূদ্রের যেমন বেদ পাঠে অধিকার বিলুপ্ত করিয়াছে, স্মৃতিও তাহাই করিয়াছে, সুতরাং এ স্থলে অর্থে স্মৃতি নহে, তন্ত্র সর্ব্ববর্ণ সাধারণকে সমান অধিকার দিয়াছে. এই জন্য একমাত্র তন্ত্রই সর্ব্বতোমুখ। ইহাও বক্তব্য যে, স্মৃতি বুঝাইতে বেদ শব্দের ব্যবহার আর কুত্রাপি নাই। বরং তন্ত্র বুঝাইতে বেদবাচক আগম শব্দ ও নিগম শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বেদের যেমন রচয়িতা কেহ নাই, বেদের স্মর্ত্তা কেবল চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা*শাস্ত্রে আছে, তন্ত্রেরও সেইরূপ কেহ রচনা করিয়াছেন শাস্ত্রে নাই, কেবল মহাদেবের মুখপদ্ম হইতে আগত এইরূপ শাস্ত্রে আছে†। ঋষি মুনি জ্ঞানী কাহারও মুখ হইতে বেদ ও তন্ত্রের নির্গমের কথা নাই, ব্রহ্মা ঈশ্বর, তাঁহারই মুখ হইতে বেদ, মহাদেব ঈশ্বর, তাঁহারই মুখ হইতে তন্ত্রের আবির্ভাব এইরূপ শাস্ত্রে আছে। আরও স্পষ্ট ঐ শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মের ২৮৪ অধ্যায় ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪ শ্লোকে আছে। দক্ষের প্রতি মহাদেব বলিতেছেন, আমি ষড়ঙ্গ বেদ ও সাংখ্যযোগ হইতে উদ্ধার করিয়া যে দেব দানবের দুশ্চর বিপুল তপস্যা দ্বারা সুতপ্ত বেদাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মঙ্গলময় সর্ব্ব বর্ণ ও সর্ব্বাশ্রমের অনুকূল অন্যায় তিন বর্ষ দশ দিন-সাধ্য গুহ্য জ্ঞানীর প্রশংসিত অজ্ঞানীর নিন্দিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিপরীত কোন কোন স্থলে তুল্য জ্ঞাত সিদ্ধান্ত ব্যক্তির অবধারিত অত্যাশ্রম কল্যাণকর পাশুপত ব্রত উৎপাদন করিয়াছি, দক্ষ, তুমি সেই আচরিত ব্রতের সম্যক্ সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইলে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পাশুপত ধর্ম্মপ্রতিপাদক তন্ত্রগ্রন্থ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বেদ বলা যাইতে পারে না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "ষড়ঙ্গ বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া"। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় মহাভারতে তন্ত্রশাস্ত্রের মত তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোদ্ধার প্রদর্শিত হইয়াছে।—"ঘন্টি, চক্র চেলী মিলী মিলী। ব্রহ্ম কায়িকমগ্নীনাং।" মোক্ষ ধর্ম্ম ২৮৪ অধ্যায় ৭৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন; "ঘন্টি প্রণবঃ রুদ্রেতি সম্বুদ্ধিঃ—অগ্নীনাং কায়িকং—জায়া, ব্রহ্ম

* প্রাণাপানৌ তথোদানং সমানং ব্যানমেব চ এবং তৌ মনসি স্থাপ্য দধতুঃ প্রাণয়োর্মনঃ।—তথাধার মূর্দ্ধস্থানমেবচ। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২০১ অঃ ১৭, ১৯ শ্লোক। মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনী মুত্থাপ্য ঊর্দ্ধোর্দ্ধ চক্রজয়ক্রমেণ মনসি হৃদয়ে অনাহতচক্রে স্থাপ্য ততশ্চ মনসা সহ তৌ প্রাণাপানৌ আজ্ঞাচক্রে ধারয়তঃ। ইত্যাদি—নীলকণ্ঠ কৃত টীকা।

* ন কেচিদ্ বেদকর্ত্তারো বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।

† [illegible]শিববাক্যতঃ।

প্রণবঃ—তেন ওঁ রুদ্র চিলী চিলী চিলি চিলি মিলি মিলি ওঁ স্বাহেত্যষ্টাদশার্ণো মন্ত্র উদ্ধৃতঃ। অনুশাসন পর্ব্ব ১৪শ অধ্যায়ের ৩৭৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, তারপর আট দিন (অর্থ সাত দিন) মুহূর্ত্তের মত অতীত হইল। আমি সেই বিপ্রের নিকট (উপমন্যুর নিকট) যথাবিধি মন্ত্র গ্রহণ করিলাম। এই শ্লোকের পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই মন্ত্র জপ করিয়া শিবের কঠোর তপস্যা করিলেন, প্রীত হইয়া উমার সহিত শিব কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণের স্তবে শিব ও উমা সন্তুষ্ট হইয়া উভয়ে কৃষ্ণকে বর প্রদান করিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন কোন শিক্ষিতের মুখে শুনিয়াছি, এক বিরাট পর্ব্বে যুধিষ্ঠির কৃত দুর্গার স্তব ভিন্ন মহাভারতে আর কুত্রাপি শক্তির নাম-গন্ধ নাই। মহাভারতের দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণীর দেহত্যাগের কথা নাই, দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ করিবার জন্য দাক্ষায়ণীর দেহ হইতে ভদ্রকালীর উদ্ভবের কথা আছে *। দক্ষের স্তবে প্রীত হইয়া দক্ষের সম্মুখে মহাদেবের সহিত দুর্গার অধিষ্ঠান ও অন্তর্ধানের কথা আছে। অনুশাসন পর্ব্বের কৃষ্ণকৃত শিবের সহস্র নামে "বামদেবশ্চ বামশ্চ প্রাগ্দক্ষিণশ্চ বামনঃ"। "বেদকারো মন্ত্রকারঃ," ইত্যাদিও আছে। বেদকার বলিয়া মন্ত্রকার বলাতে আর বৈদিক মন্ত্র এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না, টীকাকার নীলকণ্ঠ তান্ত্রিক মন্ত্র অর্থ করিয়াছেন। বাম ও দক্ষিণ বলাতে বাম ও দক্ষিণ মার্গের কথাই বলা হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত বীজ মন্ত্রের কথা অনেকেরই অবগতি আছে, "চতুর্ম্মুখো মহালিঙ্গশ্চারু লিঙ্গস্তথৈবচ, ইত্যাদি, বীজাধ্যক্ষো বীজকর্ত্তা" ইত্যাদিও আনুশাসনিক মোক্ষ ধর্ম্মে আছে। ইহা অপেক্ষা আরও স্পষ্ট করিয়া মহাভারতে লিখিত আছে, "সাংখ্যং যোগং পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা। জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানা মতানি বৈ।"—ইত্যাদি "উমাপতি র্ভূতপতি শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ। উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ। পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তাতু ভগবান্ স্বয়ং।" মোক্ষধর্ম্ম ৩৫০অ, ৬৪ শ্লোক হইতে ৬৮ শ্লোক পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা পঞ্চরাত্রকেও তন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার কলিকালে তন্ত্রোক্ত বিধানে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে এইরূপ বিধান দেখিয়া অনেকে আপত্তি করেন; তন্ত্র আধুনিক, কারণ, কলির জন্যই তাহার সৃষ্টি। ইহার উত্তর মহাভারতে সেই মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বেই আছে, সত্য যুগে যোগস্থিত রুদ্র বালখিল্য ঋষিদিগকে এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, পরে পুনরায় সেই দেবেরই মায়ায় তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। মোক্ষ ধর্ম্ম, ৩৪৮অ, ১৭, ১৮ শ্লোক। মোক্ষধর্ম্মের ২৬৭ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে মহর্ষি কপিল স্যূমরশ্মিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঋতেত্বাগমশাস্ত্রেভ্যো ব্রূহি তদ্ যদি পশ্যসি,"—আগম শাস্ত্র ভিন্ন আর যদি কিছু দেখিয়া থাকেন, বলুন। স্যূমরশ্মি তাহার উত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার পরে পরে "ইতি শ্রুতিঃ," "ইতি শ্রুতিঃ" বলিয়াছেন; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে পারি এই প্রশ্নোক্ত "আগম" শব্দের অর্থ কি? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" এই শারীরক সূত্রের ভাষ্যে পঞ্চরাত্রোক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের উল্লেখ করিয়া "উভয় নিরাক্রিয়তে" বলিয়া তাহার খণ্ডন করেন

* ভদ্রকালীতি বিখ্যাতা দেব্যাঃ কোপাদ্ বিনিঃসৃতা। মোক্ষ ধর্ম্ম, ২৮৪ অ, ৫৪ শ্লোক। মন্যুনা ও মহাভীমা মহাকালী মহেশ্বরী। ২৮[illegible]২ শ্লোক।

নাই; কিন্তু বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের (জীবের) উৎপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। "ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভিরি"ত্যাদি বলিয়া স্পষ্টতঃ পঞ্চরাত্রোক্ত সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। আবার "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে "মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে" ইত্যাদি "পশুপতিনেশ্বরেণ পশু পাশ বিমোক্ষায়োপদিষ্টাঃ" ইত্যাদি, ইত্যাদি লিখিয়াছেন। রামানুজ স্বামী শ্রীভাষ্যে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" এই অধিকরণে "নারায়ণেন স্বয়মেব পঞ্চরাত্র-তন্ত্রে বিশদীকৃত মিতি" লিখিয়া "বেদবহিষ্কৃতাচারো নিরাকৃতো, ন যোগ স্বরূপঃ পশুপতিস্বরূপঞ্চ, অতঃ সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা। আত্মপ্রমাণ্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিরিত্যাদি লিখিয়াছেন। রামানুজস্বামী আমার উদ্ধৃত মহাভারতের প্রমাণগুলি ও এতদ্ভিন্ন মহাভারতের ও অন্যান্য গ্রন্থের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সূত সংহিতা নামক একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, ব্রহ্মগীতা নামে তাহার একটী অংশ আছে। ব্রহ্মা তাহার বক্তা, তাহাতে পরব্রহ্মরূপে শঙ্করেরই কীর্ত্তন সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার টীকাকার সর্ব্বদর্শনকার বেদভাষ্যকার স্বয়ং মাধবাচার্য্য। তিনি অধ্যায় সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন, "ইতি শ্রীমৎ কাশীবিলাস ক্রিয়াশক্তি পরমভক্ত শ্রীমত্র্যম্বকপাদাব্জসেবাপরায়ণেন উপনিষন্মার্গ প্রবর্ত্তকেন মাধবাচার্য্যেণ" ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতেও ক্রিয়াশক্তির পরমভক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তন্ত্রেই শক্তির কথা, জ্ঞানশক্তির কথা, ক্রিয়াশক্তির কথা। কেবল মহাভারত বলিয়া নয়, সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর তন্ত্রোক্ত দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বরাহ পুরাণের রুদ্র মাহাত্ম্যে আছে, "যাবত্যস্তা মহাশক্ত্যস্তাবদ্ রূপাণি শঙ্করঃ। কৃতবাংস্তাংস্তু ভজতে পতিরূপেণ সর্ব্বদা।"

"যশ্চারাধয়তে তাস্তু তস্য রুদ্রস্তু তোষিতে।
সিধ্যন্তে তাঃ সদা দেব্যো মন্ত্রিণো নাত্র সংশয়ঃ॥"

বরাহ পুরাণ, ৮১ অধ্যায়।

এই বচনটিতে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা তন্ত্রে আর অধিক কি আছে? স্কন্দ পুরাণের শঙ্কর-সংহিতা নামে একটি অংশ আছে, তাহাতে সূতের প্রতি ঋষিদিগের প্রশ্নেই আছে, "ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামো বীরমাহেশ্বরক্রমং" ইত্যাদি। মহাদেবের প্রতি কার্ত্তিকেয়ের প্রশ্নে আছে, "কেচিৎ শৈবাগমাভিজ্ঞাঃ"। শঙ্করের উত্তরেও আছে, "বেদাগমপুরাণেষু সারং গোপ্যং মনোহরং; ৮০ অধ্যায়। শৈবাগম শব্দের অর্থ যে তন্ত্র, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না, "বেদাগম পুরাণেষু" স্বতন্ত্র যখন "বেদ" শব্দের উল্লেখ আছে, তখন এ "আগম" শব্দের অর্থও যে তন্ত্র, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। শঙ্করাচার্য্য যে দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আরও অনেক উপনিষদ্ আছে, তাহা বোধ করি, অনেকেই জানেন। যে যে উপনিষদে অদ্বৈতবাদের কথা আছে, সেই গুলিরই তিনি প্রয়োজনানুরোধে স্বমতের অনুকূল বলিয়া ভাষ্য লিখিয়াছেন। যেমন তাঁহার মূল বেদের ভাষ্য লিখিবার প্রয়োজন ছিল না, সেইরূপ উপাসনা কাণ্ড বলিয়া অন্যান্য উপনিষদেরও ভাষ্য লিখিবার প্রয়োজন হয় নাই। জপে কোন্ কোন্ দ্রব্যের মালা গ্রহণ করিবে, তাহা অক্ষমালিকোপনিষদে আছে, "প্রবাল, মৌক্তিক, স্ফাটিক, শঙ্খ, রজতাষ্টাপদ, চন্দন, পুত্র—জীবিকা, অব্জ, রুদ্রাক্ষ ইতি" তন্ত্রেও ইহা অপেক্ষা মালার উপাদান সম্বন্ধে আর অধিক নাই। অথর্ব্ববেদের

অন্তর্গত অথর্ব্বশিখ, অথর্ব্বশিরঃ, অমৃতারক, অধ্যাত্ম, অন্নপূর্ণা, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, অব্যক্ত, কৃষ্ণ, কৌল, ক্ষুরিকা, গণপতি, কাত্যায়ন, কালাগ্নিরুদ্র, কুণ্ডিকা, ত্রিপুরা তাপনীয়, দক্ষিণামূর্ত্তি, দেবী, দ্বয়, ধ্যানবিন্দু নাদবিন্দু, নারদ, নারায়ণ, নির্ব্বাণ, নৃসিংহ-তাপনীয়, পাশুপত, ব্রহ্ম পৈঙ্গল, পৈপ্পলাদ, বহ্বৃচ, বৃহজ্জাবাল, ভস্ম, মুক্তিকা, রহস্য, রামতাপনী, বজ্রপঞ্জর, বরাহ, বাসুদেব, সরস্বতী-রহস্য, সীতা, সুদর্শন, হয়গ্রীব প্রভৃতি উপনিষদ্ আছে কত কি লিখিব? যেমন ঋগ্বেদের ২১, যজুর্ব্বেদের ১০৯, সামবেদের ১০০০ শাখা আছে, সেই পরিমাণে সেইরূপ উপনিষদও আছে। পূর্ব্বকথিত উপনিষদের প্রত্যেকটিতেই যে তন্ত্রের ন্যায় উপাসনা-প্রণালী লিখিত আছে, সেই সেই উপনিষদের অন্বর্থ নাম শুনিয়াই তাহা শ্রোতৃবর্গ অবধারণ করিতে পারিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আর সেই সেই উপনিষদের অংশ উদ্ধৃত করিলাম না। নৃসিংহ-তাপনীয়ের অনেকগুলি ভাষ্য আছে, তন্মধ্যে একখানি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত, আর একখানি শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু মুনীন্দ্র বলিয়া খ্যাত গৌড়পাদাচার্য্যের লিখিত। সুতরাং পুস্তক অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার আশঙ্কা নাই। আমি যে যে উপনিষদের নাম কীর্ত্তন করিলাম, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ থাকিলে তিনি যেন A Descriptive catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras." Vol. I. Part 3. নামক মুদ্রিত তালিকা একবার পাঠ করিয়া দেখেন; আমার এ বিষয়ে একান্ত অনুরোধ। মনুসংহিতার প্রামাণিক টীকাকার মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্ট মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের টীকায় হারীত বচন বলিয়া "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ, শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্ম্মঃ শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকীচ" এইটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, তন্ত্র আর কিছুই নয়, বেদেরই অংশ বিশেষ, এইজন্য তন্ত্র বুঝাইতে "আগম" "নিগম" শব্দের ব্যবহার আছে। মহাভারতের প্রাগুক্ত কতিপয় বচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাদেব বেদের সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পাশুপত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাদেবের শ্রীমুখনির্গত সেই বাক্য দ্বারাও বুঝিতে পারি, তন্ত্র বেদেরই অংশ। এক্ষণে আমরা মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়ের ১৬৫ শ্লোকে যে "কৃৎস্ন (সমস্ত) বেদ" পদ সত্ত্বেও আবার "রহস্য" পদ আছে, তাহার ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২য় বর্গীয়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১০ সূক্তে সমস্ত বেদ, উপনিষদের উল্লেখ করিয়া আবার যে "বিদ্যা" শব্দ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার তন্ত্র অর্থ করিতে পারি। বৃদ্ধ হারীত সংহিতায় কিরূপে তন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবে, আনুপূর্ব্বিক তাহার পদ্ধতি আছে, উশনঃ সংহিতায় পাঞ্চরাত্র ও পাশুপত ধর্ম্মের স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে, কাত্যায়ন সংহিতায় গণেশ ও গৌরী প্রভৃতি দেবীর পূজার বিধান আছে। ব্যাস সংহিতায় গুহ্য বিদ্যার জপ করিবার উপদেশ আছে, স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারা জপমালা করিবার বিধান আছে, রুদ্র গায়ত্রীদ্বারা শিবপূজা করিবার উপদেশ আছে। তন্ত্রভিন্ন অন্যত্র রুদ্র বা অন্য দেবতার গায়ত্রী নাই। শঙ্খ সংহিতায় আছে, দেবতার ধ্যান করিয়া স্ফাটিকাদির মালায় জপ করিবে ও বাম হস্তে সংখ্যা রাখিবে। বৃদ্ধগৌতমসংহিতায়

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের একটি নামের তালিকা আছে, তাহাতে ব্রহ্মার নাম আছে, উমা মহেশ্বরেরও নাম আছে। আর কত উদ্ধৃত করিব, সমস্ত স্মৃতি সংহিতাতেই পুরাণের মত স্পষ্টতঃ ও ভাবতঃ তন্ত্রের উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্ত্রে স্মৃতি ও পুরাণের নামোল্লেখ নাই, ইহা দ্বারাও বুঝিতে হইবে, তন্ত্র কত প্রাচীন। "শিবাগম" নামে একখানি সুপ্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থ আছে, তাহার প্রমাণ কৃষ্ণানন্দও তন্ত্রসারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ভাষ্যকার অভিনব গুপ্ত কাশ্মীরাধিপতি গোনর্দ্দের সভা-পণ্ডিত। গোনর্দ্দ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে বীরগতি লাভ করিয়াছেন *। এক্ষণে বুঝুন তন্ত্র কত প্রাচীন।

মিশরের প্রাচীন অধিবাসীরা হিন্দুর মত অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করিত, দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে মদ্যের আহুতি দান, দেবতার অগ্রে বলি প্রদান করিত, পশুর মস্তক দেবতার অগ্রে রক্ষিত ও নিবেদিত হইত। † অগ্নিতে মদ্যের আহুতি, দেবতার অগ্রে বলি প্রদান ও পশুমস্তকের নিবেদন তন্ত্র শাসনের অনুগত। কাল ও দেশ দ্বারা সুদূরে অবস্থিত মিশরেও যখন তন্ত্রের শাসন দেখিতে পাই, তখন কি করিয়া তন্ত্রকে আধুনিক বলিব, বুঝিতে পারি না। মিশরে অসংখ্য দেবতা স্বীকৃত হইলেও তিনটি দেবতা প্রধান বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন; ইহা দ্বারাও মিশরে হিন্দু দেবতার প্রভাব পরিব্যাপ্ত, বুঝিতে পারা যায়। মিশরে "হোরেশ" নামে সূর্য্য আখ্যাত ও পূজিত। অহর্পতি, অহরীশ সূর্য্যের সংস্কৃত নাম; তাহা হইতে বা হোরার (অহোরাত্রের) ঈশ—হোরেশ, হইতে মিশরের হোরেশ নামের সৃষ্টি হইয়াছে, অবধারণ করিতে পারা যায়। মিশরের উপাস্য শ্রেষ্ঠ দেবতা "রা" • তারা হইতে বা রাম হইতে উৎপন্ন নহেন, কে বলিবে? এই সকল কারণে ও অন্যান্য কারণে মিশরেও হিন্দুধর্ম্মের ক্ষীণ জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়, তন্ত্রের প্রভাব প্রতিপাদিত হয়। অতীত দশ সহস্র বৎসরের লিখিত ইতিহাসে নিবদ্ধ মিশরের আচারের সহিত যখন তান্ত্রিকতা বিজড়িত রহিয়াছে, তখন কি করিয়া তন্ত্রকে প্রাচীন না বলিয়া অর্ব্বাচীন বলিব, চিন্তা করিয়া অবধারণ করিতে পারি না।

আমার নিজের বিশ্বাস, চতুর্থ আপত্তির উত্তরে যাহা বলিবার আমি সমস্তই বলিয়াছি। তন্ত্রের আধুনিকত্বের বিরুদ্ধে হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্র সমস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সুতরাং এ প্রবন্ধে আর আমার অতিরিক্ত বলিবার কিছুই নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিবার আছে, যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাষায় ও পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রে কৃতবিদ্য, যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে মার্জ্জিত, উন্মেষিত ও সেই পাশ্চাত্য রাগে রঞ্জিত, সেই সকল কুসংস্কারবর্জ্জিত মহাত্মাদিগকে উল্লিখিত যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিব, এরূপ আশা করিবার আমার অধিকার নাই। কারণ আমার Inductive ও Deductive লজিক্ শিক্ষা করিবার সৌভাগ্য হয় নাই, আমি দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে "তাল পড়িয়াই শব্দ হয়, না শব্দ হইয়াই তাল পড়ে" এই আকারের তর্ক শিক্ষা করিয়াছি। রঘুনাথ, মথুরানাথ প্রভৃতি খ্যাতনামা নৈয়ায়িকগণ যে তাল পড়া লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না, ইন্‌ডাক্‌টিভ (Inductive), ডিডাক্‌টিভ্

* কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী ও শিবাগমভাষ্য দ্রষ্টব্য। ভাষ্য দ্বারবঙ্গাধিপতির পুস্তকালয়ে আছে।

† The Historian's History of the world Vol I.

(Deductive) লজিক্ ত ছোট কথা, তাহা অপেক্ষা কত সূক্ষ্ম ভাগের কল্পনা ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। বারান্তরে সেই উপহার লইয়া মহানুভব সভাপতি মহাশয়ের সহিত ও মাননীয় সভ্যবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রহিল। আমি ঘটনাচক্রে কিছু দীর্ঘকাল কটকে ছিলাম। প্রত্যহ অপরাহ্ণে সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগের প্রত্যাশায় কাটযুড়ী নদীর তীরে বন্ধনীর (Revetment) উপরে তত্রত্য সম্ভ্রান্ত মহোদয়দিগের সহিত সমবেত হইতাম। সেই-সান্ধ্য সমিতিতে জ্ঞানগর্ভ নানা বিষয়ের অবতারণা হইত। এক দিন প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্রের আধুনিকত্ব লইয়া কথা হয়। আমি তাহাতে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতর্কের কতক কতক বলি। কটক কলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী ঋষি ও শাস্ত্রে একান্ত শ্রদ্ধালু খ্যাতনামা সাহিত্যিক কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেন যে, "এই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের যুক্তিতর্কগুলি আপনি মুখে বলিয়া কাটযুড়ী নদীর প্রবল বায়ুরাশির হিল্লোলে ভাসাইয়া দিবেন না, এই বিষয়ের একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সর্ব্বত্র যাহার প্রচার আছে এইরূপ একখানি পত্রিকায় প্রচারিত করুন এই আমার অনুরোধ।" সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ও সাহিত্য সভায় অনেক দিন কোন প্রবন্ধ দিই নাই, একটি প্রবন্ধ দেওয়া একান্ত আবশ্যক, এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছি। লিখিতে লিখিতে অসাবধানতা বশতঃ প্রবন্ধের কলেবর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়াছি। সভাপতি মহাশয়ের ও সভ্যবৃন্দের অনেক আবশ্যক কার্য্য আছে, তাহা সত্ত্বেও যে তাঁহারা এই নীরস দীর্ঘ প্রবন্ধ শুনিতে যাইয়া দীর্ঘ সময় নষ্ট করিলেন, উপসংহারে সে জন্য একান্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। *

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

গঙ্গাস্নানের সময়, যখন উমাকালী চক্রবর্ত্তীর সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "উমাকালী ভাই, আজ বিকালে তুমি আমাদের বাটীতে যাইও। গদাই যে ভাল তামাক আনিয়াছিল, এখনও তাহার কিঞ্চিৎ আছে, আজ দুই চার ছিলিম খাওয়া যাইবে।" তদনুসারে উমাকালী চটি জুতা পরিয়া, চম্পকবর্ণ গামছা খানি স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, এবং তৈলপক্ক বংশযষ্টিটি নির্ভর করিয়া, মধুসূদনের বাটীতে বিকালে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মধুসূদন অত্যন্ত আনন্দসহকারে কহিলেন,—"শুনিয়াছ, ভাই! আজকার সোমপ্রকাশে পাশের সংবাদ বাহির হইয়াছে। গদাই আমার পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে। সে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবে।"

উমা। বল কি? কুড়ি টাকা বৃত্তি হইবে? মধুসূদন ভাই, তোমার গদাই ছেলেটিকে সামান্য ছেলে ভাবিও না। যখন ও বাল্যকালে, গাছে চড়িয়া, মাছ ধরিয়া, খেলা করিয়া বেড়াইত, তখন আমরা

* সাহিত্য সভার অধিবেশনে পঠিত

উহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি নাই। দেখ ভাই, তোমাকে আমি চুপি চুপি একটা [illegible] বলি।

মধু। কি কথা?

উমা। তোমার এই ছেলেটির প্রতি দেবী সরস্বতীর কৃপা হইয়াছে।

মধু। তুমি কিরূপে জানিলে?

উমা। তোমার মনে আছে, তুমি তখন বলিতে যে দেবী স্বরস্বতী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া তোমার পুত্রকে বিদ্যাদান করিবেন। সেদিন কালাদহ গ্রাম হইতে যে ভদ্রলোকটি আসিয়াছিলেন,—তাঁহার নামটি কি ভাল?

মধু। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

উমা। হাঁ, হাঁ, কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়। এই কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাটিকে তুমি ভাল করিয়া দেখিয়াছিলে?

উমা। মেয়েটি মানুষ নয়, সাক্ষাৎ দেবী। দেবী সরস্বতী।

মধু। বল কি? শুনিলাম মেয়েটির বিবাহ হয় নাই।

উমা। ওহে ভাই! সরস্বতী দেবীকে কি পৃথিবীর লোক বিবাহ করিতে পারে?

যখন দুই বন্ধুতে বসিয়া, ফৌজদারীবালাখানার তামাকুর ধূম উদ্গীরণ করিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন গ্রাম মধ্যে গ্রামবাসিগণের মুখে মুখে গদাধরের সুখ্যাতি উছলাইয়া পড়িতেছিল। গদাধর কিন্তু এ সংবাদ তখনও প্রাপ্ত হয় নাই। বৃদ্ধ মধুসূদন দিবানিদ্রার পর, গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে, গদাধরের নামে দুই খানি পত্র এবং একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আসিয়াছে। তিনি পত্র দুইখানি গদাধরের জন্য বালিশের নীচে রাখিয়া, মোড়ক খুলিয়া সংবাদ পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। দেখিলেন, সর্ব্ব প্রথমেই গদাধরের নাম। দেখিয়া গদাধরকে সংবাদ দিবার জন্য তিনি তাহার অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু সে ছিপ্ লইয়া, কোথায় কাহাদের পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। কোন স্থানে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তাহাকে সন্ধান করিতে যাইয়া রাস্তায় যাহার সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাহাকেই তাঁহার অত্যন্ত সুখ-সংবাদ প্রদান করিয়া সুখী হইলেন। বাটীতে ফিরিয়া অল্পকাল মধ্যে উমাকালী চক্রবর্ত্তীকে সমাগত দেখিলেন।

সন্ধ্যাকালে, দুইটি বৃহদাকার রোহিত মৎস্য হস্তে করিয়া গদাধর বাটীতে ফিরিল। বাটীতে প্রবেশমাত্র মধুসূদন ত্বরিতপদে তাহার হস্ত হইতে মৎস্য দুইটি লইয়া, সংবাদ দিলেন, "গদাই, তুমি পাশ হইয়াছ; প্রথম হইয়াছ।" গদাধর ছিপ্ রাখিয়া, ধূলির উপর জানু স্থাপন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা পিতার পবিত্র পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল। মধুসূদন পুত্রের মস্তকে স্নেহ-মণ্ডিত করের দ্বারা স্পর্শ করিয়া মনে মনে ডাকিলেন, "দয়াময় প্রভু, আমায় এ বংশের তিলককে তুমি রক্ষা করিও।" পরে উমাকালী চক্রবর্ত্তীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ভাই! গদাধর আজ দুইটা মাছ ধরিয়াছে, এ মাছ দু'টা তুমি লইয়া যাও; খাইবে?" উমাকালী কহিল, "সর্ব্বনাশ! আমরা দুইটি প্রাণী, এই দুই বড় মাছ কিরূপে আহার করিব? ইহার একটি মাছ বহন করিবার শক্তিও আমার নাই।" গদাধর বলিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা, বাবা যা' বলিতেছেন তাহা আপনার শুনিতেই হইবে। আমি মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মাছ আপন[illegible] বাটীতে পৌঁছিয়া দিব, কুটিয়া

দিব, এবং যদি দরকার হয়, তাহা হইলে মাছ ভাজিবার তেল কলুব ড়ি হইতে আনিয়া দিব।" উমাকালী একটু চিন্তিত হইল, পরে গদাধরকে বলিল, "বাবাজি, তুমি যখন মৎস্য সম্বন্ধে এতটা ভার গ্রহণ করিলে, তখন মাছ খাইবার ভারও গ্রহণ কর; কেননা তোমার বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী কাকার এই বৃদ্ধ বয়সে এমন সাধ্য নাই, এবং তোমার খুড়িমারও এমন সাধ্য নাই যে এই দুই বৃহৎ মৎস্যের......বুঝিয়াছ।"

গদাধর মৎস্য দু'টী কুটিয়া, ধুইয়া, লবণাক্ত করিয়া, তাহার চক্রবর্ত্তী কাকার বাটীতে পৌঁছিয়া দিল। সে রাত্রে মধুসূদন স্ত্রী-পুত্র লইয়া, উমাকালীর বাটীতে আহার করিয়াছিলেন এবং গ্রামের আরও দুই চারি ব্যক্তি মৎস্য খাইবার জন্য উমাকালীর বাটীতে আহূত হইয়াছিল। গদাধরের খুড়িমা রাঁধিয়াছিল ভাল, কিন্তু সকলেই কহিলেন, "অম্বলটা যদি টাট্‌কা না হইয়া বাসী হইত, তাহা হইলে মাছগুলি মজিত ভাল।"

আহারাদির পর বাটী ফিরিয়া, মধুসূদন কহিলেন, 'গদাই, তোমাকে বলিতে ভুলিয়াছিলাম; বালিশের নীচে তোমার দুইখানি পত্র আছে; আজ ডাকে আসিয়াছে।" গদাই প্রদীপের কাছে মাদুরে বসিয়া পত্র পড়িতে লাগিল।

একখানি পত্র, তাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে আসিয়াছিল। পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করার জন্য তিনি তাহার কত প্রশংসা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহাকে কত সদুপদেশ দিয়াছেন।

দ্বিতীয় পত্রখানি কাহার নিকট হইতে আসিয়াছে, তাহা গদাধর সহজে বুঝিতে পারিল না। তাহা প্রেম-[illegible]ায়। যেন কোন প্রেমনিপীড়িতা যুবতী তাহার প্রাণাধিককে প্রেম সম্ভাষণ করিয়াছে। কে এ যুবতী? পত্রের নিম্নে স্বাক্ষর দেখি[illegible] সে কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না। পত্রখানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। তাহার সহপাঠী কোন বালক বিদ্রূপ করিয়া কি তাহাকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছে?

পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল। "তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না। এ জন্য কোন প্রকার সম্বোধন করিলাম না। তোমার ঠিকানা জানিতে পারি নাই বলিয়া, এত দিন তোমায় পত্র দিতে পারি নাই। তা'না হইলে অনেক দিন আগে তোমাকে পত্র লিখিতাম। আজ বহুকষ্টে তোমার ঠিকানা জানিয়া তোমায় পত্র লিখিতে বসিয়াছি। তুমি কেমন আছ? বাড়ি যাইবার আগে আমার সহিত দেখা করিয়া যাও নাই কেন? আমি তোমাকে একটিবার দেখিবার জন্য যে কত কাতর, তাহা তোমাকে কিরূপে বুঝাইব। বিধাতা মেয়েমানুষদের পাখীদের মত পাখা দেন নাই কেন? যদি আমার পাখা থাকিত, আমি এই দণ্ডে তোমার নিকট উড়িয়া যাইতাম। তুমি আমার পাখা দেখিয়া মনে করিতে, আকাশ হইতে পরী নামিয়া আসিয়াছে। আমি তোমাকে আদর করিতাম। আমার আদরে, তুমি শিহরিয়া উঠিতে। পাখা থাকিলে, এই সব হইত বটে, কিন্তু পাখাত নাই। তাই, তোমাকে পত্র লিখিয়া যতটুকু সুখ পাওয়া যায়, তাহা উপভোগ করিবার জন্য, ঘরে খিল দিয়া বসিয়াছি। তুমি কবে কলিকাতায় ফিরিবে, তাহা আমাকে লিখিও। আর এখানে আসিয়াই আমার সহিত দেখা করিতে আসিও। তুমি কেন সর্ব্বদা আমাদের বাটিতে আস না, তাহা আমি বুঝিতে' পারি না। কেন,

আশিক্ষিত কুরূপা নহি, আমার যৌবনও গত হয় নাই। এ বার তোমাকে ছাড়িব না। আমার কাছে বসাইয়া তোমার সহিত গল্প করিব। এবার যদি আমার সহিত গল্প না কর, তাহা হইলে আমি কাঁদিব। আমার স্বামীর মুখে শুনিলাম, তুমি খুব ভালরূপে পাশ হইয়াছ; শুনিয়া আমার অতিশয় আহ্লাদ হইল। আমার হাতের লেখা ভাল নয় বলিয়া, তুমি যেন হাসিও না। তুমি যদি শিখাও, আমি বেশ ভাল রকম লেখা শিখিতে পারি। আমি ভাল আছি; কিন্তু তোমাকে দেখিবার জন্ত আমার মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। এস সখা, আসিয়া আমার প্রাণ স্থির কর। ইতি।"

পত্রের তলায় নাম লিখা ছিল, "চারু।" কে এ চারু? চারু নামে গদাধরের এক সহাধ্যায়ী বালক ছিল; এ কাজ কি তাহারই? না তাহা সম্ভব নহে। লেখাটা অল্পশিক্ষিতা কোন বালিকার লেখার স্থায়; তাহার সহপাঠিগণের মধ্যে কাহারও লেখা এরূপ হইতে পারে না। এ কোন্ বালিকা? কে এ কুৎসিত প্রেম-পত্র তাহাকে লিখিল?

গদাধর ত জানিত না যে, অতুলানন্দ বাবুর পরমা পাপীয়সী পত্নীর নাম চারুশশী। জানিলে হয়ত সে বুঝিতে পারিত যে, এ তাহারই কাজ! হায়! এই প্রমত্ত পাপ, মাতাপিতার স্নেহাবৃত পবিত্র শান্ত কুটীরের মধ্যে গদাধরকে অনুসরণ করিয়াছে। ধিক!

১৮

চারুশশীকে গল্প না শুনাইয়া, তাহার মনোবাসনা পূর্ণ না করিয়া গদাধর চলিয়া আসার পর, অতুলানন্দ বাটী ফিরিয়াছিল। যে চোর পূর্ব্ব রাত্রে চুরি করিবার জন্ত সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদিগের বিশ্বাস, তাহার চকিত অন্তঃকরণও আজ অতুলানন্দের অন্তঃকরণের স্থায় আশঙ্কিত হয় নাই। অতুলানন্দ চারুশশীকে চিনিত। তাঁহার দুরন্ত শাসন-ভয়ে সে আজ কম্পিত-কলেবর হইয়াছিল। অতি সন্তর্পণে এবং সভয়চিত্তে সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

কিন্তু সে পত্নীর শ্রীমুখ-বিনির্গত যে ঝটিকার দ্বারা গৃহভিত্তি প্রকম্পিত হইবার আশঙ্কা করিয়াছিল, সে ঝটিকা মোটেই উত্থিত হয় নাই। পাপীয়সী চারুশশী তখন ভর্ত্তাকে ভৎর্সনা করা অপেক্ষা অধিকতর পাপে আপনার মনকে নিমজ্জিত রাখিয়া, আপনার শয্যাগৃহ কোণে নির্বাক্ হইয়া বসিয়াছিল। পলাতক গদাধরের প্রতি তাহার বিফল প্রয়াস কি সহজ উপায়ে সফল হইবে, তাহার চিন্তায় তখন তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন ছিল। এ চিন্তা ত্যাগ করিয়া, স্বামীকে কুকথা প্রয়োগের অবসর ছিল না। কুকথা কহিবারই যখন অবসর ছিল না, তখন সে ভাল কথা কহিবার অবসর কোথায় পাইবে? অতএব সে নির্বাক্ রহিল। অতুলানন্দ তাহার নিকটে আসিলে, সে কথা না কহিয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। গমন-কালে তাহার যৌবনভারাক্রান্ত দোদুল্যমান অঙ্গের বিভ্রম দেখিয়া, অতুলানন্দ ছেলে-ধরা কুক্কুর মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া রহিল। এবং আত্মরক্ষার্থ ধূমময় দুর্গ প্রস্তুত করিবার জন্ত ঝিকে ডাকিয়া এক ছিলিম তামাকু দিবার জন্ত অনুরোধ করিল। আমি দেখিয়াছি যে শ্রীমতী মনসা দেবী ধূনার ধূমে যেমন জব্দ হইয়া থাকেন, আমাদের গৃহের মানময়ী মাল্সামুখী মনসারা তামাকুর ধূমে তেমনি জব্দ হইয়া থাকেন। কিন্তু চারুশশীর পক্ষে এ ধূমবিদ্যা কার্য্যকরী হয় নাই।

তাহার পরদিনও চারুশশী অতুলানন্দের প্রতি বিমুখ থাকিয়া, সারাদিনটা মৌনাবলম্বী ঋষির ন্যায় অতিবাহিত করিল।

তৎপরদিন মানময়ীর মুখ ফুটিল। স্বামী একখানি নূতন শান্তিপেড়ে সাড়ি হস্তে লইয়া, পত্নীসম্ভাষণ জন্য তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে, সে কহিল, "যাও, আর আদর জানাইতে হইবে না।"

অতুলানন্দ চারুশশীর চিবুক ধরিয়া কহিল, "কেন আদর জানাইব না? তুমি যে আমার সকল আদরের আদরিণী; তুমি যে আমার বোকা মনের জ্ঞানদায়িনী।"

চারুশশী অতুলানন্দের হস্ত তাহার চিবুক হইতে সবলে অপসারিত করিয়া এবং তাহার প্রতি কোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "যাও, যাও, আর রসিকতা করিতে হইবে না,—রসিক পুরুষ আমার।"

অতুলানন্দ চারুশীলার বদন-কমলের নিকট আপনার মুখ লইয়া, পদ্মবদন চুম্বনপ্রয়াসী মধুমক্ষিকার ন্যায় গুন গুন্ স্বরে গাহিল,—

"আমি তোমার রসিক পুরুষ,
কর্‌বো তোমার জুতো বুরুষ।"

অতুলানন্দের এই নীরস রসিকতায় চারুশশীর হাড় জ্বলিয়া গেল। তথাপি তাহার অতুলানন্দের সহিত কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল। গদাধরের নামটি পর্য্যন্ত সে জানিত না। তাহার পরিচয় জানা এবং তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। স্বামীর সহিত কথা না কহিলে ত এসব কিছু হইবে না। তাই সে দুই দিন পরে কথা কহিল। এখন স্বামীর রসিকতায় সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বলিল, "তোমার এই রসিকতা সে দিন রাত্রে কোথায় ছিল? ভাগ্যিস্ ভাল মানুষের ছেলে আসিয়া আমাকে রক্ষা করিল; তা'না হ'লে, কি হ'ত বল দেখি? তোমার না আছে বুদ্ধি, না আছে আক্কেল।"

অতুলানন্দের সুর তখনও থামে নাই। সে আবার গাহিল,—

"আমি বি-এ ফেল
নাই ক আক্কেল,
(আমি শুধু নই)
আমার চৌদ্দ পুরুষ বেজায় বেঁহুস্
কর্‌বো তোমার জুতা বুরুষ॥"

অতুলানন্দের অঙ্গভঙ্গীযুক্ত এই গান শুনিয়া, মানিনীর গুরু মান কিঞ্চিৎ লঘু হইল। বলিল, "ওগো! রক্ষা কর; আর তোমার গানে কাজ নাই। তুমি যে বড় সুরসিক, তা' বেশ বুঝা গেল।"

অতুলানন্দ সুযোগ বুঝিয়া কহিল, "দেখ ভাই চারু, তোমায় কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমার বড়ই অপরাধ হইয়াছে। চোর বেটা বড় বেকুব; সেত আগে আমাকে কিছু ব'লে নাই। আমি কিছুই জানিতাম না। জানিলে কি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতাম; হ'লই বা মনিব বাড়ী!"

চারু। তোমার ঐ এক কথা। আমি কি তোমাকে নিমন্ত্রণে যাইতে নিষেধ করিয়াছি?

অতুল। না, না। নিমন্ত্রণে যাইতে বারণ করিবে কেন? আমি সে কথা বলিতেছি না। তবে কি না আহারাদির পর শরীরটা বড়ই বেতরিব হইয়া গেল, তাই আর আসিতে পারিলাম না। তথাপি সেই অবস্থাতেও আমি গদাধরকে—

চারু। কি বল্লে? তা'র নামটি কি?

অতুল। নামটা শুন্‌লে বড় হাসি আসে, নয়? গদাধরচন্দ্র।

চারু। তাহারা বামুন না, কি?

অতুল। আরে! বামুন বই কি! তুমি চেহারাটা দেখে বুঝি বাগ্‌দী টাগ্‌দী কিছু ভেবেছ।

চারু। হাঁ, চেহারাটা ভাল নয়। কিন্তু দেখ্‌লে মনে হয়, গায়ে খুব জোর আছে।

অতুল। ভয়ঙ্কর জোর। এমন জোর তুমি আর কখন দেখ নাই। বাবুদের বাড়ীতে রতন সিং বলে একটা পালোয়ান আছে জান?

চারু। হাঁ, হাঁ, সেই যে তুমি একবার কুস্তি দেখিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলে? তা' রতন সিংএর কথা তুমি কি বলিতেছিলে?

অতুল। জান্‌লে, সেই রতন সিং একটি লোহার সিন্দুক সরাইতে পারিল না। আর গদাধর অক্লেশে তাহা সরাইয়া রাখিল। জান্‌লে, গদাধরটি একটি কলিকালের ভীম।

চারু। তাহারা কিরূপ বামুন? চক্রবর্ত্তী, ঘোষাল, মুখুর্য্যে, না কি?

অতুল। গদাধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়!

চারু। উহাদের কি এই কলিকাতাতে বাস?

অতুল। না, না, কলিকাতাতে বাস হইতে যাবে কেন? সেই চেহারা দেখিলে কি তাহাকে সহরের লোক বলিয়া বোধ হয়? শুনিয়াছি, তোমাদের গ্রামের নিকটে কোন পল্লীগ্রামে তাহার বাড়ী।

চারু। কোন্ গ্রামে?

অতুল। ওর নিজের নামের চেয়েও, ওর গ্রামের নামটা আরও বদ্।

চারু। তা' বদ্ হ'ক। কিন্তু গ্রামটার নাম কি?

অতুল। সত্য বলিতেছি, গ্রামটার নাম আমি একবারে ভুলিয়া গিয়াছি।

চারু। মনে ক'র। নন্দীপুর?

অতুল। না, না, নন্দীপুর নয়।

চারু। কল্যাণেশ্বর?

অতুল। না।

চারু। কলসঘাটা?

অতুল। না।

চারু। দেবেন্দ্রগ্রাম?

অতুল। না।

চারু। তেপুর?

অতুল। না।

চারু। চৌগ্রাম।

অতুল। না, না, সে নাম ওরকমের কিছু নয়। তার গোড়ায় "রা" আছে। তুমি আগে 'রা'-ওয়ালা কথা যতগুলো জান বল দেখি। রাম, রাবণ, রাখাল, রাখালী, রাজা, রাজস্ব, রাজত্ব—এই রকম যত কথা জান ব'লে যাও দেখি।

চারু। রাগ?

অতুল। না, না আর রাগে কাজ নাই।

চারু। আমি কি রাগ করিতেছি নাকি? আমি আগে 'রা'-ওয়ালা কথা বলিতেছি। রাক্ষস?

অতুল। না।

চারু। রাজর্ষি, রাগী?—রাব্‌ড়ি?

অতুল। না।

চারু। রাখী, রামী?—রাঙ্গা?

অতুল। না, না, ও সব কিছু নয়।

চারু। রায়, রাস, রাধা, রাত্রি, রাশি?

অতুল। না, হ'ল না। কিছুতেই সেই তুচ্ছ কথাটা মনে পড়িল না।

চারু। ছি! ছি! তুমি বড় ভুলো; তোমার কিছুই মনে থাকে না। একটা গ্রামের নাম, তাহাও মনে করিয়া রাখিতে পার না।

অতুল। মনে ক'রে রাখবার যে এত দরকার ছিল, তা' আগে বুঝিতে পারি নাই। এখন গদাধরকে আবার জিজ্ঞাসা করিয়া ভালরূপ ইয়াদস্ত করিয়া রাখিব।

চারু। কাল যখন বাড়িতে খাইতে আসিবে, তখন গ্রামের নামটা নিশ্চয় আমাকে বলা চাই। [illegible]র দেখ......।

অতুল। আর কি?

চারু। তোমার এই গদাধর, তোমার সাত পাক দেওয়া, বিয়ে করা স্ত্রীকে, আর তোমার চুরি-করা আর রোজগার-করা সমস্ত সম্পত্তি চোরের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছে। আমার মনে হয়, তাহাকে আহ্বান করিয়া একবার আহার করান আমাদের উচিত। তুমি কি বল?

অতুল। তোমার যাহা মত, তাহাতে কি আমার অন্য মত আছে। আমি কালই তাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিব।

চারু। দেখ?

অতুল। কি?

চারু। সেই বিপদের সময় আমি উহার সহিত কথা কহিয়া ফেলিয়াছি। আমার জ্ঞান ছিল না, তুমি রাগ করিবে না?

অতুল। গদাধরের সহিত আমি একত্রে কাজ করি। সে আমার ছোট ভায়ের মত। বড় ভাল ছেলে। তাহার সহিত তুমি কথা কহিবে, ইহাতে আমার রাগ হইবে কেন? তুমি বরাবর তাহার সহিত কথা কহিও।

গদাধরকে ধরিবার জন্য চারুশশী যে জাল বোনার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল সে কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইল। কাল রাত্রে গদাধর তাহাদের বাটিতে আহার করিতে আসিবে। সে কি বাঁধিবে, কোন্ বসনখানি কিরূপে পরিধান করিয়া কি কথা কহিয়া তাহাকে পরিবেশন করিবে, এই চিন্তায় সে সমস্ত রাত্রি ভালরূপ নিদ্রা যাইতে পারিল না। হায়! সে ত জানিত না যে, যে মরকাগ্নি সে হৃদয়মধ্যে জ্বালিয়াছিল, গদাধর দূর হইতে তাহার তাপ অনুভব করিয়া, দাহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য, আরও দূরে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরদিন মধ্যাহ্নে আহার সময়ে বাটী ফিরিয়া যখন অতুলানন্দ তাহাকে বলিল যে, তাহার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া গদাধর, আহার করিতে আসিতে পারিবে না, তখন সে গর্জ্জিয়া উঠিল। হৃদয়ের সমস্ত আক্রোশ উদ্গার করিয়া, লোচন মধ্যে অগ্নিজ্বালা পূরিয়া কহিল, "তুমি একটি ঢেঁকি, তোমার দ্বারা কোন কাজ হইবার নয়। একটা লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিবার ক্ষমতাও তোমার নাই। যাও, তুমি আর মুখ নাড়িয়া কথা কহিও না।"

উপরোক্ত ঘটনার পর চারুশশী একপক্ষ কাল ভর্ত্তার সহিত বাক্যালাপ করা আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

১৯

পনের দিন বাদে, মানভঞ্জন পালায় স্বামীর নিকট পরাজিত হইয়া চারুশশী তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল, তখন জানিতে পারিল যে, গদাধর তাহার বাক্যশূন্য পক্ষকাল মধ্যে পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিয়া, সদানন্দে আপনার পল্লীগ্রামে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গদাধরের আশা ত্যাগ করা চারুশশীর পক্ষে অসম্ভব। সে তাহাকে আপনার হৃদয়ে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল—গদাধর যত দূরে যাইতেছিল, চারুশশীর হৃদয়ের বাঁধনে ততই জোরে টান পড়িতেছিল। টান যত জোরে পড়িতেছিল, তাহার হৃদয়ের ব্যথা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। এই ব্যথিত হৃদয় লইয়া সে কিরূপে প্রাণধারণ করিবে? কয়েক দিন চিন্তার পর সে স্থির করিল যে, সে গদাধরকে একখানা পত্র লিখিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া, সে যে পত্রখানা লিখিয়াছিল, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু সেই পত্রখানা তাহার বহু পরিশ্রমের ফল। প্রথম দিন যখন পত্র লিখিতে বসিল, তখন

"প্রাণেশ্বর" বলিয়া পত্রের প্রথম ছত্রটা আরম্ভ করিবামাত্র, তাহার মনে হইল যেন ঘরের বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা ছিঁড়িয়া লেখন সামগ্রী সকল লুক্কায়িত করিয়া, প্রকম্পিত হৃদয়ে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, কেহ কোথাও নাই। তবে সে জুতার শব্দ কোথা হইতে আসিল? সে জুতার শব্দ তাহার স্বামীর জুতার শব্দের ন্যায়। সে নিম্নতলে নামিয়া, ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল। ঝি কহিল, "কই না বাবুত বাড়ী আসেন নাই।" চারুশশী বুঝিতে পারে নাই যে, যে শব্দ তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা সনাতন। তাহা চিরদিন মানুষের কানের কাছে ধ্বনিত হইতেছে। সে বুঝিতে পারে নাই যে, ভগবানের নিষেধ আজ্ঞা, পাপের দ্বারে, তাহার স্বামীর জুতার শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন সে আর পত্র লিখিতে পারিল না।

দুই দিন পরে সে আপন শয়নগৃহের দ্বার আবার অর্গলাবদ্ধ করল। লেখন-সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিল। কিন্তু সেদিনও লেখা হইল না। প্রাণাধিক, প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ, প্রাণসখা,—ইত্যাদি "প"এ র-ফলা প্রমুখ শব্দের মধ্যে কোন্ শব্দটা গদাধরের প্রতি অধিক প্রযুজ্য, তাহা স্থির করিতে অত্যন্ত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। গৃহদ্বারে ঝি আসিয়া কহিল;—"মা,বাবু আসিয়াছেন, জল খাবার দাও।" শুনিয়া, হৃদয়ের অযথা ঘাত-প্রতিঘাতে চারুশশীর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কাগজপত্র,কালী কলম অতি সত্বর পেটকবদ্ধ করিয়া এবং আপনার সমস্ত পাপ হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া, সে স্বামি-সম্ভাষণ জন্য অর্গল খুলিয়া বাহিরে আসিল।

সপ্তাহ পরে, সে পুনরায় গদাধরকে পত্র লিখিবার জন্য যত্নবতী হইল। কিন্তু এক্ষণে তাহার সহসা স্মরণ হইল যে, তাহাকে পত্র লিখিতে হইলে অগ্রে তাহার ঠিকানা জানা আবশ্যক। গদাধরের বাটী কোন্ গ্রামে তাহা জানিয়া লইবার জন্য সে বহুদিন পূর্ব্বে তাহার স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার নির্ব্বোধ এবং এবং নিতান্ত স্মরণশক্তিবিহীন স্বামীটি এতকাল তাহাকে সে, সংবাদ দেয় নাই। সেও নির্ব্বোধের মত ক্রোধের বশীভূত হইয়া, পক্ষকাল স্বামীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, গদাধর সম্বন্ধে নানা সংবাদ যথাসময়ে শুনিবার সুযোগ হারাইয়াছে। সে এরূপ ক্রোধ আর কখন করিবে না। সরস কথায়, মিঠা চাহনীতে স্বামীকে ভুলাইয়া, মার্জ্জারের ন্যায় আবার মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণধার নখ লুক্কায়িত রাখিয়া, নরম "সুলা" বাড়াইয়া, গদাধর সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আদায় করিবে।

অতঃপর অতুলানন্দ কয়েক দিন দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এত সোহাগ সে জীবনে কখন ভোগ করেন নাই। এই সময়, সে বহুযত্নে গদাধরের এক সতীর্থের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইল যে, গদাধর যে গ্রামে বাস করে তাহার নাম নাড়িচা, এবং ঐ নাড়িচা গ্রাম, নান্দীপুর নামক গ্রামের পোষ্ট আপিসের অধীনে এবং উহা হুগলি জেলার অন্তর্গত। এ সংবাদ চারুশশী শীঘ্র স্বামীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারিল বটে, কিন্তু সে পত্র লিখিবার সুযোগ শীঘ্র লাভ করিতে পারিল না। যে সোহাগের গাঢ় রসে সে স্বামীকে ভিজাইয়াছিল, তাহাতে সে মধুলিপ্ত মধুমক্ষিকার ন্যায় বিজড়িত হইয়া কয়েক দিন চারুশশীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিল। অতএব চারুশশী পত্র লিখিবার জন্য নির্জ্জন অবসর সহসা লাভ করিতে পারিল না।

অবশেষে, গদাধরের স্বদেশযাত্রার এক মাসেরও অধিক সময় পরে, সে পত্র লিখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পত্র লিখিয়া, উত্তরলাভের প্রত্যাশায় সে পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। সূর্য্য উপাসকগণ, ঊষাস্নান সমাপনান্তে, প্রভাতে অরুণের রক্তমূর্ত্তি দেখিবার জন্য যেমন আগ্রহসহকারে আকাশের পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া থাকে, চারুশশীও ডাকপিয়নের রক্তবর্ণ পাগ্‌ড়িটি অবলোকন করিবার জন্য, তেমনই পথপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া থাকিত। পথপ্রান্তে প্রত্যহ যথা-সময়ে সে রক্ত পাগ্‌ড়ি উদিত হইত বটে, কিন্তু সে চারুশশীকে তাহার ঈপ্সিত রত্ন আনিয়া দিত না। প্রত্যহ সে ঝিকে জিজ্ঞাসা করিত, "ঝি, আমার নামে কোন পত্র আছে কি না, হরকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আয় ত।" ঝি প্রত্যহ ফিরিয়া আসিয়া বলিত, "না, তোমার নামে, কোন পত্র আসে নাই।"

এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তথাপি গদাধরের নিকট হইতে সে সেই আকাঙ্ক্ষিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইতে পারিল না। অবশেষে একদিন স্বামীর মুখে শুনিল যে, গদাধর বাটী হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে। শুনিয়া, উৎফুল্লমুখী স্বামীকে আদর করিয়া কহিল, "এই বার তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া আনিও।"

তাহার পর দিনই অতুলানন্দ গদাধরকে আহ্বান করিয়া কহিল, "এই বার ভাই তোমাকে আর ছাড়িব না; বল, কবে আমাদের বাড়িতে খাইতে যাইবে।"

গদাধর। আপনি যে দিন হুকুম করিবেন, সেই দিনই আপনার বাটীতে যাইয়া অন্নধ্বংস করিয়া আসিব।

অতুল। তাহা হইলে পরশু রবিবার আছে, পরশুই আহার করিতে যাইবে।

গদাধর। পরশু? এত তাড়াতাড়ি কেন? এখনও গঙ্গার ইলিশমাছ উঠে নাই। ইলিশ মাছ উঠুক, তখন একদিন খাইলেই হইবে।

অতুলানন্দ। না, না, ভাই, অত দেরী করিলে হইবে না। আমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা যে, তুমি একদিন আমাদের বাটীতে আহার কর।

গদাধর। বেশ ত। কবে যাইব, তাহা আমি আপনাকে পরে বলিব। আপনার বাড়িতে খাইতে হইলে পেটটি ভাল থাকা চাইত? বাটী হইতে আসিয়া, আপনাদের কলিকাতার লোনা জলে আমার শরীরটা খারাপ হইয়াছে। একটু সারিলেই খাইতে যাইব।

গদাধরকে নিমন্ত্রণ করিতে না পারায় সে দিন সে স্ত্রীর নিকট যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা অতুলানন্দের মনে পড়িল। ভাবিল যে কোনও উপায়েই হউক, তাহাকে তাহাদের বাটীতে আহারে প্রবৃত্ত করিতেই হইবে। বলিল, "ভাই, আগামী রবিবারে তোমার আহার করিতেই হইবে; না হয় হাল্‌কা রকম মাগুর মাছের ঝোল ইত্যাদি প্রস্তুত করা যাইবে।"

এ নিমন্ত্রণ গদাধর কি কৌশলে প্রত্যা-খ্যান করিবে? যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, তাহা সত্য না হইলেও হইতে পারে; তাহা সত্য হইলেও অতুলানন্দের নিকট তাহা কহিবার নহে। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া, কি ভাবিয়া গদাধর কহিল, "যাইব, রবিবারেই আপনাদের বাটীতে খাইব; কিন্তু শুধু মাগুর মাছের ঝোল খাইব না।"

২০

চারুশশী মনে করিয়াছিল যে, শনি-বারের রাত্রি অবসান হইবে না; তথাপি

তাহা অবসিত হইয়াছিল। এবং সেই রবিবার দিনেও অরুণালোকিত সুন্দর প্রভাত অতুলানন্দের গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সে দিন অপর লোকের বাটীতেও প্রভাত উদিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা তাহাতে, চারুশশীর ন্যায়, অরুণালোক বা সৌন্দর্য্য কিছুই দেখে নাই। তাহাদের দুরদৃষ্ট!

বহুবিধ রন্ধনসামগ্রী পূর্ব্বরাত্রে সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া চারুশশী পরম উৎসাহে রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিল।

কোন সময়ে অতুলানন্দ এক মুসলমান জমীদারের বাটীতে কিছু দিনের জন্য কারকুনের পদে নিযুক্ত ছিল। সেই সময়ে, কখন কখন জমীদার সাহেবের এক বাঁদী অতুলানন্দের বাটী আসিয়া, প্রাঙ্গনে, দুই আটি বিচালীর উপর বসিত। চারুশশী তফাতে দাড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "আজ তোমাদের কি রান্না হইয়াছিল?" সে পোলাও, কোপ্তা, কোর্ম্মা, ইত্যাদি নবাবী আহারের গল্প করিত। শুনিয়া, চারুশশীর ইচ্ছা হইল যে, সে এই নবাবী রান্নাগুলা বাঁদীর নিকট হইতে শিখিয়া লয়। এখন কথাটা এই যে, বাঁদী যে সকল রন্ধনের গল্প করিত, তাহার অনেকগুলির আস্বাদই সে জীবনে কখন উপভোগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই; এবং তাহার একটি দ্রব্যও রন্ধন করিবার কৌশল সে অবগত ছিল না। তথাপি সে স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে বলিবে যে, রন্ধনকার্য্যে সে অপারদর্শী। অতএব যখন চারুশশী বাদসাহী পাকপ্রণালী শিক্ষার্থিনী হইয়া, তাহাকে প্রশ্ন করিল, সে তখন সেই দুই আঁটি বিচালির আসনে সমাসীনা থাকিয়া চারুশশীকে বকোওয়ালী বিদ্যায় দীক্ষিতা করিল। এইরূপে নবাবী রান্নায় জ্ঞানলাভ করিয়া, চারুশশী পলান্ন সংযুক্ত ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ভর্ত্তাকে খাইতে দিল। খাইয়া, অতুলানন্দ কহিল, "বাঃ।" তাহার পর অতুলানন্দের দুই জন বন্ধু আসিয়া সেই প্রকার ব্যঞ্জন খাইয়া কহিল "বা হো বাঃ।" ইহার পর চারুশশী বুঝিল যে, এই মর্ত্তধামে পাককার্য্যে সে অদ্বিতীয়া।

আজ সে তাহার সেই বকোওয়ালী বিদ্যা সযত্নে জাহির করিল। চিংড়িমাছের বড়া ভাজায় কিঞ্চিৎ পেঁয়াজ সংযুক্ত করিয়া নবাবী কোপ্তা প্রস্তুত করিল। রশুন ফোড়ন দিয়া মাংসের ডাল্না রাঁধিয়া, কোর্ম্মা প্রস্তুত করিল। মাছের কালিয়াতে অখণ্ড পাটনাই পেঁয়াজ দিয়া, দোপেঁয়াজা পাক করিল। মৎস্যের ঝালে কিছু দুগ্ধ ও ভর্জ্জিত পলাণ্ডু নিক্ষেপ করিয়া দমপোক্তা প্রস্তুত করিল। এইরূপে পেঁয়াজ রশুনের সৌরভে রন্ধনশালা আমোদিত হইয়া উঠিল। এবং চারুশশী একান্তমনে আশা করিল যে, এই নবাবী-রন্ধন আহার করিয়া গদাধর তাহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইবে।

রন্ধনাদি সমাধান্তে, বেশ পরিবর্ত্তন জন্য চারুশশী দ্বিতলে আরোহণ করিল। তথায় এক প্রকার প্রলেপের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তম রূপ মার্জ্জিত করিয়া, সুগন্ধি সাবানের দ্বারা তাহা সযত্নে বিধৌত করিল। তাহার পর কেশ সংস্কার করিয়া, একখানি কুঞ্চিত-প্রান্ত শাটী পরিয়া, এবং কিছু কিছু অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সে নিম্নতলে নামিয়া আসিল। তখন বেলা এগারটা। কিন্তু তখনও সাত রাজার ধন এক মাণিক স্বরূপ অতিথিটি সঙ্গে লইয়া, অতুলানন্দ গৃহে সমাগত হয় নাই। চারুশশী পরিষ্কৃত স্থানে আসন বিস্তৃত করিবার জন্য ঝিকে আজ্ঞা দিয়া, নিজে আহারীয় দ্রব্য সজ্জিত করিবার জন্য [illegible]ায় গেল।

অল্পকাল মধ্যে অতুলানন্দ বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া কহিল, "ও গো, গদাধর আসিয়াছে, আমাদের খাইতে দাও।" চারুশশীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে আপন উদ্বেগ দমন করিয়া কহিল, "বাহিরে কেন? ঠাকুর-পোকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া আইস; আমিত তাহার সহিত কথা কহিয়া থাকি।"

কতদিন পরে, গদাধর আসিয়া, চারুশশীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অমানুষিক বলের আধার সে দীর্ঘ বিশাল কৃষ্ণ দেহ চারুশশীর চক্ষে বিদ্যুৎ-গর্ভ বৈশাখী মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। কে জানে এ কাল মেঘ, এ প্রেমচাতকিনীকে কি আনিয়া দিবে? তাহার উল্লাস-স্ফীত উন্নত উরস কি এ মেঘের কঠিন জ্বালাময় কুলিশ প্রহারে ভগ্ন হইয়া যাইবে? চাতকিনীর হৃদয়ের সমস্ত আশা কি একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে? অথবা তাহার প্রেমতপ্ত যৌবনদীপ্ত পরিমার্জ্জিত দেহতরু শীতল রজতধারায় স্নাত হইয়া শীতলতা প্রাপ্ত হইবে? মেঘ বজ্র হানে, প্রচণ্ড ঝড় আনে, কখন আবার শীতল বারি দানে পৃথিবীকে শীতল করিয়া দেয়। গদাধর-মেঘ চারুশশীকে কি দিবে? বজ্র, ঝঞ্ঝা, না স্নিগ্ধ বারিধারা? চারুশশীর হৃৎপিণ্ড, ক্লক ঘড়ির পেণ্ডুলামের ন্যায়, আশা ও নিরাশার মধ্যে সপন্দে দুলিতে লাগিল।

গদাধরকে দেখিয়া, হাতের চুড়ি বাজাইয়া, চারুশশী বক্ষের বস্ত্র সযত্নে বক্ষের উপর বিন্যস্ত করিল, এবং অপাঙ্গভঙ্গিমায় আপন লাবণ্য-সরস বর দেহ বিলোকন করিয়া কহিল, "ঠাকুর-পো! তুমি দেশ হইতে কবে আসিলে?"

গদাধর। প্রায় পনের ।

চারু। এতদিন আসিয়াছ, একবার কি আমাদের বাটীতে আসিতে নাই? তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি একবারও আমাকে দেখিতে আসিলে না?

গদাধর। কই, আপনি ত আমাকে আহ্বান করেন নাই। এই দেখুন, আপনি ডাকিয়াছেন, আর আমি আসিয়াছি। আজ আমার জন্য আপনি কি রাঁধিয়াছেন।

চারু। কত ভাল ভাল সামগ্রী রাঁধিয়াছি; যখন খাইবে তখন বুঝিতে পারিবে। এমন রান্না তুমি কখনও আগে খাও নাই।

গদাধর। যাহা কখন খাই নাই, তাহা হঠাৎ খাইতে কি ভাল লাগিবে? আচ্ছা দেন খাইয়া দেখি। অতুল বাবু কোথায় গেলেন?

চারু। ও বুঝি উপরে কাপড় ছাড়িতে গিয়াছে। এখনি আসিবে। চল, তোমাদের খাবার দিয়া আসি।

গদাধর ও অতুলানন্দ আহারে বসিল। চারুশশী আপন ললিত বাহুযুগলে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়া, নয়নকোণে মধুর কটাক্ষ পূরিয়া, সরস অধরে সুধা মাখিয়া, পলাণ্ডু-সুবাসিত আহারীয় সামগ্রীসকল পরিবেশন করিল। অসুরদিগকে ছলনা করিবার জন্য যে অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদিগকে সুধা বিভাগ করিয়াছিলেন, সে অপূর্ব্ব-মোহিনী মূর্ত্তি অপেক্ষা অপূর্ব্ব-মূর্ত্তিতে চারুশশী গদাধর-দেবতা ও অতুলানন্দ-অসুরকে সুধাসম নবাবী আহার বিতরণ করিল। আহার করিতে করিতে গদাধর কহিল, "অতুল বাবু, আপনার এ কচুরীগুলি বড় চমৎকার হইয়াছে; আমাকে আরও কয়েক খানা দিবার জন্য বলুন।" কচুরী সম্বন্ধে এ সুখ্যাতিটা চারুশশীকে স্পর্শ করিল না।

কচুরীগুলা, বাড়ির বুড়া চাকর বৌবাজারের হালুই-এর দোকান হইতে লইয়া আসিয়াছিল। চারুশশী কয়েকখানা কচুরী আনিয়া, গদাধরের পাতে দিয়া কহিল, "ঠাকুরপো! এই কচুরী, দোপেঁয়াজার ঝোলে ভিজাইয়া খাও দেখি, বড় ভাল লাগিবে।

গদাধর। থাক্, থাক্। শুধু কচুরীই আমার বেশ লাগিবে। আপনি অতি চমৎকার কচুরী ভাজিয়াছেন।

অতুল। ওহে ভাই! একখানা কচুরী দোঁপেঁয়াজার একটা নরম পেঁয়াজ দিয়া খাও, মজা পাইবে।

গদাধর। পেঁয়াজ খাওয়া এখনও আমার অভ্যাস হয় নাই।

অতুল। বল কি? তুমি পেঁয়াজ খাও না?

চারুশশী। আমার সমস্ত তরকারী যে পেঁয়াজ দিয়া রান্না; তাহা হইলে ঠাকুরপো কি খাইবে?

গদাধর। আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না; কচুরী খাইব, পরমান্ন খাইব, দই খাইব, মিষ্টান্ন খাইব, তাহাতেই আমার উদর পূর্ণ হইবে। পূর্ব্বে অতুল বাবুকে আমার বলা উচিত ছিল যে, আমি পেঁয়াজ খাই না। আমারই দোষে আপনারা বিব্রত হইলেন। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি, আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।

গদাধর ব্যঞ্জন খাইল না বলিয়া কি চারুশশীর কষ্ট হইয়াছিল? না, তাহা হয় নাই। সেত আহার করিবার জন্য গদাধরকে আহ্বান করে নাই। আহারে তাহাকে নিমন্ত্রণ করা ছলমাত্র। এই ছলে তাহাকে গৃহে আনিয়া, সে ইচ্ছা করিয়াছিল যে, সুযোগমত তাহার কদর্য্য বাসনা পূর্ণ করিবে। গদাধরকে সু-আহারে বশীভূত করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা যখন ঘটিল না, তখন চারুশশী অন্য উপায় অবলম্বন করিবে। নূতন ফাঁদ পাতিয়া, তাহার প্রাণ-পক্ষীকে ধরিয়া হৃদয়-পিঞ্জরে পুরিবে।

আহারাদির পর, গদাধরকে তাহার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, অতুলানন্দ বিশ্রাম লাভ জন্য দ্বিতলে আপন শয্যা-গৃহে যাইয়া শয়ন করিল। গদাধর বহির্বাটীর কুঠারিতে যাইয়া বসিল।

চারুশশী,—আমাদের বলিতে লজ্জা হয়, গদাধরের এবং স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট সামগ্রী একত্র করিয়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে, সে ঝিকে ডাকিয়া বুড়া চাকরের অনুসন্ধান করিল। ঝি কহিল, 'সে গঙ্গাস্নানে গিয়াছে।' চারুশশী কহিল, 'ও মা! আমাকে বলিয়া গেল না? ঘরে যে এক ছটাক গঙ্গাজল নাই; এক কলসী গঙ্গাজল আনিতে দিতাম। তুই সকাল বেলা হইতে খাটিয়া মরিতেছিস্; তোকে আর কোন্ লজ্জায় গঙ্গাজল আনিতে পাঠাইব; কিন্তু গঙ্গাজল না হইলেও নয়; একটুও নাই; ঘরে একটু গঙ্গাজল না থাকলে বাছা, আচার-বিচার হয় না।" ব্রাহ্মণের কন্যা, পলাণ্ডু ভক্ষণ করিতে করিতে যে আচার-বিচারের কথা কহিল, ঝি তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিনা, তাহার সংবাদ আমরা রাখি না। কিন্তু সে পিতলের কলসীটি কাঁখে লইয়া, গামছাটি স্কন্ধে ঝুলাইয়া বলিল, "তাহা হইলে আমি জল আনিতে চলিলাম, তুমি আসিয়া সদর দরজা বন্ধ কর।"

চারুশশীর আহার সমাপ্ত হইয়াছিল। সে ঝির পশ্চাৎ যাইয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিল। তাহার পর উপরে উঠিয়া দেখিল[redacted]হার স্বামী নিদ্রাভিভূত হইয়া

রাগরাগিণীসংবলিত নাসিকা-ধ্বনি করিতেছে। সে কম্পিতহস্তে, বাহির হইতে স্বামীর কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল। এ কম্পন কেন? যদি সুযোগ ঘটিয়াছে, তবে তাহা কি চারুশশী হারাইবে? কিসের ভয়? কেহ ত দেখিবে না। বাটীতে কেহ নাই। স্বামীও কক্ষমধ্যে রুদ্ধ হইয়া মৃতবৎ নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। তবে কাহাকে ভয়? তবে এ কম্পন কেন? স্বামীর কক্ষ-দ্বার বন্ধ করিতে তাহার বাহুদ্বয় কেন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল? সোপানসকল অধিরোহণকালে তাহার বেপথুমান উরুদ্বয় কেন গুরুভারে বিজড়িত হইয়া পড়িল? বহু কষ্টে নিম্নে নামিয়া সে ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মধ্যাহ্নে সূর্য্যসংবলিত নীল আকাশ যেন জ্বলন্ত পিঙ্গল তারাসংবলিত এক বিরাট্ নির্নিমেষ লোচনের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কি ভয়ঙ্কর! তাহার পদনখরপ্রান্ত হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। দেহমধ্যস্থ শিরাসকলে শোণিত-স্রোত বন্ধ হইয়া গেল।

তথাপি পাপীয়সী কাঁপিতে কাঁপিতে বর্হির্বাটীর কক্ষ দ্বারে গদাধরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লজ্জাহীনা যুবতী যৌবনের যাবতীয় প্রলোভন দেহতটে প্রকটিত করিয়া, প্রমত্ত মনের সমস্ত আকর্ষণ ফণিনীর ফণার ন্যায় বিস্তার করিয়া, অপরিণতচিত্ত যুবক গদাধরের লোচনাগ্রভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। গদাধর প্রমত্তার যৌবনদীপ্ত প্রকম্পিত অবয়ব অবলোকন করিল। বিলাস-লালসাময় ক্ষুদ্র ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের বিন্যাস দেখিল। স্মর-শরাসন তুল্য ভ্রূতে শ্লক্ষ্ণ বিভ্রম বিলোকন করিল। তাহার বিহ্বল বিকচ কটাক্ষের সুতীব্র তীব্রতা অনুভব করিল। [illegible] রুচির কপোলে যৌবনের উল্লাস-রাগ অবলোকন করিল। সে বিকশিত রক্তাধরে [illegible] চুম্বন-লালসা পরিস্ফুট দেখিল। [illegible] ক্ষণেকের জন্য গদাধর আত্মহারা হইয়া গেল। একবার তাহার মনে হইল যে, চারুশশীর সুগোল বাহু দু'টিতে লাবণ্যের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু যে সতর্ক প্রহরী চিরদিন দিবারাত্র অনিদ্র থাকিয়া আমাদিগের হৃদয়মধ্যে রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি যথাসময়ে আত্মহারা গদাধরকে সুপথ দেখাইয়া দিলেন। আপনার ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্য লজ্জিত হইয়া গদাধর আপনাকে সত্বর সংযত করিল। হৃদয়কে সম্যক্ শাসিত করিয়া সে চারুশশীর সহিত কথা কহিল।

২১

গদাধর। অতুল বাবু কোথায়?

চারুশশী। সে উপরে আছে;—ঘুমাইতেছে।

গদাধর। তাঁহাকে ডাকিয়া দিন, আমার যাইবার সময় হইয়াছে।

চারুশশী। এখনই কেন যাইবে? একটু থাকিলে কি তোমার ক্ষতি হইবে?

গদাধর। এখানে যদি কিছু আবশ্যক থাকিত, তাহা হইলে থাকিতাম। অকারণ কিরূপে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? তাহা অপেক্ষা বাটী যাইয়া পড়া-শুনা করিলে ভাল হয়।

চারুশশী। পড়াশুনা ত চিরদিন করিতেছ, একদিন তাহা বন্ধ রাখিলে ক্ষতি কি? আর, এখানে তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে কেন? কথা কহিতে জানিলে কি চুপ করিয়া থাকিতে হয়? এই আমি তোমার কাছে বসিতেছি; তুমি বসিয়া বসিয়া আমার সহিত গল্প কর।

গদাধর। না, না, আমি যাই।

চারুশশী। তোমাকে যদি ধরিয়া রাখি, যদি যাইতে না দিই, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? আমার কথা শোন, যাইও না। একটু বস। একটু গল্প কর। তোমার কথা শুনিতে আমি ভালবাসি; বসিয়া একটু কথা কও। ইহাতে তোমার বা তোমার পড়া-শুনার কিছুই অনিষ্ট হইবে না। তবু উঠিতেছ? ছি! ছি! তুমি কি নিষ্ঠুর! তোমার মনে একটুও দয়া নাই।

গদাধর। কেন আপনি আমাকে এরূপ কথা কহিতেছেন?

চারুশশী। কেন কহিতেছি তাহা কি তুমি জান না? কেন? তোমাকে ত আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রে ত আমি সকল কথা জানাইয়াছিলাম।

গদাধর। পত্র? আপনি কি আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন?

চারুশশী। সে পত্রের তুমি উত্তর দাও নাই কেন? আমি স্ত্রীলোক হইয়া লজ্জা-ত্যাগ করিয়া, তোমাকে পত্র লিখিলাম; আর, তুমি পাষাণ, তাহার উত্তর দিলে না?

গদাধর। লজ্জা আপনাদিগের উৎকৃষ্ট ভূষণ, এ উৎকৃষ্ট ভূষণ কেন আপনি ত্যাগ করিয়াছিলেন? আপনার নাম কি চারু?

চারুশশী। হাঁ, আমার নাম চারুশশী। আগে কি তুমি আমার নাম জানিতে না?

গদাধর। না, আমি আপনার নাম আগে কখনও শুনি নাই। আমি আগে বুঝিতে পারি নাই যে, সে পত্রখানা আপনি লিখিয়াছিলেন।

চারুশশী। বুঝিতে পারিলে কি সে পত্রের উত্তর দিতে?

গদাধর। না, আমি কখনই সে পত্রের উত্তর দিতাম না। কেন আপনি সেরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন?

চারুশশী। কেন লিখিয়াছিলাম? শুনিবে, কেন লিখিয়াছিলাম? তোমাকে ভালবাসি বলিয়া লিখিয়াছিলাম। তোমাকে দেখিবার জন্য মন অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছিলাম। না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়া লিখিয়াছিলাম।

গদাধর। ছি! ছি!

চারুশশী। হায়! হায়! কেন তুমি আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? এ দেহমধ্যে যে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, তাহা পান করিয়া লও। যে যৌবন-লাবণ্যের ডালি তোমার পায়ের তলায় বিতরণ করিতে আসিয়াছি, তাহা পরম যত্নের সামগ্রী, তাহা ফেলিয়া দিও না। কেন? আমার কি রূপ নাই? এ রূপের কি মাধুরী নাই? এ মাধুরীতে কি মধুরতা নাই? কেন তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে না? এত সাধনাতেও কেন তোমার মনে দয়া হইবে না?

গদাধর। ছি! ছি! ইহাত ভালবাসা নয়। আপনি যদি আমাকে ভালবাসিতেন, তাহা হইলে কি আমাকে এই ঘৃণ্য নরকের পথ দেখাইয়া দিতেন? ভঙ্গুর, জড় দেহের আশু বিনশ্বমান রূপ, অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; আমাকে ভালবাসিয়া, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন দ্রব্য আমাকে দিবার সামর্থ্য কি আপনার নাই?

চারুশশী। কি চাই বল? আমার যাহা আছে, সব দিব। তুমি কেবলমাত্র একবার আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাও; কেবলমাত্র একবার আমাকে তোমার প্রশস্ত বক্ষে স্থান দিয়া বল যে আমাকে তুমি ভালবাস।

গদাধর। আপনি ও সব কথা আর বলিবেন না। যাহা অকথ্য, তাহা কহিয়া আপনার মুখকে কলঙ্কিত করিবেন না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে যে বাক্‌শক্তি আমরা

পাইয়াছি, তাঁহারই আশীর্ব্বাদে তাহা যেন চিরদিন পবিত্র থাকে। যে মুখ ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে, কিরূপে তাহা হৃদয়ের কলঙ্কিত বাসনা ব্যক্ত করিবে? যে মুখ তাঁহার দেওয়া পবিত্র আহার গ্রহণ করে, তাহা কিরূপে জঘন্য পাপ উদ্গীরণ করিবে?

চারুশশী। ঠাকুরপো! তুমি আমাকে কলঙ্কের ভয় দেখাইও না। তোমার জন্য আমি কলঙ্কের ডালি মাথায় করিব। পৃথিবীর লোক আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিবে, "দেখ এই কলঙ্কিনী কুলত্যাগ করিয়াছে।" আমি দুই বাহুর দ্বারা তোমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিব, "দেখ কলঙ্কিনী আমি কুলত্যাগ করিয়া কি রত্ন লাভ করিয়াছি। আমি সত্য কহিতেছি, তোমার জন্য আমি সহস্রবার কলঙ্কের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার চরণে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, তুমি একবার আমাকে বক্ষে গ্রহণ কর। একবার আমার শ্রবণমূলে মুখ আনিয়া বল যে, তুমি আমাকে ভালবাস।

গদাধর। আপনার কি নরকেরও ভয় নাই?

চারুশশী। নরক? তুমি নরকের কথা কহিতেছ? জানি না, নরকে কি এমন যন্ত্রণা আছে, যাহা তোমার বক্ষঃস্পর্শে উপশম হইবার নহে। তোমার স্নিগ্ধ বক্ষে, যখন অসহ্য সুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিব, তখন নরকের তপ্ত জ্বালাও আমি ভুলিতে পারিব। নরক? তুমি নরকের কথা কহিতেছ? তুমি একদিন আমাকে গ্রহণ কর, তাহার পর, আমি চিরদিন অম্লানবদনে তোমার নরকের সমস্ত জ্বালা সহ্য করিব।

গদাধর। আমি যাই।

চারুশশী। কোথায় যাইবে? আমি যাইতে দিব না। এই আমি তোমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলাম। কিরূপে যাইবে?

গদাধর। না, না, আপনি পথ ছাড়িয়া দিন। আপনি জানেন না যে, কি ভয়ানক অধর্ম্মাচরণে আপনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একদিন ইহার জন্য আপনার অনুতাপ আসিবে। আমি মিনতি করিতেছি, আপনি আপনার মনকে সংযত করুন। যে স্বামী আপনার প্রতি অনুরক্ত, যিনি সুরূপ, তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী হউন। ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।

চারুশশী। আমি মঙ্গল চাহি না—তোমাকে চাই। বল, তুমি আমাকে ভালবাসিবে?

গদাধর। হায়! কে আমি? কি আমি যে আমার জন্য আপনি অত্যন্ত অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন? কে আমি যে আমার জন্য আপনি কলঙ্কের ডালি মাথায় করিবেন, নরকের বিকট যন্ত্রণা উপভোগ করিবেন? কে আমি যে আমার জন্য আপন স্বামীর পুণ্যাশ্রয়, পবিত্র স্নেহ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? আমার এই কদর্য্য বিকট দেহের দিকে চাহিয়া দেখুন, ইহাতে কি আছে যে ইহার জন্য আপনি সতীত্বের গৌরবমণ্ডিত মহিমাশিখর হইতে নামিয়া, এক পাপ দুর্গন্ধময় পঙ্কিল নিরয় লাভের জন্য অভিলাষী হইয়াছেন? আমার এই দীন দারিদ্র্যের মধ্যে আপনি সংসারের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, পরম নিন্দার পথে বিচরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? ছি! ছি! এখনও সময় আছে। আমি বলিতেছি, আপনি ফিরিয়া যান, ফিরিয়া যান। যাইয়া আপনার মহিমা-শিখরে বসিয়া, মস্তকে সতীত্বের উজ্জ্বল কিরীট ধারণ করিয়া, দেবতার ন্যায় পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পূজা গ্রহণ করুন।

চারুশশী। আমি কিছুই চাহি না, কেবল তোমাকে চাই।

গদাধর। আমাকে চা'ন? তবে এদিকে আসুন।

দ্বারাবরোধ ছাড়িয়া, আত্মহারা চারুশশী গদাধরের দিকে প্রধাবিতা হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে, মহাবেগে গদাধর দ্বারপথে বাহির হইয়া গেল। পরাভূতা পাপিনী, ক্ষোভে, তাপে অশ্রুজলে বিজড়িতা হইয়া, করিপদ-বিদলিতা পদ্মিনীর ন্যায়, কক্ষতলে বিলুণ্ঠিতা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

জাহাঙ্গীরের আত্ম-কাহিনী।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের কথোপকথন।

হিন্দুসমাজে ধর্ম্মপ্রচারক বা পণ্ডিত নামে অভিহিত কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন লইয়া এক দিন আমার বিচার করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। হিন্দুগণ ভগবানের সত্তা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক তাহাদের পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি নিরাকার, যাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি বা বিনাশ নাই; যিনি পরিমাণের অতীত, স্থূল হইতেও স্থূলতম এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, যিনি আমাদের বুদ্ধির অগম্য এবং চিন্তার বহির্ভূত, আমরা অমূলক অসম্পূর্ণ কল্পনা-মার্গের বশীভূত হইয়া সেই মহাপুরুষের অনন্ত অচিন্তনীয় রূপকে কি করিয়া সামান্য মূর্ত্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া থাকি? ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে? ইহা কেবল আমাদের মনুষ্য-বুদ্ধির অজ্ঞতার পরিচয়মাত্র। আপনারা বলেন যে, এই সমস্ত মূর্ত্তিতে আপনারা প্রাণদান করিয়া ঐশ্বরিক শক্তি প্রদান করেন, কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কারণ ঐশী শক্তি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে অনুস্যূত হয়, এই দৈববাণী ইজরায়েলের ধর্ম্মপ্রচারক মোজেস্ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে প্রচার করিয়াছিলেন। আপনারা অন্য একটী যুক্তি দ্বারা আপাদের মতের সমর্থন করিতে পারেন; তাহা এই যে, ঈশ্বরের গুণের সাদৃশ্য লইয়া আপনারা এই সমস্ত মূর্ত্তি অঙ্কিত বা গঠিত করেন; কিন্তু ইহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহার অনুরূপ বা সদৃশ হইতে পারে, কারণ তিনি রূপের অতীত ও উপমারহিত। ইহা যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজে যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহাদের অসাধারণ এবং অলৌকিক ক্ষমতা-বলে লোকসমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও ঈশ্বরের অনুরূপত্ব লাভ করিতে পারিতেন। হে পণ্ডিতমণ্ডলি! আপনারা যদি এই সমস্ত মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের অনুরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা বা অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে আপনারা অতিশয় ভ্রমে পতিত হইবেন, কারণ একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আমরা কাহাকেও

* Autobiography of Emperor Jahangir নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

পূজা বা অর্চ্চনা করিব না। তাঁহার সদৃশ বা তাঁহার সমকক্ষ পুরুষ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এইরূপ মীমংসার পর সুধীবৃন্দ স্বীকার করিলেন যে, ইহা তাঁহাদের মানসিক প্রবৃত্তির দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র এবং তাঁহাদের যুক্তির সকল ভিত্তি শূন্য ও গুরুত্ববিহীন। তথাপি তাঁহারা যে পৌত্তলিকতার পক্ষপাতী, ইহার প্রধান কারণ এই, মূর্ত্তি ব্যতীত কখনও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরধ্যানে মনকে সম্যক্‌রূপে তাঁহারা মগ্ন করিতে পারেন না।

আকবরের কবিত্বশক্তি।

এই সমস্ত পণ্ডিতের সহিত আমার পিতা আকবর নানাবিধ প্রসঙ্গ লইয়া কথোপকথন করিতেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু পণ্ডিতগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার যে কোনরূপ বিশেষ লাভ হইয়ছিল তাহা নহে; কিন্তু বিদ্বজ্জনের সহবাসে সুন্দরভাবে গদ্য বা পদ্য লিখিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। সাধারণ লোকে তাঁহাকে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বলিত।

আকবরের আকৃতি ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব।

আমার পিতা দীর্ঘকায় ছিলেন, তাঁহার গাত্রের বর্ণ পক্ক গোধূমের ন্যায় ঈষৎ লোহিতাভ, তাঁহার চক্ষু কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং ভ্রূযুগল পরস্পর মিলিত হইয়া যেন ভ্রমরকেও নিন্দা করিত। তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে অতিশয় কোমল বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু তিনি সিংহের ন্যায় তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন। কারণ তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল এবং আজানুলম্বিত বাহু বীরত্বের পরিচায়ক। ফলতঃ তাঁহার আকৃতি সর্ব্বপ্রকারে মনোহর ও নয়নের প্রীতিদায়ক ছিল। তাঁহার নাসিকাগ্রস্থিত কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন দেখিয়া সামুদ্রিকবিদ্যাবিশারদেরা তাঁহাকে অতিশয় ভাগ্যবান্ বলিত প্রকৃত পক্ষে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যেন তাঁহার করতলগত হইয়াছিলেন; কারণ আমার পিতা ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহই এই সমগ্র হিন্দুস্থানে নির্ব্বিবাদে বিজিত শক্রমধ্যে যাবৎ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই।

আকবরের অর্থরাশি—আগ্রার ধনাগার।

একদিন বাদশা আকবর তাঁহার কোষাধ্যক্ষ কিলিজ্ খাঁকে রাজকীয় কোষাগারে কত পরিমাণ সুবর্ণ সঞ্চিত আছে, তাহা পরিমাণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। কোষাধ্যক্ষ সর্ব্বপ্রথমে আগ্রার ধনাগারে সঞ্চিত অর্থরাশি গণনা করিতে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই অসীম অর্থরাশি একজন ব্যক্তির দ্বারা গণনা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কিলিজ খাঁ সহরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে আটশত তুলাদণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্র ধরিয়া পাঁচ মাস কাল কার্য্য করিবার পর আমার পিতা জানিতে চাহিলেন যে, কত মণ সুবর্ণ তথায় সঞ্চিত আছে। তদুত্তরে কোষাধ্যক্ষ নিবেদন করিলেন, "জাঁহাপনা! সহস্র ব্যক্তি পাঁচমাস ধরিয়া আটশত তুলাদণ্ডের সাহায্যে দিবারাত্র অর্থরাশি ওজন করিতেছে, তথাপি একটী কোষাগারের অর্থের পরিমাণও শেষ হয় নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতা আদেশ করিয়া পাঠাইলেন, "যতদূর হইয়াছে তাহাই ভাল, আর কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না; তোমরা পূর্ব্ববৎ অবস্থায় সেই সমস্ত অর্থরাশি রাখিয়া ফিরিয়া আইস"। ইহা দ্বারা অনুমান করিতে পারা যায় যে, বাদশা আকবরের রাজত্বকালে দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে কত অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই ইহার ইতিবৃত্ত নির্ণয় করা সুকঠিন।

আকবরের হস্তিশালা।

তাঁহার হস্তিশালাতে এত অধিকসংখ্যক হস্তী ও হস্তিনীর একত্র সমাবেশ ছিল যে পৃথিবীর কোন রাজার পুরাবৃত্তে তাহার তুলনা দেখা যায় না এবং ভবিষ্যতে কোন রাজা যে এরূপ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহজনক। তাঁহার হস্তিশালায় দ্বাদশ সহস্র হস্তী ও বিংশ সহস্র হস্তিনী ছিল।

মৃগয়ার জন্য রক্ষিত জন্তু।

তাঁহার শীকারের উপযোগী নানাবিধ জন্তু ও পক্ষী রক্ষিত করা হইত। তাহাদেরও সংখ্যা গণনার বহির্ভূত। দ্বাদশ সহস্র এক চক্ষু বিশিষ্ট হরিণ এবং পাহাড়ীয় মেষ গণ্ডার, অষ্ট্রীচ, ইলাটিডেরিয়াই (Eloute-derriai) নামক জন্তুতে আর দ্বাদশ সহস্র।

সঞ্চিত রাজপরিচ্ছদাদি।

পিতা যে সমস্ত হস্তী রাখিয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমি যুদ্ধোপযোগী হস্তিসকল ও নিজ ব্যবহারের জন্য অল্পসংখ্যক রাখিয়া সমস্তই বিদায় করিয়া দিয়াছি। তিনি এরূপ বহুমূল্য রাজোচিত পরিচ্ছদ, বসন ভূষণ ও আসবাব সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, দুর্দ্দমনীয়, পৃথিবী-জয়ী তৈমুরলঙ্গও তাহার দশমাংশ ভাগ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার উদাহরণ অনুকরণীয়; তিনি গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের শেষপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তিনি সর্ব্বদাই উচ্চ আশা হৃদয়ে পরিপোষণ করিতেন এবং ইহাকে ফলবতী করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্য বিজয়-লক্ষ্মী তাঁহার উন্নত শিরোদেশকে অক্ষয় কিরীটদ্বারা শোভিত করিয়াছিলেন।

আকবরের সন্তানসন্ততি।

তাঁহার বিংশতি বর্ষ বয়সে বিবি পাঙ্গারির গর্ভে ফতিমা বানু বেগম নামে এক কন্যা জন্মে, কিন্তু এক বৎসর বয়সে বালিকাটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিবি আরামবক্সের গর্ভে হোসেন ও হোসেনি নামে দুই পুত্র জন্মে। হোসেনির লালনপালনের ভার আসফ খাঁর জননী বিরেজী বেগমের হস্তে সমর্পণ করেন, কিন্তু বালকটী অষ্টাদশ দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনি অপরটীকে জেনিখান্ খোকার হস্তে প্রদান করেন। এই বালকটীও দশম দিবসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পরে সেলিমা বেগমের গর্ভে এক কন্যা জন্মে, তাহার সাহাজাদা খোনাম এই নাম করণ হয়। ভগ্নীগণের মধ্যে আমার প্রতি তাঁহার অভেদ্য ভালবাসা ছিল এবং আমার উন্নতির জন্য তিনি স্বতঃই যত্নবতী ছিলেন।

তৎপরে খেরা বিবির গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। পিতা আদর করিয়া তাঁহাকে পাহাড়ি বলিয়া ডাকিতেন, কারণ ফটাহাপুরের পর্ব্বত মধ্যে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম সুলতান মুরাদ। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর, পিতা ইহাঁকে সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার হস্তে নর্ম্মদার দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত যাবতীয় গিরিদুর্গ অধিকারের ভার ন্যস্ত করেন। সুলতান মুরাদ অকুতোসাহসে দুর্দ্দম্য পার্ব্বত্য রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া অভেদ্য দুর্গসকল অধিকারপূর্ব্বক মোগল-গৌরব অক্ষুন্ন রাখেন। পরিশেষে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

সুলতান মুরাদ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠকায় ও নাতিদীর্ঘাকার ছিলেন। ধীরতা, নম্রতা ও দূরদর্শিতা তাঁহার চরিত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ভয় কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তাঁহার বিচারশীলতার

গুণের জন্য পিতা তাঁহাকে গৃহনির্ম্মাণ ও কর্ম্মচারীদের উপর নেতৃত্বভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

মিতি বেগম।

ইহার অব্যবহিত পরেই মেহের সিমার গর্ভে আমার পিতার এক কন্যা জন্মে। তিনি তাহাকে মিতি বেগম বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় মিতি শব্দের অর্থ মিষ্ট। মিতি অষ্টম মাসে উপনীত হইতে না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পর বিবি মেরিয়মের গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মে এবং এই পুত্রকে রাজা বহার মলের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেন।

সাহাজাদা ডেনিয়েল।

সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর পিতা দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের ভার তদীয় অন্যতম পুত্র সাহাজাদা ডেনিয়েলের হস্তে অর্পণ করেন। পিতা বারহামপুরে উপস্থিত হইলে পর সুলতান্ ডেনিয়েল খান্ খানান্ ও অন্যান্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রধান প্রধান সৈন্য-দলের সহিত আমেদ নগরাভিমুখে অগ্রসর হন। এই সময়েই আমেদনগর দুর্গ মোগল হস্তে পতিত হয়। পিতা আকবর সুলতান ডেনিয়েলকে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া আগ্রাভিমুখে যাত্রা করেন। ডেনিয়েলও ত্রিশ বৎসর বয়সে বারহামপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অধিক সুরা তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণ।

ডেনিয়েলের মৃগয়াসক্তি।

ডেনিয়েল অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তিনি শীকারে বড় আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার একটি বন্দুক ছিল, তাহাকে তিনি জেনোজা * বলিতেন। ইহার উপরে পশ্চাল্লিখিত মর্ম্মে একটী কবিতা লেখা ছিল—

"হে অস্ত্র! তোমার দ্বারা আমি কতই আনন্দ উপভোগ করি, যাহার প্রতি তোমায় নিক্ষেপ করি, সে জীবনশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎভূমিতে লুটাইতে থাকে।

তাঁহার পানাসক্তি নিবারণার্থে আকবরের আদেশ।

ডেনিয়েলের পানাসক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া খান্ খানের পরামর্শানুসারে এই আদেশ প্রচারিত হইল যে, সুলতান ডেনিয়েলকে অতঃপর সুরা সরবরাহ করা হইবে না এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে এতদ্বিষয়ে সাহায্য করিবেন, তাঁহাকে রাজাজ্ঞানুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। এই ভীষণ আজ্ঞায় ভীত হইয়া সুলতানের বন্ধুবর্গ "সুরা" শব্দ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর, ডেনিয়েলের পক্ষে জীবন যেন ভার বোধ হইতে লাগিল। কারণ যে ব্যক্তি এত দিন অতিশয় মাত্রায় সুরাপান করিয়া আসিয়াছেন, একবারে তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব। ডেনিয়েল অতি কাতরস্বরে ও সাশ্রুলোচনে মুরশিদকুলী নামক একজন গোলন্দাজকে বলিলেন, "দেখ, তুমি যদি কোন উপায়ে সামান্য পরিমাণে সুরা আনিয়া আমার জীবন রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার পদোন্নত করিয়া দিব"। নীচাশয় মুরশিদকুলী সামান্য পদোন্নতির আশায় এই ঘৃণিত কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহাজাদা! কি উপায়ে সুরা আনিব আজ্ঞা করুন—কেহ জানিতে পারিলে আমার জীবন সংশয় হইবে"। সুলতান বলিলেন, "মুরশিদ কুলি! আজ তুমি আমার জীবন দান কর। এই বন্দুকের নলের ভিতর করিয়া যদি সুরা লইয়া আইস, তাহা হইলে কেহই তোমাকে সন্দেহ করি-

* জেনোজা শব্দের অর্থ শবযাত্রী শকট, এখানে মৃত্যুবাণ।

বেক না। এইরূপে দুই তিনবার আনিতে পারিলেই আমার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবে।" মুরসিদকুলী তাহাই করিল। সে কি অশুভ-ক্ষণেই বন্দুকের মধ্যে সুরা আনিয়াছিল। যে আগ্নেয়াস্ত্র অসংখ্য জীবের প্রাণনাশ করিয়া সাহাজাদার মনস্তুষ্টি করিয়াছিল এবং যে অস্ত্রকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন, আজ সেই ভীষণ অনল-উদ্গারী অস্ত্র কি ভয়ানক হলাহল উদ্গীরণ করিল! সাহাজাদা অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। মুরশীদ কুলী আসিবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে সুরাপরিপূর্ণ বন্দুক হাতে তুলিয়া লইলেন। একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না, তাঁহার প্রিয় অস্ত্র অজ্ঞাতভাবে আজ তাঁহার প্রাণ লইতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি সুরাপান করিবামাত্র নিশ্চল হইয়া পড়িলেন, শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে প্রাণবায়ু সাহাজাদার দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ডেনিয়েলের অন্যান্য আসক্তি।

ডেনিয়েল যেরূপ সুরাসেবী ছিলেন, তদ্রূপ উৎকৃষ্ট ভোজনে তাঁহার অতিশয় আসক্তি ছিল। তিনি অত্যন্ত হস্তিপ্রিয় ছিলেন. সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হস্তিসকল লইয়া তিনি একটী বিভাগ গঠিত করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার সামন্তগণের মধ্যে কেহ কোন বৃহদাকার ও সুশিক্ষিত হস্তী দেখিলে প্রচুর অর্থব্যয়ে ডেনিয়েলের জন্য তাহা ক্রয় করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং নিজে হিন্দি পদ্যসকল সুললিতস্বরে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

লালা বেগম ও আরাম বান বেগম।

মৌন্ বিবির লালা বেগম নাম্নী এক কন্যা হয়, কিন্তু অষ্টাদশ মাস উত্তীর্ণ হইতেই শিশু কন্যাটি মরিয়া যায়। তার পর বিবি দৌলৎসার আরামবান্ বেগম নাম্নী এক কন্যা হয়। পিতা এই কন্যাটীকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং আমাকে বলিতেন যেন তাঁহার মৃত্যুর পর আমি তাহাকে সমান ভাবে ভালবাসি ও যত্ন করি।

আকবরের উৎকৃষ্ট ভোজনে আসক্তি।

তিনি উৎকৃষ্ট ভোজন করিতে ভালবাসিতেন এবং উত্তম ক্ষুধাকে জীবনের পরম সুখ বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

আকবরের ধর্ম্মপ্রবণতা।

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সর্ব্বদর্শী ক্ষমতাতে তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার অপরিমেয় শিক্ষিত সৈন্য, অসীম রাজস্ব, অগাধ ধনরাশি, অতুল গৌরব এবং সিংহ-সদৃশ বিক্রম থাকিলেও তিনি কখনও স্বীয় ক্ষমতাতে ক্ষণকালের জন্যও নির্ভর করিতেন না, পরন্তু প্রত্যেক কার্য্যেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। তিনি সকল সময়ে নিম্নলিখিত ভাবের কবিতাটী বলিতেন ;—

সর্ব্ব ঘটে, সর্ব্ব জীবে, আছ অধিষ্ঠান,
মূঢ় মোরা তাই তব পাই না সন্ধান।
কেবা জানে কোথা হ'তে, কর আশীর্ব্বাদ ;
রক্ষা কর ওহে বিভোঃ ঘুচাও বিষাদ।
কার কর্ম্ম কেবা করে কিছু ত জানি না ;
যা করাও করি আমি ভুলিয়ে আপনা।

তাঁহার চরিত্রে আরও একটী বিশেষ সদ্গুণ ছিল। তিনি জাতিগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য উপেক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মহৎ ব্যক্তিগণের সহিত সদালাপে পরম পরিতুষ্ট হইতেন। এই কারণেই তাঁহার নিকট হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সকলেই সমভাবে আদৃত হইতেন তিনি তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া তন্মধ্য হইতে আবশ্যক বিষয়টী গ্রহণ করিতেন।

ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে ক্রমশঃই ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এমন কি তিনি এই সমস্ত সাধু প্রসঙ্গে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়াও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে কালযাপন করা রাজধর্ম্মের পক্ষে গর্হিতাচরণ মনে করিতেন। সমস্ত দিবা ও রজনীর মধ্যে কেবল মাত্র এক প্রহর কাল বিশ্রাম করিয়া তিনি শান্তিলাভ করিতেন।

আকবরের সাহসিকতা।

একাধারে এত গুণের সমাবেশ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি অন্যান্য সৎগুণে বিভূষিত হইলেও নির্ভীকতা ও সাহসিকতা তাঁহার চরিত্রকে অধিক প্রশংসনীয় করিয়াছিল। এতদ্বিষয়ে কয়েকটী কিংবদন্তী আছে। তিনি প্রায়ই করিণীপৃষ্ঠ হইতে উচ্ছৃঙ্খল মদমত্ত করিপৃষ্ঠে লম্ফ প্রদান করিয়া মাহুতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কখনও যদি কোন হস্তী কোন কারণবশতঃ দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়িত এবং মাহুতের কর্ত্তৃত্ব ভ্রূক্ষেপ না করিত, তবে তিনি সেই উন্মত্ত হস্তীকে এরূপ অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা মুগ্ধ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইতেন যে, সেই হস্তী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইত।

আকবরের শারীরিক ক্ষমতা।

তিনি যেরূপ সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন, তাঁহার শারীরিক ক্ষমতাও তদ্রূপ ছিল, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে দশ মন ওজনের এক খণ্ড লৌহ-শৃঙ্খল লইয়া এরূপ ক্ষিপ্রতা-সহকারে নানাবিধ ব্যায়াম করিতেন যে, সকলে তাঁহার এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

ক্রমশঃ

পঞ্জিকা-তত্ত্ব-বিবেক।

বোম্বাই পঞ্চাঙ্গশোধন মহাসভার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়াতে সকল লোকেই বুঝিয়াছেন যে, সূক্ষ্ম গণনা দ্বারাই পঞ্জিকালিখিত কালের নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্রের ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভারতের সকল দেশ হইতেই উক্ত সভায় সমাদরে আহূত হইয়াছিলেন। ইংরাজী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অধিকারী মহোদয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। সার্দ্ধশত (১৫০) সুবিজ্ঞ পণ্ডিত সমবেত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম শাস্ত্রের অবিরোধে বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম গণিতের আশ্রয়ে পঞ্জিকা রচনা করিতে হইবে, স্থির করিয়াছেন। ঈদৃশ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজের বাগ্‌জাল বিস্তার করা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা মাত্র। ফলতঃ সকলেই এক প্রকার নিঃসংশয় হইয়াছেন। কেবল মাত্র হাট খোলার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটী সিদ্ধান্তভূষণ উপাধি ধারণপূর্ব্বক নিজের জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিজ্ঞতা ছড়াইতেছেন। তাঁহার দুই তিনটী কথায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রকৃত বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "অতি প্রাচীন সময় হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্রে মন্দ ফল ভিন্ন অন্য কোনও আকর্ষণপ্রসূত সংস্কার দৃষ্ট হয় না।"

ইহাদ্বারা নিঃসংশয়ে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের জ্ঞান এইরূপ যে "মন্দ ফল আকর্ষণেই উৎপন্ন হয়" কিন্তু যিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিত, মন্দফল

কেন উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে যাঁহার অনুসন্ধান আছে, তিনি কখনই বলিলেন না যে, মন্দফল কোন গ্রহের বা পৃথিবীর, বা কাহারও আর্কষণে উৎপন্ন হয়। মন্দ ফল আকর্ষণ-প্রসূত ইহা শুনিয়া ইউরোপীয় জ্যোতি-র্ব্বিদ্যাভিমানীরাও হাস্য করিবেন। সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শীও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনায়াসেই লিখিলেন। "মন্দফল ব্যতীত অন্য কোন আকর্ষণ প্রসূত সংস্কার দৃষ্ট হয় না"। বোধ হয় সূর্য্যসিদ্ধান্তে কৃষ্ ধাতুর দুই চারিটী প্রয়োগ দেখিয়া তাঁহার এই ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। সে প্রয়োগ গুলি প্রকৃত আকর্ষণ অর্থে প্রযুক্ত নয়। ইহার পরেই আর একটী কথা লিখিয়াছেন। "যেহেতু শীঘ্র সংস্কার কেবল কেন্দ্র পারিবর্ত্তন জন্য। অর্থাৎ কেন্দ্রস্থ জ্যোতিষ্ক ও ভ্রমণ-কারী গ্রহ মধ্যে আকর্ষণ জনিত ফলই গৃহীত হইয়া আসিতেছে।"

যদি "কেন্দ্র পরিবর্ত্তন জনিত" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বিদ্যার নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলেও কতক ভাল ছিল। কিন্তু "অর্থাৎ" হইতেই মাটী হইয়াছেন। অর্থাৎ ইত্যাদি বাক্যের কোন অর্থই বুঝা গেল না। কেবল প্রলাপ বচনে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। যে সিদ্ধান্ত ভূষণের সিদ্ধান্ত বিদ্যা, এইরূপ। তাঁহার বৃথা চাৎকারে কর্ণপাত না করাই সঙ্গত। এইজন্য তাঁহার প্রস্তাব সাহিত্য সংহিতায় দেখিয়াও সম্পাদক কর্ত্তৃক উত্তর লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও উত্তর লিখি নাই। তথাপি তাঁহার সন্দেহ অপনোদন করিবার জন্য দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সংশয় দূর করিবার জন্য ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে "আবর্ত্তন" শব্দটী অতি সমাদরে সংগৃহীত হইল।

এই শব্দটী ভারতবর্ষের প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল সংগ্রহকারেরাই, ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল এই "আবর্ত্তন" শব্দটীর পর্য্যালোচনা করিলেই সূক্ষ্ম গণিত লইয়াই যে পঞ্জিকা রচনা আবশ্যক তাহা অসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। এই আবর্ত্তন শব্দের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহা একটী অমূল্য রত্ন, অন্ধের চক্ষু, অজ্ঞানের জ্ঞান, ইহার আলোচনায় সকল সংশয় দূর হইয়া যায়।

আমাদের বঙ্গদেশ প্রচলিত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের প্রণেতা শ্রীমান্ রঘুনন্দন স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিয়াছেন ;—

"আবর্ত্তনং পশ্চিমদিগবস্থিতছায়ায়াঃ পূর্ব্বদিগ্ গমনারম্ভকালঃ"॥ প্রাতঃকালে সমস্ত বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে থাকে। সেই ছায়া যখন পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে যাইতে আরম্ভ করে সেই কালটীর নাম আবর্ত্তন। ইহা দেখিয়াও কি সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়ের অদৃশ্য সূর্য্যের কথা মনে পড়িবে। অদৃশ্য সূর্য্যের কি ছায়া হয়?

বিশুদ্ধ ভাবে গণিত করিয়া সূর্য্যের যে সূক্ষ্মভোগ (Longitude) পাওয়া যায়, সেই ভোগের আশ্রয়েই আবর্ত্তন কালের যথার্থ গণনা হইতে পারে। নতুবা কখনই শুদ্ধ গণনা হয় না। ভুল গণনায় বা স্থূল গণনায় কদাপি যথার্থ আবর্ত্তন কাল নির্ণয় হইতে পারে না। এই গণিতাগত আবর্ত্তন কালেই যদি ছায়ার পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলেই আমরা তাহাকে দৃগ্ গণিতৈক্য বা দৃক্-তুল্য গণনা বলিয়া থাকি।

এক স্থানে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ বাধক বিনা সর্ব্বত্রেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই চিরন্তন নিয়মানুসারে পঞ্জিকায় সকল গণনাই দৃকতুল্য চাই, ইহা জানা উচিত। তিথির গণনায় ভুল করিতে হইবে, আর

আবর্ত্তনটী শুদ্ধ করিতে হইবে, এমন কোন শাস্ত্রেই পাওয়া যাইবে না, বরং তিথি বিষয়ে গোভিল বলিয়াছেন।

সূর্য্যা চন্দ্র মসোর্যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সামাবস্যা।

সূর্য্য ও চন্দ্রের যে পরম সন্নিকর্ষ (Conjunction) তাহার নাম অমাবস্যা।

রঘুনন্দন ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরসন্নিকর্ষশ্চ উপর্যধো ভাবাপন্ন সমসূত্র পাত ন্যায়েন রাশ্যে কাংশাবচ্ছেদেন সহাবস্থ ন রূপঃ।

উদাহরণ স্বরূপ কল্পনা করা গেল, যেন কলিকাতায় খস্বস্তিকে (Zenith) সূর্য্য ও চন্দ্রের কেন্দ্র আসিয়াছে, (অর্থাৎ সর্ব্বগ্রাস সূর্য্য গ্রহণের মধ্য কাল হইয়াছে) অতএব পৃষ্ঠ দ্রষ্টা ও কেন্দ্রীয় দ্রষ্টা উভয়েই সমকালে খস্বস্তিক গত সূত্রে মধ্যগ্রহণ বা অমাবস্যার অন্তক্ষণ দেখিতে পাইতেছে। অতএব দৃক্‌তুল্য তিথিই স্মার্ত্ত সম্মত হইতেছে, ইহাতে কোন বিবাদ নাই।

অতএব সিদ্ধান্ত করা গেল যে, সকল গণনাই শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম করিতে হইবে।

আমাদের পরম কারুণিক রঘুনন্দন কেবল শ্রাদ্ধতত্ত্বেই যে আবর্ত্তন শব্দের অর্থ করিয়াছেন তাহা নহে, মলমাস তত্ত্বেও ইহা দেখা যায়। মলমাস তত্ত্ব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

গোভিলোহপি।

আবর্ত্তনে যদা সন্ধিঃ পর্ব্বপ্রতিপদোর্ভবেৎ।
তদহর্যাগ ইষ্যেত পরতশ্চেৎ পরেহহনি॥

স্কন্দ পুরাণে।—

আবর্ত্তনাত্তু পূর্ব্বাহ্ণোহ্যপরাহ্ণস্ততঃপরম্‌।
আবর্ত্তনাৎ বাসরস্য চছায়া পরিবর্ত্তনাৎ।

স্মার্ত্ত গোভিলের একটি বচন তুলিয়াছেন। ইহার সন্ধি শব্দের অর্থ, পরে লিখিত হইবে। পর্ব্ব শব্দে অমাবস্যা ধরা গেল। অমাবস্যা ও প্রতিপদের সন্ধি, যদি আবর্ত্তনের পূর্ব্বে হয়, তাহা হইলে সেই দিনই যজ্ঞ হইবে, যদি আবর্ত্তনের পরে সন্ধি হয়, তাহা হইলে পর দিন যজ্ঞ হইবে।

ইহার পরে স্কন্দ পুরাণের একটী বচনার্দ্ধ তুলিয়াছেন। তাহার অর্থ—আবর্ত্তনের পূর্ব্ব ভাগ পূর্ব্বাহ্ণ ও পরভাগ অপরাহ্ণ। এখানে রঘুনন্দন আবর্ত্তন শব্দের অর্থ আবার করিতেছেন। "আবর্ত্তনাৎ বাসরস্য ছায়া পরিবর্ত্তনাৎ।" দিনের মধ্যে যখন সকল বস্তুর ছায়া পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকেই আবর্ত্তন বলে।

ইহাদ্বারা সুন্দর রূপে অবগত হওয়া যায় যে, আবর্ত্তনের আশ্রয়ে যজ্ঞাদি কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যিনি এই আবর্ত্তনের সূক্ষ্ম গণনা না মানেন, তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্র মানিবার কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না।

এইরূপে হেমাদ্রি চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি গ্রন্থে পরিশেষ খণ্ডে শ্রাদ্ধনির্ণয় প্রকরণে লিখিয়াছেন ;—

পূর্ব্বাহ্ণো দ্বিধা কৃতস্যাহ্নঃ পূর্ব্বো ভাগঃ তথাচ স্কন্দ পুরাণে।—

আবর্ত্তনাত্তু পূর্ব্বাহ্ণোহ্যপরাহ্ণস্ততঃপরম্‌। ইতি॥

আঙ্‌ মর্য্যাদায়াং ছায়ায়াঃ পরিবর্ত্তনং মর্য্যাদীকৃত্য যঃ কাল স পূর্ব্বাহ্ণঃ॥

হেমাদ্রি, স্কন্দ পুরাণের একটী বচন তুলিয়াছেন। ইহা রঘুনন্দনও তুলিয়াছেন, ইহার অর্থ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

হেমাদ্রি "আবর্ত্তনাৎ" পদের অর্থ করিতেছেন—এখানে আঙ্‌ উপসর্গটী (মর্য্যাদা) সীমা অর্থে জানিতে হইবে। ছায়ার পরিবর্ত্তনকে সীমা করিয়া যে কাল তাহার নাম পূর্ব্বাহ্ণ। এক্ষণে দেখুন, হেমাদ্রিও ছায়ার পরিবর্ত্তনকে আবর্ত্তন মানিলেন।

মদন পারিজাত গ্রন্থেও গোভিলের উক্ত বচনটী দেখিতে পাই।

যদাহ গোভিলঃ।
আবর্ত্তনে যদা সন্ধিঃ পর্ব্বপ্রতিপদোর্ভবেৎ।
তদহর্যাগ ইষ্যেত পরতশ্চেৎ পরেহহনি ॥

এক্ষণে দেখান হইল যে, শ্রাদ্ধতত্ত্বে মল মাসতত্ত্বে, হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণিতে ও মদন পারিজাত গ্রন্থে, আবর্ত্তন শব্দ আছে, এবং তাহার আশ্রয়ে, যজ্ঞাদি কার্য্য হইয়া থাকে। এই আবর্ত্তনের গণনা দৃক্‌তুল্য গণিত বিনা হইতে পারে না, কাজেই দৃক্‌ তুল্য গণনা রঘুনন্দন, হেমাদ্রি ও মদন পাল প্রভৃতির সম্মত হইতেছে। সুতরাং দৃকতুল্য গণিত বিনা যাগাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

এক্ষণে সন্ধি শব্দের অর্থ করিবার জন্য কালমাধব গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

লৌগাক্ষিরপি।
তিথেঃ পরস্যা ঘটিকাস্তু যাঃ স্যুঃ।
ন্যূনাস্তথা যাভ্যধিকাস্তু তাসাম্ ॥
অর্দ্ধং বিযোজ্যঞ্চ তথা প্রযোজ্যং।
হ্রাসেচ বৃদ্ধৌ প্রথমে দিনে তৎ ॥

এই বচনের অর্থ কাল মাধব গ্রন্থের রচয়িতা মাধবাচার্য্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই,—

পূর্ব্বেদ্যুরমাবস্যা পঞ্চদশ ঘটিকাঃ
পরেদ্যুঃ প্রতিপদপি তাবতী,
তদা যথাস্থিতমেবোপজীব্য সন্ধির্বিজ্ঞেয়ঃ।
যদা প্রতিপদঃ ষট্‌ ঘটিকাঃ ক্ষীয়ন্তে।
তদা ঘটিকাত্রয় হ্রাসোঽমাবস্যায়াং
বিযোজনীয়ঃ। তস্মিন্ বিয়োজিতে দ্বাদশ
ঘটিকা অমাবস্যা ভবতি। তদা আবর্ত্তনাৎ
পূর্ব্বং সন্ধিঃ সম্পদ্যতে। অনেন ন্যায়েন
ঘটিকাত্রয়বৃদ্ধৌ যোজিতায়াং অষ্টাদশ ঘটিকা
অমাবস্যা ভবতি। তদা আবর্ত্তনাৎ উর্দ্ধং
সন্ধির্ভবতি। ইত্যেবং সন্ধিং বিজ্ঞায় তদনু-
সারেণ অন্বাধানেষ্টী অনুষ্ঠাতব্যে।

ইহার অর্থ এই যে, যদি পূর্ব্বদিনে অমাবস্যা পঞ্চদশ ১৫ দণ্ড থাকে তৎপর দিন প্রতিপদও ১৫ দণ্ড থাকে, তাহা হইলে ১৫ দণ্ডেই সন্ধি জানিতে হইবে। যদি প্রতিপদের ছয় দণ্ড হ্রাস হয়, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক তিন দণ্ড ঐ পঞ্চদশ ১৫ দণ্ড অমাবস্যার বিয়োগ করিতে হইবে। এরূপ করিলে ১২ দণ্ড অমাবস্যা হইল, তাহা হইলে আবর্ত্তনের পূর্ব্বে সন্ধি হইবে। এইরূপ যদি প্রতিপদের ছয় দণ্ড বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক তিন দণ্ড, পঞ্চদশ দণ্ড অমাবস্যায় যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে অষ্টাদশ ১৮ দণ্ড অমাবস্যা হইল। তাহা হইলে আবর্ত্তনের পরে সন্ধি জানিতে হইবে। এইরূপে সন্ধিকাল নির্ণয় করিয়া অন্বাধান ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ইহা দেখিয়া যিনি ধর্ম্ম শাস্ত্র মানেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, পঞ্জিকা লিখিত মধ্যাহ্ন কালেই ঠিক ছায়া পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। যদি পঞ্জিকা লিখিত মধ্যাহ্নেই ছায়ার পরিবর্ত্তন হইল, তাহা হইলেই তাহাকে দৃগ্‌ গণিতৈক্য বলা যায়। তিথির গণনাও এইরূপ সূক্ষ্ম চাই, তাহা না হইলে উভয়বিধ কালের সজাতীয়তা থাকে না। সজাতীয় পদার্থদ্বয়েরই যোগান্তর হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয়ের যোগ বা অন্তর হয় না। ইহা গণিত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে। যদি আবর্ত্তন সূক্ষ্ম জাতীয় এবং তিথি স্থূল জাতীয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের এক জাতীয়তা থাকিবে না।

এই আবর্ত্তন কালের পর্য্যালোচনা করিলেই জানা যায় যে, ইহা স্পষ্ট কাল (Apparent time) মধ্যম কাল (Mean time) নহে। আমরা যে আবর্ত্তন কাল লইয়া যজ্ঞের ব্যবস্থার কথা- দেখাই[illegible]লেই, আবর্ত্তন কালকেই স্পষ্ট

মধ্যাহ্ন (Apparent noon) বলে। ইহা মধ্য মধ্যাহ্ন (Mean noon) নহে।

মধ্যম কাল, (Mean time)ভারত বর্ষীয় গণক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা যজ্ঞাদির ব্যবস্থা করা যায় না। কারণ স্ফুট মধ্যাহ্ন ও মধ্য মধ্যাহ্নের অন্তরে ১৬½ মিনট পর্যন্তও ব্যবধান হয়। মধ্যম কাল হইতে স্ফুট কাল গণনা করিয়া যজ্ঞাদির বা ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এরূপ ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ কোথাও পাওয়া যায় না। শুদ্ধ পঞ্জিকা প্রচারের গুরু ৺কাশীধামের মহামহো-পাধ্যায় ৺বাপুদেব শাস্ত্রী C. I. E. মহাশয় এবং তমতানুবর্ত্তী মান্দ্রাজের ৺রঘুনাথ আচার্য্য মহাশয়, ইঁহারা উভয়েই স্পষ্ট কালের আশ্রয়ে পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিষ্যেরাও অদ্যাপি স্পষ্ট কালের আশ্রয়ে পঞ্জিকা প্রকাশ করিতেছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে অশুদ্ধ পঞ্জিকা মুদ্রিতই হয় না। ৺রঘুনাথ আচার্য্যের সম্প্রদায়ের পঞ্জিকাই সে দেশে চলে। উৎ-কলে ৺চন্দ্রশেখর সিংহের মতে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়। তাহাও শুদ্ধ পঞ্জিকা এবং স্পষ্ট কালের আশ্রয়ে রচিত হইয়া থাকে। সেখানেও অশুদ্ধ পঞ্জিকা নাই। এমন কি মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অশুদ্ধ পঞ্জিকার ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়াছে। ৺বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্জিকা ৺কাশীধামেও বুন্দীর মহারাজ শ্রীযুক্ত রঘুবীর সিংহ বাহাদুরের রাজ্যে, গিধোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত রাবণেশ্বর সিংহ বাহাদুরের রাজ্যে অব্যাহত ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। এ সকল পঞ্জিকাই ধর্ম্ম কার্য্যের ব্যবহারার্থ প্রচারিত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই স্পষ্ট কালের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ মহাশয় সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিছুই দেখেন না। ভাটিক্যা... বুঝেন, তাহাতে Mean time আছে। বোধ হয় সেই জন্য তাহাতে তাঁহার বড়ই প্রীতি। সেই জন্য তাঁহার পঞ্জিকা মধ্যম কালে রচিত হইয়া থাকে। এইজন্য তাঁহার দিবসমান ৬০ দণ্ড সূচনা কিন্তু ৬০।০ এরূপ তিথিমান পঞ্জিকায় দেখা যায়। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র দেখেন না। ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা হউক আর নাই হউক তাহাতে তাঁহার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

এই মহাত্মা উদয় ও অস্তকালে ২ মিনিট করিয়া Refraction) গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন ৪ মিনিট দিনমানের কলেবর বৃদ্ধি করিতে-ছেন। ভূ-বায়ু জন্য উদয় দর্শনে কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে (Refraction) বলে। প্রতিদিনই যে ৪ মিনিট হইবে, এরূপ কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভূ-বায়ুর সজলতা ও শুষ্কতা অনুসারে বিভিন্ন হইবেই হইবে। এই যে কিঞ্চিৎ দৃষ্টির ভ্রম, ইহা উদয় কালেই হয় মধ্যাহ্নে হয় না।

প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত প্রতি ক্ষণই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সে যাহাহউক উদয় বেধ করিয়া দিনমান গণনা করিতে হইবে এরূপ শাস্ত্র নাই। অর্থাৎ উদয় বেধ করিয়া দিনমান সাধন করিবে এ বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই, জ্যোতিষ শাস্ত্রেও নাই। কিন্তু ক্রান্তি ও অক্ষাংশ অনুসারে দিনমান গণনা হইয়া থাকে ইহা সকল জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্মত। সেই ক্রান্তি ও অক্ষাংশ শুদ্ধ হইলেই দিনমান ও শুদ্ধ দৃক্ তুল্য হইবে। উদয় বেধ যে যথার্থরূপে হয় না বা হইতে পারে না ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞদিগের নিকট সুপ্রসিদ্ধই আছে।

Refraction এর প্রভাব দেখুন।

আশু বাবুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায়

১৮ই মার্চ্চ	দিনমান ২৯।	৫১° দক্ষিণক্রান্তি	১।২২।৫৩
১৯ „	„ ৩০।	২ „ „	০।৫৯।১১
২০ „	„ ৩০।	৬ „ „	০।৩৫।২৯
২১ „	„ ৩০।	৯ „ „	০।১১।৪৬
২২ „	„ ৩০।	১৩ উত্তর „	০।১১।৫৬

ইহার আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে ১৮ই মার্চ্চ ১ অংশ ২১ কলা দক্ষিণ ক্রান্তি থাকিতেও দিনমান ৩০ দণ্ড হইয়াছে। অর্থাৎ বিষুব দিন হইয়াছে। কিন্তু ২২এ মার্চ্চ সূর্য্য বিষুব বৃত্তে আসিবেন, সে দিন বাবুর দিনমান ৩০ দণ্ড ১৩ পল। ইহা অপেক্ষা হাস্যকর গণনা আর কি আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে দিন সকল দেশে দিনমান ৩০ দণ্ড হইবে, বাবুর সে দিন বিষুব দিন হইল না। তাহার ৫ দিন অগ্রে ১৮ই মার্চ্চ বিষুব দিন হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের ক্রান্তিগুলিও Refraction এর জোরে Nautical Alamanac অপেক্ষাও ৬।৭ কলা করিয়া প্রতিদিন অধিক হইয়াছে। যাহা হউক এই সৃষ্টি ছাড়া, পাঁজি হিন্দুতে মানিতে পারে না। যেদিন সূর্য্য বিষুব বৃত্তে আসে সেই দিনই বিষুব দিন হয় ইহা হিন্দুর শাস্ত্রসম্মত পঞ্জিকা প্রস্তুত কেবল ন্যাটিক্যালের বিস্তারে হয় না। কেবল ন্যাটিক্যাল আনিয়া করিতে গেলে কিরূপ অনর্থ উপস্থিত হয় তাহা বিশদ ভাবে দেখান যাইতেছে।

১৩১৭ সালের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় মেষ সংক্রমণ কালটী ১৫।৪৭ পলে লিখিত হইয়াছে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় উহা ১৫ ৪১ পলে হইয়াছে। অন্য পঞ্জিকায় ৪২পলেও আছে।* আশুবাবু, পরিশ্রম বাঁচাইয়া ঐ ১৫।৪১ পল বা ১৫।৪২ পল লইয়া নিজের প্রিয়তম Refroctian যোগ করিয়া ১৫ দণ্ড ৪৭ পল লিখিয়াছেন। কিন্তু যদি গুপ্তপ্রেসাদির মেষসংক্রমণ কালটী শুদ্ধগণনা প্রসূত হইত তাহা হইলে বড় ক্ষতি ছিল না কিন্তু তাহা নহে। গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকায় উজ্জয়িনী ও কলিকাতার মধ্য দেশান্তর ঘটিকা ২ দণ্ড ৩৪ পল পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মানচিত্র (এ্যাট্‌লাস্) প্রভৃতির আশ্রয়ে দেখিলেও ইহাতে ৩২পল ভুল পাওয়া যায়। গুপ্তপ্রেসের গণকদিগের এ সকল বিচারের আবশ্যকতা নাই। কারণ তাঁহারাত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত লইতেছেন না। পূর্ব্বাপর এক ভাবেই ২দণ্ড ৩৪ পল দেশান্তর লইয়া আসিতেছেন। তাহাই লইবেন। অশুদ্ধ গণনা করাই তাঁহাদের, অলঙ্কার। যাঁহারা অশুদ্ধ গণনা মানেন তাঁহারা তাহাই মানিবেন। কিন্তু আশু বাবু, কি বিবেচনায় ঐ সংক্রমণ কালটী গ্রহণ করিলেন?

আমরা প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে এই সংক্রমণ কালটী গণনা করিয়া সিদ্ধান্তামোদী মহাশয়গণের সন্দেহ দূর করিয়া দিতেছি। পরে এই সংক্রান্তির আশ্রয়ে পূর্ণ সংবৎসরের পঞ্জিকায় যে ভয়ানক ভুল ও বিষম ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইতেছি। এই মেষ সংক্রমণ সাধনে বৃহৎ বৃহৎ গুণভাগের অংশ ছাড়িয়া দিয়া প্রধান প্রধান ফল গুলিই দেখান গেল।

বঙ্গদেশে, প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তই, সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই জন্য উহা হইতেই মেষ সংক্রমণের ভুল দেখান গেল এবং এই গণিতের শুদ্ধতার পরীক্ষার জন্য সিদ্ধান্ত রহস্যের গণণার সহিত ঐক্য দেখাইলাম, এবং গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় দেশান্তরে যে ভুল আছে, সেই ভুলটী ত্যাগ করিলে ইহা গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাদির সহিতও মিলিয়া যায়, [illegible] দেখান গেল। কেবল বিশুদ্ধ

সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার নূতন গণক শ্রীযুক্ত আশু-তোষ মিত্র মহাশয়ের গণনায় ৩৮ পলের ভুল পাওয়া যাইতেছে।

শকে ১৮৩২ চৈত্র শুক্ল চতুর্থীতে বুধবারে সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে অহর্গণ৭১৪৪০৪.২৬৯৩৬

ভগণাদি মধ্য রবি ১৯৫৫৮৮৫০১০।১১।২৭।
২৪ ৩৩

রাশ্যাদি মধ্য রবি	১১।২৭।২৪।৩৩
১৫ দণ্ডের চালন	১৪।৪৭
উজ্জয়িনীর উদয়ে মধ্য রবি	১১।২৭।৩৯।২০
রবি মন্দোচ্চ রাশ্যাদি	২।১৭।১৭।৩০
মন্দকেন্দ্র	৯।১০।২১।৫০
রাশ্যাদি ভুজ	২।১৯।৩৮।১০
ভুজাংশ	৭৯।৩৮।২০
ভুজজ্যা	৩৩৮১
স্ফুট পরিধি	১৩।৪০
ভুজফল	২।৮।১৪
কোটীফল	০।২২
উজ্জয়িনীর উদয়ে স্ফুট রবি	১১।১৯।৪৭।৪৪
তৎকালিক গতি	৫৮।৪৫
উজ্জয়িনীতে সংক্রমণ কাল	১২।৩১
যথার্থ দেশান্তর	২।২
চরকাল	০।৩৬

কলিকাতায় মেষ সংক্রমণ ১৫।৯

পরীক্ষার্থ সিদ্ধান্ত রহস্যের গণিত দেখুন।

মধ্যম সূর্য্য	১১।২৭।৩৯।১৯ ৫০
মন্দফল	২।৮।২৪
উজ্জয়িনীর উদয়ে স্ফুট রবি	১১।২৯।৪৭।৪৩।৫০
রবিগতি	৫৮।৪৬
উজ্জয়িনীর, সংক্রমণ কাল	১২।৩১
যথার্থ দেশান্তর	২।২
চরকাল	০।৩৬

কলিকাতার মেষ সংক্রমণ ১৫ ৯

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় কেন ৪১ পলে সংক্রমণ লিখিত হইয়াছে, কি ভুল হইয়াছে, তাহা দেখুন।

উজ্জয়িনীর সংক্রমণ	১২।৩১
অশুদ্ধদেশান্তর	২।৩৪
চরকাল	০।৩৬

কলিকাতায় মেষ সংক্রমণ ১৫।৪১

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম্ এ মহাশয় এই ৪১ পল বা অন্য পঞ্জিকাতে ৪২ পল যাহা আছে তাহাই লইয়া ৫ পল প্রিয় Redraction দিয়া ১৫ দণ্ড ৪৭ পল লিখিয়াছেন।

গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকার গণকেরা স্পষ্ট সূর্য্য সাধন করিতে যে সকল কার্য্য করেন তাহা করিয়াই মেষ সংক্রমণ সাধন করিয়া তাঁহাদের সহিত ঐক্য দেখাইলাম। বাস্তবিক পক্ষে অপরে সংস্কারের দ্বারা সূক্ষ্ম করিলে, ঐ সংক্রমণ কাল আরও ৫ পল কমিবে। তাহা হইলে ১৫ দণ্ড ৪ পলে বিশুদ্ধ মেষ সংক্রমণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ১৫ দণ্ড ৪৭ পলে লিখিত হওয়াতে বাস্তবিক ৪৩ পল ভুল হইতেছে। ১৮৩২ শকের বাঙ্গলা ১৩১৭ সালের মেষ সংক্রমণ যাহা ১লা বৈশাখের পূর্ব্বদিন হইয়াছে, ঐ কালটী জ্যোতিঃশাস্ত্র-মার্ত্তণ্ড, পণ্ডিত চন্দ্রদেব ও জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদ মহাদেব শাস্ত্রী ঘাটে মহাশয়েরা যাহা বিশুদ্ধ ভাবে গণনা করিয়াছেন তদনুসারে ১৫ দণ্ড ৪ পলেই ঘটিয়াছে। ইহা আশুবাবুর গণনার সহিত ৪৩ পলের ভ্রান্তি প্রমাণ করিতেছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়েরও এই মত তাঁহার পঞ্জিকা অনুসারেও ১৫ দণ্ড ৪ পলে মেষ সংক্রান্তি এই ভুল অনুসারে মকর সংক্রান্তির গণনাটি শুদ্ধ করিলে, দেখা যায় যে, ৪১।৫৫ পলে মকর সংক্রান্তি ঘটিতেছে। ইহাতেও ৫২ পলের ভুল হইয়াছে। এই ভুল শুদ্ধ করিলে ২৯ পৌষ শুক্রবারেই সংক্রান্তির পুণ্যকাল হইবে। ঐ দিনেই মাসান্ত হইবে। ১লা মাঘ শনিবার কখনই

পুণ্য কাল হইতে পারিবে না। যিনি ঐকয়ে গঙ্গা-স্নান, দান, শিবঃপ্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিবেন, তিনি যদি বিশুদ্ধ গণিত মানেন, তাহা হইলে শুক্রবারেই করিতে হইবে, শনিবারে নহে। শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মিত্র এম, এ, মহাশয় মেষ-সংক্রমণের ভুল করিয়া কি অনর্থপাতই করিয়াছেন।

এই সকল দেখিয়া বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তামোদীদের ধর্ম্মরক্ষার্থ আমরা নূতন পঞ্জিকা করিতেছি। এই সকল ব্যাপার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের পৃষ্ঠপোষক। ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে জানাইয়াছিলাম, তিনি একদিন সভা করিয়া এই সকল দোষ শুদ্ধ করিয়া পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে আমাকে বলেন। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ সম্বন্ধে অন্য দিন কথা হইবে স্বীকার করেন। ২।৪ দিন পরে একদিন আমি গেলে বলিলেন, আশুতোষ মিত্র মহাশয়ই গণিত করিবেন, আপনি করিতে গেলে এ বৎসর পঞ্জিকা বাহির হইবে না। এ বৎসর Refraction টী ত্যাগ করা হইবে। এই কথা শুনিয়া নিজের ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারে যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মরক্ষার্থ নূতন পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেছি। সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করি। সুপ্রথিতনামা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (C. I. E.) মহাশয় তাৎকালিক গণক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার নিকট গণনা শুদ্ধ হইল কি না দেখাইতে পাঠাইতেন। আমিও যথামতি ৺বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্জিকা ধরিয়া তিথিগুলি শুদ্ধ করিয়া দিতাম। তিনি বলিতেন, তুমি সিদ্ধান্ত বিদ্যায় পণ্ডিত, তুমি শুদ্ধ বলিলেই আমরা শরতের গণনা শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া ব্রতোপবাসাদি করিতে পারি, অতএব আমার অনুরোধ এই, ধর্ম্মকার্য্যে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিবে। সেই কারণে সেই হইতে আমার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সংশোধক নাম। এখনকার গণক আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করেন না; গণনাও দেখান না। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কেবল সংশোধক নামটী ছাপাইয়া থাকেন মাত্র।

শ্রীপঞ্চানন শর্ম্মা।

চিত্রকরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

পূরণচাঁদ চলিয়া গেল। কত দূর গেল এবং কতদিনের মত যাইল, তাহা কেহ জানিল না—বোধ হয়, পূরণ স্বয়ং তাহা জানিত না।

চিকণ হাতের যে কাজটুকু সারিতেছিল, তাহা সম্পন্ন হইলে, তাহার অধিকারীকে তাহা দিয়া আপন পারিশ্রমিক লইল; তৎপরে দিল্লীর উত্তর-পূর্ব্ব কটকের কোতোয়ালীর পথে চলিল।

সেথায় উপস্থিত হইয়া রসিদ দেখাইলে, কোতোয়ালীর লোকেরা জীর্ণবস্ত্রাবৃত একটী কাগজের তাড়া চিকণের হস্তে সমর্পণ করিল।

"আর কিছু নাই?"

"না।"

কাগজের সেই তাড়াটী লইয়া চিকণ দোকানে [redacted] করিল। বৃদ্ধ রিপু-কর্ম্মকার যাহা করুক, যেথায় যাক্, বুঝি

জীর্ণ বস্ত্রের গণ্ডি অতিক্রম করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য! দোকানে ফিরিয়াই চিকণ নীলার জিনিস সর্ব্বাগ্রে নীলাকে উপরে পাঠাইয়া দিল।

সন্ধ্যা হয় হয়, চিকণ পদশব্দ না করিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিল। নীলা তাহার উপস্থিতি অনুভব করিল না। কৃশাঙ্গীর চিকণের দিকে পশ্চাৎ—সে মুক্ত গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। গবাক্ষের আলিসায় মৃৎপাত্রে রোপিত বেল, জুঁই, মল্লিকার গাছে অসংখ্য তুষার-শুভ্র সুরভি কুসুম সান্ধ্য-সমীরণ-প্রবাহে সন্তরণ করিতেছিল; তাহাদিগের সে সন্তরণ-কৌতুকে নীলার মস্তক বিঘ্ন উপস্থিত করায়, তাহারা যে যেখানে পারিল,—নীলার মস্তকে, চূর্ণ কুন্তলে, কর্ণে, ললাটে, গ্রীবায়, ওষ্ঠে, দলে দলে পড়িয়া একত্র নীলাকে আক্রমণ করিল। নীলার পশ্চাতে শয্যার উপর কতকগুলি পট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। চিকণ দেখিল, সেগুলি পটমাত্র, শিল্প-সৌকুমার্য্যের বিন্দুও তাহাতে বিদ্যমান নাই। নীলা ফিরিয়া চিকণকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "এ সমস্তই বাবার হাতের আঁকা; এরূপ পট এখানে বিক্রয় হইতে পারে কি? একখানি দু'খানিতে না হয়, যদি সমস্তগুলি বিক্রয় করিলেও আমার পীড়ার কর্জ্জের পরিশোধ হয়, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই।"

চিকণ মিথ্যা কথা সুরু করিল।—"তোকে কতবার করিয়া বলিব মা! তোর কর্জ্জ অতি অল্প।—এমন পট এমন সহরে বিক্রয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ আছে? ঐ সমস্তগুলি বিক্রয় করিতে হইবে? তুই মা পাগ্‌লি মেয়ে! উহার মধ্যে একখানি, কি বড় জোর দুইখানি, বিক্রয় করিলে তোর সমস্ত কর্জ্জ শোধ হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাতে তোর মাসাবধির খরচ চলিয়া যাইবে। আরোগ্য হইয়া তুই তো দিল্লীতেই থাকিবি?"

"আর কোথায় যাইব? আমার আর কে আছে?"

"তোর আমি আছি, রূপালী আছে।—রূপালী একাই এক সহস্র। এখানে থাকিতে থাকিতে ভগবান্ আরও কত সম্বন্ধ তোকে মিলাইয়া দিবেন, তারই বা ঠিকানা কি? ভাবিস্ কেন মা!" নীলা উত্তর করিল, "তা বটে। আমার মন অকৃতজ্ঞ, তাই আপনার দুঃখের চিন্তায় অভিভূত থাকিয়া তোমাদিগের স্নেহ ও যত্নের কথা মধ্যে মধ্যে ভুলিয়া যাই। সে যাহা হউক, তোমাকে এত কষ্ট দিয়া তোমার এ ঘর আমি আর কোন মতে অধিকার করিয়া থাকিব না।"

চিকণ বলিল, "তাহাই হইবে—তবে সকালে যা বলিয়াছি, তোকে আরও কয়েক দিন এখানে থাকিতেই হইবে; পরে তোর শারীরিক সুস্থতা সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিলে, অন্য কোন ব্যবস্থার কল্পনা করিব।"

নীলা আপনার জেদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিল। তাহাদের কাছাকাছি কোনও একটী বাড়ীতে চিকণ তাহাকে একটী ঘর দেখিয়া দিক্, সে তাহাতে ভাড়া দিয়া থাকিবে,—আর তাহা হইলে চিকণ ও রূপালী প্রত্যহ তাহার তত্ত্ব লইতে পারিবে।

হায় অভাগিনি! তোর উদরান্নের সংস্থান নাই—ঘর ভাড়ার কথা কি বলিতেছিস্!

নীলার কথা শুনিয়া চিকণ চিন্তিত হইল। কিছুক্ষণ পরে সাগ্রহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার একটা কথা শুনিবি মা! তুই ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে চাহিতেছিস্,—কেমন? আচ্ছা, এক কাজ

করিলে তো এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়। তুই আমার এই ঘরে থাকিয়া ভাড়া স্বরূপ মাসে মাসে আমাকে কিছু দিস্ না কেন? তাহাতে তোরও সুবিধা, আমিও বাঁচিয়া যাই। আমার কাজ কর্ম্মের সে পূর্ব্বের শ্রী আর নাই, বিশেষ বার্দ্ধক্যে বাতক্লিষ্ট অঙ্গুলিতে ছুঁচ চালাইতেও আর পারি না। আমার যুক্তি তুই যদি গ্রহণ করিস, তাহা হইলে তোর কল্যাণে এ বয়সে দু' বেলা দু' মুটা বসিয়া খাইতে পাই। বুঝিয়া দেখ্, দোকানেই আমার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটে। কোন দিন রাত্রি দুই প্রহরে, কোন কোন দিন বা তাহারও পরে কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া থাকি। সিঁড়ির ঘরে রূপালী শয়ন করে; অত রাত্রিতে তাহাকে জাগাইলে পাছে বৃদ্ধা বিরক্ত হয়, এই ভয়ে ঘর থাকিতেও মাসের আধেক দিন দোকানেই আমাকে নিদ্রা যাইতে হয়। সত্য বলিতেছি, আমার এ ঘরে কোনও প্রয়োজনই নাই। —তুই এইখানে থাকিয়া পট আঁকিবি, আমি বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া আসিব, তাহাতেই আমাদের মা পো-এর স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যাইবে।"

সরলা বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কি সত্য, না মমতা-পরবশ হইয়া তুমি আমার কারণে মিথ্যাকে সত্যের আকার দিয়া আমাকে বঞ্চনা করিতেছ?"

হে স্বর্গের দেবতাকুল! বৃদ্ধ চিকণ-লালের অপরাধ গ্রহণ করিও না। সে একে একে তোমাদের সকলের নাম করিয়া বালিকার নিকট শপথ করিল, সে যাহা বলিয়াছে, তাহা সমস্তই ধ্রুব সত্য! জল-প্রপাতের স্ফটিক-শিশু হাস্য-সংবরণে অপারগ হইল; সে ভাবিল—ভগবান্ ক্রীড়াচ্ছলে রমণী সৃষ্টি করিবার সময় যদি জানিতে পারিতেন, ভবিষ্যতে সেই রমণীর কারণ পুরুষের মুখে ব্যবহৃত হইবার জন্য কত কোটী কোটী মিথ্যা কথা তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা হইলে রমণী সৃষ্টি ভগবানের চিন্তার বিষয় হইত! অভাগ্য চিকণের মিথ্যা কথা কহা ব্যতীত তখন উপায়ান্তর ছিল না।

"তবে তাই ঠিক রহিল?"

নীলা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

"তোর নিজের আঁকা একখানি পটও ত আমাকে দেখাইলি না?"

নীলা অন্যত্র রক্ষিত দুই একখানি পট আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল। তন্মধ্যে এক-খানি বৃদ্ধকে আকৃষ্ট করিল। সেখানি 'মদন-ভস্মের' চিত্র—মহাদেবের ধ্যানভঙ্গে তাঁহার বজ্র-কটাক্ষের স্ফুলিঙ্গ মদনকে দগ্ধ করি-তেছে! পর্ব্বতে দাবাগ্নি, এবং দেবদেবের সে প্রলয়-মূর্ত্তির দৃশ্যে চিকণ অমার্জ্জিত, অথচ প্রকৃত প্রতিভার রেখা দেখিতে পাইল। বৃদ্ধ কোনও কথা না ভাঙ্গিয়া পাশ কথা পাড়িয়া বলিল, "কেমন এখন আর তোর মনে কোনও কষ্ট নাই, মা।"

"তুমি আমাকে ভরসা দিয়াছ, আর ভাবিব কেন?"

বিক্রয়ার্থ বলিয়া তাহার নিকট হইতে তাহার পিতার অঙ্কিত দুই খানি পট লইয়া চিকণ নীচে আসিল, এবং সিন্দুক খুলিয়া তন্মধ্যে ছিন্ন বস্ত্রের পর্ব্বত-নিম্নে, সে দুই-খানিকে কবরসাৎ করিল।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে চিকণ নীলাকে ডাকিয়া তাহার হস্তে (রূপালির অসাক্ষাতে) চারিটী রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিল। নীলা অবাক্ হইয়া বলিল, "কিসের টাকা?"

চি[illegible] সেই চিত্র দুইখানির বিক্রয়লব্ধ।

নী। "চার টাকা?" নীলা বিস্ময় সংবরণ করিতে পারিল না।

চি। চার টাকা কেন? এগার টাকায় দুই খানি বিক্রয় করিয়াছি—তাহার মধ্যে পাঁচ টাকা তোর পীড়ার কর্জ্জে গিয়াছে, আর যদি কিছু মনে না করিস্‌ ত বলি—আমার হাতটা আজকাল একেবারে খালি হইয়া পড়ায়, আমার ঘরের ভাড়ার বাবত অগ্রিম দুই টাকা আমি কাটিয়া লইয়াছি। বাকী চারি টাকা এই তোকে দিলাম।

নীলা সাশ্চর্য্যে চিকণকে বলিল, "তুমি কি বলিতেছ, আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে সে দুই খানির বড় জোর চারিটী পয়সা মাত্র দাম হইত—সে স্থলে এখানে এগারটী রূপার টাকা? যে দোকানে তুমি তাহা বিক্রয় করিয়াছ, তাহার দোকানী নিশ্চয়ই পাগল!"

চি। দোকানী পাগল নয়, তুই আমার পাগল মেয়ে। দিল্লীর মত সহরের, আর তোদের গ্রামের মত দরিদ্র গ্রামের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। দিল্লীর দোকানীরা না বুঝিয়া মাল গস্ত করে না।

বৃদ্ধ দুর্দ্দিনের জন্য যাহা সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহার এ দুর্দ্দিনে তাহা সার্থক হইল! দুঃখিনী নীলার নিরাশা-নীরস হৃদয় আশার বর্ষণে উৎফুল্ল হইল!

নীলাকে চিকণ রূপালীর নিকট অর্থাদি সম্বন্ধে কখনও কোনরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। নীলা চিকণের সে কথা অগ্রাহ্য করে নাই।

ক্রমে নীলা তাহাদের ভিতর এক জন হইয়া দাঁড়াইল। সে পল্লীর মন্দ লোকেরা কাণাকাণি করিত, নীলা চিকণেরই আত্মজা—হয় ত কোনও বিশেষ কারণে সে কথা সে স্বীকার করিতে সাহস করে না।

আর চিকণ—দ্বিগুণ উৎসাহে বৃদ্ধ দোকানে বসিয়া অবিশ্রাম কার্য্য করিতে লাগিল। সে বৎসর দিল্লীর দুঃসহ গ্রীষ্মের কষ্ট তাহার অনুভূতিতেই আসে নাই। পুরগের শীতল পুষ্পিত উপবন অপেক্ষা তাহার দিল্লী চৌকের ধূলাপূর্ণ দোকানখানি অনেকপরিমাণে আরাম-প্রদ বলিয়া সে অনুমান করিয়াছিল।

(৮)

ক্রমে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায়, গ্রীষ্মকাল শরৎকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিল।

চিকণের যত্নে এবং রূপালীর তত্ত্বাবধানে নীলা তাহার লুপ্ত স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৃদ্ধা কঙ্কালসার হতাশা রাক্ষসী নীলার কিশোর অন্তঃকরণ আপনার অধিকার-ভূমি স্থির করিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিতে না করিতেই, যৌবনের আজ্ঞাকারিণী দেব-কন্যা আশা তাহাকে চুলের মুঠি ধরিয়া তথা হইতে দূর করিয়া দিল! যৌবনের শক্তি সঞ্চালনে, এবং আশার তৃপ্তিকর সঙ্গীতে উৎফুল্ল থাকিয়া, নীলা মেঘমুক্ত নিশাকরের ন্যায় দিব্য-লাবণ্যে প্রতিভাত হইল!

চিকণের রুক্ষ জীবন-মরুভূমি এত কাল পরে স্নেহ মমতা ও আনন্দের পুণ্য জলপ্লাবনে, অতি কোমল উর্ব্বর মানস-ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে! তবে বড় আদরের জিনিস থাকিলে আশঙ্কা, ত্রাস, উদ্বেগ, তাহাতে যেন সদাসর্ব্বদা লাগিয়া থাকে, ছাড়িতে চায় না। চিকণেরও তাহাই ঘটিল। এত সুখে তার স্বস্তি নাই। নীলার মহদন্তঃকরণ, তাহার ততোধিক মহৎ চরিত্র, অসামান্য রূপ, নিতান্ত দারিদ্র্য, এবং অদম্য ওজস্বিতা, বৃদ্ধের বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংসারে সে অপরি-

চিন্তা, সংসার তাহার অপরিচিত—এ অবস্থায় এ তরুণ পথিক কুটিল সংসার-পথের সহস্র মরীচিকা উপেক্ষা করিয়া কি উপায়ে পথাতিবহন করিবে? হে ভগবান্! তাহার আশাতীত অথচ অনায়াস-লব্ধ রত্নটী সুব্যবস্থিত হইবার পূর্ব্বে, দেখিও ঠাকুর! বৃদ্ধ চিকণের ভাল মন্দ ঘটাইও না! তাহা হইলে সে স্বর্গে যাইলেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না!

যাহার জন্য চিকণের এত চিন্তা, তাহার কিন্তু কোনও দুশ্চিন্তা নাই। শীতের জোয়ার গাঙের প্রশান্ত হিল্লোলের মত, তাহার জীবন নিরুদ্বেগে ভবিষ্যৎ-সমুদ্র পানে ভাসিয়া যাইতেছে! দিবসের অধিকাংশ সময় তাহার চিত্রাঙ্কণে কাটিয়া যায়—অবকাশে সে কখন কোন দিন, প্রভাতে মধ্যাহ্নে কিংবা সন্ধ্যায়—চিকণ ও রূপালীর সহিত নগর-পরিভ্রমণে বহির্গত হয়। তাহার চিন্তা তাহার চিত্রে, তাহার কল্পনায়। চিকণের মুখ মলিন দেখিলে কখন কখন তাহার চিন্তা আসিত বটে—রূপালীর অপ্রসন্নমুখীতায়ও বালিকাকে চিন্তান্বিতার মত দেখাইত—কিন্তু মনের মধ্যে স্বীয় প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবা অর্চ্চনা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহার আদৌ অভ্যাস ছিল না।

চিকণ ভাবিত, 'আমার এ পঙ্কিল সংসার-তড়াগে আমার ঐ সোনার কমল ভাসাইয়া দিয়াছি—কিন্তু হেথায় ও কয়দিন বাঁচিবে? মলয়াগত মুক্ত সমীরণ, উদয়াচলের সদ্যঃস্নিগ্ধ অরুণালোক, মানস-সরোবরের সঞ্জীবন সলিল ভিন্ন অন্য কি উহাকে অনুপ্রাণিত রাখিতে পারে? হায় নীলা! রিপু-কর্ম্মকারের সংস্রবে, দরিদ্র এবং অশিক্ষিত সমাজে, তোমার মানসিক স্বাস্থ্যের লয় ভিন্ন পুষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? আর এক বিষম ব্যাপার—তাহার চিত্রকলা-উন্মাদ! সম্প্রতি আমার ছল বা প্রবঞ্চনার বাছা যেন ভুলিয়া আছে, কিন্তু তাহার এ মোহ ভাঙ্গিয়া যাইতেই বা কয়দিন? পৃথিবীর কোন্ দেশে—সৃষ্টির কোন্ যুগে, কবে—নারী চিত্র-কলায় পারদর্শিনী হইয়াছে?'

এই সকল চিন্তায় বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে বড়ই কাতর হইয়া পড়িত। জীবন স্বতঃই ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে সে বৃদ্ধ—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে, তাহার সন্ধ্যা আসিয়া তাহাকে অন্ধ করিবার পূর্ব্বে, অনাথার একটা উপায় করা আবশ্যক।—কিন্তু সে আপনি নিরুপায়, অন্যে উপায় তবে সে কেমন করিয়া করে?

এ সময়ে যদি সুরনাথ দিল্লিতে থাকিত! এক দিন বৃদ্ধ মনের চিন্তা মুখে উচ্চারণ করিয়া বলিল, "এ সময় যদি সুরনাথ দিল্লিতে থাকিত, তাহা হইলে তাহার সহিত পরামর্শ করিতাম। এ বিষয়ে আমাকে সদ্‌যুক্তি দান করিবার উপযুক্ত এক সুরনাথ ব্যতীত অন্য কেহই নাই।"

কিন্তু সুরনাথ কোথায়? সুরনাথ যে দিন মধ্যাহ্নে চিকণকে বাদশাহের চিত্রশালা দেখাইয়া লইয়া আসে, সেই দিনই সন্ধ্যায় স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছে, অদ্যাপি তাহার কোন বার্ত্তা নাই। সে চিত্রশালা দর্শনের দিন বৃদ্ধের চিরস্মরণীয়। তাহার স্মৃতির মানচিত্র-পটে সে দিন চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে;—সেই দিন অপরাহ্নে তাহার পথহারা নীলা প্রথম তাহার দোকানে আসিয়া পথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

তাহার পর কত দিন, কত মাস চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সুরনাথের কোনও উদ্দেশ নাই। চাঁদনী চৌকের পশ্চিম ভাগে, ন্যূনাধিক অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে, বিবিধ বৃক্ষ-চ্ছায়ায় শীতল তাঁহার অতি পরিচ্ছন্ন সুন্দর ভবনে দুই-চারিজন পরিচারক মাত্র বাস

করিতেছে। সুরনাথ ধূলি কঙ্কর আলোক এবং অত্যধিক জনতার খাসোরু সহর পরিত্যাগ করিয়া, জন্ম-ভূমির মমতা-মধুর সুন্দর এবং সুশীতল পল্লী-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আছে।

সুরনাথ দেবানুগৃহীত ক্ষণজন্মা পুরুষ। আচরণে বীর, পণ্ডিত, জ্ঞানী, এবং মহানুভব —ব্যবসায়ে চিত্রকর। সুরনাথ দিল্লির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর—স্বয়ং বাদসাহের বৃত্তি-ভোগী, এবং ভারতাকাশের তদানীন্তন সূর্য্য চন্দ্র সুগ্রহগণের সম্মান্য!

দিল্লির পঞ্চাশদধিক ক্রোশ দক্ষিণে, হীনা-বস্থ কোনও পল্লীগ্রামে, ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এক অতি দরিদ্র কৃষক-কুলে সুরনাথের জন্ম। সেই সুরনাথের খ্যাতির আজ সমগ্র ভারতবর্ষে স্থান-কুলান হয় না—তাহার তুলিকার উপার্জ্জনে সে আজ এক জন ধন-কুবের! তাই বলিতেছিলাম, সুরনাথ দেবানুগৃহীত ক্ষণজন্মা পুরুষ।

পৃথিবীর বারো আনা মানুষের পক্ষে—ধন এবং খ্যাতি শত্রুতার কার্য্য করে, মিত্রতার নয়। তাহাদিগের স্পর্শে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সাহচর্য্য একেবারে নষ্ট হয়। সুরনাথকে ধন এবং খ্যাতি স্পর্শ করিতে পারে নাই,—কি জানি কি দৈবী শক্তি তাহাদিগের স্পর্শ হইতে এতাবৎকাল সুরনাথকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

সুরনাথ অন্য সকলের নিকট অসামান্য হইলেও, বৃদ্ধ চিকণের নিকট সামান্য সুরনাথ মাত্র! সুরনাথের ধন এবং খ্যাতির সহিত সুরনাথের যেমন কোনও পরিচয় ছিল না, তাহাদিগের সহিত চিকণেরও তেমনই কোনও পরিচয় ছিল না।

এক দিন কথোপকথনের সময় অন্য-মনস্কে চিকণ একবার সুরনাথকে 'সুরনাথ বাবু' বলিয়া ফেলিয়াছিল,—তাহার পর পনর দিন সুরনাথ অভিমান করিয়া চি দোকানে আসে নাই।

তাই চিকণ মধ্যে মধ্যে ভাবিত, তাহার এই বড় সাধের, বড় সুখের বিপদে সে যদি সুরনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পাইত!

এমন সময় সহসা একদিন সন্ধ্যার সময়—অনাহূত, অপ্রত্যাশিত, সুরনাথ একমুখ হাসি লইয়া তাহার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল!

"চিকণলাল কেমন আছ বল? আমি এতদিন দেশে ছিলাম, কাল আসিয়াছি মাত্র—আবার কাল দিল্লি পরিত্যাগ করিয়া যাইব। দেশে তোমার জন্য বড় মন কেমন করিত। আমাদের গ্রামে মা লক্ষ্মীর শ্বশুর-বাড়ী; সেথায় কিছুরই অভাব বোধ হইত না—কেবল আমার কর্ণযুগল মাঝে মাঝে তোমার কথকতার অভাব অনুভব করিত। জলপ্রপাতের সে স্ফটিক তোমার কেমন আছে? তাহার কোনও অসুখ বিসুখ হয় নাই ত?"

হঠাৎ দোকানের ভিতর নজর পড়ায় সুরনাথ বলিয়া উঠিল, "ও আবার কি? চিত্রশিল্পেও হাত লাগাইয়াছ না কি? সর্ব্বনাশ! আমার রুটীটুকু মারিবার সঙ্কল্প করিলে কেন?"

(৯)

নীলার নিকট হইতে যে পটগুলি বিক্রয় করিবে বলিয়া চিকণ গ্রহণ করিত, তাহা তাহার দোকানের সিন্দুক-জাত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রথম দিন নীলার অঙ্কিত যে 'মদন-ভস্মের' আলেখ্য দেখিয়া বৃদ্ধ বিমুগ্ধ হইয়াছিল, সেখানি সে তাহার দোকানের দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল। সেই চিত্রে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায়, সুরনাথ বৃদ্ধকে তামাসা করিল।

চিকণ উত্তর করিল, "ওখানি বিক্রয়ার্থ। বিক্রীত হইলে উহার মূল্য চিত্রকরকে অর্পণ করিব। চিত্রটী কেমন হইয়াছে?" সুরনাথ চিত্র-পর্য্যালোচনে কিয়ৎক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া বলিল, "যদি শিখিবার বয়স থাকে, চিত্রকরকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও।"

"চিত্রে তাহার হাত আছে, মনে কর?"

"তাহার বয়স কত হইবে?"

"বড় জোর, ষোল।"

দেয়াল হইতে তুলিয়া চিত্রখানি হাতে লইয়া, সুরনাথ আপনার নিকট তখন যে কয়টী রৌপ্য মুদ্রা ছিল, চিকণকে তাহা প্রদান করিল—এবং যাইবার সময় বলিয়া গেল, "চিত্রে অমার্জ্জিত প্রতিভার দীপ্তি বিদ্যমান। চিত্রকরকে আমার কার্য্যালয়ে যাইতে বলিও—যাহাতে তাহার কিছু উপকারে আসি, এমন চেষ্টা করিব।"

চিত্রকর-সম্রাট্ সেই অতি সামান্য চিত্রখানি তৎপক্ষে অসামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া প্রস্থান করিল। সমস্ত দিল্লি—সমস্ত জগৎ সুরনাথের প্রতিভার অর্চ্চনা করিত। সেই খ্যাতনামা মহাপুরুষের সুখ শান্তির অবাধ স্রোত, প্রতিকূল-বায়ু-সঞ্চালিত কখন একটী 'কুটী'র আঘাতও সহ্য করে নাই—কোন্ শনির কুদৃষ্টি-আকর্ষণে সে আজ ভরা সন্ধ্যায় চিকণলালের ছিন্নবস্ত্রালয়ে আসিয়া 'মদন-ভস্মের' আলেখ্য উপলক্ষে আপনার সুখ সৌভাগ্যে চিরদিনের মত অগ্নিসংযোগ করিয়া গেল!

সুরনাথ চলিয়া যাইলে, চিকণলাল মনে মনে অনেক কথার আন্দোলন করিতে লাগিল। রাজপথে জনতারও বিরাম নাই—নানাবিধ ভাব ও শব্দসূচক কোলাহলেরও বিরাম নাই—তাহাতে কিন্তু চিকণের চিন্তার কোনরূপ কিছু আসিল যাইল না। অবশেষে নিদ্রাস্পর্শে চিন্তার সমাধি ঘটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থির হইল, পর দিন সুরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলাই বিধি। সুরনাথ কর্ম্মবীর—তাহার সৎসাহসের পরিসীমা নাই—প্রকৃত অনাথের সে প্রকৃত উপকারী বন্ধু। বিশেষ, সুরনাথে ন্যস্ত বিশ্বাস কাহারও কখন নষ্ট হয় নাই—পশু পক্ষীরাও নতমস্তকে এ কথা স্বীকার করিত।

দশ বৎসরের নিরক্ষর দরিদ্র গ্রাম্য বালক, পদব্রজে এবং প্রায় অনশনে, পঞ্চাশ ক্রোশ পথ অতিবাহন পূর্ব্বক দিল্লির ন্যায় সহরে একাকী আসিয়া উপস্থিত হয়,—এবং যাহার অঙ্কুশে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মহা মহা পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই নির্ম্মম অসুর দারিদ্র্যের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করে! বালক শ্রান্তি জানিত না—তাহার চরিত্রের অভিধানে 'আরাম' শব্দের অস্তিত্ব ছিল না। দিবায় তাহার যে কিছু মজুরি মিলিত, সে তাহাই করিত—রাত্রি তাহার শিক্ষা ও সাধনায় কাটিয়া যাইত। তাহার ষোড়শ বৎসর বয়সে, প্রকাশ্য সভামণ্ডপে, সেই অনামা দরিদ্র যুবাকে—চিত্রশিল্পে তাহার অনন্য-সাধারণ নৈপুণ্যের কারণ, দিল্লির প্রধান প্রধান ওমরাহগণ বিশিষ্ট অভিনন্দন প্রদান করেন, এবং পরক্ষণেই তাহার কুটীরাবাসে প্রত্যাগত হইয়া অনাহার-ক্লিষ্টতায় সে যুবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে! এমন বীরত্বে দেবতা প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারেন না!

সুরনাথের কল্পনার অভিনবত্বে, চিত্রের সজীবতায়, রঙ্গের অদ্ভুত ইন্দ্রধনু খেলা দেখিয়া, অনেকে তাহাকে যাদুকর বলিত। আলো যেমন অন্ধকারকে ঘৃণা করে, চিত্রশিল্পের নকলনবীশগণকে সুরনাথ তেমনই [illegible] করিত; পক্ষান্তরে, অপরিচিত

অথবা উপেক্ষিত প্রতিভা পতিত দেখিলে প্রভাতারুণের মৃদুস্ফ কিরণের মত তাহার আবরণস্বরূপ হইয়া, সুরনাথ তাহাকে সযত্নে পোষণ করিত। কারণ, সুরনাথ সকল সময়ে প্রতিভার পূজা করিত, যশের নয়। হালের শিল্পিগণ যশের উপাসক, প্রতিভার নয়।

তাই বলিতেছিলাম, এমন মনুষ্য-দেবতাকে কোন্ অলক্ষণে ভাগ্য সে দিন চিকণের দোকানে উপস্থিত করিয়াছিল। বুঝি বা একাদিক্রমে পনর ষোল বৎসর তাহার উপর প্রসন্ন থাকায় শ্রান্তি বোধ করিয়া, ভাগ্য এক্ষণে পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী হইয়াছিল, তাই!

চিকণ আপন চিন্তার বিষয় সুরনাথের গোচরীভূত করিবার কারণ পরদিন তাহার বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে

হরিৎ লতা হরিৎ পাতা শ্যাম-শস্যে ভরা ;
ভাঁড়ারখানি বুঝিয়ে দিয়ে হেমন্তের করে,—
"আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে মা-লক্ষ্মী গর্ভে বসে,"
শরৎ বুঝি চল্লো হেসে ফিরে আপন ঘরে।
"আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে মা লক্ষ্মী গর্ভে বসে"—
পল্লী-বালে মশাল জ্বালি গাইবে সারা রাত ;—
রাত পোহাবে শরৎ যাবে, আস্‌বে নূতন রাণী,—
এ বুঝি তার আগমনী গীতি সুপ্রভাত।
আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে রেতে বাড়ি বাড়ি—
ঘরের বুড়ি সাথে সাথে ছোট মেয়ে নিয়ে,
"অলক্ষ্মীর মুখে ছাই লক্ষ্মী এস বলি"—
অলি গলি আপদ্ তাড়ায় কুলোয় বাড়ি দিয়ে।
আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে ফুল্‌বে নূতন ধান,
সেই আমোদে ঋতু-রাণী করি আবাহন—
অজয় হইবে জানি বালক বৃদ্ধ যুবা,
প্রভাত হলে কর্‌বে সবে নিম্ব আস্বাদন।
লতায় পাতায় শিশির পড়ে সন্ধ্যা সকাল বেলা,
সাঁজের আগে হিমের ভয়ে বন্ধ ছেলের খেলা।
আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে 'নবান' দুদিন পরে,
নূতন ধানের খামার গৃহী কচ্ছে ঘরে ঘরে।
হিঁদুর ঘরের দুর্গা ঠাকুর ডুব্‌লো বলে জলে,
ফরসা হোলো দেশের নদী পলি পোলো তলে।
আশ্বিন যায় কার্ত্তিক এল শীতের খবর নিয়ে,
বাঁধ লো চাষী মাঠে কুঁড়ে গৃহ ছেড়ে দিয়ে।
আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে ভাঙ্‌লো মিলন টুক,
কর্ম্মী চলে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আশায় বাঁধি বুক।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাহিত্য-সংহিতা

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

২১

একুশ বৎসর বয়সে গদাধর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ, পরীক্ষাতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল, তখন আমাদের লালাস্রাবময়ী নায়িকা শ্রীমতী মানদা দেবী পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়া, শিখিকণ্ঠবর্ণ ক্ষুদ্র পট্ট বস্ত্রে পরিহিত হইয়া, পুণ্য পুষ্করিণী স্বহস্তে খনন করিয়া, শ্রীমতী ভুলী দেবীর শিক্ষকতায়, ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিল। বিল্বপল্লব-ছায়া-সমাকুল পুণ্যবাপীর সুসংস্কৃত তীরভূমিতে বসিয়া বালিকা মানদা ভক্তিগদগদ বালকণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ কোকিলকুহরণের ন্যায়, প্রত্যহ প্রভাতকালে গাহিত,—

পুণ্য পুকুর পুষ্পমালা।
কে পূজে রে দু'পর বেলা॥

প্রভাত রৌদ্রে সুকুমার মুখটি রক্তবর্ণ করিয়া, রৌদ্রালোকে কর্ণভূষা দুলাইয়া, নোলক নাড়িয়া গাহিত,—

আমি সতী লীলাবতী।
ভাই বোন পুত্রবতী॥

চন্দনচর্চ্চিত ললাট কুঞ্চিত করিয়া, গ্রীবা উচ্চ করিয়া গাহিত,—

হ'বে পুত্র ম'রবে না।
পৃথিবীতে ধ'রবে না॥

কণ্ঠের পুষ্পমালা দোলাইয়া, সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তপুষ্পদল তুল্য যুগ্ম করপল্লব ঊর্দ্ধে তুলিয়া ক্ষুদ্র কোমল ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া গাহিত,—

স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মেখ হরি পদতলে॥

সরস শ্যামল বঙ্গমাতার পরিশুষ্ক কণ্ঠে তৃষ্ণাকাতরতা দেখিয়া আমাদের মনে হয়, বুঝি এই পুণ্য পুকুরের সুধাগান আমাদের দেশে আর প্রভাত বিহঙ্গ কাকলীর সহিত বালিকাদিগের মধুর কণ্ঠে ঝঙ্কারিত হয় না। সরোবর প্রতিষ্ঠার পবিত্র প্রবৃত্তির বীজ, আমাদিগের বিশ্বাস, এই পুণ্যপুকুরের ব্রতের মধ্যে নিহিত আছে। সকল বীজেই যে গাছ হয়, এমত নহে। কিন্তু গাছের আবশ্যক হইলে বীজ বপন করিতেই হইবে। পুণ্যপুকুরের ব্রতধারিণী প্রত্যেক বালিকাই যে উত্তরকালে সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, এমত নহে; কিন্তু যে পুণ্যবতী রমণী বার্দ্ধক্যে সরোবর প্রতিষ্ঠার পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাঁহার বাল্য ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, বাল্যকালে তিনি পুণ্যপুকুরের ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সরোবর প্রতিষ্ঠা করাটা অন্য দেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; উহা বাঙ্গালীরই ধর্ম্ম। পুণ্যপুকুরের ব্রতও বাঙ্গালী বালিকারই ব্রত; উ[redacted]র কোথাও নাই।

সুলীর শিক্ষকতায় মানদা আরও কত ব্রতানুষ্ঠান করিল। নবীন দূর্ব্বাদল দ্বারা গাভীর সেবা শিক্ষা করিয়া, গোকালের ব্রত আরম্ভ করিল। চিত্রচর্চ্চায় দশপুত্তলি অঙ্কিত করিয়া স্বামিভক্তি শিক্ষা করিল। তাহার পর, সতীনকে গালাগালি দিবার মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিবার জন্য আর এক ব্রতের অনুষ্ঠান করিল। সে ব্রতের নাম সাঁজ পূজনীর ব্রত; জানি না, আমার পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ সে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছে কি না। তোমরা কি কেহ একটি পক্ষী অঙ্কিত করিয়া সেই অঙ্কনের উপর হস্তার্পণ করিয়া কহিয়াছ,—

ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না?

তোমরা কি কেহ পিটালি গুলিয়া, তদ্দ্বারা একটা গাছের মত চিত্র লিখিয়া তিনবার করিয়া বলিয়াছ,—

'অশথ তলায় বসত করি,
সতীন কেটে আলতা পরি।'

ইহা যদি তোমরা না বলিয়া থাক, তাহা হইলে বৃথায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। আমার নায়িকা, আমার মানদা বাঙ্গালী। ঘণ্ট-সুক্ত-ছ্যাচড়া-সড়সাড়-খাগীর, ক্ষীর সর-ননীভুক্তা কন্যা আসল বাঙ্গালী। সে পাঁচ বৎসর বয়সে সাঁজপূজনীর ব্রত করিয়া, সতীন হইবার পূর্ব্বে সতীনকে প্রাণ ভরিয়া গাল দিয়াছিল। তাহার গালির মন্ত্র হইতে মাছিটিও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। সে মাছির আকৃতির ন্যায় এক ক্ষুদ্র অঙ্কনের উপর, তাহার কঙ্কণধ্বনিত ক্ষুদ্র করতল বিন্যস্ত করিয়া কহিয়াছিল,—

মাছি, মাছি, মাছি,
সতীন ম'লে বাঁচি।

একবার নয়, তিনবার বলিয়াছিল,—

মাছি মাছি মাছি,
সতীন ম'লে বাঁচি।

ব্রত নিয়মের মাঝে, সীমাহীন আদর সোহাগের মাঝে, মনোমত মহার্ঘ সাজে সদা সজ্জিত থাকিয়া, সুবর্ণভূষায় ভূষিত হইয়া আদরিণী মানদা বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। তাহার আব্দারে, বাহানাতে, হাসিতে, কান্নাতে জমীদার বাবুর প্রকাণ্ড বাটী সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। তাহার আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, জাগরণে, বাটীর সমস্ত দাসদাসী বিব্রত হইয়া ফিরিত। সে ইলিস মাছের ডিম খাইতে এত ভালবাসিত যে, তাহার জন্য ইলিস মৎস্যকে বার মাস সসত্ত্বা অবস্থায় থাকিতে হইত। মেচুনি মাগী বার মাস জমীদার বাবুর আজ্ঞাক্রমে প্রত্যহ এক একটী গর্ভবতী ইলিস-যুবতী লইয়া হাজির হইত। তাহার পান জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করিতে হইলে, গোপবধূকে আপনার সনাতন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইত; দুগ্ধে এক বিন্দু নীর সংযুক্ত করিবার সৎসাহস তাহার অঞ্চলাবৃত অন্তঃকরণ মধ্যে উদিত হইত না।

মানদার মাতার নাম রত্নময়ী। বিবাহের পূর্ব্বে, তাঁহার নাম ছিল বিন্দুবাসিনী। কিন্তু বিবাহের সময় রত্নেশ্বর বাবুর পিতা কহিলেন যে, ও নাম ভাল নয়। তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার পুত্র রত্নেশ্বরের বধূর নাম রত্নময়ী হওয়া উচিত। তাঁহার পার্শ্বস্থ কয়েক জন ভদ্র ব্যক্তি কহিলেন, "হা, হা, বাবু মহাশয় যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন; রত্নময়ী নামটি অতি সুমধুর এবং বিশেষরূপ প্রযুজ্য; বধূর রত্নময়ী নাম হওয়াই উচিত। অতএব বিবাহের পর বিন্দুবাসিনী রত্নময়ী হইয়া গেল। রত্নময়ীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী বিবাহের সময় জীবিত ছিলেন না; এ নিমিত্ত বিবাহের অল্প দিন পর

হইতেই তিনি জমীদার বাবুর বিপুল সংসারের কর্ত্রী হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, রত্নময়ী কর্ত্রী হইবার পূর্ব্বে সেই কর্ত্তৃত্ববিহীন বৃহৎ পরিবার মধ্যে যে অতি বৃহৎ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত, তাঁহার অশিক্ষিত কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়াও, তাহার কিছুমাত্র অপনীত হয় নাই। তথাপি প্রতিবাসিনীগণ কোন প্রকার আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহাভিলাষিণী হইয়া, যখন তাঁহার নিকট সমাগতা হইত, তখন তাহারা অভিলষিত দ্রব্য করতলগত করিয়া কহিত যে, তেমন সুদক্ষ এবং সুচতুর এবং মধুরভাষিণী এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিনা গৃহিণী তাহারা বিশাল ভুবন মধ্যে কুত্রাপি নয়নগোচর করে নাই। এক্ষণে রত্নময়ী দেবী মানদার মাতা হইয়া এবং দৌহিত্র লাভ করিয়াও আপন গৃহ মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতরা শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে সক্ষমা হ'ন নাই। ফলতঃ প্রত্যেক লোকের নিকট হইতে অপরিমিত স্তুতি লাভ করা ব্যতীত গৃহিণীর যে অন্য কোনও কর্ত্তব্য সাধন থাকিতে পারে, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত ছিলেন না। অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, হীনা স্তাবকী পুরনারীগণের স্তুতিপূর্ণ মুখসকল মুখরিত করিয়া, সশব্দ চরণালঙ্কারে গৃহতল ধ্বনিত হইয়া, তিনি দিবাবসান কালে পুরীমধ্যে বিচরণ করিয়া, মনে করিতেন যে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বের কর্ত্তব্য সমস্তই প্রতিপালিত হইল। কন্যার জন্য নবীন ভূষা, স্বামীর নিকট প্রার্থনা করিয়া, এবং যথাসময়ে তাহা প্রাপ্ত না হইলে, মরণের দ্বারা জীবিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া, রত্নময়ী মনে করিতেন যে, একমাত্র আদরিণী কন্যার প্রতি পরম স্নেহময়ী মাতার সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়া গেল। স্বামীর আহার কালে তালবৃন্ত-সঞ্চালনে মক্ষিকাকুলকে বিতাড়িত করিয়া, তিনি মনে করিতেন, স্বামিসেবারূপ সুকঠিন ব্রতের প্রত্যেক ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

রত্নময়ীর চরিত্রচিত্রন জন্য আমরা উপরে যে কয়েক পংক্তি লিখিলাম, তাহা হইতেই তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে, মানদা কিরূপ মাতার কন্যা। মাতাকে দেখিয়া, তোমরা কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন চিত্রিত করিয়া লও।'

২২

বি, এ, পরীক্ষা যখন খুব নিকটবর্ত্তী, তখন প্রবেশিকার ফল বাহির হইল। জ্ঞানদা বাবু সংবাদ-পত্র লইতেন বটে, কিন্তু প্রায় তাহা পাঠ করিতেন না। এবার তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত সংবাদপত্র খুলিয়া বসিলেন। দেখিলেন, গদাধর তাঁহাকে বহুপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য হইয়াছে! তাঁহার প্রথম পুত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ধন্য গদাধরের যত্ন; তাহার কোন পুরুষে যে কাজ পারে নাই, স্বপ্নেও যাহার জন্য তিনি আশা করেন নাই, গদাধর তাহাই সফল করিয়াছে। তিনি গদাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কহিলেন, "গদাধর, আজ তুমি আমার মনে যে আহ্লাদ দিয়াছ, তাহার জন্য আমার নিকট কোনও পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

গদাধর। আপনার মনে সন্তোষ জন্মিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক কি পুরস্কার আছে। আপনার আহ্লাদ দেখিয়া আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছি।

জ্ঞানদা বাবু। না, হে, তোমার ও সব বাজে কথা আমি শুনিব না। আজ তোমার কিছু চাহিতেই হইবে। যা' চাহিবে দিব।

গদাধর। তাহা হইলে চাহিব? কিন্তু বোধ হয়, আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবেন না।

জ্ঞানদা। নিশ্চিত পারিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ তুমি যাহা চাহিবে, সাধ্য থাকিলে, তাহা আমি তোমায় দিব। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরার আংটী, সোনার হার, কি চাও? যদি এ সবই চাও, সবই দিব। যদি নগদ টাকা চাও, তাহাও দিব।

গদাধর। আপনি আগে প্রতিজ্ঞা করুন যে দিব; তাহার পর আমি চাহিব।

জ্ঞানদা। এইত প্রতিজ্ঞা করিলাম, আবার কি প্রতিজ্ঞা করিব? আচ্ছা, আমি তিনবার বলিতেছি যে, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব, করিব করিব।

গদাধর। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি আজ হইতে, আপনার এই অত্যন্ত আনন্দের দিন হইতে, মদ খাওয়াটা ছাড়িয়া দিন।

জ্ঞানদা। সর্ব্বনাশ!

গদাধর। সর্ব্বনাশ কেন? আপনি তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া কি তাহা রক্ষা করিতে পারিবেন না?

জ্ঞানদা। কিন্তু কেন তোমার এরূপ খেয়াল হইল?

গদাধর। আপনার অন্নে আমি প্রতিপালিত। আপনাকে নিন্দাশূন্য এবং নীরোগ করিতে পারিলে আমার জীবন সার্থক হইবে। আপনার অনিন্দনীয় চরিত্রে কেন এ কলঙ্ক লিপ্ত করিয়া রাখিবেন? এই রোগপ্রবণ, উন্মাদকর দ্রব্যের দ্বারা কেন আপনার ভঙ্গুর স্বাস্থ্যকে ভগ্ন করিবেন? আপনার অবসাদময় মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হয় যে, আপনার দেহ মধ্যে কোন আভ্যন্তরিক রোগ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার ন্যায় আশ্রিতের প্রতি সদয় হইয়া এ রোগজনক অভ্যাস পরিত্যাগ করুন।

জ্ঞানদা। গদাধর, আমি তোমার কথা শুনিব। আমি বেশ বুঝিতেছি যে, তোমার কথা শুনিলে আমার ভাল হইবে।

গদাধর। আপনার কথা শুনিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। আমি ধন্য হইলাম।

সেই দিন, সন্ধ্যাকালে জ্ঞানদা বাবুর মনোমধ্যে বাসনা এবং সংযম উভয়ে মিলিয়া ভারি লড়াই বাধাইয়াছিল। তিনি ভৃত্যকে দুইবার আহ্বান করিলেন; দুই বার তাহাকে কহিলেন যে, তাঁহার কোন আবশ্যক নাই। সে জানিত না যে তাহার প্রভুর হৃদয়ে এক ভয়ঙ্কর সমর চলিয়াছিল; সে অকারণ আহ্বানে আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া গেল। আবার তিনি তাহাকে আহ্বান করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাটীতে কয় বোতল হুইস্কি বা ব্রাণ্ডি মজুদ আছে। সে গণনা করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল। জ্ঞানদা বাবুর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রলোভনটা বড় উজ্জ্বল বেশে তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। জ্ঞানদা বাবু আসন ত্যাগ করিয়া অন্য আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। ভৃত্যকে কহিলেন, "তুই চলিয়া যা।" হে বিপন্নের আশ্রয়, হে আশ্রয়হীনের বন্ধু, হে সর্ব্বরক্ষক, জ্ঞানদা বাবু আজ বড় বিপন্ন হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর। তুমি রক্ষা না করিলে বুঝি ভাগ্যহীন আবার বাসনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইবে। তুমি একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, তুমি তাহাকে উদ্ধার কর। ধন্য তিনি! তাঁহার অমোঘ শক্তি জ্ঞানদা বাবুর মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইল। সংযমের নিকট বাসনা পরাজিত হইল।

রাত্রে, অন্তঃপুরমধ্যে শয়ন করিলে পর, গৃহিণী আসিয়া জ্ঞানদা বাবুর সেবা করিলেন। সেবায় তৃপ্তি লাভ করিয়া জ্ঞানদা বাবু গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই অন্য কোন দিন ত তুমি এত আদর কর নাই।"

গৃহিণী কহিলেন, "আমি প্রত্যহই প্রাণপণে তোমার সেবা করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি মদ্য পানে অচেতন থাক, এজন্য কিছুই অনুভব করিতে পার না। আজত তুমি মদ খাও নাই?"

জ্ঞানদা বাবু শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—"না, আজ আমি মদ খাই নাই। যদি ভগবান্ কৃপা করেন, তাহা হইলে জীবনে আর কখন খাইব না। দেখ, এই মদটা আমাদের কি একটা বিপুল সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল। ভক্তিমতী স্ত্রীর সেবা পৃথিবীর জিনিষ নহে এবং স্বর্গেও বোধ হয় সুলভ নহে। এত দিন এই সেবায় পরম তৃপ্তি অনুভবে আমি বঞ্চিত ছিলাম। দেখ, গদাধর সহজ বালক নহে। দেখিয়াছ ত, সে সেদিন কুস্তিতে রতন সিংকে কত সহজে পরাজিত করিল। আর, এখন আমার হাত কিছু অবশ হইয়াছে, পাখোওয়াজ বাদ্যে বুঝি সে আমাকেও পরাজিত করিবে; কি মিঠা হাত! খোকাকে পড়াইবার জন্য এত যত্ন করিল যে, আমার মত মূর্খ পিতার সন্তান হইয়াও সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল. ইহাতে যখন আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলাম, সে ঘড়ি, চেন, আংটি টাকা কড়ি কিছুই লইল না। দরিদ্র গদাধর অক্লেশে, অম্লানবদনে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমার প্রার্থনা যে, আজ হইতে আপনি সুরাপান ত্যাগ করেন, আমার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" সে যখন এই কথাটা কহিল, তখন ত তাহার মুখ তুমি দেখ নাই। তাহার চোখ দেখিয়া আমার ভয় হইল। তাহার বিনীত প্রার্থনাটা যেন একটা বিচারপতির আদেশ বলিয়া মনে হইল। আমার সে আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য রহিল না। তুমি কতবার আমাকে বারণ করিয়াছ, কতবার আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছ, তথাপি আমি এই কু অভ্যাসটা ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু আজ গদাধরের মুখ হইতে কথা বাহির হইবামাত্র, আমি বলিয়া ফেলিলাম. 'গদাধর, আমি তোমার কথা শুনিব।' তুমি হয়ত জান না; কিন্তু পৃথিবীতে এক একটা এমন মানুষ আছে যে, তাহাদের কথা অমান্য করা চলে না; তাহা পালন করিতেই হইবে। গদাধর সেই জাতীয় মানুষ। তাহাকে তুমি সহজ লোক মনে করিও না।"

মৌনাবলম্বিনী হইয়া, স্বামীর বাক্পটু মুখের দিকে বিশাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জমীদার-পত্নী সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার বক্ষ মধ্যে স্নেহ-সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেই দিন হইতে তাহার চক্ষে গদাধর পুত্রাধিক প্রিয় হইল।

পর দিন প্রত্যুষে অতুলানন্দ গদাধরকে আসিয়া কহিল, "ওহে! তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন যে পার্ক ষ্ট্রীটের ধারে, গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে যে তিন বিঘা এগার কাঠা জমী তাঁহার নামে খরিদ করা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই তোমাকে দিতে হইবে। আমার প্রতি হুকুম হইয়াছে যে, অদ্যকার মধ্যেই উকিলের কাছে যাইয়া দানপত্রের লেখা পড়া সম্পাদন করিতে হইবে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপাততঃ এ কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তা বলিয়া ফেলিলাম।"

শুনিয়া, গদাধর তাহার পিতাকে পত্র লিখিল,—"বাবা, সে দিন, আপনার পত্র পাইয়াছিলাম। কিন্তু এবার তাহার উত্তর লিখিতে একটু দেরী হইয়া গেল। আমি

একটা বিষয়ে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি। জ্ঞানদা বাবুর পুত্র প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, আমারই যত্নে সে পরীক্ষাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহা মনে করিয়া, তাঁহারা আমাকে একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের জমী দান করিতেছেন। আমি ইহা লইব কি? তাঁহারা আমাকে বেতন এবং আশ্রয় দুই দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কি এ পুরস্কার লওয়া সঙ্গত? আমরা দরিদ্র; কলিকাতার ভিতর এই মূল্যবান্ জমী লইয়া কি করিব? কি করা কর্ত্তব্য, আপনি শীঘ্র উপদেশ দিবেন। আমি আপনার আশীর্ব্বাদ পত্রের আশায় রহিলাম। আর চার দিন পরে আমাদের বি, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পরীক্ষা শেষ হইলেই আমি বাটী যাইব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি। সেবক গদাই।"

এ পত্র সুখসংবাদ লইয়া যখন মধুসূদনের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি সাংঘাতিক রোগে শয্যাগত। পত্রের উত্তর লিখিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। উমাকালী চক্রবর্ত্তী আসিয়া কহিল, "ভায়া, ডাক্তার বলিতেছেন, তোমার রোগটা শক্ত। গদাধরকে সংবাদ দিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি কি বল?" মধুসূদন ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "না, না, আমার পীড়া কঠিন নহে। তোমরা গদাধরকে পত্র লিখিও না। আমার পীড়ার জন্য চিন্তিত হইলে, সে আর পরীক্ষা দিতে পারিবে না। আর দুই দিন পরেই তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। এই দেখ সে, আমায় পত্র লিখিয়াছে।" এই বলিয়া, মধুসূদন গদাধরের পত্র উমাকালীর হস্তে প্রদান করিলেন।

২৩

পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায় গদাধর উদ্বিগ্ন চিত্তে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু সে প্রতীক্ষিত পত্র আর আসিল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অতি ভীষণ আতঙ্ক আসিয়া আশ্রয় লইল। সে অতি কষ্টে মনকে শান্ত করিয়া চারি দিন পরীক্ষা দিল।

পরীক্ষার পঞ্চম বা শেষ দিনের প্রত্যূষে চিন্তাভারে ম্রিয়মাণ হইয়া, সে ডাকহরকরার প্রত্যাশায় দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান ছিল। ভাবিতেছিল, পরীক্ষা না দিয়া, ইতিপূর্ব্বেই তাহার বাড়ী যাওয়া উচিত ছিল। পিতা হয়ত কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়াছেন। হয়ত তাঁহার হাত এমন অবশ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকেও পত্র লিখিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। চক্রবর্ত্তী কাকা কি করিলেন? তাঁহাকেও ত পত্র লিখিয়াছি; তিনি উত্তর দিলেন না কেন? আর সে থাকিতে পারে না। মনের এই উদ্বেগ লইয়া কলিকাতায় আর এক দণ্ডকাল অবস্থিতি করা তাহার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষা থাক্, সে আজই বাড়ি যাইবে।

জ্ঞানদা বাবুর অনুমতি লইবার জন্য সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। রাস্তায় প্রান্তে ডাক-হরকরাকে দেখিয়া, সে স্থির হইল। হরকরা আসিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিল। পত্র তাহারই, হস্তাক্ষরও পরিচিত। পত্র অম্বিকা দেবীর লিখিত। পত্র মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি লেখা ছিল।—"গদাধর, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করিও। আজ বাবার সহিত আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম। তোমার পিতা পীড়িত। আগামী কল্য তোমার পরীক্ষা শেষ হইবে। পরীক্ষা

শেষ হইবামাত্র তুমি বাটী আসিও। বাবা তোমাকে অকারণ উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিতেছেন। ভরসা করি, তুমি ভাল আছ। ইতি। প্রণতা অম্বিকা।”

পত্র পাঠ করিয়া, জ্ঞানদা বাবুর অনুমতি এবং সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করিয়া, হাটখোলার ঘাটে আসিতে কে জানে গদাধরের কয় মিনিট সময় লাগিয়াছিল? মাতা তীর-ভূমির নিবিড় ক্রোড়ে এবং ভাগীরথীর শুভ্র কোমল তরঙ্গ শয্যায় শুইয়া, এবং আপনাদের মুখ হইতে অতি কোমল ও অতি শুভ্র কুজ্ঝটিকায় আস্তরণটি অপসারিত করিয়া নৌকাসকল ‘মাতৃস্তন পানরত’ শিশুগুলির মত তটলগ্ন হইয়াছিল। গদাধর একখানি ক্ষুদ্র তরণী বাছিয়া লইল। মাঝিকে কহিল, ‘ছাড়িয়া দাও, নাড়িচা যাইতে হইবে।’ মাঝি গদাধরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং বাক্যব্যয় না করিয়া দুইজন দাঁড়ি লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা জোয়ারের টান মুখে লইয়া নাড়িচার দিকে ছুটিল। কিয়দ্দূর গমনের পর, গদাধর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, “মাঝি, তোমার কি আর একখানা দাঁড় আছে? আমাকে দাও, আমিও টানিব।” মাঝি নৌকার পার্শ্বে যেখানে আর একখানা দাঁড় ছিল, তাহা দেখাইয়া দিল। গদাধর ক্ষেপণী গ্রহণ করিয়া, তাহা স্রোত মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া আকর্ষণ করিল। তরণী উন্মত্তবেগে নাড়িচা অভিমুখে ছুটিল।

বেলা দশটার সময় বাটী পৌঁছিয়া গদাধর মৃত্যুশয্যায় শয়ান পিতাকে দেখিল। তাহার মহাবলশালী বিপুল দেহ সহসা শক্তিহীন হইয়া গেল। সে পিতার চরণতল তপ্ত অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ডাকিল, ‘বাবা।’ সে কণ্ঠস্বরে ভীত হইয়া, বুঝি যমরাজও আপনার নিদারুণ কর্ত্তব্য ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে সুধাপূর্ণ আহ্বান মৃত সঞ্জীবন মন্ত্রের ন্যায় মধুসূদনের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া চকিতনেত্রে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দ্বারদেশে রোরুদ্যমানা পত্নীকে দেখিয়া কহিলেন, ‘তুমি কাঁদিও না; তোমার চোখে জল দেখিলে গদাই আমার অস্থির হইয়া পড়িবে।’

উমাকালী চক্রবর্ত্তী দাওয়ায় বসিয়া কহিল, “আহা হা, হরি হে।”

গদাধর তাহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “চক্রবর্ত্তী কাকা, ডাক্তার কখন্ আসিবেন? নান্দীগ্রামের গোবিন্দ ডাক্তারকে কি আনা হইয়াছিল?”

উমা। হাঁ, তাঁহাকেও আনা হইয়াছিল। চিকিৎসার কোন ত্রুটী হয় নাই। কালী-দহের কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় এবং তাঁহার সেই কন্যাটি, বাবাজি, অদ্ভুত লোক। তাঁহারা নিজ ব্যয়ে দেশের যত ডাক্তারকে জড় করিয়াছিলেন। এবং সেই কন্যাটি নিজে রাত দিন বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করি-তেছেন। ধন্য তাঁহারা! কিন্তু যাহার আয়ু শেষ হইয়াছে, মানুষে তাহার কি করিবে? তুমি কাঁদিও না, বাবাজি। তোমার কান্না দেখিলে মধু ভায়া অস্থির হইয়া পড়িবে। আহাহা, কর কি, তুমি যে আমাকে শুদ্ধ কাঁদাইয়া দিলে?

কথাটা ঠিক সত্য নহে। উমাকালী পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, কথা কহিতে কহিতে কতবার নয়নাশ্রু নয়নকোণ অতিক্রম করিয়াছিল। এক্ষণে বলিষ্ঠ যুবক, পুত্রস্থানীয় অশ্রুপ্লাবিত গদাধরকে শোকবেগে পিতৃপদতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া তাহার বাক্য কণ্ঠমধ্যে রুদ্ধ হইয়া গেল। নয়নজলে, তাঁহার গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিল।

পূর্ব্ব রাত্র হইতে অম্বিকা গদাধরের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, মধুসূদনের শুশ্রূষা করিতেছিল। আজ বেলা এক প্রহরের পর উমাকালী আসিয়া, তাহাকে স্নান আহার জন্য আপন বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে সে স্নান আহার সমাপন করিয়া, উন্মুক্ত, নিবিড় কেশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা দেবীর ন্যায়, রোগীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, গদাধর তাহার পত্রপ্রাপ্তিমাত্র বাটী আসিয়াছে। বুঝিল, সে শেষ দিনের পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে নাই; পিতাকে দেখিবার জন্য পত্র প্রাপ্তিমাত্র ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহার পিতৃভক্তি বিদ্যাগৌরবকে পদদলিত করিয়াছে। সে মনে মনে বলিল, দেবতা, তোমার পূজার আসন, আমার হৃদয় মধ্যে আরও উচ্চে উঠিল।'

মধুসূদনকে সম্বোধন করিয়া অম্বিকা কহিল, "বাবা আপনার ঔষধ খাইবার সময় হইয়াছে. ঔষধ খা'ন।"

মধুসূদন অম্বিকার মুখের দিকে আপনার ক্ষীণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "মা, ঔষধ আর নহে। আমার ঔষধ ঐ দেখ।" এই বলিয়া, দুইটি ক্ষীণ হস্ত উত্তোলন করিয়া, মধুসূদন গদাধরকে দেখাইয়া দিলেন।

পিতার কথা শুনিয়া, গদাধর শোকবেগে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িল। তাহার কপোল প্লাবিত করিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিল। গদাধর কাতরকণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা।'

মধুসূদন কহিলেন, "বাবা আমার! গদাই আমার! আর আমাকে ডাকিও না। আমার পৃথিবীর কাজ ফুরাইয়াছে। আর আমার পৃথিবীতে থাকিবার অধিকার নাই। তোমার ডাক শুনিলে আমার স্বর্গে যাওয়াও কঠিন হইবে। তোমাকে শেষ আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এ প্রাণ রাখিয়াছিলাম। এখন তুমি আসিয়াছ। পুত্রের কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর। তোমার অঞ্জলি পূরিয়া গঙ্গার জল আমার তৃষিত মুখে ঢালিয়া দাও। কানে, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্ত্তন কর। অধীর হইও না। কঠিন এ কর্ত্তব্য, তথাপি ইহা তোমাকে পালন করিতে হইবে। বৎস, যত দিন পৃথিবীতে থাকিবে, কর্ত্তব্য যতই কঠিন হউক, তাহা হইতে যেন কখনও তোমাকে পরাঙ্মুখ হইতে না হয়। আমি আমার আসন্নকালে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি যেন কর্ম্মবীর হইয়া পৃথিবীর উপকারের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে পার।"

উমাকালী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "বাবা, দাও তোমার বাবার মুখে আর একটু গঙ্গাজল। মধু ভাই, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমার গদাইএর হাতে গঙ্গাজল পান করিয়া তোমার মত মরিতে পারি। মধু, ভাই আমার, তুমি গদাধরকে আর একটি আশীর্ব্বাদ কর। তোমার মুখের বাণী মিথ্যা হইবে না। সে যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার মত পিতা লাভ করিতে পারে।"

মধুসূদন কহিলেন, "গদাই আমার বংশের তিলক। ও আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। জানি না, কোনও জন্মে আমি এমন পুত্র লাভ করিতে পারিব কি না। দীনবন্ধু, অসহায়ের সহায়, তুমি আমার বাছাকে রক্ষা করিও, সংসারে তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দিও।"

অম্বিকা মধুসূদনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার কপালে আপন শীতল হস্ত বিন্যস্ত করিল। ধীরে ধীরে তাঁহার শিথিল হস্ত তুলিয়া আপন ক্রোড়ের উপর রাখিল।

তাহার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর, আপনার অশ্রুভারাক্রান্ত বিশাল আঁখি তুলিয়া উমাকান্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

উমাকান্ত কহিল, 'বুঝিয়াছি।' এবং উঠিয়া, ত্বরিত পদে গ্রামের কয়েকটি লোককে ডাকিয়া আনিল। বেলা তিনটার সময় মধুসূদনকে তীরস্থ করা হইল। গদাধরের হাহাকার ধ্বনিতে গ্রামের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া গেল। আকাশের উদার বক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল।

২৪

ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, বিপদ্ কখনও একাকী আসে না। এ কথাটা যে অত্যন্ত সত্য, তাহা বাস্তব জীবনে আমরা কতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পিতৃবিয়োগের অসহ্য ব্যথায় গদাধর যখন আহার নিদ্রা ভুলিয়া ধূলিতে বিলুণ্ঠিত ছিল, বিধাতা তখন সেই কাতরের মস্তকে আর একটা নিদারুণ বজ্রাঘাত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। যেন তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এই অসীম নির্দ্দয়তার পরও মানুষ তাঁহাকে করুণাময় বলে কি না। স্বামীর মৃত্যুর সাত দিন পরে গদাধরের মাতা বিসূচিকা রোগে পরলোকগত স্বামীর পদানুসরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া পল্লিবাসিনীগণ কহিল, "আহা! এমন পুণ্যবতী আর দেখি নাই; দশ দিনও স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করিল না।"

শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হইবার পর, একদিন অম্বিকা, পিতার সহিত, গদাধরের নিকট আসিয়া কহিল, 'চল গদাধর, কিছুদিন তুমি কালীদহে যাইয়া আমাদের বাটীতে অবস্থিতি করিবে।' গদাধর কহিল, "না, অম্বিকা, এখন তুমি এ অনুরোধ করিও না— এখন আমি এ গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিব না। এ গৃহ এখন আমার পবিত্র তীর্থস্থান হইয়াছে। এই গৃহের আকাশে তাঁহাদের আদরবাণী ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহাদের পদস্পর্শপূত ধূলিতে এ গৃহতল পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। এ তীর্থ ছাড়িয়া এখন কোথাও যাইব না।' অম্বিকা আর সে কথা উত্থাপন করিল না। অন্যান্য প্রস্তাবে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, গদাধরের হৃদয়ের বেদনাভার আপনার হৃদয় মধ্যে বহন করিয়া সে পিতার সহিত কালীদহে ফিরিয়া গেল।

গদাধর নাড়িচা গ্রামে দুই মাস থাকিবার পর একদিন জানিতে পারিল যে, বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে গদাধরের নাম ছিল না। আমরা পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, যে সকল বিষয়ে গদাধর পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যকটিতে সে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চম দিনে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ান পিতাকে দেখিবার জন্য, পরীক্ষা দিতে পারে নাই। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সে অনুপযুক্ত।

তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াতে গদাধরের কোনও প্রকার ক্ষতি ছিল না। সে মনে করিয়াছিল যে, সংসারে তাহার সকল কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে। বিদ্যাগৌরব লাভে তাহার আর আস্থা ছিল না।

কিন্তু অম্বিকা ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে ধীরে ধীরে গদাধরের শোকক্ষতের উপর আপনার অপরিসীম স্নেহের স্নিগ্ধ প্রলেপ অনুলেপন করিতেছিল। আপনার মধুর আকর্ষণে তাহাকে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত

কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া আনিতেছিল। আপনার প্রাণ ঢালিয়া, গদাধরের প্রাণে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিতেছিল। তাহার কাতরতা আপনি গ্রহণ করিয়া, তাহার হৃদয়ভার লঘু করিয়া দিতেছিল। মহিমাময়ী আপন মহিমাপ্রভায় গদাধরের অন্ধকার হৃদয় প্রভাসিত করিয়া তুলিতেছিল!

মাতাপিতৃবিয়োগের তিন মাস পরে গদাধর উমাকালী চক্রবর্ত্তী এবং কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে এবং জ্ঞানদা বাবুর নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ পত্র প্রাপ্ত হইয়া, কালীদহ গ্রামে দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, কলিকাতা রওনা হইল। ছাদে দাঁড়াইয়া অম্বিকা দেখিল, গদাধরের নৌকা গদাধরকে সগৌরবে ক্রোড়ে করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। তাহার মনে হইল, যেন তাহার প্রাণটা তাহার দেহ ছাড়িয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসিতেছে। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ অম্বিকা সেই তরণীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর, সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসিল।

গদাধর কলিকাতায় ফিরিয়া আবার পাঠে মনোনিবেশ করিল। সে চব্বিশ বৎসর বয়সে বি, এ, পরীক্ষাতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল। পঁচিশ বৎসর বয়সে সে ইংরাজি ভাষায় এম, এ, পরীক্ষা দিল। সেই বৎসর সি, ম্যানফিল্ড নামক একজন ইংরাজ প্রফেসর ইংরাজিতে এম, এ, পরীক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু গদাধর তাহাকে পরাজিত করিয়া, প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাতে বাঙ্গালী-সমাজ মধ্যে একটা সুখ্যাতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলেই বলিল, "এমন ছেলে দেখা যায় না।" ছাব্বিশ বৎসর বয়সে সে 'রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ' বৃত্তি গ্রহণ করিল। জ্ঞানদা বাবু গদাধরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই বৃত্তির টাকা এবং আমার নিকট কর্জ্জ স্বরূপ ষোল হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া পার্ক ষ্ট্রীটে তোমার যে জমী আছে, তাহার উপর একটি গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দাও।" গদাধর ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতে যাইলে, তিনি কহিলেন, "ইহা তোমার শুনিতেই হইবে; আমি তোমার কোন আপত্তি শুনিব না। আমরা এতদিন তোমাকে যত্ন করিয়া, আদর করিয়া মানুষ করিলাম; আর তুমি আমাদিগের একটা তুচ্ছ অনুরোধ রক্ষা করিবে না?" সুতরাং পার্ক ষ্ট্রীটে গদাধরের জন্য গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। আপাততঃ একতলা গৃহই প্রস্তুত হইল। সাতাইশ বৎসর বয়সে, গদাধর বি, এল, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া, আলিপুরের আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিল। এবং জ্ঞানদা বাবুর নিকট বিদায় লইয়া, সে আপন বাটীতে আসিয়া বাস করিল। গৃহপ্রবেশের দিন জ্ঞানদা বাবুর স্ত্রী স্বয়ং নূতন বাটীতে উপস্থিত হইয়া উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

যখন ওকালতিতে গদাধরের একটু পসার হইল, যখন রূপচাঁদের চাকচিক্যে, লোকের নয়নে তাহার কৃষ্ণাবয়ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন তাহার প্রতি কন্যাভারাক্রান্ত পিতৃমাতৃকুলের আকুল দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হইল। কন্যার অভিভাবকগণ ঘন ঘন গদাধরের বাটীতে পদধূলি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলকেই গদাধর অতি গম্ভীর মুখে এক উত্তর দিল, "মহাশয়, আপনার কন্যার জন্য অন্য পাত্র অনুসন্ধান করুণ; আমার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পাত্রকে কোন কন্যাই পছন্দ করিবে না; বিশেষতঃ অন্য এক পাত্রীর সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে।"

গদাধর কন্যাভারগ্রস্ত পিতৃগণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য মিথ্যাকথা কহে নাই। সে ইতিপূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, যদি অম্বিকার অমত না থাকে, তাহা হইলে, বিধিলিপিকে মিথ্যা করিয়া, সে তাহাকেই বিবাহ করিবে। সে এখনও এ বিষয় কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের নিকট বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, যদি বিবাহ করিতেই হয়, তাহা হইলে অম্বিকা দেবীকে সে বিবাহ করিবে। হায়! মানুষে যাহা স্থির করে, বিধাতা কি তাহা সফল করিয়া দেন? ইচ্ছা করিবার সামর্থ্য মাত্র তিনি মানুষকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা ফলবতী করিবার শক্তিকে, ইচ্ছাময় আপন ইচ্ছাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। গদাধর ত জানিত না যে, তাহার বাসনা পূর্ণ হইবার নহে।

একদিন জ্ঞানদাবাবু গদাধরের বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। নানারূপ কথাবার্ত্তার পর, তিনি গদাধরকে কহিলেন, "দেখ, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলিতে আমি ভুলিয়া যাইতেছিলাম।"

গদাধর। কি কথা?

জ্ঞানদা। তোমাদের গ্রামে একজন উমাকালী চক্রবর্ত্তী আছেন?

গদাধর। হাঁ, তাঁহাকে আমি 'চক্রবর্ত্তী কাকা' বলি। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন।

জ্ঞানদা। তাঁহার নিকট হইতে এক পত্র লইয়া একজন ঘটক আমার নিকট আসিয়াছিল।

গদাধর। ঘটক?

জ্ঞানদা। তোমাদের গ্রামের নিকট কালীদহ নামে এক গ্রাম আছে?

গদাধর। আছে। আপনাকে বুঝি আগে বলি নাই?

জ্ঞানদা। সেই গ্রামের একজন প্রধান লোকের কন্যার সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া, ঘটকঠাকুরটি আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে আগামী কল্য আসিতে বলিয়াছি। কেমন? এ বিবাহে তোমার মত আছে ত? শুনিলাম কন্যাটি অত্যন্ত সুন্দরী এবং বয়স্থা।

গদাধর। কন্যার পিতার নামটি কি?

জ্ঞানদা। নামটি ঠিক স্মরণ হইতেছে না। কি চট্টোপাধ্যায়।

গদাধর চিন্তিত হইল। চট্টোপাধ্যায়ের বয়স্থা সুন্দরী কন্যা? কে এ? জিজ্ঞাসা করিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা এ বিবাহ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন।"

জ্ঞানদা। তিনি লিখিয়াছেন যে, এ বিবাহে গদাধরের ভাল হইবে। ইহাতে, তোমার যাহাতে অমত না হয়, তাহা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তোমার অমত হইবার ত আমি কোনও কারণ দেখি না। কেমন? রাজি ত?

গদাধর আবার চিন্তিত হইল। ভাবিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা যখন এরূপ পত্র লিখিয়াছেন, তখন নিশ্চিত তিনি কন্যার পিতার নিকট পরিচিত। কিন্তু আমি জানি, তিনি কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় ছাড়া, কালীদহ গ্রামের অন্য কোনও লোকের সহিত পরিচিত নহেন। আর আমাকেও ত কালীদহের অন্য কোনও ব্যক্তি জানে না; না জানিয়া, না দেখিয়া কেহ কি আপন কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইয়া দেয়? আবার শুনিলাম, কালীদহ গ্রামের তিনি প্রধান ব্যক্তি। আমি ত জানি যে, গ্রামের মধ্যে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ই সর্ব্বপ্রধান। তবে, এ কন্যার পিতা, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়! এ কন্যা অম্বিকা! ধন্য আমি; আমি অম্বিকাকে সহধর্ম্মিণী রূপে প্রা[redacted]! ভগবন্, তোমার জয়

হউক। কিন্তু, অম্বিকা ত আমাকে পত্র লেখে, সে এ কথা আমাকে জানাইল না কেন? লজ্জাকুণ্ঠিতা আপনার বিবাহের কথা কিরূপে জানাইবে? ছি! ছি! বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে কি আপনার বিবাহের কথা আপনার ভাবি স্বামীর নিকট প্রকাশ করিতে পারে? তা, সে না জানা'ক্; কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় কেন আমাকে এ কথা লিখিলেন না? বোধ হয় সেটা সামাজিক প্রথা নহে। ঘটকের দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব পাঠানই বোধ হয় সামাজিক প্রথা। তিনি বিজ্ঞ হইয়া কিরূপে সামাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করিবেন?"

গদাধরের মনোমধ্যে যখন উল্লিখিত চিন্তা স্থান লাভ করিয়াছিল, তখন জ্ঞানদাবাবু, তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, রাজি ত?

গদাধর প্রফুল্ল মুখে কহিল, "হাঁ, এ বিবাহে আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি।"

জ্ঞানদাবাবু কহিলেন, "নিশ্চয়?"

গদাধর কহিল, "নিশ্চয়।"

২৫

মানদার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল। সে বাল্য ও যৌবনের সন্ধি-স্থলে দাঁড়াইয়া, আপনাকে একটি সুন্দরী তরুণী করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভাব দেখিয়া, তাহার পিতামাতারও মনে হইয়াছিল যে, না, এ মেয়েকে আর আইবুড় রাখা চলে না। তাঁহারা একটি কুলীন-চূড়ামণি জামাতার অন্বেষণে ঘটকগণকে দিকে দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রত্নেশ্বরবাবুর জাজিম-তাকিয়া,—গড়গড়া গুড়গুড়িসমন্বিত, অম্বরি তামাকুর ধূম-সুবাসিত হুকাবৈঠকান্বিত বৈঠকখানা ঘরে একজন অর্দ্ধপক্ককেশী বিশৃঙ্খলবেশী কুলাচার্য্য সমাগত হইয়া রত্নেশ্বরবাবুকে অভিবাদন করিল। রত্নেশ্বরবাবু কহিলেন, "কি ঘটক ঠাকুর, তোমার খবর কি?"

ঘটক। খবর ভাল।

রত্নেশ্বর। কোন স্থানে, কোনও সৎ-পাত্রের অনুসন্ধান পাইলে কি?

ঘটক। আজ্ঞে একটি উত্তম সুপাত্র পাওয়া গিয়াছে।

রত্নেশ্বর। কোথায়?

ঘটক। এই গ্রামের দক্ষিণে নাড়িচা নামে এক পল্লীগ্রাম আছে।

রত্নেশ্বর। হা, নাড়িচা; গত বৎসর 'রেভিনিউ সেলে,' আমি এই মাহালটা ক্রয় করিয়াছি।

ঘটক। তাহা হইলে, নাড়িচা আপনারই সম্পত্তি; আমি ইহা পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না।

রত্নেশ্বর। হাঁ, নাড়িচা আপাততঃ আমারই সম্পত্তি বটে।

ঘটক। এই নাড়িচা গ্রামে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন।

রত্নেশ্বর। কুলীন?

ঘটক। আজ্ঞে হা, শ্রেষ্ঠ কুলীন; আপনাদেরই পাল্‌টি ঘর। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান।

রত্নেশ্বর। ক' পুরুষে? আমরা চার পুরুষ। ইহার সমান বা ইহা অপেক্ষা উচ্চ হওয়া চাই। আমি নামিয়া কন্যাদান করিব না। আমাদের বংশে এরূপ কার্য্য কেহই করেন নাই।

ঘটক। আজ্ঞে না, আপনাকে তাহা করিতে হইবে না। পাত্র স্বকৃত ভঙ্গের পুত্র। ঐ গ্রামেরই বিরূপাক্ষ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া, পাত্রের পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন।

রত্নেশ্বর। এরূপ জামাতা লাভ করা গৌরবের কথা বটে। দেখ ঘটক ঠাকুর, এ পাত্রটি হাত ছাড়া করা হইবে না। পাত্র দেখিতে কিরূপ ?

ঘটক। দেখুন, আমার ইচ্ছা যে আপনি পাত্রটিকে একবার নিজ চক্ষে দেখিয়া আসেন।

রত্নেশ্বর। তুমি এটা পাগলের মত কথা কহিলে। কালীদহের জমীদার পাত্রের দ্বারস্থ হইতে পারে না। ইহা আমাদের কুলপ্রথা নহে।

ঘটক। আজ্ঞে, আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমি না জানিয়া ওরূপ কথা বলিয়াছি। তা, আমি আপনার কাছে সত্য কথা বলিব। পাত্রটি দেখিতে দিব্য; হৃষ্টপুষ্ট; তবে শ্যামবর্ণ।

রত্নেশ্বর। তা' শ্যামবর্ণ হউক। শ্যামবর্ণে কিছু ক্ষতি নাই। আমার পিসা মহাশয়ও শ্যামবর্ণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মত সুপুরুষ ত আমরা দেখি নাই। পাত্রের বয়স কত ?

ঘটক। আমি তাহার কোষ্ঠী দেখিয়াছি। আগামী বৈশাখ মাসে তাহার ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে।

রত্নেশ্বর। বয়সটা একটু বেশী। তা' হক্। আমার কন্যাও ডাগর হইয়াছে। পাত্রটি কি করে ?

ঘটক। পাত্রটি এম, এ, বি, এল ;— আলিপুর জজ আদালতের উকিল। এই অল্প বয়সেই বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইয়াছে।

রত্নেশ্বর। বেশ। কিন্তু বিবাহের পর আমি আর তাহাকে ওকালতি করিতে দিব না; এখানে আনিয়া, আমার সমুদয় জমীদারীর ম্যানেজার করিয়া দিব।

ঘটক। সে আপনি যেরূপ অভিপ্রায় করিবেন, তাহাই হইবে। পাত্রের অপর অভিভাবক কেহ নাই; গ্রামে ঘর বাড়িও তেমন নাই। সেই এখানে থাকিবে। আপনিই তাহার অভিভাবক হইবেন এবং আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, সে তাহাই করিবে।

রত্নেশ্বর। তোমার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে পাত্রটিকে সকল বিষয়েই মনোমত বলিয়া বোধ হইতেছে। তথাপি, এ বিষয়ে আমি একবার ওপাড়ার কৃষ্ণ দাদার সহিত পরামর্শ করিব। তুমি কি তাঁহাকে চেন ? তিনি আমাদিগের সগোত্র এবং দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়; তাঁহার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি দশখানা গ্রামে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ঘটক। আপনি কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের কথা বলিতেছেন ত ? আমি তাহার নাম শুনিয়াছি।

রত্নেশ্বর। আমি তাঁহাকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইতেছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তোমাকে একবারে পাকা কথা দিব।

ঘটক ঠাকুর বাহিরে আসিয়া, গুড়ুক সেবায় মনোনিবেশ করিল। অত বড় একটা মান্য জমীদারের সম্মুখে তামাকু সেবন করা ধৃষ্টতা হইবে মনে করিয়া, সে বাহিরে আসিয়াছিল। তামাক খাইতে খাইতে, ঘটক বিদায়ের চিত্রটা সে মনোমধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া লইতেছিল। তামাকু খাইয়া, মস্তিষ্কটাকে কিঞ্চিৎ সজীব করিয়া, ঘটকঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার প্রবেশ করিল। দেখিল, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় তথায় সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া ঘটক ঠাকুরের মনের মধ্যে একটু ভয় হইল। মনে হইল, তাহার এত কষ্টের যোগাড়টা বুড়ো বুঝি, একটি কথায় বজ্রঘাতে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। অতএব তাহার মন ভিজাইবার উদ্দেশ্যে সে

কহিল, "আহা, মহাশয়কে দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে মহাশয়ের জগতব্যাপী নাম শুনিয়াছিলাম।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় হাত নাড়িয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্।" ঘটকের বচন-বিন্যাস আরম্ভেই সমাপ্ত হইয়া গেল। সে থাক্-থাকের পর অতি বড় বাগ্মীর বাক্‌ও নির্ব্বাক্ হইয়া যায়।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঘটক ?"

ঘটক। আজ্ঞে হাঁ, আমিই ঘটক।

কৃষ্ণ। যে পাত্র তুমি স্থির করিয়াছ, তাহার নাম কি ?

ঘটক। গদাধর।

কৃষ্ণ। গদাধর মুখোপাধ্যায় ?

ঘটক। আজ্ঞে হা।

কৃষ্ণ। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ?

ঘটক। আজ্ঞে।

কৃষ্ণ। নাড়িচায় বাড়ি ?

ঘটক। আজ্ঞে। দেখিতেছি, আপনি সকলই জানেন।

কৃষ্ণ। হাঁ, গদাধর আমার সম্পূর্ণ পরিচিত। রত্নেশ্বর বাবু, তুমি ইহার অপেক্ষা সুপাত্র সমস্ত বাঙ্গালা দেশে আর পাইবে না। তুমি এ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ লইবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছিলে; আমার সৎ পরামর্শ গ্রহণ কর, এই পাত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দাও, সে চিরসুখিনী হইবে।

ঘটক ঠাকুর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বুঝিল যে, ঘটকবিদায় সম্বন্ধে আর কোনও গোলযোগ রহিল না।

রত্নেশ্বরবাবু কহিলেন, "শোন ঠাকুর, আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম যে, এই শ্রেষ্ঠ কুলীন পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিব। এক্ষণে কৃষ্ণ দাদাও বলিতেছেন যে, এমন সুপাত্র আর নাই। কুলে শীলে বিদ্যায় এ পাত্র উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আগামী বৈশাখ মাসেই বিবাহ দেওয়া স্থির রহিল।"

অন্দর মহলে সংবাদ গেল যে, শ্রীমতী মানদা দেবীর ফুল ফুটিয়াছে, বর মিলিয়াছে; বর এম, এ পাশ-করা এবং তাহার চেহারাটা ঠিক রাজপুত্রের মত। বুড়া সুলী মানদার গাল টিপিয়া কহিল, "ওলো, আমাদের যেন ভুলিস্ নে। রাঙ্গা বর পেয়ে, যেন বলিস্ নে, ও মাগী কোথাকার কে ?" মানদা হাসিতে ঠোঁট ফুলাইয়া, নয়নে তারা ঘুরাইয়া মাটীতে অঞ্চল লুটাইয়া, ছুটিয়া পলাইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "যাঃ।"

২৬

বিবাহের ছয় দিন পূর্ব্বে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় গদাধরকে পত্র লিখিলেন যে, আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যাইব। আমরা চার পাঁচ জন মাত্র যাইব; তুমি আহারাদির কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত রাখিও। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের পত্রখানি স্বয়ং ঘটক ঠাকুর গদাধরের নিকট লইয়া আসিয়াছিল। পত্র পাঠ করিয়া গদাধর যখন আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বরকে আরও একটু আনন্দিত করিয়া বরপক্ষের ঘটকবিদায়ের পরিমাণটা বৃদ্ধি করিবার মানসে, ঘটক ঠাকুর কহিল, "যদিচ পত্রে সে কথা লিখিত নাই, কিন্তু আমি যদ্দুর জানি, তাহাতে বোধ হয়, গৃহিণীর অনুরোধক্রমে, স্বয়ং রত্নেশ্বর বাবু, আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন।"

গদা। রত্নেশ্বর বাবু কে ?

ঘটক। হাঃ, হাঃ, হাঃ;—এ যে আপনি হাস্যরসের অবতারণা করিলেন, দেখিতেছি। সাতকাণ্ড রামায়ণের পর, সীতা কার বনিতা ?

গদা। আমি রত্নেশ্বরবাবুর নাম ইতিপূর্ব্বে কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ঘটক। ক্রমে শুনিবেন; ক্রমে ঐনাম জপমালা হইয়া দাঁড়াইবে। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।

গদা। কে এ রত্নেশ্বরবাবু?

ঘটক। যে পরমা সুন্দরীকে আপনি পত্নীরূপে লাভ করিবেন, রত্নেশ্বর বাবু তাঁহারই জনক। রত্নেশ্বর বাবু লক্ষপতি, কালীদহ গ্রামের জমীদার। আপনি কন্যার পিতার নাম ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। সম্বন্ধ স্থিরের সময়, আমিত সকল কথাই জ্ঞানদা-বাবুকে বলিয়া গিয়াছিলাম।

গদাধর। আপনি যে কন্যার সহিত আমার বিবাহ স্থির করিয়াছেন, তাহার নাম কি?

ঘটক। তাহার নাম, শ্রীমতী মানদা সুন্দরী দেবী।

গদাধর। সর্ব্বনাশ!

ঘটক। সর্ব্বনাশ কিসে? এ নাম-টিত দিব্য মনোহর নাম, আর ইচ্ছা যদি আপনার পছন্দ না হয়, নামটা পাল্টে ..।

গদাধর। আপনি কোন ক্রমে এ বিবাহ রহিত করিতে পারেন?

ঘটক। আপনি এ কি কথা বলি-তেছেন?

গদাধর। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দিন। বাজে কথা শুনিবার এখন আমার অবসর নাই।

ঘটক। এ বিবাহ কোন ক্রমে রহিত হইতে পারে না। রত্নেশ্বর বাবু এ কথা শুনিলে পৃথিবী তোলপাড় করিবেন।

গদাধর। আপনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন যে, একটা ভ্রমে পড়িয়া আমি এ বিবাহে সম্মত হইয়াছিলাম, বিবাহে তাঁহার কন্যা সুখী হইবে না। আমি আপনাকে বিলক্ষণরূপ পুরস্কৃত করিব, আপনি এ বিবাহ স্থগিত করিয়া দিন।

ঘটক ঠাকুর একটু মুস্কিলে পড়িল। রত্নেশ্বরবাবুর নিকট হইতে সে যে ঘটক বিদায় পাইয়াছিল, এখনও তাহা সে পরিপাক করিতে পারে নাই। সম্মুখে আবার নূতন পুরস্কার উপস্থিত। আবার এ নূতন পুরস্কারটির 'বিলক্ষণ' বিশেষণযুক্ত। সে কি করিবে? হস্তগত পুরস্কারটা ত্যাগ করা তাহাদের কুলপ্রথা নহে। কিন্তু এ বিলক্ষণ পুরস্কারটা হজম করাও সহজ নহে। রত্নেশ্বরবাবু যখন রোষকষায়িতলোচনে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তখন সে হরকোপানলদগ্ধ মদনের মত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। হায়! হায়! বেচারা এ দুর্ব্বিপাক হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিবে? কিন্তু তাহার চিন্তা করিবারও আর অবসর হইল না। গদাধর বাক্স হইতে পাঁচ খণ্ড এক শ' টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "আপাততঃ আমি আপনাকে এই পাঁচ শত টাকা দিতেছি, লউন।

ঘটক। য়্যাঁ, পাঁচ-শ-অ-টাক্য?

গদাধর। হাঁ, আপাততঃ পাঁচ শ' টাকা দিলাম; কিন্তু আপনি যদি এ বিবাহ স্থগিত করিতে পারেন, তাহা হইলে আরও এক হাজার টাকা দিব।

ঘটক। হাজার টাকা পাইলে, চন্দ্র সূর্য্যের গতি আমি রহিত করিয়া দিতে পারি; পূর্ব্বের সূর্য্যকে পশ্চিমে উঠাইতে পারি।

গদাধর। সে সব কিছু করিতে হইবে না। কেবলমাত্র এই বিবাহটা বন্ধ করিয়া দিন। এ বিবাহে কাহারও

মঙ্গল হইবে না; তা' না হইলে, আমি কথা দিবার পর এ বিবাহ ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতাম না।

ঘটক। নাঃ। জগতের মঙ্গলের জন্য এ বিবাহ ভঙ্গ হওয়াই উচিত। আমি আজই ইহার উদ্যোগ করিব।

গদাধর। বেশ। তাহা হইলে, আপনি এখন যাইতে পারেন।

ঘটক। দেখুন!

গদাধর। কি?

ঘটক। এই নোট গুলা বাজারে ভাঙ্গাইতে যাইলে, লোকে ত বলিবে না যে, এগুলা জাল নোট?

সেই মহাবিপদের সময়ও গদাধরের মুখে হাসি আসিল। কহিল, "তা, লোকে কি বলিবে, তাহা আমি কিরূপে বলিব?"

ঘটক। দেখুন, জাল নোট বা চোরাই নোট ভাঙ্গাইতে আমার বড় ভয় হয়। তাহার চেয়ে, আমাকে আপনি নগদ টাকা দিন।

গদাধর ভৃত্যকে ডাকিয়া, বাজার হইতে নোটের পরিবর্ত্তে টাকা আনাইয়া ঘটককে গুণিয়া দিল। ঘটক ঠাকুর আপনার কচ্ছ উন্মোচন করিয়া, তাহাতে টাকাগুলি উত্তম রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। এবং পশ্চাদ্দেশে মুদ্রার গুরুভার দোলাইয়া জ্ঞানদাবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া, জ্ঞানদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটক ঠাকুর! তোমার খবর কি?

ঘটক। খবর ভাল নয়।

জ্ঞানদাবাবু। ব্যাপার কি?

ঘটক। আপনাদের গদাধর বাবুর রাক্ষস গণ।

জ্ঞানদা। কে বলিল?

ঘটক। কে বলিল, [redacted] বচনে কোষ্ঠী দেখিয়াছি; তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, গদাধর বাবুর রাক্ষস গণ।

জ্ঞানদা। তাহাতে ক্ষতি কি?

ঘটক। বর পক্ষের ক্ষতি নাই বটে, কিন্তু কন্যা পক্ষের ক্ষতি অতি ভয়ঙ্কর! কন্যা যদি নর গণ হয়, আর বর যদি রাক্ষস গণ হয়, তাহা হইলে রাক্ষস বর, কন্যা নরকে খাইয়া ফেলে।

জ্ঞানদা। তাহা হইলে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?

ঘটক। এ বিবাহ রহিত করাই উচিত।

জ্ঞানদা। গদাধর কি ইহাতে সম্মত হইবে?

ঘটক। তাঁহাকে এখনই একটা পত্র লিখিয়া, তাহার মনোগত ভাব জানিতে পারিলে ভাল হয়।

জ্ঞানদাবাবু পত্র লিখিয়া গদাধরের নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেলে, তিনি ঘটকঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কটিদেশে একটা উচ্চ বস্তু কি দেখিতেছি।" ঘটক প্রমাদ গণিল। মনে মনে মধুসূদনকে ডাকিয়া, মুখটা একটু বিকৃত করিয়া কহিল, "ওটা মহাশয় একটা বিস্ফোটক; কয়েক দিন হইতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি।" "কই, দেখি।" সর্ব্বনাশ! সে কিরূপে সেই বিলক্ষণ পুরস্কারের গুরু পুটলিটি জ্ঞানদাবাবুকে দেখাইবে? সে কহিল, "এ ঘৃণ্য বস্তুটা মহাশয়কে দেখাইবার নহে। আমি এখন বাহিরে যাই।' এই বলিয়া কচ্ছদেশে টাকার পুটলি দোলাইয়া সে দ্রুতগতি গৃহের বাহিরে আসিল।

প্রায় অর্দ্ধপ্রহর পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া গদাধরের পত্র জ্ঞানদাবাবুর হাতে দিল। সে পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল;—

"মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি একটা ভ্রমবশতঃ এ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বেশ বুঝিতেছি, এ বিবাহ ঘটিলে বিশেষ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। মহাশয়, মহাশয়ের পত্রের সহিত ঘটককে অদ্যই কালীদহ গ্রামে পাঠাইয়া যদি এ বিবাহ স্থগিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, উভয় পক্ষেরই বিশেষ মঙ্গল হয়। আমার ভরসা হয়, আপনি পত্র লিখিলে এ বিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি অদ্যই পত্রখানি পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন; নতুবা, আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাঁহারা আগামী কল্যই আসিয়া পড়িবেন।"

গদাধরের অভিপ্রায়মত একখানি পত্র লিখিয়া, দ্রুতগামী নৌকার জন্য অতিরিক্ত পাথেয় দিয়া, তিনি ঘটকঠাকুরকে বিদায় করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে পত্র কখনই কালীদহ গ্রামে পৌঁছিল না। পথে, তাহার সেই দোদুল্যমান, ভস্মা-নামক মেষের পুচ্ছের ন্যায়, কচ্ছের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, এক বুদ্ধিমান্ পাহারাওয়ালা তাহার ক্ষীণ মণিবন্ধ বিশেষরূপে কবলিত করিয়া ফেলিল। তাহার, মধুচক্রের মত, শ্মশ্রুসমন্বিত মুখ নাড়িয়া, এবং সমীরণ-সেবিত কোকনদের মত তাহার লাল পাগ্‌ড়িটি দোলাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "এ বামুন! তোর কাছায় কি?" ঘটক অম্লান বদনে উত্তর দিল, "কই? কিছুই ত নয়; ওঃ! ও একটা, বুঝিলে, ফোড়া হইয়াছে।" পাপিষ্ঠ পাহারাওয়ালা ব্রাহ্মণের এই সরল উক্তিটি, সত্যের অপলাপ বলিয়া বিবেচনা করিল এবং তাহার নির্দ্দয় রুলের সবল প্রক্ষেপে ফোড়াটা উত্তমরূপে বিদীর্ণ করিয়া দিল। তাহা বিদীর্ণ হইয়া, রাজপথে রজতমুদ্রা সকল বর্ষণ করিল। সহসা লোকারণ্যে তৎপ্রদেশ পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা তোমরা আপন কল্পনা-বলে অনুমান করিয়া লও। গল্পের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি তাহা বিবৃত করিব না।

২৭

পরদিন প্রত্যূষে, জ্ঞানদাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া, গদাধর কতকটা নিশ্চিন্ত মনে আপন বাটীতে বসিয়াছিল। পূর্ব্ব দিন ঘটনাপটলের যে ঘন অভ্রমালা তাহার হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা রঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণ যবনিকার ন্যায় ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতেছিল। মেঘ-নির্ম্মুক্ত তাহার মনটি এক প্রত্যয়ময়ীর মধুর স্মৃতিপ্রভায়, জ্যোৎস্নালোকিত শরৎ অম্বরের ন্যায় প্রভাসিত হইয়া উঠিতেছিল।

ফটকের ভিতর দুইখানি গাড়ি প্রবেশ করিতে দেখিয়া, গদাধর সহসা বিচলিত হইয়া উঠিল। এ অসময়ে, তাহার বাটীতে কে আসিল? ইহাঁরা কি কালীদহের লোক? জ্ঞানদাবাবুর পত্র পাইবার পরও কালীদহ হইতে লোক আসিল কেন? ঘটকঠাকুরের কৌশল কি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে?

গদাধর পাঁচটি অপরিচিত লোককে গৃহমধ্যে লইয়া, বসাইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিলেন, "আমরা কালীদহ হইতে আসিয়াছি। আমার নাম রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।" তাঁহাদের মধ্যে অপর একটি হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতের দ্বারা গদাধরকে জানাইল, "প্রণাম কর।"

রত্নেশ্বর। তোমার নামটি কি?

গদাধর। আমার নাম গদাধর।

রত্নেশ্বর। তোমারই নাম গদাধর, তোমারই সহিত আমার কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছে? ঘটকটা আমাদের সঙ্গে না আসা[illegible]দের কিছু অসুবিধা ভোগ

করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়—আমার কৃষ্ণদাদা, যি'ন তোমাকে জানেন, তিনি গ্রামের একটি দলাদলির ব্যাপারে পড়িয়া, আসিতে পারেন নাই।

গদাধর। গতকল্য জ্ঞানদাবাবু ঘটকের হাতে আপনাকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কি আপনি পান নাই?

রত্নেশ্বর। কিরূপে পাইব? তাহার সহিত মোটেই আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এখানে পত্র দিয়া, গতকল্যই তাহার কালীদহে যাইবার কথা ছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তাহাকে অদ্য আমাদের সহিত লইয়া আসিব। কিন্তু তাহার ত দেখা পাওয়া গেল না।

গদাধর। সে কোথায় গেল?

রত্নেশ্বর। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ কথার উত্তর তোমার নিকটই জানিতে পারিব।

গদাধর। না, আমি তাহার তথ্য কিছুই অবগত নহি।

রত্নেশ্বর। সে যাহা হউক, যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন তাহাকে আর আমাদের আবশ্যক হইবে না। এক্ষণে তুমি ধান দূর্ব্বা চন্দনাদির যোগাড় কর; শুভলগ্নে কার্য্যটা সমাপ্ত করা যাউক।

গদাধর। এ সম্বন্ধে, জ্ঞানদাবাবু আপনাদিগকে কিছু বলিবেন। তাঁহাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া আমি লোক পাঠাইতেছি। ইত্যবসরে মহাশয়েরা স্নান আহার সমাধা করিলে আমি কৃতার্থ হইব।

রত্নেশ্বর। গঙ্গার ঘাটে, ভাউলেতে আমাদিগের আহার প্রস্তুত হইতেছে, আমরা শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, সেখানে যাইয়াই আহার করিব।

গদাধর। ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না; আপনাদিগকে আহারাদি না করাইয়া আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না।

রত্নেশ্বর। তা' আশীর্ব্বাদের পর যাহা হয়, হইবে। তাহার পূর্ব্বে আমরা তোমার বাটীতে জলবিন্দু গ্রহণ করিতে পারি না।

গদাধর এ কথার কিছু উত্তর দিতে পারিল না। সে কি উত্তর দিবে? নিদারুণ নিরাশার হাতে সে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। জ্ঞানদাবাবু আসিয়া কি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন? সে পত্র লিখিয়া জ্ঞানদা বাবুর নিকট লোক পাঠাইল। যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া দিল, "হাঁটিয়া যাইও না, রাস্তায় একটা দ্রুতগামী গাড়ি ভাড়া করিয়া লইও।

রত্নেশ্বর বাবু বিছানার উপর, তাকিয়া হেলান দিয়া, চিন্তিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। গদাধরকে যতদিন তিনি আপন চক্ষে নিরীক্ষণ করেন নাই, ততদিন কল্পনার বলে, ভাবী জামাতার একটি চিত্র মনোমধ্যে আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে গদাধরকে স্বচক্ষে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহার মন-চিত্রখানা যেন একটা বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। এই রুক্ষ কর্কশ অবয়বকে তাঁহার ললিত লাবণ্যময়ী, নবনীবিগঠিতা কন্যা কিরূপে, স্বামিরূপে বরণ করিবে? এই দৈত্যনিসূদন বিকট মূর্ত্তিকে তিনি কিরূপে জামাতার উচ্চাসনে উপবেশন করাইবেন? হায়! হায়! দুষ্ট ঘটকটা এ মসীনিন্দিত বর্ণকে কিরূপে শ্যামবর্ণ কহিল? এ বিবাহ কি কোনরূপে রহিত করিতে পারা যায় না? ও হরি! রত্নেশ্বর-বাবুও যে, এ বিবাহ রহিত করিতে চা'ন! তবে কি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ মিথ্যা হইবে? তবে কি মানদার সহিত গদাধরের বিবাহ হইবে না?

জ্ঞানদাবাবু আসিলেন। পরস্পর

পরস্পরের নিকট পরিচিত হইলেন। জ্ঞানদা-বাবু সামান্য বেশে আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া রত্নেশ্বরবাবু বুঝিলেন যে, 'হাঁ, ইনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় জমীদার বটে।' জ্ঞানদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া, রত্নেশ্বর বাবুর এক সহচর কহিলেন, "মহাশয়ের আগমন অপেক্ষায়, আমরা এ পর্য্যন্ত শুভাশীর্ব্বাদ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি নাই। এক্ষণে মহাশয় আসিয়াছেন, বারবেলা পড়িবার পূর্ব্বেই আশীর্ব্বাদ-কার্য্য সম্পন্ন করা যাউক।'

জ্ঞানদা। আশীর্ব্বাদ হইবার পূর্ব্বে আমার কিছু নিবেদন আছে।

সহচর। অবশ্য, অবশ্য, আপনার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিবেন বই কি।

জ্ঞানদা। আমি রত্নেশ্বরবাবুকে যে পত্র লিখিযাছিলাম, শুনিলাম, তাহা ইনি প্রাপ্ত হ'ন নাই। তাহা প্রাপ্ত হইলে, আমাকে আর কোনও কথাই বলিতে হইত না।

রত্নেশ্বর। সে পত্রে আপনি কি লিখিয়াছিলেন?

জ্ঞানদা। এই বিবাহ রহিত করিবার জন্য সেই পত্রে আমি আপনাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

সহচর। বিবাহ রহিত?

রত্নেশ্বর। তুমি থাম।

সহচর। থামিব কেন? এ বিবাহ কোনও ক্রমে রহিত হইতে পারে না। আমাদের ও অঞ্চলে আমাদের বাবুর অতুল সম্মান। ইনি পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া, আশীর্ব্বাদ না করিয়া যদি ফিরিয়া যা'ন, তাহা হইলে ইহাঁর সম্মান কিরূপে রক্ষা পাইবে? লোকে কি বলিবে?

রত্নেশ্বর। আহা! আহা! আমার কিছু কথা ছিল; তুমি চুপ কর; আমি বলিব।

সহচর। ইহাতে চুপ করিবার কি আছে? আমিই বলিব। আপনার ভয়ানক চক্ষুলজ্জা। চক্ষুলজ্জার খাতিরে, আপনি সকল কথা বলিতে পারিবেন না। এক্ষণে এ বিবাহ কোনও ক্রমেই রহিত হইতে পারে না। আজ আপনি পাত্রকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া যদি ফিরিয়া যা'ন, তাহা হইলে মানদা দেবীর বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইবে।

জ্ঞানদা। আমার সকল কথা বলা হয় নাই। সকল কথা শুনিয়া, আপনাদের যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা হইবে, তাহাই করিবেন। আমি ঘটকঠাকুরের নিকট শুনিলাম যে, আপনাদের কন্যার নর গণ।

রত্নেশ্বর। হাঁ, তাহার নর গণ বটে। পাত্রের কি গণ?

জ্ঞানদা। রাক্ষস গণ।

রত্নেশ্বর। রাক্ষস গণ? সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে, কিরূপে বিবাহ হইবে? জানিয়া শুনিয়া, কন্যাকে কিরূপে রাক্ষসের হাতে সমর্পণ করিব? দুই দিনেই যে খাইয়া ফেলিবে।

জ্ঞানদা। এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, এ বিবাহ স্থগিত করাই মঙ্গলজনক। এ বিবাহে পাত্রের কিছুমাত্র মত নাই জানিবেন।

সহচর। দেখিতেছি, আমাদিগকে অপমান করাই আপনাদিগের উদ্দেশ্য। যদি এ বিবাহে পাত্রের মত নাই, তবে আমাদিগকে প্রথমে জানাইলেই হইত; আমরা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতাম না। যখন আমরা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি, তখন আশীর্ব্বাদ না করিয়া যাইব না। পাত্রের রাক্ষস গণে আসিয়া যায় না, ও একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিলেই কাটিয়া যাইবে।

গদাধর এ বিবাহে আপনাদের কন্যা সুখী

সহচর। বাপু হে, পাত্রীর সুখের ব্যবস্থা তোমাকে করিতে হইবে না। সে ব্যবস্থা আমাদের বাবুই করিবেন। বাবুর অগাধ সম্পত্তি, আর বংশের মধ্যে ঐ একমাত্র কন্যা, বুঝিয়াছ? আরও শুন, এক্ষণে তুমি এ বিবাহে অসম্মত হইতে পার না;—তাহা হইলে, একটা উচ্চ বংশের মুখে 'কালী' দেওয়া হইবে। কন্যার অন্য বিবাহ দেওয়া দায় হইবে। তুমি আইন পড়িয়াছ; আমরাও আইনের মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝিয়া থাকি। বল দেখি, বিবাহ করিতে ধর্ম্মতঃ সম্মত হইয়া, এক্ষণে আশীর্ব্বাদের সময় পশ্চাৎপদ হওয়া নিতান্ত আইনবিগর্হিত কর্ম্ম কি না?

রত্নেশ্বর বাবুর সহচরের বাক্‌বিতণ্ডায় ভীরুস্বভাব রত্নেশ্বরবাবু কিলক্ষণ কাবু হইয়া পড়িলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আশীর্ব্বাদ কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য বাক্য-বিতাড়িত হইয়া, তিনি আনন্দবাবুকে পীড়াপীড়ি করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া, গদাধরও ইহাতে সম্মত হইতে বাধ্য হইল।

ধান, দুর্ব্বা ও দশ খান মোহর দিয়া, রত্নেশ্বরবাবু গদাধরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

হিমুর সহিত আকবরের যুদ্ধ।

পিতামহ হুমায়ুনের মৃত্যুর পরেই আবার পিতা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই আফগান-সম্রাট্ হিমু দিল্লী আক্রমণ করিবার মানসে স্বীয় বাহিনীকে যুদ্ধোপযোগী সজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিলেন। হিজরা শক ৯৬৩ অব্দে মহরমের ষষ্ঠ দিবস বৃহস্পতিবারে (ইং ১৫৫৫ খৃঃ অঃ ২০শে নভেম্বর) হিমু অসংখ্য সুশিক্ষিত আফগান সৈন্য লইয়া দিল্লীর সন্নিকটস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমু দুইটী প্রবলপরাক্রম হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের সমগ্র রাজত্ব স্বাধিকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি মনে মনে জানিতেন যে, তাঁহার সমকক্ষ বীর আর কেহ নাই। এই যুদ্ধে তিনি শত সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চাশৎ সহস্র উষ্ট্র-পৃষ্ঠারোহী গোলন্দাজ, এবং তিন সহস্র হস্তী লইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হিমু পিতাকে বালক বোধে এবং তাঁহার ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম বিবেচনা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন;—"হে বালক! আমার এই অসংখ্য ও দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণের সম্মুখে আসিও না, ইহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে। তোমাকে যমুনার পূর্ব্বতট হইতে বাঙ্গালার সীমা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতেছি এবং হিন্দুস্থানের অবশিষ্টাংশ আমার অধিকারে রহিল।" বাদশাহ আকবর তদুত্তরে গর্ব্বিত হিমুকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দেখুন, দুইটী প্রবল হিন্দুরাজাকে পরাভূত করিয়াছেন বলিয়াই কি আপনার তাঁর

* Autobiogrphical Memoirs of the Emperor Jahangir নামক পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

ব্যক্তির বৃথা অহঙ্কার প্রকাশ করা উচিত? যদি প্রকৃত বীরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আপনার এ অহঙ্কার শোভা পাইত, মোগল জাতি কখনই হীনবীর্য্য নয়, একবার যুদ্ধোৎসাহে মাতিয়া উঠিলে, তাঁহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে, এমন কোন্ ব্যক্তি আছে? আফগান-সম্রাট্! আমি বালক হইলেও আপনার ভ্রূকুটীতে ভীত হইব না। আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে বুঝিতে পারিবেন, এই জাতি আপনার সমকক্ষ কি না। নিশা-সহচরী তামসী জগৎকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কিন্তু উষাগমে মরীচিমালী তদীয় কিরণজাল বিস্তৃত করিলে পর, রজনীর অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া চলিয়া যায়। আগামী কল্য প্রত্যূষে আপনি সমস্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, আমিও মোগল-সৈন্যগণসমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইব। দেখিব—কে বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিতে পারে।"

হিমুর ব্যূহরচনা ও যুদ্ধের বিবরণ।

পিতার এইরূপ তেজোদীপ্ত উত্তর শ্রবণে পর দিন প্রাতে হিমু তাঁহার সেনানায়ক-গণকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিয়া কিরূপে সৈন্য চালনা করিতে হইবে, তাহা বলিতে লাগিলেন। প্রথমে এক সহস্র হস্তী, মধ্যে সাধারণ-সেনাদল এবং পশ্চাতে দুই সহস্র হস্তী সমভাবে থাকিবে। তিনি স্বয়ং সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পিতা অগ্রভাগে পঞ্চ সহস্র বর্ম্মাবৃত অস্ত্রধারী অশ্বারোহী এবং পশ্চাতে এক সহস্র শিক্ষিত হস্তী লইয়া স্বয়ং করিপৃষ্ঠে হিমুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই তীরন্দাজেরা ও আগ্নেয়াস্ত্রধারীরা যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং উভয় পক্ষের হস্তি-সকল ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। সহসা একটী তীর হিমুর মস্তক দেশ বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া দিল। আফগান-সৈন্যদল তাঁহাদের নেতাকে এই-রূপে পতিত এবং মোগল-সৈন্যের অসীম, অদম্য বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্য দর্শনে ভীত হইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে প্রবল বাত্যা-হত ধূলিকণার ন্যায় হিমুর অসংখ্য বাহিনী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সাকুলী খান্ মোহরেম্ নামক একজন মোগল-বীর মুষ্টি-মেয় সৈন্য লইয়া হিমু যেস্থানে হস্তী হইতে পতিত হইয়াছেন, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার বহুমূল্য রত্নখচিত স্বর্ণনির্ম্মিত আসন * হস্তগত করিলেন। এই হস্তী ও আসন এবং হিমুর ছিন্ন মস্তক, হীরক, পদ্মরাগ, অয়স্কান্ত, সূর্য্যকান্ত, নীলা ও মুক্তা দ্বারা মণ্ডিত তদীয় রাজমুকুট † পিতার সম্মুখে আনীত হইল।

হিমুর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করাতে ইহা যে রাজত্বের ভবিষ্যৎ গৌরবের শুভকর সূচনা, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সাকুলী খাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া মহামতি আকবর পুরস্কারস্বরূপে তাঁহাকে পঞ্চ হাজারীর পদে উন্নীত করিলেন। হিমুর যাবতীয় রত্নরাজি, তিন সহস্র হস্তী, পঞ্চাশৎ সহস্র উষ্ট্র, পিতার করতলগত হইল। মন্ত্রী বৈরাম খাঁ পিতাকে মৃত হিমুর দেহে বিজয়ের শেষ চিহ্নস্বরূপ একটী ক্ষত করিতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তর করিলেন, "যে সময় আমি আমার পিতার পুস্তকাগারে চিত্রকর আবদুস্‌সমদ্ দ্বারা অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে হিমুর প্রতিকৃতি দেখিয়াছিলাম, সেই সময়ই আমি উহাকে সপ্ত খণ্ড করিয়া

* হিমু হস্তিপৃষ্ঠে যে সিংহাসনে বসিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহার মূল্য আঠার লক্ষ মুদ্রা।

† ইহার মূল্য পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা।

ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই সময়েই জানিতাম যে, আমি এই নাস্তিক দাম্ভিকের উপর জয়লাভ করিয়াছি।"

এই যুদ্ধের অবসানে দেখা গিয়াছিল যে, চতুর্দ্দশ সহস্র আফগান-সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে। এতদ্ব্যতীত আহত পলায়নকারীদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

হিমুর সহিত যুদ্ধে আবুলফজলের বর্ণনা।

হিমু হিন্দুস্থানে আধিপত্য লাভ করিবার জন্য এই যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল। হিজরা শক ৯৬৫ * অব্দে মহরমের দ্বিতীয় দিবসে বৃহস্পতিবারে পানিপথের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে এই ভয়ানক যুদ্ধের সূচনা হয়। আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, হিমু তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা বিদ্ধ হইলেও জীবিত ছিলেন এবং আকবরের সম্মুখে আনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাদশার সহিত কথা কহিতে অস্বীকার করায়, আকবর শাহ তাঁহাকে বধ করিয়া স্বীয় তরবারিকে কলঙ্কিত করিতে চান নাই। হিমুর এইরূপ ঔদ্ধত্য দর্শনে বাদশাহ-মন্ত্রী বৈরাম তাঁহার দেহকে তরবারির দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন। হিমুর ঈদৃশ মৃত্যুতে আকবর সাহ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি এই বন্দীকে নিহত না করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত, তাহা হইলে মোগল সাম্রাজ্যের অনেক উপকার হইতে পারিত। কারণ হিমু সাহসী, দক্ষ ও বিচক্ষণ, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

আকবরের আমদাবাদ যাত্রার উদ্যোগ।

তাঁহার ফতেহাপুরে অবস্থান কালে সংবাদ আসিল যে, গুজরাটের অধিবাসিগণ মির্জ্জা ইব্রাহিম হুসেনি এবং মির্জ্জা সাহা মির্জ্জার নেতৃত্বে আমেদাবাদ অবরুদ্ধ করিয়াছে। খানে আজেম * বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাহা রক্ষা করিতেছে, এই সংবাদ শ্রবণে তিনি বিশ্বস্ত পারিষদ্‌বর্গের সহিত ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। খানে আজেমের জননী বিবিবেগমও তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরামর্শে ইহা স্থির হইল যে, বাদশা স্বয়ং সৈন্যসমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিবেন। ফতেহাপুর হইতে গুজরাট দুই মাসের পথ, কিন্তু বাদশাহ সৈন্যদগকে লইয়া কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও বা উষ্ট্রপৃষ্ঠে এই দুই মাসের পথ চতুর্দ্দশ দিবসে অতিক্রম করিলেন।

আমদাবাদ সন্নিকটে।

৯৮০ হিঃ শক বুধবার দ্বিতীয় জামোদির দিনে (ইং অক্টো ১৫৭২ খৃ অঃ) তিনি আমদাবাদের অদূরে সৈন্য সমাবেশ করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কখন্ শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবেন। কেহ কেহ বলিলেন, সেই রাত্রেই শত্রুদিগকে অলক্ষিত ভাবে আক্রমণ করা যাউক। কিন্তু রজনীর গাঢ় অন্ধকারের সাহায্যে শত্রুদিগকে অতর্কিতভাবে অক্রমণ করা কাপুরুষোচিত কার্য্য হইবে ভাবিয়া মহানুভব বাদশাহ উহাঁদের পরামর্শ মনোনীত করিলেন না। পরদিন, প্রত্যুষেই আমদাবাদের সন্নিকটস্থ হইবেন এইরূপ স্থির করিলেন। রাত্রিতে মোগল-সৈন্য পথভ্রমণজনিত ক্লেশ বিদূরিত করিয়া উষাসমাগমে নবোৎসাহে শয্যাত্যাগ করিয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। অমনি মোগল-সৈন্যের শ্রবণ-বিদারক জয়ঢাক ও তূর্য্য ধ্বনি গগনমণ্ডল নিনাদিত করিয়া বিপক্ষ শিবিরে

* আবুল ফজল লিখিত তারিখের সহিত পূর্ব্ব লিখিত তারিখের এক বৎসরের অনৈক্য দেখা যাইতেছে।

* খানেখাজেম—আকবরের ধাত্রীপুত্র। তাঁহাকে কখনও কখনও মির্জ্জা কোকা বলা হইত

শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণের হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিল। তাহারা সেই সময় নিশ্চেষ্ট হইয়া অপর একটি নগর অবরোধ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল।

সবরনদীতীরে।

বাদশাহ সৈন্যদিগকে লইয়া স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সবরমতী নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থান হইতে দেখিলেন, একদল শত্রু-সৈন্য নদীর অপর পারে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু নদীতীরের যে অংশে তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং অধিকাংশই বন্ধুর ভূমি, এই স্থান যুদ্ধের পক্ষে ততদূর সুবিধাজনক নহে; সেই জন্য তিনি সৈন্যদিগকে সাঁতার দিয়া নদী পার হইতে আদেশ করিলেন। কারণ কোন রূপ জলযানের জন্য বিলম্ব করিলে হয়ত শত্রুগণ প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে।

এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার শ্রবণে মহম্মদ হাসেনি মির্জ্জা নদীতীরে সুভোন্ কুলী নামক একজন তুর্কীদেশীয় সেনানায়কের নিকট কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং জানিতে চাহিলেন কোথা হইতে এই সমস্ত সৈন্য আসিয়াছে, ইহাদের সেনাপতিই বা কে? সুভোন্ প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন,—ইহারা সকলেই বাদশাহ আকবরসাহের সৈন্য। বাদশাহ স্বয়ং সৈন্যচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই অসম্ভাবী সংবাদে যদিও তাহাদের হৃদয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহা যে আকবরের সৈন্য ইহা কখনও বিশ্বাস করে না। কারণ তাহাদের গুপ্তচর বাদশাকে ফতেপুরে দেখিয়া আসিয়াছে এবং দুই মাসের পথ চতুর্দ্দশ দিবসে আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নিশ্চয়ই ইহারা ধর্ম্মত্যাগী কিংবা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ভয়ে কোথাও পলায়ন করিতেছে।

খানকুলন ও আকবর।

পিতা আকবর সৈন্যদিগকে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইতে বলিলেন এবং শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ প্রস্তুত হইতেছে জানিতে পারিয়া নদী পার হইতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে খান্‌কুলন্ নামক জনৈক সেনানায়ক বাদশাকে জানাইলেন যে, বিপক্ষ দল মোগল-সৈন্য অপেক্ষা অধিকসংখ্যক এবং গুজরাটের চারিজন রাজকুমার দুই লক্ষ চর্ম্মাচ্ছাদিত সশস্ত্র অশ্বারোহী, বিংশতি সহস্র উষ্ট্রারোহী গোলন্দাজ লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা যুদ্ধে জয় লাভ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত ত্রিশ সহস্র উষ্ট্র গোলাগুলি বারুদ লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আসিতেছে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত খোন্ খানান্, খাঁ দোরন্ এবং খান্ জোহন অধিকসংখ্যক মোগল-সৈন্য লইয়া উপস্থিত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নদী পার হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ এরূপ অবিমৃষ্যকারিতার সহিত কার্য্য করিলে হয়ত সামান্যসংখ্যক মোগল-সৈন্য অপরিমেয় শত্রু সম্মুখে পরাজিত হইতে পারে।

সেনানায়ক খান্ কুলনের পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত হইলেও, ঈশ্বরপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ আকবর শা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হীনবল বলিয়া কিছুমাত্র বিচলিত বা ভীত হইলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যেই ঈপ্সিত ফললাভ করিতে সমর্থ হন না। এই জন্যই তিনি কখনও ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। এই অচল দৃঢ় ঈশ্বরবিশ্বাসের ফলে তিনি প্রত্যেক কার্য্যেই অযাচি[redacted] সাহায্য পাইয়াছেন। সর্ব্ব-

নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সাহায্যে নির্ভর করিয়া তিনি আমদাবাদে বিপুল সেনাবাহিনীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি খানখানানের ঈদৃশ বিমৃষ্যকারিতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি মনুষ্যশক্তির উপর নির্ভর করিলে কখনও এরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া মোগল-সৈন্যের প্রবল বিনাশে উদ্যত হইতেন না। মঙ্গলময় ভগবানের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

সবর নদীর পর পারে।

অশ্বারোহী সেনাদল এবং প্রধান প্রধান অধিকাংশ সেনানায়ক আকবরের নিকট হইতে অনেক দূর পশ্চাতে পড়িয়াছিল; তাঁহার সহিত কেবলমাত্র পাঁচ সহস্র সৈন্য উপস্থিত ছিল। প্রধান ওমরাহগণ পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণের জন্য ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং মক্কাভিমুখে জানু পাতিয়া অক্ষয় বিজয়দাতা ভগবানের আরাধনা করিলেন। সহসা যেন তাঁহার বদনমণ্ডলে তড়িদ্বেগে অপূর্ব্ব তেজঃপূর্ণ জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত হইল। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে পুনরারোহণপূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাসে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। ক্ষণকাল পরেই নিরাপদে সবর-নদীর অপর তীরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তিনি দেবচাঁদ নামক জনৈক শরীররক্ষককে তাঁহার ছদ্মবেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবচাঁদ বলিল, ব্যস্ততাপ্রযুক্ত সেই পরিচ্ছদ পথিমধ্যে কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া, বরং ইহা যে তাঁহাদের জয়লাভের একটী শুভচিহ্ন, তাহাই প্রকাশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল যে, প্রত্যাবর্ত্তী মোগলবাহিনী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবার জন্য নদীতে অবতরণ করিতেছে। এই সেনাদলের মধ্যে দশ সহস্র অশ্বারোহী, এক সহস্র হস্তী, দুই সহস্র গোলন্দাজ ছিল। সমস্ত সৈন্যকে একত্র সন্নিবেশিত করিয়া বাদশাহ শত্রু-পক্ষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মির্জ্জা ইব্রাহিম ও মির্জ্জা শা ভ্রাতৃদ্বয় নিয়তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইবার জন্যই যেন নিশ্চেষ্টভাবে সৈন্যদিগকে লইয়া শিবির মধ্যে কালযাপন করিতেছিলেন। মির্জ্জাদ্বয় আকবরের দয়া ও সহৃদয়তা বিস্মরণ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধায়োজন করিয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহাদের অকৃতজ্ঞতার বিষময় ফল প্রদান করিলেন। তাঁহারা যে সুযোগ হারাইলেন, তাহা আর পাইলেন না।

খান-আজেম ও আকবর শাহ।

যিনি আমদাবাদ দুর্গ বিদ্রোহীকারীদের হস্ত হইতে অকুতোসাহস ও অসীম ধৈর্য্যতার সহিত রক্ষা করিয়াছেন, সেই রাজভক্ত বিশ্বস্ত খাঁ-আজেম্ যখন শুনিলেন যে, মোগল-কুল-রবি বাদশাহ আকবর শা স্বয়ং সৈন্যসমভিব্যাহারে এরূপ আশ্চর্য্যজনক ক্ষিপ্রতাসহকারে তাঁহার উদ্ধারার্থ আমদাবাদে আসিয়াছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আসফ্ খাঁ ও অন্যান্য ওমরাহগণকে সঙ্গে লইয়া মোগল-সিংহ আকবরের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া বিনীতভাবে হৃদয়ের আবেগ ও কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। খানে আজেম্ তখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, তিনি বাদশাহের সম্মুখে;—বোধ হয় তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, নতুবা ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সৈন্যদলে।

অতঃপর একদল শত্রু-সৈন্য নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া মোগল-সেনানীর সম্মুখীন হইতে লাগিল। পিতা আকবর শাহ পূর্ব্ববৎ অটল, অচল ও গম্ভীরভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানে মতি স্থির রাখিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে শত্রুর আক্রমণের গতি-রোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহম্মদ কুলী খাঁ ও তার খাঁ দেওয়ানী আদেশমত কতকগুলি সৈন্য লইয়া অগ্রগামী হইলেন। কিন্তু তাঁহারা শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তদ্দর্শনে ক্ষুব্ধমনা পিতা আকবর শাহ অম্বরাধিপতি ভগবান্ দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শত্রু-সৈন্য যতই প্রবল ও অগণন হউক্ না কেন, তরবারিচালনা ব্যতীত আমাদের কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই! কারণ একবার যদি মোগল-সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহা হইলে কেহই প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবে না। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি। এস, আমরা সকলে দেহ ও প্রাণকে এক করিয়া শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করি! শত্রুগণ পাপ-নিরত, নিশ্চয়ই আমরা এই ধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিব।

ইত্যবসরে মহম্মদ হোসেনি মির্জ্জা স্বীয় সৈন্যদল হইতে অগ্রসর হইয়া সম্মুখভাগে আসিতে লাগিলেন। সাকুলী খাঁ মেহরেম্ এবং হোসেনি খাঁ টারকোমেন্ ইহা দেখিয়া বলিলেন, "এই উত্তম সুযোগ।" পিতা অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের বাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের দ্বারা ঈশ্বরের সাহায্য পাইয়াছি, সাম্প্রতিকই উত্তম সুযোগ আসিয়াছে।" তাহার পর মোগল-সৈন্য বীর সাজভাবে অগ্রসর হইয়া শত্রুসম্মুখে উপস্থিত হইল।

পিতা কোপায় নামক প্রিয় রণপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, হস্তে বর্শা এবং কোমরবন্ধে সুতীক্ষ্ণ তীর-পরিপূর্ণ তূণীর ঝুলিতেছিল। বীরাগ্রগণ্য শমনসদৃশ মোগল-বীরগণ তাঁহার সাহায্যার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া রহিল। তখন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; তুরী, ভেরী ও জয়ঢাকের শব্দ রণস্থলকে কাঁপাইয়া তুলিল। রণ-সঙ্গীতে মোগল-যোদ্ধগণের হৃদয়ে অভিনব আশার সঞ্চার হইল। তাহারা রণমদে মত্ত হইয়া প্রাণের মায়া-মমতা যাবতীয় কোমল বৃত্তিসকল ভুলিয়া গিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল এবং "আল্লা হো আকবর, আল্লা হো আকবর" চীৎকার করিতে করিতে তরবারি উন্মুক্ত করিয়া শত্রুদল মধ্যে বর্ষাকালীন প্রবল বন্যার ন্যায় বেগে প্রবেশ করিল। তাহাদের পাদবিক্ষেপ সহ্য করিতে না পারিয়া যেন ধরিত্রী কাঁপিতে লাগিলেন। অশ্বের দ্রুত সঞ্চালনে বিক্ষোভিত ধূলিরাশি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় আকাশমার্গকে আবৃত করিয়া ফেলিল। সূর্য্য মেঘান্তরালে মুখ লুকাইয়া যুদ্ধের ভীষণ পরিণাম দেখিতে লাগিলেন। তরবারির পরস্পর সংঘাতে উত্থিত অগ্নিরাশি চঞ্চলা চপলার ন্যায় চক্ষু ঝলসাইয়া দিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যেই রণস্থল প্রলয়কালীন মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু আকবর শাহ দেখিতে পাইলেন, যেন পশ্চিমাকাশে চক্রবালের উপরিভাগে মোগল-কুললক্ষ্মী অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত জয়পতাকা লইয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্‌কে স্মরণপূর্ব্বক, তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহম্মদ হোসেনি মির্জ্জা পূর্ব্ব দিকে মোগল-সৈন্যগণকে হাসরাই করিয়া

নিজ সৈন্যের দ্বারা ব্যূহ রচনা করিলেন। কিন্তু অচিরেই বাদশাহের সৈন্য তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল।

বিপজ্জালে আকবর।

বাদশাহ আকবর প্রাণের মমতায় বিপদের সম্মুখীন হইতে ভীত হইতেন না। তাঁহার ঈশ্বরে এতই প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, তিনি জানিতেন, ভগবান্ রক্ষা করিলে কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই জনাই তিনি শক্রর তীক্ষ্ণধার তরবারি, বর্ষার কিংবা কালান্তকারী বন্দুকের গুলির সম্মুখে বক্ষঃস্থল পাতিয়া দিতে পারিতেন। শক্রপক্ষীয় সৈন্যগণ বাদশাহকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে বর্ষার বারিধারার ন্যায় অবিরলধারে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি অক্ষতদেহে শক্র সংহার করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই ভাগ্যচক্র সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে পরিবর্ত্তিত হইল। বাদশাহের প্রাণনাশ করিবার জন্য শক্রপক্ষ যে সকল গুলি নিক্ষেপ করিতেছিল তন্মধ্যে একটী গুলি ঘটনাক্রমে শক্রপক্ষীয় একটী হস্তীর পৃষ্ঠের উপর পড়িল। হস্তীর পৃষ্ঠে নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র ও বারুদ বোঝাই ছিল। সেইগুলি সমস্ত জ্বলিয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বীয় সৈন্যদলের প্রাণ বনাশ করিতে লাগিল। হস্তীটি প্রাণভয়ে যূথমধ্যে প্রবেশ করিলে পর, এক ভীষণ দৃশ্যের অবতারনা হইল। হস্তিপৃষ্ঠস্থিত সমস্ত দাহ্য পদার্থগুলিতে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া শক্রপক্ষীয় সমস্ত অশ্ব, উষ্ট্র ও সেনাদলের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপ ভীষণ ব্যাপার দর্শনে বিপক্ষদল ভীত হইয়া প্রাণ লইয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। এমন কি দেখিতে দেখিতে অগণ্য সেনা কোথায় অদৃশ্য ও বিনষ্ট হইয়া গেল।

শক্র-কবলে আকবর।

বাদশাহ বিপক্ষ সেনাদলকে এইরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এবং এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দণ্ডায়মান হইলেন। হোসেনি মির্জ্জার সেনাদল তখনও ভিন্ন ভিন্ন দিকে পলায়ন করিতেছে, যেন সহস্র সহস্র যোদ্ধা তাহাদের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছে। মোগল-সৈন্য তখনও স্থানে স্থানে যুদ্ধ করিতেছে। বাদশাহের নিকটে তখন সামান্য সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। এই সুযোগে মহম্মদ হোসেনি মির্জ্জা সদলবলে আসিয়া বাদশাহকে আক্রমণ করিল। তিনি জীবনে এরূপ বিপদে কখনও পড়েন নাই। অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা ও সাহসের সহিত হোসেনি মির্জ্জার গতি রোধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য। রাজা মানসিংহ প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজা রঘুদাস এই যুদ্ধেই নিহত হন। উফাদার নামক জনৈক সেনানায়ক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও যুদ্ধ হইতে বিরত হন নাই।

সৌভাগ্যক্রমে হোসেন মির্জ্জা বা তদীয় সৈন্যসকল বাদশাহকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু যে তিনজন অশ্বারোহী তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুই জন তাঁহাকে বিনা আক্রমণে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল। বাদশাহ তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বর্ষা উন্নীত করিয়া ঘাতকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিলেন। পাপিষ্ঠ প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া বাদসাহের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিল, "আমি আপনার প্রাণ লইতে আসি নাই।

আপনাদের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্যই জাঁহাপানার সম্মুখে আসিয়াছি।” এইরূপে আকবরশাহ শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সৈন্যদলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভবিষ্যতে ইহা জানা গিয়াছিল যে, এই তিন জন অশ্বারোহী সামান্য পুরস্কারের লোভে বাদশাহের অমূল্য জীবন নাশে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বাদশাহের সম্মুখে আসিয়া তদীয় তেজোপূর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে দুই জন ঘাতক অশ্ব ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তৃতীয় ব্যক্তি * সাহসের সহিত তদীয় সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার উন্মুক্ত প্রাণনাশী বর্শার ভয়ে প্রাণভিক্ষা করিয়াছিল। তৎপরে বিদ্রোহিগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি স্বীয় সৈন্যদলকে আদেশ করিলেন, “তোমরা শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ কর এবং একজনও যেন জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিতে না পারে, এরূপ চেষ্টা কর।”

যুদ্ধের শেষ পরিণাম।

তৎপরে তাহারা যুদ্ধলব্ধ ধন সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দুই সহস্র হস্তী, দুই সহস্র বর্ম্মাচ্ছাদিত অশ্ব এবং পঞ্চাশৎ সহস্র কামানবাহী উষ্ট্র পিতার সম্মুখে আনীত হইল। সুজায়েৎ খাঁ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য পিতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার শুভাদৃষ্ট ও ঈশ্বরের কৃপাতে তিনি যে এই ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তজ্জন্য ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কারণ তৎপক্ষীয় কেহই ইহা অনুমান করিতে পারেন নাই যে, মোগল-সৈন্য এত অল্প-সংখ্যক হইয়া বিপুল শত্রুবাহিনীর নিকট কিরূপে জয়লাভ করিতে পারিবে।

খান কোকার মৃত্যুসংবাদ।

যুদ্ধাবসানের পর পিতা বিজয়দাতা ভগবান্‌কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমদাবাদ নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে শুনিলেন যে, সেফ্ খান্ কোকা এই যুদ্ধে বীরের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, এই শোকাবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার ধাত্রী-পুত্রের (জেনি খাঁর ভ্রাতার) মৃত্যুর বিষয় যথাযথভাবে শুনিতে লাগিলেন।

আমদাবাদের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে, পিতা আকবরশাহ সমস্ত আমীরকে একটী ভোজ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং সেই দিনে কতকগুলি গণৎকার) তথায় উপস্থিত ছিলেন। সম্ভাবিত যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে, বাদশাহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। শেনাবিদগণ গণনা করিয়া বলেন যে, বাদশাহ জয়লাভ করিবেন বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার একটী প্রিয় ও বিশ্বস্ত ওমরাহ নিহত হইবে। সেই দিন রাত্রে সেফ্ খাঁন পিতাকে বলেন, ওমরাহ এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইবেন এবং ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিয়াছিল। যুদ্ধ কালে তিনি মুখে দুইটী সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে তাঁহার সম্রাট্ ও প্রভু আকবরশাহের নিকটে দ্রুতবেগে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মহম্মদ হোসেনি দি[redacted]গতিরোধ করেন, কিন্তু খাঁন্

* আবুল ফজল বলেন, তিন জন ঘাতকই তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে একজন তাঁহার জানুদেশে তরবারি দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও যুদ্ধ-নিপুণতার ফলে আর কোন আঘাত প্রাপ্ত না হইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ হোসেনির পলায়ন ও ধৃত হওন।

হোসিনি মির্জ্জা (যিনি নিজেকে গুজরাটের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন) সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে পর, শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলায়ন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে তাঁহার অশ্বের পাদদেশে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে পদব্রজে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। এমন অবস্থায় পিতার একজন বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার অনুসরণ করেন এবং অবশেষে বন্দী করিয়া বাদশাহের নিকটে পলাতক বিদ্রোহী হোসেনিকে বিচারার্থ লইয়া আসেন। হোসেনি পাছে পলায়ন করে, এইজন্য পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহার হস্তদ্বয় বাঁধা ছিল। অপর দুই জন ব্যক্তি মির্জ্জা খাঁকে ধৃত করিয়াছে বলিয়া বাদশাহকে জানান, কিন্তু বাদসাহ বন্দীকে এই জটিল রহস্য মীমাংসা করিতে বলায় মির্জ্জা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর করিলেন, "বাদসাহের নিমক আমার বন্দীকারী" অর্থাৎ মির্জ্জা বাদশাহের দয়া ও অনুগ্রহ ভুলিয়া গিয়া তাঁহারই বরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেই অকৃতজ্ঞতার ফলেই সে এইরূপে বন্দী হইয়াছে। এই দুঃখজনক পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া সম্রাটের হৃদয়ে দয়া হইল এবং মির্জ্জার হস্তের বন্ধন মোচন করিতে আদেশ দিলেন। মানসিংহ দরবারির অধীনে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। কিন্তু মানসিংহের নিকট বন্দী পানীয় জল ভিক্ষা করিলে, তিনি তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলেন পিতা ইহা শ্রবণ করিয়া মানসিংহের কার্য্যের প্রতি[illegible]ছিলেন এবং অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বন্দীকে তাঁহার নিকট রাখিতে আমাদের দিলেন। মির্জ্জা আকবরের এইরূপ সহৃদয়তায় আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, যদিও গুজরাটের রাজকুমারগণের মধ্যে একজন পরাস্ত ও বন্দী হইয়াছে, তথাপি তাঁহার এরূপভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে, এখনও তিন জন অরণ্য মধ্যে আছেন, তাঁহারা পুনরায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া আক্রমণ করিতে পারেন।

এখ্‌তিয়ার উল-মুল্ক ও মোগল-সৈন্যের যুদ্ধ।

বাদশাহ ধীরে ধীরে আমদাবাদ নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন এবং হোসেনিকে রায় সিংহের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হোসেনির হস্ত বন্ধন পূর্ব্বক হস্তিপৃষ্ঠে উত্তোলিত করিয়া লওয়া হইল। পথিমধ্যে একদল বিপক্ষ-সৈন্য নব উদ্যমে ও উৎসাহে অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া মোগল-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এখতিয়ার উল্‌মুল্ক ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া এই বিপক্ষ সেনা-দলের পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি বাদশাহকে অভিনন্দন করিবার জন্য আসিতেছিলেন ইহা জানাইলেন, মোগল-সৈন্যগণ, শত্রুসৈন্যগণকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বাদশাহ তাঁহার রণবাদ্য-করগণকে রণবাদ্য করিতে আদেশ দিলেন। যোদ্ধ্‌গণ সকলেই নিজ নিজ অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাজা মানসিংহ, সুজায়েত খাঁন, রাজা ভগবান্ দাস সামান্য-সংখ্যক সৈন্য লইয়া অগ্রগামী শত্রুগণের সম্মুখীন হইয়া আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ-গণ উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে শত্রুদিগের উপর অজস্র-ভাবে তীর ও গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃ।

আলোকের চাপ।

বায়ু মৃদুবেগে বহিলে গাছের পাতায় আন্দোলন দেখিয়া আমরা বায়ুর চাপ বুঝিয়া লইতে পারি। তা'র পর সেই বায়ুই প্রবল হইয়া যখন গাছপালা বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করে, তখন চাপের কার্য্য আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। উচ্চস্থান হইতে পড়িলে গুরু বস্তু যে চাপ দেয়, তাহা প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আলোকের চাপের কথাটা সম্পূর্ণ নূতন।

মনে করা যাউক অতি উজ্জ্বল দীপশিখার নিকটে কোন দ্রব্য রাখা গিয়াছে, এবং তাহার একার্দ্ধে তীব্রালোক পড়িতেছে। এ প্রকার অবস্থায় জিনিসটা সত্যই কি আলোকের চাপে ধাক্কা পাইয়া দীপশিখা হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করে? কোন লঘু বস্তুর উপর ফুৎকার দিলে উহাতে যে চাপ পড়ে, তাহা জিনিসটাকে উড়াইয়া দূরে লইয়া যায়। উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে লঘু বস্তু থাকিলে তাহা সত্যই কি দূরে চলিয়া যায়?

আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার উপর সূর্য্যালোকের কার্য্য দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বলিতেছেন, ভীমকায় ধূমকেতু যখন তাহার কোটি কোটি যোজনব্যাপী বিশাল পুচ্ছটিকে বিস্তৃত করিয়া আকাশে উদিত হয়, তখন সূর্য্যালোকের চাপই তাহার দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লঘু কণার উপর ধাক্কা দিয়া পুচ্ছের রচনা করে। বৈশাখের পশ্চিমে ঝড়ে ধূলি উড়িতে আরম্ভ করিলে, বায়ুর চাপে তাহা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকেই চলিতে থাকে। সূর্য্য হইতে অজস্র আলোকরশ্মি আসিয়া ধূমকেতুর উপরে যে চাপ দেয়, তাহাতে উহার দেহের লঘু কণাগুলি ঠিক্ ঐ প্রকারেই সূর্য্য হইতে দূরে গিয়া পড়ে। এই কারণে ধূমকেতুর পুচ্ছকে সর্ব্বদাই সূর্য্যের বিপরীত দিকে দেখা গিয়া থাকে। ইহা ছাড়া পূর্ণ গ্রহণকালে চন্দ্রাচ্ছাদিত সূর্য্যবিম্বের চারিদিকে যে ছটামুকুট (Corona) প্রকাশ পায়, এবং সূর্য্যের উদয়াস্তের অনেক পূর্ব্বে ও পরে যে মৃদু আলোক সবিতার সম্মুখের খুরাখিত রজতধূলির ন্যায় রবিমার্গে (Ecliptic) বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাদের সকলেরই মূলে আলোকের চাপ বর্ত্তমান। নিয়তই জগতে এ প্রকার অনেক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, যাহার অস্তিত্ব চক্ষুকর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। সূচ্যগ্র প্রমাণস্থানে যে শত শত জীবাণু জীবনসংগ্রামে যোগ দিয়া উন্নত প্রাণিগণেরই ন্যায় বিচরণ করিতেছে, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় তাহার পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রই জীবজগতের এই বিশাল খণ্ডরাজ্যের লীলা দেখায়। কোটি যোজন দূরের মহাজ্যোতিষ্কগুলি হইতে যে ক্ষীণালোক শত শত বৎসর ছুটিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, আমাদের চক্ষু তাহাতে সাড়া দেয় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফোটোগ্রাফের চিত্র তাহাদেরই পরিচয় প্রদান করে। আলোকের চাপ এই প্রকারেরই অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। ঝড়ের মাঝে দাঁড়াইলে বায়ুর প্রবল চাপ ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা আমরা বুঝিয়া লই। কিন্তু সূর্য্যালোকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলে, আলোক যে মৃদু চাপ দেয় তাহা আমরা পারি না। পরীক্ষাগারের

সূক্ষ্ম যন্ত্রদ্বারা তাহার অস্তিত্ব বুঝিয়া লইতে হয়, এবং গণিতের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এইপ্রকারেই আলোকের চাপের অস্তিত্ব বুঝিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহার কার্য্য দেখাইতেছেন। আমাদের পৃথিবীর উপর সূর্য্যালোক পড়িয়া নিয়তই একুশ লক্ষ মণ জোরে ধাক্কা দিতেছে।

আলোকের চাপের সাহায্যে যে সকল জ্যোতিষিক প্রহেলিকার মীমাংসা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, চাপ কি প্রকারে কার্য্য করে তাহা জানা আবশ্যক। যখন বাহির হইতে কোন শক্তি আসিয়া কোন বস্তুর উপর পড়ে, তখন জিনিসটির পৃষ্ঠফল অনুসারে শক্তির কার্য্য দেখা যায়। এক সের লৌহপিণ্ডের উপর প্রবল বায়ু আঘাত দিয়া যে পরিমাণ চাপ দেয়, তাহাকে পিটাইয়া বৃহৎ পাতের আকারে পরিণত করিলে সেই চাপেরই সমবেত পরিমাণ অনেক অধিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভূমধ্যাকর্ষণ (Gravitation) প্রভৃতির শক্তি যেমন সামগ্রীর (Omass) পরিমাণ অনুসারে অল্পাধিক হয়, বাহিরের চাপ সে নিয়মে চলে না। জিনিস যতই লঘু হউক না কেন, তাহার পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত হইলেই চাপের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। একসের লৌহপিণ্ডের পৃষ্ঠফল যত, সেই লৌহদ্বারা গঠিত একশত গুলির সমবেত পৃষ্ঠফল তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। তা'র পর সেই ছোট বর্ত্তুলগুলিকে ভাঙিয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বিভক্ত করিলে, পৃষ্ঠফলের পরিমাণ এত অধিক হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন পূর্ব্বের অখণ্ড গোলকটির পৃষ্ঠফলের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে এক সের ওজনের লৌহপিণ্ডের উপর [illegible] আসিয়া পড়ে, অতি ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত হইলে, সেই জিনিসই তাহার সহস্র সহস্র গুণ চাপ পাইতে আরম্ভ করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বড় জিনিসের উপরকার আলোকের চাপ আমরা বুঝিতে পারি না। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থের উপরে উহার যে কার্য্য হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া চাপের অস্তিত্ব বুঝিয়া লইতে হয়। যে সকল জিনিসের পৃষ্ঠফল তাহাদের গুরুত্বের তুলনায় অত্যন্ত অধিক, সেই গুলিতেই উহার কার্য্য সুস্পষ্ট দেখা যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সাধারণ লৌহকণিকার ব্যাসের পরিমাণ যদি এক ইঞ্চির একলক্ষ ভাগের একভাগ হইয়া দাঁড়ায়, তখন উহার পৃষ্ঠে পতিত সূর্য্যালোকের চাপ কণিকাগুলির গুরুত্বের ঠিক সমান হয়। কণাগুলি ইহা অপেক্ষাও ছোট হইয়া পড়িলে, আলোকের চাপ তখন গুরুত্বের অধিক হইয়া সেগুলিকে ধূলিকণার ন্যায় উড়াইয়া দূরে চালাইতে থাকে।

ধূমকেতুর দেহ যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জমাট শিলামৃত্তিকা দ্বারা গঠিত নয় তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সূর্য্য বা অপর কোন জ্যোতিষ্ক ধূমকেতুর মুণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহার জ্যোতিঃর একটুও হ্রাস হয় না। জমাট পদার্থ দ্বারা গঠিত হইলে, চন্দ্র যেমন গ্রহণকালে সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, সেইপ্রকার ধূমকেতুগুলিও সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে সূর্য্যগ্রহণ উৎপন্ন করিত। কিন্তু এপ্রকার গ্রহণ কখনই ঘটে নাই। তা'ছাড়া যে পথ ধরিয়া সাময়িক ধূমকেতুগুলি (Periodic Comets) সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তাহার সর্ব্বাংশ প্রায়ই বহু উল্কাপিণ্ড দ্বারা বিকীর্ণ থাকে। কাজেই ইহাদের দেহ ছোট বড় উল্কাপিণ্ড দ্বারা গঠিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

সূর্য্যালোক বড় পিণ্ডগুলির উপরে যে চাপ দেয়, তাহাতে সেগুলি স্থানভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু ইহাদেরই সহিত যে সকল অতি লঘুকণা থাকে, তাহারা সেই চাপ ধারণ করিতে না পারিয়া বায়ুতাড়িত ধূলিকণার ন্যায় দূরে ধাবিত হইয়া পুচ্ছের রচনা করে। কোন কোন ধূমকেতুর পুচ্ছ দশ কোটি মাইল অপেক্ষাও দীর্ঘ হইয়াছে। অথচ সমগ্র পুচ্ছে যে সামগ্রী থাকে তাহা একত্র করিলে কখনই চারি পাঁচ সেরের অধিক হয় না। ধূমকেতুর খণ্ডদেহের ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যে কত সূক্ষ্ম ইহা হইতে আমরা তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি।

কখন কখন ধূমকেতুর একাধিক পুচ্ছ দেখা যায়। এপর্য্যন্ত এই ব্যাপারটির ভাল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন জ্যোতিষীর নিকটে শুনা যায় নাই। আলোকের চাপের সাহায্যে ইহার উৎপত্তি তত্ত্ব এখন বুঝা যাইতেছে। যে সকল উজ্জ্বল বস্তু আমাদের করায়ত্ত নয়, প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের পরীক্ষা করা চলে না। এই অবস্থায় রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্র (Spectroscope) আমাদের প্রধান সহায়। এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সাহায্যে কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কগুলির গঠনোপাদান কেবল বর্ণচ্ছত্র (Spictrum) পরীক্ষা করিয়া স্থির করা যায়। ধূমকেতুর পুচ্ছ হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহা ঐ যন্ত্র ফেলিয়া বিশ্লেষ করিলে পুচ্ছে অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া অনেক জ্যোতিষী মনে করিতেছেন, সূর্য্যের তাপে ঐ অঙ্গার ও হাইড্রোজেন ঘটিত বস্তু বিশ্লিষ্ট হইয়া যে সকল অঙ্গারকণিকার উৎপাদন করে, তাহাই পুচ্ছের প্রধান উপাদান। কিন্তু এগুলির সকলেই সমান আকার গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয় না, কাজেই একই সূর্য্যালোক ছোট বড় হিসাবে নানাপ্রকারে চাপ দিয়া একাধিক পুচ্ছের রচনা করে। হেলির (Halley's Comet) ধূমকেতুটিতে গত উদয় কালে অনেকগুলি ছোট ছোট পুচ্ছ দেখা গিয়াছিল। ১৭৪৪ সালে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার পাঁচটি পুচ্ছ ছিল। সুবিখ্যাত ডনাটির (Donati's Comet) ধূমকেতুটি পঞ্চপুচ্ছের সহিত আবিষ্কারকালে ধরা দিয়াছিল।

সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে ধূমকেতুর পুচ্ছ যে কত শীঘ্র বাড়িয়া যায়, হেলির ধূমকেতুর ক্রমিক পরিবর্ত্তন যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৬৮০ সালের বৃহৎ ধূমকেতুটির পুচ্ছ দুই দিবসের মধ্যে ছয় কোটি মাইল দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের জনক নিউটন সাহেব তখন জীবিত ছিলেন। পুচ্ছের আকস্মিক বৃদ্ধির তিনিও কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম নেতা মহাপণ্ডিত অধ্যাপক আরেনিয়স্ (Arrhenius) আলোকের চাপ দ্বারা এই প্রকার বৃদ্ধি সম্ভব বলিয়া সম্প্রতি প্রচার করিয়াছেন। ইনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, পুচ্ছস্থ কণিকাগুলি যথেষ্ট ছোট হইয়া পড়িলে, সেগুলি আলোকের চাপে দুই ঘণ্টা কালে ছয় কোটি মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে।

তাপালোকের বিপুল ভাণ্ডার বক্ষে ধরিয়া যে মহাজ্যোতিষ্কটি আমাদের এই জগতের কেন্দ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাতে আলোকের চাপের কি কার্য্য হয়, এখন আলোচনা করা যাউক। দূর হইতে আমরা সূর্য্যের যে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি সেপ্রকার নয়। নানা

বায়বীয় পদার্থের গভীর আবরণে আবৃত থাকিয়া সূর্য্যদেব আমাদিগকে দেখা দেন। এই সকল যবনিকার অন্তরালে তিনি কোন্ রূপ গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহা দেখা কঠিন। যাহা হউক, প্রকৃত সূর্য্য ঘন-বাষ্প বা কঠিন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, যে সকল উপাদানে সৌরদেহ গঠিত তাহা যে খুবই উত্তপ্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা কৃত্রিম উপায়ে বহুপ্রকার তাপ উৎপন্ন করি, তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক-তাপের উষ্ণতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সূর্য্যের উষ্ণতা শত শত বৈদ্যুতিক চুল্লীর উষ্ণতাকেও অতিক্রম করে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গভীরতা পঞ্চাশ মাইলের অধিক নয়, কিন্তু সূর্য্যের বাষ্পাবরণটি সকলের বাহিরে রহিয়াছে, কেবল তাহারই গভীরতা প্রায় পাঁচ হাজার মাইল। এই বিশাল বাষ্পরাশি অনন্ত হাইড্রোজেনের লোহিতাভ আলোকে রঞ্জিত হইয়া সৌরাকাশের সর্ব্বাংশে ঝটিকাবেগে আলোড়িত হইতেছে। সূর্য্যালোকের ভীষণ ঝটিকার সহিত আমাদের পরিচিত ঝটিকা বা ঘূর্ণাবর্ত্ত গুলির তুলনাই হয় না। এই আলোড়নের ঘাতপ্রতিঘাতে সৌরাকাশের রঙিন্ বাষ্প রাশিকে সহস্র সহস্র মাইল দীর্ঘ শিখাকারে অনেক উপরে উঠিতে দেখা গিয়া থাকে। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে যখন উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, কেবল তখনি সৌরাকাশের এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার সুবিধা হয়। এজন্য পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণে এপর্য্যন্ত সৌর-বাষ্পমণ্ডল পরীক্ষা করিবার একমাত্র সুযোগ ছিল। দেশ বিদেশের জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীন ক্যামেরা প্রভৃতি যন্ত্র এবং যন্ত্রাদি লইয়া অতি দুর্গম স্থানেও পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ দেখিবার জন্য মহাবিপদ অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু এখন এক নূতন ব্যবস্থায় সকল সময়েই সূর্য্যের বাষ্পাবরণ পরীক্ষার সুযোগ হইয়াছে।

যাহা হউক সূর্য্যের আকাশের উপরে পূর্ব্বোক্ত সহস্র সহস্র মাইল দীর্ঘ শিখাগুলি (Streamers) যে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তাহা ঠিক বলিতে পারিতেন না। সামগ্রীর (mass) পরিমাণ যত অধিক হয়, জিনিষের আকর্ষণী শক্তিও তত বাড়িয়া থাকে। এই ধ্রুব নিয়মের অনুগত হইয়া সৃষ্টির ছোট বড় সকল কার্য্যই চলিতেছে। সূর্য্যের সামগ্রী-পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় অত্যন্ত অধিক। হিসাব করিলে দেখা যায়, ভূতলে যে বস্তুর ভার দেড় মণ, সূর্য্যালোকে তাহার ওজন প্রায় ৪৬ মণ হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রবল আকর্ষণের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সৌরাকাশের লঘু বাষ্পগুলিকে বেশ স্বাধীনভাবে আকাশের উপরে ভাসিতে দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ অবাক্ হইয়া পড়িতেন। ব্যাপারটা জ্যোতিঃশাস্ত্রের এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এখন বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে আলোকের চাপেরই কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, যে বাষ্পরাশি সূর্য্য হইতে মহাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা চিরকালই বাষ্পাকারে থাকিতে পারে না। একটু দূরে গিয়া শীতল হইয়া পড়িলেই তাহা জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত হয়। আকারে একটু বড় হইলে আলোকের চাপ সেগুলিকে আর শূন্যে রাখিতে পারে না, নিজেদের ভারে তাহারা আপনা হইতেই সূর্য্য-পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে। আমরা বহুদূরে থাকিয়া এই কণিকাগুলিকেই সূর্য্যের বাষ্পাবরণের বক্র শিখাকারে দেখিতে পাই। উহাদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়াইলে আবার

আলোকের চাপ ঠিক গুরুত্বের সমান হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি উপরে বা নীচে কোন স্থানেই যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা কণিকাগুলিকে লঘু মেঘাকার বাষ্পাবরণের উপর ভাসিতে দেখি। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে সূর্য্যের আকাশে এই প্রকার উজ্জ্বল মেঘ বার বার দেখা গিয়াছে। কণিকাগুলির আকার যখন আরো ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়ায়, তখন সূর্য্যালোকের চাপ উহাদের গুরুত্বকে অতিক্রম করে। এই অবস্থায় সেগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছস্থ কণিকাগুলিরই ন্যায় আলোকের ধাক্কায় দ্রুতবেগে সৌরাকাশ ছাড়িয়া দূরে চলিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য হইতে অনেক দূরে যে মৃদু আলোকের ছটামুকুট (Corona) সূর্য্যগ্রহণকালে দেখা দেয়, তাহা আলোক-তাড়িত অতি ক্ষুদ্র কণিকাগুলি দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণুকেই (Atoms) সৃষ্টপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ বলিয়া অনুমান করিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান উহা অপেক্ষাও বহুক্ষুদ্র এক জাতীয় অতি পরমাণুর (Corpuscles)* সন্ধান দিয়াছে। এগুলি ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুতের বাহক এবং আকারে এত ক্ষুদ্র যে, অন্ততঃ হাজারটি একত্র না হইলে আমাদের পরিচিত একটি পরমাণুর গঠন হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, সূর্য্যের বাষ্পমণ্ডলে যে রাসায়নিক কার্য্য ও তাপের লীলা অবিরাম চলিতেছে, তাহাতে সৌরাকাশ সর্ব্বদাই বিদ্যুৎযুক্ত হইয়া আছে এবং অসংখ্য অতি পরমাণু ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বহন করিয়া গোলা-গুলির মত মহাকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই ইহাদেরই যেগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপর আসিয়া পড়ে, তাহাদের সংস্পর্শে বায়ুরাশির ঊর্দ্ধতম অংশ ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া পড়ে। দুইটী পদার্থ যদি একই জাতীয় বিদ্যুতে পূর্ণ থাকে, তবে কাছাকাছি রাখিলে তাহারা বিকর্ষণ সুরু করিয়া দেয়। সুতরাং সূর্য্য হইতে যখন ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ নূতন অতি পরমাণু দলে দলে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে, তখন তাহারা আমাদের ঋণাত্মক বিদ্যুৎ পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হইয়া পিছাইয়া যাইতে চায়। এই অবস্থায় সেগুলি যদি পরস্পর মিলিয়া বা অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া আকারে বেশ বড় হইয়া দাঁড়ায়, তবে সূর্য্যের দিকেই তাহারা পড়িতে আরম্ভ করে, আলোকের চাপ গতিরোধ করিতে পারে না। জ্যোতির্বিদ্‌গণ বলিতেছেন, পৃথিবী ও সূর্য্যের অতি পরমাণুর এই প্রকার আনাগোনা সত্যই অবিরাম চলিতেছে। যদি কেহ চন্দ্রলোক হইতে আমাদের পৃথিবীটিকে দেখেন, তবে সূর্য্য ও ধরাকে ঐ অতি পরমাণুর প্রবাহ দ্বারা সুস্পষ্ট সংযুক্ত দেখিতে পাইবেন।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং অস্তের পরে রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রগুলিকে ভেদ করিয়া যে এক মৃদু আলোক (Zodiacal Light) আকাশে দেয়, জ্যোতির্বিদ্‌গণ এত চেষ্টাতেও উহার উৎপত্তি-তত্ত্ব নিঃসন্দেহে স্থির করিতে পারেন নাই। এখন কেতুকেই পূর্ব্বোক্ত আলোকের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে।

অতি পরমাণু ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, আজকাল এক এক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষাগারে তাহার সত্যতা চাক্ষুষ দেখানো হইতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্ (Crookes) এক প্রকার প্রায় বায়ুশূন্য নলিকার (Crooke's tube) ভিতর বি[redacted] করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-

গুলির সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। নলের দুই প্রান্তে দুইটি তার সংযুক্ত থাকে। ইহাদের সহিত বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের দুই প্রান্ত সংযুক্ত রাখিলেই নলের ভিতর আলোক দেখা দেয়। ইহা সাধারণ আলোক নয়। সূর্য্য হইতে যে সকল অতি পরমাণু ছুটিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরে আসিয়া পড়ে ক্রুক্সের নলের আলোকটা সেই জাতীয় বিদ্যুৎ পূর্ণ অতি পরমাণুরই আলোক। নলের বাহিরে চুম্বক ধরিলে চৌম্বকাকর্ষণে ঐ অতি-পরমাণুর প্রবাহকে সুস্পষ্ট বাঁকিয়া চলিতে দেখা যায়। এই পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজনের আবশ্যক হয় না। আজকাল ছোটখাটো পরীক্ষাগারেও অতি-পরমাণু ও চুম্বকের এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দেখানো হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ চৌম্বকাকর্ষণজনিত বিচলনের পরিমাণাদি গণনা করিয়া অতি-পরমাণুর গুরুত্ব ও বেগ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন।

যাহা হউক ক্রুক্সের নলের ভিতর অতি-পরমাণুর কার্য্য লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য আরেনিয়স্ (Arrhenius) মেরুপ্রভার (Aurora) উৎপত্তির এক ব্যাখ্যান দিয়াছেন। আমাদের পৃথিবী যে নানা প্রকারে একটি বৃহৎ চুম্বকের ন্যায় কার্য্য করে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সাধারণ চুম্বক-শলাকার যেমন দুইটি মেরু (poles) থাকে, পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত স্থানে সেই প্রকার চৌম্বক-মেরুর ন্যায়ই দুইটি স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। চৌম্বক-শক্তির সূচক রেখাগুলি (Lines of forces) ঐ দুই মেরুকে সংযুক্ত করিয়া পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক আরেনিয়স্ বলিতেছেন, সূর্য্য হইতে বিচ্ছুরিত সেই বিদ্যুৎযুক্ত অতি-পরমাণুগুলি যখন আমাদের দিকে ছুটিয়া আসে, পৃথিবী চুম্বকের ন্যায়ই সেই প্রবাহটিকে বাঁকাইয়া দেয়। বিষুব রেখার (Equator) সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষাকৃত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, এবং চৌম্বক রেখাগুলি সেখানে ধরাতলের সহিত প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত। সেজন্য এই সকল স্থানের উপরে যে অতি পরমাণুগুলি আসিয়া পড়ে, তাহারা ক্রুক্সের নলের কণিকাগুলির ন্যায় বাঁকিয়া মেরু অভিমুখে ছুটিয়া চলে। তা'র পর এগুলিই যখন মেরুপ্রদেশে পৌঁছিয়া এবং বক্রপথে নীচে নামিয়া, বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে, তখন তাহাদেরই আলোক আমাদের নয়নগোচর হইয়া পড়ে। ইহাই মেরু-প্রভা। বিষুব প্রদেশ হইতে তাড়িত হইবার সময় অতি-পরমাণুগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলকে স্পর্শ করিতে পারে না। কাজেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসিগণ সেই বিচিত্র আলোক হইতে বঞ্চিত থাকে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

চিত্রকরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

১০

সুরনাথের বাটী প্রাচীরবেষ্টিত—প্রাচীরের দক্ষিণ শ্রেণীর মধ্যস্থলে তোরণ দ্বার। বাটীকে অট্টালিকা বলিতে চাও বল—তবে তাহাতে গগনভেদী স্তম্ভ বা মর্ম্মরের কারুকার্য্য নাই—অথবা ব্যয়-বাহুল্যে তাহার সৌন্দর্য্য-শ্রীতে জড়তার প্রলেপ ছিল না।

শুভ্র পরিচ্ছন্ন দুই মহল দ্বিতল ভবন। প্রাচীরাভ্যন্তরে আম, জাম, সপেটা, আখ্রোট, বট, দেবদারু প্রভৃতি অগণন বৃক্ষরাজী শাখাপত্রে হরিত চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া সুরনাথের আবাসবাটীখানিকে পশ্চিমের প্রচণ্ড ক্রোধাবতার নিদাঘ-সূর্য্যের দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়াছে। শীতল, ছায়াময়, মনোরম স্থান।—নিম্নে ঐ সমস্ত মহীরুহ সম্প্রদায়ের ব্যবধান প্রদেশে—বাতাবী, করবী, কামিনী, বেল যুঁই, গোলাপ প্রভৃতি সুকুমার পুষ্পতরুর বৃন্দাবন! এই সমস্ত বৃক্ষরাজি কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর রেখাবন্ধনে ক্লিষ্ট নয়; অবাধ স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যে সকলগুলিই সুন্দর!—স্বভাবের উন্মুক্ত অসংযত শোভাই ভাবুকের চিত্তরঞ্জন করে—তাহাকে প্রণালীবদ্ধ করিলে, সে চিকিৎসাপীড়িত স্বাস্থ্যহীন মলিন-কান্তি মানবের মত হইয়া পড়ে।

বাটীর প্রাচীরে ঝুমকালতা, তরুলতা, মাধবীলতা প্রভৃতি বিভিন্নজাতীয়া লতিকাকুল পরস্পর আলিঙ্গন বন্ধনে কে কোথায় কাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তোরণ-শিখরে তরুণী পাগলিনী দ্রাক্ষা আঙ্গুরের অসংখ্য স্তবক দোলাইয়া, অতি কিশোরী ফলবতী রমণীর মত রমণীয়তা ধারণ করিয়া রহিয়াছে!

দিল্লীর ওমরাহগণের মধ্যে যিনি সুরনাথের গৃহে কখন না কখন অভ্যাগত হন নাই, তিনি সম্ভ্রান্ত পদবাচ্য হইবার অধিকারীই নন বলিলে হয়।—সুরনাথ সর্ব্বাগ্রে সে সকলকে তাহার বৃদ্ধা ক্ষীণ-শ্রুতি-দৃষ্টি জননীর পরিচিত করিত, পরে আপনি তাহাদিগের পরিচিত হইত।—"আমার মাতৃদেবী"—সাহঙ্কারে সুরনাথ প্রত্যেককে এই কথা বলিত।

বৃদ্ধা আপনার মনে চরকা কাটিতেন, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না।

প্রতিদিন সুরনাথের প্রথম দৈনন্দিন কার্য্য জননীর চরণ-বন্দনা। পুত্র জননীর চরণে ভূমিষ্ঠ হইলে জননী আশীর্ব্বাদ করিতেন—পুত্র তাহার পর সানন্দে অন্য কার্য্যাদিতে মনোনিবেশ করিত।

সূর্য্যাস্ত—চিকণলাল সুরনাথের গৃহে প্রবেশ করিল। স্বয়ং সম্রাট্ প্রবেশ করিয়া যে গৃহ কোন দিন সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাতে ছিদ্র কোথায়, যাহার অপনোদনে হীন রিপুকর্ম্মকারের আবির্ভাব!

সারাদিন গুরু শ্রমের পর বাগানে বাপীতটে বসিয়া সুরনাথ বিশ্রাম করিতেছিল চিকণ তথায় উপস্থিত হইল। সুরনাথ চিকণকে সাদরে সম্ভাষণ করিল।

বাদশা হউক, ভিখারী হউক—সরল প্রাণ এবং শিল্পে অনুরাগ থাকিলে সুরনাথের নিকট উভয়ের সমান সমাদর। লক্ষীর বরপুত্রগণের বরং কখন কখন সুরনাথের সহিত বাদানুবাদে বিপত্তি ঘটিত, দারিদ্র্য,

সুরনাথের অমায়িকতায় এবং প্রসন্ন হাস্যে কখনও বঞ্চিত হয় নাই।—সুরনাথ বলিত, "দারিদ্র্য-ক্লেশ যে আমার অস্থিমজ্জা-নিহিত—সুতরাং প্রত্যেক ভিখারী আমার আত্মীয় কুটুম্ব।"

সরসীসোপানে পাদচারণা করিতে করিতে সুরনাথ চিকণের বিপৎ-ইতিহাস শ্রবণ করিল। সান্ধ্যসমীরণোত্থিত জলহিল্লোলের তালে তালে জলজ কুসুম-রাজি নৃত্য করিতেছিল—উপরে আকাশতলে বিহঙ্গ-কবি চাতক উড়িতে উড়িতে তাহা দেখিয়া অমিয়-কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল "আমরি—কি ফটিক-জল!"

চিকণের কথান্তে সুরনাথ হতাশের কণ্ঠে বলিল,—"আমি ভাবিয়াছিলাম যুবা—পুরুষ!" স্ত্রীলোকের চিত্রকলায় সাফল্য—অর্থাৎ—"

সুরনাথ তাহার কথা শেষ না করিলেও চিকণ তাহার 'অর্থাতের' অর্থ বুঝিল। অর্থাৎ, সুরনাথের বলিবার তাৎপর্য্য এই, রমণী কখনও চিত্রকলায় সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই—পারিবে বলিয়াও তাহার ধারণা নয়।

চিকণ সভয়ে উত্তর করিল—"তুমি ত মদন-ভস্মের চিত্রে অমার্জ্জিত প্রতিভার লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলে?"

"সত্য! কিন্তু তাহা তাহার পিতার যৎসামান্যের উত্তরাধিকারিত্ব ব্যতীত আর কিছু না হইতে পারে।"

চিকণ বলিয়া উঠিল,—"তোমার অনুগ্রহে যদি সেই সামান্য শক্তি পরিস্ফুট হইয়া সামান্য কার্য্যকরীও হয়, তাহা হইলেও তাহার দু'বেলা দু'মুঠার সংস্থান হইতে পারে ত? তাহার যে তাহারও কোন উপায় নাই—"

সুরনাথের প্রসন্ন মুখে পলকের মধ্যে অন্ধকারের ছায়া প[illegible]ধোচ্চস্বরে সুরনাথ চিকণের চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, "না না—অমন কথা মুখে আনিও না।—শিল্পকলায় যাহার বস্তুতঃ অধিকার নাই—তাহার তাহাতে কখনই স্থান হইতে পারে না।—কেবল উদরের পূরণার্থ এ দেবকলা স্পর্শ করা গো-হত্যা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাতক! উদরের জন্য পুরুষের লাঙ্গল, এবং নারীর চরকা, কোথাও পলায়ন করে নাই ত?"

চিকণ অপ্রতিভ হইল। থতমত খাইয়া বৃদ্ধ বলিল, "তোমার কথা অতি যথার্থ—তবে তাহার আলেখ্য আলোচনা করিয়া তুমি কাল যাহা বলিয়াছিলে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তোমার কথার উত্তর করিতে সাহস করি,—'চিত্রকলায় একেবারে তাহার স্থান নাই', এমন দণ্ডাজ্ঞা তৎপক্ষে উচিত কি?"

সুরনাথ ক্ষিপ্রগতিতে কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বদিনের ক্রীত চিত্র চিকণের নিকট আনয়ন করিল।

"হাঁ! চিত্রে চিত্রকরের প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় সত্য—আর সহস্র ত্রুটী সত্ত্বেও চিত্র মৌলিকত্বের পরিচয় প্রদান করে। শোন চিকণ! আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব—অথবা তুমি যতটুকু অনুরোধ করিতেছ, তদপেক্ষা আমি অধিক করিব। আমি আজ রাত্রিতে আগ্রা যাইতেছি—বোধ হয় পাঁচ ছয় মাস কাল সেথায় অবস্থান করিব—তোমার অনুরোধে আমার কার্য্যালয় আমার অবর্ত্তমানে তোমার নীলার জন্য আমি উন্মুক্ত রাখিতে আদেশ করিয়া যাইব। তাহাকে এখানে আনয়ন করিও—সে ইচ্ছা করে, মার কাছে এ বাটীতে থাকিতে পারে—"

সুরনাথের কথায় বাধা দিয়া এই সময় চিকণ কি বলায়, সুরনাথ উত্তর করিল, "উত্তম—এখানে সে না থাকিতে চায়,

প্রত্যহ তুমি তাহাকে পাঠাইয়া দিও। তাহার প্রতিভা আছে, সে আমার সমস্ত সমাপ্ত ও অসমাপ্ত চিত্রাবলী সমনোযোগে আলোচনা করিলে, তাহার শক্তি বিকশিত হইবে, আমি বিশ্বাস করি। তবে স্ত্রীলোকের তুলিকায় তুমি অবশ্য একটা অসাধারণ কাণ্ড কল্পনা করিও না। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আর আমার ইচ্ছার যাহা বিরোধী, অধ্যবসায়ের আনুকূল্যে একটা সে রকম মাঝারী চলন-সই হাত তৈয়ার হইলেও হইতে পারিবে।—আরও এক কথা চিকণলাল! তাহার উচ্চে স্ত্রীলোকের আরোহণ অনুচিত—যশের মুকুটভারে পুরুষেরই অবনতি ঘটে—স্ত্রীলোকের মস্তকে সে মুকুটের প্রভাব কত ক্ষতিকর হইবার সম্ভাবনা, তাহা ভাবিয়া দেখিও। সে শিখিতে চায় শিখুক, কারণ, তাহার "মদন-ভস্ম" তাহার প্রতি ভগবানের আশীর্ব্বাদকণিকার পরিচয় প্রদান করে।—চল, আমরা ভিতরে যাই।"

অনুরোধ রক্ষা করা সুরনাথের স্বাভাবিক। সুরনাথের নিকট চিকণের অনুরোধ ব্যর্থ হইল না। আলোকোৎফুল্ল চিত্রালয়ে প্রবেশ করিয়া সুরনাথ সহাস্যে চিকণকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নীলার কথা পূরণ-চাঁদকে বলিয়াছ?"

"না।"

"কেন বল নাই? এমন অসাধারণ কুমারীকে নায়িকা করিয়া পূরণ একটি উপাদেয় ও অভিনব গীতি-কবিতা রচনা করিতে পারিত, এবং তাহার উপহারে জগৎকে আর একবার ধন্য করিত।"

"অথবা তাহার কবিতার ভাগ্য সে আমার কুমারীকেই প্রদান করিত"—

"তোমার কথার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।"

"পূরণের কবিতার ভাগ্য—জন্মের পর দুই চারি মাস তাহাদিগের আদর অভ্যর্থনা, পরে অগ্নিতে বর্জ্জন!—নীলাকে দেখিলে কবি তাহার কবিতা মূর্ত্তিমতী ভাবিয়া তাহার কবিতার ঐ সাধারণ ভাগ্যে নীলাকে অভিষিক্তা করিত!"

"অথচ তুমি পূরণকে ভালবাস?"

"নিশ্চয়।—তাহাকে কে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে? তাহাকে না ভালবাসিলে কত অবলা অগ্নিপরীক্ষায় বাঁচিয়া যাইত।"

সুরনাথ বলিল,—"সমস্ত সংগ্রামের মত 'ভালবাসা'র সংগ্রামেও এক পক্ষ বাঁচে—এক পক্ষ মরে। ভালবাসার যে দিক্ নিষ্প্রাণ, সেই দিকের রক্ষা।"

চি। "পূরণ চতুর কবি—একটি রুগ্ন প্রাণ লইয়া তাহার ব্যবসা। সে প্রাণটি সহজে বাহির করিয়া সে তাহাকে শ্রান্ত করিতে চাহে না। সে বিলক্ষণ জানে—সহস্র সাবিত্রী একত্রিতা হইয়া আরাধনা করিলেও, তাহার প্রাণান্তে তাহার মত সত্যবানের জন্য কালের করুণা হইবে না; সুতরাং তাহার সে রুগ্নপ্রাণটুকুও সে ফেরত পাইবে না।"

সু। "তুমি আমার 'সাবিত্রী সত্যবানে'র চিত্র দেখ নাই?"

'সাবিত্রী সত্যবান্' সুরনাথের শেষ রচনা। এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ চাক্ষুষ করে নাই। সুরনাথ স্বয়ং বর্ত্তিকালোক লইয়া চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া চিকণকে তাহা দেখাইল।

চিত্রখানি সুরনাথের দৈবীশক্তিরই সমুপযুক্ত—সুন্দর ও সচেতন। একত্রীভূত প্রেম, করুণা ও তেজের সুকোমল আধার! মহীয়সী পতিব্রতা গত-প্রাণ পতির মস্তক অঙ্কে লইয়া, আপনার পুণ্যহোমাগ্নির বক্ষঃস্থি[illegible] মধ্যে অবস্থিতা; দেবাসুর

কাহার সাধ্য, সে উত্তাপ-সান্নিধ্যে অগ্রসর হয়! দূরে দান অসহায় মহাকাল শোচনীয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দণ্ডায়মান! মহান্ দৃশ্য—দৃষ্টিপাতমাত্র শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত করে।

চিত্র দেখিয়া মূর্থ রিপুকর্ম্মী উন্মত্তের ন্যায় চিকণের হস্তদ্বয় ধরিয়া বলিল—"তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও।" আরও কি বলিবার চেষ্টা করিল—বলিয়া উঠিতে পারিল না; পাগল কদাকার কুঞ্জের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, এবং তাহার কণ্ঠস্বর জড়তাবদ্ধ হইল।

সুরনাথ বলিল,—"সত্যবান্ চলিয়া যাইতে পারে, যমের মূর্ত্তি কতকটা বিভীষিকাময়ী হইয়াছে বলিলে আপত্তি করিব না—কিন্তু সাবিত্রীর মুখ, আমি সাদা কথায় বলিতেছি, —কিছুই হয় নাই।

"সুন্দর' ও তো এ কালের প্রাণহীন সৌন্দর্য্য। প্রণয়ের যে শক্তি মৃতসঞ্জীবনী—যে শক্তির প্রতাপে অন্য কেহ নয়, স্বয়ং যম বিজিত—ও মুখে সে শক্তিগত সৌন্দর্য্য কই? দয়াময়ী কল্পনাদেবী সকল সময় তাঁহার এ হীন সাধককে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার সহস্র মিনতি সত্ত্বেও দেবীকে আমার প্রতি সদয়া করিতে পারি নাই।—আমার মনের মত সাবিত্রী আমি তাঁহার নিকট হইতে আহরণ করিতে পারিলাম না।"

"কল্পনা-দেবতাকে তুমি এবার আর বিরক্ত করিও না। সাবিত্রী-মুখের জীবন্ত-ছবি আমি তোমাকে দেখাইব—তুমি তাহাকে চিত্রে প্রতিফলিত করিও।"

"এ কালে তেমন কোথায় পাইবে?"

"আমার নীলার মুখে তুমি তোমার সাবিত্রীর মুখের 'আদর্শ' প্রাপ্ত হইবে।" সুরনাথ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া উত্তর করিল—"অন্য কেহ বলিলে [illegible] হাসিয়া উঠিতাম। কিন্তু তোমার প্রাণ আছে—চক্ষু আছে—চিকণলাল; আমি তোমার কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া আজ রাত্রিতে আগ্রায় যাওয়া স্থগিত করিলাম। এক দিন বিলম্বে আমার কিছু আসিবে যাইবে না। তোমার নীলার সহিত সাক্ষাতের পর, আমি দিল্লী পরিত্যাগ করিব। তবে সে প্রকৃতই আকারে সাবিত্রী হইলে, সাবিত্রীর ভাগ্য তাহাকে না স্পর্শ করে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিও।"

"যদি সাবিত্রীর সামর্থ্য তাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি কি?"

"এ কালের দেবতারা মানবী শক্তিতে আকৃষ্ট হন না। এ কালের সামর্থ্য কল্যাণ-কর না হইয়া অকল্যাণের অবতারণা করে।"

হায় চিকণ! কেন তোমার কথায় সুরনাথ নীলার সাক্ষাৎ অপেক্ষা করিয়া আগ্রা যাত্রা আজ স্থগিত করিল—কেন তুমি তাহাকে নীলার মুখের আদর্শে সাবিত্রী চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রলুব্ধ করিলে?

১১

পরদিন প্রত্যূষে সুরনাথ চিকণের গৃহে আসিয়া কিশোরী চিত্রকরীকে সন্দর্শন করিল।

নীলা চিকণের সঙ্গে কখন্ তাহার গৃহে আসিবে, সুরনাথের তাহার অপেক্ষা সহে নাই। নীলাকে দেখিয়া সুরনাথ ভাবিল—"আ মরি! এই নশ্বর ননীর পুত্তলীটি তো বিশ্বচিত্রকরের মাধুরীময়ী মোহিনী কল্পনা, এই ছবিই আবার ছবি আঁকে! এ বড় কাব্যের কথা!"

সুরনাথ নীলাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

"তোমাতে ঐশী শক্তি নিহিত, তুমি প্রতিভা-সম্পন্না, সামান্য শ্রমেই তুমি তোমার কার্য্যে পারদর্শিনী হইবে, চিন্তা করিও না।" এই বলিয়া সুরনাথ সরলভাবে সোজা কথায়

নীলাকে মোটামুটী কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিল। বালিকার রূপে আকর্ষণের বীজ বর্ত্তমান থাকিলেও, সুরনাথ সেই কোমলতার অবতার জ্যোতির্ম্ময়ীকে আপনার সমব্যবসায়িনী ভাবিয়া তাহাতে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল।

সুরনাথ নীলাকে বলিল "প্রতিভার অঙ্কুর প্রথমে ঈশ্বর স্বয়ং মানব-হৃদয়ে রোপণ করেন। পরে রোপিত অঙ্কুর ক্ষেত্রের জলবায়ুর অনুসারে বৃদ্ধি বা লয় প্রাপ্ত হয়। তোমার প্রতিভা লয়ের পথে না গিয়া বৃদ্ধির পথেই এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কৃতজ্ঞ হইয়া ঈশ্বরের দান পবিত্রতার মন্দির-বেষ্টনে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অতি সামান্য তাচ্ছীল্য-কলুষে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা—এই ভাবিয়া তোমাকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। কি বল,—না?"

নীলা নির্ভয়ে সুরনাথের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—"হুঁ।" সুরনাথ তাহার সরল দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিল, বালিকা তাহার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

কিয়ৎ বিলম্বে নীলা বলিল—"আমার শিক্ষা নাই, শিক্ষা করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা। আমি আমার মনের ভিতর কত চমৎকার চমৎকার দৃশ্যের অভিনয় দেখিতে পাই—কিন্তু তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারি না; তাহাদিগকে ধরিতে গেলে, তাহারা স্বপ্নের মত ভাসিয়া দূরে মিলাইয়া যায়।"

"ওই ত আমাদের বিপদ!" সুরনাথ নীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আমরা স্বপ্নরাজ্যে সদা সর্ব্বদাই ভ্রমণ করি, কিন্তু আমাদের এ মাটীর রাজ্যে সে স্বপ্নশিশুদিগকে নামাইয়া আনিতে গেলে পথিমধ্যেই তাহারা ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া যায়। তবে সাধনায় বিপদ্—সম্পূর্ণ না হউক,—অনেকপরিমাণে, অতিক্রান্ত হইতে পারে। আমার শিক্ষকতায় তুমি সে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিবে, আমি এমন আশা করি। তোমার প্রকৃত প্রতিভা আছে,—বয়স তোমার স্বপক্ষ, সুতরাং শ্রমে তোমার শ্রান্তি হইবে না—অতএব তুমি নিরাশ হইও না।"

সুরনাথ চিকণকে লইয়া বাহিরে তাহার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল।—চিকণ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বুঝিলে?" "সুন্দর শিশু! আহা! উহার ঐ কোমল তুষার শুভ্র ললাটের অভ্যন্তরে কি বিধাতার কঠোর অন্ধকারময়ী লিপি! শোন চিকণ! এক কড়ারে আমি নীলার যথাসাধ্য শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে পারি।"

"কি কড়ার, বল।"

"যে মধুর প্রবঞ্চনায় ও দুঃখের বালিকাকে তুমি আত্মবিস্মৃতা করিয়া রাখিয়াছ, আমাকে তাহার অংশ দিতে হইবে। নীলাকে তুমি বুঝাইবে, আমার শ্রম-লাঘবের কারণ আমি এক জন সহকারী অন্বেষণ করিতেছিলাম, তুমি তাহা জানিয়া উহাকে সেই পদে অভিষিক্ত করিতে আমাকে অনুরোধ কর, এবং আমি তোমার সে অনুরোধ (কেবল উহার পারকতা বিবেচনায়) রক্ষা করিয়াছি। ভাবিয়া দেখ, চিকণলাল! পুরুষ হইলে কথা অন্যরূপ হইত,—কিন্তু নারী—বালিকা—কোমলতাময়ী—তাহার কেহ নাই। বিপুল সংসারে সে একাকিনী! আহা! কত যত্নের, কত আদর সোহাগের নিধি সে!"

"আমি যাহা বলিলাম, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে—আমি স্বয়ং তাহা পারিব না, কারণ দারিদ্র্যে বালিকা মহিমাময়ী—আমার ন্যায় অপরিচিতের সামান্য কথাতেও তাহার সে মহিমায় আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা; [redacted]

চিকণ উত্তর করিল,—"আশীর্ব্বাদ কর, জীবনে তাহার মহিমাই যেন অক্ষুন্ন থাকে। তবে বস্তুতঃ তাহার অভাবের সংখ্যাও বড় অল্প। চিরদিনেই তাহার বর্দ্ধন—এক তাহার আপনার মানস-সম্পদ্ ব্যতীত অন্য কোনও সম্পদের সহিত বালিকার কখনও পরিচয় হয় নাই। বোধ হয় আজন্ম তাহার অভাব দূরীকরণের অপারকতার কারণ অভাব তাহাকে স্পর্শ করিতেই সমর্থ হয় নাই—এই অবস্থাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

সু। "বলিলাম ত, বালিকা না হইয়া বালক হইলে, তাহার কথা স্বতন্ত্র হইত। কিন্তু ঐ অল্পশক্তি কোমল শরীর—স্নেহ, যত্ন ও সর্ব্ববিধ সাচ্ছল্যে তাহার পুষ্টি চাই —অবশ্য তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাও অগ্রাহ্য করিবার নয়।"

"বালিকার এক কথায় চিত্র-শিল্পীর প্রধান লক্ষণ তাহাতে পরিস্ফুট বুঝিলাম—কল্পনার স্বপ্নধারণে অক্ষমতায় তাহার আন্তরিক যাতনার কথা! প্রতিভার তাড়নায় ঐ যাতনার জন্ম—ও লক্ষণ সাধারণ শিল্পীতে বিরল! যাহা হউক, কাল হইতে তুমি নীলাকে আমার ওখানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবে—সেখানে উহার স্বতন্ত্র চিত্রাগার করিয়া দিব।—আমার মাতৃদেবী আছেন—তাঁহার পরিচারিকারা আছে—আমার বিশ্বাস, আমার গৃহে তোমার নীলার কোনরূপ কষ্ট হইবে, এমন তুমি আশঙ্কা করিবে না।" এই বলিয়া সুরনাথ প্রস্থান করিল।

সুরনাথের কথায় বা কার্য্যে কাহারও কখনও অবিশ্বাস হয় নাই—চিকণের কথা ছাড়িয়াই দাও—কিন্তু তথাপি সুরনাথ চলিয়া যাইবার পর বৃদ্ধের মনটা মধ্যে মধ্যে কেমন ছাঁত ছাঁত করিতে লাগিল। অসুস্থান্তঃকরণে বৃদ্ধ সূচীকার্য্যে রত [redacted] কোথাকার কে—কোন ঘূর্ণি বাতাসের জোরে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছিল—আবার অবস্থা-তরঙ্গে ভাসিয়া চলিল—কে জানে এবার কোথায় উপনীত হইবে। অবোধ সরল-দৃষ্টি বন্য হরিণ-শাবক,—ধরা পড়িয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে অবরোধ-শাসনে আবদ্ধ ছিল—ভালই ছিল—বিভীষিকাময় সংসার-অরণ্যে চিকণ তাহার প্রবেশের কারণ হইতে যাইল কেন? সেথায় যে দাবাগ্নি ও শিকারীর শরের আশঙ্কা নিত্য নৈমিত্তিক।

হায় বৃদ্ধ! তুমি নিজে কতটুকু, তোমার সামথ্য কতটুকু যে, পৃথিবীর কার্য্য কারণের মধ্যে তুমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্পর্দ্ধা কর! তুমি ভাগ্যের ক্রীড়ণকমাত্র!

যেমন কৌশলাভাবে চৌর্য্যে অশক্তি প্রযুক্ত অনেকে সাধু বলিয়া থাকে, তেমনি স্বার্থের অভাবে অনেকে পরার্থপর সাজে। স্বার্থাভাবে পূর্ব্বের পরার্থপর সদানন্দ চিকণ, আজ স্বার্থ সমন্বয়ে স্বার্থপরতার উৎপীড়নে চিন্তাকুল, বিমর্ষ! অনন্ত স্বর্ণ তাহার,—মাঝখান হইতে, কেবল ঘসা মাজার কারণ স্বর্ণকারের তাহাতে একটু দাবীর ছায়া পড়িবে, মূলে এই মর্ম্মদাহই চিকণের উপস্থিত মনস্তাপের কারণ!

১২

ঘটনার এবংবিধ গতিতে চিকণের একটা প্রকৃত আতঙ্কেরও কারণ ছিল। সুরনাথের মুক্তহস্ততায় দরিদ্রা নীলার প্রকৃতিতে পাছে ব্যয়-বিলাসে অনুরাগ জন্মায়। সুরনাথ স্বয়ং ব্যয়-বিলাসী নহে, তাহা চিকণ বিলক্ষণ জানিত; শ্রম ও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে সে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই, এবং চিকণের দৃঢ় বিশ্বাস, এখনও আবশ্যক হইলে সে কখন তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবে না—কিন্তু তাই বলিয়া সৃষ্টির শোভা কোমল রমণী জাতির তৎকর্ত্তৃক নির্য্যাতন,—সুরনাথের, এবং

সুরনাথের ন্যায় প্রত্যেক পুরুষোচিত প্রকৃতি পুরুষের প্রাণে অসহ্য।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে নীলাকে সঙ্গে করিয়া চিকণ সুরনাথের গৃহে উপস্থিত হইল। সুরনাথ সাদরে নীলাকে সম্ভাষণ করিয়া তিন জনে একত্র কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিল।

কার্য্যালয় তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এক প্রকোষ্ঠে কেবল হিন্দু পৌরাণিক চিত্রাবলী—অন্যটিতে মহম্মদীয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিবিধ চিত্র,—এ প্রকোষ্ঠ আপাততঃ সুরনাথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তৃতীয় প্রকোষ্ঠ নীলার কার্য্যালয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

তিন জনে প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ উন্মুক্ত অসম্ভব অননুমেয় চিত্রৈশ্বর্য্যের মধ্যস্থ হইয়া কল্পনানুগৃহীতা গ্রাম্য শিশু শঙ্কা-বিহ্বল হইয়া পড়িল। যে স্বপ্নরাজ্যের বসন্ত সমীরণ-শ্বাস মধ্যে মধ্যে তাহার মন স্পর্শ করিয়া তাহাকে উৎফুল্ল এবং বিচলিত করিয়া তুলিত, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নগ্ন-সৌন্দর্য্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যেন সযত্নে তাহাকে আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত সরল হরিণী-নেত্রে, নীলা তাঁহার অঙ্গশোভা নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে স্তম্ভিতা, এবং পরক্ষণে অপহৃত-চেতনা অনুমান করিল।

সুরনাথ হাসিয়া চিকণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এ সজীব অলোক-সুন্দর চিত্রখানি এ পর্য্যন্ত প্রকৃতই ভাবুক পুরণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই ?"

চিকণ বলিল—"না।"

"এ চিত্র দেখিলে কবি এখন প্রবাসী হইত না।"

সুরনাথের কথায়, যেন কোনও ভাবী অমঙ্গলের আভাসে চিকণের মন উৎপীড়িত হইল। সাহসে ভর করিয়া চিকণ বলিল—

"অন্ততঃ এখন হইতে বৎসরেক কাল তো দিল্লী পুরণের বিরহ-সাগরে ভাসমানা থাকিবে।"

"তাহার নিশ্চয়তা কি ? পুরণ দশ বৎসর কাল প্রবাসে যাপন করিতে পারে—আবার কালও দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে পারে।"

সে প্রকোষ্ঠে যে অন্য কেহ আছে, নীলার তদ্বিষয়ে সংজ্ঞা ছিল না। সুরনাথের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখিতেছ ?"

নীলা অবিলম্বে সুরনাথের কথায় জবাব দিয়া বলিল—"আপনার সহিত কথা কহিতে আমার ভয় হইতেছে।"

স্থানান্তরে বলিয়াছি, বালিকার সাংসারিক অভিজ্ঞতা আদৌ ছিল না। তাহার চক্ষে যাহা যেমন পড়িত, সে তাহাকে তেমনি ধরিয়া লইত। সাংসারিকের মনশ্চক্ষু-বিশ্লেষণে তাহা হইতে কূট বাহির করিবার ক্ষমতা সে ধারণ করিত না। তাহার মানস-দর্পণে স্বতঃ যখন যে ভাব প্রতিফলিত হইত, তৎক্ষণাৎ তাহা সে কথায় মুখে প্রকাশ করিত—সাংসারিকের তুষ্টি-অতুষ্টির বাট্-খারায় পাষাণ-ভাঙ্গা ভাব প্রকাশ করিবার অভ্যাসে সে একেবারে বঞ্চিতা ছিল। আমার তৃষ্ণাবশতঃ জলপানের ইচ্ছা হইয়াছে—সংসার ইঙ্গিত করিয়া বলিল—'এ সময় জলপান করিও না—করিলে ভদ্রতাহানি হইবে'—সংসারের সেরূপ নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া জলপানরূপ-মহাপাতকে লিপ্ত হইতে নীলা কিছুমাত্র বিব্রতা হইত না।—তাই সুরনাথ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, সে উত্তর করিল,

"আপনার সহিত কথা কহিতে আমার ভয় হইতেছে। আপনি মহাপুরুষ !"

অতঃপর [redacted]নীর কিরণ প্রতিফলিত

হইয়া সমস্ত প্রতীচ্য আকাশে যেমন মধ্যে মধ্যে স্বর্গীয় সিন্দূরের লালী মাড়িয়া দেয়, নীলার অজ্ঞান-কৃত স্তুতিবাদে সুরনাথের আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ তেমনি লাল হইয়া উঠিল—শত শত বাদশাজাদার স্তুতি নিন্দায় সুরনাথ কখনও কর্ণপাতও করে নাই! সুরনাথ বলিল—"অমন কথা বলিও না। প্রকৃত মহাপুরুষগণ স্বর্গে—হালের আমরা তাঁহাদিগের পদাঙ্কমাত্র অনুসরণ করি। তাঁহাদিগের কার্য্যের তুলনায়, আমাদিগের কার্য্য নগণ্য। কুরুপাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রের পর জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের পাণিপথ সামান্য ব্যাপার!"

"যাক্, কথায় সময় নষ্ট না করিয়া, চল, তোমাকে তোমার কর্ত্তব্যের প্রথম আভাস প্রদান করিব।"

যে কক্ষ নীলার কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সুরনাথের সহিত নীলা ও চিকণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তথায় চিত্রণ কর্ম্মোপযোগী জিনিসপত্র সমস্তই স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া সুরনাথ, নীলাকে কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিল—অবশেষে বলিল, "হালে ন্যূনকল্পে মাসাধিককাল তোমার কার্য্য থাকিল, আমার পূর্ব্বের সহজ সহজ চিত্র বাছিয়া কেবল তাহার অনুকরণ। আমাকে দিল্লী হইতে প্রায় বাহিরে যাইতে হয়—বাহিরে যাইবার সময় তোমাকে অনুকরণীয় চিত্রের তালিকা করিয়া দিয়া যাইব। স্থিরচিত্তে তোমার সমস্তটা মন কার্য্যে নিবিষ্ট করিলে, সফলতা অদূর-লভ্য হইবে। এইবার চল, আমার বৃদ্ধা জননীর নিকট গিয়া তোমাকে তাঁহার পরিচিত করিয়া দিই। চিকণের সহিত তাঁহার অনেক দিনের পরিচয়।"

সে কক্ষ পরিত্যাগ করিবার সময় প্রাচীর-বিলম্বিত একখানি বৃহৎ চিত্রকে উদ্দেশ করিয়া নীলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তি কাহার? কোনও দেবমূর্ত্তি নিশ্চয়?"

সুরনাথ নীলার পানে কটাক্ষ করিয়া বলিল, "ওখানি পূরণচাঁদের প্রতিকৃতি—ও আমার অনেক দিনের—"

নীলা যেন সুরনাথের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "মূর্ত্তি বড় সুন্দর! পূর্ণচন্দ্রের আকার কল্পনা করিয়া বুঝি আপনি ও চিত্রখানি আঁকিয়াছিলেন? আপনার কল্পনার শক্তি ও আপনার তুলিকার নৈপুণ্য অনির্ব্বচনীয়! বাবার নিকট গল্প শুনিয়া ছিলাম, আমাদের গ্রামে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে একজন যাদুকর ছিলেন, তাঁহার নামও পূরণচাঁদ। তিনি নাকি ইচ্ছানুসারে নানারূপী হইতে পারিতেন।"

সুরনাথ হাসিয়া বলিল—"এ পূরণচাঁদও এক প্রকার সেই যাদুকরের মত—হয় ত বা তাহারই অবতার।—পূরণচাঁদ আমার ও চিকণের বন্ধু—দিল্লীর বড় আদরের কোকিল-কণ্ঠ কবি!—"

"তিনি প্রকৃতই আপনার ঐ চিত্রের মত সুন্দর—অত সুন্দর—মানুষ কি ঠিক্ অমন সুন্দর হইতে পারে?"

সুরনাথ চিত্র বস্ত্রাবৃত করিয়া, নীলাকে এবং অন্যমনস্ক চিকণকে সঙ্গে লইয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হস্তামলকের আত্ম-পরিচয়।*

প্রশ্ন।

(১)

কে তুমি হে চারুশিশু! কাহার সন্তান?
করিছ গমন কোথা? কি তোমার নাম?
এসেছ বা কোথা হ'তে? দিয়ে পরিচয়
তোষ মোরে, দেখি' তোরে প্রীত অতিশয়
।

(২)

মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী নির্জ্জিত-ইন্দ্রিয়,
গৃহী বা সন্ন্যাসী মধ্যে কেহ আমি নহি;
নিজ-বোধ স্বরূপে হে সদা আমি রহি।

(৩)

যেমন আলোকময় সূর্য্যের কিরণ
গমনা-গমন-আদি চেষ্টার কারণ
সমস্ত লোকের; সেইরূপ হন্ যিনি
মন-আদি ইন্দ্রিয়ের চালক ও স্বামী,
আকাশ-সদৃশ, সদা উপাধি-রহিত,
নিষ্কম্প-পদার্থ সেই হৃদি-গুহাস্থিত
আত্মা আমি হই, জেন, নিত্য-জ্ঞ নময়;
তব প্রশ্নে এই মম উত্তর নিশ্চয়।

(৪)

অগ্নির স্বরূপ তার উষ্ণতা যেমন,
নিত্য-জ্ঞান হয় যার স্বরূপ তেমন,
স্বয়ম্ নিষ্কম্প আর থাকি অদ্বিতীয়,
যাহার আশ্রয়ে জড় সকল ইন্দ্রিয়
নিজ নিজ কর্ম্ম করে অথচ নিয়ত,
নিত্য-উপলব্ধি আত্মা আমি সে, সুব্রত!

(৫)

দর্পণের অভ্যন্তরে মুখ প্রতিবিম্ব যে রে
পড়িতে সতত দেখা যায়,
যথার্থ ঐ মুখ হ'তে অন্য মুখ নাহি তা'তে,
সকলে প্রত্যক্ষ করি তায়;
বুদ্ধিবৃত্তি-দরপণে যার বিম্বাভাস সনে
জীবনাম অভিহিত হয়,
সেই আত্মা হই আমি, সংশয় না কর তুমি,
অবিকৃত নিত্য জ্ঞানময়।

(৬)

দর্পণের নাশে যথা লুপ্ত প্রতিবিম্ব-সত্তা,
অবশেষ সত্য মুখ রহে;
সেইরূপ বুদ্ধি-নাশে আভাস-রহিত শেষে
রহে যাহা সৎবস্তু কহে;
সেই অদ্বিতীয় আমি, আত্মা বলি জেন তুমি,
উপলব্ধি-স্বরূপ কেবল;
জীব—প্রতিবিম্ব মত, আমি রে পরমার্থতঃ
সৎবস্তু—মুখ অবিকল।

(৭)

মনাদি অন্তরিন্দ্রিয় চক্ষু-আদি বাহ্যেন্দ্রিয়
হইতে বিমুক্ত যেই হয়;
থাকিয়া তাদের আর প্রকাশক অনিবার,
স্বয়ং অগম্য হ'য়ে রয়;
পৃথগবস্থিত ওই, প্রকাশক আর যেই
ইন্দ্রিয়-অতীত চিরন্তন;
সেই আত্মা হই আমি, তাইতে রে অন্তর্যামী
জ্ঞানময় নিত্য নিরঞ্জন।

(৮)

এক ভানু যথা শরাবাদি-জলে
বিভাসিত হ'য়ে নানারূপে খেলে;
তেমতি যে এক সুনির্ম্মল-চিত
বিবিধ বুদ্ধিতে স্বতঃপ্রকাশিত,

* হস্তামলক একখানি অতি প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে ১৪টি মাত্র মূল সংস্কৃত শ্লোক আছে। রচয়িতার নাম হস্তামলক বলিয়া তাঁহার নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। ইনি আচার্য্য হস্তামলক নামে খ্যাত, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হস্তামলক নহেন। শঙ্কর ইঁহারই শ্লোক কয়টীর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং ইঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থে শঙ্কর-শিষ্য হস্তামলকের আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে শ্লোক কয়টী ইহা হইতে বিভিন্ন

একই হইয়া বিবিধ দেখায়,
আত্মা আমি সেই নিত্য-জ্ঞানময়।

(৯)

এককালে রবি প্রকাশে যেমন—
নহে ক্রমে ক্রমে—অনেক লোচন;
এককালে তথা যে মহাচেতন
সমস্ত বুদ্ধির করে হে স্ফুরণ;
সেই আত্মা আমি নহি কিছু আর,
নিত্য-উপলব্ধি স্বরূপ আমার।

(১০)

সূর্য্যালোকে যথা চক্ষুর প্রকাশ,
দ্রব্য-রূপ হয় চক্ষুতে বিকাশ;
সেইরূপ সূর্য্য যাঁহার আলোকে
হ'য়ে প্রকাশিত প্রকাশে চক্ষুকে;
একমাত্র সেই আত্মা হই আমি,
নিত্য জ্ঞানময় জেন মোরে তুমি।

(১১)

একসূর্য্য হইলেও যেমন চঞ্চল-
স্থিরজলে প্রতিবিম্ব হেরিয়া সকল
অনেক বলিয়া তারে অনুভূত হয়,
বাস্তবিক থাকে না যে মিলিত তথায়;
সেইরূপ যেবা এক হইয়া বিকল
ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিতে রে দেখায় চঞ্চল;
নানাভাব ধরি তথা থাকে অনম্বক্; *
সেই আত্মা হই আমি সম্পূর্ণ পৃথক্।

(১২)

দিবসে আকাশে মেঘে দৃষ্টি-রোধ হয়,
আবৃত হয়না সূর্য্য মেঘ আবরণে;
নিতান্ত যে মূঢ় লোক মতি-ভ্রংশ হয়,
মেঘাচ্ছন্ন প্রভাশূন্য ভাবে রে তপনে;
নিজ-বুদ্ধি-বন্ধ-বশে মোহাচ্ছন্ন লোকে
বদ্ধ বলি মনে করে যাঁহাকে তেমন,
নিত্য-জ্ঞানময় সেই আত্মা হে আমাকে
জানিবে নিশ্চয় তুমিও হে মহাত্মন্!

(১৩)

সকল বস্তুতে যিনি অনুবিদ্ধ হন্,
পারে না যাঁহারে কিন্তু সবে পরশিতে;
আকাশের মত যিনি শুদ্ধ স্বচ্ছ রন্;
জানিবে অভেদ তথা তাঁহাতে আমাতে।

(১৪)

স্বভাব-নির্ম্মল স্ফটিকাদি মণি,
রক্ত-জবা কিম্বা নীলকান্ত-মণি-
সন্নিধানে যথা রঞ্জিত তখনি
লোহিত-কৃষ্ণাদি নানারূপ ধরে;
অথবা যেমন জলের তরঙ্গে
দেখায় চন্দ্রমা কাঁপিতে স্বরঙ্গে;
থাকিয়া তেমতি বুদ্ধির সঙ্গে
ভেদ-কল্পনা করিছ তোমারে।
জগদ্ব্যাপী বিষ্ণু! তব বুদ্ধি-বশে
ঔপাধিক * মাত্র জানিবে বিশেষ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

* যাহা কাহারও পশ্চাৎ গমন করে অর্থাৎ কাহারও সহিত মিলিত হয়, তাহা অম্বক্; যাহা তাদৃশ নহে তাহা অনম্বক্ অর্থাৎ পৃথক; যাহার স্বরূপের বিষয় চিন্তা করিলে তাহাকে পৃথক বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অনম্বক্।

* উপাধি অর্থাৎ উপাধি-ভেদ-সম্বন্ধ, তদ্বিশিষ্ট যাহা তাহাই ঔপাধিক; বুদ্ধিরূপ উপাধির সম্বন্ধ বশতঃ নানাত্ব বিস্তৃতরূপেই প্রতীত হয়। নানাত্ব পরমার্থতঃ বিদ্যমান নহে। অপিচ তোমার চাঞ্চল্য পারমার্থিক নহে, তাহা ঔপাধিক মাত্র। এখানে প্রশ্নকর্ত্তাকে বিষ্ণু অর্থাৎ জগদ্ব্যাপী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

ফিরে সুখ পাই।

তৃপ্ত, দীপ্ত, সনাতন হৃদয়ের মাঝে—
জীবজন্তু নিশিদিন রহি ভরপুর;—
কি আনন্দে, কি মাধুর্য্যে, কিবা অভিনব
সুধা সম তুলিতেছে প্রীতি মাখা সুর।
দেবতার সৃষ্ট আমি কত অধঃস্তরে;
সেথাও অশান্তি তবু ঘিরিছে আমারে!
যদি কভু কোন দিন মুহূর্ত্তের তরে—
মনে মনে আপনারে সুখী মনে পড়ে;—
সুপ্ত, লুপ্ত,-গুপ্ত-তার জ্বালা নিদারুণ
বক্ষে উঠি যেন সব ভেঙ্গে দেয় ঝড়ে।
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে পূর্ণ বারি বনরাজি;
পূর্ণতায় পরিপূর্ণ এভরা ভাদর।
আমিই বিশুষ্ক যেন, পাংশুল পঞ্জর;—
জাগে বুকে অবিশ্বাস, শত অনাদর।
পাষাণও গলিয়া ঘামে, সুতীক্ষ্ণ কিরণে;
আমি কিন্তু দেখি নাই কভু তিলবিন্দু—
ঘামিতে, গালিতে তার, কঠোর সাধনে
অন্তস্তরি ক্ষুদ্রতম প্রেম বক্ত-সিন্ধু।
সেকি উপদংশ বিষ চিকিৎসার বার
সপ্তবংশে সংক্রামিবে আপন ইচ্ছায়!
অথবা সে রাজযক্ষ্মা, রক্ত ক্ষয়কাশ
তিলে তিলে দেহ মোর করে দিবে ক্ষয়।
মনে পড়ে কত কথা নিশি শেষে শুয়ে—
আপনার ছিল যারা সবে গেছে ধুয়ে।
মাঝিরা লাগায়ে ডিঙ্গী ইচ্ছামতী-তীরে—
সোয়ারি আনিতে আজো যায় চন্দনপুরে;
গেছে ভদ্র, কিম্বা ক্ষুদ্র, যত ছিল লোক;
আছে সর্প, শেয়াকুল, বনভরা জোঁক।—
আর আছে কাদপুর শ্মশানের ঘাটে—
ধৌত চিতা, সকলের পাটে-পাটে-পাটে।
সকলি মরিয়া গেল, সেত মরে নাই;
সে বুঝি মরিয়া গেলে, ফিরে সুখ পাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ভারতী মঙ্গল-কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রিপদী।

বেলা যায় যায় হৈল, জয়দ্রথ না মরিল,
ধনঞ্জয় কষ্ট ভাবে মনে।
ইহা জানি মায়া করি, কৈলা বিভাবরী হরি,
জয়দ্রথ আইল বিদ্যমানে॥
হেনকালে মায়ানাশ, দিনমণি পরকাশ,
দেখি পার্থ চাপে ইষু যুড়ে।
আকর্ণ পূরিয়া কোপি, ক্ষেপে ব্রহ্মমন্ত্র জপি,
অলক্ষিতে মুণ্ড কাটি পাড়ে॥
নাশি জয়দ্রথ বীর, ধনঞ্জয় হৈল স্থির,
দেখি দ্রোণ কোপে অতিশয়।
শর্ব্বরীতে হৈল রণ, মৈল বহু সেনাগণ,
উভয়ত ঘটিল সংশয়॥
কোপি দ্রোণ বীরবর, ক্ষেপি বহু ব্রহ্মশর,
পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা মারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্যগণে, দেখি হেন বিদ্যমানে,
ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিল গোচরে॥
দেখি অরি রণস্থলে, শক্তি ভিন্দিপাল ফেলে,
বহুরণ করিল ব্রাহ্মণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন তূর্ণ চলে, অতিকোপে রথে মিলে,
দ্বিজ মুণ্ড কাটিল কৃপাণে॥
পঞ্চদিন যুদ্ধ করি, মৈল বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী,
[illegible] দিল রাজা দুর্যোধন।

লৈয়া বড় কুতুহলী, ধনুর্ব্বাণ ঊর্দ্ধে তুলি,
নৃত্য করে পাণ্ডবের গণ॥
কর্ণে করি সেনাপতি, দুর্য্যোধন তূর্ণ অতি,
আসি পুন প্রবেশে সমরে।
দেখিয়া পাণ্ডবগণে, আসি উত্তরিল রণে,
মহা কোপে সিংহনাদ করে॥
কোপে কর্ণ সেনাপতি, সংহারে বিস্তর রথী,
রুধিরে সরিৎ বৈয়া চলে।
দেখি কোপে বৃকোদরে, মহাগদা লৈয়া করে,
কুরুদল নাশে কুতুহলে॥
হেন দেখি দুঃশাসনে, অত্যন্ত কোপিয়া মনে,
ভীমকে হানিল কোপ মনে।
চাপ কাটি চারিবাণে, দিব্যশরে পুনি হানে,
ধ্বজ রথ তুরঙ্গ সংহারে॥
অতি কোপে গদা হানে, দৃঢ়াঘাতে দুঃশাসনে,
ভূমে পড়ি ত্যজিল জীবন।
দ্রৌপদীর দুঃখ স্মরি, দুই হাতে বক্ষঃচিরি,
রক্ত লৈয়া করিল অশন॥
দেখি হেন কর্ণবীরে, অতি কোপে রণ করে
ইহা দেখি আইল ধনঞ্জয়।
প্রাণপণে দুইজনে, অসংখ্য আয়ুধ হানে,
সংগ্রাম হইল অতিশয়॥
ব্রহ্ম অস্ত্র লৈলা করে, পার্থ তূর্ণ চাপে পূরে,
মন্ত্র পড়ি ছাড়িল সে শর।
অলক্ষতে কাটে শির, পড়িল রাধের বীর,
ছিন্ন দ্রুম যেন ভূমি পর॥
অত্যন্ত তাপিত মনে, তবে রাজা দুর্য্যোধনে,
শল্যকে করিলা সেনাপতি।
চড়ি স্বর্ণময় রথে, মহাধনু লৈয়া হাতে,
যুদ্ধ করে পাণ্ডব সংহতি॥
যুধিষ্ঠির ভূপে তারে, দিব্যবাণে নাশ করে
দুর্য্যোধনে দুঃখ ভাবি মনে।
গদা লৈয়া নিজ করে, আসিয়া সমর করে,
মহারণ করে ভীমসনে॥
ভীমের গদার ঘাতে, ঊরু ত্যজে নরনাথে,
পড়িলেন বিষম সমরে।
পাণ্ডবে জিনিল রণ, অত্যন্ত উল্লাস মন,
জয়ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে করে॥
রাজা হৈল যুধিষ্ঠির, প্রজাগণ হৈল স্থির,
অশ্বমেধ ক্রতু পরে কৈলা।
বহুকাল রাজ্য করি, পরে ধর্ম্মঅধিকারী,
সশরীরে স্বর্গপুরে গেলা॥
শুন দ্বিজ কালিদাস, ভারত প্রসঙ্গ ভাষ,
হৈল সাঙ্গোপাঙ্গ এই খানে।
ভারতী চরণোপরে, যেন মত সাধ্যে ধরে,
দ্বিজ রাজসিংহে পদ ভণে॥

ক্রমশঃ।

২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাহিত্য-সংহিতা

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

বাদরায়ণের পরমাণুবাদ সমীক্ষণ।

পরমাণুবাদ সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনে যে অতি সূক্ষ্ম গবেষণা হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং এই গবেষণার ফলে আণবিক সমুদায় বস্তুই যে অনিত্য ও ক্ষণ পরিবর্ত্তনীয়, এই সত্যেও মতিমান্ লোক প্রত্যায়ান্বিত হইয়াছেন; কিন্তু বাদরায়ণ ও শঙ্করের লোকাতীত প্রজ্ঞাপ্রসূত যুক্তিপূর্ণ বিচারণার উপর মনোনিবেশ করিলে ঐ গবেষণাকে অঙ্গবৈগুণ্য দোষ হইতে অসংশ্লিষ্ট রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। এই দোষটার স্বরূপ ও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি উভয়ের ঐ বিচারণার পর্য্যবেক্ষণেই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িবে, সুতরাং এ সম্বন্ধে এই স্থলে মোটের উপরে ইহা বলা যাইতেছে যে, জগতের আদিকারণ কোন প্রকারে ব্যক্ত প্রকৃতি বা ব্যক্ত ধর্ম্ম বিভিন্নতা প্রভৃতির আধার হইতে পারে না। কণাদ ও তদীয় প্রশিষ্যবৃন্দ সূক্ষ্ম যুক্তির অনুশীলন করিয়াও এই সম্বন্ধে যে সাবধানতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, তাহা কপিলের প্রকৃতিবাদ ও ব্যাসের মায়াবাদ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। যদ্যপি মায়াবাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া শঙ্করই বিখ্যাত, তথাপি তদীয় ভাষ্যের মূলীভূত সূত্র-প্রণেতাকে ইহার মূলে না রাখা বিচার-বৈশদ্যের পরিচায়ক হইতে পারে না। আর স্বপ্ন অবস্থা-বর্ণনে স্বয়ং ব্যাস "মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" সূত্র দ্বারা মায়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই মায়াবাদ সম্বন্ধে কোন কোন উদ্ভটপন্থী তর্কবন্ধু যে বেদ-বিরোধিতার অভিযোগ আনিয়া থাকেন ইহার মূলেও তাঁহাদের অসম্যক্‌দর্শিতাই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, "নিহারেণ প্রাবৃতা জল্পা অসুতৃপ উক্থশাস শ্চরন্তি" "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ও "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি শ্রুতি মায়াবাদের সমর্থন করিতেছে। "কুহকরূপিণী মায়ার আবৃত হইয়া জল্পনা করিতেছে, প্রাণের তৃপ্তি সাধনে রত হইতেছে ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসা গাহিতে গাহিতে ইতস্ততঃ যাইতেছে।" "পরমেশ্বর মায়ার বিবিক্ত শক্তি দ্বারা নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন"। "মায়াকে উপাদান কারণ জানিবে"।

এই পরমাণুবাদ সমীক্ষণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে সানুবাদ ব্যাসসূত্র ও তদীয় শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রদর্শিত হইতেছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ বাদরায়ণ ও শঙ্করের যুক্তিপূর্ণ বিচারণায় মনোনিবেশ করিতে সাবধানতার ত্রুটি দেখাইবেন না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বিচার্য্য বিষয় দার্শনিক, জটিল ও অবিশেষদর্শীর পক্ষে অসুবোধ্য; কিন্তু গৃহকোণে মধু প্রাপ্তি যে সকল বিষয়ে ঘটে না, এই জন্য সময়ে সময়ে পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয় ইহাও মনীষীর বিবেচ্য।

প্রকৃতিকারণবাদ পূর্ব্বে নিরাকৃত হই-

আছে, এইরূপে পরমাণুকারণবাদের নিরাকরণ করা চাই। এ সম্বন্ধেও পরমাণুবাদী যে ব্রহ্মবাদীর প্রতি দোষ কল্পনা করিয়াছেন প্রথমে তাহার সমাধান করা যাইতেছে। বৈশেষিকেরা এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, কারণ-দ্রব্য সমবেত গুণ কার্য্য-দ্রব্যে নিজের তুল্যজাতীয় গুণের আরম্ভক হয়; কেন না শুক্ল তন্তু হইতে শুক্ল পটেরই উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার বৈপরীত্য ঘটে না। সুতরাং চেতন ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলিলে কার্য্যরূপ জগতেও চৈতন্যের সমাবেশ হউক। আর যখন এইরূপ দেখা যাইতেছে না, তখন চেতন ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। বৈশেষিকদিগের এই সিদ্ধান্তটা তদীয় প্রক্রিয়াতেই দোষগ্রস্ত বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

"মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং।"

২ অঃ ২ পাঃ ১১সূঃ।

"যেরূপ পরমাণুর শুদ্ধ অণু পরিমাণ হইতে দ্ব্যণুকের অণুত্ব বিশিষ্ট হ্রস্ব পরিমাণ এবং দ্ব্যণুকের অণু ও হ্রস্ব পরিমাণ হইতে ত্র্যণুকের মহত্ব বিশিষ্ট দীর্ঘ পরিমাণ আরব্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইলে কোন দোষ হয় না।"

ঐ প্রক্রিয়াটা এই যে, পরমাণু সমূহ কিছুকালের জন্য কোন কার্য্য আরম্ভ না করিয়া যথাযোগ্য রূপ প্রভৃতি গুণ ও অণু পরিমাণ যুক্ত হইয়া অবস্থিতি করে (এই অবস্থাটা প্রলয় কালের)। অতঃপর জীবপুঞ্জের অদৃষ্ট ও ঈশ্বরপ্রযত্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পরস্পর সংযুক্ত হওয়াতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে নিখিল কার্য্যের উৎপত্তি আরম্ভ করে। আর কারণের গুণই কার্য্য সমূহে গুণান্তরের আরম্ভক হয়। (এই স্থলে দ্রব্যের আরম্ভক দ্রব্য, ও গুণের আরম্ভক গুণ জানিবে)। যখন দুই পরমাণু দ্ব্যণুকের আরম্ভক হয়, তখন পরমাণুগত রূপাদি গুণবিশেষ শুক্লাদি দ্ব্যণুকে অপর শুক্লাদির—আরম্ভ করে। কিন্তু পরমাণুর গুণবিশেষ পারিমাণ্ডল্য দ্ব্যণুকে অপর পারিমাণ্ডল্যের আরম্ভ হয় না, কারণ দ্ব্যণুকের অপর পরিমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, উহা অণুত্ব বিশিষ্ট হ্রস্বত্ব। পক্ষান্তরে যখন দ্ব্যণুকযুগল চতুরণুকের আরম্ভক হয়, তখনও তুল্যরূপে দ্ব্যণুকসমবেত শুক্লাদি গুণ চতুরণুকগত শুক্লাদি গুণের আরম্ভক হইয়া থাকে। কিন্তু দ্ব্যণুকসমবেত অণুত্ব, হ্রস্বত্ব চতুরণুকগত গুণের আরম্ভক হয় না; কেননা তদীয় মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব পরিমাণই শিষ্ট ব্যক্তিরা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। যখন অনেক পরমাণু অনেক দ্ব্যণুকের অথবা দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণু স্বকীয় কার্য্যের আরম্ভক হয়, তখনও এইরূপ প্রক্রিয়ারই যোজনা করিয়া লইবে। অতএব যেরূপে পরমাণুর স্বকীয় পরিমাণ হইতে দ্ব্যণুকের অণু ও হ্রস্ব পরিমাণ আরব্ধ হয়, কিন্তু পরমাণুগত পরিমাণ নহে, এবং দ্ব্যণুকের অণু ও হ্রস্ব পরিমাণ হইতে ত্র্যণুকের মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ জন্মে, কিন্তু অণু ও হ্রস্ব পরিমাণ নহে, সেইরূপে চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ জন্মে এইরূপ স্বীকার করিলে কোন দোষ হয় না। যদি তুমি এইরূপ মনে কর যে, দ্ব্যণুক প্রভৃতি দ্রব্য বিরোধী পরিমাণ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় পরমাণুর পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ দ্ব্যণুকগত পরিমাণের আরম্ভক নহে ইহা স্বীকার করিয়া লইব; কেন না চেতনার বিরোধী অচেতনা নামে কোন গুণ নাই, এই জন্য তথাবিধ গুণদ্বারা জগৎ আক্রান্ত হইয়াছে এই অছিলায় কারণগত চৈতন্য কার্য্যগত উহার আরম্ভক নহে এইরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না এবং এই কারণে পারিমাণ্ডল্য বৈষম্য হওয়ায় কারণগত চৈতন্যের

কার্য্যগত চৈতন্যারম্ভকত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, তবে বলিতেছি এইরূপ মনে করা অসঙ্গত। ইহার কারণ এই যে, কারণগত পারিমাণ্ডল্যের ন্যায় তথাবিধ চৈতন্যেরও অনারম্ভকত্ব বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, পারিমাণ্ডল্যাদি অপর পরিমাণ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় দ্ব্যণুকাদি পরিমাণের আরম্ভক নহে, কেন না অপর পরিমাণ আরম্ভ করার পূর্ব্বে পারিমাণ্ডল্যাদিও দ্ব্যণুকাদি পরিমাণের আরম্ভক হইতে পারে। আর ইহাও বলা যাইতে পারে না যে, বিরোধী পরিমাণের সহিতই কার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হউক, কেন না গুণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উহা ক্ষণকাল নির্গুণ অবস্থাতে অবস্থিতি করে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পরমাণু প্রভৃতি হইতে যে দ্ব্যণুকাদির অপর পরিমাণ হইয়া থাকে ইহারও অপর কারণ, এইজন্য পারিমাণ্ডল্যাদি পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যগ্র হইয়া নিজের তুল্যজাতীয় পরিমাণের আরম্ভক হয় না এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না। এই অপর কারণটা বক্ষ্যমাণ কণাদ সূত্র সমূহ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে।

"কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ" "তদ্বিপরীতমণু" "এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে।"

"ত্র্যণুকরূপ কারণের বহুত্ব প্রযুক্ত ত্র্যণুকের, মৃত্তিকার মহত্ত্ব প্রযুক্ত ঘটের এবং অবয়বের সংযোগ বিশেষ প্রযুক্ত দ্বিতুলপিণ্ডারব্ধ অতি স্থূল পিণ্ডের মহত্ত্ব (মহৎ পরিমাণ) জন্মে"।১। "ঐ মহৎ পরিমাণ হইতে দ্ব্যণুকের অণু পরিমাণ বিপরীত অর্থাৎ পরমাণুগত দ্বিত্ব সংখ্যা জনিত"। ।২। "ইহা দ্বারা দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ—যেরূপ মহত্ত্বের অসমবায়ী কারণ মহত্ত্ব সমধিকরণ দীর্ঘত্বেরও অসমবায়ী কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ অণুত্বের অসমবায়ী কারণ তদবিনাভূত হ্রস্বত্বেরও অসমবায়ী কারণ হয়"। পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ হয় বলিয়া তদ্গত বহুত্বাদি সংখ্যাই আরম্ভক হউক, কিন্তু পারিমাণ্ডল্যাদি নহে, এইরূপ আপত্তির পরিহারও এইরূপে হয় যে, দ্রব্য বা গুণারম্ভাবস্থাতে সমস্ত কারণগুণই তুল্যরূপে নিজের আশ্রয়ে সমবেত হওয়ায় আরম্ভক হইয়া থাকে; কিন্তু কেহ আরম্ভক কেহ অনারম্ভক এইরূপ হয় না। অতএব স্বভাবতই যে পারিমাণ্ডল্যাদি অনারম্ভক এইরূপই বলিতে হইবে; সুতরাং চৈতন্য সম্বন্ধেও এই প্রকারই জানিয়া লইবে। এইরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে, প্রস্তাবিত বিষয় দ্রব্য হওয়ায় উদাহরণে গুণকে রাখা যুক্তিযুক্ত নহে; কেন না উদাহরণে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত বস্তুর আরম্ভ মাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। আর এইরূপও কোন নিয়ম নাই যে, দ্রব্যের উদাহরণে দ্রব্য এবং গুণের উদাহরণে গুণই রাখিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে সূত্রকার কণাদও "প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণামপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্য পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে" সূত্র দ্বারা দ্রব্যের উদাহরণে গুণকে রাখিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, "যেরূপ প্রত্যক্ষীভূত ভূমি ও অপ্রত্যক্ষীভূত আকাশের সংযোগ অপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পঞ্চভূতারব্ধ শরীরও প্রত্যক্ষ হউক, এইজন্য প্রত্যক্ষীভূত শরীরকে পাঞ্চভৌতিক বলা যাইতে পারে না।" এইক্ষণে অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, সংযোগরূপ গুণকে শরীররূপ দ্রব্যের উদাহরণে রাখা হইয়াছে। আর "দৃশ্যতে তু" ব্রহ্মসূত্রেও কারণের গুণ যে কার্য্য সম্বন্ধে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত গুণের আরম্ভক [redacted] হইয়াছে। এই রূপ এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে,

"দৃশ্যতেতু" সূত্র দ্বারা বর্ত্তমান সূত্র গতার্থ হইল, কেন না উহা সাঙ্খ্যমত সম্বন্ধে, আর ইহা বৈশেষিক মতের প্রতি। পক্ষান্তরে— "এতেন শিষ্টা পরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" অর্থাৎ "সাঙ্খ্যমত নিরাকরণ দ্বারা শিষ্ট ব্যক্তির অপরিগৃহীত ন্যায় ও বৈশেষিক মত নিরাকৃত হইল।" বেদান্তের অতিদেশ সূত্রে বৈশেষিক মতের সমীক্ষণ হইয়াছে এই প্রকার আক্ষেপেরও কোন অবকাশ নাই; কেন না ঐ অতিদেশ সূত্রেরই বৈশেষিক প্রক্রিয়ারম্ভে তদীয় প্রক্রিয়ানুযায়ী নিদর্শন দ্বারা বিস্তার করা যাইতেছে।"

"উভয়থাপিন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ"। ঐ ঐ ১২

"কর্ম্মের নিমিত্তভূত অদৃষ্টকে আত্ম সমবেত বলা বা অণুসমবেত বলা এই উভয় প্রকারেও পরমাণুর কর্ম্ম অসম্ভব, সুতরাং তন্মূলক সংযোগও অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে।"

ভাষ্য—এইক্ষণে পরমাণু কারণবাদ নিরাকৃত হইতেছে। ঐ বাদের অভ্যু-খান এই প্রকারে হয় যে, দেখিতে পাই সাবয়ব পটাদি দ্রব্য নিজসংশ্লিষ্ট সংযুক্ত তন্তু প্রভৃতি দ্রব্যে আরব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, সাবয়ব দ্রব্য মাত্রই নিজসংশ্লিষ্ট সংযুক্ত দ্রব্যে আরব্ধ হয়। আর যাহা হইতে অবয়বের বিভাগ নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই অন্তিম অবয়বকে পরমাণু বলা হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে গিরি সমুদ্র প্রভৃতি সমস্ত জগৎই সাবয়ব, এইজন্য উৎপন্ন ও বিনশ্বর। আর কার্য্য কখন নিষ্কারণ হইতে পারে না বলিয়া কার্য্যরূপী জগতেরও অবশ্য কোন না কোন কারণ বলিতে হইবে, সুতরাং ঐকারণ পরমাণুই বটে এইরূপ কণাদমুনির অভিপ্রায়। বিশেষতঃ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চতুর্ব্বিধ ভূতকে সাবয়ব-দেখিয়া উহাদের কারণরূপে চতুর্ব্বিধ পরমাণু কল্পনা করা যাইতেছে। ঐ পরমাণু সমূহের সর্ব্বান্তিম অংশ হওয়ায় বিভাগ হইতে পারে না বলিয়া নশ্বর পৃথিবী প্রভৃতির বিভাগ পরমাণুতে যাইয়া সমাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে বিভাগ সমাপ্তির কালকে প্রলয় কাল বলা যায়। পক্ষান্তরে প্রলয় কালের পরে সৃষ্টি সময়ে বায়বীয় পরমাণুতে অদৃষ্টজনিত কর্ম্ম আরম্ভ হয় এবং ইহা নিজের আশ্রয়ভূত পরমাণুকে অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত করে। এইরূপ নিয়মে দ্ব্যণুকাদিক্রমে বায়ু উৎপন্ন হয়। তেজ, জল, পৃথবী, শরীর ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপ ক্রমই জানিয়া লইবে। অধিক কি বলিব, এই সমস্ত জগৎ এই নিয়মে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইত গেল দ্রব্য সম্বন্ধে, গুণ সম্বন্ধেও পরমাণুগত রূপাদি হইতে তন্তুপট ন্যায়ে দ্ব্যণুকগত রূপাদি জন্মে। উল্লিখিত ক্রমে সংক্ষেপতঃ কণাদমত ব্যক্ত হইল। এক্ষণে তৎসম্বন্ধ বিবেচনা করা যাইতেছে—

কণাদমতাবলম্বীরা বিভক্ত পরমাণু সমূহের সংযোগ কর্ম্মসাপেক্ষ স্বীকার করিবে, কেন না কর্ম্মবিশিষ্ট তন্তু প্রভৃতিরই সংযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু কর্ম্ম কার্য্যরূপ হওয়ায় তাহার কোন না কোন কারণ অবশ্য মানিয়া লওয়া চাই,—না মানিলে অণুরাশির প্রথম কর্ম্মই অসম্ভব হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে উহা মানিলেও অভিঘাত প্রভৃতি বা প্রযত্নকেই অদৃষ্ট অনুসারে কর্ম্মের কারণ বলিতে হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব, কেন না প্রলয় অবস্থাতে কোন শরীর নাই, আর শরীরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগ ঘটিলেই প্রযত্ন হইয়া থাকে। প্রযত্নের ন্যায় অভিঘাতাদি দৃষ্ট বস্তুকেও

কর্ম্মের কারণ বলা যাইতে পারে না এই জন্য যে, প্রলয় সময়ে নিখিল কার্য্য অভাবগ্রস্ত হওয়ায় উহাদের অস্তিত্বই অসম্ভব। এইস্থলে দৃষ্ট কারণকে বাদ দিয়া অদৃষ্টকে উহা বলা যাইতে পারে না; কারণ এই যে, আত্মা বা পরমাণুতে সমবেত হইয়াই উহা কর্ম্মের কারণ হইতে পারে, কিন্তু উভয় প্রকারেই তাহা ঘটে না, এই জন্য যে, অদৃষ্ট অচেতন বলিয়া কোন চেতন বস্তুর আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে বা অপরকে প্রবর্ত্তিত করিতে অক্ষম ইহা সাংখ্য প্রক্রিয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহাদ্বারা বুঝিতে বাকি রহিল না যে, অচেতন অণুতে সমবেত অদৃষ্ট তদীয় কর্ম্মের কারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রলয় অবস্থাতে বৈশেষিক মতানুসারে শরীরাদি সাধনের অভাব হেতু চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া ঐ অবস্থাতে আত্মা অচেতন; সুতরাং তদবস্থাপন্ন আত্মাতে সমবেত অদৃষ্টও অচেতনাধিষ্ঠিত হওয়ায় প্রস্তাবিত কর্ম্মের কারণত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে অযোগ্য। এইস্থলে ইহাও অনুধাবন করিয়া লইতে হইবে যে, যখন অদৃষ্ট আত্মসমবেত হইতেছে, তখন উহা ব্যধিকরণ, অণুসমবেত কর্ম্মের কারণ কি প্রকারে হইতে পারে; কেন না এইরূপ অবস্থায় কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাতেও যদি আপত্তিকারী বলে যে, গুরুত্বের ন্যায় স্ব সমবায়ীর সংযোগরূপ কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধই বর্ত্তমান আছে, তবে বলিতেছি, যে, অপর নিয়ামকের অভাব হেতু ঐ সম্বন্ধটা সর্ব্বদাই হইতে থাকুক এবং এইজন্য অবিরাম পরমাণুর ক্রিয়া হওয়াও প্রলয়ই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব কর্ম্মের কোন নিয়ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিয়া পরমাণুর প্রথম কর্ম্মই অসম্ভব। আর কর্ম্ম অসম্ভব বলিয়া সংযোগও হইতে পারে না; সুতরাং তন্মূলক দ্ব্যণুকাদি কার্য্যসমূহও অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিশেষ বিবেচ্য এই যে, অণুরাশির পরস্পর সংযোগটা সর্ব্বাংশে বা একাংশে হইবে। প্রথম পক্ষে তজ্জনিত উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না অণুপরিমাণই থাকিয়া যাইতে পারে এবং দৃষ্টবিপর্য্যয় দোষ ঘটে। দৃষ্টবিপর্য্যয় না ঘটিবে কেন, প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যেরই তথাবিধ অপর দ্রব্যের সহিত সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নিরবয়ব অণুর অপর তথাবিধ অণুর সহিত সংযোগ ব্যাপারটাই অসঙ্গতি দোষে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় পক্ষে—নিরবয়ব পদার্থের একদেশ অসম্ভব হওয়াতে ঐরূপ স্বীকার করায় পরমাণুর সাবয়বত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। এইরূপ কঠিন সমস্যায় যদি বল যে, পরমাণুর প্রদেশ অর্থাৎ অংশ কল্পিত, তবে বলিতেছি যে, কল্পিত বস্তু অসত্য হওয়ায় তজ্জনিত সংযোগও অসত্য হইয়া উঠিল, সুতরাং উহা সত্য বস্তুর সম্বন্ধে অসমবায়ী কারণ হইতে পারে না। আর অসমবায়ী কারণের অভাবে দ্ব্যণুক প্রভৃতি কার্য্যদ্রব্যের দশাও তথৈবচ। এইরূপ প্রণালীতে সৃষ্টির প্রথমে উপযুক্ত কারণ নাই বলিয়া যেমন সংযোগ উৎপন্ন হইবার জন্য পরমাণুর কর্ম্ম সম্ভবপর নহে, তেমনি মহাপ্রলয়েও বিভাগ উৎপত্তির উদ্দেশ্যে তদীয় কর্ম্ম অসম্ভব। আর ঐ দুই অবস্থাতে যেরূপ কোন নিয়ত দৃষ্ট কারণ নাই, সেইরূপ অদৃষ্ট কারণেরও অভাব বটে। সুতরাং পরমাণু সম্বন্ধে সংযোগ ও বিভাগ উৎপন্ন হইবার জন্য কর্ম্মই অভাবগ্রস্ত। পক্ষান্তরে সংযোগ ও বিভাগের এইরূপ দশা হওয়ায় তদধীন সৃষ্টি এবং প্রলয় ব্যাপারটাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। কাজেই পরমাণুকারণবাদকে যুক্তিবিরুদ্ধ না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না।

"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।" ঐ ঐ ১৩ সূত্র।

"সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করাতেও পরমাণু দ্ব্যণুকের কারণ হইতে পারে না, কেন না যেরূপ দুই অণু হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুক উহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াও উহার সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়, সেইরূপ সমবায় সম্বন্ধও সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় অপর সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। এইরূপে অপর সমবায় ধারার বিশ্রাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে।"

ভাষ্য—

"পূর্ব্ব সূত্র হইতে যে তদভাব পদের অধিকার হইয়াছে উহার অন্তঃপাতী তৎ শব্দ প্রস্তাবিত অণু কারণবাদ বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং তদভাব পদের অর্থ অণু কারণবাদের নিষেধ। ইহার প্রণালী ব্যক্ত হইতেছে—

দুই অণু হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুক অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াও উহার সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া থাকে এইরূপ তুমি স্বীকার করিতেছ, কিন্তু ইহাদ্বারা অণুকারণ বাদের সমর্থন হইতে পারে না। কারণ এই যে, যেরূপ দুই অণু হইতে দ্ব্যণুক অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াও উহার সহিত সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়, সেইরূপ সমবায় সম্বন্ধও সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় অপর সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, কেন না অত্যন্ত ভেদটা উভয় পক্ষেই তুল্য। সুতরাং উহা অপর সমবায়ের সহিত সম্বন্ধ হউক, এইরূপ প্রণালীতে অপর সমবায় ধারার বিরাম না হওয়ায় অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। এই স্থলে এইরূপও বলিতে পারা যায় না যে, তন্তুতে পট ইত্যাদি রূপ বিশিষ্ট বুদ্ধির নিয়ামক সমবায় সমবায়ীর সহিত নিত্যই সম্বন্ধ আছে, কিন্তু অসম্বন্ধ বা অপর সম্বন্ধ সাপেক্ষ নহে; কাজেই উহার অপর সম্বন্ধ এই প্রণালীর অনবস্থা ঘটিতে পারে না। কেন না এইরূপ হইলে পর সমবায়ের ন্যায় সংযোগও সংযোগীর সহিত নিত্য সম্বন্ধ হউক বা অপর সম্বন্ধের অপেক্ষা না করুক। আর যদি বল যে, সংযোগ সংযুক্ত বস্তু হইতে অতিরিক্ত বলিয়া সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা করে, তবে আমিও বলিতেছি যে, সমবায়ও নিজের অনুযোগী এবং প্রতিযোগী হইতে অতিরিক্ত হওয়ায় অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা কেন করিবে না? ইহাতেও যদি তোমার আপত্তি হয় যে, সংযোগ গুণ বলিয়া অপর সম্বন্ধের অপেক্ষা করিবে, তবে আমারও বলিবার অধিকার আছে যে, সমবায়ও গুণ নহে বলিয়া অপর সম্বন্ধের অপেক্ষা করুক্, কেন না উভয় পক্ষেই অপেক্ষার কারণটা তুল্য। আর কর্ম্ম প্রভৃতির অপর সম্বন্ধ-সাপেক্ষতা আছে বলিয়া ব্যভিচার হওয়ায় সম্বন্ধান্তরাপেক্ষাতে গুণ পরিভাষাকে নিয়ত কারণ বলা যাইতে পারে না। অতএব অতিরিক্ত সমবায় স্বীকারকারীর পক্ষে অনবস্থা দোষ অনিবার্য্য। আর এই অনবস্থা দোষে সমবায়ের সিদ্ধি হয় না বলিয়া দ্ব্যণুকাদির সিদ্ধিও অসম্ভব; সুতরাং সকল জিনিষেরই সিদ্ধি সুদূর পরাহত। কাজেই পরমাণু কারণ বাদকে যুক্তি বিরুদ্ধ বলা যাইতেছে।"

"নিত্যমেবচ ভাবাৎ।" ঐ ঐ ১৪ সূত্র—

"পরমাণুর প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, উভয় বা অনুভয় স্বভাবের কোন একটা স্বীকার করিলেও উহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না; কারণ ঐ স্বভাবটার নিরন্তর অবস্থিতি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে।"

ভাষ্য—

"পরমাণুকে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, উভয় বা অনুভয় স্বভাব স্বীকার করিলেও তাহা যুক্ত-

যুক্ত হইতে পারে না। কারণ এই যে, প্রবৃত্তি স্বভাব স্বীকার করিলে সর্ব্বদা প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের লোপাপত্তি হইয়া পড়ে, নিবৃত্তি স্বভাব মানিলে সর্ব্বদা নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টিই অদৃশ্য হইয়া উঠে, উভয় স্বভাব স্বীকারে পরস্পর বিরোধমূলক অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে এবং অনুভয় স্বভাব মানিলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে নৈমিত্তিক স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং অদৃষ্টাদি নিমিত্তের নিরন্তর সান্নিধানে সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হইতে থাকুক্। আর যদি বল যে, এই সম্বন্ধে অদৃষ্ট কারণই নহে, তবে সর্ব্বদা অপ্রবৃত্তি প্রসঙ্গ হইয়া পড়িল। অতএব পরমাণু কারণবাদকে যুক্তির অনুমোদিত বলা যাইতে পারে না।"

"রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ।" ঐ ঐ ১৫

"পরমাণু রূপ প্রভৃতি গুণ সমন্বিত বলিয়া ও তদীয় নিত্যত্ব ও অণুত্বের বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে; কেন না লোকসমাজে তথাবিধ বস্তুকে স্থূল ও অনিত্য দেখিতে পাওয়া যায়।"

অবয়ব সন্নিবিষ্ট বস্তুর অংশতঃ বিভাগ করিতে করিতে যাহাতে যাইয়া আর বিভাগ হইতে পারে না সেই অবিভাজ্য অংশকেই পরমাণু বলা যায়। ঐ পরমাণু চতুর্বিধ ও চতুর্বিধ ভূত ভৌতিক পদার্থের আরম্ভক, সুতরাং নিত্য। বৈশেষিকেরা যে এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন তাহার কোন ভিত্তি নাই। কারণ এই যে, তাহা হইলে পরমাণু অণুত্ব ও নিত্যত্ব হইতে বিপর্য্যয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে অর্থাৎ চরম কারণ অপেক্ষা উহাদের স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু ইহা বৈশেষিকদিগের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। আর লৌকিক নীতি অনুসারেও দেখা যাইতেছে যে, রূপাদিশালী বস্তুমাত্রই নিজের কারণ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। ইহার উদাহরণে তন্তু অপেক্ষা স্থূল পট এবং অংশু (সূক্ষ্ম সূত্র) অপেক্ষা স্থূল তন্তুকে রাখা যাইতে পারে। এইক্ষণে এইরূপ বলিতে কোন বাধা রহিল না যে, যখন বৈশেষিকগণ পরমাণু সমূহকে রূপাদি বিশিষ্ট স্বীকার করে, তখন ঐগুলি কারণ জন্য, স্থূল ও অনিত্য। পক্ষান্তরে বৈশেষিকরা যে, "সদকারণবন্নিত্যং" (কারণ হইতে অনুৎপন্ন ভাবাত্মক বস্তু নিত্য) এই সূত্রকে পরমাণুর নিত্যত্ব সম্বন্ধে কারণ বলিয়াছে তাহাও সম্ভবপর নহে; কেন না উল্লিখিত প্রণালীতে অণুও কারণ জন্য প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে "অনিত্য-মিতিচ বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ।" যদি কারণ নিত্য না হয়, তবে কার্য্য অনিত্য এইরূপ বিশেষভাবে কার্য্যের নিত্যত্ব নিষেধ অসঙ্গত হইয়া পড়ে; সুতরাং দ্ব্যণুকাদির কারণ রূপ অণু নিত্য। সূত্রকে ঐ সম্বন্ধে যে, দ্বিতীয় কারণ বলা হইয়াছে তাহাও পরমাণুকে নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে না। পারিবে কি প্রকারে, কোন প্রকার নিত্য বস্তু না থাকিলে অবশ্যই অনিত্যং এই স্থলে নঞ্ সমাস হইতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু ঐ সমাসটা যে, পরমাণুর নিত্যত্ব অপেক্ষা করে এইরূপ বলা কোন প্রকারে যুক্তি সঙ্গত হয় না। অন্য নিত্য চরম কারণ পরব্রহ্মই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বিশেষতঃ শব্দ বা অর্থের ব্যবহার মাত্রেই কোন বস্তু প্রসিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ শব্দ ও অর্থেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পরমাণুর নিত্যত্ব সম্বন্ধে যে, তৃতীয় কারণ "অবিদ্যাচ" (বৈশেষিক সূত্র) ইহার ব্যাখ্যা যদি এইরূপ করা যায় যে, যে কারণের কার্য্য সকল পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহাকে প্রত্যক্ষত না জানা, তবে দ্ব্যণুক ত্র্যণুকের অপ্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া নিত্য হইয়া উঠিল, কিন্তু ইহা তোমার মতের অত্যন্ত বিরুদ্ধ। আর যদি এইস্থলে কারণের আরম্ভক দ্রব্য শূন্য এইরূপ একটা

বিশেষণ লাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে কারণ অজানিতত্বই কলত নিত্যতার নিয়ামক হইয়া উঠিল, কিন্তু ইহা "সদকারণবন্নিত্যং" সূত্র দ্বারা পূর্ব্বে ব্যক্ত হওয়ায় "অবিদ্যার" সূত্র পুনরুক্তি দোষগ্রস্ত হয়। এই স্থলে যদি উক্ত ব্যাখ্যা না করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যে, কারণের বিভাগ ও তদীয় নাশ ব্যতীত বিনাশের অপর তৃতীয় কারণের অসম্ভবই অবিদ্যা, আর ইহাই পরমাণুকে নিত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, তবে বলিতেছি যে, এইরূপ বলা অসঙ্গত। কেন না অবশ্য বিনাশশীল বস্তুর এই দুই হেতুদ্বারাই বিনাশ হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। তথাপি ইহা সত্য যে, সংযুক্ত সাবয়ব দ্রব্য যখন অপর কোন দ্রব্যের আরম্ভক হয়, তখন অবশ্যই এইরূপ নিয়মে কার্য্য দ্রব্যের বিনাশ ঘটিয়া থাকে। পরন্তু যখন নির্ব্বিশেষ সামান্য রূপ কারণ বিশিষ্ট অপর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আরম্ভক হয়, তখন ঘৃতের কাঠিন্য বিলয়ের ন্যায় মূর্ত্ত অবস্থার বিলয়েও বিনাশ সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং রূপাদি বিশিষ্ট হওয়ায় অণুসমূহের অনিত্যতা প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে, এইজন্য পরমাণু কারণবাদ অসঙ্গত।

"উভয়থাচ দোষাৎ।" ঐ ঐ ১৬

"পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণুর ন্যূনাধিক গুণ স্বীকার এবং অস্বীকার উভয় পক্ষেই দোষ হয়।"

ভাষ্য—

পৃথিবী গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শগুণ বিশিষ্ট হইয়া অপর তিন ভূত হইতে স্থূল, রূপ, রস ও স্পর্শগুণ বিশিষ্ট হইয়া জল পৃথিবী হইতে সূক্ষ্ম রূপ ও স্পর্শগুণ বিশিষ্ট হইয়া তেজ ঐ দুই হইতে সূক্ষ্মতর এবং স্পর্শগুণ বিশিষ্ট হইয়া বায়ু ঐ তিন হইতে সূক্ষ্মতম। এইরূপ প্রণালীতে ভূত সমূহ ন্যূনাধিক গুণশালী হওয়ায় স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম বলিয়া জনসমাজে প্রথিত হইয়া আসিয়াছে। পরমাণুসম্বন্ধে এই প্রকার নিয়ম স্বীকার বা অস্বীকার উভয় পক্ষেই দোষ আসিয়া পড়ে। উহার ক্রমটা এই যে, পরমাণুকে যদি ন্যূনাধিক গুণশালী মানা যায়, তবে তথাবিধ বস্তুর স্বরূপত উপচয় ঘটায় অপরমাণুত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, কেন না পৃথিবী প্রভৃতি ভূত সমূহ সম্বন্ধে গুণের উপচয়ে স্বরূপের উপচয় দেখায়; স্বরূপের উপচয় ব্যতিরেকে গুণের উপচয় হইতে পারে এইরূপ বলা যায় না, এবং পরমাণু ন্যূনাধিক গুণশালী নহে এইরূপ স্বীকার করিলে তদীয় তুল্য পরিমাণ প্রতিপন্ন করিবার জন্য যদি সকল পরমাণুকেই এক এক গুণ বিশিষ্ট কল্পনা করা যায়, তবে কার্য্যের গুণ কারণ গুণ পূর্ব্বক হওয়ায় তেজে স্পর্শের, জলে রূপ ও স্পর্শের এবং পৃথিবীতে রস রূপ স্পর্শের উপলব্ধি হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি সমুদায় পরমাণুকেই উক্ত চারিগুণ বিশিষ্ট বলা যায়, তবে জলে গন্ধের, তেজে গন্ধ রসের এবং বায়ুতে গন্ধ রূপ রসের উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব পরমাণু কারণবাদ যুক্তি-বিরুদ্ধ।

"অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।" ঐ ঐ ১৭ সূত্র

"পরমাণু কারণবাদ নিখিল শিষ্টদিগের অপরিগৃহীত বলিয়া কোন প্রকারে ইহার সমাদর করা যাইতে পারে না।"

বেদবিৎ মনু প্রভৃতিও প্রধান কারণ বাদকে যুক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও উহার সৎকার্য্যত্ব অংশ উপযোগী এই জন্য স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু এই পরমাণু কারণবাদ কোন শিষ্ট ব্যক্তি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া কোন প্রকারে বৈদিক পণ্ডিত-

দিগের আদরণীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বৈশেষিক শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় ছয় পদার্থ, ঐগুলিকে বৈশেষিক পণ্ডিতেরা পরস্পর ভিন্ন ও ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত স্বীকার করিয়াছেন এবং মনুষ্য, অশ্ব ও শশ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে ঐরূপ স্বীকার করিয়াও উহার বিরুদ্ধে গুণ প্রভৃতি অপর পদার্থগুলির দ্রব্যাধীনতা মানিয়া লইয়াছেন; কিন্তু তাহা যুক্তির অনুমোদিত নহে। ইহার কারণ এই যে, লোক-নীতিতে যেরূপ শশ, কুশ ও পলাশ প্রভৃতি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় একে অপরের অধীন নহে, সেইরূপ প্রস্তাবিত পদার্থগুলির পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নতা স্বীকারে গুণ প্রভৃতিকে দ্রব্যের অধীন বলা যাইতে পারে না। এরূপ আপত্তিও উঠিতে পারে না যে, যেরূপ একই দেবদত্ত অবস্থাভেদে বিভিন্ন শব্দে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রব্য বর্ত্তমানে গুণাদির বর্ত্তমানতা ও অবর্ত্তমানে তাহাদের অবর্ত্তমানতা দেখিয়া অবস্থাভেদে এক দ্রব্যই গুণাদি অনেক শব্দের অভিধেয় হয়; কেননা তাহা হইলে সাংখ্য সিদ্ধান্তের সমুত্থান ও নিজ সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়ে।

(ইহার তাৎপর্য্য দ্রব্য ও গুণাদির তাদাত্ম্য স্বীকারে এইরূপ দোষ) এই আপত্তি সম্বন্ধে এইরূপও বলা যাইতে পারে না যে, অগ্নি হইতে ভিন্ন ধূমেরই অগ্নির অধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়; কেননা ঐ স্থলে ভেদ প্রতীতিমূলক অগ্নি ও ধূমের ভিন্নভাব সুনিশ্চিত, কিন্তু এই স্থলে দ্রব্য ও গুণ সম্বন্ধে শুক্ল কম্বল, লোহিত ধেনু ও নীল উৎপল ইত্যাদি প্রতীতি দেখায় অগ্নি ধূমের ন্যায় ভিন্নতা বোধ হইতে পারে না; সুতরাং গুণ দ্রব্যাত্মকই বটে। এই প্রকারে গুণের দ্রব্যাত্মকতা প্রতিপাদন দ্বারা কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ও যে দ্রব্যরূপ, ইহা প্রতিপন্ন হইতে বাকি রহিল না। আর যদি বল যে, দ্রব্য ও গুণ অযুতসিদ্ধ বলিয়া গুণাদি দ্রব্যের অধীন, তবে বলিতেছি, অযুতসিদ্ধত্ব কি অপৃথগ্‌দেশত্ব, না অপৃথক্‌কালত্ব অথবা অপৃথক্‌ স্বভাবত্ব? কোন প্রকারে ইহা সঙ্গত হয় না। অপৃথগ্‌-দেশত্ব পক্ষে তোমার নিজাঙ্গীকৃত বিষয়ই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেননা তন্তুতে আরব্ধ পটকে তন্তুরই দেশ বলা হইয়া থাকে; কিন্তু পটের শুক্লাদি গুণকে তন্তুর দেশ স্বীকার না করিয়া তাহারই দেশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। (দেশ শব্দের অর্থ অবস্থাবিশেষ)। নিজাঙ্গীকৃত বিষয়টা এই যে, "দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং" এই বৈশেষিক সূত্র অর্থাৎ কারণ দ্রব্য অপর কার্য্য দ্রব্য পটাদির আরম্ভক হয় এবং তন্তুর গুণ শুক্লাদি পটরূপ কার্য্যদ্রব্যে অপর শুক্লাদি গুণ আরম্ভ করে। পরন্তু দ্রব্য ও গুণের অপৃথগ্‌দেশত্ব স্বীকার করিলে ইহার বাধা হইয়া থাকে। (তাৎপর্য্য—সূত্রস্থ দ্রব্যান্তর ও গুণান্তর পদই পৃথগ্‌দেশত্ব জ্ঞাপন করে) এইরূপে অপৃথক্‌কালত্ব পক্ষে বামভাগস্থ ও দক্ষিণভাগস্থ গো-শৃঙ্গের পরস্পর অযুতসিদ্ধত্ব আপত্তি আসিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অপৃথক্‌স্বভাবত্বকে অযুতসিদ্ধত্ব বলিলে দ্রব্য ও গুণের পরস্পর স্বরূপ ভেদ অসম্ভব হয়; কেননা অপৃথক্‌ স্বভাবত্বটা তাদাত্ম্যেরই নামান্তর। এই স্থলে যুতসিদ্ধ (ব্যধিকরণ হইয়া পরস্পর ভিন্ন আকার বিশিষ্ট) বস্তুযুগলের সম্বন্ধকে সংযোগ এবং অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধকে সমবায় স্বীকার করিলেও কোন ফলোদয় হইবার নহে; কেননা [redacted] কার্য্য হইতে পূর্ব্ব সিদ্ধ

দ্রব্যরূপ কারণের অযুতসিদ্ধত্ব সম্ভব হয় না। (তাৎপর্য্য পূর্ব্বসিদ্ধত্ব ও অপূর্ব্বসিদ্ধত্বের স্বর্গ মর্ত্ত্যের অন্তর হওয়ায় উভয়ের অপৃথক্‌-স্বভাবত্ব রূপ অযুতসিদ্ধত্বই অসম্ভব হইয়া উঠে)। আর এইরূপ বলিলেও নিস্তার নাই যে, ঐ স্বীকারটা দুই পদার্থের মধ্যে অন্ত-তরের অযুত সিদ্ধত্ব সাপেক্ষ; সুতরাং অযুত সিদ্ধ কার্য্যের যে কারণের সহিত সম্বন্ধ, তাহাকেই সমবায় বলা যাইবে; কেননা পূর্ব্বকালের অসিদ্ধ ও অসম্বদ্ধ স্বরূপ যে কার্য্য কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর সম্বন্ধ যে দুই সিদ্ধ বস্তুর অধীন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাতে এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, কার্য্য স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কারণের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হউক, কেননা কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে কার্য্যের সিদ্ধি মানিলে (কার্য্যত্ব ও কারণত্ব প্রভৃতি পৃথক্‌ স্বভাব হওয়ায়) অপৃথক্‌স্বভাবত্ব রূপ অযুতসিদ্ধিই কার্য্য ও কারণের সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে; সুতরাং "কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে" বৈশেষিক সূত্র অসঙ্গত হইয়া যায়। ইহার ভাবার্থ এই যে, যেরূপ উৎপন্ন কার্য্যদ্রব্যের নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই আকাশাদি বিভু পদার্থের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সমবায় নহে, সেইরূপ কারণ দ্রব্যের সহিত সংযোগ সম্বন্ধই হউক, সমবায় না হউক। আর সংযোগ ও সমবায়ের সম্বন্ধী হইতে অতিরিক্ত সত্তাতে কোন প্রমাণ নাই। এই স্থলে এইরূপও বলিতে পারা যায় না যে, সম্বন্ধী ব্যতিরেকেও সংযোগ এবং সমবায় শব্দজনিত প্রতীতি দেখায় সংযোগ ও সমবায়ের অতিরিক্ত সত্তা কেন হইবে না, কারণ বস্তু এক অভিন্ন হইলেও স্বরূপ বা বাহ্যরূপে[illegible]ক্ষা করিয়া অনেক প্রকার শব্দজনিত প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয়, বদান্য, বালক, যুবা, স্থবির, পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও জামাতাকে রাখা যাইতে পারে। এইরূপ অঙ্কসম্বন্ধেও সন্নিবেশ ভেদে একই রেখাবিশেষ এক, দশ, শত ও সহস্র প্রভৃতি নানা শব্দজবোধের গোচর হয়। সুতরাং সম্বন্ধিযুগলই সম্বন্ধী শব্দজ প্রতীতির বিষয় না হইয়া সংযোগ ও সমবায় শব্দজ প্রতীতির গোচর হইয়া থাকে, কিন্তু অতিরিক্ত বস্তুসত্তা এই স্থলে প্রতীতির বিষয় নহে। অতএব সম্বন্ধী ব্যতিরেকে সংযোগ এবং সমবায় শব্দজনিত প্রতীতি দেখাতেও সংযোগ এবং সমবায় যে অতিরিক্ত বস্তু, এইরূপ উপলব্ধি না হওয়ায় উভয়ের অতিরিক্ত বস্তুত্বসিদ্ধি সুদূরপরাহত। আর সম্বন্ধীকে প্রতীতির বিষয় বলিলে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না যে, সম্বন্ধী সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে বলিয়া সম্বন্ধশব্দজ প্রতীতি নিরন্তরই হইতে থাকুক; কেননা স্বরূপ ও বাহ্যরূপের সাপেক্ষ যে ঐ প্রতীতি, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। পক্ষান্তরে পরমাণু, আত্মা ও মনের প্রদেশ নাই বলিয়া সংযোগই অসম্ভব হইয়া উঠে; কেননা প্রদেশ বিশিষ্ট বস্তুরই তথাবিধ অপর বস্তুর সহিত সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে এইরূপ বলিলেও কোন ফলোদয় হইবার নহে যে, পরমাণু, আত্মা ও মনের প্রদেশ কল্পনা করিয়া লইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়; কেননা অবিদ্যমান বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ এই এই পদার্থই কল্পনার যোগ্য; কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা অধিক নহে এইরূপ কোন নিয়ম না থাকাতে এবং কল্পনা নিজায়ত্ত বলিয়া স্বচ্ছন্দ হওয়াতে, অবিদ্যমান বস্তুর কল্পনা হইতে সম্ভব অসম্ভব সকল পদার্থেরই সিদ্ধিপ্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই স্থলে

এমন কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা বৈশেষিকের কল্পিত ষট্ পদার্থ হইতে অপর শত সহস্র অধিক বস্তুর কল্পনা নিবারণ করিতে পারে। সুতরাং কল্পনার প্রভাবে যাহার যে বস্তু অভিলষিত, তাহার পক্ষে সেই বস্তুই সিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। কোন দয়ার্দ্রহৃদয় প্রাণিসমূহের দুঃখবহুল সংসার তিন কালে অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ শূন্যময়, এইরূপ কল্পনা করিয়া লউক এবং অপর সংসারাসক্ত ব্যক্তি মুক্ত পুরুষদিগেরও পুনর্জন্ম কল্পনায় নিযুক্ত হউক। কে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ? কেবল অভিহিত বিষয় দ্বারাই বৈশেষিকদিগের মত সম্বন্ধে দোষের ভাণ্ডার খালি হইতেছে না, আরও আছে। আকাশের ন্যায় নিরবয়ব পরমাণু-যুগলের সহিত সাবয়বদ্ব্যণুকের সমবায় সম্বন্ধটা সঙ্গত নহে। আর আকাশের সহিত পৃথিবী প্রভৃতির জতুকাষ্ঠের ন্যায় সংশ্লিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমস্যায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষের অভ্যুত্থান বলিয়া সমবায়ের অস্বীকারে কার্য্য ও কারণের আশ্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধ হয় না, সুতরাং সমবায় স্বীকার করা আবশ্যক, এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিবারও কোন উপায় নাই। অন্যোন্যাশ্রয় দোষটার ক্রম এই যে, কার্য্য ও কারণের ভিন্নতা সিদ্ধিমূলক আশ্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধি এবং আশ্রয়াশ্রিত ভাব-সিদ্ধিমূলক ভিন্নতা সিদ্ধি। ইহার উদাহরণে কুণ্ড ও বদরকে রাখা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বেদান্তমতে কার্য্য কারণের ভিন্নতা বা আশ্রয়াশ্রিত ভাব স্বীকৃত হয় নাই; কেননা কার্য্য কারণের বিবর্ত্তমাত্র। কাজেই ঐ দোষটা এই মতে আসিতে পারে না। এইরূপে পরমাণু পরিচ্ছিন্ন বলিয়া ছয়, আট বা দশ যত দিক্ আছে ঐগুলির ভেদক উপাধিভূত অবয়ব দ্বারা সাবয়ব সিদ্ধ হইয়া পড়িল; সুতরাং সাবয়বত্বমূলক নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বের বাধা না হইয়া রহিল না। এই স্থলে এইরূপ বলিলেও কোন ফল হইবে না যে, তুমি যাহাকে ঐরূপ অবয়ব কল্পনা করিতেছ, তাহাকেই আমি পরমাণু বলিব; কেননা স্থূল সূক্ষ্ম তারতম্য-ক্রমে মূল কারণ হইতে পারে না বলিয়া পরমাণুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। (এই স্থলে অনুমিতি বাক্য এইরূপ যে, পরমাণু মূল কারণ নহে, যেহেতু বিনাশী; উদাহরণ-ঘট)। ইহা উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে, যেরূপ পৃথিবী দ্ব্যণুক প্রভৃতি অপেক্ষা স্থূলতম বস্তু হইয়াও বিনশ্বর, সেইরূপ উহার সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর অংশ এমন কি দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ প্রণালীতে পৃথিবী সমজাতীয় হওয়াতে পরমাণুর বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। এই সমস্যাতে এইরূপ দোষও আসিতে পারে না যে, পরমাণু নিরবয়ব বলিয়া অবয়ব বিভাগ অসম্ভব হওয়াতে বিনাশের কোন কারণই অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না; কেননা ইতঃপূর্ব্বে ব্যক্ত করা গিয়াছে যে, ঘৃতের কাঠিন্য বিলয়ের ন্যায় মূর্ত্ত অবস্থার বিলয়েও নাশ হইতে পারে। এই বিষয়টা বিশদ হইতেছে যে, যেরূপ অবিভাজ্য অবয়ব ঘৃত সুবর্ণাদির অনল সংযোগে দ্রবীভাব হওয়ায় কাঠিন্যের বিনাশ হয়, সেইরূপ পরমাণুসমূহেরও পরম কারণভাব প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্ত্ত অবস্থার বিধ্বংস ঘটে। এইরূপে কেবল অবয়বসংযোগ দ্বারাও কার্য্যের আরম্ভ হইতে পারে না; কারণ দুগ্ধ ও জলাদির সম্বন্ধে অবয়ব সংযোগ ব্যতিরেকেও দধি ও তুষার প্রভৃতি কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে। অতএব অসার তর্ক-গুম্ফিত, ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব প্রতিপাদক বেদবাক্যবিরুদ্ধ এবং বেদপ্রবণ মনু প্রভৃতি শিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপরিগৃহীত বলিয়া

শ্রেয়োভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই পরমাণুকারণবাদকে অত্যন্ত অগ্রাহ্য করা উচিত।

পাঠক, মহর্ষি ব্যাস ও বিদ্যামূর্ত্তি শঙ্কর যে পরমাণুবাদ সমীক্ষণ সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত হইল। এই স্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, পরমাণুবাদ সম্বন্ধে কুশাগ্রবুদ্ধি শঙ্কর যে দোষগুলি দেখাইয়াছেন, তাহার সমুদায় ব্যাপারটা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, দর্শনশাস্ত্রে অলব্ধপ্রবেশ ব্যক্তি এইগুলিকে সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন না। যাহা হউক, আগামী প্রবন্ধে এই শঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

হোসেনি মির্জ্জার হত্যা।

এই যুদ্ধব্যপদেশে রাজা ভগবান্ দাস পিতাকে সংবাদ জানাইলেন যে, এইরূপ অবস্থায় হোসেনি মির্জ্জা যদি কোনরূপে পলায়ন করিতে পারে, তাহা হইলে মোগল পক্ষে অতিশয় অনিষ্ট ঘটিতে পারে; সুতরাং তাহাকে হত্যা করাই শ্রেয়ঃকল্প; কিন্তু বাদশাহ আকবর এতই দয়াবান্ ছিলেন যে, শত্রুগণের এইরূপ অকৃতজ্ঞতা দেখিয়াও হোসেনির প্রাণবধ করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। সুতরাং তিনি ভগবান্ দাসের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রায় সিংহ বাদশাহকে আর কোন কথা না বলিয়া হোসেনি মির্জ্জাকে হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, সের মহম্মদ নামক একজন সৈনিক মির্জ্জার দেহ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। এইরূপে হতভাগ্য অকৃতজ্ঞ মির্জ্জার অভিনয়ের যবনিকা পতিত হইল।

এখতিয়ার উলমুল্কের পরাজয় ও হত্যা।

এখতিয়ার মোগল-সৈন্যের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া বাদশাহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জানাইলেন যে, বাদশাহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; তিনি রাজভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য বাদশাহের সিংহাসনসমীপে আসিতেছিলেন; কিন্তু মোগল-সৈন্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অধীন সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই সময় তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা অসম্ভব, এই জন্য তিনি পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু মোগল-সেনা তাঁহার অনুসরণ করিল

এই স্থানেই সোরাব বেগ নামক একজন টার্কোমেন্ তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই পলায়ন করে এবং প্রায় দশ সহস্রাধিক সৈন্য মোগল-সৈন্যের দ্বারা নিহত হয়।

দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর আকবর আমদাবাদ নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় সাত দিবস কাল অতিবাহিত করিয়া বৈরাম খাঁর পুত্র খান্ খানানের হস্তে তত্রত্য শাসনভার অর্পণ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আকবরের চিতোর আক্রমণ।

ইহার পরেই বাঙ্গালা দেশ, চিতোর এবং

* Autobiographical Memoirs of the Emperor Jahangir পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

খাণ্ডাম্‌ পুরের দুর্ভেদ্য দুর্গজয় করিবার জন্য বাদশাহ মনোনিবেশ করিলেন। তিনি চিতোর ও খাণ্ডামপুরের যুদ্ধের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিতোরবাহিনীর পরিচালক রাণা জয়মল্ল দুর্গপ্রাচীরের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অবরোধকারীদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং শত্রুগণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া এমন অব্যর্থ সন্ধানে একটী বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিলেন যে, তাঁহার গুলিক খনও নিষ্ফল হইল না। তিনি এই বন্দুকটীকে এইজন্য ক্রসতানদাজ (অব্যর্থ সন্ধানকারী) বলিতেন। এই বন্দুকটী এখন আমার নিকটে রহিয়াছে। ইহার তুল্য বন্দুক আর দেখা যায় না। বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, পিতা আকবর শাহ এই বন্দুকটী দ্বারা বিংশতিসহস্র পশুপক্ষীর প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে বন্দুকটীর গুণের সঙ্গে সঙ্গে পিতার অসাধারণ লক্ষ্যভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। শিকারে আমারও সাতিশয় আসক্তি থাকায় আমিও এই বন্দুকের সাহায্যে কুড়িটি হরিণ এক দিনে বধ করিয়াছি; কিন্তু একটী অসম্ভব ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমি শপথ করিয়াছিলাম যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আর এই বন্দুক ধরিব না।

মৃগশিকারে জাহাঙ্গীরের মূর্চ্ছা।

এক দিন অরণ্যে মৃগয়া করিতে যাইয়া একটী সুন্দর হরিণ আমাদের নয়নপথবর্ত্তী হইল; তাহার সুন্দর বর্ণ দেখিয়া আমি অন্যান্য সমভিব্যাহারিগণকে তাহার প্রতি অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলাম; কারণ হয়ত মৃগটী এত অধিকসংখ্যক লোক দেখিয়া অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইতে পারে। তারপর আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রসতানদাজকে ছুড়িলাম। প্রথম লক্ষ্য বিফল হওয়ায় ক্রমান্বয়ে দুইবার আওয়াজ করিলাম; কিন্তু মৃগটী পূর্ব্বের ন্যায় সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইলাম। আমাকে দেখিয়া মৃগটী যেন স্থানান্তরে লাফাইয়া উঠিল, আমি পুনরায় লক্ষ্য করিলাম, কিন্তু সে লক্ষ্যও ব্যর্থ হইল। তখন আমি তাহার আরও নিকটে যাইলাম; কিন্তু মৃগটী হঠাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল এবং আমিও—জানিনা কোন্‌ দৈবকারণবশতঃ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলাম। এইরূপ অবস্থায় যে কতক্ষণ তথায় ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। তৎপরে আমার পুত্র খুরাম আমার প্রত্যাবর্ত্তনে অথথাবিলম্ব দেখিয়া যেস্থানে আমি অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়াছিলাম, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে তাদৃশ মোহভাবাপন্ন দেখিয়া গোলাপ জল দ্বারা আমার কপোলদেশ সিঞ্চন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে আমার চৈতন্যের উদয় হইল। সেই সময় হইতে প্রায় মাসাধিক কাল আমাকে মানসিক দৌর্ব্বল্য ও অসহনীয় চিন্তায় কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল; আর সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর, আর আমি এই বন্দুক ব্যবহার করিব না।

আকবরের উপবাস ও পরিমিতাহার।

পিতার বিষয় শেষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পরিমিতাহার ও উপবাস সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই দুইটী বিষয়ে তিনি এতদূর নিয়মানুবর্ত্তী ছিলেন যে, বৎসরের মধ্যে তিন মাসকাল কোনরূপ আমিষ ভোজন করিতেন না। তাঁহার জন্মমাসে যাহাতে কোন জন্তুর প্রাণবধ করা না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিষেধ-আজ্ঞা ছিল। রমজানের সময়ে যদিও তিনি

সমস্ত মাস উপবাস করিতেন না বটে, কিন্তু রমজানের শেষ দিবস তিনি এড্‌গাতে (Eidgah) উপসনালয়ে যাইয়া বিধিমত দুইবার উপাসনা করিতেন এবং তিনি যে উপবাস করিতে পারেন নাই, সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তিন শত ক্রীতদাসকে মুক্তিদান করিতেন, এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা বিতরণ করিতেন।

জম্মল উদ্দিন আনজু।

আমার অপ্রাপ্তবয়সের হিতৈষী ব্যক্তিগণের মধ্যে জম্মল উদ্দিন আঞ্জু পিতার জীবদ্দশায় আমার মঙ্গলের জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি এক-হাজারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহাকে "এজাদদৌলা" এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া বার-হাজারীর পদে উন্নীত করিয়াছি। এরূপ উচ্চস্থানীয় মান্য আমার পিতার সময়ে কিংবা আমার সময়ে আর কোন ওমরাহ পান নাই, এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে জয়ঢাক, রাজচিহ্নাঙ্কিত পতাকারত্নাদি, হীরকখচিত তরবারি ও কটিবন্ধ, সুন্দর অশ্ব ও বহুমূল্য অশ্বাভরণ প্রদান করিয়াছি। এইরূপে তাঁহাকে পিতৃদত্ত মান্য অপেক্ষা বহুগুণ মান্য দ্বারা ভূষিত করিয়া প্রভূত ক্ষমতার সহিত বেহারের শাসনভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছি। আরও তাঁহার একাদশ পুত্রকে অবস্থানুসারে এক বা দুই সহস্র অশ্বারোহীর নেতৃত্ব ভার প্রদান করিয়াছি। এমন কি ওমরাহগণের মধ্যে ইতিমদ্দৌলার বংশ ব্যতীত আর কেহ এরূপ আশাতীত উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই, কারণ ইতিমদ্দৌলার পুত্র ও সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের হস্তেই রাজ্যের প্রকৃত শাসনভার অর্পিত হইয়াছে।

জাহাঙ্গীরের নূতন মুদ্রাপ্রচলন।

এই সময়ে আমি সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিয়া নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দিলাম। ব্যবসায়ী ও অন্যান্য লোকের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা বা স্বর্ণ মোহরসকল বহুদিন যাবৎ ব্যবহৃত হওয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; নূতন মুদ্রার সহিত তুলনায় কোনরূপ অননুকূল পার্থক্য দৃষ্ট হইলে তাহা অগ্রাহ্য করা হইবে, এইরূপ আদেশ করিলাম।

জাহাঙ্গীরের নব সংস্কার।

আমার পিতার সময়ে মুদ্রা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ রাজসরকার হইতে একটী অশ্ব বা হস্তী এবং পাঁচ লক্ষ মুদ্রার আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিতেন। এইরূপ ব্যবহার আমি অসম্ভব ও কষ্টদায়ক বিবেচনা করিয়া তাহা উঠাইয়া দিয়াছি এবং এই আদেশ প্রদান করিয়াছি যে, বর্ত্তমান সময়ে রাজকোষ হইতে পুরস্কার বা ভাতাস্বরূপ আর কোন অর্থ দেওয়া হইবে না।

দাক্ষিণাত্য হইতে সালবাহনের আগমন।

মৃত সুলতান ডানিয়েলের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সকল লইয়া সালবাহন্ দাক্ষিণাত্য হইতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। ইহার মধ্যে পনের শত বৃহৎ শ্রেণীর হস্তী—প্রত্যেকটীর মূল্য চারি লক্ষ মুদ্রা ছিল। এতদ্ব্যতীত ইরাক ও বদকৃশাম্ জাতীয় আট সহস্র অশ্ব, ইহাদের প্রত্যেকটীর মূল্যও হস্তীর মূল্য অপেক্ষা ন্যূন নয়। এই সঙ্গে আট সহস্র উষ্ট্র ছিল। রাজসভার উপযোগী নানাবিধ বহুমূল্য আসবাব, চীনদেশীয় স্বর্ণখচিত রেশমী বস্ত্র এবং গুজরাটের-স্বর্ণখচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র। এই সঙ্গে চার কোটী পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার

বহুমূল্য প্রস্তরাদি ও মুক্তা আনীত হইয়াছিল।

ভ্রাতা দানিয়েলের রক্ষিত তিন শত বেগম সালবানের সহিত আসিয়া আমার সাহায্য-প্রার্থিনী হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, যদি কেহ পরিণয়প্রার্থিনী হন, তাহা হইলে আমার ওমরাহগণের মধ্যে উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিতে পারি। এই সমস্ত বেগমের নিজ নিজ সম্পত্তি ছিল। প্রত্যেকেরই বহুমূল্য রত্নাভরণ, বস্ত্রাদি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসাদি, হস্তী, অশ্ব, খোজা ও ক্রীতদাসী ছিল এবং প্রত্যেকের বিবাহসময়ে উপহারস্বরূপে প্রাপ্ত তিন লক্ষ মুদ্রাও ছিল। আমি ইহাদের কপর্দ্দকমাত্র না লইয়া তাঁহাদের মনোনীত আমীরগণের সহিত বিবাহ দিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিলাম।

ইন্দ্রগজ।

আমার ভ্রাতা দানিয়েলের রক্ষিত হস্তি-যূথের মধ্যে—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও গুণশালী একটী হস্তী ছিল। আমি তাহার নাম ইন্দ্রগজ রাখিয়াছিলাম। ইহার ন্যায় উচ্চ হস্তী আমি কখনও দেখি নাই। ইহার পৃষ্ঠে চড়িতে হইলে বৃহৎ সিঁড়ির আবশ্যক হইত। ইহা এত শান্ত ও বশ্য ছিল যে, যদি কোন বালক অসাবধনতাবশতঃ ইহার দ্বারা তাহকে নিরাপদ্ স্থানে সরাইয়া দিয়া পরে আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইত। ইহা যেরূপ শান্ত, তদ্রূপ দ্রুতগামী ছিল। এমন কি কোন বেগগামী অশ্বও ইহার সহিত ছুটিতে পারিত না; ইহার সাহসও অসীম ছিল, ইহা শতসংখ্যক উন্মত্ত হস্তীকে এককালে আক্রমণ করিয়া পরাভব করিত।

তাহার আহারের জন্য দৈনিক এক মণ মদ্য, চারি মণ চাউলের অন্ন, এক মণ ঘৃত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমি সেই হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ-নির্ম্মিত হাওদার উপর চড়িয়া বেড়াইতে যাইতাম। তাহার নানাবিধ স্বর্ণের আসবাব ছিল, যথা শৃঙ্খল, ঘণ্টা ইত্যাদি। চন্দন দ্বারা প্রত্যহ তাহার অঙ্গ চিত্র বিচিত্র করা হইত; ইহার চিত্তবিনোদনের জন্য একদল গায়কও নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক সুলতান দানিয়েলের পূর্ব্ব ঋণ-পরিশোধ।

আমি অবগত হইলাম যে, মৃত শাজাদা দানিয়েল বলপূর্ব্বক ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে হস্তী ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করিতেন এবং তাহাদিগকে প্রকৃত মূল্য দিতেন না। আমি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলাম, যদি কোন ব্যক্তি সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বিক্রীত বস্তুর অবশিষ্ট মূল্যের জন্য আমার নিকট দাবী করেন, তাহা হইলে আমার মৃত ভ্রাতার সেই সমস্ত ঋণ আমি পরিশোধ করিব।

জাহাঙ্গীরের বন্দুক।

আমার নিজস্ব একটী বন্দুক ছিল। মির্জ্জা রস্তম ইহার পূর্ব্ব স্বত্বাধিকারীকে বার হাজার টাকা ও দশটী অশ্ব দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি ইহা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমার অসম্ভব বোধ হইয়াছিল এবং আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনার বন্দুকের এমন কি বিশেষ গুণ আছে যে, মির্জ্জা রস্তম এত অধিক মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন;—বন্দুকটীর বিশেষ গুণ আছে। প্রথমতঃ ইহাকে শতবার আওয়াজ করিলেও ইহা উত্তপ্ত হয় না; দ্বিতীয়তঃ ইহাতে অগ্নি-সংযোগ করিতে হয় না; তৃতীয়তঃ ইহার সন্ধান [redacted] পাঁচ মিত্কাল ওজনের

গুলি বহন করিতে সমর্থ। এই সমস্ত গুণের জন্ত আমি তাঁহাকে বন্দুকের মূল্যস্বরূপ একটী উপঢৌকন দিয়াছিলাম।

জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক খুরামকে কণ্ঠহার প্রদান।

১০২০ হিঃশক, ১৭ই শাভন শনিবার * আমি পুত্র খুরামকে † মুক্তা ও হীরক খচিত একছড়া কণ্ঠহার উপহার দিয়াছিলাম। ইহার মূল্য আট লক্ষ মুদ্রা। কালক্রমে খুরাম অনেক রত্নাদির অধিস্বামী হইয়াছিল। আমি আশা করি, খুরাম বুদ্ধি, ধর্ম্ম এবং নানাবিধ সদ্গুণে অন্যান্য পুত্রগণের অপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

জাহাঙ্গীরের নিকট কাবুলের কাজী আবদুল্লার আবেদন।

এই দিনে আমি কাবুলের কাজী-আবদুল্লার নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী আবেদন পাইলাম যে, যাহারা রাজ্য মধ্যে ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীর ন্যায় কার্য্য করে, এরূপ ব্যক্তির নিকট জিকয়েত নামক কর আদায় করা হইবে না, তিনি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা রাজ-সরকারের আয় অনেকপরিমাণে কমিয়া যাইবে ও তাহাতে অনিষ্ট সাধন হইবে। এই আবেদনের দ্বারা আমার মনে হইল মহানুভব কাজী মহাশয় নীচ স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে রাজসরকারের উন্নতি কামনায় ইহা করেন নাই। তজ্জন্য আমি আরও একটী নূতন আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম যে, ব্যবসায়ী বা যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, তাঁহারা অবাধে জিনিষ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে পারিবে; তজ্জন্য তাহাদিগের কোনরূপ শুল্ক লাগিবে না এবং আমার সৈন্যদলের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই সাধারণবিদিত অনুজ্ঞা অবহেলা করিবে না।

শৈয়দ কমলের পদচ্যুতি।

পিতা আকবরশাহ সৈয়াদ আবদুলওহা-য়েবের পুত্র সৈয়াদ কমলের হস্তে দিল্লীর শাসনভার অর্পিত করেন এবং তিনি এই পদে থাকিয়া কয়েক বৎসর যাবৎ কার্য্য করেন। কিন্তু অবশেষে তিনি স্বীয় কর্ম্মের দায়িত্ব বিস্মরণ হইয়া এরূপ গর্হিতাচরণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য-সকল সততাশূন্য হওয়ায় ক্রমশঃই শাসনের অগৌরব হইতে লাগিল। এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে তদীয় অসদাচরণের জন্য শাস্তি দিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু আমার পিতার জীবদ্দশায় তিনি যেরূপ মানসম্ভ্রমে আদৃত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিতে বাধ্য হইলাম এবং অন্য কোন শাস্তির বিধান না করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলাম।

কাবুল ও অন্যান্য স্থানে জিকায়েত উত্তোলন।

যে সময় হিন্দুস্থানে জিকায়েত নামক কর উঠাইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলাম, সেই সময়ে কাবুল এবং তাহার অধীন স্থান সকলও এই নিয়মের জন্য জিকায়েত হইতে মুক্তিলাভ করিল। পিতার সময়ে ঐ সমস্ত স্থানে এক কোটী আশরফি অর্থাৎ নয় কোটী মুদ্রা রাজস্ব আদায় হইত। এক্ষণে ইরাণের সহিত তুরাণের যেরূপ সম্বন্ধ, কাবুলের সহিত হিন্দুস্থানেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। তজ্জন্য আমার ইচ্ছা হইল যে, হিন্দুস্থানের অধিবাসি-গণ যেরূপ সুবিধা উপভোগ করিতেছে, খোরাসান এবং মেরায়ান্ নেহারের

* ১৬১১ খ্রীঃ অঃ ১২ই ডিসেম্বর, তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন।

† পরে যিনি সাজাহান নামে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

(Transoxiana) অধিবাসিগণ আমার রাজত্বকালে সেই সকল সুবিধা উপভোগ করিবে।

বাজ বাহাদুরকে আসফ খাঁর জায়গীর প্রদান।

আসাফ খাঁর অধিকৃত জায়গীরসকল বাজবাহাদুরকে প্রদান করিলাম। কিন্তু আসাফ খাঁর দুই লক্ষ টাকা বাকী পাওনা ছিল; এই জন্য যে পর্য্যন্ত ঐ টাকা তাহাকে দেওয়া না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত জায়গীর আসফ খাঁর দখলে থাকিবে। আমি আদেশ দিয়াছিলাম যে, এক লক্ষ টাকা রাজ-ধনাগার হইতে আসাফ খাঁকে দেওয়া হইবে এবং বাজবাহাদুর বাকী সমস্ত টাকা আদায় করিয়া রাজসরকারে জমা দিবেন।

জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক শেরিফ খাঁকে ত্রিশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান।

প্রায় সেই সময়ে শেরিফ খাঁকে ত্রিশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিকস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলাম, কারণ তিনি উদিপুরের রাণার বিরুদ্ধে আক্রমণের সময় আমার পুত্র পারভিজের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন।

হিন্দল মির্জ্জার কন্যার সহিত্ সাহসী খাঁ মেহরেমের পরিণয়।

সেই দিনে আমার মাতুল হিন্দল মির্জ্জার কন্যার সহিত সাকুলী খাঁ মেহরেমের পরিণয় সমাধা করিয়াছিলাম। পিতা আমার পুত্র খুরামকে তাঁহার হস্তে লালন পালন ভার প্রদান করিয়াছিলেন।

খসরু কর্ত্তৃক পঞ্জাব আক্রমণের সংকল্প।

১০১৪ হিঃ শঃ ৮ই জিলহুজ্জি শনিবার * রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে পর আমার পুত্র খসরু দুরভিসন্ধিকারী দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পঞ্জাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়াছে, সংবাদ পাইলাম।

খসরুর পলায়ন।

ক্ষণকাল পরেই খসরুর আলোকরক্ষক মন্ত্রী উজির-উল মুলককে জানাইয়াছিল যে, সাহাজাদা দ্বিতীয় প্রহরে রাজ-প্রাসাদ হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি বিলম্ব না করিয়া অন্যতম মন্ত্রী আমির-ওল-ওমরার নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আমার নিকট হইতে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমির-ওল-ওমরা পথিমধ্য হইতে খসরুর প্রাসাদে ফিরিয়া যাইলেন এবং তত্রত্য খোজা শান্ত্রী রক্ষকদিগকে আহ্বান করিয়া সমস্ত তথ্যের অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, প্রকৃতই সাহাজাদা রাজপ্রাসাদ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। দেড় ঘণ্টা পরে আমির-ওল-ওমরা পুনরায় আমার নিকট ফিরিয়া এই আশ্চর্য্য ঘটনার সংবাদ প্রদান করিলেন। আমি বিশ্রামার্থ অন্দরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সুতরাং তিনি খোজা একলাস দ্বারা জানাইয়া পাঠাইলেন, কোন কার্য্যবশতঃ আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ বিশেষ আবশ্যক।

আমার অনুমান হইল, গুজরাটে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। কিংবা দাক্ষিণাত্যে কোন শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা হইয়াছে। যাহা হউক, কালবিলম্ব না করিয়া মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার নিকট হইতে, পুত্র খসরুর অকারণ পলায়নের সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিলাম। ক্রুদ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক্ষণে কি করা বিধেয়। আমি স্বয়ং তাহার নিকট যাইব, অথবা অপর

* ১৬০৬ খ্রীঃ অঃ ৩১এ মার্চ্চ। যদি এই তারিখ ঠিক হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী ঘটনা জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের বার মাস আঠার দিন পরেই ঘটিয়াছিল এবং ইহা আরও পূর্ব্বে বলা উচিত ছিল।

পুত্র খুরামকে, তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিব। আমির-উল-ওমরা তদুত্তরে বলিলেন, যদি আমি তাঁহাকে আজ্ঞা করি, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে এই অশুভ ঘটনা শেষ করিয়া আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন।

তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি শাহাজাদা সীমা অতিক্রম করিয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তখন আমি কিরূপ উপায় অবলম্বন করিব। আমি তাঁহাকে বলিলাম, যদি এইরূপ বুঝিতে পারেন যে, বিনা যুদ্ধে এ ব্যাপার শেষ হইবে না, তবে তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। রাজক্ষমতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে পুত্র বা আত্মীয়ের মুখ তাকাইলে চলিবে না। যদি একজন বিদেশীয় ব্যক্তি রাজার স্বার্থের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সহস্র পুত্র বা আত্মীয় অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যিনি ক্ষমতা বা প্রভাব দ্বারা স্বীয় প্রভুর উন্নতি সাধন করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাকে প্রভুর সামর্থ্যের অন্তর্গত কোন বস্তুই অদেয় নাই। যে পুত্র অহঙ্কারদৃপ্ত হইয়া পিতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হয়, যে অকৃতজ্ঞ মুক্তভাবে অসংখ্য রাজপ্রসাদ লাভ করিয়াও রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে পুত্র হইলেও আমার নিকট বিদেশীয় শত্রুপদবাচ্য। যদিও আমার পুত্র সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, কিন্তু সে নীতি-বিগর্হিত আচরণের দ্বারা তাহার হৃদয়ের বৈরীভাব প্রকাশ করিয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি গৃহের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া তাহার উপর ছাদ তুলিতে গিয়া নিজ মূর্খতার পরিচয় দেয়, খসরুর কার্য্যও তদ্রূপ।

দেখ, যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শত্রুতাচরণ করিয়া অকৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, ইহা আশা করিও না, পুত্র বলিয়া আমি তাহার সহিত কোন ঘনিষ্ঠতা রাখিতে ইচ্ছা করি। মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ওসমান্‌বংশীয় নৃপতিগণের গার্হস্থ্য অনুশাসন-রীতিতে ইহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, তাঁহারা রাজশক্তিকে দৃঢ় রাখিবার জন্য একটী মাত্র পুত্রকে জীবিত রাখিয়া, অন্যান্য সকলকে নষ্ট করিতেন। এই ক্ষেত্রে রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য এবং রাজ্যের অশান্তি দূর করিতে যদি আমার বংশের একজনকে নষ্ট করা বিধেয় বিবেচনা করি, তাহা হইলে অন্যায় হইবে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনার পর পিতার প্রতি এইরূপ অবজ্ঞাজনক কার্য্যের চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াও যদি ইহার প্রতিবিধান না করিয়া সেই পুত্রকে পুনরায় ক্ষমতা দিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে আমার উপর ন্যস্ত ক্ষমতার কি অগৌরব করা হইবে না? যদি ঈশ্বর প্রদত্ত রাজক্ষমতা আমি নিজে সেই ধ্বংসকারী পুত্রের হস্তে তুলিয়া দিই, তাহা হইলে তাহার মূর্খতা ও ব্যসনের জন্য এই রাজত্ব শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পরিণত হইবে। আমি কখনও সামান্য অত্যাচার সহ্য করি নাই; এক্ষণে এইরূপ গর্হিতাচরণ কিরূপে অনুমোদন করিব?

(ক্রমশঃ)

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

১৮

মানদার গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে, গ্রাম্য মহিলাগণ রত্নেশ্বরবাবুর অন্তঃপুর মধ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত মহিলাগণের মধ্যে কতকগুলি নবীনা, ঠানদিদি নামধেয় রজতকুন্তলা, স্খলিতাঙ্গনা বর্ষিয়সীগণের সহিত কল-কল-নিনাদে বহুবিধ সুগভীর সমালোচনায় ব্যাপৃতা ছিলেন। কেহ কল্পনা-বলে বরের মোহনমূর্ত্তি গড়িয়া শিখিবাহন ষড়াননের সহিত তাহার তুলন করিতেছিলেন। কোন গণিত-বিদ্যাবতী আপন চম্পকমুকুলবিনিন্দিত, মণিমণ্ডিত করাঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া স্থির করিতেছিলেন যে, মানদার বিবাহ হইতে আর দুই দিনমাত্র বাকী আছে। কোন প্রজ্ঞা প্রভাকরকরস্নাত মুখখানি উর্দ্ধে তুলিয়া কুঞ্চিত ললাটতলকে চিন্তিত করিয়া, অনুমান করিতেছিলেন যে, বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই; এক্ষণে বরের পদস্পর্শপূত, স্নেহসিক্ত হরিদ্রাচূর্ণ লইয়া নরসুন্দর নরপুঙ্গবের শুভাগমন করা কর্ত্তব্য ছিল।

নবীনাগণের মধ্যে, বিমলা নাম্নী এক প্রফুল্লমুখী, হারুঠান্‌দিদি নাম্নী এক মিশিমসীমুখীকে প্রশ্ন করিলেন, "শুনছ ত?' হারুঠান্‌দিদি মিশিমসীময় দন্তগুলি বিকশিত ও আলোড়িত করিয়া কহিলেন, "কি লো?'

বিমলা। বর বড় পণ্ডিত; এম্, এ পাশ করা; উকিল।

হারু। তাইত বোন, এবার বাসর ঘরে আমরা কি কথা কহিতে পারিব?

বিমলা। কি হ'বে ঠান্‌দিদি? তোমরা ইহার একটা যুক্তি কর। বর বাড়ী ফিরিয়া যদি বলে যে, কালীদহের মেয়েগুলা সব মূর্খ, তাহা হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইব।

হারু। ইস্, তা' আর বল্‌তে হয় না! তোমরা এক কাজ ক'র, একটু চেষ্টা করিয়া অম্বিকাকে বাসর ঘরে লইয়া আসিও। বি-এ পাশই করুক, আর এম্-এ পাশই করুক, শুনিয়াছি অম্বিকার মত বিদ্বান্ কেহই নাই।

বিমলা। ঠিক বলিয়াছ, আমরা অম্বিকাকেই ডাকিয়া আনিব। আমরা পাঁচ জনে ডাকিলে সে নিশ্চয় আসিবে।

হারু। সে এই বাড়ীতেই আছে। তাহাকে ডাকিয়া আজই কথাটা পাকাপাকি করিয়া লও।

বিমলা। বেশ বলিয়াছ।

বিমলা অম্বিকার সন্ধানে গেল। ইতিপূর্ব্বেই রত্নময়ীর আহ্বানে, অম্বিকা তথায় আগমন করিয়াছিল। রত্নময়ীকে সে 'খুড়িমা' বলিয়া সম্বোধন করিত। সে খুড়িমার সহিত রন্ধনকার্য্য পরিদর্শন করিতেছিল। কার্য্যে তাহার আশ্চর্য্য পারদর্শিতা গ্রামের স্ত্রীলোকগণের অবিদিত ছিল না। অনেক পাকপরিপক্কহস্তা প্রবীণা নূতন ব্যঞ্জন রন্ধন সম্বন্ধে অকুণ্ঠচিত্তে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন। বিমলা তাহাকে গিয়া ধরিল; কহিল, "ভাই, তুমি নহিলে আমাদের মান রক্ষা হইবে না; তুমি কোনও বাসরে কখনও যাও নাই, কিন্তু মানদার বাসরে তোমাকে আসিতেই হইবে।"

অম্বিকা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, পরিণীতা নববধূর পার্শ্বে সমাসীন প্রফুল্লমুখ গদাধরকে যে কোন উপায়ে দেখিয়া সে আপনার জীবন সার্থক করিবে। এক্ষণে দেখিল যে, বিধাতা স্বয়ং

তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়া দিতেছেন। সে বিমলাকে বলিল, "এ বাসরে গদাধর বর; এ বাসরে আসিতে কোনও বাধা নাই; বাবাও বোধ হয় নিষেধ করিবেন না।"

বিমলা। তুমি কি বরকে চেন? বরের নামটি তবে গদাধর?

অম্বিকা। হাঁ, তাহার নাম গদাধর, তাহাকে আমি বাল্যকাল হইতে উত্তমরূপে চিনি। সে বাবার ......।

অম্বিকার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে কলকলায়মান নারীসমাজ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। চরণালঙ্কারসকল শিঞ্জিত করিয়া মরালমন্থরগামিনীরা শিকারানুসারী তরক্ষুর ন্যায়, প্রাঙ্গনের এক প্রদেশে প্রধাবিতা হইল। তথায়, গদাধরের নিকট হইতে হরিদ্রা লইয়া নাপিত আসিয়াছিল। সুবর্ণের ক্ষুদ্র পাত্রে যে অল্প হরিদ্রা ছিল, তাহা কন্যার জন্য। রৌপ্যনির্ম্মিত বৃহৎ আধারে যে হরিদ্রা ছিল, তাহা কন্যার কুটুম্বিনীগণের জন্য। নাপিত হাত দিয়া দেখাইয়া দিল, "এই সোণার বাটিতে কন্যা তেল মাখিবেন। তেল মাখিবার সময় মেদিনীপুরের এই পাটীর উপর, এই শ্বেত পাথরের পীঁড়িতে হেলান দিয়া বসিবেন। আর এই ঢাকাই কাপড়খানি পরিবেন। আর এই যে মার্ব্বেল পাথরের জলচৌকী দেখিতেছেন, ইহাতে বসিয়া স্নান করিবেন। এই দুইটি রূপার ঘড়াতে স্নানের জল থাকিবে। এই রূপার গামলাতে, এই রূপার ঘটীটির দ্বারা জল ঢালিয়া লইবেন। এ'টা রূপার ঝারি, ইহার দ্বারা মাথায় জল ঢালিবেন। জলটি সুবাসিত করিবার জন্য এই দেখুন দুই বোতল গোলাপজল আনিয়াছি। স্নান করিয়া, এই দর্পণে মুখ দেখিবেন; এই গন্ধ দ্রব্য মাখিয়া, এই সকল চিরুণি দিয়া চুল বাঁধিবেন। এই সকল তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিবেন। এই বারাণসী কাপড় পরিয়া, এই মখমলের বিছানার উপর বসিবেন। বাক্সের মধ্যে গহনা আছে, এই তার চাবি। ওটা একটা মখমলী গালিচা, উহার উপর বসিয়া চুল বাঁধিবেন। জল খাইবার জন্য এই সব রূপার বাসন। এই পেঁড়ার মধ্যে কুড়িখানা ঢাকাই কাপড় আছে, এ সব কন্যার কুটুম্বিনীগণ পাইবেন।"

দ্রব্যসকল দেখিয়া, গ্রামবাসিগণ স্থির করিলেন যে, এ গাত্র-হরিদ্রার সহিত এরূপ বহুবিধ এবং মূল্যবান্ সামগ্রী আসিতে তাঁহারা কুত্রাপি অবলোকন করেন নাই; কেবল মাত্র একবার অমুক গ্রামে, তাঁহাদের অমুক আত্মীয়ের অমুক কন্যার বিবাহের সময়, অমুক গ্রামের অমুক জমীদারদিগের বাটী হইতে যে 'গাত্রহরিদ্রা' আসিয়াছিল, তাহাই ইহা অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। কারণ, তাহাতে দাঁত খুঁটিবার সোণার খড়্কেটি হইতে আরম্ভ করিয়া, পা ঘষিবার জন্য বিলাতি ঝামাটি পর্য্যন্ত,—কোন দ্রব্য বাদ পড়ে নাই। এবং তাহাতে কুটুম্বিনীদিগের জন্য কেবলমাত্র এক এক খানি সাড়ি আসে নাই, পরন্তু এক এক ছড়া সোণার চেন হার আসিয়াছিল। ইত্যাদি।

চারুশশীর বাটী যে কালীদহ গ্রামে, তাহা তোমরা অবগত আছ। সে তাহার মাতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া অবগত হইয়াছিল যে, গ্রামে জমীদার বাবুদিগের বাটীতে জমীদার বাবুর কন্যার শুভ বিবাহ হইবে; এবং তদুপলক্ষে গ্রামে মহাসমারোহ উপস্থিত হইবে। অতএব, সে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতেছিল। আজ সেও গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে জমীদার বাবুদিগের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া-

ছিল। কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই যে, ঠিক কাহার সহিত মানদার বিবাহ হইবে। সে এইমাত্র শুনিয়াছিল যে, বরের বাটী কলিকাতাতে। এক্ষণে সে তাহার কলিকাতা সম্বন্ধে সর্ব্ববাদিসম্মত অভিজ্ঞতা জাহির করিয়া, আগত নাপিত-পুত্রকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো! আমাদের বরের বাড়ী, কলিকাতার কোন্ পাড়ায়?"

নাপিত বলিল,—"বরের বাড়ী চৌরঙ্গীতে। কিন্তু আমরা বরের বাড়ী হইতে আসি নাই।"

চারুশশী। তোমরা তবে কোথা হইতে আসিয়াছ?

নাপিত। আমাদের বাবু বরকে বাল্য-কালে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনিই বরের একপ্রকার অভিভাবক। আমরা তাঁহারই বাটী হইতে আসিয়াছি। গিন্নী মা ঠাকুরুণ নিজে দেখিয়া, এই সকল জিনিষ ক্রয় করিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটি তিনি নিজে পছন্দ করিয়া লইয়াছেন।

চারুশশী। তোমার গিন্নী মা ঠাকুরুণের পছন্দ ভাল নয়। পাড়াগাঁয়ের লোকে এই জিনিষ দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু আমার বাড়ী কলিকাতায়; আমি অনেক জায়গায় অনেক ভাল 'গায়ে হলুদের তত্ত্ব' দেখিয়াছি।

নাপিত। কলিকাতায় কোন্ যায়গায় আপনাদের বাড়ী?

চারু। ঝামাপুকুরে।

নাপিত। ঝামাপুকুরে? ঝামাপুকুরের অতুলবাবুর বাটীতে আমি দুই একবার কামাইতে গিয়াছি।

চারু। তুমি, তাহা হইলে, আমাদের বাটীতেই গিয়াছ। সেই আমাদের বাড়ী। তুমি যে বাবুর নাম করিলে, তিনিই আমার স্বামী।

নাপিত ভূমিষ্ঠ হইয়া, চারুশশীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "তাহা হইলে, আপনি আমা-দিগের পর নহেন। অতুলবাবুই ত আমাদের বাবুর ছোট ম্যানেজার।

চারুশশী। একটু অপ্রতিভ হইল। গিন্নীর সম্বন্ধে সেই মত প্রকাশ করাটা তাহার ভাল হয় নাই;—নাপিত বাড়ী ফিরিয়া, যদি গল্প করে। পরে, একটু সাহস করিয়া নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা হইলে, তুমি মল্লিকবাবুদের বাটী হইতে আসিয়াছ।"

নাপিত। আজ্ঞে হাঁ।

চারুশশী। বরের নাম কি?

বিমলা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। নাপিত চারুশশীর প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল, "ও মা। অবাক্! তুমি বরের নাম জান না?"

চারু। না ভাই, কোথা থেকে জানিব? তুমি যদি জান, তাহা হইলে, বল।

বিমলা। বরের নাম গদাধর।

নামটি বজ্রনিনাদে চারুশশীর মনোমধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহা বজ্রের আঘাতের মত তাহার হৃদপিণ্ডকে আঘাত করিল। এই বজ্রের চকিতালোকে তাহার হৃদয়ের সন্দেহ-অন্ধকার মুহূর্ত্ত মধ্যে তিরোহিত হইয়া গেল। বুঝিল, তাহারই সেই গদাধর বর সাজিয়া তাহাদেরই গ্রামে অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিতেছে। পাপীয়সীর হৃদয়মধ্যে আশা জাগিয়া উঠিল, "কত বৎসর পরে আবার তাহাকে দেখিব।"

২৯

দুইখানা বজ্‌রা ও চারিখানা ভাউলে আসিয়াছিল। একখানা বজ্‌রাতে জ্ঞানদা বাবু, গদাধর, অতুলবাবু, এবং জ্ঞানদাবাবুর

তিন পুত্র ছিলেন। অন্য বজ্‌রাতে বরযাত্রীগণ ছিলেন। ভাউলেতে নাপিত, পুরোহিত, এবং ভৃত্যবর্গ ছিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে বজ্‌রা ও ভাউলে কালীদহের বাঁধাঘাটে আসিয়া ভিড়িল। গ্রামের মধ্যে "বর আসিয়াছে," "বর আসিয়াছে," সাড়া পড়িয়া গেল। পুষ্প-পল্লব-পতাকা-পরিশোভিত, আলোকমালা-বেষ্টিত চাঁদনিতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। পুরস্ত্রীগণ গল্প বন্ধ করিয়া কোলের ছেলেটিকে কোলে করিয়া, বর দর্শনাভিলাষিণী হইয়া, গৃহছাদে উঠিয়া, আবার গল্প ধরিল।

বর, সুগন্ধ রৌপ্যকারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য তাঞ্জামে চড়িয়া, এবং বরযাত্রীরা মন্থরগামী অশ্বশকটে আরোহণ করিয়া, বিচিত্র ফানুস-বেষ্টিত দীপাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া, বহু বাদিত্রের বাদ্যনিনাদে বধির হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিল। তথায় সংখ্যাতীত স্ফটিক দীপাধারে উজ্জ্বল আলোকসকল, উজ্জ্বল গৃহশয্যায় প্রতিফলিত হইতেছিল। তথায় আলেখ্য-অলঙ্কৃত গৃহভিত্তি সকল কমনীয় কুসুমহারে পরিশোভিত হইয়াছিল। তথায় সভামধ্যে উচ্চ স্থানে বরের জন্য মহার্হ মসনদ বিস্তৃত ছিল। তথায় চিকের অন্তরালে অন্তঃপুরবাসিনাগণে পরিবৃতা হইয়া, রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, রত্নময়ী জামাতার মুখচন্দ্র অবলোকন করিবার জন্য বসিয়াছিলেন।

বর দেখিয়া, রত্নময়ীর হাড় জ্বলিয়া গেল। চক্ষে জল আসিল। হায়! হায়! তাহার আদরিণী কন্যার অদৃষ্টে আর কোনও সুখের আশা রহিল না। তাহার নির্ব্বোধ স্বামী দেখিয়া শুনিয়া, কিরূপে কমলমুখী এবং নবনীতবিগঠিত-পুত্তলিকা-সমা কন্যার এরূপ কদাকার বিকটদর্শন বর মনোনীত করিল! ইহা অপেক্ষা কন্যার হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহাকে সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত করিলে ভাল হইত। রত্নময়ী বার বার আপনার বিদগ্ধ ললাটের নিন্দা করিয়া, এবং তাহাকে আশু যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য, যমরাজকে আহ্বান করিয়া, আপন শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমরা পরে অবগত হইতে পারিয়াছিলাম যে, সে রাত্রে রত্নময়ী আর শয্যাকক্ষের বাহিরে আসেন নাই; কেবল রাত্র একাদশ ঘটিকার পর শ্রীমতী মুলীদেবীর একান্ত নির্ব্বন্ধানুযায়ী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, কাতরকণ্ঠে তাহাকে কহিয়াছিলেন, "কি ভাবিলাম, আর কি হইল!

রত্নময়ীর অভাবে, কিন্তু মানদার বিবাহ বন্ধ হয় নাই। ঢক্কা-ঢোল-নহবৎ-সানাই-নিনাদিত হুলু-হুলু ধ্বনিত বিবাহটা লগ্নমত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, উত্তরীয়াঞ্চলে নববধূকে বন্ধন করিয়া, রাত্রিযাপন উদ্দেশ্যে, বর বাসরগৃহদ্বারে আনীত হইয়াছিল।

তথায় অলক্তরক্তে আপন কোমল কপোল দ্বয় রঞ্জিত করিয়া, অলঙ্কার-আলোকে আপনার পরিণত দেহতট প্রজ্বলিত করিয়া, স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্র পরিয়া, দ্বারদেশে চারুশশী দণ্ডায়মান ছিল। দেখিয়া, চরণাগ্রে সহসা বিষধর সর্প দেখিলে পথিক যেমন স্তম্ভিত হয়, গদাধর সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, এ পাপ কোথা হইতে আসিল?

গদাধরকে অচল দেখিয়া, চারুশশী কহিল, "ঠাকুরপো! কেমন আছ? ভিতরে এস। ভয় কি? আমি তোমাকে খাইয়া ফেলিব না।" গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন?" চারুশশী অকারণ অনেকটা হাসি হাসিয়া কহিল, "এই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি ত আপনা হইতে দেখা দাও না।" গৃহের ভিতর হইতে উতলা বিমলা হাঁকিল,

"ও চারু, তুই যে ভাই, বরকে ঐখানেই দাঁড় করাইয়া রাখিলি। দাঁড়া, আগে ভিতরে এসে বসুক, তা'র পর কথা ক'স।"

বর গৃহমধ্যে আসিয়া বসিলে চারুশশী আবার একমুখ হাসি হাসিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জানিতে না যে, এই কালীদহ গ্রামে আমার বাপের বাড়ী?" গদাধর কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু হারুঠা'ন্‌দিদি আসিয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল, "আহা! বরটি নয়ত যেন চোরটি।" এই কথাটি বলার পর হারুঠা'ন্‌দিদি মনে করিল যে, তাহার মত রসভাষিকা রসিকা, গৃহমধ্যে আর কেহ বর্ত্তমান নাই। ফলতঃ ঠা'ন্‌দিদির কথাটা শুনিয়া গৃহমধ্যস্থ সকল সুন্দরীই স্থির করিলেন যে, এরূপ রসিকতার পর সকলেরই হাস্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব গৃহমধ্যে খিল-খিল, খল-খল রবে একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল। হাসিতে হাসিতে বিমলা হারুঠানদিদিকে ধরিয়া বলিল, "ঠা'ন দি, আজ তোমায় একটা গান গাহিতেই হইবে, আমরা কিছুতেই ছাড়িব না।"

ঠা'নদিদি কহিল, "আমার কি ভাই, আর সে কাল আছে যে গান গাহিব? তবে তোমরা ধরিয়াছ, একটা যা'হ'ক গাই, শোন।" ঠান্‌দিদি একবার বরের মুখের কাছে, আর বার মানদার মুখের কাছে ছ'হাত নাড়িয়া, এবং মসীবিচিত্র দন্তচ্ছটা প্রকটিত করিয়া এবং রাগিণীসকলকে মোল্লার বাড়ের কুক্কুটীর ন্যায় 'হালাল' করিয়া, তারস্বরে গাহিল,—

"আই আই ঐ বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
"বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো॥"

ঠা'নদিদির গান আর থামে না—গৃহের কোনের-আনা-রকম অবলা নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ পরে, হারুঠানদিদি আপন সঙ্গীতবেগ উপশম করিয়া, চারি দিকে চাহিল। দেখিল, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত সৈন্য-গণের ন্যায়, যেন তাহারই ধীর আঘাতে নারীগণ বাসর-আসরে ধরাশায়ী হইয়াছে; সমস্ত আততায়ী নিধনকারী পরাক্রান্ত বিজয়ী সেনাপতির ন্যায়, যেন সে একক আপন মস্তক উন্নত রাখিয়াছে।

বিমলা ও চারুশশী বরের বিছানার নিকট নিদ্রিতা ছিল। বর নিজে তন্দ্রাঘোরে অচেতন ছিল।

পার্শ্বের ঘরে, বরের আহারের জন্য স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। তথায় কতকগুলি পুরনারী বহুবিধ উপাদেয় আহার সামগ্রী সজ্জিত করিতেছিলেন। অম্বিকা তাহাদের সাহায্য করিতেছিল। সে সেদিন উৎকৃষ্ট বসন ও অলঙ্কারসকল পরিধান করিয়াছিল। উৎসব-বসন-পরিহিতা অলঙ্কৃতা মহিমাময়ীকে রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

আহারের জন্য আহ্বান করিতে, অম্বিকা গদাধরের নিকট আসিয়া ডাকিল, "গদাধর।" গদাধরের কানের ভিতর স্বর্গের সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল; মনে হইল, সে যেন স্বপ্নের ঘোরে স্বর্গের ছবি দেখিয়াছে। মনে হইল, তাহার হৃদয়মধ্যে, বিহঙ্গের কাকলী লইয়া, কোমল পল্লবময়ী পুষ্পিতা লতিকা লইয়া, শীতল নির্ম্মল চঞ্চল জলপ্রবাহ লইয়া, আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডার খুলিয়া, বসন্ত যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। অম্বিকা আবার ডাকিল, "গদাধর।"

গদাধর জাগ্রত হইয়া কহিল, "কেন অম্বিকা?"

বিমলা ও চারুশশী বরের নিকটে শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিল, "কেন অম্বিকা?"

বিমলা ভাবিল, "একজন ডাকিল, "গদাধর।' আর একজন উত্তর দিল, "কেন অম্বিকা?" —দেখিতেছি, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়টা বড় গুরুতর।" চারুশশী ভাবিল, "বাঃ অম্বিকা এই অল্প সময় মধ্যে, গদাধরের সহিত কিরূপে এত প্রণয় করিয়া লইল; এই বুঝি অম্বিকার সতীপনা।" চারুশশী ত জানিত না যে, বাল্যকাল হইতেই উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত।

গদাধর অম্বিকার সহিত পার্শ্বের ঘরে যাইয়া আহার করিল। তাহার সহিত কত কথা কহিল। বরের সহিত অম্বিকার বাক্যালাপের প্রথা অবলোকন করিয়া, সেই গৃহস্থিত পুরমহিলাগণ ভাবিলেন, "একজন অপরিচিত যুবক বরের সহিত, যুবতী অম্বিকার চোখ মুখ নাড়িয়া, ওরূপ ভাবে অত কথা কহা অনুচিত হইয়াছে; এবং একজন বেহায়া স্ত্রীলোক ছাড়া, অন্য কেহ এরূপ কথা কহিতে পারে না।"

আহারাদির পর গদাধর আসিয়া আবার বাসরঘরে বসিল। অম্বিকা আসিয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিয়া, আবার কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিল। যাহারা সেই ঘরে নিদ্রিতা ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে উঠিয়া হাস্যকৌতুকের অভাবে, বিজৃম্ভণসহকারে গৃহান্তরে যাইয়া শয়ন করিল। বিমলা ও চারুশশী যথাস্থানে শুইয়া রহিল। কিন্তু তাহারা নিদ্রিত ছিল না। জাগ্রত অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অম্বিকার বাক্যালাপের মধ্যে কোথায় গুপ্ত প্রেম লুক্কায়িত ছিল, তাহার অনুসন্ধানকার্য্যে আপনাদের শ্রবণ-যন্ত্রকে বিশেষরূপে নিযুক্ত রাখিয়াছিল।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, অম্বিকা গদাধরকে কহিল, "আর রাত্রি জাগিলে তোমার অসুখ হইবে; তুমি শয়ন কর। আমিও শয়ন করিবার জন্য যাইতেছি।"

অম্বিকার সহিত কথা কহিতে পাইলে, গদাধর বোধ হয় চিরজীবন বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিতে পারিত। কিন্তু সে ভাবিল; সে শয়ন না করিলে অম্বিকা শয়ন করিতে যাইবে না। ইহাতে রাত্রি জাগরণ হেতু অম্বিকার শরীর অসুস্থ হইতে পারে। অতএব সে কহিল, "হাঁ, রাত্রি বেশী হইয়াছে। এখন শয়ন করিতে হইবে। কিন্তু এই স্থানে শয়ন করিতে পারি না। তুমি আমাকে বহির্বাটীর পথ দেখাইয়া দাও; আমি বাহিরে যাইয়া শয়ন করিব।"

অম্বিকা গদাধরকে পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিল। গদাধর পশ্চাৎ চলিতেছিল। বৃহৎ ভবন। গৃহের পর গৃহ অতিক্রম করিয়া অম্বিকা উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। জনসমাকীর্ণ বদ্ধ গৃহের বাহিরে আসিয়া, শীতল বায়ুর স্পর্শে গদাধর সবিশেষ স্নিগ্ধতা অনুভব করিল। হৃদয়ে শান্তি লাভ করিয়া কহিল, "বাঁচিলাম। বাহিরে আসিয়া বাঁচিলাম। বোধ হয় এই বিবাহে আসা আমার ভাল হয় নাই।"

অম্বিকা হাসিল; কহিল, "তোমার বিবাহে তুমি না আসিলে কিরূপে বিবাহ হ'ত?"

গদাধর। শোন অম্বিকা! এ আমার বিবাহ নহে। জমীদারকন্যা মানদার বিবাহ। ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় উহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহাতে মঙ্গল হইবে না। ইহা হইতে আমি জীবনে কোন সুখ লাভ করিতে পারিব না।

অম্বিকা। গদাধর, ভাই, তুমি পৃথিবীতে সুখের আশা করিও না। সুখলাভ করিবার জন্য আমরা এ পৃথিবীতে আসি নাই। এখানে, আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমরা পালন করিয়া যাইব। সে কর্ত্তব্য যদি অত্যন্ত

কঠিন হয়, তাহাও আমাদিগকে হাস্যমুখে পালন করিতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তব্যপালন করিয়া, ভাই, তুমি পুরস্কারের প্রত্যাশা করিও না। তাহার ফলাফল ভগবানের হাতে সমর্পণ করিও। তুমি কহিতেছিলে যে, এ বিবাহে মঙ্গল হইবে না। কাহার মঙ্গল হইবে না? তোমার? মানদার? ভাই, এই সীমাহীন বিশ্বের মঙ্গলের কাছে, তোমাদের আপন আপন ক্ষুদ্র মঙ্গলের কথা গণনা করিও না।

গদাধর। আমি নিজের মঙ্গলের কথা ভাবিতেছি না; মানদার অনিষ্টের কথা ভাবিতেছি। আমি তাহাকে অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়া, তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছি।

অম্বিকা। অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়াছ? ভাই, ভাবিয়া দেখ, আমাদের ইচ্ছার বল কতটুকু। ইচ্ছা করিলে কি তুমি এ বিবাহ রহিত করিতে পারিতে? বিধাতা যে সূত্রে তোমার জীবনঘটনাবলীর মালা গাঁথিয়াছেন, তুমি মানুষ হইয়া কি তাহা ছিন্ন করিতে পারিতে? না ভাই, মানুষ তাহা পারে না। মানুষকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেই হইবে। কলের পুতুলের ন্যায় ভবিতব্যতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশে নৃত্য করিতেই হইবে। তুমি বলিতেছিলে যে, এ বিবাহের দ্বারা মানদার তুমি অনিষ্ট করিয়াছ। তোমার কি সাধ্য ভাই, যে তুমি এই ভগবানের পবিত্র রাজ্যে কাহারও অনিষ্ট করিবে? তোমার কুশাঙ্কুরসম মনুষ্যের শক্তি লইয়া, কিরূপে মহাশক্তিধরের স্নেহাশ্রিতের অনিষ্ট সাধন করিবে? অসম্ভব! অসম্ভব!

গদাধর। তাহা হইলে, তোমার মতে কোন মানুষ কোন মানুষের অনিষ্ট করিতে পারে না?

অম্বিকা। সাধ্য কি? এ পৃথিবীর ইষ্টানিষ্টের কর্ত্তা মানুষ নহে। তুমি কাহারও অনিষ্ট করিতে পার না। কেহই পারে না। রাজ-কারাগারে যে নরঘাতী পাপী মৃত্যুদণ্ড-প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছে, সেও কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে নাই। আপনার বিশ্বরাজ্যে বিশ্বদেবতা যে মহান্ কীর্ত্তিমন্দির সংস্থাপন করিতেছেন, সেই মন্দির-প্রতিষ্ঠায়, মহাপুণ্যাত্মার ন্যায়, এই নরঘাতী পাপীও সহায়তা করিতেছে। যে লজ্জাহীনা নারকী নারী আপন লজ্জা গোপন করিবার মানসে, স্বহস্তে আপন সদ্যপ্রসূত সন্তানের কণ্ঠাবরোধ করিয়াছে, সেও জগতের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই; আপন দুষ্কার্য্যের দ্বারা কেবলমাত্র সেই বিপুল বিজয়মন্দিরের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। বুঝিয়া দেখ।

গদাধর কি বুঝিবে? সে প্রতিভাময়ীর অমানুষিক জ্যোতির্ম্ময় মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, "হায়! দেবি! এ জীবনে তোমাকে পূজা করিবার অবসর পাইলাম না। তোমারই আদেশ মাথায় লইয়া, আমি কুলিশসম কর্ত্তব্য আপন বুকে গ্রহণ করিব।"

৩০

গদাধর যখন অলিন্দ-পথে অহর্নীয়া অম্বিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অনন্যমনে, কঠিন কর্ত্তব্য-ভার আপন বুকে গ্রহণ করিতেছিল, তখন তথায় আচম্বিতে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, স্ত্রীকণ্ঠপ্রসূত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

অম্বিকার সহিত গদাধরকে একাকী বাসর ঘর ত্যাগ করিতে দেখিয়া, বিমলা ও চারুশশী তাঁহাদের চরণালঙ্কারসকল উন্মোচন করিয়া [illegible] নিরাপদ্ স্থানে লুক্কায়িত রাখিল। বলা বাহুল্য, মূল্যবান্ অলঙ্কার

সকল অপহারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে স্থানটি তাহারা নিরাপদ্ মনে করিয়াছিল, তাহা নিতান্ত নিরাপদ্ হয় নাই। তাহারা যেমন হিংসা ও কৌতূহল বুকে পুরিয়া আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনমানসে, কপট-নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তেমনই, সেই গৃহমধ্যে অন্য এক দুষ্টা, অলঙ্কার অপহরণের সুযোগ খুঁজিয়া, নিদ্রার ভাণ করিয়া, মুদ্রিতনয়নে পড়িয়াছিল। বিমলা ও চারুশশীকে, অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া, অন্য স্থানে যাইতে দেখিয়া, সে পক্ষিশাবক-লাভ-লোলুপ সরীসৃপের ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিল। দেখিল, তাহারা এক স্থানে অলঙ্কারসকল লুক্কায়িত করিল। দেখিয়া, ত্বরিতপদে আপন স্থানে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিল। অম্বিকা ও গদাধরের পশ্চাদ্গামিনী হইয়া, যখন বিমলা ও চারুশশী চলিয়া গেল, তখন সে পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া, অলঙ্কারসকল আপন বস্ত্রমধ্যে সংগ্রহ করিয়া ঈপ্সিত স্থানে রাখিয়া আসিল। এইরূপে, বিমলার কৌতূহলের জন্য এবং চারুশশীর হিংসার জন্য, বিধাতা আপন বিহিত দণ্ড প্রদান করিলেন।

অলঙ্কারবিহীন নীরব চরণে, তাহারা কখন্ আসিয়া, অলিন্দের এক স্তম্ভের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, তাহা অম্বিকা কিংবা গদাধর কেহই জানিতে পারে নাই; এক্ষণে সহসা তাহাদের হাস্য-কোলাহলে উভয়ের চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। চক্ষু ফিরাইয়া, তাহাদিগকে দেখিয়া, অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা, ভাই, এখানে কখন্ আসিলে?"

বিমলা আপন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এবং চক্ষুপ্রান্তে কৃষ্ণ তারা ঘুরাইয়া, রক্তাধর তরঙ্গিত করিয়া, হাসিল। চারুশশী কহিল, "আমরা বাসর ঘরের বরকে না দেখিয়া, তাহাকে খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম; এখানে আসিয়া দেখিলাম, তুমি উহার সহিত লুকাইয়া প্রেমের কথা কহিতেছ। আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই রাত্রে, এই গোপন স্থানে তোমার কি বরের সহিত এরূপভাবে কথা কহা উচিত হইয়াছে?"

অম্বিকা। কি কথা কহিয়াছি?

চারুশশী। কি কথা কহিয়াছ, তা' তুমিই জান। কিন্তু মানুষ লুকাইয়া যে কথা বলে, তাহা ভাল কথা নহে।

চারুশশীর এই কথার পর, তাহার সহিত আর কোন কথা কহা আবশ্যক আছে, অম্বিকা এরূপ বিবেচনা করিল না। সে গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "চল, গদাধর, আমি তোমাকে বহির্বাটীর পথ দেখাইয়া দিই।"

তাহারা চলিয়া গেলে, বিমলা চারুশশীর গায়ে হাত দিয়া বলিল, অম্বিকা ছুঁড়ী ভিতরে ভিতরে যে এমন, তাহা আগে আমি জানিতাম না।" চারুশশী আপনার অলক্তরঞ্জিত গণ্ডে অলক্তরঞ্জিত হস্ত বিন্যস্ত করিয়া কহিল, "অবাক্ করিয়াছে; এমন নির্লজ্জ বেহায়া, বেয়াদব মেয়ে, আমি বিশ্বচরাচরে দেখি নাই। গ্রামের বোকা লোকে উহাকে আবার সতীলক্ষ্মী বলে। পোড়া কপাল সতী লক্ষ্মীর। কেমন সতীপনা তুমিত স্বচক্ষে দেখিলে? রাত দু' পরে পরপুরুষের কাঁধে হাত দিয়া, কথা আর ফুরায় না।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁধে হাত দিয়াছিল বুঝি? কই আমি ত তাহা দেখি নাই!"

চারুশশী। ও মা! তুমি বুঝি তা' দেখ নাই? তোমার চোখটা ছিল কোথায়? কাঁধে হাত দেওয়া ত অল্প কথা; আমার একবার মনে হ'ল, যেন অম্বিকা ছুঁড়ী ওর মুখে একবার চুমো খাইল।

বিমলা। তুই আর জ্বালাস্‌নে ভাই। ঐ দাঁত উঁচু মুখে কি কেহ চুমো খাইতে পারে? আরে, রাম! রাম!

চারুশশী। তুমি ত বুঝ না দিদি! তুমি সকলকে আমাদের মত মনে কর। ও ছুঁড়ী আইবুড়ী, ও কি আর দাঁত উঁচুর বিচার করবে? ওর একটা হ'লেই হ'ল।

বিমলা। হাঁ ভাই চারু! তুই বরকে তখন ঠাকুরপো বল্‌ছিলি; তুই কি ওকে আগে দেখেছিলি?

চারুশশী। ওকে আবার দেখিনি? ও যে রোজ বিকালে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া জল খাবার খাইয়া যাইত।

বিমলা। তো'দের বাড়ীতে আস্‌ত কেন?

চারু। তা' বুঝি জান না? আমার স্বামী কলিকাতার যে রাজার বাড়ীর ম্যানেজার, সেই বাড়ীতেই ও থাকে। বড় গরীব। ও জলখাবার খাওয়াবার জন্য ওকে ডেকে নিয়ে আস্‌ত।

বিমলা। সে রাজার বাড়ীতে ও কি করে?

চারু। কি জানি ভাই কি করে? তখন ত ছেলে পড়াইত।

বিমলা। কত টাকা মাহিনা?

চারু। তখন ত শুনিয়াছিলাম, উহার কুড়ি টাকা মাহিনা। এখন কত হইয়াছে, বলিতে পারি না।

চারুশশী সখি বিমলার সহিত কথা কহিতে কহিতে যেস্থানে তাহারা চরণাভরণ সকল চরণকমল হইতে উন্মুক্ত করিয়া সংগুপ্ত রাখিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সংগোপনস্থানে হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া ভীতপ্রকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমার চরণ-পদ্ম?"

বিমলা। আমার মল?

চারুশশী। ওমা কি হবে? কিছুই নাই!

বিমলা। আমার যে ডায়মনকাটা মল।

চারুশশী। আমি যে ভাই, এই সে দিন পঞ্চাশ ভরি দিয়া চরণ-পদ্ম গড়াইয়াছিলাম। এখনও যে সেক্‌রার সব দেনা শোধ হয় নাই।

বিমলা। কে নিলে ভাই? কিরূপে বাড়ী ফিরিব? শাশুড়ি যে বকিয়া অনর্থ করিবে।

খোঁজ, খোঁজ চারি দিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। বাতির বিগলিত শ্বেতবিন্দুর দ্বারা গৃহতল অলঙ্কৃত করিয়া সকলে পাতি পাতি খুঁজিল। যে চুরি করিয়াছিল, সেও কত খুঁজিল; কিন্তু সে আভরণসকল আর প্রাপ্ত হওয়া গেল না। তখন সকলে অনুমান করিতে লাগিল, "লইল কে?" এ বাসর-গৃহ হইতে ত কেহই বাহিরে যায় নাই, কেবল বরই বাহিরে গিয়াছে। যাহারা গৃহে আছে, তাহাদের মধ্যে ত কাহারও নিকট এ অলঙ্কার নাই। গহনাসকল হস্ত পদবিশিষ্ট নহে, যে ছুটিয়া পলাইবে, কর্পূর নহে, যে উবিয়া যাইবে; তাহাদের পক্ষ নাই যে আকাশপথে পলায়ন করিবে। কোথায় গেল? কে লইল? ভাবিতে ভাবিতে প্রভাত হইয়া গেল।

প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া, ঘুমঘোর আঁখি লইয়া, নিশীথ ঘটনাবলীর ইতিহাস হৃদয়-মধ্যে রচনা করিয়া পল্লী-মনোমোহিনীগণ দিক্‌বিদিকে আপন আপন গৃহপথ অনুসরণ করিল। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের রচিত মনোরম ইতিবৃত্ত বিবৃত করিল।

শুনিয়া, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝিল যে, জমীদার বাবুর জামাতাটি যমদূতের ন্যায় কদাকার। এবং নিতান্ত বোকা, যেহেতু বাসর ঘরে একটিও কথা কহিতে

পারে নাই ; এবং বিদ্যাহীন, যেহেতু কেবল মাত্র একটি কুড়ি টাকা বেতনের সামান্য চাকুরী করিয়া থাকে, এবং দরিদ্র যেহেতু অঙ্গুলিতে হীরার আংটী বা বক্ষে সোনার চেন কেহই দেখে নাই। এবং চোর, যেহেতু হারু ঠান্‌দিদির ন্যায় বুদ্ধিমতী রসিকা স্ত্রীলোক তাহার মুখ দেখিবামাত্র বলিয়াছিল যে, বরটী নয়ত যেন চোরটি ; আর সে বাসর ঘর হইতে চলিয়া আসার পর হইতেই অলঙ্কারগুলি অন্তর্হিত হইয়াছিল ; এবং লম্পট যেহেতু সে নিভৃত স্থানে অম্বিকাকে লইয়া তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মুখচুম্বন করিয়াছিল। অতএব স্থির হইয়া গেল যে, মানদার বিবাহ দেওয়া হয় নাই ; তাহাকে এক প্রকার জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আর অম্বিকা সম্বন্ধে গ্রামবাসীরা অনেক যুক্তি-তর্কের পর স্থির করিলেন যে, কেবল মাত্র ঘোর কলির প্রভাবেই এরূপ স্ত্রীলোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদি আইন এবং পুলিশের ভয় না থাকিত, এবং যদি ইতিপূর্ব্বেই নাপিত ধোবা ও গয়লা বন্ধের ব্যবস্থাটা না হইয়া যাইত, তাহা হইলে নাপিতের দ্বারা উহার মস্তকমুণ্ডন করিয়া এবং ধোবার নিকট হইতে গাধা লইয়া তাহার উপর চড়াইয়া এবং গয়লার নিকট হইতে ঘোল সংগ্রহ করিয়া উহার মাথায় ঢালিয়া ভগ্ন কুলোর বাতাস দিয়া তাহারা কুলটা অম্বিকাকে গ্রামের বাহির করিয়া দিত। কিন্তু ইহা করিতে না পারিয়া কর্ত্তারা আপন আপন অন্তঃপুর মধ্যে আসিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উচ্চ করিয়া স্ত্রী-কন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া এই শাসনবাক্য প্রচার করিলেন যে, 'খবরদার ! তোমরা আর কেহ অম্বিকার ছায়া স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

হায় ! অবোধ গ্রামবাসীরা জানিত না যে, প্রতিভাময়ী পুণ্যময়ী [illegible]গী অম্বিকার দেহ ছায়াহীন স্বর্গের আলোকে অহর্নিশ আলোকিত ছিল। দেবতাদিগের অমর দেহের ন্যায় সে দেহের ছায়া ছিল না। সে যেস্থানে আসিয়া দাঁড়াইত, রূপপ্রভার পুণ্যচ্ছটায় সে স্থানটা প্রভাসিত হইয়া উঠিত।

৩১

বিবাহের পরদিন প্রভাতে, গ্রামের পাঁচ জন ভদ্র ব্যক্তিকে সাক্ষ্য রাখিয়া, উপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিয়া রত্নেশ্বরবাবু নাড়িচা গ্রামখানি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ গদাধরকে দান করিলেন।

পূর্ব্বেই স্থির ছিল যে, নাড়িচা গ্রামেই গদাধরের বৌ-ভাত হইবে। তজ্জন্য বৃদ্ধ উমাকালী চক্রবর্ত্তী সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। গদাধরের পৈতৃক বাটী উত্তমরূপে সংস্কৃত হইয়াছিল। এবং বহির্বাটীর এবং ভিতরবাটীর অঙ্গনে তালপত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত দুইটী বৃহদাকার অস্থায়ী মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সব উদ্যোগ সমাধা করিয়া উমাকালী গদাধরের বিবাহ দেখিবার জন্য কালীদহ গ্রামে আগমন করিয়াছিল। যৌতুক-দান-কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইবার পর, সে গদাধরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবাজি ! তুমি বধূমাতাকে লইয়া পশ্চাৎ আসিও। আমি অগ্রে চলিলাম। বরকন্যার গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময়, বধূকে লইয়া কতদিন পরে গদাধর আবার আপন বাটীতে প্রবেশ করিল। গৃহদ্বারে লগ্নপদে মলিন বস্ত্র পরিয়া উমাকালী দাঁড়াইয়া ছিল। গদাধরকে দেখিয়া বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মধু ভাই, কোথায় তুমি ? তোমার গদাই বধূ লইয়া গৃহে আসিয়াছে। তুমি এস ভাই, আসিয়া তোমার কার্য্য কর ;—পুত্র এবং পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যাও।” অনল প্রবাহসম অশ্রুধারা গদাধরের গণ্ড বহিয়া প্রবাহিত হইল;—দ্বারদেশে বসিয়া, মস্তকে হাত দিয়া, সে কাতরকণ্ঠে ডাকিল, “বাবা গো।”

মুলী মানদার সহিত আসিয়াছিল। যে গাড়ীতে মানদা ছিল, সে তাহারই ভিতর বসিয়াছিল। সে বাহির হইয়া, এবং বাহু বেষ্টিত সুবর্ণের অনন্তটি বাহির করিয়া, মানদার বাহু ধরিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। দেখিল, দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া উমাকালী রোদন করিতেছে। তাহার মলিন বেশ এবং পাদুকা-বিহীন পদ দেখিয়া, জমীদারদিগের বাটীর পুরাতন ‘ঝি’ স্থির করিতে পারিল না যে, ঐ ব্যক্তিটি কোন ভদ্রলোক হইতে পারেন। বহুকাল জমীদারদের বাটীতে থাকিয়া তাহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মানুষ ধোবা ও মুচির সাহায্য ব্যতীত ভদ্রলোক হইতে পারে না। অতএব সে উমাকালীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আ-মর, অলক্ষণে মিন্‌সে! দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিস্ কেন? এখন ক’নে বাড়ীতে ঢুকিতেছে, এ সময় চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস্ কেন?”

কথাটা গদাধরের কাণে গেল। পত্নীর পরিচারিকার হৃদয়হীন আস্পর্দ্ধা সে আপন কাতর হৃদয়মধ্যে অনুভব করিল। হায়! কি সাহসে এই নির্লজ্জা তাহার পিতৃস্থানীয় পরম সুহৃৎকে অবজ্ঞার ভাষায় অপমানিত করিল! বিরক্তিবিজড়িতকণ্ঠে গদাধর মুলীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “দাঁড়াও।”

মুলী মানদার বাহু ধরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “কেন গা জামাইবাবু, আমরা দাঁড়াইব কেন?”

গদাধর তাহার চক্রবর্ত্তী কাকাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, “ইহাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে।”

মুলী অবাক্ হইয়া গদাধরের মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, সে মুখ দিয়া যে আদেশ নির্গত হইয়াছে, তাহা অমান্য করিবার সাধ্য তাহার নাই। অগত্যা সে এবং মানদা উমাকালীর পদে প্রণতা হইল। কিন্তু এই ঘটনায় মুলী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল; এবং এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার একটা ইচ্ছা সে মনোমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে গদাধরের তৃণাচ্ছাদিত সামান্য মৃন্ময় গৃহে প্রবেশ করিয়া বুঝিল যে, তাহার বুকের নিধিকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে;—এ গৃহে রাজরাণীর কন্যা কিরূপে বাস করিবে? গ্রাম দেখিয়া, মুলী ভাবিল, “ও মা! ও মা! এ গ্রামে নাকি মনিষ্যি বাস করিতে পারে।”

পরদিন কুশণ্ডিকা ও পাকস্পর্শ হইল। গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া গদাধরের বাটীতে আহার করিল। সকলেই বলিল, এরূপ সুপক্ক আহারসামগ্রী তাহারা বহুকাল ভক্ষণ করে নাই।

তাহার পরদিন গদাধর তাহার চক্রবর্ত্তী-কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, “চক্রবর্ত্তী কাকা, আপনি যদি কয়েকটা বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।”

চক্রবর্ত্তী-কাকা। কি ভার গ্রহণ করিব, বল।

গদাধর। আপনি শুনিয়াছেন যে, এই নাড়িচা গ্রামখানি, আমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী। শুনিয়াছি বই কি?

গদাধর। আমি কাগজ পত্র দেখিয়া বুঝিলাম যে এই গ্রামে বৎসরে তের শত টাকা খাজানা আদায় হইয়া থাকে। ইহা

হইতে প্রায় পাঁচ শত টাকা বার্ষিক সদর মালগুজারি দিতে হয়। বাকী আট শত টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। খাজানা আদায়ের এবং কিস্তি কিস্তি মালগুজারি দাখিলের ভার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

চক্রবর্ত্তী। ইহা ত অতি সহজ কথা। আমি খাজানা আদায় করিব, মালগুজারি দিব, এবং মুনাফার টাকা কলিকাতাতে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব।

গদাধর। না, এই মুনাফার টাকা, আমি আমার কয়েকটি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিতে চাই।

চক্রবর্ত্তী। কি ব্যয়?

গদাধর। প্রথম দুই বৎসরের ১৬০০৲ টাকা মজুদ্ হইলে. উহার দ্বারা একটি ভাল রকম আটচালা প্রস্তুত করাইতে হইবে।

চক্রবর্ত্তী। আটচালা কোথায় প্রস্তুত করাইব?

গদাধর। কেশব কামারের ভিটা, যাহাতে মোট এক বিঘা আট কাঠা জমী আছে, বাবা বাগান করিবার জন্য খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন। দাম হইয়াছিল তিন শত টাকা। কিন্তু বাবার হাতে তখন তিন শত টাকা না থাকায়, ঐ জমী ক্রয় করিতে পারেন নাই। ঐ ষোল শত টাকা হইতে তিন শত টাকা লইয়া, ঐ জমী ক্রয় করিতে হইবে। ঐ জমীর চারি পার্শ্বে সাত আট শত টাকা খরচ করিয়া একটি ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দিতে হইবে। এবং তন্মধ্যে ফুলগাছের বাগান প্রস্তুত করিয়া ঐ বাগানের এক ধারে পাঁচ ছয় শত টাকায় আটচালাটি বাঁধিতে হইবে।

চক্রবর্ত্তী। তাহার পর?

গদাধর। ছয় বৎসর হইতে বার বৎসর বয়সের ছেলে গ্রামে কয়টি আছে?

চক্রবর্ত্তী। আমার অনুমান হয় ত্রিশ চল্লিশ জনের বেশী হইবে না।

গদাধর। এই ত্রিশ চল্লিশ জন বালককে প্রত্যহ দু'পর বেলায় ঐ আটচালার মধ্যে একত্রিত করিতে হইবে।

চক্রবর্ত্তী। বাবাজি, এইটী অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। এই ক্ষুদে ছেলেগুলা তোমার চক্রবর্ত্তী-কাকাকে মোটেই গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তুমি যখন বলিতেছ, তখন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। আমার মনে হয়, কিছু বাতাসা ও মুড়্‌কি খরচ করিতে পারিলে এ কার্য্য সহজ হইবে।

গদাধর। বেশ, প্রত্যহ আট আনার বাতাসা ও মুড়্‌কি খরিদ করিয়া ছেলেদের খাইতে দিবেন।

চক্রবর্ত্তী। প্রত্যহ এ কার্য্য করা কি আমার ন্যায় বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব হইবে?

গদাধর। তাহা কি কখনও সম্ভব হয়? আপনি অশ্বিনী সরকারকে জানেন। আমি তাহাকে এই কার্য্যের ভার দিব।

চক্রবর্ত্তী। বাপু হে, অশ্বিনী সরকার কায়স্থ সন্তান এবং লেখাপড়া জানে। সে কি কিছু বেতন গ্রহণ না করিয়া এ কার্য্য স্বীকার করিবে?

গদাধর। বেতন দিতে হইবে বই কি। বোধ হয়, পঁচিশ টাকা বেতনেই সে এই কার্য্য এবং ছেলেদের একটু একটু লেখাপড়া শিখানর কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইবে।

চক্রবর্ত্তী। খুব, খুব।

গদাধর। তাহা হইলে, আমার বার্ষিক আট শত টাকা মুনাফা, তৃতীয় বৎসর হইতে এইরূপে খরচ হইবে,—

মুড়্‌কি বাতাসা মাসে পনের টাকা হিসাবে—	১৮০৲
অশ্বিনী সরকারের বেতন মাসে পঁচিশ টাকা হিসাবে—	৩০০৲

তাহার পর যে তিন শত কুড়ি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার দ্বারা আপনি আপনার ইচ্ছামত গ্রামের পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইবেন এবং আমার বাটীটি আবশুকমত মেরামত করাইবেন।

আয় ব্যয় সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী-কাকার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত সমুদয় সমাধা করিয়া, নববধূকে লইয়া গদাধর কালীদহ গ্রামে শ্বশুর বাটীতে বিবাহের প্রথা অনুযায়ী আগমন করিল। এবার রত্নময়ী বাধ্য হইয়া জামাতার কিছু আদর করিল। ভাবিল, হিন্দুর ঘরের বিবাহ ত ফিরিবার নহে। কিন্তু যতবার সে জামাতার কৃষ্ণ-মুখ অবলোকন করিয়াছিল, ততবার তাহার দারুণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পর মুলীর মুখে যখন সে গদাধরের কণ্টকবনবেষ্টিত পর্ণকুটীরের শব্দালঙ্কারসংবলিত বিবরণ শ্রবণ করিল, তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন মুলীর কথাগুলা একটা বিষধরের দেহ ধারণ করিয়া, তাহার বস্ত্রের ভিতর, তাহার দেহকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে বিসর্পিত হইতেছে। সে সর্পের শীতল স্পর্শে যেন তাহার শরীরের তপ্ত রক্ত জল হইয়া যাইতেছিল।

৩২

দুই চারি দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, গদাধর রত্নেশ্বর বাবুর নিকট আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "মহাশয়, আমি আগামী কল্য কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি অনুমতি করিলে যাইতে পারি।"

রত্নেশ্বর। কাল কখন্ যাইবে স্থির করিয়াছ?

গদাধর। বিকালে ঝড় বাদলের আশঙ্কা আছে। এজন্য মনে করিয়াছি, কাল প্রত্যুষেই যাইব।

রত্নেশ্বর। আহারাদি না করিয়া যাওয়া হইতে পারে না। আহারাদি করিয়া যাইতে হইবে।

গদাধর। ভাল, আহারাদি করিয়া যাইব। কিছু আগে আহার করিলেই চলিবে।

রত্নেশ্বর। যাইবার আগে, আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিব। আমি তোমার পিতৃস্থানীয়, আমার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে তোমার মঙ্গল হইবে।

গদাধর। কি করিতে হইবে বলুন।

রত্নেশ্বর। তুমি এখন কলিকাতায় যাইতেছ, যাও। কিন্তু দুই চারি মাসের পর, তোমাকে কালীদহে আসিয়া বাস করিতে হইবে। তুমি আমার জামাতা;— তোমার সামান্য চাকুরি বা ওকালতি করা হইবে না। আমি তোমার মাসহারা বরাদ্দ করিয়া দিব; তুমি এখানে আসিয়া বাস করিবে।

গদাধর। আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহা পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কয়েকটা কার্য্যের জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া কয়েক বৎসর কলিকাতাতে থাকিতেই হইবে। ইহা ছাড়া অলসভাবে বসিয়া মহাশয়ের অন্নধ্বংশ এবং মাসহারা ভোগ করা অপেক্ষা পরিশ্রমের দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করা আমার ভাল মনে হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে পরে আমি আপনার উপদেশ লইয়া কার্য্য করিব।

রত্নেশ্বর। তাই ভাল। তবে মনে রাখিও যে, আমার জামাতা হইয়া, তোমার চাকুরী বা ওকালতি করা হইবে না।

পরদিন আহারাদি করিয়া নৌকা চড়িয়া গদাধর কলিকাতা রওনা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার নৌকারোহণের পূর্ব্বে যে একটা ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা লিপিবদ্ধ করি। [illegible] করি।

বেলা দশটার সময়, জামাতা আহারে বসিলে, রত্নময়ী এক পরিচারিকাকে কহিয়াছিলেন যে, পূর্ণিমা উপলক্ষে অদ্য তিনি গঙ্গাস্নানে যাইবেন। পরিচারিকা বুঝাইয়া দিল যে, যদি গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য জামাতার বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই সমাধা হওয়া আবশ্যক ; কারণ কেহ বাটী হইতে যাইবার পর, বাটীর গৃহিণী স্নান করিলে যাত্রী ব্যক্তির অকল্যাণ হয়। কাজেই রত্নময়ী ত্বরিত-পদে গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন। তাঁহার সহিত দুইজন পরিচারিকা বস্ত্রাদি লইয়া এবং একজন দ্বারবান্ স্কন্ধে দীর্ঘ বংশযষ্টি বহন করিয়া চলিয়াছিল।

চাঁদনি ঘাটের পার্শ্বে একটি বৃহদাকার বটবৃক্ষ ছিল। বটবৃক্ষের তলায় একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপের উপর, চন্দন ও ঘৃতাদি লিপ্ত, এবং বিল্বপত্র ও পুষ্পাদি আচ্ছাদিত মসৃণদেহ একখণ্ড শিলা স্থাপিত ছিল। কোন্ অনাদি কাল হইতে এই শিলা সেই স্থানে স্থাপিত ছিল তাহা গ্রামের কোনও বৃদ্ধ লোক অবগত ছিল না। এই শিলাটি কালেশ্বর মহাদেব এই উপাধি ধারণ করিয়া অনাদি কাল হইতে গ্রামবাসীর ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করিত। হায়! হায়! সেই পদহীন প্রস্তরখণ্ডের পদতলে না জানি কত বিমল ভক্তিপুষ্প অনাদিকাল হইতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল ; মস্তকহীন সেই প্রস্তরখণ্ডের মস্তকে, আমাদের লোলুপ জিহ্বাকে বঞ্চিত করিয়া, না জানি, কত রাশি রাশি নবনীত, তক্র, দধি এবং এবংবিধ কত উপাদেয় এবং সুধাসম খাদ্যসামগ্রী বর্ষিত হইয়াছিল।

স্নান সম্পন্ন করিয়া, রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, সুকুন্তলা রত্নময়ী ক্ষুদ্র রৌপ্যাধারে পবিত্র গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া, কালেশ্বর মহাদেবের তপ্ত মাথা, গঙ্গাজল-বর্ষণে শীতল করিবার মানসে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পান নাই যে, একটা বৃহদাকার বৃষ পূর্ব্বোল্লিখিত মৃন্ময় বেদিকার পার্শ্বে শুইয়া, প্রভু মহাদেবের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। রত্নময়ীকে সমাগত দেখিয়া, দেবতার বাহন শ্রীমান্ ষণ্ডেশ্বর জমীদার গৃহিণী বলিয়া কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করিল না। অপিচ, গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার রক্তাম্বরবেষ্টিত কোমল গাত্র বিদ্ধ করিবার জন্য, আপনার সূক্ষ্মাগ্র শৃঙ্গদ্বয় ঋজু করিয়া, রত্নময়ীর দিকে অতি বেগে ধাবিত হইল।

রত্নময়ীর শরীর রক্ষা করিবার জন্য যষ্টি স্কন্ধে লইয়া, তাহার সহিত যে দ্বারবান্ আসিয়াছিল, সে, এরূপ কালে অন্য দ্বারবান্গণ যাহা করিয়া থাকে, তাহাই করিল। এরূপ অর্ব্বাচীন ক্রোধোন্মত্ত ষণ্ডকে যষ্টির তাড়না করা বৃথা জানিয়া, যষ্টিটি ষণ্ডেশ্বরের পদে আশু উপহার দিয়া বটবৃক্ষের রজ্জু-শাখা গ্রহণ করিয়া উপরে উঠিয়া, সে একটি বৃহদাকার কুষ্মাণ্ডের ন্যায় ঝুলিতে লাগিল। সঙ্গিনী পরিচারিকা দু'টী প্রভুপত্নীর এবংবিধ বিপদ্ দেখিয়া, যেন শোকাবেগে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য, পবনগতিতে আসিয়া গঙ্গাজলে ঝম্প প্রদান করিল।

একাকিনী অসহায়া রত্নময়ী প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। তাঁহার আলুলায়িত কুন্তলরাশি পবনবেগে উড়িল। রক্ত বসনাঞ্চল চরণতলে লুটিল।

আহারাদি সমাপন করিয়া, কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বে, গদাধর শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য অন্তঃপুরমধ্যে আগমন করিয়াছিল। সে তথায় আসিয়া শুনিল

যে, রত্নময়ী গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নৌকারোহণ করিতে পারিবে, মনে করিয়া গদাধর বাটী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিল। তাহার পেটকাদি ভৃত্যগণ পূর্ব্বেই বহন করিয়া নৌকায় রাখিয়া আসিয়াছিল।

পথিমধ্যে বিপদ্‌গ্রস্তা রত্নময়ীকে দেখিয়া গদাধর বিপুলবেগে বৃষভের উদ্যত শৃঙ্গের পার্শ্বে আসিয়া, হস্তদ্বারা সবলে তাহা গ্রহণ করিল। পরিত্রাণ লাভ করিয়া অবসন্নদেহা রত্নময়ী পথিমধ্যে বসিয়া পড়িলেন এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার জামাতা অমানুষিক শক্তি আপন বিশাল কৃষ্ণ বাহুতে প্রকটিত করিয়া, দৃঢ় মুষ্টিতে বৃষের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বৃষটা বহু চেষ্টা করিয়াও আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বলা বাহুল্য, জামাতার মহাবলশালী দেহ দেখিয়া এবং তাহাকে আপন উদ্ধারকর্ত্তা মনে করিয়া, তাহার প্রতি রত্নময়ীর পূর্ব্ব ঘৃণাটা কিঞ্চিৎ উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ষণ্ডকে বিমুখ করিয়া, গদাধর নিকটে আসিয়া, শ্বশুড়ির পদে প্রণত হইয়া কহিল, "মা, আপনি অনুমতি করুন, আমি কলিকাতায় যাই।" রত্নময়ী কহিলেন, "এস, বাবা।"

জামাতাকে বিদায় দিয়া রত্নময়ী বাটী ফিরিয়া আসিল। কিয়ৎকাল পরে পরিচারিকাদ্বয় এবং দ্বারবান্‌টি, আপনাদের সুবুদ্ধি এবং পরাক্রম সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প রচনা করিয়া গৃহে ফিরিল। দ্বারবান্ সরকারের নিকট কহিল যে, যষ্টির আঘাতে সে ষণ্ডকে নিশ্চয় যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিত, কেবল শিবের বাহনকে হিন্দু হইয়া মারা উচিত নয়, এই জন্ত সে মারে নাই।

বিদায় লইয়া, গদাধর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবার পর, কালীদহ গ্রামটি তাহার গুণাগুণের আলোচনায় বিশেষরূপ মুখরিত হইয়া উঠিল। যদু রামকে বলিল, "বাবুদের জামাইটি যেন একটি আস্ত কসাই; বাবা কালেশ্বরের ষাঁড়টাকে আধ-মারা করিয়াছে; দ্বারবান্‌টা না থাকিলে, বোধ হয় একেবারে মারিয়া ফেলিত।" হরি, গোপালকে বলিল, "বাবুদের জামাইটিকে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে ডাকাতি না করিয়া, সে চুরি করিয়াছে, ইহা গ্রামের লোকের চৌদ্দ পুরুষের পুণ্য।" মন্মথ মাধবকে বলিল, "বাবুদের জামাইটি শিবের ষাঁড়কে রেয়াৎ করে নাই; আমাদেরই কি আর ছাড়িয়া দিবে? বাগে পেলেই পকেট হইতে পয়সা কাড়িয়া লইবে। অতএব সাবধান সবাই।" কর্ত্তা গিন্নিকে বলিলেন, "বুঝছ, ভায়ার মৃত্যুর পর হইতে মেজ বৌটাকে লইয়া আমি বড় বিব্রত হইয়াছি। আমি ঘরের লোক, স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ওর যত লজ্জা আমার কাছে। তুমি উহাকে বিশেষরূপে বারণ করিয়া দিও, ও যেন বাবুদের জামায়ের সম্মুখে না বাহির হয়। শুনিলাম, ছুঁচো বেটা নাকি মেজ বৌকে দেখে হেসেছিল।" তরুবালা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া, তাহার গাল টিপিয়া বলিল, "ও লো, রোজ যেত লো, রোজ যেত। এমন কুচরিত্রের জামাইত ভাই, আমি কখন দেখি নাই। আমার গায়ে যেন কাঁটা দেয়। আর অম্বিকারই বা কি বুকের পাটা। দিন দু'পরে বাড়ীতে লইয়া গিয়া, বুড়ো বাপের সামনে —ছি, ছি, ছি।"

কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া মুনী অম্বিকাঘটিত কথাটা মানদাকে শুনাইল। তাহা মানদার এক শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া

অন্ত শ্রবণ পথ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মানদার হৃদয় থাকিলে, হয়ত কথাটা তাহার হৃদয়ে স্পর্শ করিত; কিন্তু তাহার ত হৃদয় ছিল না। মৎস্য ভক্ষণের জন্ত, অলঙ্কার পরিধানের জন্ত, সধবার শত সুবিধা উপভোগ করিবার জন্ত, মানদার একটি স্বামীর প্রয়োজন আছে, স্বামীকে ভালবাসিবার প্রয়োজন ছিল, স্বামীর ভালবাসা না পাইলে দুঃখিত হইবার আবশ্যক আছে, এরূপ জ্ঞান বালিকা মানদার হৃদয়মধ্যে তখনও উদিত হয় নাই। কেবলমাত্র জীবিত থাকিয়া তাহার মৎস্যাহারের এবং ভূষণধারণের সুবিধা করিয়া দিয়া, স্বামী যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুক, তাহাতে মানদার আপত্তি ছিল না। তাহার নিকট, স্বামীর স্নেহ লাভ করা অপেক্ষা আভরণ এবং মৎস্য-পুচ্ছের সমাদর অধিক ছিল। আমাদের ভরসা আছে, একটু বয়স হইলে, বালিকা মানদার এ দোষটা কাটিয়া যাইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীমঙ্গল-কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

ত্রিপদী।

পুনি কালিদাসে, মুনিতে জিজ্ঞাসে,
বিনয় করিয়া অতি।
কহ তথা মুনে, গেলেন কেমনে,
রসাতলে ভাগীরথী॥
বলে মুনিবরে, যে হৈল তৎপরে,
শুন বলি সাবহিতে।
নৃপে কৃপা করি, হর্ষে সুরেশ্বরী,
তূর্ণ চলে তথা হৈতে॥
তবে নৃপমণি, করি শঙ্খধ্বনি,
আগে আগে চলি যায়।
গঙ্গা মনোরঙ্গে, হিল্লোল তরঙ্গে,
পাছে অতি লঘু ধায়।
দিলে পথ ক্রমে, জহ্নুর আশ্রমে,
গঙ্গা যান কুতূহলে।
কুশ তিল যব, ভাসি গেল সব,
অত্যন্ত তরঙ্গ জলে॥
কুপি জহ্নুমুনি, ধ্যানে বার্ত্তা জানি,
গঙ্গার এমত কার্য্য।
অঞ্জলিতে পূরি, মুনি পিয়ে বারি,
দেখি ধন্দ(১) মহারাজ॥
হৈল জল লোপ, মুনি কাছে ভূপ,
চলিলেন শীঘ্র গতি
করি যোড় হাত, কৈলা প্রণিপাত,
শুন স্তুতি মহামতি॥
মোর পিতৃগণ, পাইয়াছে শমন,
ব্রহ্মশাপে ভস্ম হৈয়া।
বিনা গঙ্গা তার, নাই প্রতীকার,
এতেকে চলেছি লৈয়া॥
অপার হরিষে, যাই নিজ দেশে,
তাতে পথে তুমি বাদী।
জানি মোর দোষ, ক্ষমা কর রোষ,(২)
চরণে ধরিয়া সাধি॥
শুনি হেন বাণী, কৃপা করি মুনি,
রাজাকে দিলেন সায়।
অন্তরে আমার, রৈল জলধার,
বল করি কি উপায়॥

(১) অজ্ঞতা; ভ্রম। (২) রাগ।

মুখদ্বার দিয়া, বাহির করিয়া,
বদি সেই ভাগীরথী।
স্বর্গ মর্ত্ত স্থানে, এ তিন ভুবনে
বাস্ত(১) বলি হবে খ্যাতি॥
যদি গুহ্যদ্বারে, হইল বাহিরে,
সকলে কহিবে মল।
বলহ নৃপতি, ইহার যুকতি,
কিরূপে নিকাশি জল॥
রাজা বলে মুনি, তুমি মহাজ্ঞানী,
কি বুদ্ধি বলিব আমি।
যেরূপে ইহার, ঘটে প্রতীকার,
তেন কার্য্য কর তুমি॥
ইহা শুনি মুনি, ধ্যানে থাকি খানি,
জানু চিরে দ্বিজবরে।
আজ্ঞা পায়ে তার, গঙ্গা জলধার,
বার হৈল সেই দ্বারে॥
দেখি হেন কাজ, হর্ষে মহারাজ,
মুনিকে বন্দিয়া চলে।
অতি লঘুগতি, হৈল উপস্থিতি,
গঙ্গা রত্নাকর(২) কূলে॥
গঙ্গা পুছে বাণী, কহ নৃপমণি,
কোথা তব পিতৃগণ।
যুড়ি যুগ্ম করে, বলে নৃপবরে,
শুন মাতা নিবেদন॥
হেদে গো ভারতী, আমি হীনমতি,
ত্রাণ কর নিজ গুণে।
তোমার চরিত, করিয়া রচিত,
ভূপতি অনুজে ভণে॥

পয়ার।

তবে রাজা ভগীরথ যুড়ি দুই কর।
স্তুতি ভক্তি করি কহে গঙ্গার গোচর॥
কপিল মুনির ধ্যানে পাতাল নগর।
ভস্ম হৈয়া তথা আছে মোর পিতৃবর॥
তুমি যদি তথা যাও অনুগ্রহ করি।
তবে ত্রাণ পায় সব শুন মহেশ্বরী॥

(১) বদি; উদ্গীর্ণ। (২) সমুদ্র।

গঙ্গা বলে তথা যাইতে নাহিক সরণি। (১)
কি উপায় করি এবে কহ নৃপমণি॥
রাজা বলে অন্য পথ নাই যাইবারে।
প্রবেশ করহ মাতা গভীর সাগরে॥
এত শুনি ভাগীরথী শতমুখী হৈয়া।
রসাতলে গেলা দ্রুত সাগরে পড়িয়া॥
সেই ভস্ম স্পর্শ যাইয়া কৈলা গঙ্গাজলে।
মুক্ত হৈয়া রাজা সব বৈকুণ্ঠেতে চলে॥
উর্দ্ধবাহু নাচে রাজা মন আনন্দিতে।
ঘোষণা হইল বহু এ তিন জগতে॥
মনুজ (১) মাঝারে হেন কীর্ত্তি আছে কার।
হয়না হয়েছে নাই হইবে না আর॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা শুনি কালিদাসে।
পুনরপি যোড় হাতে মুনিতে জিজ্ঞাসে॥
পূর্ব্বে আজ্ঞা কৈলা লক্ষ্মী হইলা তুলসী।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহা ঋষি॥
মুনি কহে শুন দ্বিজ হৈয়া সাবধান।
বলি পূর্ব্ব ইতিহাস পুণ্য উপাখ্যান॥
দম্ভনামে মহাবল ছিল দৈত্যবর।
পুষ্করেতে তপ করে ভাবি গদাধর॥
এক পায়ে লক্ষ বর্ষ রৈল অনাহারে।
দিবানিশি ভাবে হরি আপন অন্তরে॥
তাহার উৎকট তপে হর্ষ হৈয়া হরি।
আসিলা সাক্ষাতে তার দেব গিরিধারী॥
তুষ্ট স্থানে দম্ভ স্থানে বলে নারায়ণে।
লও বর দৈত্য রায় যেই ইচ্ছে মনে॥
দতিসুত বলে মোরে দেও এই বর।
তুমি আসি পুত্র হৈয়া জন্ম মোর ঘর॥
হব বলি অন্তর্ধান হৈলা জনার্দ্দন।
দম্ভ দৈত্যপতি গেলা আপন ভবন॥
তদন্তরে যেই হৈল শুন দ্বিজবর।
যথাকালে একদিন গোলক নগর॥
কুপিতা রাধিকা শ্রীদামের দোষ দেখি।
হইতে অসুর শাপ দিলা চন্দ্রমুখী॥

(১) পথ[illegible]

শ্রীদাম তাপিত মন শুনি হেন বাণী।
রাধিকাকে করে স্তুতি যুড়ি যুগ্মপাণি॥
তুষ্ট হৈয়া রাধা বলে শুনহ গোপাল।
অসুর হইয়া যাইয়া থাক কত কাল॥
না হইয়া ব্যস্ত মোর শুনহ যুকতি।
পুষ্করে পায়েছে বর দম্ভ দৈত্যপতি॥
বিষ্ণু অংশে তার ঘরে হইতে নন্দন।
অতি তূর্ণ তুমি তথা করহ গমন॥
কালান্তরে শিব হস্তে হইয়া সংহার।
মুক্ত হৈয়া স্বস্থান পাইবা আপনার॥
ইহা শুনি কষ্ট ভাবি চলিলা শ্রীদাম।
উপনীত হৈলা আসি অসুরের ধাম॥
তৎকালে বনিতা তার হৈল ঋতুমতী।
শুভ যোগে দম্ভাসুরে করিল সুরতি॥
শ্রীদাম প্রবেশে গর্ভে সেইত সংযোগে।
দশমাস গর্ভবাস নিজ কর্ম্মভোগে॥
বিংশতি পক্ষেতে পূর্ণ কাল উপজিল।
সর্ব্ব সুলক্ষণ এক কুমার জন্মিল॥
দেখি দম্ভ দৈত্যপতি হরিষ অপার।
শঙ্খচূড় অভিধান হইল তাহার॥
পুনি কালিদাস স্থানে বলিলেন ঋষি।
শুন লক্ষ্মী যেন মতে হইল তুলসী॥
সুধর্ম্ম অ খ্যান ধর্ম্মবন্ত নরপতি।
কালক্রমে নারী তার হৈল গর্ভবতী॥
কলাংশেতে সেই গর্ভে প্রবেশে কমলা। (১)
শুভযোগে রাণী এক কন্যা প্রসবিলা॥
সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা অতি অনুপম।
তুলসী বলিয়া তার তাতে (২) থৈল নাম॥
কালক্রমে এথা শঙ্খচূড় দৈত্যনাথে।
ব্রহ্মা আরাধন হেতু চলে বিপিনেতে॥ (৩)
বিষম উৎকট তপ করয়ে অসুরে।
প্রসন্ন হইয়া বিধি আসিলা গোচরে॥
লহ বর যেই ইচ্ছা বলে পদ্মযোনি। (৪)
কহে দৈত্য শঙ্খচূড় যুড়ি যুগ্মপাণি॥

(১) লক্ষ্মী। (২) পিতা। (৩) বনে। (৪) ব্রহ্মা।

এই নিবেদন প্রভু বলি তব স্থানে।
জয়ী হৈতে দেও বর এ তিন ভুবনে॥
তথাস্তু বলিয়া ধাতা গেলা নিজ ঘরে।
বর পায়া দৈত্য গেল আপন বাসরে॥ (১)
তথাতে তুলসী দেবী ব্রহ্মাকে ভাবিয়া।
মহাতপ আরম্ভিল অরণ্যে বসিয়া॥
শঙ্খচূড় হৈতে পতি করিয়া কামনা।
দিবা বিভাবরী (২) করে ব্রহ্মা আরাধনা॥
হইল শরীর শুষ্ক শিরে জটাজাল।
না পরে অম্বর (৩) বামা সবে বৃক্ষছাল॥
না করে অশন (৪) কিছু থাকে অনাহারে।
উদক (৫) ভিতরে বসি থাকে যে শিশিরে॥
নিদাঘেতে চারি দিকে অনল জ্বালিয়া।
প্রচণ্ড তপনতাপে থাকয়ে বসিয়া॥
স্পন্দন নাহিক দেহে মুদ্রিত লোচন।
বল্মীক (৬) কীটেতে তনু কৈল আচ্ছাদন॥
হেন মতে উগ্র তপ করয়ে যুবতী।
বহুকালে প্রসন্ন হইলা পজাপতি (৭)॥
দেখিয়া সুন্দরী তূর্ণ হৈয়া যোড়হাত।
লুটায়ে ধরণী ধনী (৮) কৈল প্রণিপাত॥
বলিলা বিরিঞ্চি (৯) বর লও ইচ্ছামতে।
যোড়পাণ হৈয়া বামা লাগিল কহিতে॥
শঙ্খচূড় হৈতে পতি মোকে দেও বর।
তোমার চরণে এই নিবেদন মোর॥
ব্রহ্মা বলে হবে পতি শঙ্খ দৈত্যপতি।
বলয়ে তুলসী পুন করিয়া কাকুতি॥
দিলা এই বর যদি মোকে কৃপা করি।
পতিকে অমর বর দেও অধিকারী॥
ব্রহ্মা বলে না কহিব অমর হইতে।
লও আর বর তোর ইচ্ছা যেহি চিতে॥
তুলসী বলিল প্রভু ভাণ্ডিলে আমারে।
অবশ্য অসুরে হিংসা করয়ে অমরে॥

(১) গৃহে। (২) রাত্রি। (৩) বস্ত্র। (৪) ভক্ষণ।
(৫) জল। (৬) উইপোকা। (৭) ব্রহ্মা।
(৮) যুবতী স্ত্রী। (৯) ব্রহ্মা।

দেবের দারুণ চক্র কে পারে বুঝিতে।
শঙ্খচূড় বুঝি নষ্ট হবে অচিরেতে ॥
তবে প্রজাপতি বলি চরণে তোমার।
যাবত সতীত্ব নষ্ট না হয় তাঁহার ॥
তাবত না হবে নাশ শঙ্খ দৈত্যপতি।
এই বর দেও ধাতা করিহে কাকুতি ॥
তথাস্তু বলিয়া চলি গেলা অজযোনি (১)।
হর্ষ মনে তপোবনে রৈলা সুবদনী ॥
শুন মাতা সরস্বতী মোর নিবেদন।
রাখিও চরণে যবে ধরয়ে শমন (২) ॥
আমি অতি হীন মতি পূর মোর আশ।
ভণে রাজসিংহ দ্বিজ নাম তব দাস ॥

ত্রিপদী।

দৃঢ় মনে কালিদাস, শুন ধর্ম্ম ইতিহাস,
যে বৃত্তান্ত হৈল তদন্তরে।
চড়িয়া মরাল (৩) যানে, চলে স্রষ্টা রঙ্গ মনে,
শঙ্খচূড় দৈত্যের বাসরে ॥
দেখি দৈত্য প্রজাপতি, আসি অতি দ্রুতগতি,
কৈল নতি অবনী লুটাইয়া।
সিংহাসন দিল আনি, বলি বহু স্তুতি বাণী,
বসাইল পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥
দৈত্য বলে পিতামহ, কিবা হেতু আইলা কহ,
মোর স্থানে কোন্ প্রয়োজন।
দেখিল চরণ তোর, সফল জীবন মোর,
পুণ্য ভাগ্য নাহিক গণন ॥
হর্ষ হৈয়া বলে ধাতা, শুন দৈত্য বলি কথা,
সুযজ্ঞের দুহিতা তুলসী।
ত্যজি ভোগ অভিলাষ, সার কৈল বনবাস,
তব লাগি হৈয়াছে তপস্বী ॥
আমি তাকে দিছি বর, গৃহিণী হইতে তোর
চল তূর্ণ দানব ঈশ্বর।
বলি মাত্র এই বাণী, (৪) অন্তরীক্ষ অজযোনি, (৫)
চলি গেলা আপন বাসর ॥

ব্রহ্মার আদেশ পাইয়া, শঙ্খচূড় চলে ধাইয়া,
অপার হরিষ রঙ্গমনে।
লঙ্ঘিয়া নানান স্থান, হৈল যাইয়া বিদ্যমান,
তুলসী সুন্দরী যেই স্থানে ॥
দেখিয়া সুযজ্ঞ-সুতা. দৈত্য স্থানে কহে কথা,
কেবা তুমি দেও পরিচয়।
যদি বল মিথ্যা ভাষ, শাপিয়া করিব নাশ,
সত্য মনে বলহ নিশ্চয় ॥
বলে শঙ্খ দৈত্যেশ্বর, দম্ভাসুর পিতা মোর,
শঙ্খচূড় মোর অভিধান।
মোর কাছে আসি ধাতা, কহিছে সকল বার্ত্তা,
এই হেতু আইল বিদ্যমান ॥
শুনিয়া দৈত্যের বাণী, চকিত হইয়া ধনী (১)
অন্তরে ভাবিত হৈয়া অতি।
কেবা বটে এই জন, নাহি জানি নিরূপণ,
সখী স্থানে বলেন যুবতী ॥
এই মত পরকারে, (২) দশানন সীতা হরে,
এ কথা শুনেছি রামায়ণে।
শুনি পুছে সখীগণ, কেবা বটে দশানন,
সীতাকে হরিল কি কারণে ॥
কহে সুযজ্ঞের সুতা, শুনহ অপূর্ব্ব কথা,
বাল্মীকির কাব্য মনোহর।
অযোধ্যা নগরে পুরী, সূর্য্যবংশ অধিকারী,
দশরথ নাম নৃপবর ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী নাম, দুই অতি অনুপম,
তৃতীয়েতে সুমিত্রা সুন্দরী।
পতিব্রতা মহা সতী, রূপে জিনে রম্ভা রতি,
এই তিন মুখ্য পাটেশ্বরী ॥
চারি পুত্র নৃপতির, বিষম সংগ্রামে ধীর,
জ্যেষ্ঠ রাম কৌশল্যা-নন্দন।
ভরত কৈকেয়ী সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত,
সুমিত্রার তনয় লক্ষ্মণ ॥
কনিষ্ঠ তাহার আর, মহা যোদ্ধাপতি সার,
শত্রুঘ্ন তাহার অভিধান।

(১) ব্রহ্মা। (২) যম।
(৩) হংস (৪) আকাশ (৫) ব্রহ্মা

(১) যুবতী স্ত্রী (২) রাবণ

খেলে খেলা চারি জন, হাতে ইক্ষু শরাসন,
কৈলা সবে মহা বলবান ॥
দেখিয়া রাঘববর, মনে ভাবে নরেশ্বর,
নৃপতির যোগ্য বটে রাম।
দশরথ হর্ষ মনে, কৈল সব আয়োজনে,
সংযমিতে রৈলা গুণধাম ॥
রাম হবে নৃপমণি, শুনিয়া কৈকেয়ী বাণী,
তূর্ণ চলে যথাকে ভূপতি।
কান্দিয়া রাজাতে বলে, রামকে তাড়িয়া ছলে,
রাজ্য দেও ভরতের প্রতি ॥
পূর্ব্বের স্মরিয়া পণ, ভূপতি চিন্তিত মন,
শ্রীরামকে দিলা বনবাস।
জানকী লক্ষ্মণ সাথ, বনে চলে রঘুনাথ,
কৈকেয়ীর পূর্ণ হৈল আশ ॥
বনে গেলা তিন জন, ব্যাকুলিত প্রজাগণ,
শোকে ভূপ ত্যজিল জীবন।
আসিয়া ভরত রাজ, করিয়া অন্ত্যেষ্টি কাজ,
যথা রাম গেলা দুই জন ॥
ভরত বলেন বাণী, শুন রাম রঘুমণি,
দেহ ত্যাগ কৈলা মহারাজ।
শুনি রাম দুঃখী অতি, বিধিমতে রঘুপতি,
কৈলা পরে শ্রাদ্ধ আদি কাজ ॥
রামে বুঝাইয়া বলে, দেশেতে ভরত চলে,
গেলা রাম দণ্ডক কানন।
রূপবতী হৈয়া ছলে, শূর্পণখা আসি মিলে,
মৈথিলীকে (১) করিতে অশন(২) ॥
তাহার বৃত্তান্ত জানি, আজ্ঞা দিলা রঘুমণি,
লক্ষ্মণে কাটিল নাসা কাণ।
কুপিয়া রাক্ষসী অতি, গেল চলি দ্রুতগতি,
সব কথা কহে খর স্থান ॥
শুন প্রভু রঘুপতি, মোর জ্ঞান হীন অতি,
ত্রাণ কর প্রভু নিজগুণে।
শ্রীরামের পদাম্বুজে, বন্দে জ্ঞানহীন দ্বিজে,
ত্রিপদীতে কৃপাম্বুজে জনে ॥

(১) সীতাকে (২) ভক্ষণ

পয়ার।

ভগিনীর অতিশয় দেখিয়া দুর্গতি।
খর নিশাচর হৈল কোপযুক্ত অতি ॥
আরক্ত লোচন গণ্ড কাঁপয়ে অধর।
কোপে তূর্ণ প্রেরে (৩) চতুর্দ্দশ নিশাচর ॥
না করিবে ব্যাজ লঘু চল পুণ্যজন।
আন সীতা বধি রাম সহিতে লক্ষ্মণ ॥
আজ্ঞা পায়ে চতুর্দ্দশ যাতুধান(৪) চলে।
যুদ্ধ সজ্জে রাঘবের কাছে যাইয়া মিলে ॥
দেখি অরি দাশরথি চাপে লৈয়া করে।
বেদাধিক দিক বাণে সুসন্ধান পূরে ॥
হেলে ইক্ষুদণ্ড যেন কাটে শিশুগণে।
তেনই রাক্ষস মৈল রাঘবের বাণে ॥
দেখিয়া রাক্ষসী চলি গেল শীঘ্রগতি।
খর স্থানে কহে গিয়া এসব ভারতী (৫) ॥
শুনি কোপে ডাকি বলে রাক্ষস ঈশ্বর।
মানুষে জিনিল সেনা আমার গোচর ॥
কার্ম্মুক (১) করিয়া করে উঠে কোপমনে।
আরোহণ কৈল তূর্ণ স্বর্ণের স্যন্দনে (২) ॥
দূষণ ত্রিশিরা (৩) দুই চলে মহারথী।
চতুর্দ্দশ সহস্র বরূথী (৪) স্ব-সংহতি ॥
যথায় রাঘব তথা হৈল উপস্থিত।
দেখি মনে দাশরথি হইলা বিস্মিত ॥
ভার্য্যার রক্ষক রাখি সুমিত্রানন্দন।
রণস্থলে তিষ্ঠে রাম হাতে শরাসন ॥
মার মার বলি কোপে ডাক ছাড়ে খরে।
পদাতি মানুষ একা আমার সমরে ॥
হেন বাণী শুনি সবে রামকে বেড়িয়া।
পূর্ণ কৈল চারি দিক বাণ বরষিয়া ॥
প্রাবৃষে (৫) পর্জ্জন্য (৬) যেন পর্ব্বতে বরিষে।
তেন অস্ত্র কুপি কোপে প্রমত্ত রাক্ষসে ॥
কিবা দিবা বিভাবরী (৭) নাহি পরিচয়।
অম্বরে (৮) অমরগণে ভাবিল সংশয় ॥

(৩) প্রেরণ করে (৪) রাক্ষস (৫) কথা।

(১) ধনুক (২) রথে (৩) [illegible] (৪) সেনা (৫) বর্ষাকালে (৬) মেঘ (৭) রাত্রি (৮) আকাশে

মহারণে চণ্ড (১) চাপ লৈয়া রঘুমণি।
অতি কোপে পুনঃপুনঃ টানেন শিঞ্জিনী(২)॥
বরিষে আয়ুধ প্রভু নিজ বাহুবলে।
কাটিয়া রাক্ষসী অস্ত্র চারি দিকে ফেলে॥

(১) তীক্ষ (২) ধনুর গুণ

অতি ক্রুদ্ধ পুন বাণ ফেলে রঘুনাথ।
সমরে শর্ব্বরীচর (১) করিলা নিপাত॥
সকল সংহারে সেনা সংগ্রামে রাঘবে।
অনিলে (২) কদলীবন যেমত মাধবে (৩)॥

(১) নিশাচর (২) বায়ু দ্বারা (৩) বৈশাখ মাসে

তুমিই ত সব।

তুমি ইত সব কল্লে এসে,
শান্তি টুকু গেল ভেসে,
ঘুরে বেড়াই দেশে দেশে,
ভাঙ্‌লে সোণার ঘর ;

অক্ষি দিয়ে বক্ষ ফুঁড়ে—
পড়্‌লে বসে হৃদয় যুড়ে,
পক্ষী মতন উড়ে উড়ে—
দিলাম তোমায় ভর !

হাস্‌লে যেন চন্দ্র উঠে ;
নয়নকোণে পদ্ম ফুটে ;
অলির মত ছুটে ছুটে—
তোমাতে বেড়াই ;

মায়ের কথা ভুলে গেলাম
পাগল পানা হয়ে পো'লাম ;
—কেমন তোমার অঙ্গ মোলাম--
ভাব্‌না হোল তাই।

বর্ষাকালে নদীর মত—
গর্ব্ব তোমার বাড়্‌লো কত !
ডুব্‌লো ছিল সুগুণ যত,—
উঠ্‌লো মানের তারা ;

পোড়্‌লো অলক চরণ চুমি,—
চরণ ভরে কাঁপ্‌লো ভূমি,
মনে মনে ভাব্‌লে তুমি
নীলাকাশের তারা।

যেদিন তোমার হোল বিয়ে ;
রঙিন টোপর মাথায় দিয়ে,—
পালকী করে এলাম নিয়ে,—
জাগ্‌লো কত আশা রে !

শিশু কালের সরল নারী,—
এম্‌নি হোলে অহঙ্কারী,—
আপন্‌ রূপে আপ্‌নি মরি ;—
ভাঙ্‌লে সাধের বাসা রে।

ভগ্নী ভা'য়ের খাওয়া পরা—
কষ্ট হোল সহ্য করা ;
থাক্‌লে হোয়ে জ্যান্তে মরা
টান্‌লে শেষে আমারে।

ধ্বংস এখন বাস্তু ভিটা ;
পড়ে নাক গোবর ছিটা ;
দেখ্‌ছো এখন কোন্‌টা মিঠা ?
চর্‌'ছে ঘুঘু খামারে !

কথায় কথায় অভিমান,—
পাহাড় ভলে নদীর বান ;
(এখন, আস্‌তে দেখে কাঁপ্‌ছে প্রাণ ;—
ভালবাসার ফলটা !

তারায় কোলে, ফুলে ফুলে,—
গগন যুড়ে ভু'ব ছিলে,
এম্‌নি শেষে করে দিলে—
চাই না তরে জলটা।

চাই না তোমায়, চাই না সুখ,
সঙ্গে নিব আসুক দুঃখ ;

—ভাঙ্গুক প্রেমের নেশাটুক—
তোমায় ভয়া সবইতো!
উচ্চ অমন আকাশ থেকে,
চাঁদের সুধায় ডুবিয়ে রেখে,
নিত্যি নূতন স্বপ্ন দেখে,—
লিখ্‌বো নাক কবিতা।
তুমিই ত সব গড়েছিলে,
তুমিই ত সব ভেঙ্গে দিলে—
সাগর সমান দুখে দিলে;
তোমায় বলিহারি!
আগে যদি জান্‌তে পেতাম,—
তবে কি এ বেকুব হোতাম,
গণক ডেকে গুণে নিতাম—
কেমন তুমি নারী!
তুমিই ত সব কলিকালে—
তোমায় বলিহারি!!

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

গুরু নানক এবং তাঁহার উপদেশ।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা নানকদেব লাহোরের পঞ্চদশ ক্রোশ পশ্চিমে তল্‌বণ্ডি নামক নগরে এক ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে সেই স্থান নানকানা নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন তথায় এক মেলা হইয়া থাকে। এক্ষণে নর্থওয়েষ্ট রেলের একটি শাখা উক্ত স্থানে পৌঁছিয়াছে। নানকের পিতার নাম কালুচাঁদ; মাতার নাম ত্রিপতা দেবী।

কালু গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর পাটওয়ারীর কার্য্য করিতেন। নানক বাল্যকালে সাধারণ বালকের ন্যায় ক্রীড়াসক্ত ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনতা ভালবাসিতেন এবং অতিশয় শান্তস্বভাব ছিলেন। পঞ্চবর্ষ বয়সে নানককে গোপাল পণ্ডিতের পাঠশালায় ধারাপাত শিখিতে নিযুক্ত করা হয়। যখন পণ্ডিত মহাশয় ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক ছাত্রকে পাঠ আরম্ভ করিতে বলেন, তখন নানক তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, বেদ-মন্ত্রের অর্থ করিতে নাই। তদুত্তরে নানক এই দোঁহটি আবৃত্তি করিলেন;—

ও নম অক্ষর শুনহ বিচার,
ও নম অক্ষর ত্রিভুবনসার।

অর্থাৎ ওঁকার এই অক্ষরটি বিচার করিয়া শ্রবণ করুন, ইহা ত্রিভুবনের সার পদার্থ। এইরূপ নানা কথায় পণ্ডিত মহাশয়কে ওঁকারের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর নানক তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস না করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতা এক মৌলবির নিকট তাঁহাকে ফারসি ও উর্দ্দু শিখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় তথায় নানকদেব প্রতি অক্ষরে এক একটি দোঁহা রচনা করিয়া মৌলবির নিকট আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, যথা,

"আলিফ্ আল্লাহু ইয়াদকর গফ্‌লত্
মনহু বিচার,
শ্বাস পলটে নাম বিনু ধৃগ জীবন সংসার।"

অর্থাৎ আলিফেতে আল্লার স্মরণ কর, নাম বিনা শ্বাস যাইতেছে; সংসারে এমন জীবন ধারণে ধিক্কার।

নবম বর্ষ বয়সে নানকের উপনয়ন সংস্কার হয়। তখন নানক নিজ পুরোহিতের নিকট যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাবৎকাল যজ্ঞোপবীত ধারণ না করে, তাবৎ

কাল দেবতা এবং পিতৃকর্ম্মের অধিকারী হয় না। এই কথা শুনিয়া নানক বলিলেন ;—

দয়া কপাহ সন্তোষ শুৎ জিত গণ্ঠ,
তিত বটুঁ,
ইহ জনেয়ু জিয়ে কা হইতু
পাঁড়ে ঘতু।

অর্থাৎ দয়ার কার্পাস ও সন্তোষের সূত্র, ভগবন্নামের সহিত পাক এবং গাঁঠ দিয়া যে উপবীত প্রস্তুত হয়, সেই উপবীতই হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। অন্য কয়েকটি দোঁহায় তিনি পুরোহিতকে বলিয়াছেন ;—"যে যজ্ঞোপবীত চরকায় কাটিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ একত্রিত হইয়া উপনয়ন সময়ে উপনীতের গলদেশে লম্বমান করে, এবং উপনয়ন-উৎসবের সমাপ্তিকালে সকলে মিলিয়া ছাগমাংসাদি আহার করে, সেইরূপ সূত্রগুচ্ছের প্রয়োজনীয়তা কি ?" এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পঞ্জাব প্রদেশে উপনয়নকালে ছাগবধ প্রচলিত আছে। যখন তাঁহার পিতা দেখিলেন, নানক লেখা পড়া শিক্ষা করিল না এবং এক্ষণে বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ হইয়াছে, তখন তিনি বালাজাট নামক এক ক্ষত্রিয়ের হস্তে কুড়িটি মুদ্রা দিয়া বলিলেন, ভাই ! তুমি নানককে সঙ্গে লইয়া লাহোরে যাও এবং তথা হইতে কিছু লাভজনক পণ্য ক্রয় করিয়া আন, আমি নানককে ব্যবসায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

বালাজাটের সমভিব্যাহারে লাহোরাভিমুখে যাইবার কালে নানক পথিমধ্যে এক স্থানে কোন উদ্যান মধ্যে কতিপয় সাধু দেখিতে পাইলেন, এবং কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলেন যে, সাধুরা সেই দিবস সকলে অভুক্ত আছেন। তখন নানক বালাজাটকে বলিলেন, পিতা আমাকে উত্তম সওদা ক্রয় করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, অতএব আমার বিবেচনায়, ইহা অপেক্ষা উত্তম সওদা আর কি হইতে পারে ? এক্ষণে তোমার অনুমতি ও অভিরুচি হইলে আমি অভুক্ত সন্ন্যাসীদিগকে পরিতোষরূপে আহার করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করি। বালাজাট ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল এবং এইরূপ সওদা করিলে তাঁহার পিতা বিশেষরূপ ক্রুদ্ধ হইবেন, এ কথাও জানাইল। কিন্তু নানক কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি সেই কুড়টী মুদ্রা ব্যয় করিয়া সন্ন্যাসীদিগের সেবা করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নানকের পিতা ও ভগিনীপতি নানককে সংসারী করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে নানকের পিতা দৌলত খাঁ লোদী নামক জনৈক "নবাব" উপাধিধারী মুসলমানের অধীন কর্পূরতল রাজ্যের অন্তর্গত সুলতানপুর নামক নগরে, নিজ জামাতার নিকট চাকরির উদ্দেশ্যে নানককে প্রেরণ করিলেন। এই নবাবের এক মুদিখানার দোকান ছিল, নানক সেই দোকান চালাইবার ভার প্রাপ্ত হইলেন, তিনি প্রত্যহ সাধু সন্ন্যাসীদিগকে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে দোকান হইতে দান করিতে লাগিলেন। নবাবের কর্ণে সেই সংবাদ উপস্থিত হইলে নবাব সাহেব কর্ম্মচারীর দ্বারা দোকানের হিসাব পত্র লইলেন, কিন্তু এক পয়সাও কম হইল না দেখিয়া নানককেই সেই কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিলেন।

এই সময়ে এক দিবস নানক নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হইলেন, তাঁহাকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। তিন দিন পরে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, নানকদেব এক গোরস্থান মধ্যে বসিয়া আছেন। তখন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে লাগিল। নানক তাঁহার অন্নদাতা প্রভু নবাবকে বলিলেন, আমি আর এক্ষণে অর্থ

উপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিব না। এই কথা শুনিয়া নবাব সাহেব তাঁহাকে অর্থের প্রয়োজনীয়তা, সংসারীর সুখ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলেন। তদুত্তরে নানক বলিলেন, আমি ভগবানের চাকর, আমার দ্বারা অন্য কাজ হইবে না। তখন নবাব সাহেব নানককে তাঁহার সঙ্গে মস্‌জিদে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, যদি তুমি ভগবানের চাকর, তবে আমাদিগের সহিত নিমাজ পড়। যখন অন্যান্য লোকে নিমাজ পড়িতে লাগিল, তখন নানক নিস্তব্ধ হইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। নবাব সাহেবের নিমাজ পড়া শেষ হইলে তিনি নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কিরূপ ব্যাপার? তুমি ত আমাদিগের সহিত নিমাজ পড়িলে না? তাহার উত্তরে নানক বলিলেন, আমি কাহার সহিত নিমাজ পড়িব? মৌলবী সাহেব ত নিমাজ পড়িবার সময়ে আপনার গো-শাবকের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন এবং আপনি কান্দাহারে অশ্ব ক্রয় করিতে নিযুক্ত ছিলেন। নানকের মুখে মনের প্রকৃত কথা বলিতে শুনিয়া নবাব সাহেব অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মৌলবীও সেই সময়ে নানককথিত চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহারা যে উভয়েই বাহ্যভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতেছিলেন, এজন্য লজ্জিত হইলেন এবং নানককে আর কোন কথা বলিলেন না।

অনন্তর নানক সুলতানপুর ত্যাগ করিয়া সিয়ালকোট নগরে কোন এক সিদ্ধ মুসলমান ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তখন নানকের সঙ্গে মরদানা নামক এক ভক্ত শিষ্য ছিল। সিয়ালকোটের এক মসজিদ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মুসলমান ফকির অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি নগরবাসীর উপর ক্রোধান্বিত হইয়া নগর ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য যোগবল ছিল। নানক তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারীর নিকট অভিপ্রায় জানাইলেন; পরন্তু কোন কর্ম্মচারী মসজিদ্ অভ্যন্তরে যাইতে সাহসী হইল না। তখন অকস্মাৎ মসজিদের ছাদ্ ভঙ্গ হইল এবং ফকির সাহেব নানকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নানক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিজন্য নগরবাসীর উপর রুষ্ট হইয়াছেন? ফকির সাহেব বলিলেন যে, নগরবাসী সকলেই পাপাচারী এবং মিথ্যাবাদী। তখন নানক আপনার শিষ্য মরদানার হস্তে দুইটি পয়সা দিয়া বলিলেন, বাজার হইতে এক পয়সার "মিথ্যা", এবং এক পয়সার "সত্য" ক্রয় করিয়া আন। মরদানা বাজারে যাইয়া কাহার দোকানে সত্য এবং মিথ্যা পাওয়া যায়, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়া বাজারের লোকেরা অনুমান করিল, এই ব্যক্তি পাগল, নতুবা এরূপ সওদা খুঁজিতেছে কেন। পরিশেষে মুলাকর্ঁঙ্ক নামক এক যুবক, মরদানার হস্ত হইতে পয়সা দুইটি লইয়া দুই টুক্‌রা কাগজে লিখিল, "মৃত্যু সত্য এবং জীবন মিথ্যা।"

মরদানা নানকের নিকট ফিরিয়া আসিলে নানক সেই কাগজ খণ্ডে লিখিত "মৃত্যু সত্য এবং জীবন মিথ্যা" এই দুইটি উক্তি ফকির সাহেবকে শুনাইয়া বলিলেন, আপনি বলিতেছিলেন, সিয়ালকোট নগরে সকলেই পাপাচারী; কিন্তু দেখুন, নগর মধ্যে এমন একজন লোক আছে, যে ব্যক্তি মৃত্যু সত্য এবং জীবন মিথ্যা বলিয়া জানে।

তখন ফকির সাহেবের ক্রোধের শান্তি হইল। অতঃপর সেই ফকিরের ক্রোধ হইতে নগরকে রক্ষা করিয়া নানক সেই

সত্যমিথ্যার বিক্রেতা মুলাক্ষত্রিকে সঙ্গে লইয়া অমৃতসহরে গমন করিলেন এবং তথায় এক ধনাঢ্য কৃপণ বণিকের গৃহে যাইয়া বলিলেন, আপনি আমার একটি সূচিকা বন্ধক স্বরূপে রাখুন, আমি ইহা আপনার নিকট হইতে পরলোকে গ্রহণ করিব। এই কথা শুনিয়া সেই বণিক্ উত্তর করিল, পরলোকে ইহা আমি কিরূপে লইয়া যাইতে পারি? তদুত্তরে নানক বলিলেন;—মহাশয়, যদি আপনি সামান্য একটি সূচ লইয়া যাইবার সামর্থ্য রাখেন না, তবে কি প্রকারে আপনার এই প্রভূত ধনরাশি সঙ্গে লইয়া যাইবেন? নানক কর্ত্তৃক কৌশলে এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বণিকের চৈতন্য লাভ হইল, এবং সেই ব্যক্তি তদবধি নিজ অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে লাগিল। নানক তখন শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া হরিদ্বারে পৌঁছিলেন। হরিদ্বারে ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বমুখে তর্পণ করিতে দেখিয়া নানক পশ্চিমমুখে অঞ্জলি অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে পাণ্ডারা অর্থাৎ হরিদ্বারবাসী ব্রাহ্মণেরা নানককে পশ্চিম-মুখে জল নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে নানক বলিলেন, যদি আপনাদিগের দেয় জল পিতৃলোকে পৌঁছায়, তবে অবশ্যই আমার নিক্ষিপ্ত জল পঞ্জাবের করতারপুর নগরে আমার স্বকীয় উদ্যানে পৌঁছিবে॥

তদনন্তর হরিদ্বার হইতে পূর্ব্বমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া নানক বেহারের পাটনা নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নানকের শিষ্য মরদানা নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, জগতের লোক ভগবদ্ভক্তের মর্য্যাদা কি হেতু অবগত নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে নানক বলিলেন;—ইহার উত্তর পশ্চাৎ দিব, এক্ষণে আমি একটি মাণিক দিতেছি; তুমি ইহা বাজারে বিক্রয় করিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিবে। মরদানা মাণিক লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইল বটে, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত মূল্য না জানিয়া এক পয়সাও দিল না, পরিশেষে এক জহুরি মাণিকটি হাতে লইয়া বলিল, ইহার মূল্য এত অধিক যে, আমার দিবার সামর্থ্য নাই। আপনি এই মাণিক লইয়া যান এবং আমার নিকট হইতে এক শত মুদ্রাও লইয়া যান। মরদানা সেই এক শত মুদ্রা এবং মাণিকটি লইয়া গিয়া নানকের হস্তে অর্পণ করিল এবং পূর্ব্বাপর সমুদয় ঘটনা বর্ণন করিল। নানক বলিলেন, এই ঘটনাই তোমার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ জানিবে, এক্ষণে এক শত মুদ্রা যাহার, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আইস। জহুরি ব্যতিরেকে জহরতের মূল্য কেহ অবগত নহে।

অনন্তর পাটনা হইতে পূর্ব্বমুখে ধুবড়ি হইয়া নানক কামাখ্যাতীর্থে উপস্থিত হইলেন; এইখানে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে নানারূপ উপদেশ দিয়া তথা হইতে সিলেট, কাছাড়, জগন্নাথ হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে সিংহল দ্বীপে উপনীত হইলেন। সিংহলের রাজা ও রাণী উভয়েই একে একে নানককে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। রাণী আসিয়া নানকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কৃপা করিয়া বলুন, কি উপায় অবলম্বন করিলে, আমার পতি একমাত্র আমার বশে থাকিবে। নানক বলিলেন, রাজমহিষি, ইহার অতি সদুপায় আমি তোমাকে বলিয়া দিতেছি। যদি তুমি নম্রতা, মিষ্ট কথা, এবং দীনতা রূপী তিনটি সখীকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখ, তাহা হইলে তোমার পতি তোমার অনুগত থাকিবেন। সিংহল হইতে নানক দেশে উত্তরপশ্চিম অভিমুখে দ্বারকা

হইয়া ক্রমশঃ উত্তরপশ্চিমে মুলতান নগরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মুলতানে বহুসংখ্যক সিদ্ধ মুসলমান ফকির বাস করিতেন। নানকের উপস্থিতি-সংবাদ পাইয়া তাঁহারা নানকের নিকট এক বাটি দুগ্ধ, এবং কয়েকখানি বাতাসা প্রেরণ করিলেন। তদ্দর্শনে নানক তাঁহাদিগের উপঢৌকনের প্রতিদান স্বরূপে তাঁহাদিগকে কতকগুলি পুষ্প পাঠাইয়া দিলেন। দুগ্ধ এবং বাতাসা পাঠাইবার অর্থ এই যে, এস্থলে অনেক সাধক আছেন, আপনার আসার কোন লাভ নাই। নানক যে পুষ্প পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই যে, আমি পুষ্পের দ্বারা আপনাদের অর্চ্চনা করিতেছি, এবং পুষ্পের ন্যায় আপনাদের বোঝার কারণ হইব না। এই প্রকার ইঙ্গিতসূচক উত্তর পাইয়া তাঁহারা সকলে নানকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

নানক মুলতান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কিছুদিন রাভী নদের তীরে বাটালার পশ্চিমাংশে বর্ত্তমান ডেরানানক নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ নামক দুইটি সন্তান তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল, লাহোরের কতকগুলি ধনাঢ্য লোক জ্বালামুখী দেবীর দর্শন ইচ্ছায় গমন করিবার সময় লয়নু নামক এক ডাকাতের দলস্থ দুই চারিটি লোক সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য লয়নুকে বলিয়া পাঠান, তাহাতে লয়নু সম্মত হয় এবং সে ব্যক্তি নিজেও যাইতে ইচ্ছুক হয়। পথিমধ্যে অন্য দস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা উদ্দেশ্যে লয়নুর দলবলকে তাঁহারা সঙ্গে লইলেন। রাভীর তীরে তীরে উত্তরমুখে যাইবার কালে সকলেই মহাত্মা নানকদেবের দর্শনার্থে ডেরানানক নামক স্থানে উপস্থিত হন। নানকদেব তখন জপমালা হস্তে ধ্যানস্থ ছিলেন। অন্যান্য সকলে দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু দস্যু লয়নু তথায় গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। কেহই শত চেষ্টায় তাহাকে উঠাইতে সমর্থ হইল না। এইরূপে একাসনে তিন দিন অতিবাহিত হইলে গুরু নানক তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। নানকের দর্শনে দস্যুর পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত পাপকর্ম্মের কথা স্মরণ হইয়া তাহার মনে অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। সে নানকের নিকট নতজানু হইয়া তাঁহার সেবক হইবার বাসনা জ্ঞাপন করিল। ইহাতে তিনি আজীবন শিষ্যভাবে তাহাকে সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর একদিন নানকদেব লয়নুর মনোগত ভাব অর্থাৎ বলবিক্রমজনিত অহঙ্কার দূর করিবার উদ্দেশ্যে লয়নুকে বলিলেন, এস, তোমার সহিত আমি মল্লযুদ্ধ করিব। প্রথমতঃ লয়নু তাহাতে সম্মত হইল না, কিন্তু গুরু আজ্ঞা অবহেলা করা পাপ বিবেচনা করিয়া দস্যু লয়নু নানকের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত হইল। তখন হইতে নানকদেব লয়নুর নাম অঙ্গদ রাখিলেন। এই ব্যক্তিই নানকদেবের অবর্ত্তমান সময়ে তাঁহার গদি পাইয়াছিলেন, এবং গুরু অঙ্গদ নামে নানকপন্থের দ্বিতীয় গুরু হইয়াছিলেন।

নানক দ্বিতীয় বার বহির্গত হইয়া হিমাচলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় বারে, তেহরণ বোগ্দাদ্ হইয়া মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। শিখদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি মক্কা নগরে উপস্থিত হইয়া একদিন কাবার অর্থাৎ ভজনা-মসজিদের দিকে পা ছড়াইয়া শুইয়াছিলেন। এইরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে নিষেধ করে, কিন্তু

তিনি কর্ণপাত না করিলে, তাহারা বলপূর্ব্বক তাঁহার পদযুগল সরাইয়া দিল। তাহাতে কাবা মসজিদের দরজা তাঁহার পদের সম্মুখবর্ত্তী হয় অর্থাৎ যে দিকে নানকের পদ ঘুরিয়া গেল, সেই দিকেই কাবার দরজা ঘুরিল। তখন নানক দেড় হস্তপরিমিত এক পাদুকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার এক পাটি তাহাদের কাবার নিকট ফেলিয়া রাখিলেন। অতি দীর্ঘ পাদুকা সন্দর্শনে মৌলবীরা ভাবিল, এই জুতা অবশ্য আল্লাতালার (ঈশ্বরের)। এইরূপ ভাবিয়া তাহারা সেই পাদুকার পূজা করিল, এবং ধৌত করিয়া তাহার জল পান করিল; এমন সময় নানক দেব অপর এক পাটি পাদুকা হস্তে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভাইগণ! তোমরা কেহ কি আমার অপর এক পাটি জুতা দেখিয়াছ? এই ব্যাপারে মৌলবিদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। ইহা কতদূর সত্য, তাহার প্রমাণ নাই। বোধ হয়, শিখেরা মুসলমান বিদ্বেষ হেতু এই প্রকার গল্প রচনা করিয়া থাকিবে। এই গল্পের সহিত আরও কিছু কটুকাটব্য আছে। এইখানে আর একটী ঘটনা লিখিত হইল। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর এবং কোথাও আন্তরিকতা না দেখিয়া ইহাঁর মন অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, একদা মক্কা নগরের অন্য একটী মসজিদের দিকে পা করিয়া ইনি একদিন শয়ন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জনৈক মোল্লা রোষাবিষ্ট হইয়া রূঢ় বাক্যে ইহাঁকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে ইনি অতি বিনীতভাবে উত্তর করেন;—মোল্লা সাহেব, রাগ করিতেছেন কেন? যে দিকে পরমেশ্বর নাই, দয়া করিয়া সেই দিকে আমার পা দুখানি সরাইয়া দিন। মোল্লা সাহেব নির্ব্বাক্ হইলেন।

নানক যখন মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে বোগদাদ নগরে এক ধনাঢ্য তস্করের বাটীর সম্মুখে কয়েক দিবস বাস করেন। একদিন তিনি তাহার বাটীর সম্মুখে রাশীকৃত খোলাভাঙ্গা জড় করিয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত দস্যু-সর্দ্দার নানকদেবকে রাশীকৃত খোলা ভাঙ্গা একত্র করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নানক বলিলেন, যেমন তুমি তোমার পাপের ধন পরলোকে লইয়া যাইবে, তদ্রূপ আমিও এই খোলাভাঙ্গাগুলি পরলোকে লইয়া যাইব। এই প্রকার উত্তর পাইয়া দস্যুদলপতি কিছু লজ্জিত হইল, এবং প্রত্যহ নানকের নিকট সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া মন হইতে সমস্ত পাপ সংকল্প দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এক্ষণে সে আপন সঞ্চিত অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোগদাদবাসিগণ নানকের শত শত ধন্যবাদ কীর্ত্তন করিল। যখন নানক এই স্থান ত্যাগ করেন, সেই সময়ে দস্যুপতি নানক সাহেবকে কোরাণের মন্ত্রলিখিত এক দীর্ঘ রেসমের চোগা দান করিয়াছিল। এই চোগা আজিও ডেরা নামক স্থানে রক্ষিত আছে। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানকদেব জলন্ধর সহর হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী করতারপুর নগরে প্রত্যহ দরিদ্র-সেবা-পরায়ণ হইয়া বাস করিয়াছিলেন। সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নানকদেব ইহলীলা সংবরণ করেন। পবিত্র জীবন এবং সাধু আচরণে ইনি হিন্দু মুসলমান সকলের সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রণীত এক বৃহৎ পুস্তক আছে, শিখেরা এবং অন্যান্য নানকপন্থীরা, সেই পুস্তকের পূজা করিয়া থাকেন। উক্ত পুস্তকের নাম গুরুগ্রন্থ সাহেব; উহা গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত। নানকপন্থীরা প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায়

গ্রন্থ সাহেবের পাঠ, শ্রবণ, এবং আরতি ও ভোগ দান করে।

গুরু নানকের পর আরও নয় জন গুরু, নানকের গদিতে উপবিষ্ট হন ;* তন্মধ্যে পাঁচ জন ধর্ম্মচর্চ্চায় এবং অপর পাঁচ জন ধর্ম্ম ও যুদ্ধচর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন, বর্ত্তমান শ্মশ্রুধারী শিখসম্প্রদায় দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ; ইহারা যুদ্ধ ও গুরু নাম ভিন্ন অন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। "শ্রী বাহ গুরুকী খাল্‌শা, বোলো বাহ গুরুকী ফতে" ইহাই ইহাদের মন্ত্র ; কিংবা কেবল বাহ গুরু বাহ-গুরু (প্রকৃত উচ্চারণ ওয়াহ গুরু) জপ করেন। এই মন্ত্র গোবিন্দ সিংহ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গুরু গোবিন্দের জন্মস্থান পাটনা, মৃত্যুস্থান হায়দারাবাদ নিজাম রাজ্যের নাদেদ সহরে। তিনি নবাবপুত্রের হস্তে ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। গুরু টেক বাহাদুর মুসলমান সম্রাট্ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দিল্লী সহরে মুসলমান কর্ত্তৃক হত হন। সেই জন্য গোবিন্দ সিংহ আপনার শিষ্যগণকে সর্ব্বদা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত রাখিতেন এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে বহুবার অসি ধারণ করিয়াছিলেন। নানকের গ্রন্থ ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা অতিশয় উত্তেজক ও বীররস পূর্ণ।

চিঁড়িয়া হোকে বাজ মাঁরাউ,
তব্ গোবিন্দ সিংহ নাম ধরাউ॥

অর্থাৎ ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া শিকারী পাখীকে মারিব, তবে গোবিন্দ সিংহ নাম ধারণ করিব। অর্থাৎ আমরা অল্পবল হইয়াও পরাক্রান্ত মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিব, নতুবা গোবিন্দ সিংহ নাম ধারণ করিব না

ইত্যাদি। বিশ্বস্ত পাঁচ জন শিখ তাঁহার শরীর রক্ষায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তিনিই শিখদিগের ধূমপান রহিত করেন।

নানকসম্প্রদায়ের দশ গদির মধ্যে লয়নু দস্যু অর্থাৎ দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ দেব, প্রায় গুরু নানকের সমতুল্য প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, গুরু নানকের দেহান্তের পর, গুরু অঙ্গদ দেব ব্যাস নদের তীরে এক পর্ণকুটীরে নির্জ্জনে ঈশ্বরারাধনায় দিবারাত্র মগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে সম্রাট্ হুমায়ুন সের সাহের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে গজ্‌নি নগরে পলায়ন করিতেছিলেন। সম্রাট্ ব্যাস নদের তীরে উপনীত হইয়া শুনিলেন যে, অদূরে এক সিদ্ধ-ফকীর, ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন আছেন। এইরূপ সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন গুরু অঙ্গদ দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিক্ষিপ্তচিত্ত সম্রাট্, অঙ্গদ দেবের ধ্যান ভঙ্গ হইবার আশায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, পরে ক্রোধে অধীর হইলেন এবং কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, গুরু অঙ্গদ দেবের প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; পরন্তু অসি কোষ হইতে বহির্গত হইল না। অঙ্গদ দেব অন্তরে সমস্ত অবগত হইয়া চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক সম্রাট্ হুমায়ুনকে বলিলেন ;—হে দিল্লীশ্বর! আপনি সামান্য ফকিরের উপর বাহাদুরি দেখাইতেছেন ; পরন্তু যদি এই তরবারি সের-সাহের উপর প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম আপনি বীর পুরুষ। হুমায়ুন আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হইয়া অঙ্গদ দেবের চরণে মস্তকের উষ্ণীষ রাখিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অঙ্গদ দেব তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলেন, আপনি পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন এবং শীঘ্রই আপনার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। সেই পুত্র সমগ্র ভারত জয় করিবে

* ২। অঙ্গদ ; ৩। অমরদাস ; ৪। রামদাস ; ৫। গুরু অর্জ্জুন ; ৬। হরগোবিন্দ ; ৭। শ্রীহর রায় ; ৮। গুরু হরকিষণ ; ৯। তেগ বাহাদর ; ১০। গোবিন্দ সিংহ ;

এক্ষণে কিছু দিন পর্য্যন্ত আপনি নানারূপ কষ্টভোগ করিবেন বটে, কিন্তু অচিরেই আপনার সকল দুঃখের অবসান হইবে। ইতিহাসে কথিত আছে যে, সম্রাট্ রাজপুতানার মরুভূমিতে অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া পথিমধ্যে আক্‌বর সাহ নামক পুত্রমুখ দর্শন করেন এবং অমরকোট-রাজের সাহায্যে সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিয়া, ক্রমশঃ বল সঞ্চয় পূর্ব্বক পুনরায় দিল্লী অধিকার করেন।

গুরু নানকের গ্রন্থের অনেক স্থলেই ভক্তি পূর্ণ কবিতায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থ-সাহেবের শ্রুতিমধুর ভক্তিরসপূর্ণ বাণী শুনিলে পাষণ্ডের মনেও শান্তি সঞ্চারিত হয়। গ্রন্থ-সাহেব সরল গুরু-মুখী ভাষায় লিখিত ; ভাষার প্রাচীনত্ব হেতু বর্ত্তমান পাঞ্জাববাসীরা তাহার সম্পূর্ণ অর্থ করিতে সমর্থ নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, নানকের গ্রন্থে অনেক স্থলে কবিরের বাণী উদ্ধৃত আছে। এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধ হিন্দি, ও কতক উর্দ্দ মিশ্রিত। তাহা সহজে বর্ত্তমান হিন্দিভাষাভিজ্ঞগণ বুঝিতে সমর্থ। কোন কোন স্থলে নানক রচিত শুদ্ধ হিন্দি লিপিও আছে—

জগৎ মে ঝুঠি দেখি প্রীত,
মেরো মেরো সবহি কহত হ্যায়,
হিত সে বান্ধো চিত,
অন্তকাল্ সঙ্গী কোই নহি,
এহ অচরজ হ্যায় গীত,
নানক ভব জল পার পরে,
জো গাওয়ে গুরুকী গীত॥

ইহার বঙ্গানুবাদ এই ;—জগতের ভালবাসা মিথ্যা দেখিলাম, সকলই অসার মঙ্গল কামনায় চিত্তকে নিযুক্ত করিয়া, আমার আমার বলিতেছে, কিন্তু কেহই অন্তিম কালের সঙ্গী নয়। এই উক্তি আশ্চর্য্য জানিবে, হে নানক! যে ব্যক্তি গুরুদেবের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনিই ভবনদী পার হইতে পারিবেন।

নানক দুখিয়া সব সংসারা,
সুখিয়া সেই যো নাম অধারা।

অর্থাৎ হে নানক, সমুদয় সংসার দুঃখী, কেবলমাত্র যিনি ভগবন্নামের আশ্রয় লইয়াছেন, সেই ব্যক্তিই সুখী।

ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত সকলেই অসুখী, এই কথা শুনিয়া সেবক মরদানা নানককে বলিলেন, আপনি বলিলেন, সংসারে কেহই সুখী নহে। এই কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না ; কারণ শত শত ধনাঢ্য বণিক্ পরম সুখে জীবিতকাল অতিবাহিত করিতেছে, কিন্তু আপনি বলিলেন, সংসারে কেহই সুখী নাই। এরূপ কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। তখন নানক দেব মরদানাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি নিজের মনে যাহাকে সুখী বলিয়া জান, তাহাকে আমার নাম করিয়া ডাকিয়া আন, তখন মরদানা এক শুভ্র বস্ত্রালঙ্কারধারী ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়কে পরম সুখী ধারণা করিয়া ডাকিয়া আনিল ; সে ব্যক্তি নানকদেবের সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে উপবেশন করিল। নানক তখন মরদানার ভ্রম দূর করিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যথার্থ বলুন, এই অতুল ধনরাশি লাভ করিয়া আপনি সর্ব্ববিষয়ে সুখী, অথবা আপনার কোন দুঃখের কারণ আছে। নানকের এইরূপ প্রশ্নে সে ব্যক্তি উত্তর করিল, হে সাধু, আপনার নিকট আমি মিথ্যা বলিব না ; প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় আমার ন্যায় দুঃখী জগতে নাই। হে মহাপুরুষ, আপনি আমার দুঃখের কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আমার পিতা আমাকে প্রাণের সহিত স্নেহ করিতেন। বাল্যকালে আমি সর্ব্বদা স্নেহপুত্তলিকার ন্যায় লালিত পালিত হইয়াছিলাম। যৌবন

সমাগমের পূর্ব্বে অতি অল্প বয়সেই পিতা আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই আমরা উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতাম। একত্র উপবেশন, একত্র আহার বিহার, একত্র শয়ন ও ভোজনে আমাদের পরস্পরের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমার বাল্যসখীর সহবাসে আমি পরম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। নির্ম্মল আমোদ প্রমোদে আমাদের দিনগুলি বেশ সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমাদের বয়স বৃদ্ধি হইয়া আমরা যৌবনে পদার্পণ করিলাম। পিতার অতুল ধন ছিল, আমার উপার্জ্জনচিন্তা ছিল না। যৌবনে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আমরা উভয়ে পরম প্রীতির সাগরে নিমগ্ন হইয়া স্বর্গ সুখ অনুভব করিলাম। হায়! এই সুখ আমার ভাগ্যে অধিক কাল স্থায়ী হইল না। একদা সহসা আমার পত্নীর কঠিন পীড়া হইল। তিনি মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া কাতরকণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "স্বামিন্! আমি ত ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিলাম, আমার মৃত্যুর পর তুমি পুনরায় বিবাহ করিও। আমাকে ভুলিয়া গিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিও।" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, "কখনই নহে, আমি তোমাকে হারাইলে কখনই অন্য বিবাহ করিব না। এই কথা শুনিয়া আমার পত্নী উত্তর করিলেন, আমি নিশ্চয়ই মরিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। তখন আমি আমার মুমূর্ষু পত্নীকে আমার ভালবাসা দেখাইবার জন্য, এবং আমি যে কখন অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইব না, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিবার জন্য, আমি তীব্র ঔষধ প্রয়োগে স্বকীয় উপস্থেন্দ্রিয় শক্তিশূন্য করিলাম। স্বল্প দিন পরে আমার সেই পীড়িতা পত্নী আরোগ্য লাভ করিলেন। প্রভো! সেই পাপ কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে যে নারীর জন্য আমি আমার ঐরূপ সর্ব্বনাশ করিলাম, সেই নারীই কালসর্পিণী হইয়া আমাকে দংশন করিল। পাপীয়সী কুলকলঙ্কিনী হইয়া অন্য পুরুষে আসক্ত হইল। তাহার পূর্ব্বের সেই নির্ম্মল পতিপ্রেম সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। এই সকল দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে লাগিল অতুল ঐশ্বর্য্য কিছু মাত্র আমার তৃপ্তিদায়ক নহে।" বণিকের কথা শেষ হইলে নানকদেব মরদানাকে বলিলেন, বৎস মরদানা, শুনিলে সংসারে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখী, সংসার-সুখ ক্ষণস্থায়ী, এবং তাহার পরিণাম দুঃখ, প্রকৃত সুখ সংসারপ্রবৃত্তির নাশে এবং ভগবদ্ভক্তি-ত প্রাপ্ত হওয়া যায় জানিবে।

এইবার আমরা নানকের গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। নানক সাহেবের গ্রন্থে নানা স্থানে অনাহত শব্দের সাধনার কথা উল্লেখ আছে, যথা;—

"পঞ্চ শব্দ জো বাজতে, ঘর ঘর হতো রাগ
তে মন্দির খালি পড়া বৈঠন লাগে কাগ„।

অনাহত শব্দের অর্থ—ন+আহত অর্থাৎ যাহা আপনা আপনি হইতেছে। শব্দ দুই প্রকার ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক, শব্দ প্রধানতঃ দশটি, যোগ-মার্গের ব্রহ্মাণ্ডস্থ পঞ্চ ভূমিকার প্রত্যেকটিতে দুই প্রকার অনাহত শব্দ শ্রবণগোচর হয় বলিয়া, অনাহত নাদ প্রধানতঃ দশ প্রকার বলিয়া পরিগণিত হয়, তদ্ভিন্ন ধ্বন্যাত্মক শব্দ নানা প্রকারের আছে; বায়ুসঞ্চলনজনিত শব্দ, জল প্রপাতের শব্দ, অশনিপাতের শব্দ ইত্যাদি; যে সকল শব্দ বর্ণ অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা লিখিত হয় ও যাহা অর্থবোধক তাহাকে বর্ণাত্মক বলে।

ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চ ভূমিকায় পাঁচটি মূল শব্দের কথা নানক দেব নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দোঁহাটির তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ ;—মানব-দেহরূপ মন্দিরে আত্মারূপী দেবতা বাস করিতেছেন, তিনি যথার্থ ঈশ্বরের অংশ ; তাঁহারই শক্তি-কিরণে সুষুম্না নাড়ীর উর্দ্ধমুখী স্রোতে অনাহত নাদরূপ নানা প্রকারের মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে। মনুষ্য অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় নিজ দেহরূপী মন্দির ও আত্মারূপী দেবতাকে না জানিয়া অন্য কাল্পনিক দেবতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ও পূজা করে, এই কারণে প্রকৃত দেহ-পূজা মন্দির আরাধনা ব্যতিরেকে শুন্য থাকে বলিয়া ষড়্‌রিপুরূপী বায়সসমূহ তাহাতে বাসা করিতেছে।

এই প্রকার যোগমার্গের ইঙ্গিতবাক্য নানক-প্রণীত গ্রন্থের অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্ভিন্ন ভক্তির মহিমা, ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ এবং মনোনিরোধের কথা অনেক স্থলে আছে ; যথা—

(১) "পও পর্ বাজি অট্‌কি আর

গুরুবিন্ পও কা দাও না পরি।"

পও অর্থাৎ মন। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি অন্তঃকরণের মধ্যে, "পও" অর্থাৎ (একপোয়া একের চতুর্থাংশ) বলিলে, মনকে বুঝায় এবং অন্য অর্থে "পও" বলিতে দাবা বড়ের একটিমাত্র বড়েকে বুঝায়। মনোরূপী একটি বড়েতে বাজি আটকাইয়া রহিয়াছে (অর্থাৎ মনকর্ত্তৃক ভববন্ধন সৃষ্ট ও তদ্দ্বারা সর্ব্বজীব বদ্ধ আছে) ; সদ্‌গুরু ব্যতীত সেই মনোরূপী বড়েকে কেহ জয় করিবার উপায় লাভ করিতে পারে না। অন্যত্র এইরূপ একটি কথা আছে, যথা—

(২) মন্‌কে হারে, হারিয়া, মন্‌কে জিতে জিৎ অর্থাৎ মনের নিকট হারিলেই যথার্থ হার হইল ও মনকে জয় করিলেই প্রকৃত জয়ী হইল। মন কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই লোকগণ সৎ ও অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা মনের বশীভূত নানাপ্রকার প্রলোভনজনক কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহারা ভাবী দুঃখের বীজ বপন করে। আর যাঁহারা সুবুদ্ধির প্রভাবে মনকে নিজ আজ্ঞায় পরিচালিত করিতে পারেন, তাঁহারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার সুখ অর্জ্জন করিয়া থাকেন।'

(৩) অস্তুত করহি অনেক জন,

অন্ত'ণ পারাবার

নানক রচনা প্রভু র'চ,

বহুবিধ অনেক প্রকার।

নানালোকে নানাপ্রকারে সেই পরমাত্মার স্তুতি করিতেছে, পরন্তু কেহই সেই অপার সমুদ্ররূপী ভগবানের অন্ত নির্ণয় করিতে পারেন নাই। হে নানক, সেই একমাত্র পরমেশ্বর এই দৃশ্যমান্ জগৎ নানা আকারে গঠন করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই ভগবান্‌কেই এই দৃশ্য জগতের কর্ত্তৃস্বরূপ জানিবে॥

ভক্তিবিষয়ক কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইল, যথা—

(৪) পতিত উধারণ, ভয় হরণ,

হরি অনাথকে নাথ

কহঁ নানক তিঁহ জানিয়ে,

সদা বসত তুম সথ্।

তন ধনজিহঁ তোকো দিও,

তাঁসো নেহন কিন্

কহেঁ নানক নর বাওরে,

অবকেঁও ডোলত দিন্॥

নানক দেব বলিতেছেন, যিনি পতিতগণের উদ্ধারকর্ত্তা, ভবভয়হরণকারী, অনাথের নাথ শ্রীহরি, তিনি সর্ব্বদা তোমার সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর।

(৫) প্রাণী, পরম পুরুষ পগ্ লাগো।
সোবত কাহেঁ মোহ নীদমে,
কবহু সুচিত হো জাগো,
আউরণ কাহেঁ উপদেশত হায়,
পশু তোহিঁ প্রবোধ ন লাগো,
সিঁচত কাঁহা, পরে বিষয়ন কো,
কবহু বিষয়-রস ত্যাগো,
কেবল কর্ম্ম ভর্ম্মতে চিহ্নো,
ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুরাগো,
সংগ্রহ করহু সদা সুমিরণ কো,
পরম পাপ তজ ভাগো,
যাতে দুখ পাপ নহিঁ ভেঁটে,
কাল জাল তে ত্যাগো,
জো সুখ চাহে সদা ভজন কো,
তো হরিকে রস পাগো॥

অর্থাৎ হে জীবগণ! পরমপুরুষ পরমাত্মার চরণ বন্দনা কর, মোহরূপী নিদ্রাতে কি হেতু শুইয়া রহিয়াছ? শীঘ্র চেতনা লাভ করিয়া জাগ্রত হও; তুমি এখনও পশুতুল্য, তোমার নিজের জ্ঞান হয় নাই, তবে কি জন্য অপরকে উপদেশ প্রদান করিতেছ? কি জন্যই বা ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সকলকে সিঞ্চন করিতেছ? অর্থাৎ রূপরসাদি উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সবল করিতেছ? বিষয় ভোগ বাসনা পরিত্যাগ কর। তুমি কেবল বিষয় কর্ম্মরূপ ভ্রান্তিকেই চিন্তা করিতেছ কেন? ধর্ম্ম-কর্ম্মে অনুরক্ত হও। সর্ব্বদা ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ভগবৎ স্মরণ কর, মহাপাপসমূহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন কর অর্থাৎ পাপকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের নাম লইতে থাক। এমন কর্ম্ম কর, যাহাতে দুঃখ এবং পাপের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যদি সর্ব্বদা আরাধনাজনিত সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে হরি নাম রূপ অমৃত-রসে মগ্ন হও॥

(৬) লাখ্ ভক্ত জাকো আরাধেঁ,
লাখ্ তপিশ্বর তপহি সাধে,
লাখ্ যোগিশ্বর করতে যোগা,
লাখ্ ভোগিশ্বর ভোগহিঁ ভোগা,
ঘট ঘট বসহিঁ, জানহিঁ প্রভুথোড়া,
হায় কোই সাজন্ পরদাতোড়া,
করউ যতন যে হোঁই মেহরবানা,
তাকো দেই জীব কুরবানা,
ফিরত ফিরত সন্তন্ পঁহ আইয়া,
দুখ ভ্রম হামারা সকল মিটয়া,
মহল বুলায়াঁ প্রভু অমৃত ভুঁচা,
কহু নানক প্রভু মেরা উঁচা,
দুজা কাহে সিমিরিয়ে, জন্মতে মর জায়
একে সুমিরে নানকা, জল্ থল্
রহিয়া সমায়।

লক্ষ ভক্ত যাঁহাকে আরাধনা করিতেছে, লক্ষ লক্ষ তপস্বী তপস্যা দ্বারা যাঁহার সাধনা করিতেছে, লক্ষ যোগীশ্বর যাঁহার জন্য সর্ব্বদা যোগ করিতেছেন, লক্ষ ভোগেশ্বর যাঁহার প্রসাদে ভোগ্য ভোগ করিতেছেন, ঘটে ঘটে অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থে এবং সর্ব্বজীবে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, সেই প্রভুকে তুমি সামান্য জ্ঞান কর? যিনি মায়ার আবরণ ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ সাধু অতি বিরল।* যাঁহাকে আমি আমার প্রাণ উপঢৌকন দিয়াছি, তিনি যদি কৃপা করেন, তবেই কিছু যত্ন অর্থাৎ সাধনা করিতে সমর্থ হইব। আমি ঘুরিতে ঘুরিতে উন্নত সাধু ভক্তের নিকট আসিয়াছি, তিনি আমার সকল ক্লেশ এবং সকল ভ্রম মিটাইয়া দিয়াছেন। নানক বলিতেছেন, প্রভু আমাকে অমৃতময় অট্টালিকায় ডাকাইয়াছেন। আমার প্রভু অতি উচ্চ এবং মহৎ। যে সকল বস্তু জন্মে এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বিনাশশীল) এরূপ দ্বিতীয় বস্তুকে কেন চিন্তা করিতেছ? নানক তাঁহাকে ধ্যান করে যিনি এক হইয়াও জলে এবং স্থলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন।

রে মন এই বিধি যোগ কমাউ,
সিঙ্গি সাঁচ, অকপট কণ্ঠলা,
ধ্যান বিভূত চঢ়াউঁ,
তাতে গহু আতম বশ কর্‌কে,
ইচ্ছানাম আরাধং॥
বাজে পরম তার তৎ হরিকো,
উপজে রাগ রসারং॥
উঘটে তান তরঙ্গ রঙ্গ অতি,
জ্ঞান গীত বন্ধানং॥
চক্‌ চকী রহে দেব দানব মুনি,
ছক্‌ ছকী ব্যোম বিমানং॥
আতম উপদেশ ভেষ, সংযম
কে জাপস্‌ঁ॥
অজপা জাপে সদা রহে, কঞ্চনসি
কায়া, কাল ন কবহু ব্যাপে॥

ওহে মন, এই প্রকার যোগ সাধনা করিব, সত্যের শৃঙ্গি, অকপটতারূপ কণ্ঠমালা, ধ্যানরূপ ভস্ম অঙ্গে লাগাইব; তাহার সহিত আত্মাকে বশ করিয়া (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া) ইচ্ছাকে অর্থাৎ বিষয়-তৃষ্ণাকে ভগবন্নামের উপর নিযুক্ত করিব (আধার অর্থে হিন্দি ভাষায় অবলম্বন)। ভগবানের সেই পরম বাদ্য (মানব-দেহ-মধ্যেই) বাজিতেছে এবং তাহা হইতে সুরস রাগ রাগিণী উৎপন্ন হইতেছে। সেই অনাহত তানের তরঙ্গে জ্ঞান গীতি নানা-রঙ্গে উৎপন্ন হইতেছে। দেবতা, দানব, এবং মুনিজন (সেই নাদ শ্রবণে) আশ্চর্য্য হইয়া রহিয়াছেন ও শূন্যমার্গে বিমান রহিয়াছে। সংযমের সহিত জপ আত্মার উপদেশ এবং ভূষণ স্বরূপ। অজপা জপ করিলে সর্ব্বদা কাঞ্চনস্বরূপ শরীর থাকে এবং কাল অর্থাৎ মৃত্যু কখনও আক্রমণ করিতে পারে না।

মনসাঁচা মুখসাঁচা সোয়, আউরন পেখে
এক ন বিমুন কোও
নানক ইহ লক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানী হোএ॥

যাঁহারা মানসে সত্য চর্চা এবং মুখে সর্ব্বদা সত্য কথা বলেন, ও যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহাতে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য কিছু দেখেন না, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানী। হে নানক, এই লক্ষণগুলি ব্রহ্মজ্ঞানীরই হইয়া থাকে।

প্রভুজি তোকহি লাজ হমারি,
নীলকণ্ঠ নর হর নারায়ণ নীলবসন বনয়ারী,
পরম পুরুষ পরমেশ্বর স্বামী,
পাবন পওন আহারী
মাধব মহাজ্যোত মদ মর্দ্দন,
মান মুকুন্দ মুরারী॥
নির্ব্বিকার নিজ্‌র নিদ্রা,
বিন্‌ নিরবীষ নরক নিবারী,
কৃপাসিন্ধু কাল প্রিয়দর্শী,
কুকৃত প্রণাসনকারী॥
ধনুর্ব্বাণ ধৃতমান ধরাধর,
অন্‌বিকার অসিধারী,
হু মতি মন্দ চরণ শরণাগত,
কর গহি লেহু উবারি॥

অর্থ—হে নীলকণ্ঠ, নীলবসনধারি বনবিহারি নরহরি নারায়ণ, হে প্রভু, আমার চিন্তা ধর্ম্মকর্ম্ম যথাসর্ব্বস্ব তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে। হে পরমপুরুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর, হে মাধব, মহাবিক্রমশালীর দর্প দমনকারী সর্ব্বপূজ্য মুকুন্দমুরারি, হে নির্ব্বিকার, জরারহিত, নিদ্রারহিত; এবং বিষয়-বিষ রহিত, নরক হইতে ত্রাণকারি; হে কৃপাসিন্ধু, প্রিয়দর্শন, কুকর্ম্মের নাশকারি; হে, ধনুর্ব্বাণ- ধারি, বিশ্বম্ভর, বিকাররহিত এবং অসিধারি, আমি মন্দমতি এবং তোমার চরণে শরণাগত, আমার হস্তধারণপূর্ব্বক (ভবযন্ত্রণা হইতে) মুক্ত কর।

অতি উঁচাতাকা দরবারা,
অন্ত নহি কুছ পারাবারা,
কোটি, কোটি, কোটি, লখ, ধাওয়ে,

এক তিল তাকা মহলন পাওয়ে,
স্বভাবি কৌন সুরুলা, জিত প্রভু মেলা ॥

অর্থ—তাঁহার দরবার অত্যন্ত উচ্চ, তিনি সমুদ্রতুল্য, তাঁহার পার নাই, কোটি কোটি লোক অন্বেষণ করিতেছে, পরন্ত তাঁহার আবাসের কিছুমাত্র সন্ধান পায় নাই। কিন্তু এমন কোন স্বভাবতঃ পবিত্র স্থান আছে, যথায় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

হে অচ্যুত হে পরব্রহ্ম, অবিনাশি অঘনাশ,
হে পূরণ হে সর্ব্বময়, দুখভঞ্জন গুণতাশ ॥
হে সঙ্গি হে নিরঙ্কার, হে নির্গুণ সবটেক্
হে গোবিন্দ হে গুণনিধান, জাকে সদা বিবেক ॥
হে অপম্পার হর হরে, হ্যায় ভিহোবন হার
হে সন্তহকে সদা সঙ্গ, নিরধারা আধার ॥
হে ঠাকুর হোঁ দাস্যো, ম্যয় নির্গুণ গুণ নহি কোয়,
নানকজিকে নাম দান, রাখোঁ হিয়ে পিরোয় ॥

অর্থ—হে অচ্যুত, হে পরব্রহ্ম, অবিনাশি, পাপনাশন, হে পূর্ণ, হে সর্ব্বময়, হে দুঃখভঞ্জনকারি, হে সর্ব্বগুণাধার, হে সঙ্গি, হে অহঙ্কারবর্জ্জিত, হে গুণত্রয়বর্জ্জিত এবং সকলের দৃঢ় অবলম্বন, হে গোবিন্দ, হে গুণনিধান, হে মহাবিবেকশালিন্, হে পরম্পরারহিত আদি পুরুষ, হরিহর, হে সাধু ভক্তজনের সদাসঙ্গি, হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, হে ঠাকুর, আমি তোমার দাস, আমি গুণহীন, আমার কোন গুণ নাই; আপনি নানককে আপনার নামের মাহাত্ম্য বুঝিবার শক্তি দিন, আমি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিব।

বিষয়ন্ কো কাহেকো রচে,
নিমষ না হোয় উদাস
কহে নানক হরি ভজ মন,
পরে ন জম্‌কে ফাঁস ॥
তরুণাপন্ এঁওহি গয়্ও,
লিয়ো জরা তন্ জিত্,
কহঁ নানক ভজ হরি মন,
অবধি জাত হ্যায় বীত্ ॥
বিরধ ভয়ে সুঝে নহি,
কাল পোঁছে আন,
কহেঁ নানক নর বাওর,
কেঁও ন ভজে ভগবান্ ॥
ধন দারা সম্পতি সকল,
জিন্ অপনি কর মান্
ইন্‌সে কছু সঙ্গ নহি,
নানক সাঁচি জান্ ॥

অর্থ—হে মন! সর্ব্বদা অনন্যচিত্ত হইয়া কি জন্য বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছ? রে মন! সর্ব্বদা শ্রীহরির ভজনা কর, তাহা হইলে যমের হাতে পড়িতে হইবে না। যৌবন অবস্থা বৃথা অতিবাহিত হইল, এখন জরা শরীরকে অধিকার করিয়াছে; নাণক বলিতেছে, রে মন! শ্রীহরির ভজনা কর, আয়ু ফুরাইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ হইয়াছ, দেখিতে পাও না, মৃত্যু সম্মুখে আসিয়াছে, নাণক বলিতেছে, হে পাগল মনুষ্য, কি হেতু ভগবানের ভজনা কর না? ধন, দারা, সম্পত্তি প্রভৃতি যে সকলকে আপনার বলিয়া জ্ঞান কর, ইহার মধ্যে কিছুই সঙ্গে যাইবে না, এই কথা সত্য জানিও।

বর্ত্তমান সময়ে নানকপন্থী বলিতে কেবলমাত্র নানকের প্রচলিত সম্প্রদায় নহে ইহাই বুঝিতে হইবে। নাণকের পর গোবিন্দ সিংহ পর্য্যন্ত অপর নয়টি গুরু এবং অন্যান্য মোহন্ত কর্ত্তৃক নানা সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ কর্ত্তৃক উদাসী পরমহংসসম্প্রদায়, শ্রীতমদাস বাবাজি কর্ত্তৃক উদাসী নাঙ্গাসম্প্রদায়, গোবিন্দ সিংহ কর্ত্তৃক শিখসম্প্রদায়, তদ্ভিন্ন নির্ম্মলসম্প্রদায়, নিহঙ্গসম্প্রদায়, কুকাপন্থী, রামরায়ী, সুথ্রা সম্প্রদায় ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে নানকের প্রত্যেক যোগমার্গের কথা অনেকেই অবগত

নহেন; গ্রন্থ সাহেবের পাঠ পূজা ভিন্ন অনেকেই তাহার সার গ্রহণ করিতে মনোযোগী নহেন। সুন্দর রেশম বস্ত্রের দ্বারা গ্রন্থখানি ঢাকিয়া রাখা হয়, এবং পুষ্পমালো ভূষিত করা হয়। অমৃত সহরের স্বর্ণ-মন্দির নানকপন্থীদের এক প্রধান তীর্থস্থান। বহু অর্থ ব্যয়ে নানাপ্রকার মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা সুবিস্তৃত সরোবরের মধ্যস্থলে উক্ত মন্দির অবস্থিত। সরোবরের চারিদিকে মর্ম্মর সোপান ও মর্ম্মর আচ্ছাদিত রাস্তা। সরোবরতট হইতে মন্দির পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত মর্ম্মর সেতু নির্ম্মিত আছে। মন্দিরটি ত্রিতল, উপরিভাগে সুবর্ণমণ্ডিত, অভ্যন্তরে সুবর্ণ জল দ্বারা লতা পাতা কারুকার্য্যে চিত্রিত। এই সরোবরস্থিত মন্দির সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার পার্শ্বে একটি উদ্যান আছে; তাহাতে নানা দেশ হইতে আগত সাধু সন্ন্যাসীরা বাস করেন। বর্ত্তমান সময়ে, ইংরাজ কর্ত্তৃক একটী ঘটিকা-যন্ত্র এক উচ্চমঞ্চে সরোবর-পার্শ্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। শিখ নৃপতিরা কাবুল ও গজনি লুট করিয়া সেই লুণ্ঠিত অর্থে উক্ত সুবর্ণ মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার পর মুসলমান-সম্রাটেরা উহা একবার ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পরে রণজিৎ মন্দিরের সংস্কার করিয়া ইহাকে সুবর্ণমণ্ডিত করেন। উক্ত প্রধান মন্দির ভিন্ন আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। "বাবা অটল" অমৃত সহরে, "ডেরানানক" কটালার পশ্চিমে, মুকত সর" ফরিদকোটের নিকট। "করতার পুরের মন্দির" জলন্ধরের নিকট। "সাধ্‌বেলা" (অর্থাৎ সাধুদিগের তরণী) সিন্ধুপ্রদেশের সক্কর নগরের সম্মুখে সিন্ধু নদের মধ্যস্থলে দ্বীপাকারে অবস্থিত। "তরণ তারণ" অমৃত সহরের দক্ষিণে অবস্থিত। নামকানার মন্দির" লাহোরের পশ্চিম। "গোবিন্দ সিংহের সমাধি মন্দির" নিজাম রাজ্যের নান্দেদ্ নগরে। "গোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান তীর্থ" পাটনা নগরের চকের নিকট। "পঞ্জা সাহেব" রাওলপিণ্ডি ও অটক নগরের মধ্যে হোসেন আব্দাল্ ষ্টেসনের নিকট। "শ্রীচাঁদের চিনার বৃক্ষ ও আশ্রম" কাশ্মীর শ্রীনগরে। পঞ্চম গুরুর সমাধি লাহোর দুর্গের সম্মুখে। এইগুলি নানকপন্থীদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ। তদ্ভিন্ন আরও অনেক মন্দির ও মহন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে।

নানকপন্থী সাধুদের মধ্যে অনেকে সিদ্ধ হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ পরমহংস ও নির্ম্মলা সাধু বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ইঁহারা কাশীধামে আসিয়া সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করেন। আবার অনেকে হরিদ্বার ও হৃষিকেশ তীর্থে বিদ্যাচর্চ্চা এবং ঈশ্বরারাধনায় কালযাপন করেন, এতদ্ভিন্ন নানকপন্থের অপরাপর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অজ্ঞ। উদাসী সাধুদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কম নহে। কথিত আছে, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক প্রীতমদাস বাবাজী এক সময়ে নিজাম রাজ্যের দেওয়ান চন্দুলালের সমুদয় সম্পত্তি (প্রায় তিন কোটী মুদ্রা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি সেই মুদ্রা সাহায্যে দুর্ভিক্ষকালে প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা অন্নদানে ব্যয় করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। কুকা সম্প্রদায় এক সময়ে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। এক্ষণে ইহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। নির্ম্মলাসম্প্রদায় শিখ সম্প্রদায়ের শাখামাত্র। নিহঙ্গেরা অদ্যাবধি মস্তকোপরি লৌহ-চক্র ধারণ করে। গরীব দাসীপন্থে অনেক পরমহংস ও গৃহস্থ আছে। সুথ্‌রাগণ দুইটি কাষ্ঠখণ্ড লইয়া বাজাইয়া থাকে এবং প্রতি দোকান হইতে এক পয়সা গ্রহণ করে। উদাসী সর্ব্বপ্রকার সাধুদিগের মধ্যে এক্ষণে বহুসংখ্যক স্ত্রীপুত্র-

যুক্ত সংসারী ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমান সময়ে নানকপন্থীরা হিন্দুদিগের সর্ব্বদেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহারা শবদেহের অগ্নিসংস্কার করিয়া পরে অস্থি লইয়া গিয়া হরিদ্বারের গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। অনেককে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিতে দেখা যায়। পরন্তু এ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান নানকের গ্রন্থে নিন্দনীয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তিনি এ প্রকার বাহ্য পূজা ও কাল্পনিক আরাধনার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। শিখেরা বন্য শূকর ও গৃহপালিত কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করেন এবং বাজারে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ব্যবহার করেন, ইঁহাদের অধিকাংশ কৃষিজীবী ও সৈনিক, অতি অল্প লোকই ব্যবসায় কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। অনেককে চাকুরী করিতেও দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যে জায়গীরদার ধনী ও রাজা উপাধিধারী ব্যক্তি আছেন। শিখসম্প্রদায় হইতে সিংস সভা নামক এক সভা বর্ত্তমান কালে উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহারা দেশোন্নতি করিতে চাহেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ইংরাজিশিক্ষিত, ধনী ও মহারাজ উপাধিধারী আছেন। শিখদের মধ্যে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কতিপয় স্থানে শিখেরা অদ্যাবধি দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। পরন্তু সাধারণতঃ ইঁহারা সরলপ্রকৃতি, পরোপকারী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ।

শ্রীমনোমোহন মিত্র।

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, পৌষ। [৯ম সংখ্যা।

বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

বোম্বাই হইতে চব্বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে কল্যাণী নগরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম পণ্ডিত সঙ্গমলাল এবং মাতার নাম যমুনাদেবী। সঙ্গমলাল নিজ পুত্রের নাম বংশীধর রাখিয়াছিলেন। বংশীধর বাল্যকালে মৃগী-রোগাক্রান্ত হইলে, তাঁহার মাতাপিতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বংশীধরের বয়স যখন চারি বৎসর, সেই সময় একদা বংশীধর আপনার স্নেহময়ী মাতাকে বলিলেন, মা! আমার সেই পুস্তকখানি কোথায়? পুত্রের এই প্রকার কথা শুনিয়া খেলা করিবার জন্ত তিনি বংশীধরকে একখানি পুস্তক প্রদান করিলেন। ইহা দেখিয়া বংশীধর বলিলেন, মা! আমি এ পুস্তকখানি চাহিতেছি না, আমার সেই পুস্তকখানি কোথায়? বোধ করি, উহা আমার কুটীরের মধ্যে থাকিতে পারে, উহা পাইলে আমি নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হইব। মাতাপিতা উভয়েই বালকের এই কথার কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না।

কল্যাণী নগর হইতে এগার ক্রোশ দূরে, ওগ্রাৎ নামক গ্রামে, কার্ণা নদীর সঙ্গমে প্রত্যেক বৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। এই স্থান তীর্থস্বরূপে পরিগণিত। এই মেলার অধিবেশন সময়ে এখানে পুণ্য-সঞ্চয়-অভিলাষে বহু লোক স্নানার্থে আগমন করিয়া থাকেন। মেলার সময়ে বংশীধর পিতামাতার সহিত উক্ত স্থানে তীর্থস্নান হেতু গমন করিয়াছিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বংশীধর একটী পর্ণকুটীর দেখাইয়া মাতাকে বলিলেন, মা, আমার পুস্তকখানি ঐ কুটীরের মধ্যে আছে, তুমি উহা আমাকে আনিয়া দাও।

বংশীধরের মাতা প্রিয় পুত্রের ঈদৃশ উক্তি শ্রবণ করিয়া, উক্ত কুটীর-সমীপে উপনীত হইলেন, এবং তথায় এক সন্ন্যাসীকে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বংশীধরের আবেদন অবগত করাইলেন। পরে অনেক অন্বেষণ দ্বারা একখানি হস্ত-লিখিত জীর্ণ পুস্তক উক্ত পর্ণকুটীরের চাল হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন, এই পুস্তকখানি আমার গুরুদেবের ছিল। তিনি, তাঁহার মৃত্যুকালে আমাকে ইহা অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিলেন, পরন্তু আমি সেই সময় অনেক অন্বেষণ করিয়াও ইহা খুঁজিয়া পাই নাই। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ বংশীধরের দিকে চাহিয়া রহিলেন; অতঃপর বলিলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপ, এই বালক, পূর্ব্বজন্মে আমার গুরুদেব ছিলেন।

নচেৎ কিরূপে এ প্রকার স্মৃতি উৎপন্ন হইল। তিনি বংশীধরকে এই পুস্তকখানি দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। কথিত আছে, বংশীধর উক্ত পুস্তকখানি পাইবার পর ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত হইলেন।

বংশীধর পঞ্চ বৎসর বয়সের সময়ে পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। কল্যাণী নগর মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত। সম্মুখে,—পূর্ব্বভাগে পর্ব্বতমালা উদয়াচলের ন্যায় মনোহর দৃশ্যে দণ্ডায়মান আছে। নগরের অনতিদূরে সুবিস্তৃত কল্যাণী নদী তরতরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। কল্যাণীবাসিগণের অধিকাংশই মহারাষ্ট্রীয় এবং তণ্ডুলাহারী। কোন কোন গ্রন্থে বংশীধরকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরন্ত বংশীধর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ইহাঁর পিতা মধ্য-ভারতের অবন্তিকা অর্থাৎ উজ্জয়িনী নগরের সন্নিকটস্থ একটী পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কল্যাণী-নগরে আসিয়াছিলেন। তথায় ইনি সবসুখরাম নামক এক নিজাম রাজ-কর্ম্মচারীর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া কল্যাণী নগরের স্থায়ী অধিবাসী হন। বংশীধর বাল্যকাল হইতেই মৎস্যমাংসাদিবর্জ্জিত ছিলেন। ইনি গো-দুগ্ধ ও উদ্ভিজ্জ সহযোগে অন্নাহার করিয়া দেহের পরিপুষ্টতা লাভ করেন। এইরূপ সাত্বিক আহারে তাঁহার মেধাশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং মস্তিষ্ক সর্ব্বদা শীতল থাকিত। কল্যাণী-নগরের শীতোষ্ণতা প্রায় নিম্ন বঙ্গের ন্যায়, বৃষ্টিপাতও বঙ্গদেশের ন্যায় হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসিগণের আকৃতি বঙ্গদেশবাসীদিগের অনুরূপ। ইহাদিগের নিকৃষ্ট জাতিরা মৎস্য মাংস আহার করে। সমাজের উচ্চ জাতীয়েরা মৎস্যমাংসবর্জ্জিত, সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, পরোপকারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সংস্রবে থাকিয়া, বংশীধর সদ্ভাব ও সৎ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমকালে, বংশীধরের পিতৃবিয়োগ হয়, তদবধি তিনি মাতুলের আশ্রয়েই লালিত পালিত হইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বংশীধর মহারাষ্ট্রীয় এবং ফার্সী ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে তিনি অশ্বারোহণ ও অস্ত্রচালনা বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। একদা মোহনসাহ * নামক নবাবের একটী অশ্বকে বংশীধর বিশেষরূপে প্রহার করিয়াছিলেন। ইহাতে অশ্বটী প্রাণত্যাগ করে। তখন নবাব সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বংশীধরকে কারাগারে প্রেরণ করেন। বংশীধরকে কিছুকাল কারাগারে বাস করিতে হয়। এই অমঙ্গলের ভিতরই ভাবী মঙ্গল নিহিত ছিল। এক্ষণে বংশীধর গভীর চিন্তার অবসর পাইলেন। অসীম প্রজ্ঞাবলে তাঁহার মনে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার সকল উক্ত কারাবাস কালেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। অতঃপর কারাবাসের নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে, বংশীধর কিছুদিনের জন্য মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছু দিন পরেই তাঁহার মাতাঠাকুরাণী লোকান্তরিত হইলেন। এক্ষণে সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইল। অল্প বয়সেই মাতাপিতৃহীন হইয়া বংশীধর এক প্রকার উদাসীন ভাবাপন্ন হইলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই

* মোহনসাহ নবাব নিজাম সরকারের অধীন ছিলেন। তাঁহার সেনানায়ক সুন সুবেদার নামক এক ব্যক্তির অধীনে বংশীধরের মাতুল সবসুখরাম কার্য্য করিতেন।

তিনি পূর্ণ বৈরাগ্যভাব প্রাপ্ত হইলেন। সংসারে আর তাঁহার মন তিষ্ঠিল না। এক দিন কাহাকেও কিছুই না বলিয়া নিশীথ সময়ে গোপনে তিনি মাতুলালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরমুখে পঞ্চবটী বন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর নিবিড় অরণ্যাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন করিয়া নাসিক * সহরে উপনীত হইলেন। এক্ষণে তাঁহার মন সদ্‌গুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি শূন্যমনে হতাশপ্রাণে দেশে দেশে গুরুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নাসিক হইতে বার মাইল দূরবর্ত্তী পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের তলদেশে—যেখানে পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই স্থানের নাম ত্র্যম্বক। বংশীধর নাসিক হইতে ত্র্যম্বক যাইয়া, ত্র্যম্বকেশ্বর নামক মহাদেবের দর্শন করিলেন, এবং তথাকার সন্তোষী বৈরাগী সাধু মহাত্মাদিগের পর্ণকুটীরে যাইয়া তাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক একে একে সকলের সহিত আলাপ করিলেন। অতঃপর নাসিক নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদীর তীরভাগে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে কিছুদিন বাস করিলেন। এইখানে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের নিকট বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের শ্লোক সকল কণ্ঠস্থ করিলেন। অধিকাংশ নাসিকবাসীই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই ইহার অর্থ অবগত নহেন। ইহা দেখিয়া বংশীধর অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। পরন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই এই প্রকার অর্থশিক্ষাহীন বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। বৈদিক মহাভাষ্য ব্যাকরণ, বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্প লোকেই পাঠ করিয়া থাকেন। বংশীধর শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ, বেদের এই ছয় অঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র শিক্ষা ও কল্প অঙ্গ নাসিকনগরে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাদশ বৎসর।

কিছুকাল নাসিক নগরে বাস করিয়া পরে তিনি সেখান হইতে পদব্রজে উত্তর মুখে গমন করিলেন। এইবার তিনি কঠিন মরুবৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাপ্তী নদী অতিক্রমপূর্ব্বক নর্ম্মদাতীরস্থ ওঙ্কারেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ওঙ্কারেশ্বর পবিত্র স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মদার উত্তর তীরে অবস্থিত। তথায় নর্ম্মদার উত্তর তীরে উন্নত পর্ব্বতমালা প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান আছে। ওঙ্কারেশ্বর হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ, এবং সন্ন্যাসীদিগের একটী মড়ি অর্থাৎ মঠের শাখা-আশ্রমবিশেষ। এখানে শিবপুরী, ব্রহ্মাপুরী, ও বিষ্ণুপুরী নামে তিনটী স্বতন্ত্র পর্ব্বতশিখর বর্ত্তমান আছে। উক্ত পর্ব্বতোপরি সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম নির্ম্মিত। প্রাচীন কাল হইতে বহুসংখ্যক সাধু মহাত্মা এখানে বিদ্যাভ্যাস এবং যোগসাধনায় আজীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। বংশীধর ঐ স্থানে কোন সিদ্ধ পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভের আশায় গমন করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তিনি কয়েক দিবস পূতসলিলা নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও উক্ত প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগৃহে অন্নমাত্র ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। বহুর পর্ব্বতমালা মধ্যে নানা গুহা ও নানা কুটীরে বিচরণ করিয়া ঈপ্সিত বস্তুর অনুসন্ধান করিলেন। পরন্তু ওঙ্কারেশ্বর পর্ব্বতে তাদৃশ উক্ত

* এইস্থলে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন, এই জন্য উক্ত স্থানের নাম 'নাসিক' হইয়াছে।

তাঁহাদের মহাত্মা না পাইয়া তিনি উজ্জয়িনী নগরে মহাকালেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক ক্রমশঃ উত্তর মুখে প্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়া, রাজধানী দেওয়াস ও সীপরী নগর অতিক্রম করিয়া গোয়ালিয়রে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণের সন্দেহ হেতু তিনি বিনা দোষে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পরে রাজবিচারে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইলে তিনি কারামুক্ত হন। অনন্তর তিনি গোয়ালিয়র ত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিঠুর নগরে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সাধু মহাত্মা ও মহারাষ্ট্রীয় * ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সৎসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

বংশীধর বিঠুর হইতে হরিদ্বার কনখলে উপস্থিত হইয়া, হৃষিকেশ, লক্ষ্মণঝোলা, ব্যাসসঙ্গম, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যাশ্রম, গুপ্তকাশী, ত্রিজুগিনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কেদারনাথ তীর্থে উপস্থিত হইলেন। উত্তরাখণ্ডের কঠিন পার্ব্বত্য প্রদেশে বিচরণ এবং অনাহার বশতঃ বংশীধর একণে নিতান্ত ক্ষীণকলেবর হইলেন। এই সময় তাঁহার অন্তঃকরণ এক পবিত্র সুধাময়ভাবে যেন সর্ব্বদা সিক্ত এবং উন্মত্ত থাকিত। তিনি কোন দিবস কেবল ঝরণার সুশীতল জল পান করিয়া বন্ধুর পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেন, কোন দিন বা যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলাদি আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। হিমালয়ের কঠিন শৈত্য প্রযুক্ত রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। এই বিনিদ্র নিশীথে তিনি ভগবানের নামগান করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এই লোকসমাগমশূন্য স্থানে হিমালয়ের অরণ্যমধ্যে বহু রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরন্তু তিনি সকল প্রকার শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তুঙ্গনাথের পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। পরে গোপেশ্বর চামেলি, পিপলচটি, কুমারচটি, খদিমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পণ্ডকেশ্বর হইয়া পবিত্র স্বর্গধামতুল্য বদরিকাশ্রমে উপনীত হইলেন।

বদরিকাশ্রমের চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। পরে হৃষিকেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, গোবিন্দ স্বামী নামক এক মহাত্মার সৎসঙ্গে দীর্ঘকাল বেদান্ত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করেন। ইঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া তিনি ব্রহ্মবিদ্যায় নিপুণ হইলেন। এইবার তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি দেশে দেশে সদ্গুরু লাভের আশায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার মনোমত গুরু পান নাই। বারাণসী ধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বে গৌড় স্বামীর আশ্রম অবস্থিত। গৌড়স্বামীর বেদ-পাঠশালা ছিল। বংশীধর এইখানে উত্তমরূপে বেদাভ্যাস ও ন্যায়, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসা বৈশেষিক প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া অবশেষে গৌড়স্বামীর নিকট দণ্ডাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী নাম প্রাপ্ত হন। তদবধি ইনি উক্ত আশ্রম অভ্যন্তরেই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গৌড়স্বামীর আরও তিন জন শিষ্য সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বরূপ স্বামী নামক এক দণ্ডী গৌড়স্বামীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বিশ্বরূপ বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি এক দিবস স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সহিত বিচারে পরাস্ত হন।

* মহারাজ বাজিরাও পেশোয়া পুনা হইতে অনেক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া ইংরাজ আজ্ঞায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিঠুরে বাস করিয়াছিলেন। তদবধি বিঠুরে অনেক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়স্বামীর দেহত্যাগ হয়। অন্তিমকালে, তিনি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীকেই স্বীয় আশ্রমের যোগ্যস্থ করিয়া যান। তাঁহার পরবর্তী সময় হইতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বেদ-পাঠশালায় ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতেন ও কাশীবাসী তাবৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মহিমা প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের মনুষ্যই অবগত হন। অনেক রাজা মহারাজ মহাত্মা বিশুদ্ধানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ করিতেন।

বিশুদ্ধানন্দ মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। তিনি কৌপীন ব্যবহার করিতেন। কদাচিৎ কখন শীত ঋতুতে পশুলোম নির্ম্মিত বস্ত্রে দেহাচ্ছাদন করিতেন।

ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক হিন্দুরাজা তাঁহাকে প্রণামীস্বরূপে বহু অর্থ ও নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দিতেন; পরন্তু তিনি তাহা স্পর্শও করিতেন না। তাঁহার আশ্রমের এক প্রান্তে চাতের উপর জাহ্নবী-সম্মুখে পিঞ্জরাকৃতি একটি ক্ষুদ্র কুটীরে কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া তিনি একাকী উপবিষ্ট থাকিতেন, বৃথা বাক্যালাপ করিতে তাঁহার কদাপি অভিরুচি হইত না।

এক দিবস বারাণসীর মহারাজ কতকগুলি উৎকৃষ্ট লেংড়া আম্র লইয়া, বিশুদ্ধানন্দের সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। বিশুদ্ধানন্দ এক একটী করিয়া, ক্রমশঃ সমস্ত আম্রই বানরদিগকে প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে কাশীরাজ বিস্মিত হন, এবং কিছুই বলিতে ভরসা না করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উপবিষ্ট থাকেন। কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে, সুবর্ণনির্ম্মিত যোয়াস্ত কলমে লিখিতে দেখিয়া, করযোড়ে জিজ্ঞাসা করেন, হে হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ মহাশাস্ত্রজ্ঞ স্বামীজি মহারাজ, আপনি সমুদয় শাস্ত্রোক্তি অবগত থাকিয়াও কিজন্য সন্ন্যাসধর্ম্মের অস্পৃশ্য সুবর্ণ স্পর্শ করেন? তাঁহার উক্তির উত্তরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, দেখ তোমরা শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম কিছুই অবগত নহ, সন্ন্যাসী শব্দের সাধারণ অর্থ ত্যাগ এবং প্রকৃত অর্থ হেয়াহেয়, প্রিয়াপ্রিয় পদার্থে সমবুদ্ধি লাভ অর্থাৎ স্পৃহাহীনতা। সুবর্ণ স্পর্শ করিলেই পাপ উৎপন্ন হয় না, আসক্তিই পাপের অন্য নাম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে—

সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ অর্থাৎ লোষ্ট্র এবং কাঞ্চনে সমবুদ্ধি হওয়া চাই।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্ কার্য্যম্ কর্ম্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ।

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া সর্ব্বদা বাসনাহীন হইয়া কর্ম্ম করেন, সেই ব্যক্তি সন্ন্যাসী এবং যোগিপদবাচ্য। অগ্নিবর্জ্জিত কিংবা সৎকর্ম্মবর্জ্জিত ব্যক্তি সন্ন্যাসী নহেন। এই বাক্য ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের সর্ব্বপ্রথমেই লিখিত আছে।

বিশুদ্ধানন্দের নিকট শাস্ত্রার্থ অবগত হইবার জন্য সুদূর জর্ম্মনদেশবাসী সংস্কৃত-পাঠার্থী পণ্ডিতগণ আগমন করিতেন। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর মধ্যে অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাবিৎ ছিলেন না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ জাহ্নবীজলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু রাজগণের নিকট হইতে যাহা কিছু উপঢৌকনস্বরূপে পাইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ সওয়া লক্ষ মুদ্রা। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত মুদ্রার সাহায্যে দণ্ডী সন্ন্যাসীদের অন্নসত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে।

বিশুদ্ধানন্দ একজন রাজযোগী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধক ছিলেন। তিনি যখন জাহ্নবীতে স্নান করিতে নামিতেন, গঙ্গার সোপানাবলীর উপর তাঁহার সেবকগণ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চামর দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিত। তিনি স্থূলদেহধারী, তেজস্বী, সিংহসদৃশ উন্নতস্বভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহার ভোগবিলাসস্পৃহা, কিংবা অর্থলোভ কিছুমাত্র ছিল বলিয়া, কেহ কখনও অনুমান করিতে পারে নাই। বিশুদ্ধানন্দ স্বনামধন্য এবং বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের অমূল্য রত্ন স্বরূপ ছিলেন। ভারতের হিন্দুমাত্রেই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া পবিত্রচিত্ত হইত। তিনি বেদান্তের প্রকৃত উক্তির স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মৈব ভবতি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করেন। তিনি প্রকৃতই ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন, "দণ্ডগ্রহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ," এ কথা মিথ্যা, জ্ঞানদণ্ড ধারণ ব্যতিরেকে কেহ বংশদণ্ড ধারণে নারায়ণ হইতে পারেন না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

এক জীববাদ।

আর্য্য দার্শনিকগণ জীবতত্ত্ব লইয়া আবহমান কাল হইতে বিচার করিয়া আসিতেছেন। এই বিচারের ফলে অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে আর্য্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় অপর কোন জাতিই নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া বিজ্ঞসমাজে অদ্যাপি যশস্বী হইতে পারেন নাই। যদ্যপি বর্ত্তমান প্রতীচ্য কৃতবিদ্য কতিপয় ব্যক্তি অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা যে প্রকৃত পন্থা ধরিয়া উঠিতে পারিয়াছেন, ইহাতে কোন প্রবুদ্ধ ব্যক্তিই প্রত্যয়ান্বিত হইতে পারেন না। Telepathy (চিত্ত সংক্রমণ) Hypnotism (সম্মোহন) অথবা Trance (আবেশ) প্রভৃতিকে ভিত্তি করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলে উহা যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রবল বাত্যায় অটুট থাকিবে এরূপ আশাকে দুরাশা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আর্য্যভূমিতে যখন এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যে সবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তদধ্যুষিত কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই এইগুলির মহিমায় মুহ্যমান হইতে পারেন না। ফলতঃ বিচারবিধৌত-বুদ্ধি তত্ত্বদর্শী ব্যতিরেকে কে যে ভূতপ্রেতের সাহায্যে আত্মবিদ্যার সুখসেব্য সুশীতল সমীরণে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার এই মর জগতে বিরল। তবে ইহা সত্য যে, এই প্রকার আলোচনার প্রভাবে তাঁহারা জড়বাদের প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রশস্ত বর্ত্ম ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইবেন।

এই জীবতত্ত্ব বিচারের প্রকৃষ্ট পরিণতি যে এক জীববাদ ইহা মতিমান্‌কে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কেন না, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় জীবগত পার্থক্য জ্ঞানগোচর হইলেও সুষুপ্তি অবস্থাতে তৎসম্পর্কিত ভিন্ন ভাব আমরা কোন প্রকারে ধরিয়া উঠিতে পারি না। জাগ্রৎ রামের বাহ্য ও আভ্যন্তর ক্রিয়াকলাপ তথাবিধ শ্যামের তথাবিধ ক্রিয়াকলাপ হইতে ভিন্ন বটে; কিন্তু সুষুপ্তিতে—ঐ উভয়ই একীভাবাপন্ন—ঐ উভয়েরই অন্তর্ব্যাপার ও বহির্ব্যাপার স্ব-কারণে অন্তর্গত। এইরূপে স্বপ্ন অবস্থাও উহ্য করিয়া লইবে। যেরূপ বিভিন্ন মনুষ্যের সুষুপ্তিতে একীভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ

তদিতর জীব ও তৎসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। জাগ্রৎ বা স্বপ্ন অবস্থায় বিভিন্নজাতীয় জীবের বিভিন্নত্ব উপলব্ধিকে আপাততঃ ভ্রম বলিয়া বুঝিয়া লইলেও সুষুপ্তিতে যে, নিখিল জীবই একত্ব-জলধিতে নিমগ্ন এই ধ্রুব সত্যকে কেহই মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত এরূপ দার্শনিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা সুষুপ্ত জীবের ভিন্ন ভাব বুঝাইয়া দিতে পারে—যাহা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার ন্যায় সুষুপ্তিকেও ভিন্নতার পূতিগন্ধে কলুষিত করিতে পারে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই প্রত্যহ সুষুপ্তি অবস্থা ঘটে, কিন্তু ঐ অবস্থার অস্তত্ত্ব প্রকৃতরূপে "ইদমেব তত্ত্বং" বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে, এইরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ অতীব দুর্লভ।

এই স্থলে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে, যেরূপ সুষুপ্ত জীবের অবস্থাগত একত্ব দেখিয়া জাগ্রৎ-স্বপ্ন-অবস্থাপন্ন জীবের তথা-ভাব স্বীকার করিতেছ, তদ্রূপ এই উভয় অবস্থাপন্ন জীবের পার্থক্য দেখিয়া সুষুপ্ত জীবেরও কেন তাহা বল না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সুষুপ্তি, জীবের মৌলিক অবস্থা, সুতরাং উহার একত্বে তাহার মৌলিক অবস্থার ঐক্য নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইয়া গেল। আর জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থা যে আগন্তুক মায়াবিলাস বা কার্য্য-ভাবাপন্ন ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য। যদিও ঐ অবস্থা যুগলকে মায়া-বিলাস বলিতে কোন কোন মতবাদীর আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু উহাদের অলৌকিকত্ব ও কার্য্যত্ব বিষয়ে কোন মতবাদীরই অনুযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সুষুপ্তিতে যে জীবের মন প্রভৃতি স্বকীয় উপাদানে বিলীন হইয়া যায় এই সম্বন্ধেও কোন বিবাদ নাই। এই জন্য এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কোন বাধা রহিল না যে, কার্য্য অবস্থাতে জীবের কার্য্যোপাধি জনিত পার্থক্য বা নানাত্ব প্রমাণিত হইলেও কারণ অবস্থাতে তাহার একত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। "সুখমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষং" এই স্মৃতি যখন প্রত্যেক সুপ্তোত্থিত ব্যক্তিরই অভিন্ন, তখন যে সুখ ও অজ্ঞানানুভূতিরূপ সুষুপ্তি অবস্থা একী-ভাবাপন্ন ইহাতে সন্দেহ করিতে পারা যায় না। আর সুপ্তব্যক্তিদিগের শরীরাদিগত পার্থক্য জাগ্রৎ জীবই অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু সুপ্ত জীব নহে; সুতরাং তথাবিধ অবস্থাপন্ন জীবের শরীরাদি-সম্পর্কিত পার্থক্য জ্ঞানও সুপ্তজীবের নহে। মনে কর, যদু, উপেন ও নরেন একত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, চতুর্থ হেম আসিয়া তাহাদিগের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দেখিতেছে। এই স্থলে দ্রষ্টা হেম জাগ্রৎ অবস্থার লোক, আর যদু প্রভৃতি সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন কিন্তু তাহারা আপন শরীরাদি সম্পর্কিত ভিন্নতার লেশমাত্রও অনুভব করিতে পারিতেছে না। যদিও ঐ ভিন্নতার ন্যায় পরস্পর একত্বেরও জ্ঞান তাহাদের নাই, তথাপি তাহারা সুষুপ্তিভঙ্গের পরে প্রভাবিত স্মৃতির ঐক্যদ্বারা ঐ অবস্থার ঐক্য বুঝিয়া লইতে পারে। পক্ষান্তরে উক্ত চতুর্থ ব্যক্তি কেবল শরীরাদির পার্থক্যই দর্শন করে, কিন্তু তিনি অভ্যন্তরীণ ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ইহাও বিবেচ্য যে, জীবের প্রকৃতস্বরূপ চৈতন্য অংশের ভিন্নতা বা পার্থক্য প্রমাণ করিতে যখন কেহই সমর্থ নহে, তখন তাহার উপাধিভূত অজ্ঞান বা অবিদ্যার মূল স্বরূপের পার্থক্যসিদ্ধির উপর জৈবিক পার্থক্য সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে; কিন্তু মানব অন্ধ বিশ্বাসের শরণ না লইয়া যুক্তি-দ্বারা কোন প্রকারেই অজ্ঞানের মৌলিক পার্থক্য বুঝিয়া উঠিতে পারে না; প্রত্যুত

সুষুপ্তি অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে উহার একত্বই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে জীবের মৌলিক নানাত্ব-স্বীকারকারীকে কি বলিয়া অভ্রান্ত মানিয়া লওয়া যাইতে পারে? এইরূপে যখন জীবের নিজ মূল স্বরূপ ও তদীয় উপাধিভূত অবিদ্যার মূল স্বরূপ অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে কোন প্রতিবন্ধক দেখা যায় না, তখন একজীববাদকে বন্ধমুক্তির ব্যবস্থা হয় না বলিয়া উপেক্ষা করা কখন বিচার-পাটবের পরিচায়ক হইতে পারে না। অবশ্য আস্তিকমণ্ডলীর মনে আপাততঃ বন্ধমুক্তির ব্যবস্থা না হইবার আশঙ্কা-জনিত একটা ভীতি আসিতে পারে, কিন্তু নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিলে পর বন্ধ ও মুক্তির মূর্ত্তিটাই মায়া-কল্পিত বিলাসে পরিণত না হইয়া থাকে না। যাহা হউক, একজীববাদ সম্বন্ধে যতিপ্রবর বেদান্ত মুক্তাবলীকার যে যুক্তিপ্রমাণোপেত সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসুমাত্রের উপাদেয় বিবেচনায় নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। গ্রন্থকার প্রথমে অজ্ঞানের একত্ব নিরূপণ করিয়া তদুপহিত জীবকে এক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

"তথাপি তদজ্ঞানমেকমনেকং বেতি
কথং নির্ণয় ইতি চেৎ একমেবেতি বদামঃ
কিং তত্র সাধকমিতি চেৎ উচ্যতে।
লৌকিকী বৈদিকী চাপি নাজ্ঞানে দৃশ্যতে
প্রমা।
কার্য্যাদৃষ্ট্যার্থকল্প্যং চেন্নাঘবাদেকমেবতৎ।৮

"নির্ব্বিষয় চিন্মাত্র শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হইলেও উহা এক বা অনেক ইহার নিরূপণ কি প্রকারে হইতে পারে, এইরূপ যদি বল, তবে উত্তর এই যে, অজ্ঞান সম্বন্ধে লৌকিক প্রত্যক্ষাদি বা বৈদিক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু জগতের কার্য্য দেখিয়া অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা উহার কল্পনা করিতে হয়। বিশেষতঃ নানা অজ্ঞান মানিলে গৌরব হয় বলিয়া লাঘবতঃ উহাকে একই স্বীকার করা যাইতেছে।"

গ্রন্থকার স্বয়ংই কারিকার তাৎপর্য ব্যক্ত করিতেছেন—

"অজ্ঞানং কিং বেদসিদ্ধং উত প্রত্যক্ষাদি-সিদ্ধং উত পরিদৃশ্যমান কার্য্যান্যথানুপপত্ত্যা কল্প্যং। তত্র নাদ্যঃ পূর্ব্বকাণ্ডস্য কর্ম্মমাত্র-বিষয়ত্বাৎ বেদান্তানাংচ পরিপূর্ণসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মমাত্রবিষয়ত্বাৎ তত্রৈব ফলসম্বন্ধাৎ অজ্ঞা-নাদৌ তদভাবাৎ তদপ্রতিপাদকত্বাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ স্পষ্টপ্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বে বিবাদাভাব-প্রসঙ্গাৎ।"

"অজ্ঞান (মায়া) বৈদিক প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ অথবা অন্য প্রকারে দৃশ্যমান কার্য্য-জগতের বিশৃঙ্খলা হয় বলিয়া উহা কল্পনীয়। ১ম পক্ষ ঠিক নহে, কেন না বেদের পূর্ব্বকাণ্ড কেবল যাগাদি কর্ম্মকেই অধিকার করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড বেদান্তও একমাত্র পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই বিষয় করিয়া থাকে, কেন না উহাতেই সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তিরূপ ফলের সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞান প্রভৃতিতে নহে; আর উহাতে ঐ ফলের সম্বন্ধ বেদ প্রতিপাদন করে নাই। এইরূপে ২য় পক্ষও দোষ-সংপৃক্ত, কেন না অজ্ঞান সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষাদি সিদ্ধ হইলে তাহা লইয়া শাস্ত্রকারদিগের এত বাদ বিসম্বাদ হইত না।

গ্রন্থকার জগৎ প্রপঞ্চের পরিণাম উপাদান কারণ মায়া-পর নামক অজ্ঞানকে এক বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এই জন্য যে, উহা জীবচৈতন্যের উপাধি। আর উপাধির একত্ব ও অনেকত্বের উপর উপহিত বস্তুর একত্ব ও অনেকত্ব নির্ভর

করিতেছে বলিয়া উপাধিভূত অজ্ঞানের একত্ব প্রতিপন্ন হইলে তদুপহিত জীবেরও একত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

"তস্মাৎ স্বতোঽসঙ্গোদাসীনস্য সদা স্বানন্দতৃপ্তস্যাসত্যানেকবিধ সুখদুঃখাত্মক প্রপঞ্চরচনানুপপত্ত্যা অজ্ঞানং কল্প্যত ইত্যেবং বাচাং গত্যন্তরাভাবাৎ। তথাচ কল্প্যমান-মজ্ঞানমেকমনেকং বেতি বিবাদেঽপি একস্যাপি নিদ্রাদোষস্যানেকবিধ কার্য্য-জনকত্বস্য স্বপ্নে দৃষ্টত্বাৎ লাঘবসহকৃতান্যথানুপ-পত্তির্বিচিত্রশক্তিকমেকমজ্ঞানমাদায় বিশ্রাম্য-তীতি যুক্তং। অতএবাজ্ঞানস্য জীবো-পাধিত্বাত্তস্য চৈকত্বাত্তদুপাধিক আত্মা জীবো ভবন্নেক এব ভবতি ইত্যেকজীব-বাদিনো বদন্তি।

"অজ্ঞান সম্বন্ধে লৌকিক বা বৈদিক প্রমাণ নাই, সুতরাং স্বতঃ অসঙ্গ, নির্লেপ, নিরন্তর আনন্দসন্দোহ-সংতৃপ্ত, ব্রহ্মাত্মার পক্ষে মিথ্যাভূত, বিবিধ সুখদুঃখাত্মক, প্রপঞ্চের রচনা অসঙ্গত হয় বলিয়া উপায়ান্তর না দেখায় অজ্ঞান কল্পনা করা যাইতেছে এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, যেরূপ স্বপ্ন অবস্থাতে একই নিদ্রাদোষ তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বস্তুর কারণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কল্প্যমান অজ্ঞান এক বা অনেক এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও প্রকারান্তরে জগৎ-বৈচিত্র্য সঙ্গত হয় না বলিয়া লাঘবতঃ উহাদ্বারা বিভিন্ন শক্তিশালিনী এক মায়ার অর্থাৎ অজ্ঞানের কল্পনা করা যাইতেছে। পক্ষান্তরে এক অজ্ঞান জীবের উপাধি হওয়ায় তদুপহিত আত্মাই জীব হইয়া উঠিল; সুতরাং উহার একত্ব প্রতিপন্ন হইতে কোন বাধা রহিল না, এইরূপ একজীববাদীরা বলিয়া থাকেন।

"যথোক্তানুপপত্তিসিদ্ধার্থানুবাদিনী শ্রুতি-রপি। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" অস্যায়মর্থঃ—অসত্যস্য জগতো অবিদ্যাহেতুকত্বে বক্তব্যে সা কিং জন্যা অজন্যা বেতি সংশয়েন জন্যেতাহ অজামিতি। নচাবিদ্যাবাচকপদাভাবঃ অজা-মিত্যস্যৈব স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দিষ্টস্য তদ্বাচকত্বাৎ তস্যা অনেকত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি একামিতি। তস্যা বিচিত্রকার্য্যজননসামর্থ্যং ত্রিগুণাত্মকত্বেন সমর্থয়তে লোহিতেত্যাদিনা।"

অভিহিত অসঙ্গতিসিদ্ধ বিষয়ের অর্থাৎ এক অজ্ঞানের অপর পর্য্যায় মায়ার প্রতি-পাদনকারী বেদমন্ত্রেরও অভাব নাই। উহা এই "অনাদি মায়া এক, উহা ত্রিগুণশালিনী ও স্বসমানরূপ বহুবিধ কার্য্যজনিকা। এই মায়ার শরণ লইয়া জীব মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং ভোগ সমাপনান্তে ইহাকে পরিত্যাগ করিতেছে অর্থাৎ আত্মদর্শন মূলক বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হইতেছে। এই জীব স্বরূপত মায়া হইতে ভিন্ন ও এক।" এই বেদমন্ত্রের অর্থ এই যে, মিথ্যাভূত জগৎকে অবিদ্যাজনিত বলিলে এই সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয় যে, উহা জন্য বা অজন্য, সুতরাং ইহার উচ্ছেদার্থ "অজাং" এই বিশেষণ দ্বারা উহার জন্যত্ব নিষেধ করা হইতেছে। এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, এইস্থলে অবিদ্যাবাচক পদ নাই, কেন না স্ত্রীলিঙ্গান্ত "অজাং" এই পদই তাহার বাচক। "একাং" এই পদদ্বারা তাহার অনেকত্ব নিবারিত হইতেছে। "লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" এই বিশেষণাবলি দ্বারা মায়ার তিনগুণ আছে বলিয়া বিবিধ কার্য্যজননের সামর্থ্য সমর্থন করা যাইতেছে।

"তাদৃশাবিদ্যোপহিতস্য জীবস্যোৎপত্তিং নিরস্যতি অজ ইতি। তস্য জীবস্যানেকত্বং

নিবেধয়তি এক ইতি। নম্নু জীবগত-মনেকত্বং লোকে অনুভূয়তে তৎ কথং একত্বমিত্যাশঙ্ক্যাভেদস্যৌপনিষৎপ্রসিদ্ধত্বং যুক্তিসিদ্ধত্বং চ প্রসিদ্ধার্থেন "হি" শব্দেনাহ হীতি। নম্নু স্বয়ং-প্রকাশব্রহ্মাভিন্নত্বাজ্জীবস্য কথং তদ্বিলক্ষণাবস্থা ইত্যত আহ অনুশেতে ইতি। তামবিদ্যামনুসৃত্য নিদ্রিত ইব শেতে অজ্ঞানেনাবৃতঃ সন্ মুদ্রিতজ্ঞাননেত্রো ভবতি ইত্যর্থঃ। পশ্চাৎ কার্য্যাকারেণ স্থিতাং তামেব জুষমাণঃ সেবমানঃ সংসারী ভবতি স্বপ্নদৃগিবেত্যাহ জুষমাণ ইতি।"

'উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট অবিদ্যোপাধিক জীবের উৎপত্তির নিরাস হইতেছে "অজ" পদদ্বারা। "এক" পদ দ্বারা ঐ জীবের অনেকত্ব নিবারিত হইতেছে। যখন সকল লোকই জীব নানা এই প্রকারই অনুভব করিতেছে, তখন কি প্রকারে তাহার একত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কায় প্রসিদ্ধ "হি"শব্দ দ্বারা জীবের একত্বকে উপনিষৎ ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া কথিত হইতেছে। জীব স্বয়ং-প্রকাশ ব্রহ্মরূপ হওয়ায় তাহার ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ অবস্থা কিরূপে হইল এই অভিপ্রায়ে বলা হইতেছে "অনুশেতে"।

ইহার ব্যাখ্যা এই যে, ঐ অবিদ্যাকে অনুসরণ করিয়া জীব নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ অজ্ঞানে আবৃত হইয়া জ্ঞানচক্ষু মুদ্রিত করিয়া লইয়াছে। ইহার পরে জগৎকার্য্যরূপে পরিণত ঐ অবিদ্যার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। ইহার উদাহরণে স্বপ্নদ্রষ্টাকে রাখা যাইতে পারে; এই অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হইতেছে "জুষমাণ"।

"নম্নু অবিদ্যায়া অনাদিত্বেনাবিনাশিত্বাৎ অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ ইত্যত আহ জহাত্যেনামিতি। বাক্যোত্থতথাত্বসাক্ষাৎকারেণ নিবর্ত্তয়তি ইত্যর্থঃ। ত্যাজ্যা চেদবিদ্যা কথং তর্হি তামাশ্রিতবানাত্মেত্যাশঙ্ক্য ভোগার্থং হ্যবিদ্যাশ্রয়ণং ভোগস্য চ তয়া জনিতত্বাদিদানীং স্বাত্মদর্শনেন প্রয়োজনশূন্যাং মন্যমানো জহাতীত্যাহ ভুক্তভোগামিতি। ভুক্তো ভোগো যয়া সা তথেতি বিগ্রহঃ। নম্ববিদ্যাবিশিষ্টস্য জীবত্বাদবিদ্যা যয়া জীবস্বরূপান্তর্ভাবাৎ কথং জহাতীত্যুক্তমিত্যত আহ অজোঽন্য ইতি। অজো জীবঃ অবিদ্যাতোঽন্য এব নত্ববিদ্যান্তর্ভাবেন জীবত্বং অবিদ্যায়া জড়ত্বাৎ জীবস্য চেতনত্বাজ্জীবোপাধিত্বেন স্বীকারাচ্চেতি।"

অবিদ্যা অনাদি বলিয়া অবিনশ্বর হওয়াতে অবিদ্যার অত্যন্ত বিনাশরূপ মুক্তি সিদ্ধ হয় না এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, "জহাত্যেনামিতি।" অবিদ্যা যদি উপেক্ষণীয়ই বটে, তবে কেন আত্মা তাহাকে আশ্রয় করিল এইরূপ আশঙ্কায় কথিত হইতেছে যে, "ভুক্তোভোগাং" অর্থাৎ ভোগের জন্য অবিদ্যার আশ্রয় লওয়া, কেননা ভোগ অবিদ্যা হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু এইক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাক অবস্থায় উহাকে নিরর্থক মনে করিয়া আত্মা উহাকে পরিত্যাগ করে। ভুক্ত হইয়াছে ভোগ যাহা দ্বারা সে ভুক্তভোগা ইহাই সমাস বাক্য। অবিদ্যাবিশিষ্ট চৈতন্য জীব এবং অবিদ্যা জীবের স্বরূপে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে জীব কি প্রকারে তাহাকে ত্যাগ করে বলা যায়? এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন "অজোঽন্যঃ।" অজ শব্দের অর্থ জীব; উহা অবিদ্যা হইতে ভিন্নই বটে। জীব অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে অবিদ্যার জীবত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না, কারণ অবিদ্যা জড় আর জীব চেতন। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকারেরা অবিদ্যাকে জীবের উপাধিই বলিয়াছেন, তদীয় স্বরূপ কখন বলেন নাই।

এক্ষণে গ্রন্থকার উক্ত শ্রুতির অর্থ

করিয়া বন্ধমুক্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

"বন্ধমোক্ষব্যবস্থা স্যাজ্জীবাভেদে কথং তব।
যথাদৃষ্টং তথৈবাস্তু দৃষ্টত্বাৎ স্বপ্নদৃষ্টবৎ ॥" ৯।

নম্বেক এব চেজ্জীবঃ কথমেকো মুক্ত একো বদ্ধ ইতি ব্যবস্থিতিঃ। ননু কাত্রানুপপত্তিঃ অনুভবসিদ্ধত্বাদ্বৈতস্য অনুভব এব নোপপদ্যতে একমুক্ত্যা সকলসংসারোচ্ছেদাদিতি চেৎ ন অন্তঃকরণাদের্যথাযথমাবিদ্যকস্য স্বীকারাৎ করণানুপপত্ত্যভাবাৎ বিষয়াভাবাৎ প্রামাণ্যানুপপত্ত্যানুপপন্নোঽনুভব ইতি চেৎ তত্র বক্তব্যং কীদৃশো বিষয়োঽপেক্ষিতঃ ব্যবহারযোগ্যশ্চেদস্ত্যেবাসৌ পরমার্থসত্যশ্চেৎ কথমেবং ভবিষ্যতি একত্বস্যৈব বেদতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ তত্রৈব ফলসম্বন্ধাৎ ভেদস্য সর্ব্বস্য প্রতিপন্নোপাধৌ নেতি নেতি ইতি বাক্যেন নিষিধ্যমানতয়া মিথ্যাত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ।"

"প্রশ্ন হইতেছে যে, তোমার মতে জীব এক হইলে পর কি প্রকারে বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, অনেক জীববাদপক্ষে যেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এক জীববাদ পক্ষেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সেইরূপই হউক, কেন না উভয় পক্ষেই তুল্যরূপে উহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

গ্রন্থকার স্বয়ং এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—

জীব যদি একই হইল, তবে কোন ব্যক্তি বদ্ধ কোন ব্যক্তি মুক্ত এইরূপ ব্যবস্থা কি প্রকারে হয়? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, যখন দ্বৈত প্রপঞ্চ অনুভব-সিদ্ধ তখন কোন বিপ্রতিপত্তিই নাই। আর যদি বল যে, এক ব্যক্তির মুক্তি হইলেই নিখিল সংসারের বিলোপ হওয়ায় অনুভবই অসঙ্গত হইয়া উঠে, তবে বলিতেছি যে, যথাযোগ্য অবিদ্যা-জনিত অন্তঃকরণ প্রভৃতি স্বীকার করা যাইতেছে বলিয়া অনুভবসাধক করণের অনুপপত্তি হয় না। পক্ষান্তরে অনুভবের বিষয় নাই বলিয়া প্রমাণের অসঙ্গতিমূলক অনুভবের অসঙ্গতি হইয়া উঠিল এইরূপ যদি আপত্তি কর, তবে তাহার ভঞ্জনার্থ বলিতেছি যে, কিরূপ বিষয় তুমি চাও? যদি ব্যবহারযোগ্য বিষয় তোমার অভিমত হয়, তবে তাহা বিদ্যমানই আছে। আর যদি পরমার্থ সত্য (ত্রিকালাবাধ্য) বিষয় তোমার অভিমত হয়, তাহা অসম্ভব, কেন না একত্বই বৈদিক তাৎপর্য্যের বিষয়; একত্বেই সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিরূপ ফলের সম্বন্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার ভেদভাবের পরব্রহ্মে "নেতি" "নেতি" বাক্য দ্বারা নিষেধ করাতে প্রতীয়মান দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"বেদ এব বামদেবাদের্জ্ঞানং শ্রূয়তে ইতি চেৎ সত্যং তস্য জীবভেদাপ্রতিপাদকত্বাৎ। শ্রুতার্থানুপপত্ত্যা কল্প্যত ইতি চেৎ ন নিশ্চিতার্থ জীবৈক্যপ্রতিপাদকবাক্যান্তরবিরোধেন কল্পনানুপপত্তেঃ। নন্বেকজীবপক্ষে একমুক্ত্যা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন একত্ববাদিনং প্রতি সর্ব্বত্বস্য নিরূপয়িতুমশক্যত্বাৎ। তথাপি বহবো জীবা অনুভব সিদ্ধা ইতি চেৎ ভবতু তর্হি স্বপ্নবদ্ব্যবস্থা।

বামদেবাদির তত্ত্বজ্ঞান বেদেই উপদিষ্ট হইয়াছে এইরূপ যদি বল, তবে ইহার উত্তরে বলিতেছি যে, উহা জীবের বিভিন্নতা প্রতিপাদন করে না। ব্যক্তিবিশেষ বামদেব বিভিন্ন ব্যক্তিরূপ শ্রুত অর্থের অনুপপত্তি হয়, এইজন্য উহা কল্পনা করা যাইতেছে এইরূপ বলাও অসঙ্গত, কেন না জীবের সুনিশ্চিত একত্ব অভিধায়ক অপর বেদবাক্যের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া উক্ত কল্পনাকে কোন প্রকারে অসঙ্গতি দোষ হইতে

নির্ম্মুক্ত করিতে পারা যায় না। আর যদি বল যে, এক জীববাদ পক্ষে এক ব্যক্তির মুক্তিতে নিখিল ব্যক্তিরই মুক্তি প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, তবে বলিতেছি যে, তাহা নহে, কেন না একত্ববাদীর প্রতি অনেকত্ব ঘটিত সর্ব্বত্বের নিরূপণ করাই শক্তির অতীত। তাহা হইলেও জীব যে অনেক ইহা অনুভব সিদ্ধ এইরূপ আপত্তি তুলিলেও কোন ফলোদয় হইবার নহে, কেন না স্বপ্নে যেরূপ একই জীব হস্তী ঘোটকাদি বিবিধ জীব কল্পনা করিয়া লয়, সেইরূপ এক জীবেরই কল্পিত নানাজীব এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে।

নমু স্বপ্নে এক এব স্বপ্নদৃক্ পরমার্থসত্যঃ অন্যে তদুপকল্পিতাঃ সর্ব্বে এবং জাগরেঽপি এক এব পরমার্থসত্যঃ অন্যে সর্ব্বে কল্পিতাঃ তথাচ বহূনাং মধ্যে কোঽসাবেক ইত্যনিশ্চয়ে কঃ শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্তেতেতি সাধনানুষ্ঠানাভাবেঽনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ ইতি চেৎ নূনং দেহাত্মবাদমাশ্রিত্য ভ্রান্তোঽসি, কথমিতি-চেৎ, শৃণু স্বপ্নেঽন্যে জীবাঃ কল্পিতা ইতি কোঽর্থঃ।

এইরূপ যদি বল যে, স্বপ্ন অবস্থার এক স্বপ্নদ্রষ্টাই পরমার্থ সত্য, অপর সমুদায় জীব তাহারই ভ্রান্তি কল্পনা করিয়া থাকে। এই-জন্য বহু জীবের মধ্যে কোন্‌টি পরমার্থ সত্য এবং কোন্‌টী কল্পিত ইহার নির্ণয় না হওয়াতে অনির্দিষ্ট বিষয়ের শ্রবণাদিতে কেহই প্রবৃত্ত হইবে না, সুতরাং সাধন-অনুষ্ঠানের অভাবে জগতে কাহারও মুক্তি সিদ্ধ হইবে না। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে নিশ্চয়ই তুমি দেহাত্মবাদের প্রলোভনে পড়িয়া ভ্রান্তিতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছ। যদি বল যে, এইরূপ কেন তুমি বলিতেছ, তবে শুন, স্বপ্ন অবস্থার অপর জীব কল্পিত ইহার অর্থ কি?

"কিং দেহাদেব গন্ধর্ব্বাদিসংজ্ঞকাঃ কল্পিতাঃ উতাজ্ঞানোপাধিকো জীবোঽস্মদ-ভিমতস্তাদৃশো এব বহবোঽত্র কল্পিতাস্তেষাং মধ্যে একঃ সত্যঃ অন্যে কল্পিতা ইতি। নাদ্যঃ দেহানাং কল্পিতত্বেঽপ্যবিরোধাৎ। নহি দেহং বা দেহাবচ্ছিন্নং বা শ্রবণাদ্যধিকারিণং ব্রূমঃ যেনাবিনিগমকো দোষঃ স্যাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ অজ্ঞানাবচ্ছিন্নস্য স্বপ্নে ভেদানমুভবাৎ। নহি পরাজ্ঞানাবচ্ছিন্নঃ পরস্য প্রত্যক্ষো ভবিতু-মর্হতি। তথাপি তত্তদ্দেহচেষ্টয়ানুমীয়ত ইতি চেৎ ন একেনাপ্যনেকদেহচেষ্টো-পপত্তেঃ। নৈয়ায়িকানাং কায়ব্যূহদশায়াং যোগিদেহবৎ।"

দেহভেদেই কি গন্ধর্ব্বাদি নামক নানা-জীব স্বপ্নে কল্পিত, অথবা আমাদের অভি-মত যে অজ্ঞানোপাধিক জীব তদ্রূপই অনেকগুলি অনুভূত হয়, এবং ঐগুলির মধ্যে এক সত্য, কিন্তু অপর সকলেই কল্পিত?

১ম পক্ষ ঠিক নহে, কেন না, নানা শরীর কল্পিত হওয়ায় শরীরাবচ্ছিন্ন জীবের বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থাতে কোনই আঘাত লাগে না। পক্ষান্তরে শরীর বা শরীরাবচ্ছিন্নকে আমরা শ্রবণাদির অধিকারী বলিতেছি না, সুতরাং এই বিষয়ে একতর নিশ্চয়ের অভাব-রূপ দোষ আসিতে পারে না।

২য় পক্ষও ঠিক নহে, কেন না স্বপ্নে অজ্ঞানাবিচ্ছিন্ন জীবের ভিন্নতা এই জন্য অনুভূতির বিষয় নহে যে, অপরের অজ্ঞানা-বচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যকে অপরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারে না; তথাপি বিভিন্ন দেহের চেষ্টা বিভিন্ন হয় বলিয়া প্রত্যক্ষ না হইলেও উহাদ্বারা জীবগত ভিন্নতা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এইরূপ বলাও ঠিক নহে; কারণ এক জীবচৈতন্য দ্বারাও তৎ-সম্বন্ধ অনেক দেহের চেষ্টা সম্পন্ন হইতে পারে। ইহার উদাহরণে ন্যায়মতের কায়-ব্যূহ দশার যোগিদেহকে রাখা যাইতে পারে।

"তথাদেবানুসন্ধানপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ অবিদ্যাবচ্ছিন্নং প্রতি ইষ্টত্বাৎ তত্তদ্দেহাবচ্ছিন্নং প্রতি তত্রাপ্যভাবাৎ আত্মমাত্রস্যানুসংধাতৃত্বাৎ। অতএবৈকস্মিন্নপি দেহে পাদাবচ্ছিন্নঃ—শিরোঽবচ্ছিন্নস্য সুখং নানুসংধত্তে পাদে মে সুখং শিরসি মে বেদনেত্যনুভবাৎ। তথাচ দেহাত্মভ্রমমাশ্রিত্যৈব জীবভেদানুভব ইতি স্থিতং। তথাপি কথমভ্রানুভব ইতি চেৎ শ্রোতব্যং সাবধানেন।"

কায়ব্যূহ দশাতে যোগী যেরূপ সকল শরীরের অনুসন্ধান রাখেন, সেইরূপ এক আত্মার নিখিল শরীর সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারিত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, এইরূপ আপত্তিতে উত্তর হইতেছে যে, উহা ইষ্টাপত্তি। আর ন্যায়মতেও বিভিন্ন শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার অনুসন্ধানকারিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, কেবল অজ্ঞানোপহিত আত্মাকে অনুন্ধানকারী বলা হইয়াছে। এই জন্যই ঐ মতে এক শরীর সম্বন্ধেও পাদদেশাবচ্ছিন্ন আত্মা মস্তকাবচ্ছিন্ন আত্মার সুখ অনুভব করে না। এই সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, আমার পাদদেশে সুখ ও মস্তকে বেদনা হইতেছে এইরূপ প্রতীতি। এইরূপ প্রণালীতে দেহাত্মভ্রান্তির অনুসরণ করিয়াই যে, জীব সম্বন্ধে বিভিন্নতা অনুভূত হইয়া থাকে ইহা স্থিরীকৃত হইল। তথাপি যদি বল যে, ইহা কি প্রকারে নিরূপণ করা যাইতে পারে, তবে সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

"এক এব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব-উপনিষন্মাত্রগম্যো বস্তুতোঽস্তি। স এবাজ্ঞানমাশ্রিত্য জীবভাবং লব্ধ্বা দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিদেহান্ পরিকল্প্য তদুপকরণত্বেন ব্রহ্মাণ্ডাদি চতুর্দ্দশ ভুবনং সৃষ্ট্বা তেষু দেহেষু কশ্চিদ্দেবঃ কশ্চিন্মনুষ্যঃ কশ্চিদ্ধিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বেষাং স্রষ্টা কশ্চিদ্বিষ্ণুঃ পালকঃ কশ্চিদ্রুদ্রঃ সর্ব্বসংহারকর্ত্তা রুদ্রঃ প্রলয়ে তেষামুপাধয়ঃ সত্ত্বাদিগুণা তত্বশাত্তেষাং সর্ব্বং সামর্থ্যং অহং পুনঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণকুমারঃ তেষাং ভক্তিং পূজানমস্কারাদিনা অনুষ্ঠায় শ্রবণাদিসাধনং সম্পাদ্য মোক্ষং সাধয়িষ্যামীতি ঈশ্বরোঽপি সন্ ভ্রান্তো ভবতি। জাগরে পুনর্যথোক্ত জাগর প্রপঞ্চমুপসংহৃত্য স্বপ্নে নিদ্রাদোষ সংস্কৃতঃ তাদৃশমেব প্রপঞ্চং পরিকল্প্য তত্রেন্দ্রিয়সাধ্যভোগং ভুক্ত্বা বাশিষ্ঠাদয়ো মুক্তা অন্যে বদ্ধা অহমপি কশ্চিদ্বদ্ধো দুঃখী সংসারী মুক্তো ভবিষ্যামীতি কল্পয়িত্বা পুনস্তামবস্থামুপসংহৃত্য জাগরং সুষুপ্তিং বা সর্ব্বভ্রমনিবৃত্তিরূপাং প্রাপ্নোতি ইতি।"

একমাত্র উপনিষদের গম্য নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব এক ব্রহ্মাত্মাই বস্তুতঃ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনিই অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া জীবভাবে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন এবং নিজ দেহের উপকরণ স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করিয়া দেবতা তির্য্যক্ ও মনুষ্য দেহ কল্পনা দ্বারা ঐ দেহ সমূহের মধ্যে কাহাকে দেবতা, কাহাকে মনুষ্য, কাহাকে সর্ব্বস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ, কাহাকে পালক বিষ্ণু এবং কাহাকেও প্রলয় কালের সর্ব্বসংহর্ত্তা রুদ্র মানিয়া লন। পক্ষান্তরে ইহাতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহাদের উপাধি সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ ও তজ্জনিত সকল সামর্থ্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক অমুক ব্রাহ্মণকুমার আমি পূজা নমস্কারাদি বিধানে তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি করিব এবং উহার প্রভাবে শ্রবণ মনন প্রভৃতি সাধন সম্পাদন করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইব, এইরূপ প্রণালীতে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর হইয়াও ভ্রান্তিতে নিমগ্ন। ঐ শুদ্ধ মুক্ত আত্মাই জাগ্রৎ অবস্থার সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রপঞ্চের উপভোগ করিয়া আবার উহার উপসংহার পূর্ব্বক স্বপ্ন অবস্থায় উপনীত হয়। এই অবস্থাতেও নিদ্রাদোষ জনিত ঐরূপ বিবিধ প্রপঞ্চ কল্পনা করিয়া স্বয় এবং

যথাযথ শারীরিক বা ঐন্দ্রিয়িক ভোগ উপভোগ করে। পশ্চাৎ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুক্ত অপর সকলে বদ্ধ. আমিও কোন দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন সংসারী বদ্ধ জীব, কিন্তু কালে মুক্ত হইয়া যাইব এইরূপ কল্পনাতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া ঐ অবস্থার উপসংহার পূর্ব্বক জাগ্রৎ বা নিখিল ভ্রান্তির নিবৃত্তিরূপ সুষুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এবং সতি এক এবাত্মা পরিপূর্ণঃ স্বয়ং প্রকাশানন্দস্বভাবঃ স্বাজ্ঞানবশাজ্জীবঃ সংসারীত্যাদিশব্দাভিধেয়ো ভবতীতি ন তদন্যঃ কশ্চিৎ সংসারী সম্ভাবয়িতুমপি শক্য ইতি স্থিতং। তস্যৈবানাদিসংসারসঞ্চিত পুণ্যনিচয়ক্ষালিতকল্মষস্য বৈরাগ্যাদিসম্পন্নস্য শাস্ত্রাচার্য্যপ্রসাদাসাদিত আদরনৈরন্তর্য্য দীর্ঘকালাদিসেবিত শ্রবণমননাদিসাধন-পাটবস্য যদা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থসাক্ষাৎকার উদয়মাসাদয়তি তদা অজ্ঞানতৎকার্য্য সর্ব্বমুপসংহৃত্য স্বানন্দতৃপ্তঃ স্বমহিম্নি স্থিতো মুক্ত ইতি ব্যবহারভাগ্ ভবতি।"

তস্যামবস্থায়াং ন তদন্যঃ কশ্চিৎ সংসারী তেনানুভূয়মানং দ্বৈতং বা কিঞ্চদস্তীতি রহস্যং।"

ইহা দ্বারা এইরূপ স্থির হইল যে, স্বপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ, পরিপূর্ণ, এক আত্মাই অজ্ঞানের অধীন হইয়া জীব ও সংসারী ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। ঐ আত্মারই অনাদি কালের সঞ্চিত পুণ্য সমূহ দ্বারা পাপরাশি নির্ম্মূল হইলে বৈরাগ্যাদি লাভ হয়, পরে শাস্ত্র ও গুরুর প্রসাদে সুদীর্ঘ কাল হইতে নিরন্তর অনুরক্ত হৃদয়ে শ্রবণ মনন প্রভৃতি সাধনদক্ষতা দ্বারা যখন তাঁহার তত্ত্বমসি মহাবাক্যোত্থ আত্ম-সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, তখন অজ্ঞান ও তজ্জনিত নিখিল কার্য্যরাশির উন্মূলন করিয়া তিনি নিজানন্দে পরিতৃপ্ত, আপন মহিমায় আপনিই স্থিত ও মুক্ত ইত্যাদি ব্যবহারের ভাজন হইয়া থাকেন।

পাঠক, যতিপ্রবর বিদ্বৎকেশরী বেদান্ত মুক্তাবলী-প্রণেতার এক-জীববাদ বিষয়ে যুক্তি পূর্ণ আলোচনা শুনিলেন। আসুন এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় অপ্যয় দীক্ষিতের "বেদান্ত সিদ্ধান্তলেশো"দ্ধৃত এক জীববাদের অনুশীলন করা যাউক।

"অথায়ং জীব এক উতানেকঃ অনুপদোক্তপক্ষাবলম্বিনঃ কেচিদাহুঃ একো জীবস্তেন চৈকমেব শরীরং স জীবমন্যানি স্বপ্নদৃষ্টশরীরাণীব নির্জ্জীবানি তদজ্ঞান-কল্পিতং সর্ব্বং জগৎ তস্য স্বপ্নদর্শনবদ্যাবদবিদ্যং সর্ব্বো ব্যবহারঃ বদ্ধমুক্তব্যবস্থাপি নাস্তি জীবস্যৈকত্বাৎ। শুকমুক্ত্যাদিকমপি স্বাপ্নপুরুষান্তরমুক্ত্যাদিকমিব কল্পিতং। অত্র চ সম্ভাবিতসকলশঙ্কাপঙ্কক্ষালনং স্বপ্ন-দৃষ্টান্তসলিলধারয়ৈব কর্ত্তব্যমিতি।

জীব ঈশ্বর নিরূপণের পরে জীব এক বা অনেক এই সম্বন্ধে অনুশীলন হইতেছে।

"ব্রহ্মৈব স্বাবিদ্যয়া সংসরতি স্ববিদ্যয়া পরিমুচ্যতে" ইত্যাদ ভাষ্যোক্তপক্ষাবলম্বী কোন মনীষীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, জীব একই বটে এবং উহা দ্বারা একই শরীর সজীব, কিন্তু অপরাপর শরীর স্বপ্নদৃষ্ট শরীরসমূহের ন্যায় নির্জীব মাত্র। ঐ একই জীবের অজ্ঞান সমস্ত জগতের কল্পনা করিয়া লইয়াছে। এবং উহার অবিদ্যা নির্ম্মূল না হওয়া পর্য্যন্ত স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় সমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে জীব এক বলিয়া মুক্তিরও কোন ব্যবস্থা নাই; শুকদেব প্রভৃতির মুক্তিও স্বপ্নদৃষ্ট অপর পুরুষের মুক্তির ন্যায় কল্পনা-প্রসূত। এই মতে গুরু ঈশ্বর প্রভৃতি অপর চেতন বস্তুর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের

উদয় হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কার নিবৃত্তিও স্বপ্ন দৃষ্টান্ত দ্বারাই করিয়া লইবে।

"অন্যে তু অস্মিন্নেকশরীরৈকজীববাদে মনঃ প্রত্যয়মলভমানা অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিত্যাদি সূত্রৈর্জীবাতিরিক্ত ঈশ্বর এব জগতঃ স্রষ্টা ন জীবস্তস্যাপ্তকামত্বেন প্রয়োজনাভাবেঽপি কেবলং লীলয়ৈব জগতঃ সৃষ্টিরিত্যাদি প্রতিপাদয়দ্ভিঃ বিরোধং চ মন্যমানা হিরণ্যগর্ভ একো ব্রহ্মপ্রতিবিম্বো মুখ্যো জীবঃ। অন্যে তু তৎপ্রতিবিম্বভূতাশ্চিত্রলিখিতমনুষ্যদেহার্পিতপটাভাসকল্পা জীবাভাসাঃ সংসারাদিভাজ ইতি সবিশেষানেকশরীরৈকজীববাদমাতিষ্ঠন্তে।"

"অপর এক-জীববাদীরা এই এক শরীরবিশিষ্ট এক-জীববাদে প্রত্যয়ান্বিত নহেন। তাঁহারা মনে করেন যে, "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" এবং "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" ইত্যাদি বেদান্তসূত্র, জীবাতিরিক্ত ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু জীব নহে, ঐ ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন প্রয়োজন না থাকিলেও আপ্তকাম হওয়ায় তিনি কেবল লীলাখেলার জন্য জগৎ রচনা করিয়া লন, ইহা প্রতিপাদন করে বলিয়া এইরূপ একজীববাদে বিরোধ হইয়া থাকে; সুতরাং এক হিরণ্যগর্ভই পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বভূত মুখ্য জীব, অন্য সকলেই চিত্রলিখিত মনুষ্যশরীরার্পিত চিত্রাভাসের ন্যায় তদীয় প্রতিবিম্বরূপ জীবাভাস মাত্র। এই জীবাভাস সমূহই জন্ম মরণ প্রভৃতি সংসৃতি চক্রে পতিত। এইরূপ প্রণালীতে ঐ একজীববাদীরা সবিশেষ অনেক শরীরবিশিষ্ট একজীববাদ স্বীকার করেন।"

"অপরে তু হিরণ্যগর্ভস্য প্রতিকল্পং ভেদেন কস্য হিরণ্যগর্ভস্য মুখ্যং জীবত্বমিত্যত্র নিয়ামকং নাস্তীতি মন্যমানা এক এব জীবোঽবিশেষেণ সর্ব্বশরীরমধিতিষ্ঠতি। ন চৈবং শরীরাবয়বভেদ ইব শরীরভেদেঽপি পরস্পরসুখাদ্যনুসন্ধান প্রসঙ্গঃ জন্মান্তরীয়সুখাদ্যনুসন্ধানাদর্শনেন শরীরভেদস্য তদননুসন্ধানপ্রয়োজকত্বক্লৃপ্তেঃ যোগিনস্তু কায়ব্যূহসুখাদ্যনুসন্ধানং ব্যবহিতার্থগ্রহণবদ্যোগপ্রভাবনিবন্ধনমিতি ন তদুদাহরণমত্যাবিশেষানেক শরীরৈকজীববাদং রোচয়ন্তু।"

প্রস্তাবিত দুই শ্রেণীর এক-জীববাদী হইতে অপর এক জীববাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, কল্পভেদে হিরণ্যগর্ভের পরিবর্ত্তন হওয়ায় কোন্ হিরণ্যগর্ভ মুখ্য জীব এই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ নাই বলিয়া একই জীব নির্ব্বিশেষে নিখিল শরীরে অবস্থিতি করেন। এই মতে এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, যেরূপ এক দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুখ দুঃখ প্রভৃতি ঐ দেহাভিমানী জীব উপলব্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ এক শরীরাবচ্ছিন্ন জীবের অপর শরীর সম্পর্কিত সুখ দুঃখ প্রভৃতির উপলব্ধি কেন হয় না? ইহার উত্তর এই যে, কোন জীবকেই জন্মান্তরীয় দেহের সুখ দুঃখ প্রভৃতি উপলব্ধি করিতে দেখা যায় না, এইজন্য শরীরভেদকেই ঐপ্রকার সুখ দুঃখাদির অনুভব না হওয়া সম্বন্ধে ক্লৃপ্ত প্রয়োজক বলিতে হইবে। তবে যোগীদের যে, কায়ব্যূহ অবস্থাতে নিখিল শরীরেরই সুখদুঃখাদি উপলব্ধি হয়, ইহাও তাঁহাদের সম্বন্ধে দূরস্থ বস্তুরাশির প্রত্যক্ষ অনুভবের ন্যায় যোগজ মহিমা জনিত; সুতরাং ইহাকে উদাহরণে রাখিয়া এক শরীরাবচ্ছিন্ন জীবের পক্ষে অপর শরীর সম্পর্কিত সুখ দুঃখাদির উপলব্ধি প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। অতএব এই মতবাদীরা নির্ব্বিশেষে অনেক শরীর বিশিষ্ট একজীববাদ মানিয়া থাকেন।

বেদান্তমুক্তাবলী ও বেদান্ত সিদ্ধান্তলেশ

এই যুগলের যুক্তিপূর্ণ গবেষণা হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, মহামায়ার কার্য্য-কলাপ বিভিন্ন প্রকারের হইলেও মূলতঃ তিনি একই বর্ত্তন; সুতরাং তদুপহিত-চৈতন্য জীবও অভিন্ন জিনিষ। এই নিখিল প্রপঞ্চের পরিণাম উপাদান মহামায়ারই নামান্তর অজ্ঞান ও অবিদ্যা। ইনি কারণ অবস্থাতে ভিন্নতার জঞ্জাল মিটাইয়া একত্ব পদে সমাসীন হইয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপে অবস্থিতি তাঁহার পক্ষে চিরকালের জন্য হয় না। তিনি একত্ব পদে সমাসীনা হইয়াও আবার কার্য্যোন্মুখী হইয়া পড়েন। এই কার্য্যোন্মুখতাই তাঁহার নানাত্ব বিকার ডাকিয়া আনে অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন অনির্ব্বচনীয় রূপে পরিণত হইয়া তথাবিধ বিবিধ খেলা খেলিতে থাকেন। এই খেলার পরিণামেই এক শুদ্ধ বুদ্ধ সদাশিব ব্রহ্মাত্মাকে ভিন্নতা-পঙ্কে নিমগ্ন বলিয়া বোধ হয়। পরন্ত বিচার-বিধৌত-বুদ্ধি বিশেষদর্শী এইরূপ পরিণামের মধ্যেও পরমার্থ সত্যরূপে একত্বই দেখিতে পান। যদ্যপি তিনি সর্ব্বথারূপে নানাত্বকে প্রতীতির চতুঃসীমার বাহির করিতে পারেন না, তথাপি উহাকে কদাপি সত্যতার সহিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দেখেন না। এইরূপ সম্বন্ধ বিভ্রাটটা কেবল অপ্রবুদ্ধ সমাজেই আসন জমাইয়া বসিয়াছে। তাঁহারাই নানাত্বের ললাম লাবণ্যে আত্মহারা হইয়া "দেহি পদপল্লবমুদারং" নীতির অবদ্য ভাবে ডুবিয়া যান। এই শ্রেণীর কোন কোন স্বনামধন্য মহাশয়েরা একই ব্যক্তিকে স্ত্রী পুরুষ ঘটিত দ্বৈতাবকারে বিকৃত করিয়া তুলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ বিকৃতাত্বের প্রভাকে ব্রহ্মাত্মা বলিতেও লজ্জিত হন না।

এক জীববাদের চরম সিদ্ধান্ত যখন নির্ব্বিশেষে অনেক শরীর বিশিষ্ট এক জীববাদ হইল এবং শরীরভেদই বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন প্রকারে সুখ দুঃখ প্রভৃতির অনুভবের নিয়ামক, তখন প্রচলিত পরলোকটা এই মতে সঙ্কোচ ভাবাপন্ন না হইয়া রহিল না। আর মৃত্যুই যে শরীরের অন্তিম সীমা এই বিষয়ে আপামর প্রত্যয়াংশিত। তবে যে অনাদিকাল হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী নানা লিঙ্গশরীরের কথা শ্রুত হইয়া আসিতেছে এবং মৃত্যুর পরে ঐ শরীরের আশ্রয়ে জীবের উৎক্রমণ প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহার মূলে অন্ধবিশ্বাস বা বিচারবিভ্রাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্তে দ্বিসত্তাবাদ অর্থাৎ পরব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা ও তদতিরিক্ত বস্তু মাত্রের প্রাতিভাসিক সত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পারমার্থিক সত্তার অর্থ এক ভাবে অনাদি অনন্তকাল অবস্থিতি এবং প্রাতিভাসিক সত্তার অর্থ কেবল প্রতীতিকালে অবস্থিতি, কিন্তু উহার পূর্ব্বে ও পরে অভাব। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে অনাদিকাল হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী ব্রহ্মাতিরিক্ত অসংখ্য লিঙ্গ শরীর মানিয়া লওয়া কোন প্রকারে ঐ সিদ্ধান্তের অনুমোদিত হইতে পারে না। ব্রহ্মাতিরিক্ত ভাব মাত্রেরই যে প্রতিভাসিক সত্তা এই সম্বন্ধে "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" "চিৎসুখী" ও "বেদান্ত মুক্তাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থে যুক্তিপূর্ণ সূক্ষ্ম গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রবন্ধান্তরে ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

এই একজীববাদকে ভাষ্য ও বার্ত্তিক-মূলকই বলিতে হইবে; কেন না বৃহদারণ্যক ভাষ্যে ও বার্ত্তিকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে,"ব্রহ্মৈব স্বাবিদ্যয়া সংসরতি স্ববিদ্যয়া পরিমুচ্যতে"। "রাজসূনোঃ স্মৃতিপ্রাপ্তৌ ব্যাধ-

জ্ঞানো নিবর্ত্ততে। যথৈবমাত্মনোঽজ্ঞস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যতঃ।" এই ভাষ্য ও বার্ত্তিকের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে কুন্তীতনয় কর্ণ যেরূপ অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে রাধাপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলেন এবং এই জন্ম তাঁহাকে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, পশ্চাৎ কোন কারণে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে পর, তিনি যে কুন্তীসুত ইহা স্মৃতিতে জাগরূক হওয়ায় শ্রেয়ঃ ও শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরব্রহ্ম অনাদি অবিদ্যাবৃত হইয়া আপনাকে জীবরূপে কল্পনা করিয়া লন এবং এই জন্ম আপনার নিত্য নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ ভুলিয়া জন্মমরণরূপ সংসৃতি ও তজ্জনিত অশেষ দুঃখ ভোগ করেন; পশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রসাদে ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় স্বরূপানন্দে অবস্থিতি করেন। এই স্থলে "অবিদ্যয়া" এক বচন দ্বারা অবিদ্যা যে এক, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং অবিদ্যারূপ উপাধি এক হইল বলিয়া তদুপহিত চৈতন্যরূপ জীবও একই বটে। পক্ষান্তরে কার্য্যভূত অবিদ্যার বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইলেও কারণরূপিণী তিনি যে আমাদের বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধির অতীত, এই বিষয় ইতঃপূর্ব্বে সুষুপ্তি অবস্থার উদাহরণ দিয়া সপ্রমাণ করা গিয়াছে। ফলতঃ জীবের নানাত্ব জ্ঞানটা বিশেষদর্শীর নিকটে কোনরূপেই প্রমা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কাজেই একজীববাদের বিজয় না হইয়া রহিল না।

মানদা।

৩৩

কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া, গদাধর দেখিল যে, তাহার নামে একখানি শমন আসিয়াছে; পুলিস আদালতে আসামীর পক্ষে তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে; আসামীর নাম বলদেব আচার্য্য; আগামী সোমবার মকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে। আসামী চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়াছে। আপনার স্মরণশক্তিকে বিশেষরূপ প্রপীড়িত করিয়াও গদাধর স্মরণ করিতে পারিল না যে, এই চুরির আসামী বলদেব আচার্য্যটি কে। অনেক চিন্তা করিল, কিন্তু ঐ নামটি কখনও শুনিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

সোমবারে পুলিস আদালতে উপস্থিত হইবার পর, এ সমস্যার মীমাংসা হইল। তখন সে জানিল যে, চুরির আসামী বলদেব আচার্য্য আর কেহই নহে, সেই ঘটক ঠাকুর। ঘটক ঠাকুর অনেক পীড়াপীড়ির পর পুলিশের কর্ম্মচারিগণকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, তাহার কচ্ছ-প্রচ্ছাদিত রজত মুদ্রা সকল ঘটকতার পুরস্কার-স্বরূপ সে আলিপুরের জজ-আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার এই বাক্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাক্ষিস্বরূপ সে গদাধরকে আহ্বান করিয়াছিল। গদাধর আদালতে আসিয়া, বিচারকের নিকট সকল কথা বিবৃত করিয়া, বেপমান্ ব্রাহ্মণকে পুলিষের ভীম কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ আপন যজ্ঞোপবীত আপন সম্প্রসারিত হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে ধারণ করিয়া, গদাধরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, এবং জলপূর্ণ চক্ষু ও টাকার পুঁটুলি লইয়া

চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণের পুঁটুলিতে আর পাঁচ শত টাকা ছিল না। তা' না থাক্; যাহা ছিল, তাহার পক্ষে তাহাই ঢের।

উপরোক্ত ক্ষুদ্র ঘটনায় গদাধরের এক মহা উপকার ঘটিয়াছিল। সে কলিকাতার পুলিস আদালতে পরিচিত হইয়াছিল। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ-যুক্ত উৎকৃষ্ট ইংরাজি বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রধান ইংরাজ-বিচারক বলিয়াছিলেন যে, এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজি তিনি আর কথনও অন্য কোনও বাঙ্গালীর মুখে শ্রবণ করেন নাই। বিচারকের এইরূপ উক্তির যে ফল হওয়া সম্ভব ছিল, গদাধর সে ফল লাভ করিয়াছিল। ইহার পর, আলিপুর আদালতের ন্যায়, পুলিষ আদালতেও প্রত্যেক জটিল বিচার ব্যাপারে বিচারপ্রার্থিগণ গদাধরের আশ্রয় গ্রহণ করিত, এবং আইন সম্বন্ধে তাহার সুগভীর জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপনাদিগের ন্যায্য স্বত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সকলেই জানিল যে, কলিকাতাতে তাহার ন্যায় পারদর্শী আইনজ্ঞ ব্যক্তি আর নাই। ইহার পর গদাধর যখন "ডি, এল" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিল, তখন মুখে মুখে তাহার সুযশঃ কীর্ত্তিত হইল। দিক্‌সকল তাহার যোগ্যতার যশোগানে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। স্বয়ং লক্ষ্মী গদাধরের খ্যাতিগান শুনিয়া, তাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করিলেন; আপনার ভাণ্ডার খুলিয়া অর্থরাশি গদাধরের পদে ঢালিয়া দিলেন। যে দীন বালক একদিন চারি ক্রোশ পথ নগ্নপদে পরিভ্রমণ করিয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছিল, আজ সে কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। বিদ্যায়, সম্মানে, সম্পদে তাহার মত তখন সমস্ত বাঙ্গালাদেশে আর কে ছিল?

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর বাবু মানদাকে কলিকাতায় গদাধরের নিকট পাঠাইতে অভিলাষী ছিলেন না। কন্যার প্রতি তাঁহার অত্যধিক স্নেহ প্রযুক্ত তিনি মনে করিতেন যে, কলিকাতায় আসিয়া স্বামিগৃহে বাস করিলে সে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। সু-আহার এবং অভিলাষ-অনুযায়ী বসন-ভূষণ কিছুই প্রাপ্ত হইবে না, এবং অতিরিক্ত গৃহকার্য্য করিয়া অসুস্থা হইয়া পড়িবে। কিন্তু কয়েকটা ছুটী উপলক্ষে অবসরমত শ্বশুরালয়ে আগত হইয়া কলিকাতা সম্বন্ধে নানারূপ গল্প করিয়া, গদাধর কলিকাতা-দর্শনাভিলাষিণী বালিকা মানদার মনটি বিশেষরূপ বশীভূত করিয়া লইয়াছিল। এবং তাহার মনোমধ্যে এরূপ আগ্রহময় এক কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল যে, মানদা স্বেচ্ছায় মুখীর দ্বারা তাহার পিতা-মাতাকে জানাইয়াছিল যে, কলিকাতায় যাইবার জন্য সে একান্ত উৎসুক হইয়াছে। ইহা ছাড়া গদাধর তাহার অপরিসীম বাক্‌পটুতার দ্বারা রত্নেশ্বর বাবুর ইতিপূর্ব্বে কথিত অনুরোধ সকলকেও নিরস্ত করিয়াছিল। এক্ষণে মানদাকে কলিকাতায় পাঠাইতে কিংবা গদাধরের কলিকাতা বাসে রত্নেশ্বর বাবুর আর কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি গদাধরকে কালীদহ গ্রামে আসিয়া তাহার জমীদারী দেখিবার জন্য আর অনুরোধ করিতেন না। কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার অনিচ্ছাটাও কন্যার আপন ইচ্ছার দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার কেবল মাত্র একটি আপত্তি ছিল; মানদা চিরদিন ত্রিতল গৃহে বাস করিয়াছে; কলিকাতায় যাইয়া সে গদাধরের একতল গৃহে বাস করিতে পারিবে না।

গদাধরের প্রচুর ধনসমাগম হওয়ায়, সে গৃহটি কেবল মাত্র দ্বিতল নহে, ত্রিতল করিয়া প্রস্তুত করিল। এবং পার্শ্বস্থ সংলিপ্ত পঞ্চ বিঘা পরিমাণ ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া, তাহাতে মনোরম পুষ্পবাটিকা রচনা করিল। তৎপরে গৃহকার্য্যের জন্য এবং মানদার শুশ্রূষার জন্য অতিরিক্ত দাসদাসী নিযুক্ত করিল।

এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া, মানদাকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, সে রত্নেশ্বর বাবুকে এক পত্র লিখিল। পত্রের উত্তর পাইয়া সে কালীদহ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার পক্ষে রত্নেশ্বর বাবুর আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার কারণ ছিল না। তিনি একটা শুভ দিন দেখিয়া. মানদাকে গদাধরের সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, পট্টবস্ত্রপরিহিতা সুনী মানদার সহগামিনী হইয়াছিল। এই ঘটনাটা গদাধরের বিবাহের ঠিক দুই বৎসর পরে ঘটিয়াছিল।

তোমরা যদি মনে করিয়া থাক যে, স্নেহময় মাতাপিতাকে ছাড়িয়া, বাল্যের সঙ্গিনীগণকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া, চির-অভ্যস্ত চিরপরিচিত পিতৃগৃহ ফেলিয়া, কলিকাতা যাইবার কালে মানদা বসনাঞ্চলে অশ্রু-প্লাবিত মুখ লুকাইয়া অন্য বালিকার ন্যায় রোদন করিয়াছিল, তাহা হইলে তোমরা তাহাকে এখনও কিছুমাত্র চিনিতে পার নাই। গৃহ পরিত্যাগ কালে, মানদার নয়নকোণে কেহ এক বিন্দু অশ্রু দেখিতে পায় নাই। আপন মনোভিলাষের সাফল্য জন্য যে দ্রব্যের বা যে ব্যক্তির আবশ্যক, তাহা পাইলেই মানদার মন পরিতৃপ্ত থাকিত। কলিকাতার অপূর্ব্বত্ব দেখিবার বিশেষ বাসনাটি পূর্ণ করিবার জন্য এখন তাহার স্বামীটিকে প্রয়োজন ছিল, তাই সে পুলকভরে, নৌকায় আরোহণ করিয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিল। তাহার পুলকপূর্ণ হৃদয়ে জনকজননীর বিচ্ছেদ-ব্যথাটা স্থান লাভ করিতে পারে নাই। মৃগমদগন্ধ-বিহ্বল মৃগের ন্যায় তাহার মনটা একটা অপরিচিত আনন্দের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছিল; আর পশ্চাৎ ফিরিয়া, পিতার দুঃখকাতর মুখ দেখিবার অবসর তাহার ছিল না। এক-মাত্র প্রিয়তমা কন্যাকে বিদায় দিতে রত্নেশ্বর বাবুর মুখমণ্ডলে যে কাতরতার ছায়া পড়িয়া-ছিল,তাহা অবলোকন করিয়া বরং গদাধরের নয়নপ্রান্ত আর্দ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু কাতর স্নেহময় পিতার ম্লান মুখের সে মলিন ছায়া হৃদয়হীনা মানদার হৃদয়মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। মানদা পৃথিবীর কাহাকেও ভালবাসিত না; কেবল সে আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। সম্মুখে দর্পণ রাখিলে যে মুখখানি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত, মানদা জানিত পৃথিবীতে সে মুখের তুলনা নাই। যে মৎস্যজীবিনী তাহার জন্য ইলিশ মৎস্যের ডিম্ব প্রতিদিন আহরণ করিত, মানদা জানিত পৃথিবীতে মানদারই জন্য সে সৃষ্ট হইয়াছে। নৌকায় বসিয়া মানদা ভাবিতেছিল, এই যে গঙ্গা রজত-বিনির্ম্মিত রাজপথের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহা কেবলমাত্র তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। উপকূলবিরাজিত বিটপিশাখায় বসিয়া যে সকল বিহঙ্গ গান গাহিতেছিল, মানদার মনে হইতেছিল যেন ভগবান্ তাহাদিগকে তারই জয়গান করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মানদা পৃথিবীর কাহারও জন্য সৃষ্ট হয় নাই; পৃথিবীর সকলে তাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার মাতাপিতা তাহার জন্য কাঁদিবে;

কিন্তু সে তাঁহাদের জন্য কাঁদিবে কেন? সে হাসিতে হাসিতে কলিকাতায় চলিল।

৩৪

কিন্তু গদাধরের মনে সুখ ছিল না। সে নৌকার মধ্যে নীরবে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল, মধ্যাহ্নের ভাস্বর জলচ্ছবি তাহার চক্ষে নিতান্ত মলিন বলিয়া বোধ হইতেছিল। জাহ্নবীর জলপ্রবাহটা একটা অতি বিশাল অশ্রুপ্রবাহ বলিয়া তাহার ভ্রম জন্মিতেছিল। তীরভূমি-পরিশোভিত বৃক্ষাবলির আন্দোলন মধ্যে, সে একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। কেন?

মানদাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য, সে অম্বিকাদের বাটীতে গিয়াছিল। তথায় কৃষ্ণ চাটুর্য্যে গদাধরকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গদাধরকে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কহিলেন, "গদাধর, তুমি বাটীর মধ্যে যাইয়া অম্বিকার সহিত সাক্ষাৎ কর; তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তুমি যদি কলিকাতা চলিয়া যাও, তাহা হইলে সে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে। সে তোমাকে বড়ই ভালবাসে।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় যে ভালবাসার কথা বলিলেন, তাহা অত্যন্ত সহজ ভালবাসা। এরূপ ভালবাসা আমরা নিত্য শত শত লোককে বাসিয়া থাকি। আমরা সংসারে থাকিয়া নিত্য বলি, অমুক অমুকের ছোট ছেলেকে ভালবাসে, অমুক অমুকের ভ্রাতাকে ভালবাসে, অমুক অমুকের পিতাকে ভালবাসে। এ ভালবাসা ভালবাসা মাত্র; ইহাতে উপন্যাসাদিতে বর্ণিত প্রণয়ের গন্ধ মাত্র নাই। গদাধর আপনার সহজ মন লইয়া যদি এই ভালবাসার কথাটা শ্রবণ করিত, তাহা হইলে সেই ভালবাসার অর্থ আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, হয়ত সেও সেইরূপ বুঝিত। কিন্তু সে বাল্যে যাহার নিকট বিদ্যারম্ভ করিয়াছিল, যৌবনে যাহাকে সে সঙ্গিনীরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিল, যে মহিমময়ী তাহার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দেববালার ন্যায় বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিল, যে দেবী আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তাহাকে জলনিমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছিল; যাহার সহিত বিবাহ হইবে মনে করিয়া সে কয়েক দিন যেন স্বর্গ-স্বপ্নঘোরে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল, সেই শ্রেষ্ঠা, মধুরা অম্বিকাকে গদাধর যেরূপ ভালবাসিত তাহা সামান্য নহে। তাহা তাহার সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা আগ্নেয় গিরির গর্ভস্থ তপ্ত প্রস্রবণের ন্যায়, কর্ত্তব্যের কঠিন প্রস্তরাবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইবার জন্য, তাহার পঞ্জর মধ্যে বারংবার সবেগে আঘাত করিতেছিল। মনের ভিতর দুর্দমনীয় এই ভালবাসা লইয়া গদাধর শুনিল যে, অম্বিকা তাহাকে বড়ই ভালবাসে। এ ভালবাসার অর্থ আমরা যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, সে সেরূপ বুঝিল না। তাহার মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এই চঞ্চল মন লইয়া, সে গৃহ মধ্যে অম্বিকার সহিত সাক্ষাৎ করিল। কহিল, "অম্বিকা দেবি! আমি কলিকাতা যাইতেছি, তোমার নিকটে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

অম্বিকা স্বর্গের ছবির ন্যায় তাহার অতি বিশাল দুইটি চক্ষু গদাধরের সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর বোধ হয় শীঘ্র কালীদহে আসিবে না?"

গদাধর। না আর শীঘ্র কালীদহে আসা ঘটিবে না। বহুকাল, আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তুমি আমাকে পত্র লিখিবে ত?

অম্বিকা। আমি ত তোমাকে বরাবর রীতিমত পত্র দিয়া থাকি। তুমি কেমন থাক, তাহা মাঝে মাঝে আমাদের লিখিও। আর যদি কখন অবকাশ পাও, তাহা হইলে মানদাকে লইয়া মাঝে মাঝে কালীদহে আসিও।

গদাধর। এরূপ অবকাশ পাইবার কোনও ভরসা নাই। তথাপি তুমি বলিতেছ বলিয়া আসিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু না আসিলেও এই কালীদহ গ্রামটাকে আমি কখনও ভুলিব না। এ গ্রামের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। মনে আছে, এই গ্রামে তোমার কাছে আমার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। তোমার দেওয়া আংরাখায় এ অঙ্গ প্রথম আচ্ছাদিত হইয়াছিল। তোমার দেওয়া সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, আমি এই গ্রাম হইতেই প্রথম কলিকাতায় গিয়াছিলাম। এই গ্রামের সম্মুখে গঙ্গাজলে তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে। এ গ্রামকে আমি কখনও ভুলিব না।

অম্বিকা। যে গ্রামে তোমার বিবাহ হইয়াছে, তাহা তোমার প্রিয়; তাহাকে তুমি ভুলিবে কিরূপে?

গদাধর। না, এ বিবাহের কথাও ভুলিতে পারিব না। কিন্তু এ বিবাহটা ভুলিবার যদি উপায় থাকিত!

অম্বিকা। ইহা বড় আশ্চর্য্য! যখনই এ বিবাহের কথা তোমাকে আমি বলিয়াছি, তখনই এ বিবাহ ঘটিয়াছে বলিয়া তুমি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ। কেন? মানদা সুন্দরী, গুণবতী, তাহাকে লইয়া তুমি সুখী হইবে না কেন?

গদাধর। সুখী হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুখী হইতে পারি নাই। যে চাতক জল চায়, তাহার সম্মুখে গোলাপ-সুবাসিত সুমিষ্ট পরমান্ন রাখিলে কি সে সুখী হয়? আমার পিপাসিত মন যখন একটি স্নিগ্ধ জলধারার অন্বেষণে ছুটিয়াছিল, তখন ভগবান্ কোথা হইতে মানদাকে আনিয়া আমার সুখের পথ অবরোধ করিয়া দিলেন!

অম্বিকা। ভগবান্ যাহা দিয়াছেন, তাহা ভগবানের দান মনে করিয়া, তাহার প্রতি অনাদর করিও না।

গদাধর। না, আমি মানদাকে কখনও অনাদর করিব না। স্বামীর যাহা কর্ত্তব্য, প্রাণপণ শক্তিতে তাহা আমি প্রতিপালন করিব। কিন্তু সুখী হইতে পারিব না।

অম্বিকা। কর্ত্তব্য প্রতিপালনই সুখ; ইহা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনও সুখ নাই।

গদাধর। অম্বিকা! তুমি বোধ হয় কাহাকেও কখনও ভালবাস নাই; বাসিলে বুঝিতে আমার দুঃখটা কি?

অম্বিকা। আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে কাহাকেও ভালবাসিলে আমি অধর্ম্মে পতিত হইব। তথাপি,—আমি তোমাকে লুকাইব না,—আমি ভালবাসিয়াছি। সে ভালবাসায় পৃথিবীর কোন উপকার হইবে না মনে করিয়া, কষ্টে তাহা মনোমধ্যে গোপন রাখিয়াছি। আমার যে চিরবাঞ্ছিত, সেও ইহা জানে না যে, আমি তাহাকে কতখানি ভালবাসি। অতএব তোমার দুঃখটা যে কি, তাহা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছি। আপনার মন দিয়া, তোমার মনের কষ্ট বুঝিয়াছি। কিন্তু ভাই, এ দুঃখ নিবারণের উপায় কি? আপনার সুখ দুঃখ অপেক্ষা যদি আপনার কর্ত্তব্যকে বড় করিতে পার, তাহা হইলেই দুঃখের অবসান হইবে। কুরুক্ষেত্রের মহারণে পুরুষোত্তম অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক পরিচালিত দিব্য রথে বসিয়া, যখন স্বজন বধ

আশঙ্কায় ব্যথিত হইয়াছিলেন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন,—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥*

তুমিও ভাই, আপনার কাম্য বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া নির্ম্মম কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা শান্তি লাভ কর। যদি তুমি কাহাকেও ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে সেই ভালবাসা ভুলিতে হইবে; মনকে দমন করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। চিত্তদমন ব্যতীত, পৃথিবীতে শান্তিলাভের উপায় নাই।

গদাধর। তুমি বলিতেছিলে তুমিও আমার ন্যায় কাহাকেও ভালবাসিয়াছ। আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সে ভালবাসা ভুলিতে পারিয়াছ?

অম্বিকা। না, আমি তাহা ভুলিতে পারি নাই। ইহজীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারিব, এমন ভরসা নাই।

গদাধর। তবে আমাকে কেন আমার ভালবাসা ভুলিতে বলিতেছ? তুমি যাহা পার নাই, আমি কিরূপে তাহা পারিব?

অম্বিকা। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যাহা পারি নাই, তুমি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে। আমি দুর্ব্বলা, পাপিষ্ঠা; আমি আমার হৃদয়কে শাসন করিতে পারি নাই। তুমি তোমার দেবচরিত্র লইয়া, হৃদয়ের অমিত বল লইয়া, আপনার মোহপ্রাপ্ত চিত্তকে দমিত করিয়া পরমা শান্তি উপভোগ কর। যাহা পাইবার নয়, তাহা পাইবার আশায়, উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবীতে ঘুরিয়া পৃথিবীকে অশান্ত করিও না; আপনি অসুখী হইও না। তুমি সুখী হইলে, আমরা দূর হইতে তোমার সুখপূর্ণ বিষাদশূন্য শুভ জীবন অবলোকন করিয়া সার্থক হইব। বল ভাই, যাহা পাইয়াছ, তাহা লইয়া তুমি সুখী হইতে চেষ্টা করিবে?

গদাধর। অম্বিকা, আমি বরাবর প্রাণপণ শক্তিতে তোমার কথা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং চিরদিন করিব। এই একটা বিষয়ে, তোমার কথা অবহেলা করিবার ইচ্ছা আমার মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু না, তোমার কথাই শুনিব। যাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়াই সুখী হইতে চেষ্টা করিব। বামন হইয়া, আকাশের চাঁদের আশায় আর ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকিব না। হায়! আপনার হৃদয়ের অগ্নি দিয়া, সংসারকে দগ্ধ করিবার অধিকার আমাদের নাই।

অম্বিকা। আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার চেষ্টা যেন ফলবতী হয়। এস, আজ বিদায় দিবার সময় তোমার পদধূলি গ্রহণ করি।

এই বলিয়া, কমলপলাশলোচনা গদাধরের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল। করদ্বয় বিস্তার করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। কুসুমসদৃশ দিব্য কোমল করস্পর্শে, গদাধরের সর্ব্বাঙ্গ পুলকভরে শিহরিয়া উঠিল। হায়! এই পদপ্রান্ত-পতিত পবিত্র করপুষ্পযুগলের মালা গাঁথিয়া যদি সে বক্ষে ধরিতে পারিত! —অম্বিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। গদাধর স্পষ্ট দেখিল, পদ্মপলাশে নীহারবিন্দুর ন্যায়, নীলাকাশে নক্ষত্রের দীপ্তির ন্যায়, পীতাম্বরের বক্ষঃশোভা কৌস্তুভমণির ন্যায়, এক বিন্দু অশ্রু পদ্মের মত, আকাশের মত ভগবানের হৃদয়ের মত অম্বিকার নয়নপ্রান্তে জ্বলিতেছে।

মানদার পার্শ্বে নৌকায় নীরবে বসিয়া বিমর্ষ গদাধর অম্বিকার এই অশ্রুর কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে, কুইনিনের

* ভগবৎ গীতা ২য় অঃ ৭১ শ্লোক।

উপর এক ফোঁটা তীব্রাম্ল পড়িলে যেমন তাহা দ্রবীভূত হইয়া যায়, গদাধরের তিক্ত শুষ্ক শুভ্র কর্ত্তব্যপরায়ণতা সেই এক ফোঁটা অশ্রুজলে তেমনই বিগলিত হইয়া যাইতেছিল। অম্বিকা তাহাকে বলিয়াছিল যে সেও ভালবাসিয়াছে;—কাহাকে? অম্বিকা বোধ করি তাহাকেই ভালবাসে। গঙ্গার তরঙ্গকল্লোল তাহার হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হইয়া তাহাকে বলিয়া দিতেছিল যে, অম্বিকা তাহাকেই ভালবাসে। নৌকার ক্ষেপণী সকল জলমধ্যে শব্দ করিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের ন্যায় যেন মানুষের ভাষায় গদাধরের কাণের কাছে বারবার বলিতেছিল, "অম্বিকা তোমায় বড় ভালবাসে!"

৩৫

অশ্রুপূর্ণলোচনে গদাধরকে বিদায় দিয়া আপন শয্যাকক্ষে যাইয়া, অতি কষ্টে অম্বিকা আপন অশ্রুবেগ প্রশমিত করিল। হায়! যাহাকে পাইবার নয়, সে কেন তাহাকে ভালবাসিল? যে ভালবাসা প্রকাশ করিবার নয়, তাহা কিরূপে তাহার হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত হইল? হে ভগবন্! যদি তাহার ভাগ্যে বিবাহ না লিখিলে, তবে তাহাকে ভালবাসাশূন্যা, নিষ্প্রাণা করিয়া কেন সৃষ্টি করিলে না? এ পাপ হৃদয় মধ্যে বহন করিয়া সে কিরূপে জীবিত থাকিবে?

তুমি উপন্যাসপাঠক! তুমি হয়ত বলিবে, ভালবাসা পবিত্র জিনিস, ভালবাসায় পা। কোথায়? ভালবাসা পবিত্র জিনিষ এবং ভালবাসায় পাপ নাই, তাহা সত্য; কিন্তু যে ভালবাসা আমাদের সংসারে প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত পবিত্র জিনিষ, নহে; তাহা মোহমাত্র। কাহারও রূপ দেখিয়া, বা কাহারও গুণ বুঝিয়া, আমরা যে ভালবাসিয়া থাকি, তাহা মোহের নামান্তরমাত্র। অন্যান্য রিপুকে বশীভূত রাখিয়া তাহাদের দ্বারা যেমন সংসারের শুভ সংসাধন করিয়া লইতে পারা যায়, তেমনই এই ভালবাসারূপ মোহটাকে সংসারের নিয়মের গণ্ডির মধ্যে রাখিয়া তাহা হইতে সংসারের অনেকটা মঙ্গল করিয়া লইতে পারা যায়। ভালবাসাটা যতক্ষণ গণ্ডির মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তাহা মঙ্গলময়, গণ্ডি অতিক্রম করিলেই তাহা রশ্মিবিচ্যুত অশ্বের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। ভগ্নবাঁধ স্রোতস্বতীর ন্যায় বন্যাজলে পৃথিবীর মধ্যে হাহাকার ছড়াইয়া দেয়। পুত্রের প্রতি পিতার যে ভালবাসা, যাহাকে আমরা স্নেহ বলি—তাহা যদি পুত্রের প্রতি অর্পিত না হইয়া পাত্রান্তরে অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহা পুত্রকে পিতৃদ্বেষী করিয়া তুলে; এবং তাহা যদি পুত্রের প্রতি অপরিমিত ও অসংযতভাবে বর্ষিত হয়, তবে তাহাও পুত্রকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে। স্বামীর প্রতি পত্নীর যে ভালবাসা—যাহাকে আমরা প্রণয় বলি—তাহা যদি পুরুষান্তরের অনুসন্ধানে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে, বহু ক্ষেত্রে তাহাতে স্বামীকে নির্ম্মম নরঘাতী করিয়া তুলে। সংযত ভালবাসায় পৃথিবীতে যেমন কল্যাণ আনয়ন করে, অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসায় তেমনই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তোমরা ভালবাসিও; কিন্তু সংযমের গণ্ডির মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখিও।

অম্বিকা তাহার ভালবাসাটাকে সংযমের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয় নাই; যাহাকে ভালবাসা উচিত নয়, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল। তাই অন্তর মধ্যে প্রাণভরা এই ভালবাসা লইয়া, লোকে চিত্ত দমনে যে শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহা সে লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী আপনার পাপ আপনার হৃদয় মধ্যে অনুভব করিয়া একান্ত অবসন্না হইয়া পড়িয়াছিল।

এ ভালবাসা অব্যক্ত রাখিতে পারিলে, হৃদয়ের সংগোপন স্থানে তাহা লুকাইয়া রাখিতে পারিলে, বুঝি কিছু মঙ্গল হইতে পারিত। কিন্তু অম্বিকা কি তাহা গোপন রাখিতে পারিবে? তাহার পরিপূর্ণ হৃদয় যে সামান্য আন্দোলনে উছলিয়া পড়িতেছিল। গদাধরকে কেন সে বলিল যে, সে কাহাকেও ভালবাসিয়াছে? তাহাকে বিদায় দিবার সময় কেন তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল?

অম্বিকা ভাবিল, "গদাধর বলিতেছিল, সে কাহাকেও ভালবাসিয়াছে;—কাহাকে? আমাকে? আমাকে সে ভালবাসিয়াছে;—আমার ভালবাসা দিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। সে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসি;—তথাপি তাহাকে সেবা করিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইয়া রহিলাম—তথাপি আমি তাহাকে পূজা করিতে পারিলাম না! হে ভগবান্! তবে কেন আমাকে এ পৃথিবীতে রাখিয়াছ? পৃথিবীতে থাকিলে, হয়ত একদিন আমার এ ভালবাসা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। লোকে তাহার নিন্দা করিবে। আমার নিন্দা করিলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তাহার নিন্দা আমি সহ্য করিতে পারিব না। তাহার নিন্দা শুনিবার আগে আমার যেন মৃত্যু ঘটে। আমার কোষ্ঠীর ফল এই যে, আমি জলমগ্না হইয়া মৃতা হইব। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কাছে, এ পতিতা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছে, গদাধরের নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবার আগে যেন সে গঙ্গার শীতল গর্ভে স্থান লাভ করিতে পারে।"

তাহার পাপের আকর্ষণে, তাহার সংসর্গে আসিয়া, গদাধর পাছে জনসমাজে নিন্দিত হইয়া পড়ে, এজন্য অম্বিকা প্রতিদিন মৃত্যু-কামনা করিল। প্রতিদিন কাতর স্বরে ভগবান্‌কে ডাকিয়া আপনার আশু মৃত্যু লাভের প্রার্থনা জানাইল। প্রতিদিন গঙ্গার উপকূলে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "পতিতপাবনি মা আমার! এ পাতকিনীকে, এ আবর্জ্জনাকে তোমার পবিত্র তরঙ্গাঘাতে পৃথিবীর পবিত্র গাত্র হইতে বিধৌত করিয়া পৃথিবীর অশান্তির ভয় নিবারণ কর। অয়ি বিঘ্ন-বিনাশিনি, এই মহাবিঘ্নকে গদাধরের উন্নতির পথ হইতে তোমার তরঙ্গতাড়নে বিতাড়িত কর।" প্রতিদিন যমরাজকে ডাকিয়া সে কহিল, "এ পাপকে যদি অতি-শীঘ্র তোমার যমালয়ের অন্ধকার মধ্যে না লুকাইয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে ইহা পৃথিবীমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।"

বলা বাহুল্য, আপনার মৃত্যু কামনা করিবার আগে, অম্বিকা হৃদয়কে শাসিত করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিল। কারণ সে জানিত যে, আপনাকে হত্যা করিবার ইচ্ছাটা, অন্যকে হত্যা করিবার ইচ্ছার ন্যায় একটা মহাপাপ। কিন্তু সে আপনার হৃদয়কে কোনও ক্রমে শাসিত করিতে পারে নাই। যতবার সে গদাধরকে ভুলিব বলিয়া মনে করিয়াছিল, ততবার গদাধর আরও উজ্জ্বলবেশে তাহার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া, আরও অমোঘ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কোনও সময়ে, সন্ন্যাসিবেশ-বিভূষিত, ভস্মমণ্ডিত এক ধূর্ত্ত ব্যক্তি, আপনার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লোকসমাজে প্রচারিত করিয়াছিল যে, তাহার নিকট সর্ব্বরোগের শান্তিকারক ঔষধ আছে; লোকসকল তাহার নিকট ঔষধ লইবার প্রত্যাশায় আগত হইলে, সে তাহাদিগকে ঔষধের বটিকা প্রদান করিত এবং বলিয়া দিত যে, ঔষধ খাওয়া সম্বন্ধে আর কোনও নিয়ম নাই; রোগী ইচ্ছামত স্নান আহার করিতে পারিবে,

—কেবল ঔষধ খাইবার সময় 'উট'—এই দুই অক্ষরযুক্ত শব্দটি স্মরণ করিতে পারিবে না, ইহা স্মরণ করিলে ঔষধসেবনের কোনও ফল হইবে না; বলা বাহুল্য, কোনও রোগীই এই ঔষধে নিরাময় হইতে পারে নাই;—তাহারা কেহই ঔষধ খাইবার সময় "উট"—এই শব্দটা বিস্মরণ হইতে সমর্থ হয় নাই। যাহা ভুলিবার জন্য আমরা বার বার চেষ্টা করি, তাহা আমরা ভুলিতে পারি না। অম্বিকা গদাধরকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া, কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, গদাধরের অশুভ আশঙ্কায় আপনার ধ্বংস কামনা করিয়াছিল। গদাধরের উন্নতি-পথে আপনাকে কণ্টক মনে করিয়া, তাহা অপসারিত করিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিল।

৩৬

কলিকাতায় আসিয়া মানদা অবাক্ হইয়া গেল। কি বড় বড় বাড়ি! কি অনন্ত শকটশ্রেণী! কি কলকলায়মান জনপ্রবাহ। ভাগীরথী বক্ষে পোতসকলের গুণবৃক্ষসকল কি নিবিড় অরণ্যানী সৃষ্টি করিয়াছিল! সে প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে আপনাদের গাড়ি চড়িয়া, মুণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল। কলিকাতা দেখিয়া, সে কখনও কালীদহে ফিরিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিল না।

গদাধর তাহাকে পশুশালা, যাদুঘর, দেবালয় থিয়েটার, বাগান, মাঠ, সার্কাস প্রভৃতি দেখাইয়া, এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী খাওয়াইয়া, এবং অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও রত্নখচিত বিচিত্র অলঙ্কারসকল পরিধান করিতে দিয়া, বিলক্ষণ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটা মহামূল্যবান্ সামগ্রী সে পত্নীকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। সে তাহার হৃদয়ের উৎকট ভালবাসার প্রবাহ অসীম মানসিক শক্তির দ্বারা সংযত করিয়া মানদার দিকে তাহা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। মূর্খা মানদা তাহা গ্রহণ করে নাই। আত্মগ্রাহী মানদা স্বামীর পবিত্র ভালবাসার মহান্ মর্য্যাদা বুঝিতে পারে নাই। এ ভালবাসার প্রবাহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সে অলঙ্কারের অহঙ্কারের মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। গদাধরের সমস্ত উপেক্ষিত প্রণয় গিরিপ্রতিহত প্রবাহিনীর ন্যায় আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। হায়! মানদা যদি থিয়েটার, সার্কাস, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ভুলিয়া, এই অনাদৃত ভালবাসাটাকে হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে, আমরা বুঝি পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গের সুন্দর আলেখ্য অবলোকন করিতে পারিতাম। কিন্তু সে ত তাহা লইল না। স্বামীর প্রবল ভালবাসার প্রবাহ-মধ্যে সে নিশ্চল পাষাণ খণ্ডের ন্যায় অবিচলিত রহিল। গদাধরের ব্যর্থ ভালবাসার সমস্ত বিচূর্ণ বেগ পাষাণ প্রতিমাবিচ্যুত শুষ্ক পুষ্পাঞ্জলির ন্যায়, পাষাণীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল!

মানদার কলিকাতা আগমনের ছয় মাস পরে, বৃদ্ধ উমাকালী চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে গদাধর একখানি পত্র পাইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে গদাধর নান্দীপুর নামক একটি গ্রামের জমীদারী-স্বত্ব ছয় হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল। সদর মালগুজারি বাদে জমীদারীটির বার্ষিক আয় ষোল শত টাকা। কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায়, এবং গ্রাম মধ্যে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায়, পূর্ব্ব জমীদার কিছুমাত্র আদায়-তহসীল করিতে সমর্থ না হইয়া, অতি সামান্য মূল্যে জমীদারীটি গদাধরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। গ্রামটি গদাধরের হস্তগত হইলে, গ্রামবাসীর

উন্নতিকল্পে কি কি কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা লিখিবার জন্য সে তাহার চক্রবর্ত্তী কাকাকে এক পত্র লিখিয়াছিল। আজ গদাধর এই পত্রের উত্তর পাইয়া, তাহা হস্তে লইয়া, মানদার নিকট অন্তঃপুর মধ্যে আগমন করিল।

মানদা তখন একখানি কৌচের উপর শয়ন করিয়া, গৃহতলোপবিষ্টা মুলীর নিকট তাহার অপূর্ব্ব বিদ্যা গ্রহণ করিতেছিল। অমুক গ্রামের অমুকা ধার্ম্মিকা নারী মন্ত্রপূত সর্ষপ তাম্বুলমধ্যে পুরিয়া, তাহা স্বামীকে চর্ব্বণ করিতে দিয়া, কিরূপে তাহাকে মেষরাজের ন্যায় বশীভূত করিয়াছিল এবং কিরূপে তাহাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নৃত্য করাইতে পারিত, এবং অমুক গ্রামের অমুকা পতিরতা নারী কিরূপে মূলবিশেষের সাহায্যে তাহার পাপিনী সপত্নীকে উন্মাদিনী করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং অমুক গ্রামে অমুকা পাপিষ্ঠা আতপতাপ নিবারণার্থে মস্তকোপরি ছত্র ব্যবহার করিয়া, এবং দণ্ডধারণ জন্য দণ্ডকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া কিরূপে লোকসমাজে নিন্দিতা হইয়াছিল, এই সকল চিত্তহর বিবরণ মুলী মানদার নিকট আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতেছিল।

গদাধরকে সমাগত দেখিয়া, মুলী অতি সত্বর গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। কি জানি কেন, গদাধরকে নিকটে দেখিলে মুলীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। গদাধরের দৃষ্টি-তলে সে সংকুচিত হইয়া পড়িত।

মুলী প্রস্থান করিলে গদাধর মানদার নিকটবর্ত্তী একখানি চৌকীতে উপবেশন করিল। মানদার করতল আপন হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, অতি কোমল কণ্ঠে কহিল, "মানদা, আজ তুমি অসময়ে শুইয়া রহিয়াছ কেন? অসুখ করে নাই ত?"

মানদা পূর্ব্ববৎ শায়িতা থাকিয়া, এবং গদাধরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কহিল, —"তুমি এখন এখানে কেন আসিলে?

গদাধর মানদার করতল আপন বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল,"তোমার সহিত আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, তাই আসিয়াছি। কিন্তু বিনা কাজে কি তোমার কাছে আমার আসিতে নাই? কাজ আছে বলিয়া না আসিয়া, যদি ভালবাসি বলিয়া আসি, তাহা হইলে, তোমার কি তাহা ভাল লাগে না?"

মানদা আপন হস্ত গদাধরের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহা আকর্ষণ করিয়া কহিল,—"তোমার হাত কি শক্ত! আমার বেদনা লাগিতেছে, ছাড়িয়া দাও।" গদাধর মানদার হস্ত ত্যাগ করিলে, মানদা কৌচের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ওঃ তোমার কি কাজ আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। সে দিন আমার জন্য যে ব্রেস্‌লেট ফরমাইষ দিয়াছিলে, তাহা বুঝি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই আমাকে দিবার জন্য তুমি এখন এখানে আসিয়াছ!"

গদাধর বলিল,—"না না মানদা, আমি কিজন্য আসিয়াছি, তাহা তুমি ঠিক বুঝিতে পার নাই। তোমার ব্রেসলেট প্রস্তুত হইয়াছে বটে, এবং আমি তাহা লইয়াও আসিয়াছি। কিন্তু তোমার সহিত আমার অন্য কাজ আছে।"

মানদা, গদাধরের কথা শেষ হইতে না হইতে, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিল,— "কই দেখি, আমার কেমন ব্রেস্‌লেট হইয়াছে?" ব্রেসলেট দেখিয়া মানদার পছন্দ হইল না,—সে কহিল, "জ্ঞানদা বাবুর পুত্রবধূর হাতে যে ব্রেসলেট দেখিয়াছি, ইহা তাহার শতাংশের একাংশও সুন্দর নহে।"

গদাধর জানিত যে, অলঙ্কারটি মানদার মনোমত হইবে না; কারণ এ পর্য্যন্ত গদা-

ধরের আনীত কোন দ্রব্যই মনোমত হইয়াছে বলিয়া মানদা স্বীকার করে নাই। তথাপি এই অমনোমত অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, সে আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সু-অলঙ্কৃতা মনে করিত। গদাধর হাতে করিয়া আনিলে যে অলঙ্কার কুৎসিত দেখাইত, মানদার অঙ্গে উঠিয়া তাহা অপূর্ব্ব শ্রী বিকীর্ণ করিত। মানদা মনে করিত, এটা তাহার অঙ্গের গুণ, গদাধরপ্রদত্ত অলঙ্কারের গুণ নহে। ব্রেস্‌লেট দু'টি মানদা মণিবন্ধে ধারণ করিলে মানদার কমনীয় বাহুযুগল অবলোকন করিয়া, গদাধর প্রফুল্লমুখে কহিল,—"তোমারকাছে যে কাজের জন্য আসিয়াছি, এখন তাহা বলি, শুন।"

মানদা, তাহার বাম হস্তের ব্রেস্‌লেটটি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ঘুরাইয়া, তৎপ্রতি আপনার আনত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, কহিল,—"কি কাজ?"

গদাধর বলিল,—"তুমি একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিবে? তোমার নাম অনুযায়ী পুষ্করিণীটির নাম হইবে, "মান-সরোবর।" আমার ইচ্ছা যে, তুমি ইহা কর; ইহাতে ইহকালে নাম আছে, পরকালে পুণ্য আছে।"

মানদা পরকালের বড় ধার ধারিত না। কিন্তু ইহকালে লোকমুখে তাহার নাম কীর্ত্তিত হইবে, তাহার সুযশ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইবে,—তাহার পক্ষে এটা বড় চমৎকার সামগ্রী; ইহার প্রলোভনটা সে ত্যাগ করিতে পারে না। সে স্মিতমুখে বলিল;—"কোথা, কবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

গদাধর বলিল,—"দেখ, নাড়িচার খুব নিকটে, গঙ্গাতীর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে নান্দীপুর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামখানি আমি ক্রয় করিয়াছি। গঙ্গাতীর হইতে এই গ্রামে প্রবেশ করিবার ভাল রাস্তা নাই; এবং এই গ্রামে পানীয় জলের উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী নাই। গ্রামটি আমি অত্যন্ত সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়াছি; উপযুক্ত মূল্যের সিকি মূল্যও প্রদান করি নাই। মূল্য কম দিয়া আমি যে অর্থ লাভ করিয়াছি, গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য আমি তাহা ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এই অর্থ ব্যয় করিয়া গ্রামমধ্যে একটি সরোবর খনন করিতে হইবে এবং নাড়িচা হইতে নান্দীপুর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিব, চক্রবর্ত্তী কাকা লিখিয়াছেন, আমার এ কার্য্যে গ্রামবাসীরা সহায়তা করিবে। এই তাঁহার পত্র দেখ।"

মানদা মণিবন্ধে ব্রেস্‌লেটটি ঘুরাইয়া কহিল,—"এই মাঝের হীরাটি যদি একটু বড় হইত, তাহা হইলে অনেকটা ভাল দেখিতে হইত।"

গদাধর উমাকালী চক্রবর্ত্তীর পত্রখানি আপনার বিশাল উরুপ্রদেশে বিস্তৃত করিয়া, কহিল,—"ইহার পর হীরা দু'টি পরিবর্ত্তন করিলেই চলিতে পারিবে। তুমি যখন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতে যাইবে, তখন এই ব্রেস্‌লেট পরিয়া যাইও। ইহা পরিয়া, তোমার হাত দু'টি বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

মানদা আপনার সুন্দর হাত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—"আমি কলিকাতায় আসিয়া একটু মোটা হইয়াছি;—নয়?"

গদাধর মানদার রত্নালঙ্কৃত পুষ্পসন্নিভ প্রকোষ্ঠপ্রদেশ আপন করতল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কহিল,—"আমি তোমাকে রোজ দেখিতেছি, এজন্য তুমি একটু মোটা হইয়াছ কিনা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পুকুর প্রতিষ্ঠার জন্য যখন তোমাকে লইয়া, তিন চারি মাস পরে নান্দীপুর

যাইব, তখন তোমার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কালীদহে দুই একদিন অবস্থিতি করিব, তখন তাঁহারা তোমাকে দেখিলে বুঝিতে পারিবেন তুমি মোটা হইয়াছ কিনা।”

মানদা আপন প্রকোষ্ঠ-বেষ্টিত গদাধরের কৃষ্ণ করতল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল,—“দেখ, আমার হাতের কাছে তোমার হাতটা কত কাল দেখাইতেছে! তুমি এরূপ কাল হইলে কি প্রকারে?

গদাধর বলিল,—“মানদা আমি কাল বলিয়া কি তুমি আমাকে পছন্দ কর না?’

মানদা হাসিয়া কহিল,—“তা কেন? মা বলেন, স্বামী কাল হইলেও, কদাকার হইলেও, তাহাকে ভক্তি করিতে হয়; মুলীও তাই বলে। দেখ, নান্দীপুরে যাইবার সময় আমি মুলীকেও লইয়া যাইব। তখন কি কি গহনা পরিতে হইবে, তাহা এখন হইতে স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। মুকুতার মালাটা নূতন করিয়া গাঁথিবার জন্য, বাবার কাছে কতদিন আগে পাঠাইয়াছি, এখনও তাহা পাইলাম না। বাবার বড় দেরী করা স্বভাব। তুমি একখানা চিঠি লিখিও ত।”

আজ মানদা স্বামীর সহিত যে কথাবার্ত্তা কহিল, তাহা তোমরা স্বকর্ণে শুনিলে। বুঝিলে, মানদা একটি প্রকাণ্ড আমি; সে স্বামী টামীর বড় ধার ধারিত না।

৩৭

পঁচিশ বিঘা জলকর—প্রকাণ্ড, কাকচক্ষু-সন্নিভ কৃষ্ণ জলরাশিপূর্ণ সরোবর, নান্দীপুরে চারি মাস মধ্যে খনিত হইল। সরোবরের দক্ষিণ তটে প্রশস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানসকল বিনির্ম্মিত হইল। গ্রামস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট আহারে আহ্বান করিয়া, মানদা গদাধর-সমভিব্যাহারে নান্দীপুরে উপস্থিত হইয়া, রাজরাণীতুল্য অলঙ্কারভারে পরিশোভিত থাকিয়া, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিল। পুষ্করিণীর নাম হইল, মান-সরোবর। আহার সমাপনান্তে গ্রামের লোক গগনস্পর্শী নিনাদে চীৎকার করিয়া বলিল, “জয়, মানদা মায়িকি জয়।” আমরা জানি, এ বিজয়-ধ্বনিটা বহুদিন মানদাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল, আপনার আমিত্বে মানদা বহুদিন ডুবিয়াছিল। যে স্বামীর অনুগ্রহে সে সেই মহাযশ লাভ করিয়াছিল, সে স্বামীও তাহার মনোমধ্যে স্থান লাভ করে নাই।

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গদাধর মানদাকে লইয়া কালীদহে আগমন করিয়াছিল। মানদাকে বহুদিন পরে দেখিয়া রত্নেশ্বর বাবু বিশেষ পুলকিত হইয়াছিলেন। রত্নময়ী জামাতা ও কন্যার জন্য প্রচুর আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুই দিন কালীদহে অবস্থিতি করিয়া মানদা ও গদাধর কলিকাতাতে প্রত্যাগত হইয়াছিল।

যে দুই দিন গদাধর কালীদহে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একদিনও সে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় বা তাঁহার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। আসিবার সময়ও সে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে নাই। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বিদায়গ্রহণকালে অম্বিকার সেই এক বিন্দু চক্ষের জল এখনও সে ভুলিতে পারে নাই। তাহা উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় এখনও তাহার হৃদয়মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পুনরায় বিদায় কালে অম্বিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহস হয় নাই। তাহার হৃদয়ের বলকে সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

গদাধর কালীদহ হইতে চলিয়া যাইবার কয়েক দিন পরে, এক দিন কৃষ্ণ চাটুর্য্যে

মহাশয় বহির্ভ্রমণ হইতে বাটীতে ফিরিয়া, অম্বিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা অম্বিকা! শুনিলাম, গত সপ্তাহে গদাধর মানদাকে লইয়া কালীদহে আসিয়াছিল। কই, সে ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই?

মানদা চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহা হইলে গদাধর আসিয়াছিল; তবে তাহাকে সে দেখিতে পাইল না কেন? তাহাকে জানিতে দিত না, অন্তরাল হইতে দেখিত; কাহার অভিশাপে এ দেখায় সে বঞ্চিত হইল! সে বিমর্ষ মুখখানি উন্নত করিয়া, বিশাল চক্ষু বিস্তৃত করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে আসিয়াছিল?"—সে গদাধরের নামটা সহসা উচ্চারণ করিতে পারে নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার প্রণয়িনী-গণকে চিনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাহারা প্রণয়াস্পদের নাম সহসা উচ্চারণ করিতে পারে না। মানদা পূর্ব্বে গদাধরকে গদাধর বলিয়াই ডাকিত, কিন্তু প্রণয়ের কোমল পুষ্পটি তখনও তাহার হৃদয়মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় নাই। এখন তাহার মনটি পূর্ণপ্রণয়ে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন গদাধরের নামটা তাহার কণ্ঠপথে বাহির হইল না; হৃদয়মধ্যেই রহিয়া গেল। সে পিতাকে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে আসিয়াছিল?"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কন্যার প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"রত্নেশ্বর বাবুর বাটীতে শুনিলাম যে, নান্দীপুরে পুকুর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মানদা এবং গদাধর উভয়েই নান্দীপুরে আসিয়াছিল, সেখানে পুকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া, দুই দিন কালীদহে অবস্থিতি করিয়া, তাহারা গত বুধবারে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। আমি ভাবিতেছি সে আমার সহিত বা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল না কেন? আমরা গ্রামে সমাজচ্যুত বলিয়া কি গ্রামের লোকে তাহাকে আমাদের বাটীতে আসিতে নিষেধ করিল? গদাধর সম্প্রতি কি এমন দুর্ব্বল-চিত্ত হইয়া গিয়াছে যে, লোকের নিষেধ শুনিয়া, যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইল? মা অম্বিকা, তুমি গদাধরকে পত্র লিখ; জিজ্ঞাসা কর, কেন সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই।"

অম্বিকা কহিল,—"হাঁ বাবা, আমি তাহাকে পত্র লিখিব। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, সে কাহারও নিষেধ শুনিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিরত হইয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার শরীর অসুস্থ ছিল, এজন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারে নাই।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কহিলেন,—"তাহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যে অসুস্থতা লইয়া সে কলিকাতা যাইতে পারিল, সেই অসুস্থতা লইয়া আমার সহিতও সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারিত। যাহা হউক, তাহার নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইলে সকল বিষয় জানিতে পারিব। তুমি তাহাকে পত্র লিখ।"

অম্বিকা গদাধরকে পত্র লিখিতে বসিল। গদাধরের প্রতি তাহার যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তাহার সহিত কামনা বিজড়িত থাকিলেও, তাহা নিকৃষ্ট নিন্দনীয় কামনা নহে;—তাহা ভক্তি করিবার কামনা। কিন্তু এই ভক্তিপূর্ণ কামনার দ্বারাও সমাজমধ্যে বিশৃঙ্খলা আসিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া, অম্বিকা ইহাকে সামাজিক পাপ বলিয়া গণনা করিয়াছিল। সমাজে থাকিয়া, সমাজ মধ্যে বিশৃঙ্খলা বিস্তার করিবার অধিকার আমাদের নাই। ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন

যে, যে লোক সকলকে বিচলিত করে না, সে তাঁহার প্রিয়।* তাহার ভালবাসার পূজায় জনসমাজ বিচলিত হইবে ভাবিয়া মানদা ইতিপূর্ব্বে তাহার চির আরাধ্যকে—চির পূজ্যকে ভক্তিপূর্ণ উক্তির দ্বারা পূজা করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ গদাধরকে পত্র লিখিতে বসিয়া, সে পাপ-পুণ্য ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মহারা কাতরা পত্রখানি ছত্রে ছত্রে সুধাসম ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া দিয়াছিল।

সেই দিন রাত্রে, আপন শয্যায় শুইয়া, উদ্দেশে গদাধরকে প্রণাম করিয়া, অম্বিকা আপন পত্র-লিখন-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। গদাধরকে সেইরূপ পত্রখানা লেখা কি তাহার উচিত হইয়াছিল? তাহার দ্বারা তাহার হৃদয়ের গুপ্ত প্রেম কি ব্যক্ত হইয়া পড়িবে না? তাহার হৃদয়ের অপরিমিত ভক্তির সন্ধান পাইয়া না জানি গদাধর কত আনন্দিত হইবে। না জানি সে পত্র পাইয়া,তদুত্তরে উচ্ছ্বসিত মনোবেগে গদাধর তাহাকে কত প্রেমপূর্ণ কথা লিখিয়া ফেলিবে। সে তখন তাহার কি উত্তর দিবে? সে তখন তাহার ভক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া গদাধরের চরণতলে ঢালিয়া দিবে। কিন্তু না, সে এরূপ করিতে পারে না; সে আপনার ভক্তির টানে গদাধরকে তাহার কঠিন কর্ত্তব্য-শিখর হইতে নিয়ে টানিয়া আনিতে পারে না। তাহার প্রাণেশ্বরকে কর্ত্তব্যের মহিমাশিখর হইতে বিচ্যুত দেখিবার পূর্ব্বে সে হেলায় জাহ্নবী-জীবনে আপন জীবন উৎসর্গ করিবে।

চারি দিন পরে সে গদাধরের নিকট হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্ত হইল।—কি নীরস, কঠিন, নির্ম্মম পত্র!—গদাধরের কর্ত্তব্য-শিখরের শিলাখণ্ড অম্বিকার হৃদয়মধ্যে কি কঠিন আঘাত প্রদান করিল। পত্র পাঠ করিয়া, অম্বিকা কাঁদিয়া ফেলিল। অম্বিকাই একদিন নির্ম্মম হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য গদাধকে উপদেশ দিয়াছিল। আজ কর্ত্তব্যব্রতধারী গদাধরকে তাহার প্রতি নির্ম্মম দেখিয়া, সে কেন অশ্রুবেগে অধীর হইয়া পড়িল? মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ কথার উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন। আমরা উপন্যাস-লেখক—দর্শনশাস্ত্রের বড় ধার ধারি না।

কিন্তু সেই নীরস পত্রখানা অম্বিকা নষ্ট করে নাই; অতি যত্নে পেটকমধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল!

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

* গীতা। ১২শ অধ্যায়। ১৫ শ্লোক।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

মন্ত্রীকে বড়্‌যন্ত্রকারী বলিয়া সন্দেহ।

সাধারণ শান্তিস্থাপনের জন্য আমার এই সকল চিন্তা বহুদর্শী ও বিচক্ষণ আমির-ওল ওমরা অত্যন্ত অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যদিও তিনি আমার এই-রূপ সতর্কভাব পছন্দ করিতেছিলেন না, তথাপি তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার্ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সহিত পরামর্শ করিবার ভান করিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে লোকে তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিবে না। তিনি আমার চক্ষুর অন্তরাল হইলে আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও আগ্রহ থাকিলেও, তাঁহার রীতিবিরুদ্ধ

কার্য্যে আমার মনে তাঁহার রাজভক্তির উপর কেমন সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি আমার অন্যতম পুত্র খসরুর কনিষ্ঠ মুরাদের সহিত মিশিয়াছিলেন। এই চিন্তাতে আমার মনে আকস্মিক অশান্তি উপস্থিত হইল; কারণ জ্যেষ্ঠই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়, এইরূপ প্রথা ছিল।

আমীরগণের প্রতি জাহাঙ্গীরের আদেশ প্রেরণ।

পুত্রসদৃশ প্রিয় ও বিশ্বস্ত আমিরওল ওমরা অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হইলেন এবং আমিও রাত্রি এক প্রহরের পর তাঁহার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইলাম। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া আমি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলাম, এবং আগ্রার প্রাসাদে শান্তিরক্ষার্থে নিযুক্ত সমস্ত সৈন্যকে প্রস্তুত হইবার জন্য সেখ ফরিদ বক্সীকে আদেশ করিলাম। সহর কোতোয়াল ইতিমাম্ খাঁকে দ্রুতগামী দূত দ্বারা চারিদিকে প্রধান প্রধান আমীরগণকে এই সংবাদ প্রেরণ করিবার আদেশ দিলাম যে, আমীরগণ যেন বাদশাহের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, যে সমস্ত আমীর তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে এবং সংবাদ প্রেরণমাত্র আমার সহিত যাত্রা করিতে পারেন, এইরূপ আদেশ প্রেরণ করা হইল।

খসরুর বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের যুদ্ধসজ্জা।

আমার অশ্বশালায় চল্লিশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্ব ছিল। সমস্ত অশ্বকেই এক্ষণে সম্মুখে আনা হইল এবং রণনিপুণ ও সাহসী যোদ্ধৃগণকে প্রয়োজনানুরূপ এই সকল অশ্ব দেওয়া হইল। আমীরগণের মধ্যে কাহাকেও এক শত, কাহাকেও বা দুইশত অশ্ব দেওয়া হইল। এক লক্ষ দ্রুতগামী উষ্ট্রকে যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত করা হইল এবং যে সমস্ত সৈন্যের উষ্ট্রসকল তত্তদূর কার্য্যপটু ছিল না, তাহাদিগকে ভাল ভাল উষ্ট্র দেওয়া হইল।

আমার সমভিব্যাহারী হইতে না পারিলেও প্রত্যেক আমির এবং মুনসেবদারকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ শীঘ্র আসিবার জন্য আদেশ করা হইল। দোস্ত মহম্মদ এবং মহম্মদ বেগ কাবুলাইতকে যথাক্রমে কাবুলে ও পাঞ্জাবে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা সেকেন্দারাবাদের অনতিদূরে ছাউনি করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারাই আমার নিকট সংবাদ লইয়া আসিলেন যে, সাহাজাদা খসরু ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া সেকেন্দারাবাদ অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাবাভিমুখে গিয়াছেন।

বিশ্বস্ত সৈন্যগণকে দ্রুতগামী অশ্ব ও উষ্ট্র দিয়া আমি স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে বাম পার্শ্বের রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং পথিমধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, খসরু সিন্ধু উপকূলের দিকে যাত্রা করিয়াছে। পরদিন প্রত্যূষে আগ্রা হইতে তিন ক্রোশ দূরে সেকেণ্ডারাতে পৌঁছিলাম। এই স্থানে মির্জ্জা সারোকের পুত্র মির্জা হাসেন খসরুর সহিত যোগদান করিতে পারে নাই। এক্ষণে সে আমার নিকটে আনীত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে সমস্ত বিষয় অকপটে স্বীকার করিল। এক্ষণে আমি তাহার হস্ত বদ্ধ করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে তুলিয়া লইতে আদেশ করিলাম।

শুভ চিহ্ন দর্শন।

এই সময়ে আমি স্বর্গীয় পিতার আশীর্ব্বাদে একটী শুভ চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এইরূপ একটী ঘটনা আমার পিতামহ হুমায়ুনের জীবনে সংঘটিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে হুমায়ুন তদীয় পিতা বাবরের কবর পরিদর্শনার্থ

গমন করিতেছিলেন, এমন সময় একটী পক্ষী তাঁহার পথ অতিক্রম করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া তিনি অনুচরবর্গকে বলিলেন, যদি তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর সেই পক্ষীটীকে বিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন। এই বলিয়া তিনি পক্ষীটীর প্রতি শর নিক্ষেপ করিলেন। অমনি পক্ষীটী শর বিদ্ধ হইয়া তাহার সম্মুখে পতিত হইল। সেই সময় হইতে তাঁহার মনে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তিনি এইরূপ কোন চিহ্ন দ্বারা স্বীয় ভবিষৎ ভাগ্য পরীক্ষা করিবেন; তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আরব্ধ কার্য্যের ফলাফল ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই অনুমিত হইবে।

পথিমধ্যে আমারও এইরূপ একটী ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পিতার কবর স্থান অতিক্রম করিয়া আমি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। এক ক্রোশ পথ যাইবার পরই এক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে বাদশাহ বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "মুরাদ খোজা" আমি বলিলাম, ভগবানের অনুগ্রহে আমার আশা পূর্ণ হইতে পারে। আরও কিছুদূরে যাইবার পর যখন আমরা বাবরের কবরের সন্নিকটস্থ হইলাম, সেই সময়ে অপর একজন ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে কতকগুলি জ্বালানি কাষ্ঠ মাথার উপর চাপাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং তাহার পৃষ্ঠদেশেও এক বোঝা কাঁটা রহিয়াছে। তাহাকেও সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল, "দৌলৎ খোজা" (ভাগ্য-দেবতা)। ইহা শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বের একটী ক্ষুদ্র নদীর তীর দিয়া যাইতে লাগিলাম। অনতিদূরে আমি দেখিলাম যে, একটী ছোট বালক কতকগুলি গরু চরাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমি ঐরূপ প্রশ্ন করিলাম; তাহার উত্তর শুনিয়া আমি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম, সেই বালকটীকে নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "সোয়াদৎ খোজা (শুভজ্ঞাপক)। ইহা শুনিয়া আমার সৈন্যগণের মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। সেই সময় হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই তিনটী মাঙ্গলিক পূর্ব্বসূচনার সাদৃশ্যে আমার সাম্রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য তিন ভাগে বিভক্ত করিব এবং ইহাকে আয়মন-ও-আলাপা (তিনটী চিহ্ন) * বলা হইবে।

জাহাঙ্গীরের বৃক্ষতলে বিশ্রাম।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে পর সূর্য্যদেব মধ্যাহ্ন গগনে উদিত হইলেন। তাঁহার প্রখর উত্তপ্ত কিরণ অসহ্য বোধ হওয়ায় আমি একটী সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া উপবেশন করিলাম। এই সময়ে আমার মনে বিষাদপূর্ণ চিন্তাসকল উদিত হইয়া আমাকে ক্লেশ দিতে লাগিল। আমি মনে মনে থান্ আজামকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলাম, কারণ উপযুক্ত আসবাবের অভাবে আমাকে এবং আমার অনুচরবর্গকে এতদূর কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। আবার ইহাও ভাবিলাম, এরূপ অতাল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানসকল লওয়াও সুকঠিন। ভাবিলাম সেই বালক খসরুকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পাইতে হইতেছে, কারণ ভয়ে ও

* যদি এই সমস্ত ঘটনা প্রকৃত ঘটিয়া থাকে এবং কোন উপাখ্যান-লেখকের দ্বারা কল্পিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, হুমায়ুনের জীবনে যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহার সহিত ইহাঁর বর্ণে বর্ণে মিল আছে।

পাপের তাড়নায় নিরাশহৃদয়ে সে কোন স্থানে নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিতেছে না। আমাদের এই শারীরিক ও মানসিক কষ্ট তাহার তুলনায় কিছুই নহে। কিন্তু যখন আমি ভাবিলাম, আমার রাজত্বকালের প্রথমেই আমাকে ও আমার অনুচরবর্গকে এইরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, তখন আমার ক্রোধ ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এই সমস্ত কষ্ট সত্বেও আমার মনকে এই সান্ত্বনা দিতে পারিলাম, যদি আমি আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং না আসিতাম, তাহা হইলে হয়ত হতভাগ্য পলাতক কোন সীমান্ত স্থান অধিকার করিয়া ফেলিত এবং অনেক অসন্তুষ্ট বিশ্বাসঘাতক কপটী তাহার সহিত যোগদান করিত। সুতরাং তাহাকে দমন করিতে হইলে আমার স্বয়ং আগমন ব্যতীত সুফললাভ করিবার উপায়ান্তর ছিল না।

জাহাঙ্গীরের শিবিরস্থাপন।

এইরূপ কষ্টের সহিত অনেক পথ অতিক্রম করিয়া আমরা একটী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে অনেকগুলি পুষ্করিণী ও সুন্দর বৃক্ষবাটিকা থাকায় শিবির স্থাপন করিতে মনস্থ করিলাম।

খসরু কর্ত্তৃক হিন্দুতীর্থ মথুরা লুণ্ঠনের বিবরণ।

এই স্থানে সংবাদ পাইলাম যে, খসরু মথুরাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাদকশান দেশীয় হোসানবেগ সৈন্যসহ নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অসহায় অধিবাসীদের উপর নানাবিধ অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছে, প্রত্যেকের নিকট হইতে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক যথেচ্ছভাবে অর্থসংগ্রহ করিয়াছে। স্ত্রীলোকের উপর এরূপ পাশব অত্যাচার করিতেছে যে, ভগ্নী, স্ত্রী বা কন্যার মান সম্ভ্রম রক্ষা করা হতভাগ্যদের ভার হইয়া উঠিয়াছে। পশুপ্রকৃতি সৈন্যগণ নিজেদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে সমস্ত ঘৃণত কার্য্য সাধন এবং অযথা লোকক্ষয় করিতেছে, তাহা দেখিয়া খসরু ভীত ও সন্তপ্ত চিত্তে অনুচরবর্গের মধ্যে তাহার কৃত-কর্ম্মের জন্য আত্মগ্লানি ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বলিয়াছে,"হায়! আমি কোথায় আসিয়াছি? কাহার কুমন্ত্রণায় আমি এই ঘৃণিত কার্য্য করিতে পরিচালিত হইয়াছি! আমার সেই হিতাকাঙ্ক্ষী পারিষদ্‌বর্গই বা কোথায়? কেনই বা আমাকে এই সমস্ত ঘৃণ্য পশুভাবাপন্ন সমাজের অন্ত্যজ দিগকে আমীর বলিয়া অভিবাদন করিতে হইতেছে! কেনই বা পিতার রাজত্বের পুত্রকন্যাসম প্রজাবর্গের ভীষণ পরিণাম দর্শন করিতে হইতেছে!"

খসরু আপনার দুরদৃষ্টজনিত কর্ম্মফলনিবন্ধন আত্মগ্লানি ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, অমূলক লজ্জা ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরবশ হইয়া, এই সমস্ত পাপকার্য্য হইতে সে নিজেকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। ঈশ্বর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছি, এখনও যদি হতভাগ্য খসরু আপনার দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অবিমৃষ্যকারিতার জন্য পরিতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া আমার নিকট আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাহা হইলে আমি তাহার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি। পিতা আকবরের পীড়িতাবস্থায়, খসরু আর একবার পিতৃভক্তিহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহার শত্রুতাপূর্ণ কু-অভিসন্ধিসকল জানিতে পারিয়া খসরুর বিপজ্জনক হীন চরিত্রের উপর আমার বিশেষ সন্দেহ হইয়াছিল।

কিন্তু যখন সে প্রকাশ্যভাবে আমার নিকট আসিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল এবং তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিল, তখন আমি হৃদয় হইতে তাহার প্রতি অপ্রীতি-জনক ভাবসকল দূরীভূত করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলাম। পিতার মুমূর্ষাবস্থায় অশান্তিপ্রিয় আমীরগণের বৈরভাব ও কপটতা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সৌভাগ্যবলে সেই সমস্ত কপটী আমিরগণকে দমন করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাবলে এই সমগ্র হিন্দুস্থানের আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি সেই সময় কিরূপ বিপদে পড়িয়া কালাতিপাত করিয়াছি, তাহা পরবর্ত্তী বর্ণিত ঘটনা হইতে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

১০১৪ হিঃ শঃ জামাদির পূর্ব্ব মাসের ১৯শে সোমবার পিতা আকবরের অসুস্থতা নিবন্ধন যন্ত্রণার সময় অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, জীবন-সঞ্চারিণী মদ্য পান করিবার পূর্ব্বে কিছু ফল বা খাদ্যাদি ভোজন করা উচিত। এইরূপ করায় আকবর সাহের ভয়ানক অগ্নিমান্দ্য হইল। এই সময়ে তিনি আসিনুদ্দিনকে তদীয় বাসনাসক্তির জন্য সাতিশয় ভর্ৎসনা করিতেছিলেন, পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁহার ক্রোধ আরও প্রবলতর হইয়া উঠিল। তজ্জন্য রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় পর দিন তাঁহাকে এক-বারে নিরাহারে কাটাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বুধবার মাংসের ঝোলের সহিত মদ্য মিশ্রিত করিয়া খাইয়াছিলেন। অপর আর এক দিন তিনি হিকিম আলি নামক জনৈক চিকিৎ-সককে অসন্তোষজনক বাক্যের দ্বারা ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সেই চিকিৎসক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, উত্তেজনার সময় কোন বস্তুই অভীষ্ট ফল প্রদান করে না। নির্জ্জনতাই তাঁহার একমাত্র আরামলাভের উপায় এবং ইহা দ্বারাই তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবেন।

জীবনধারণ অপেক্ষা তাঁহার আত্মীয়গণের উদ্বেগ প্রশমিত করিবার জন্য, তিনি খিচুড়ি খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পেটের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে, এই সময়ে যাহা আহার করিতেন, তাহাতেই তাঁহার অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ হইত। হিকিম মাজাফর্ নামক অপর একজন চিকিৎসক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সমব্যবসায়ী হিকিম আলি ব্যবস্থা-পত্রে ঔষধ-নির্ব্বাচনে ভুল করিয়াছেন, বিশেষতঃ রোগীকে পীড়ার প্রারম্ভে শশা ভক্ষণ করিতে দিয়া আরও অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। হিকিম আলির প্রতি তাঁহার এইরূপ হিংসাপূর্ণ উক্তিতে আমার মনে হইল, একজন সম-ব্যবসায়ীর কথা শুনিয়া অপর একজনের সুখ্যাতি নষ্ট করা উচিত নয়।

আমি ভাবিলাম, যদি আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে চিকিৎসকের ভ্রম না হইত, তাহা হইলে আমরা কেহই মরিতাম না। আমি বিবেক ও দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া হাকিম আলিকে ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু তাহার প্রতি আমার হৃদয়ের বিশ্বাস একবারে নষ্ট হইয়া গেল।

আকবরের পীড়িতাবস্থায় সেলিমের বিরুদ্ধে আমীরগণের ষড়যন্ত্র।

পিতার পীড়ার সময়ে দশ দিন যাবৎ আমি প্রায় একঘণ্টা করিয়া তাঁহার নিকট থাকিতাম এবং মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। আমি প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনের সময় হইতে সমস্ত দিন তাঁহার নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগি-লাম। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের কোনরূপ

বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তিনি আমাকে দুর্গপ্রাসাদ হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন, এবং আমাকে অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। আমার মনে হইল, এরূপ পরামর্শে অবহেলা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এইরূপ বিপদের সময় আমি অত্যন্ত সমীক্ষাকারিতার সহিত প্রাসাদে যাতায়াত করা উচিত বিবেচনা করিলাম। তার পর, একদিন পরিজনগণের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু পর দিন আমীরগণ বাদশাহের অনুমতি না লইয়া, দুর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং আমার অনুচরগণকে তথায় প্রবেশ করিতে দিল না। কিন্তু ১৬ই বৃহস্পতিবার আমি বুঝিতে পারিলাম আমীরগণ গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছে। সেইদিন হইতে আমি দুর্গপ্রাসাদে পিতার নিকট যাওয়া একবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। তার পর আমি মোকারেব্ খাঁর হস্তে মানসিংহের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম. তাহাতে মানসিংহ জানাইয়াছেন যে, আমি যেন তাঁহাদের সহিত একমতাবলম্বী হই। এই ঘটনার সময় আমি জানিতে পারিলাম যে, মোকারেব্ খাঁ ক্ষণকালমাত্র বিশ্রাম না করিয়া আমার স্বার্থের জন্য সাতিশয় আগ্রহ ও উদ্যোগের সহিত দুর্গপ্রাসাদ মধ্যে আমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিয়াছেন। আগ্রার দুর্গমধ্যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে বঞ্চিত হইয়া আমি যে কি অসহ্য উদ্বেগ ভোগ করিয়াছি, তাহা অবর্ণনীয়। এমন কি আমি কিছুকালের জন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা আলাপ বন্ধ করিয়া কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া কালযাপন করিয়াছিলাম। এই শত্রুগণ মধ্যে এমন কয়েকজন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহাদের আমি বিশেষরূপ জানিতাম। অবশেষে আমি তাঁহাদিগকে আমার দুঃখের কারণ ও মানসিক উদ্বেগের বিষয় জানাইয়াছিলাম।

সা ইস্মাইলও সুলতান হায়দার মির্জ্জার ইতিহাস

আমার বিশ্বস্ত বন্ধুগণ প্রায়ই নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা আমার চিত্তবিনোদন করিতেন। পারস্য প্রদেশের শাহ তামাস্পের মৃত্যুর দিনে তদীয় পুত্রগণ স. ইস্মাইল ও সুলতান হাইদার মির্জ্জা কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলিয়াছিলেন। শাহের আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া কতিপয় আমীর ইস্মাইল মির্জ্জার পক্ষ অবলম্বন করিবে বলিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইস্মাইল মির্জ্জা নগরে দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। যে রাত্রে দুর্গরক্ষার ভার আমীরগণের উপর অর্পিত হইয়াছিল, সেই দিন তাহারা ইস্মাইল মির্জ্জার ভগ্নীকে অবগত করিয়াছিল যে, অপর কতকগুলি আমির ইস্মাইল্ মির্জ্জাকে বন্দী করিয়া হাইদারকে পারস্যের সিংহাসন প্রদান করিবে, এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে। সেই রাত্রেই পারস্যের অধিপতি শাহ তামাস্প পরলোকগত হইয়াছিলেন। এই সুযোগে হোসেনি বেগ ও তৎপক্ষীয় আমীরগণ হাইদার মির্জ্জাকে শাহের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে, তাহার ভ্রাতা মুস্তফা মির্জ্জাকে তথায় আনয়ন করিয়া হঠাৎ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। কিন্তু তাহাদের জয়ের আশা সন্দেহমূলক বুঝিতে পারিয়া, দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যগণ অনর্থের মূল উচ্ছেদ করিবার জন্য, সুলতান হায়দার মির্জ্জার মস্তকচ্ছেদন করিয়া তদীয় ছিন্ন মুণ্ড দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিয়াছিল। হায়দারের এবংবিধ শোচনীয়

মৃত্যু দর্শনে তদীয় পক্ষাবলম্বী সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িল এবং মুস্তফা মির্জ্জা দশ সহস্র সৈন্য লইয়া পলায়ন করিল। কিছুকাল পরে হোসেনি বেগ ও তদীয় ভ্রাতৃগণ ব্যতীত সকলেই মুস্তফা মির্জ্জাকে পরিত্যাগ করিল। অবশেষে মুস্তফা মির্জ্জা হোসেনি বেগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া ইস্মাইল মির্জ্জার হস্তে পতিত হইলেন এবং নূতন শাহ স্বীয় কণ্টক দূর করিবার জন্য মুস্তফাকেও হত্যা করিলেন।

ভারতীমঙ্গল কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

পিশিতে (১) হইল পঙ্ক সরিত (২) শোণিতে।
রথকেতু(২) হয়(৩ পক্ষী(৪) ভাসে খর স্রোতে॥
সর্ব্ব চমূ (৫) বিনাশ দেখিয়া বিদ্যমানে।
ধাইল ত্রিশিরা (৬, বেগে সঙ্গেতে দূষণে॥
সিংহনাদ করে কোপে লোহিত লোচন।
কম্পিত অধর গণ্ড হাতে শরাসন॥
অলক্ষিতে ক্ষেপে অস্ত্র আকর্ণ পূরিয়া।
রামেরে জর্জ্জর কৈল সর্ব্বাঙ্গ ভেদিয়া॥
ক্ষণেকে সুস্থির হৈয়া রাজীবলোচনে (৭)।
মহাতীক্ষ্ণ বাণ প্রভু রাক্ষসেকে হানে॥
কটাক্ষে কার্ম্মুক কাটি কৌশল্যাকুমারে।
কেতু কাটি কলেবর বিন্ধে খর (৮) শরে॥
সংহারে সৈন্ধব (৯) সব শতাঙ্গ (১০) সহিতে।
শেলে শির ত্রিশিরার ছেদে রঘুনাথে॥
দূষণের দুই হস্ত সনে কাটে শির।
ধূলে লুটে (১১) আতুধান সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
ইহা দেখি কোপে খর পুণ্যজনপতি।
গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলে শুন দাশরথী॥
ভেটিবে (১২) শমনে তূর্ণ শুনহ রাঘব।
মোর সাথে রণে কত হারিল বাসব (১৩)॥
ইহা বলি চাপে বাণ সন্ধান পূরিল।
শরজাল করি দিনমণি আচ্ছাদিল॥

(১) মাংস (২) পতাকা (৩) অশ্ব (৪) হস্তী (৫)সেনা (৬) খররাক্ষস (৭) রাম (৮) তীক্ষ্ণ (৯) ঘোটক (১০) রথ (১১) রাক্ষস (১২) প্রেরণ করিবে (১৩) ইন্দ্র; যিনি স্বর্গে বাস করেন।

অজস্র আয়ুধ আইসে নাহি অবসর।
বাণাঘাতে স্থকিত হইলা রঘুবর॥
ক্ষণমাত্র স্থির হৈয়া জলজলোচন (১)।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করে বরিষণ॥
রজনীচরের অস্ত্র করিয়া সংহার।
সিংহনাদ করি প্রভু লাগে হানিবার॥
খরের ধনুক ধ্বজ (২) করিল জর্জ্জর।
অতি কোপে চাপে যুড়ে অর্দ্ধচন্দ্র শর॥
মহামন্ত্র পড়ি বাণ ছাড়ে রঘুনাথে।
কাটিল খরের মুণ্ড কুণ্ডল (৩) সহিতে॥
মহারণে মৈল যদি খর দুরাচার।
দেবগণে লাগে পুষ্পবৃষ্টি করিবার॥
ইহা দেখি শূর্পণখা চিন্তাযুক্ত মনে।
ব্যোম (৪) পথে চলে শীঘ্র রাবণ যেখানে॥
শুন প্রভু রঘুনাথ নিবেদন মোর।
অন্তে মোকে দিবে স্থান পদযুগে তোর॥
পুনঃ পুনঃ করি স্তুতি তারহ শ্রীরাম।
ভবার্ণবে ভয় ভারি না হইও বাম॥
শুন বাণী কর প্রভু যেন ইচ্ছা মনে।
রামের রাজীব (৫) পদে রাজসিংহ ভনে॥

ত্রিপদী।

শূন্য পথে নিশাচরী, গেলা তূর্ণ লঙ্কাপুরী
রাবণ রাজার সন্নিধান।

(১) রাম (২) পতাকা (৩) কর্ণাভরণবিশেষ (৪) শূন্য আকাশ; (৫) পদ্ম।

কান্দিয়া রাক্ষসী বলে, আমাকে ধরিয়া ছলে
শ্রীরামে কাটিল নাক কাণ ॥
দেখিয়া এমত কাজ, বলে নিশাচররাজ,
স্থির হও না কর ক্রন্দন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মারি, আনিব তাহার নারী
নতু আমি কিসের রাবণ ॥
মারীচ সংহতি করি, রাক্ষসের অধিকারী
দণ্ডকে আসল শীঘ্রগতি।
ছাল পরা জটা মাথে, জানকী লক্ষ্মণ সাথে,
কুটীরে আছেন রঘুপতি ॥
সুরঙ্গ(১) কুরঙ্গ(২) হৈয়া, মারীচ মিলিল গিয়া,
দেখে সীতা রামেতে গোচরে।
শুন প্রভু নারায়ণ, বলি আমি নিবেদন,
এই মৃগ ধরি দেও মোরে ॥
হাতে ইষু শরাসন, তাড়ে মৃগ নারায়ণ,
চলি গেলা অতি দূর বনে।
প্রভুর বিলম্ব দেখে, বলে বাণী চন্দ্রমুখী
শুনি পিছে ধাইল লক্ষ্মণে ॥
পায়া এই অবসর, আসি মিলে লঙ্কেশ্বর,
যোগীবেশ অপূর্ব্ব মূরতি।
শিরে জটা ভস্ম অঙ্গে, বসন আরক্ত রঙ্গে,
শিঙ্গা করে ডাকে পশুপতি ॥
আসিয়া কুটীর কাছে, জানকীরে ভিক্ষা যাচে,
দেখি সীতা গেলা ভিক্ষা দিতে।
দুরাচার নিশাচরে, জানকীর ধরি করে,
তুলিয়া লইল নিজ রথে ॥
জটায়ু বিহঙ্গ সাথে, রাবণের দেখা পথে,
তার সঙ্গে হৈল মহারণ।
শেলাঘাতে পক্ষী মারি, অন্তরীক্ষে দুরাচারী,
সীতা লৈয়া করিল গমন ॥
লঙ্ঘি দ্রুত রত্নাকরে,(৩) উত্তরিল নিজ পুরে,
রাখে সীতা অশোক কাননে।
সীতার রক্ষক কাজে, নিয়োজে রাক্ষসরাজে,
ত্রিজটাকে (৪) পঞ্চ চেড়ী (৫) সনে ॥

(১) উজ্জ্বল রং (২) হরিণ (৩) সমুদ্র (৪) রাক্ষসী বিশেষ (৫) দাসী।

এথা প্রভু রঘুনাথে, মৃগ বধি হরষিতে,
নেউটিয়া (১) চলে নিজ ধামে।
পথে লক্ষ্মণের সাথে, দেখা হৈল অকস্মাতে,
বিস্তর গঞ্জিলা (২) প্রভু রামে ॥
কন তুমি ভ্রম পাইয়া, মোর কাছে আইলে ধাইয়া
সীতাকে রাখিয়া একেশ্বরী।
বনে ফিরে নিরন্তর, দানব ত্রিযামাচর, (৩)
চল তূর্ণ ঘরে যাই ফিরি ॥
গৃহে আসি দুই জন, দেখে শূন্য নিকেতন,
কুটীরে নাহিক চন্দ্রমুখী।
ফেলিলা ধনুক শর, চক্ষে বহে ধারাধর (৪)
অন্তরে অত্যন্ত হৈলা দুঃখী ॥
বিচারেন নানা স্থল, দরী গিরি বন জল,
কোন খানে না পায় উদ্দেশ।
ভ্রমি ফিরে দুই ভাই, সীতা চাইয়া ঠাঁই ঠাঁই,
না পাইয়া ভাবে মহা ক্লেশ ॥
ঋষ্যমূক গিরি পরে, দেখে দুই সহোদরে,
সুগ্রীব প্লবগ পঞ্চ সাথে।
রামস্থানে কপিবরে, নিজ দুঃখ সগোচরে,
শুনি মৈত্র কৈলা রঘুনাথে ॥
সুগ্রীবের পক্ষ হৈয়া, বালি কপি সংহারিয়া,
যান প্রভু রত্নাকর কূলে।
পরে পুন হরিনাথে, শ্রীরামের সাথে সাথে,
শাখামৃগ সৈন্য লৈয়া চলে ॥
আজ্ঞা দিলা রঘুনাথে, হনুমান্ শূন্যপথে,
সিন্ধু তরি গেলা লঙ্কাপুরী।
সীতাকে অশোক বনে, দেখি তুষ্ট হনুমানে,
রাম কাছে পুনি আইসে ফিরি ॥
রামকে করিয়া নতি, কহে হনু কপিপতি,
শুন প্রভু অম্বুজ(৫) লোচন।
জানকী লয়েছে হরি, রাখিয়াছে লঙ্কাপুরী,
রাবণ আখ্যান পুণ্যজন ॥
রাম হেন বাক্য শুনি, সুগ্রীবেতে কহে বাণী,
কর শীঘ্র বন্ধন সাগর।

(১) ফিরিয়া (২) তিরস্কার করিলেন (৩) নিশাচর (৪) মেঘ (এখানে) অশ্রু (৫) পদ্ম।

অঙ্গদাদি নীল নল, মুখ্য যত কপিবল,
ডাকি কহে সুগ্রীব বানর॥
সকলে শুনহ বাণী, প্রস্তর পাদপ আনি,
সেতুবন্ধে কর অনুমতি।
শুনি তূর্ণ কপিগণে, কৈল সেতু রঙ্গমনে,
দেখি হর্ষ হৈলা রঘুপতি॥
শুভক্ষণ লগ্ন করি, সসৈন্য সহিতে হরি,
সেতু হাঁটি হৈলা সিন্ধুপার।
পঞ্চ নিশাচর সনে, আসি মিলে রাম স্থানে,
বিভীষণ অভিধান তার॥
মৈত্রী কৈলা তার সাথে, লঙ্কাপুরে রঘুনাথে,
তিষ্ঠিলেন সহিতে বাহিনী।
শ্রীরাম জপিয়া মনে, রাজসিংহ দ্বিজে ভণে,
সঙ্কটেতে তরাও তারিণী॥

পয়ার।

লঙ্কাতে বানরে চারিদ্বার বন্ধ কৈল।
শুনি মনে দশাননে কোপযুক্ত হৈল॥
সারথি সম্বোধি কহে সাজাও স্যন্দন।
এত বলি কোপে দর্পে উঠিল রাবণ॥
সংহতি অসংখ্য সেনা মহাযোদ্ধাপতি।
হেন কালে দিব্য রথ যোগায় সারথি॥
লম্ফে রথে চড়ে রাজা কম্পিত মেদিনী।
আসি মিলে রণস্থলে করি সিংহধ্বনি॥
দেখি নিশাচর কোপে কাঁপে কপিগণ।
মিশাইয়া দুইজনে হৈল মহারণ॥
প্লবঙ্গমগণ গাছ পাথর বরিষে।
নানামত অস্ত্রে রণ করয়ে রাক্ষসে॥
হেন ঘোর হৈল রণ ঢাকে দিনমণি।
লক্ষে লক্ষে বীর পড়ে উভয় বাহিনী॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোপে ধনু লৈলা হাতে।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ হানে কোপ চিতে॥
বিদ্যুত জিনিয়া দীপ্তি করি চলে শরে।
খগে যেন দ্রুতগতি করয়ে অম্বরে॥
অসংখ্য রাক্ষস রণে হইল নিপাত।
রুধিরে হইল নদী অত্যন্ত অগাধ॥
একা যেই নিশাচর জিনেছে বাসব।
ক্ষণেকে রামের সাথে হৈল পরাভব॥
মেঘনাদ অতিকায় রাবণনন্দন।
মহাযোদ্ধা বলবান প্রতাপে শমন॥
সুমিত্রার সুত সঙ্গে সম্মুখ সমরে।
বাণাঘাতে দুইজন গেল যমঘরে॥
কুম্ভকর্ণ মকরাক্ষ প্রহস্তাদি বীর।
শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধে ত্যজিল শরীর॥
হেন মতে সর্ব্ব সৈন্য হইল বিনাশ।
দশানন ভাবে মনে জীবন বিনাশ॥
সারথিকে ডাকি বলে নিশাচরনাথে।
নেহ মোর রথ শীঘ্র শ্রীরাম অগ্রেতে॥
সারথিয়ে দ্রুতগতি চালাইয়া স্যন্দন।
ভিড়াভিড়ি হৈল দুই শ্রীরাম রাবণ॥
রাঘবেরে বিরথি দেখিয়া বলারাতি। (১)
পাঠাইলা নিজ যান মাতলি সংহতি॥
সেই রথে উঠি প্রভু জলজলোচন।
ঘোর সিংহনাদ করি টানে ধনুর্গুণ॥
ইহা দেখি দশানন হৈয়া কোপমাত।
উপহাস করি বলে শুন দাশরথি॥
কি বুঝিবে শিশু তুমি মোর বিদ্যমান।
রমণীর হেতু কেন হারাও পরাণ॥
বলে প্রভু শুন বাণী পাপিষ্ঠ রাবণ।
কার্য্য না করিয়া দম্ভ কর অকারণ॥
হেন মতে বাক্যযুদ্ধ হৈল পরস্পর।
পরে অস্ত্রাঘাত যুদ্ধ হৈল ঘোরতর॥

(১) ইন্দ্র।

প্রাপ্তিস্বীকার।

ভক্তের জয়—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ১৲ টাকা।

ভগবান্ ভক্তাধীন। তিনি নানা উপায়ে ভক্তের মাহাত্ম্য বাড়াইয়া ভক্তির ও ভক্তের মহিমা প্রচার করিয়া থাকেন। ভক্তের সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্ সকলই ভগবানের। ভগবান্ ভক্তের ক্রন্দনে কাঁদেন, ভক্ত হাসিলে হাসেন। কিন্তু ভগবান্‌কে এইরূপে কাঁদাইতে হাসাইতে হইলে একটা শক্তি লাভের প্রয়োজন। সে শক্তি ভক্তি। এজন্য ভক্তকে প্রথমে বিপদের ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া একটা ভীষণ পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষায় ভক্তের ভক্তি যখন অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় শতগুণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, উত্তাল তরঙ্গময় বিপৎসাগরে পতিত হইয়াও ভক্তের অবিচলচিত্ত যখন দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ন্যায় কেবল ভগবানেরই চরণাভিমুখী হইয়া থাকে, তখন ভগবান্ সস্নেহে ভক্তকে আপনার অমৃতময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া তাহার সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া দেন; ত্রিলোকে ভক্তের জয় ঘোষিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে এইরূপ কয়েকটী ভক্তচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। চরিত্রগুলি উৎকল-ভাষার 'দার্ঢ্য ভক্তিরসামৃত' গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ভক্ত কিরূপে ঘোর বিপদ্‌রাশির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াও আপনার চিত্তকে ভগবচ্চরণে অবিচল রাখিতে পারে, এবং সেই ঐকান্তিকতার গুণে শেষে কিরূপে শ্রীভগবানের করুণা লাভ করিয়া ধন্য হয়, তাহা ইহার প্রত্যেক চরিত্রে পরিস্ফুট। এরূপ চরিত্র পাঠে নির্ম্মল আনন্দ ও পবিত্রতা উভয়ই লাভ করিতে পারা যায়। ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই সাদরে 'ভক্তের জয়' পাঠ করিয়া যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ ভক্তচরিত্রের প্রকাশ দ্বারা জনসমাজে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত করা গ্রন্থকার গোস্বামী মহাশয়ের বংশোচিত কার্য্যই হইয়াছে। আমরা তাঁহার নিকট এইরূপই আশা করিয়া থাকি।

ভীষ্ম মহাদর্শন (বা মহাশক্তি আর্য্যদর্শন)—শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

আর্য্যজাতির ধর্ম্ম, জ্ঞান, শক্তি, চিন্তা প্রভৃতি কিরূপ মহান্ ছিল, এক্ষণে সেই আর্য্যজাতি কোন্ রত্ন হারাইয়া পথের কাঙ্গাল হইয়াছে, এবং কি উপায়েই বা সেই শ্রেষ্ঠরত্ন লাভ করা যায়, তাহাদের প্রদর্শনই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। মহাত্মা ভীষ্মের চরিত্রকে আদর্শ করিয়া গ্রন্থকার এই উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। ভীষ্ম চরিত্রকে আদর্শ করিবার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মতে "ভীষ্মস্তু ভগবান্ পূর্ণ।" ভগবান্ কাহাকে বলা যায়?

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

এই ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টী যাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তিনিই পূর্ণ ভগবান্। গ্রন্থকারের মতে ভীষ্মই 'পূর্ণ ভগবান্' পদের বাচ্য, তদ্ভিন্ন আর কেহ এই পদবাচ্য হইতে পারে না; এমন কি, হরিহর ব্রহ্মাদিও নহে। "ভাগবতে আছে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', কিন্তু যেমন গাঁয়ে মানে না আপনি

যেরূপ তেমনই কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, "পূর্ণ" নহেন। যেহেতু কৃষ্ণই বলুন, আর হরিহর ব্রহ্মাদিই বলুন, সকলেরই বীর্য্য খণ্ডিত হইয়াছে—সকলেরই সন্তানাদি জন্মিয়াছে। কেবল ভীষ্মের বীর্য্যই অখণ্ডিত, সুতরাং তিনিই পূর্ণ ভগবান্।" অতএব পূর্ণ ভগবান-কেই আদর্শ করিয়া গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে।

উত্তম, কিন্তু ইহার "ভীষ্মের জীবন চরিত" নাম না হইয়া "ভীষ্ম মহাদর্শন" নাম হইল কেন? তদুত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"মহান্ পদার্থের চরিত হয় না, তাঁহার চরিতের নামই দর্শন, যেমন অব্যক্ত ঈশ্বরের জীবনচরিত (!) ছয় ব্যক্তি ছয় রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহারি নাম ষড়্‌দর্শন, ইহাও তদ্রূপ ব্যক্ত ঈশ্বরের জীবন চরিত, সুতরাং ভীষ্ম মহাদর্শন।"

উত্তম বিচার! যখন অব্যক্ত ঈশ্বরেরও জীবনচরিত লিখিত হয়, এবং তাহা দর্শন নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তখন পূর্ণ ভগবান্ ভীষ্মের জীবনচরিতই বা 'মহাদর্শন' নামে অভিহিত না হইবে কেন? ব্যাসদেব মহাত্মা ভীষ্মকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এতদূর করিতে পারেন নাই। এইবার ভীষ্মের চরমোন্নতি হইয়াছে।

এই মহাদর্শনে গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব বিচার-শক্তি, অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত ভূয়োদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জোলেখা—ঐতিহাসিক উপাখ্যান। শ্রীআবদুল লতিফ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। হিতবাদী পুস্তকবিভাগ হইতে প্রকাশিত; মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা প্রসিদ্ধ কবি জামী প্রণীত জোলেখা নামক পারস্য কাব্যের ভাবাবলম্বনে লিখিত। মহাত্মা ইউসফ এই গ্রন্থের নায়ক। তাঁহার ধর্ম্মময় জীবন কাহিনী, ও জোলেখার প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ ইহাতে সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ইহার রচনা ওজোগুণসম্পন্ন ও ভাষা প্রাঞ্জল। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম।

সাবিত্রী—কথাগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা মাত্র।

পুণ্যচরিত্রা সতীশিরোমণি সাবিত্রীর কথা এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। এই গ্রন্থে সেই সাবিত্রীর উপাখ্যান সহজ ও সুখপাঠ্য ভাষায় রচিত হইয়াছে। অল্পশিক্ষিতা রমণীরাও ইহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারিবেন। নিষ্ফল গল্পপূর্ণ উপন্যাস নাটকাদির পরিবর্ত্তে সকলেই ইহা আপনার স্ত্রী কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে উপহার দিয়া সংসারকে সুখময় করিতে যত্নবান্ হইবেন।

বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না?—মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা।

এই পুস্তকে বহু যুক্তিতর্কের সহিত বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, এবং এ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের মত ও রাজবিধি উল্লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গের কবিতা—শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত ও সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত।

ইহাতে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণের কবিত্ব ও তাহার দোষ-গুণ নিপুণতাসহকারে আলোচিত হইয়াছে।

সাহিত্য-সংহিতা

একাদশ খণ্ড] ১৩১৭ সাল, মাঘ। [১০ম সংখ্যা।

কবীর সাহেব।

বিক্রমাদিত্য সংবৎ ১৪৫৫ অর্থাৎ ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কবীর সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নূর আলী এবং মাতার নাম নীমা। কেহ কেহ বলেন, কবীর নীমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের সোমবার বৃষ্টির সময় নীরুজোলা লহর তারা নামক সরোবরের জলে সূত্র ধৌত করিতে গিয়া সেখান হইতে শিশু কবীরকে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই কবীর অনেক জ্ঞানের কথা অপরকে শুনাইতেন। কবীর জন্ম হইতেই সিদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি স্বামী রামানন্দকে গুরু করিয়াছিলেন। রামানন্দ রামানুজ-মতের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। কবীরের আধ্যাত্মিক উন্নতি রামানন্দ অপেক্ষা অনেকাংশে উচ্চ ছিল; কেবলমাত্র লৌকিক প্রথা রক্ষার জন্য তিনি রামানন্দকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন, নতুবা রামানন্দ তাঁহাকে শিষ্য করেন নাই। এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে;—

রামানন্দ অন্ধ ছিলেন। এক দিবস প্রাতঃকালে তিনি গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য সোপানাবলি অবতরণ করিতেছিলেন। সেই সময় সোপানে শায়িত কবীরের অঙ্গে তাঁহার পদস্পর্শ হওয়ায় তিনি "রাম রাম" বলিয়া উঠেন। তখন কবীর সাহেব ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পদযুগল গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন;—প্রভু, আমি এক্ষণে আপনার শিষ্য হইলাম, যেহেতু আপনি আমাকে আপনার শ্রীচরণ এবং রাম নাম প্রদান করিলেন।

রামানন্দ একদিন নিজ ইষ্টদেবের বিগ্রহ পূজা করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে মূর্ত্তির মস্তকে মুকুট পরাইয়া পশ্চাৎ পুষ্পমাল্য পরাইতে গিয়া দেখেন যে, মুকুট না খুলিলে মালা পরাইবার উপায় নাই। কিন্তু মুকুট খুলিলে পাছে দেবতার অবমাননা করা হয়, এই আশঙ্কায় রামানন্দ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, বাহির হইতে কে যেন বলিতেছে, "মালার এক স্থান ছিন্ন করিয়া গলায় পরাইয়া দিন।" এই শব্দ শুনিয়া, রামানন্দ বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, কবীর সাহেব ঐ কথা বলিয়াছেন। রামানন্দ তখন কবীরকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার গুরু তুল্য।"

কবীর সাহেব, রামানন্দের শিষ্য হইলেও তিনি রামানন্দের ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডী ছিলেন না। কবীরের বাণীতে তাঁহার সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়; কবীর পরম যোগী ছিলেন। তিনি বরং সকল কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাদিগের নিন্দা করিয়াছেন; যথা—

হিন্দু কহে রাম হমারা, মুসলমান রহমানা,
দোন আপস্‌মে লড়ি মরত হ্যায়, দুব্‌ধা
মে লিপ্‌টানা,
ঘর ঘর মন্ত্র জো দেত ফিরত হ্যায়, মহিমাকে
অভিমানা,
গুরুয়া সহিত শিষ্য সব্‌ বুড়ে, অন্তকাল
পছ্‌তানা॥

অর্থাৎ হিন্দুরা বলে আমাদিগের রাম, মুসলমানেরা বলে, আমাদের রহিম; এই লইয়া দুই দলে আপসে লড়িয়া মরে, কিন্তু উভয়েই সংশয়-জড়িত। যিনি ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়া বেড়ান, এবং আপনাকে মহৎ ভাবিয়া অভিমানে পূর্ণ হন, এমন গুরুর সহিত শিষ্যও সংসারার্ণবে ডুবিয়া থাকেন, এবং অন্তিমকালে তাঁহারা কিছু সম্বল না দেখিয়া খেদ করিয়া থাকেন।

কবীর সাহেবের স্ত্রীর নাম লোই। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্রের নাম কামান ও কন্যার নাম কামানী। কথিত আছে, এই দুইটি সন্তান কবীরের পালিত। যেমন কবীর সাহেব তন্তুবায়ের গৃহে পালিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত জাতি ও জন্মতত্ত্ব কেহ অবগত ছিল না, তদ্রূপ উক্ত দুইটী সন্তানও কাহার ঔরসজাত এই বৃত্তান্ত কেহই জানিত না।

কবীর তাঁতে কাপড় বুনিতেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেন। এক দিন কবীরের গৃহে কয়েকটি অতিথি আসিয়াছে। কবীর তাঁহাদের সম্ভাষণ করিয়া বসিতে দিয়া স্বয়ং একটি নূতন পাগ্‌ড়ি লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে গেলেন। পাগড়ীটির প্রকৃত মূল্য নয় আনা। ক্রেতারা জিজ্ঞাসা করিলে কবীর প্রকৃত মূল্য বলিলেন, কিন্তু কেহই ঐ মূল্যে পাগড়ীটি লইতে চাহিল না। অগত্যা কবীর বিষণ্ণচিত্তে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন আগন্তুকগণের মধ্যে একজন এই ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি সত্যবাদী, আপনার দ্বারা বিক্রয় হইবে না, আমাকে দিন, আমি উহা বেচিয়া আসিতেছি।" আগন্তুক পাগড়ী লইয়া বাজারে গেল, এবং ক্রেতাদিগকে উহার মূল্য এক টাকা বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে টুপিটী তের আনায় বিক্রয় করিয়া আগন্তুক হাসিতে হাসিতে কবীরকে সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিলেন। ইহা দেখিয়া কবীর বলিলেন,—

সাঁচে কোই ন পতিজই ঝুঁঠ জগ্‌ পতিয়ায়,
নৌ আনা কী পাগ্‌ড়ী তেরহ আনা বিকায়॥

অর্থাৎ—কেহ সত্য কথায় বিশ্বাস করে না, জগতের লোক মিথ্যার দাস। এখানে নয় আনার পাগ্‌ড় তের আনায় বিক্রীত হয়।

কবীর সাহেব, মদ্য, মাংস, মৎস্য এবং সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেন। কবীর জোলা অর্থাৎ তাঁতি হইয়া হিন্দু-মুসলমানসকলকে শিষ্য করিতেন বলিয়া, এক দিবস ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাপরবশ হইয়া চাতুরী পূর্ব্বক কাশী সহরের দরিদ্রগণকে কবীরের নাম করিয়া নিমন্ত্রণ করিল। তাহাতে সহস্রাধিক লোক কবীরের বাটীতে আহার করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া কবীর হাসিলেন। তখন তাঁহার এক হাঁড়ী মাত্র অন্ন প্রস্তুত ছিল। কথিত আছে, তিনি সেই এক হাঁড়ি অন্নেই উপস্থিত সহস্রাধিক বুভুক্ষু অতিথিকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন। এইরূপ অনেক ঘটনায় তাঁহার অপূর্ব্ব সিদ্ধির মহিমা প্রকাশিত হইত।

এক দিবস এক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি উপদেশলাভার্থ কবীরের বাটীতে আগমন করিতেছিলেন। তখন কবীর সাহেব স্নান করিবার জন্য গঙ্গায় যাইতেছিলেন; তখন সেই ব্যক্তি কবীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন "মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন, মহাত্মা কবীর সাহেবের বাটী যাইতে হইলে কোন্ দিকে যাইতে হইবে। কবীর আত্মগোপন করিয়া তাঁহাকে নিজ বাটীর যথার্থ পথ দেখাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি কবীরের বাটী পৌঁছিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, প্রভু কবীর সাহেব গৃহে আছেন কি? তাহাতে কবীর সাহেবের স্ত্রী লোই ভিতর হইতে উত্তর করিলেন, আপনি আসন গ্রহণপূর্ব্বক উপবেশন করুন, তিনি স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, অবিলম্বেই ফিরিবেন।

কিছুক্ষণ পরে কবীর সাহেব গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সমাগত ব্যক্তিকে বলিলেন, "আপনার কি প্রয়োজনে এখানে আগমন হইয়াছে?" আগন্তুক উত্তর করিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাস্তা বলিয়া দিলেন, নচেৎ আমাকে অনেক ঘুরিতে হইত। মহাত্মা কবীরের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার অভিপ্রায়।" কবীর দীনভাবে উত্তর করিলেন, "আমারই নাম কবীর জোলা, আপনাকে পথে সে কথা বলি নাই; এক্ষণে আপনি নিজ বাটীর ন্যায় এই দরিদ্রের কুটীরে সুখে পান ভোজন পূর্ব্বক বিরাম করুন।" মধ্যাহ্নে আহারাদির পর, কবীর সাহেব তাঁত বুনিতে আরম্ভ করিলেন, কবীর-গতপ্রাণা পরম ভক্তিমতী লোই সূত্র যোগান দিতে লাগিলেন। এমন সময় কবীর সাহেব হস্তস্থিত টেকুয়া লুকাইয়া রাখিয়া, লোইকে বলিলেন, "টেকুয়াটা খুঁজিয়া দাও।" তখন লোই তন্ন তন্ন করিয়া, খুঁজিতে লাগিল, অবশেষে কবীরের নিকট আসিয়া বলিল, "স্বামিন্! আমি টেকুয়া খুঁজিয়া পাইলাম না।" তখন কবীর বলিলেন, "প্রদীপ জ্বালিয়া খোঁজ।" লোই প্রদীপ জ্বালিয়া খুঁজিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে লোই নিজ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিল। সে সময় দিবা দুই প্রহর। দিবাভাগে লোইএর ঐ প্রকার অবস্থার কারণ এই, ভক্তিতে আত্মচিত্ত হইলে ভক্তের মানসিক অবস্থা এই প্রকারই হইয়া থাকে। কবীর আগন্তুক অতিথিকে বলিলেন, "প্রেমের সমুদ্রে যাঁহারা ডুবিয়াছেন, তাঁহাদের লক্ষণ এই প্রকার হইয়া থাকে।" অবশেষে কবীর নিজ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে টেকোটি মাটীতে ফেলিয়া বলিলেন, "আর খুঁজিও না, পাইয়াছি।"

এক দিবস কবীর সাহেব কাশীতে এক ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ঐ ভক্ত বারাণসী নগরের এক ধনাঢ্য বণিক্। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। কবীর সাহেব তথায় পৌঁছিলে সেই পরম ভক্ত বণিক্ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া কবীর সাহেবকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং করযোড়ে বিনয় বাক্যে বলিলেন, "বহু পুণ্যফলে এ অধীন আজ আপনার দর্শন লাভ করিল; আপনার চরণস্পর্শে আমার গৃহ পবিত্র হইল।" ভক্তবরের এই প্রকার সম্মান দর্শন করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং স্পষ্টাক্ষরে সেই বণিকের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক বলিলেন, "ওহে লালা ধর্ম্মদাস, এতকাল শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি এ প্রকার হইল কেন? তুমি এক অস্পৃশ্য জোলাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করিতেছ!" ধর্ম্মদাস বলিল, "ভগবন্, এই মহাত্মা ভগবানের পরম ভক্ত।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "মহামূর্খ, মহা মূর্খ, ও নীচ জাতি।" তখন কবীর বলিলেন, "বাস্তবিকই আমি নীচ জাতি, এবং মূর্খ, এক্ষণে আপনারা কিছু উপদেশ দিলে এই অধমের জন্ম সফল হয়।" তখন একজন ব্রাহ্মণ কবীরের বিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট

হইয়া ভাগবত খুলিয়া তাহা হইতে তাঁহাকে কৃষ্ণলীলা শুনাইবার ইচ্ছা করিলেন। স্বভাব সুলভ রসপ্রিয়তা হেতু ব্রাহ্মণ রাসলীলা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ভাবিলেন ইহাতে এক কাজে অনেক প্রকার লাভ হইবে; কাব্যের মধুরতা ও তৎসঙ্গে লোকপ্রচলিত ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ, পাণ্ডিত্যখ্যাপন এবং মূর্খের উপর আধিপত্য লাভ হইবে। রাসলীলা শুনিতে শুনিতে কবীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এই রাসলীলার কি প্রকার অর্থ করেন?" তাহাতে, শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ জনৈক পণ্ডিত উত্তর করিলেন "গোপিনী দিগের সহিত নানা রঙ্গ ও রসকেলি করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করাই রাসলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী ছিলেন, গোপিনীদের ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেন। আহা! সেই যমুনা পুলিনে কদম্ব-তরুতলে পুষ্পমাল্যবিভূষিতা সুন্দরী রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া কতই উল্লাসে নৃত্য গীত করিতেন; আহা! তাঁহাদের গান শুনিবার জন্য যমুনা উজান বহিত, কোকিল কলাপ নীরবে পত্রকুঞ্জে লুকাইয়া সেই গীত শ্রবণ করিত। বসন্ত ঋতু ও মলয় পবন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিত না, কেননা অন্যস্থানে মধুর রাসলীলা ও সেই তরুণী বামাগণের সুরস কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতে পাইবে না।"

কবীর বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণ, যে মধুর ভক্তির শিক্ষা গোপিনীগণকে দান করিয়া তাঁহাদের বিষয়বাসনার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, আপনারা সেই মধুর ভক্তির বিপরীত অর্থ ধারণা করিয়াছেন, এবং তজ্জন্যই আপনারা শ্রীকৃষ্ণের দেব-চরিত্রে ভোগবিলাসের কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন। বাস্তবিক ভাগবত শাস্ত্রে তাহা নাই। শুকদেবের রাসলীলা বিষয়ক উক্তি দেখুন, "যে অনঙ্গ (অর্থাৎ মদন) দেবতা-দিগের দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, অথবা করিতে সামর্থ্য রাখিত, সেই অনঙ্গের দর্প চূর্ণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি অনঙ্গের অধীন ছিলেন না।" তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে, "রাসলীলার প্রবৃত্তির প্রবেশাধিকার নাই, সেখানে নিবৃত্তির প্রাধান্য ও ভক্তির তরঙ্গ বহিয়া থাকে।" স্ত্রীলোক, বা স্ত্রীদেহ, কেবলমাত্র রতি-ভাণ্ডার নহে, তাহাতে সাত্ত্বিকতার সুবর্ণ কমল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, পবিত্রতার জাহ্নবীস্রোত বহিয়া যায়। স্বভাব-সরল, কাপট্যবর্জ্জিত, তাপদগ্ধ গৃহীর ছায়াময় সুশীতল আশ্রয়, সংসারে স্নেহ-মমতার আধার রমণী-হৃদয়, সর্ব্ব স্থলে পাপপঙ্ক-বিজড়িত নহে; অনেক বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিকার বেশী, অধিকাংশ পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা মন্দ চরিত্র। যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে দোষারোপ করেন তাঁহারা নিজ নিজ মানসের পাপপ্রতিচ্ছবি কৃষ্ণচরিত্রে আরোপ করেন মাত্র।"

এই কথা বলিয়া কবীর সাহেব মৌনাবলম্বন করিলেন। পণ্ডিতেরা অন্তরে কিছু লজ্জিত হইলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণগণের সহিত কবীরের অনেক ধর্ম্মকথায় আলোচনা হইল। শাস্ত্রলিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা-কারী ব্রাহ্মণগণ প্রতি পদেই কবীরের নিকট অপদস্থ হইলেন। ধর্ম্মদাস বণিক্ সেই দিন হইতে কবীর সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে বিষয়কর্ম্মে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হইয়া কবীর সাহেবের সেবায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ধর্ম্মদাস কবীর সাহেবের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন,

এবং সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কবীর সাহেবের অবর্ত্তমান সময়ে ইনিই তাঁহার গদি পাইয়াছিলেন।

কবীর পূর্ণ যোগী ছিলেন, সে বিষয়ের পরিচয় তাঁহার উপদেশ-বাক্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার উপদেশপূর্ণ গীত এবং দোঁহাবলী বড়ই রমণীয়, শ্রুতি-মধুর, মোহনাশক ও ভক্তিবর্দ্ধক। কবীর সাহেব ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ১২০ একশত কুড়ি বৎসর বয়সে বস্তী জেলার মগহর গ্রামে দেহত্যাগ করেন। তদ্বিষয়ে মহাত্মা দাদূ এবং মহাত্মা নাভা তাঁহাদিগের পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—দাদূর সাহেবের উক্তি—

কাশী ত্যজ্ মগ্‌হর গয়ে কবীর ভরোসে নাম্
সনেহি সাহেব মিলে, দাদূ পুরে কাম্॥

অর্থাৎ কবীর ভগবৎ নামের ভরসায়, কাশী ত্যাগ করিয়া মগহর যাইলেন, স্নেহের সাহেব (অর্থাৎ প্রেমের ভগবান্) প্রাপ্ত হইলেন, হে দাদূ, তাঁহার কার্য্য পূর্ণ হইল।

মহাত্মা নাভার উক্তি—

ভজন ভরোসে, আপ্‌নে, মগ্‌হর ত্যজো শরীর
অবিনাশীকে গোদমে, বিল্‌সে দাস্ কবীর॥

অর্থাৎ—সাধনার ভরসায় তিনি মগ্‌হরে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন, দাস কবীর অবি-নাশী পরমাত্মার ক্রোড়ে বিলাস করিতেছেন।

কবীর সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। কবীরের অনেক হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য ছিল। হিন্দুরা তাঁহার দেহ দাহ করিতে চাহিল এবং মুসলমানেরা তাঁহাকে কবর দিতে ইচ্ছা করিল। এই বিষয় লইয়া উভয় পক্ষে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। পরে যখন মৃত দেহের বস্ত্রাবরণ অপসারিত হইল, তখন রাশীকৃত পুষ্প ভিন্ন সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন হিন্দুরা সেই পুষ্পের অর্দ্ধেক লইয়া দাহ করিল এবং মুসল-মানেরা অপর অর্দ্ধেক লইয়া তাহা প্রোথিত করিল। মগহরে অদ্যাপি কবীরের কবর বিদ্যমান আছে।

কাশীতে কবীর-চৌরা নামক এক আশ্রম আছে। কবীরপন্থীরা এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কবীর-পন্থীগণের মধ্যে অধিকাংশই কবীরের উপদেশের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন বলিয়া বোধ হয় না। কবীর সাহে-বের পর ধর্ম্মদাস হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর অনেক মহান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ সিদ্ধান্ত লিখিয়া, কবীরের উপদেশের তাৎপর্য্য জটিল করিয়াছেন।

কবীরের কয়েকটী সুমধুর উপদেশ সংগৃহীত হইয়া বঙ্গানুবাদ সহ লিখিত হইল।

জাগরী মেরী সুরত সোহাগিন্, জাগরী।
ক্যা তুম্ সোবত মোহনীদ্ মে, উঠকে
ভজনিয়াঁ মে লাগরী॥
চিত্ সে শব্দ, শুনো শ্রবণ দে, উঠত মধুর
ধুন রাগরী।
দো কর জোড় শীস চরণ দে, ভক্তি অচল
বর মাঙ্গরী॥
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো, জগত
পীঠ দে ভাগরী॥

অর্থ—হে ভগবানের পত্নীরূপী আমার সধবা আত্মা, জাগ্রত হও (অর্থাৎ মোহরূপ নিদ্রা ত্যাগ কর)। কেন তুমি মোহনিদ্রায় ঘুমাইতেছ, উঠিয়া ভগবন্নামের ভজন সাধ-নায় রত হও। দেহাভ্যন্তরে সর্ব্বদা অনাহত শব্দরূপ যে ভগবানের ধ্বন্যাত্মক নাম হই-তেছে, তাহা একাগ্রচিত্তে কাণ দিয়া শুন। করপুটে ভগবচ্চরণে অবিচল ভক্তির বর যাচ্ঞা কর। কবীর বলিতেছেন, হে সাধক, শ্রবণ কর, জগৎকে পিছনে রাখিয়া পলায়ন কর অর্থাৎ জগতের আশা-তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হও।

লখেরে কোই বিরলা, পদ নিরবান।
তীন লোক্‌মে ইহ যম্ রাজা, চৌথে
লোক মে, নাম নিশান্।
ইয়াহি লখত ইন্দ্রাদিক থক্ গয়ে, ব্রহ্মা থক্
গয়ে পঢ়ত পুরান্॥
গোরখ, দত্ত, বশিষ্ট, ব্যাসমুনি, শম্ভু থক্
গয়ে ধর ধর ধ্যান।
কহেঁ কবীর লখে কোই বিরলা, সৎগুরু
লগ্ গয়ে জিন্‌কে কান্॥

অতি অল্প লোকেই নির্ব্বাণ-পদ দর্শন করেন, ত্রিলোক * মধ্যে যমের অধিকার; ত্রিলোক অতীত চতুর্থ লোকে নামের সংবাদ পাইবে, অর্থাৎ মায়ামণ্ডল হইতে অতীত চৈতন্য-মণ্ডল চতুর্থ লোকবাচ্য;—তথাকার অনাহত ধ্বন্যাত্মক নাম, যাহা চৈতন্য-কিরণের প্রবাহরূপ চাঞ্চল্য হইতে উত্থিত হইতেছে, তাহাই প্রকৃত নাম। সেই চতুর্থ লোক এবং সত্য নাম অন্বেষণ করিতে ইন্দ্রাদি দেবতারা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মা পুরাণ পড়িতে পড়িতে শ্রান্ত হইয়াছেন, মহাত্মা গোরখ নাথ, দত্তাত্রেয়, বশিষ্ঠ, ব্যাসমুনি এবং মহাদেব ধ্যান করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়াছেন। কবীর বলিতেছেন, সদ্‌গুরু যাঁহার কর্ণে উপদেশ দিয়াছেন, এমন কোন বিরল সাধক তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকেন।

চন্দা ঝল্‌কে ইহ ঘট মাহীঁ
অন্ধী আঁখন্ সুঝে নাহীঁ॥
এহি ঘট্ চন্দা এহি ঘট্ সুর
এহি ঘট্ গাজে অনহদ তূর॥
এহি ঘট্ বাজে তবল্ নিশান্
বহিরা শব্দ শুনে নাই কাণ্॥
জব্ লগ্ মেরী মেরী করে, তব্ লগ্ কাজ ন
সরে॥
জব্ মেরী মমতা মর যায়, তব্ প্রভু কাজ
সঁওয়ারে আয়॥
জবলগ্ সিংহ রহে বন্‌মাহি, তবলগ্ এহ
বন্ ফুলে নাহীঁ॥
উলট্ সিয়ার সিংহকো খায়, উজিড়া বন্‌ফুলে
হরিয়ায়॥
জানকে কারণ্ করম্ কমায়, হোয়
জ্ঞান তব্ করম্ নসায়॥
ফল কারণ্ ফুলে বন্‌রায়, ফল লাগে পর
ফুল শুখায়॥
মৃগাপাশ্ কস্তুরি বাস্, আপ্‌ন খোঁজে,
খোঁজে ঘাস্॥
পাঠে পিণ্ড মীন্ লে খাই, কহেঁ কবীর
লোগ্ বৌরাই॥

অর্থ—এই শরীরে চন্দ্র ঝলমল করিতেছে, কিন্তু অন্ধের চক্ষুর দেখিবার সামর্থ্য নাই। এই শরীরাভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশিত হইতেছে, অনাহত ধ্বনি উঠিতেছে এবং তবলার বাদ্য বাজিতেছে, কিন্তু বধির ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত আমার আমার ভাব থাকে (অর্থাৎ স্বার্থপরার্থ বোধ থাকে) সে পর্য্যন্ত কার্য্য পূর্ণ হয় না, যখন মমতা চলিয়া যায় তখন প্রভু কার্য্য সম্পূর্ণ করেন (অর্থাৎ মিথ্যা মোহান্ধকার নাশপূর্ব্বক ত্রাণ করেন)। মনোরূপী সিংহ শরীররূপ বনমধ্যে যে পর্য্যন্ত বাস করে, সে পর্য্যন্ত উক্ত বনস্থলী পুষ্পিত হয় না, মনের প্রাধান্য কালে বিবেকরূপ শৃগাল কিছুই করিতে পারে না; যখন সেই শৃগাল সদৃশ শক্তিসম্পন্ন বিবেক মনোরূপ সিংহকে আহার করে, তৎকালে উজাড় বনস্থলীরূপ শরীর মধ্যে নানা সদ্‌গুণরূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং শুষ্ক বনস্থলীরূপ শরীর দয়া-ক্ষমারূপ ভূষণে শোভমান হয়। জ্ঞানের জন্য কর্ম্মের সাধনা করিয়া থাকে, জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয়। অরণ্য যেমন ফলের জন্য পুষ্পিত হয়, ফল উৎপন্ন হইলে পুষ্প শুষ্ক হইয়া থাকে, তদ্রূপ

* দেবলোক, অসুরলোক ও নরলোক।

জ্ঞানের জন্য কর্ম্মের সাধনা, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয়। মৃগের নিকট মৃগনাভি আছে, কিন্তু সে মুগ্ধ হইয়া আপন শরীরে ইহা অন্বেষণ না করিয়া বনমধ্যে অন্বেষণ করে। অপর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদত্ত হইল, পরন্তু জলের মৎস্য তাহা ভক্ষণ করিল। কবীর বলিতেছেন, জগতের লোক পাগল জানিবে।

রহনা নহি, দেশ্ বিরানা হ্যায় ॥
ইহ সংসার কাগচ কী পুড়িয়াঁ, বুন্দ্ পড়ে
 ঘুল্ জানা হ্যায় ॥
ইহ সংসার কাঠ্ কী বাড়ী, উলঝ্ পলঝ্
 মর্ জানা হ্যায় ॥
ইহ সংসার কাঠ্ আউর ভুসা, আগ্ লগে
 বর জানা হ্যায় ॥
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো, সৎগুরু
 নাম ঠিকানা হ্যায় ॥

এই জগৎরূপ দেশ, বিদেশতুল্য; এখানে থাকিবে না। এই সংসার কাগজের মোড়কের ন্যায়, ব্যাধিজরারূপ জল পড়িলেই গলিয়া যাইবে। এই সংসার কাষ্ঠের বেড়াযুক্ত শস্যক্ষেত্র, অল্প কারণেই বিশৃঙ্খল হইয়া নাশ প্রাপ্ত হইবে। এই সংসার কাষ্ঠ এবং ভুষি, অগ্নি লাগিলেই জ্বলিয়া যাইবে। কবীর বলিতেছেন, হে সাধক, শ্রবণ কর, সৎগুরুর নাম ধারণ করিলে রক্ষা পাইবে।

যোগিয়াঁ খেলিয়ো বঁচায় কে, নারীনয়ন
 চলে বান্ ॥
শৃঙ্গি কী মিঙ্গি কর ডারী, গোরখ কে
 লিপটান্ ॥
কামদেব মহাদেব সতাওয়ে, কহাঁ কহাঁ করোঁ
 বাখান্ ॥
আসন্ ছোড় মছন্দর ভাগে, জল্ মাঁ মীন্
 সমান্ ॥
কহৈঁ কবীর শুনো ভাই সাধো, গুরু
 চরনন্ লিপ্টান্ ॥

হে যোগি, সাবধান হইয়া খেলা করিও, স্ত্রীলোকের চক্ষুতে তীর চলিয়া থাকে. ইহা ঋষ্যশৃঙ্গকে বৃক্ষবীজের ন্যায় সূক্ষ্ম করিয়াছে, গোরখনাথকে জড়াইয়াছে, কামদেব মহাদেবকে বিরক্ত করিয়াছে, কত কথাই বর্ণন করিব। গোরখনাথের গুরু মছন্দরনাথ ভোগবিলাসের জন্য, সাধনার আসন ত্যাগ করিয়া জলমধ্যস্থ মৎস্যের ন্যায় দৌড়িয়াছিলেন। এক মৃত রাজার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল ভোগ সুখে ভুলিয়াছিলেন। কবীর বলিতেছেন, হে সাধক ভক্তজন, গুরু মহারাজের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর।

পীলে প্যালা হোমতওয়ালা, প্যালানাম,
 অমী রসকারে ॥
বাল্পনা সব্ খেল গঁওয়ায়া, তরুণ ভয়া,
 নারী বশকারে ॥
বিরধ ভয়া, কফ্ বাইনে ঘেরা, খাট্ পড়া
 নহি যায় খিসকারে ॥
নাভকমল বিচ্ হ্যায় কস্তুরী, জ্যায়সে
 মিরগ্ ফিরে বন্‌কারে ॥
বিন্ সৎগুরু ইত্‌না দুখ্ পায়া, বৈদ্ মিলে
 নহি, ইস্ তন্ কারে ॥
মাত পিতা বন্ধু সুত তিরিয়া, সঙ্গ্ নহি
 কোই, যায় সকেরে ॥
জব্ লগ্ জীওয়ে গুরু গুণ্ গা লে, ধন্
 যৌবন হ্যায়, দিন্ দশ্ কারে ॥
চৌরাসী জো উব্‌রা চাহে, ছোড় কামিনী
 কা চস্‌কারে ॥
কহেঁ কবীর শুনো ভাই সাধো, নখ্ শিখ্ পুর
 রহা, বীব কারে ॥

নামরূপ অমৃতপরিপূর্ণ পাত্র পান করিয়া নেশায় মাতিয়া থাক। বাল্যকাল খেলায় অতিবাহিত করিয়াছ, যৌবন আগমনে নারীর বশীভূত হইয়াছ। বৃদ্ধাবস্থা আসিয়াছে, কফ ও বায়ু আক্রমণ করিয়াছে, খাটের উপর পড়িয়া আছ, কিছুমাত্র নড়িতে

পারিতেছ না। নাভিকমলের মধ্যে কস্তুরী আছে, পরন্তু তাহা না জানিয়া, যেমন মৃগ বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তুমি সুখ-সমুদ্ররূপ নিজ আত্মাকে না জানিয়া বিষয়-সুখ লাভের জন্য সংসাররূপ অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। সৎগুরু ব্যতিরেকে এত দুঃখ পাইতে হইয়াছে। কেহ এই শরীরতত্ত্বজ্ঞ বৈদ্য পাইতেছে না। মাতা, পিতা, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, কেহই সঙ্গে যাইবে না। যে পর্য্যন্ত জীবন আছে, সৎগুরুর গুণ কীর্ত্তন কর, ধন এবং যৌবন দশ দিনের জন্য থাকে, যদি চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কামিনী-বিলাসদর্শন ত্যাগ কর। কবীর বলিতেছেন, হে সাধক ভক্ত, শ্রবণ কর, কামিনীর পদনখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিষে পূর্ণ।

করোরে মন্ ওয়া দিন্ কী তদ্‌বীর ॥
জব্ যমরাজা আন্ অড়েঙ্গে, নেক্ ধরত
নহি ধীর ॥
মার মার সোঁটন প্রাণ নিকাসত, নয়ন
ভর আয়ও নীর ॥
ভবসাগর ইক্ অগম পন্থ হ্যায়, নদীয়া
বহত গম্ভীর ॥
নাও ন বেড়া লোগ ঘনেরা, খেবট হ্যায়
ওহ পীর ॥
ঘর তিরিয়া অর্দ্ধাঙ্গ বৈঠি, মাত পিতা
সুত ধীর ॥
মায়া মুলক্ কৌন চলাওয়ে, সঙ্গ ন জাত
শরীর ॥
কহত কবীর শুনো ভাই সাধো, মাফ্ করো
তক্‌সীর।

হে মন, সেই দিনের জন্য যত্ন কর, যে দিন যমরাজ আসিয়া কঠোর ভাবে দাঁড়াইবে, কিছুমাত্র বিলম্ব করিবে না, বারংবার যষ্টি দ্বারা প্রহার করিয়া তোমার প্রাণ বাহির করিবে, তখন তোমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইবে। ভবসাগর পার হইবার এক দুর্গম পথ আছে, সেই পথমধ্যে এক সুগভীর নদী আছে, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ নৌকা কিছুই নাই, পারে যাইবার লোক অসংখ্য রহিয়াছে, কর্ণধার একমাত্র সেই সৎগুরু আছেন। গৃহের স্ত্রী শরীরের অর্দ্ধাংশস্বরূপ বসিয়া আছেন, এবং মাতাপিতা ও পুত্র আছেন, একথা যথার্থ বটে, পরন্তু ক্ষণভঙ্গুর মায়ার রাজ্যকে, কোন্ ব্যক্তি বজায় রাখিতে পারে? অধিক কি নিজ শরীরই সঙ্গে যায় না। কবীর বলিতেছেন, হে ভাই ভক্ত এবং সাধক, শ্রবণ কর, যদি কোন অন্যায় বলিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

আগে সমুঝ পড়ে গা ভাই ॥
ইহাঁ আহার উদর ভর খায়ও, বহু বিধি
মাস্ বঢ়াই ॥
জীব জন্তু বস, মার খাত হো, তনিক্
দরদ নহি আই ॥
ইহাঁ তো পরধন, লুট খাত হো, গল্ বিচ্
ফাঁস্ লগাই ॥
তিন্‌কে পিছে তীন পিয়াদা, ছিন্ ছিন্
খ্যবর লগাই ॥
সাধ সন্ত কী, নিন্দা, কীন্হী, আপন্ জনম্,
নসাই ॥
পয়ের পয়ের পর, কাঁটা ধসি হ্যায়, এহ ফল
আগে আই ॥
কহত কবীর, শুনো ভাই সাধো, দুনিয়া
হ্যায়, ঝুঠি ভাই ॥
সাঁচ কহে তো, মারা খাওয়ে, ঝুঠে জগ্
পতিয়াই ॥

হে ভাই, পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবে, এখানে উদর ভরিয়া খাদ্য ভোজন করিয়াছ, এবং তদ্দ্বারা উত্তমরূপে দেহের মাংস বাড়াইয়াছ। জীবজন্তু মারিয়া

সুস্বাদু খাদ্য খাইতেছ, জীবহত্যা করিতে কিছুমাত্র তোমার হৃদয়ে বাধা লাগে না। এখানে, গলায় ফাঁসি লাগাইয়া পরধন লুটিয়া খাইতেছ। তোমার পিছনে তিন জন পিয়াদা (যম, চিত্রগুপ্ত ও শ্বাসপ্রশ্বাস)। সদাসর্ব্বদা সকল কর্ম্মের খবর রাখিতেছে। সাধু সন্ত, ভক্ত জনের নিন্দা করিয়া আপনার জীবনকাল হারাইলে, পাপকর্ম্ম রূপ কণ্টক প্রতি পদ বিক্ষেপে ফুটিয়া যাইতেছে। ইহার ফল পশ্চাৎ প্রাপ্ত হইবে। কবীর বলিতেছেন, হে ভাই সাধু, শ্রবণ কর, জগতের মধ্যে সকলেই সংশয়ে ডুবিয়া আছে, এখানে সত্য কথা বলিলে লোকে মার খাইয়া থাকে, এবং মিথ্যা কথায় জগৎ বিশ্বাস করে।

হমারে মন, কব্ ভজি হো গুরুনাম ॥
বালপন্ জন্‌মত হি খোয়ও যোয়ানি মে.
ব্যাপা কাম্।
বুঢ় ভয়ে, তন্ থাকন্ লাগে, লট্ কন লাগে
চাম্ ॥
কা'নন্ বহির, নয়ন নহিঁ সুঝে. ভয়ে দাঁত
বে কাম্ ॥
ঘর কী তিরিয়া, বিমুখ হোয় বৈঠী, পুত্র কিয়ো
কল্ কাম্ ॥
খাটিয়া সে, ভুইয়াঁ কর দীনুহো, জম্ কা
গড়া নিশান্ ॥
বহত কবীর, শুনো ভাই সাধো. ছুব্ ধামে,
নিক্‌সত তব প্রাণ ॥

হে আমার মন, কোন্ কালে গুরুর নাম ভজনা করিবে? জন্ম লাভ করিয়া বাল্যকাল (খেলাধুলাতে) নষ্ট করিলে, যৌবন অবস্থায় মানসে কামরিপুর আবির্ভাব হইল। বৃদ্ধ হইলে শরীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্লান্ত হইতে থাকে এবং গাত্রের চর্ম্ম ঝুলিতে আরম্ভ হয়, কর্ণযুগল বধির হয়, নয়নে দেখিবার সামর্থ্য থাকে না, দন্তসকল চর্ব্বণ করিবার ক্ষমতা ত্যাগ করে, স্ত্রী তখন মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকে, পুত্র কোলাহল করিয়া উঠে এবং খাট হইতে ভূমিতে নামাইয়া দেয়। তারপর যম প্রভুত্ব-রূপ জয়পতাকা পুঁতিয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যু হয়। কবীর বলিতেছেন, হে ভাই সাধক, শ্রবণ কর, দুই বস্তু (অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণা ও ভগবান্ এই দুইটীর, কোন্‌টি ত্যাগ ও কোন্‌টি গ্রহণ করিব এই প্রকার সংশয়) লইয়া তোমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে।

অপনে ঘট, দিয়া না, বারবে ॥
নাম্ কা তেল, সুরত কী বাতী, ব্রহ্ম অগিন্
উদ্‌গার রে ॥
ঝুঠা জান, জগত কা নাতা, বারম্বার,
বিচার রে ॥
কহঁ কবীর, শুন ভাই সাধো, সৎগুরু নাম,
সুধার'রে ॥

আপনার শরীরের অভ্যন্তরে প্রদীপ প্রজ্বলিত কর। ভগবৎ নামের তৈল এবং আত্মার প্রদীপ ও ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নির উদ্গীরণ কর, জগতের সম্বন্ধ মিথ্যা জানিয়া বারংবার বিচার কর। কবীর বলিতেছেন, হে ভাই সাধক, শ্রবণ কর, সৎ গুরু নামের সংকীর্ত্তন কর অর্থাৎ বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত নাম উচ্চারণ কর।

ভক্তি কা মারগ ঝীনা রে ॥
নহি অচাহ নহি চাহ না, চরণন্ লৌলীনারে
সাধন্ কে সত্ত সঙ্গমে রহে, নিসদিন্
ভীনা'র ॥
শব্দ শ্রুত ম্যায়সে বসে, জ্যায়সে জল মীনারে
ম ন্মণিকো, এঁও ত্যজে, জায়সে তেলী
পীনারে ॥
দয়া, ছিমা, সন্তোষ, গহে রহে অতি
আধীনারে ॥
পরমারথ্ মে, দেত শির, কুছ্ বিলম্ব না
কীনারে ॥
কহেঁ কবীর, মৎ ভক্তি কা, পরঘট্ কহ
দীনারে ॥

ভক্তির পথ অতি সূক্ষ্ম জানিবে। তোমার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা এই উভয়ের একটিও থাকিবে না, ইষ্টদেব শ্রীগুরুর চরণে মগ্ন থাকিবে, সচ্চরিত্র সাধুদিগের সৎসঙ্গে দিবা-রাত্র ভিজিয়া থাকিবে। আত্মা এবং অনাহত শব্দরূপ যথার্থ ভগবৎ নাম, একত্র এরূপ মিলিত হয়, যেরূপ জল এবং মৎস্য একত্র থাকে (জল ব্যতিরেকে যেমন মৎস্য বাঁচিতে পারে না)। তৈলিক যেমন খলিকে পরি-ত্যাগ করে, সেইরূপে মানরূপ মাণিককে পরিত্যাগ কর; দয়া, ক্ষমা এবং সন্তোষাদি গুণকে ধারণ কর, ও সর্ব্বদা দীনতা অবলম্বন কর; পরমার্থে মস্তক দান করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিও না। কবীর বলিতেছেন, ভক্তির মত প্রকাশ করিয়া বলিলাম।

কোই প্রেম কী পিঙ্গ ঝুলাও রে।
ভুজকে খম্ভ আউর প্রেমকে রসসে, মন্
মহবুব্ ঝুলাওয়ে॥
সুহা চোলা, পহির অমোলা, পিয়া ঘট্
পিয়াকো রিঝাওরে॥
নয়নুন বাদর কী, ঝর লাও, শ্যাম ঘটা
উর ছাওরে॥
আবত, আবত, রুত কী, রাহ পর, ফিকর,
পিয়াকো শুনায়োরে॥
কহত কবীর, শুনো ভাই সাধো, পিয়াকী
ধ্যান, চিত লাওরে।

প্রেমের দোলনা ঝুলাও। মন-সুহৃৎকে বাহুযুগলের খম্ভা, এবং প্রেমের রশির দ্বারা ঝুলাও, শরীরে সুন্দর চোলা (গলা হইতে পা পর্য্যন্ত জামা) রূপ অমূল্য বস্ত্র পরিধান কর, প্রিয় ভগবানদত্ত শরীরে সেই প্রিয় ভগবানকে সন্তুষ্ট কর। ভগবৎ বিরহ রূপ শোকে নয়নযুগলের অশ্রুধারা রূপ বাদল উপস্থিত কর, সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ মেঘতুল্য আবরণ রহিয়াছে, চৈতন্ত-কিরণরূপ সুষুম্নার পথে আসিতে আসিতে, নিজ প্রয়োজন প্রিয় ভগবানকে শুনাইতে থাকিও। কবীর বলিতেছেন, হে সাধক, শ্রবণ কর, মানসে প্রিয় ইষ্টদেবের ধ্যান করিতে আরম্ভ কর।

মহরম্ হোয় সো জানেরে সাধো,
ঐসা দেশ হমারা॥
বেদ কতেব্ পার নহি পাবত, কহন্
শুনন্ সে ন্যারা,
জাতি বরণ কুল, কিরিয়া নাহী, সন্ধ্যা
নেম্ আচারা॥
বিন্ জল বুন্দ, পরত জহাঁ ভারী, নহি
মীঠা নহি খারা,
শূন্য মহল্ মে, নৌবত্ বাজে, কিঙ্গরী,
বীন্ সিতারা॥
বিন্ বাদল্ জহঁ, বিজলি চমকে, বিন্
সুরজ উজিয়ারা,
বিনা নয়ন জহঁ, মোতী পোহায়, বিন্
সুর শব্দ উচারা॥
জো চল্ জায় ব্রহ্ম জহঁ দরসে, আগে
অগম অপারা,
কহেঁ কবীর উহাঁ র‍্যহন হমারী; বুঝে
গুরুমুখ প্যারা॥

আমার দেশ কি প্রকার, যিনি তাহার ভেদ অবগত আছেন, তিনিই সব জানিতে পারেন। বেদ এবং কোরাণ তাহার অন্ত পায় নাই, তাহা কথন ও শ্রবণ বিষয় হইতে স্বতন্ত্র; তথায় জাতি, বর্ণ, এবং কৌলীন্য প্রথা নাই, তথায় সন্ধ্যা, নিয়মাচার নাই। তথায় বিনা বৃষ্টিতে জল বিন্দু (ব্রহ্মরন্ধ্রের অমৃত) বর্ষণ হইয়া থাকে, তাহা মিষ্ট কিংবা লবণাক্ত নহে। সেখানে শূন্য পুরীতে নহবত এবং কিঙ্গরী, বীণা ও সেতার বাজি-তেছে। তথায় বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চম্-কাইয়া থাকে, সূর্য্যের প্রকাশ ব্যতীত তথায় আলোক আছে। চক্ষু বিনা তথায় মতির মালা গাঁথা হইয়া থাকে এবং সুর বিনা শব্দ

উচ্চারিত হয়। যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হয়, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম কোথায় আছেন দেখিতে পায়, তাহার উপরের তত্ত্ব অগম্য ও অপার। কবীর বলিতেছেন, উক্ত স্থলে আমার নিবাস, সৎগুরুর প্রিয় ভক্ত তাহা অবগত আছেন।

না জানে সাহেব ক্যায়সা হ্যায় ॥
মুল্লা হোকর বাংগ্ জো দেওয়ে, ক্যা
তেরে সাহেব বহিরা হ্যায়.
কীড়ী কে পগ্ নেওয়র বাজে, সোতি
সাহেব শুন্‌তা হ্যায় ॥
মালা ফেরী তিলক লগায়া, লম্বী জটা
বঢ়তা হ্যায়
অন্তর তেরে কুফর কটারী, এঁও নহি
সাহব মিল্‌তা হ্যায় ॥
কৌড়ী, কৌড়ী, মায়া জোড়ী, জোড়
জমী পর ধর্‌তা হ্যায়
চল্‌নে কী, জব্ হুই তৈয়ারী, হাথ
পসারে জাতা হ্যায় ॥
হীরা গোওয়ে, পরখ্ দিখাওয়ে, কৌড়ী
পরখন্ ক্যায়সা হ্যায়
কহত কবীর, শুনো ভাই সাধো, হর
ভ্যায়সা কো ভ্যায়সা হ্যায় ॥

ঈশ্বর কিরূপ, সাধারণ লোকে তাহা জ্ঞাত নহে। মুল্লা হইয়া তুমি যে উচ্চৈঃস্বরে বাঙ্ দিতেছ (কানে অঙ্গুলি দিয়া আল্লা আকবর বলিয়া চীৎকার করিতেছ), কেন, তোমার ঈশ্বর কি বধির? পিপীলিকার পদে যদি ঘুমুর বাদিত হয়, তাহাও ঈশ্বর শুনিতে পান। মনের ভিতর পাপরূপ কাটারী থাকিতে মালা ফিরাইয়া, তিলক লাগাইয়া, লম্বা জটা বাড়াইয়া, ঈশ্বরের দর্শন পাইবে না। এক এক কড়ি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছ এবং সংগ্রহ করিয়া মাটীর উপর রাখিতেছ, কিন্তু (ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া) যাইবার সময় উপস্থিত হইলে, রিক্ত হস্তে যাইতে হইবে। হীরার যাচাই করিতে হয়, কড়ির যাচাই করা কি প্রকার কথা? (অর্থাৎ তুমি পরমার্থরূপ হীরার আদর না করিয়া ক্ষণভঙ্গুর কড়ির তুল্য জাগতিক পদার্থের আদর ও অসত্যে সত্য নির্দ্ধারণ করিতেছ)। কবীর সাহেব বলিতেছেন, হে ভাই সাধক, শ্রবণ কর, যে যেমন ব্যক্তি, তাহার নিকট ঈশ্বর সেইরূপ।

সমঝ্ নর মূঢ় বিগারী রে ॥
আয়া লাহা কার'লে, তাঁয় কেঁও পুঞ্জী
হারীয়ে ॥
গর্ভবাস বিন্‌তী করি, সো তাঁয় আন্
বিসারী রে ॥
মায়া দেখ্ তু ভুলিয়া, আউর সুন্দর
নারী রে ॥
বড়ে শাহ. আগে গয়ে, ওছা ব্যেওপারী রে ॥
লৌঙ্গ সুপারী ছাঁড় কে, কেঁও লাদী
খারী রে ॥
তীরথ্ বরত্ মে ভট্‌কতা, নহি তত্ত্ব
বিচারী রে ॥
আন্ দেব্‌কো পুজ্‌তা, তেরী হোগী
খোয়ারী রে ॥
ক্যা লে আয়া, ক্যা লে চলা করুকে পল্লা
ভারী রে ॥
কহেঁ কবীর জগ্ এঁও চলা, জ্যায়সে
হারা জোয়ারী রে ॥

হে অজ্ঞান মনুষ্য, বুঝিয়া দেখ, তুমি তোমার কিরূপ ক্ষতি করিতেছ। তুমি ব্যবসায় করিতে আসিয়া, কিহেতু মূলধন নষ্ট করিলে? যখন মাতৃগর্ভে ছিলে, তখন কতই মিনতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলে, তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহা তুমি বিস্মৃত হইলে. অর্থ এবং সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া তুমি ভুলিয়াছ। বড় শেঠ আগে গিয়াছেন, সামান্য দোকানদারত তুচ্ছ কথা; লবঙ্গ এবং সুপারী পরিত্যাগ করিয়া কিহেতু তুমি

বিষ্ঠা বোঝাই করিয়াছ। তীর্থ ও ব্রতের ভ্রমান্ধকারে ঘুরিতেছ, আত্মতত্ত্ব কিছুই বিচার করিলে না। একমাত্র সৎস্বরূপ ভগবান্‌কে ছাড়িয়া, অন্য দেবতার আরাধনা করিতেছ, তোমার কষ্টের অবধি থাকিবে না। কি লইয়া আসিয়াছ, কি লইয়া দাঁড়ি পাল্লা ভারি করিয়া চলিলে? কবীর বলিতেছেন, যেমন জুয়ারী সমস্ত পুঁজি হারিয়া গমন করে, জগৎও সেইরূপ চলিতেছে।

মানত নহি মন্ মোরারে সাধো,
মানত নহি মন্ মোরা রে ॥
বার বার ম্যয় মন সমঝাউঁ, জগ্‌মে
জীবন থোড়ারে ॥
ইয়া দেহি কা, গর্ব্ব ন কীজে,
ক্যা সাঁওর, ক্যা গোরা রে ॥
বিনা ভক্তি তন্, কাম ন আওয়ে,
কোটি সুগন্ধ চভোরা রে ॥
ইয়া মায়া কা, গর্ব্ব ন কীজে,
ক্যা হাথী, ক্যা ঘোড়া রে ॥
জোড় জোড় ধন্ বহুত বিগোচ,
লাখন্ কোটি করোড়া রে ॥
দুবধা দুর্ মত্, আউর চতুরাই,
জনম গয়ো নর্ বৌরা রে ॥
অজহুঁ আন্ মিলো সৎ সঙ্গত,
সৎ গুরু মান নিহারো রে ॥
লেত উঠায় পড়ত ভুঁই গির্ গির্,
জেঁও বালক বিন্ কোরা রে ॥
কহেঁ কবীর, চরণ চিত্ রাখো,
জেঁও সুই মেঁ ডোরা রে ॥

হে সাধক ভক্ত (শ্রবণ কর, আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না, আমি বারংবার আমার মনকে বুঝাইতেছি যে, জগতে জীবিতকাল অতি অল্প। এই শরীরের গর্ব্ব করিও না, শ্যামবর্ণ হউক অথবা গৌরবর্ণ হউক, ভক্তি বিনা এই শরীর কোন কাজে লাগিবে না, এবং কোটি সুগন্ধ জলযুক্ত ফোয়ারায়ও কোন কাজ হইবে না। এই মায়ার (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের) ও হাতী ঘোড়ার গর্ব্ব করিও না। অনেকে সঞ্চয় দ্বারা কোটি কোটি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে ফল কি? সংশয়, দুর্ম্মতি ও চাতুর্য্য করিতে করিতে হে পাগল মনুষ্য, তোমার জন্ম বয়িত হইল। এখনও আসিয়া সৎসঙ্গে মিলিত হও, সৎগুরুর সম্মুখে থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। যেমন বালক রুটির টুক্‌রা বার বার ফেলিয়া দেয় ও উঠাইয়া লয়, তদ্রূপ সাধনা বিস্মৃত হইলেও পুনশ্চ আরম্ভ করিবে, কবীর বলিতেছেন, হে ভাই সাধক, সৎগুরুর চরণে এমন ভাবে মতি রাখ, যেরূপ ভাবে সূচিকা মধ্যে সূত্র থাকে।

এই সকল দোঁহা ব্যতীত কবীর সাহেবের বিস্তর গজল আছে। সেই সকল গজল তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। কথিত আছে, ইনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ১৩৮০ হইতে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইনি বলিতেন, বিষ্ণু ও আল্লা, রাম ও রহিম, একই; ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দমাত্র। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত উ বিশ্বাসী সম্প্রদায় কবীরপন্থী নামে অভিহিত।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৩৮

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা ঘটিবার পর দুইটি বৎসর পৃথিবীর সুখ দুঃখের অসংখ্য কাহিনী সংগ্রহ করিয়া অতীতের অন্ধকার-অন্তরালে লুকাইয়াছিল। এই দীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে গদাধরের ঘটনাবিচিত্র জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববিবৃত ঘটনাগুলির তুলনায় কোনও ক্রমে কম বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচিত্র ঘটনাও ভালরূপে বিবৃত করিতে না পারিলে তাহা কাহারও প্রীতিকর হইবে না বুঝিয়া, এবং চিত্রবর্ণনায় আপনার অসামর্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমি এই দীর্ঘকালের কোন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলাম না।

এই দুই বৎসর পরে, একদিন সকাল বেলা, গৃহমধ্যে বসিয়া, আপনার ছয় মাসের শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া, গদাধর পত্নী মানদার সহিত কথোপকথন করিতেছিল।

পুত্রটি দেখিতে গদাধরের মত হয় নাই; মানদার মত সুন্দর হইয়াছিল। ছেলেকে যে কিরূপ ভালবাসিতে হয়, তাহা গদাধর বাল্যকালে আপন পিতামাতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। তাহাকে কোলে ধারণ করিয়া, গদাধর সতৃষ্ণনয়নে তাহার সুগোল মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার লালাসরস প্রবাল অধর অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া, তাহাতে সুধাহাসির স্বর্গীয় লীলা নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার কোমল পদ্মদল বিগঠিত চিবুক ধরিয়া, তাহাতে আপনার বুক ঢালা আদর ঢালিয়া দিতেছিল।

মাতৃস্নেহের মহিমাকে খর্ব্ব করিয়া আমরা আমাদের লেখনী কলুষিত করিব না,—আমরা সত্য কথা বলিব—মা দাও আপন আত্মজকে ভালবাসিত। সে তাহার পিতাকে বলিয়া খোকার দুধ খাইবার জন্য সুবর্ণের পাত্রসকল প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল।

মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া মানদা খোকার জন্য মুকুতার মালা লইয়াছিল। গদাধরকে বলিয়া উৎকৃষ্ট মখমলের পোষাক প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিল। সত্যই মানদা খোকাকে ভালবাসিত। সে হাসিলে, সে তাহার হসিত মুখ চুম্বন করিত। ঘুমাইলে তাহার নরম হাত দুটি নাড়িয়া দিত। পোষাক পরিলে তাহাকে কোলে লইয়া বসিত। কিন্তু,—কিন্তু, কিন্তুর কথা কাহারও শুনিয়া কাজ নাই।

পুত্রকে আদর করিতে করিতে গদাধর পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া কহিল,—"দুধ লইয়া আইস; খোকার ক্ষুধা পাইয়াছে।"

পরিচারিকা বলিল,—"দুধ এখনও জ্বাল দেওয়া হয় নাই।"

গদাধর। বামুন ঠাকুরকে বল যে, সে এখনই দুধ গরম করিয়া লইয়া আসে।

মানদা। বামুনঠাকুরকে আমি বিদায় করিয়া দিয়াছি।

গদাধর। কেন?

মানদা। বড় বদলোক, এঁটো কাঁটা কিছুই মানিত না। রান্নাঘরের বারান্দায় একটা জলের জালা ছিল, জান? সেটা সদ্য এঁটো; সেই জালায় বামুনঠাকুরের কাপড় লাগিয়াছিল। দুলী তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই কাপড় লইয়া বামুনঠাকুর রান্নাঘরে ঢুকিয়াছিল। ওমা! ওমা! আর

জন্য আর কিছুই রহিল না। মুলী আসিয়া জাগিয়াস্ আমাকে বলিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া গেল। আমি সরকারকে ডাকিয়া, মাহিনা-পত্র হিসাব করিয়া দিয়া, তাহাকে বিদায় দিয়াছি। দরওয়ানকে একটা নূতন বামুন ডাকিয়া আনিবার জন্য বলিয়াছি।

গদাধর। নূতন বামুন আসিতে বিলম্ব ঘটিবে। চল, মানদা, আজ তোমাতে আমাতে মিলিয়া রাঁধি।

মানদা। রান্নাঘরে যাইলে, ধোঁয়া লাগিয়া যে আমার চোখ জ্বালা করে।

গদাধর। তুমি না হয়, বারান্দায় বসিয়া তরকারী কাটিয়া দিবে; আমি ঘরের ভিতর বসিয়া রাঁধিব।

মানদা। ওমা! পুরুষ মানুষে নাকি আবার রাঁধে!

গদাধর। কেন রাঁধিবে না?—তোমার যে বামুনঠাকুর ছিল, সেও ত পুরুষ মানুষ। সে যাহা পারে, আমি তাহা পারিব না কেন? চল আমরা রাঁধিতে যাই।

মানদা। আমি কিন্তু তোমার তরকারি কাটিতে পারিব না। তরকারি কাটিলে আঙ্গুলে বড় বিশ্রী দাগ হয়।

গদাধর হাসিল; কহিল, 'চল, আমিই তরকারি কাটিয়া লইব। তুমি বারান্দায় খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া আমার সহিত গল্প করিও।' মানদা অগত্যা নিম্নতলে নামিয়া, রান্নাবাড়িতে গদাধরের অনুসরণ করিল। সেখানে এক পরিচারিকা চুল্লী প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং দুগ্ধপূর্ণ কটাহ লইয়া, তাহার উপর সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। মুলী পরিচারিকাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র জলাধার হইতে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিয়া দুগ্ধের উপর সিঞ্চিত করিল। মুলীকে এবংবিধ কার্য্য করিতে অবলোকন করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিল,—"দুধে জল ছিটাইবার কারণ কি?"

মুলী বলিল,—"গঙ্গাজল।"

পরিচারিকা বলিল,—এখানে কেহ ছিল না। বামুনঠাকুর চলিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিবার জন্য আমরা সকলে খিড়্‌কিতে গিয়াছিলাম। দরজা খোলা পাইয়া কোথাকার একটা কুকুর আসিয়া, দুধের কড়াতে মুখ দিয়াছিল। মুলী দিদি তাই গঙ্গাজল দিয়া দুধটা শুদ্ধ করিয়া লইতেছে।"

মুলী বলিল,—"না তা' নয়। দুধ ত আর দেবতা বামুনের জন্য নহে যে, উহাতে কুকুরে মুখ দিলে অশুদ্ধ হইবে। ছেলে পিলে কুকুরে মুখ-দেওয়া দুধ খেলে আর কি দোষ আছে। আমি তাহার জন্য গঙ্গাজল দিই নাই। বামুনঠাকুরটি যে মজাইয়া গিয়াছে; সে এঁটো কাপড় পরিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সৃষ্টি ছুঁইয়া গিয়াছে। জেনে শুনে কি ক'রে সকলকে শতেক জাতের এঁটো খাওয়াইব? তাই গঙ্গা-জল দিলাম।"

গদাধর অবাক্ হইয়া, মুলীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, "হায় ভগবান্! আমাদের এই সোনার দেশটাকে এঁটোর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দাও।"

সত্য, তোমরা ত সমাজসংস্কার করিতে বসিয়াছ, আপনার দেশের জন্য জীবন সমর্পণ করিতে বসিয়াছ। দেশকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া, তাহার পূজা করিতেছ। স্বদেশবাসীকে ভ্রাতার ন্যায় কোলে তুলিয়া লইতেছ। তোমাদের পবিত্র দেশ যে এঁটো হইয়া রহিয়াছে; তাহার কি তোমরা কিছু প্রতিকার করিবে না? বীর তোমরা, সাহসী তোমরা! তোমরা ব্রতী হইলে, এঁটোর হাত হইতে, তোমরা তোমাদের স্বদেশকে উদ্ধার করিতে পারিবে। তোমরা

সহধর্ম্মিণীগণ, তোমরাও এই ধর্ম্মকার্য্যে সহায় হইও। তোমাদের সহায়তা প্রাপ্ত না হইলে, উঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া গদাধর পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"দুধটা ফেলিয়া দাও; কুকুরের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ কেহ পান করিবে না। দরোয়ানকে বাজার হইতে শীঘ্র দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য বল।"

কিন্তু দ্বারবান্ একটি নূতন বামুনঠাকুরের অন্বেষণে চলিয়া গিয়াছিল। পরিচারিকা তাহাকে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আসিয়া সংবাদ দিল যে, সে দ্বারবান্‌কে খুঁজিয়া পাইল না। গদাধর তখন অন্য ব্যক্তিকে দুগ্ধ সংগ্রহ জন্য প্রেরণ করিল। সে দ্রুতপদে দুগ্ধ আনয়ন করিবার জন্য চলিয়া গেল।

তখন বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছিল। তখনও গদাধর রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিরূপে হইবে? সব এঁটো।—মানদার আদেশানুযায়ী সব ধৌত করিতে অনেক বিলম্ব ঘটিল। তরকারি কাটিবার জন্য গদাধর বঁটী গ্রহণ করিতে যাইলে, মানদা চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, 'এঁটো, এঁটো, ছুঁইও না।" পরিচারিকা বঁটী ধৌত করিয়া আনিলে মানদা বলিয়াছিল,—"না, না, এখনও ঠিক হয় নাই; ঐ ছিদ্র মধ্যে ঐ, ঐ, ঐ এঁটো রহিয়াছে। বঁটী ধৌত হইলে গদাধর তরকারির ঝুড়িতে হস্তার্পণ করিতে যাইলে, মানদা বলিল, "দাঁড়াও, বামুনঠাকুর বোধ হয় ঐ ঝুড়িতে হাত দিয়াছিল, তরকারি এবং ঝুড়ি ধৌত করিয়া লইতে হইবে।" এইরূপে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত গদাধর রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

খোকা একণে মাতৃক্রোড়ে স্থান-লাভ করিতে না পারিয়া এবং এ বেলা দুগ্ধপান করিতে না পাইয়া কিছু অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গদাধর ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া আদর করিল। কিন্তু অশান্ত ছেলে মানদার কোলে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। মানদা ক্রন্দনমান পুত্রকে কখনও ক্রোড়ে লইত না। সে যে পুত্রকে ভালবাসিত না, এমন নহে। কিন্তু তোমরাত জান, সে সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে বেশী ভালবাসিত। প্রীতিকর, সহাস্যবদন পুত্রকে কোলে লইয়া সে বিলক্ষণ প্রীতি লাভ করিত। কিন্তু এ কাঁদুনে ছেলেকে সে কিরূপে কোলে লইবে? তথাপি গদাধরের অনুরোধ ক্রমে সে খোকাকে একবার ক্রোড়ে লইল। গদাধর আবার রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। হতভাগ্য ছেলের আবার কি হইল, আবার সে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। মানদা সকাল বেলা হইতে অনেক সহ্য করিয়াছিল। আর কত সহিবে? আর সেরূপ অশান্ত ছেলেকে একটু শাসন করাও দরকার। সে পুত্রকে কোল হইতে বারান্দায় নামাইয়া দিল, তাহার পৃষ্ঠে গুরু চপেটাঘাত করিল।

এখন, গদাধর যে হাতটিকে কুসুমদলবিগঠিত বলিয়া অনুমান করিত, বাস্তবিক তাহা কুসুমবর্ষণের ন্যায় খোকার পৃষ্ঠদেশে পতিত হয় নাই। ছয় মাসের শিশু আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়া করুণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিয়া, স্নেহপূর্ণ গদাধর অধীর হইয়া পড়িল। এরূপ অবস্থায় সে যদি মানদার প্রতি কোন রূঢ় কথা প্রয়োগ করিত, তবে কি তোমরা তাহার নিন্দা করিতে? কিন্তু যে কর্কশ বাক্য তাহার কণ্ঠমধ্যে আসিয়াছিল, তাহা সে কণ্ঠমধ্যেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল; ব্যবহার করে নাই।

যে অমানুষিক মানসিক বলে সে চারুশশীর প্রদীপ্ত প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অধিকার বজ্রের ন্যায় অশ্রুবিন্দু বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, আজ তাহা অপেক্ষা অধিক বলপ্রয়োগের আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু সে বল গদাধর প্রয়োগ করিয়াছিল। সন্তানের বেদনায় ব্যথিত হৃৎপিণ্ড তাহার নয়নকোণে রক্তধারার ন্যায় যে অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল, গদাধর অমিত বলে তাহা নয়ন প্রান্তে রুদ্ধ করিয়া দিল। যে দীর্ঘনিশ্বাস ভর্ৎসনারূপে মানদার দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল, সেই অমিত বলে গদাধর তাহার গতিরোধ করিয়া দিল।

গদাধর পুত্রকে কোলে তুলিয়া সদ্য আনীত দুগ্ধ গরম করিয়া, তাহাকে খাইতে দিল এবং মানদাকে বলিল, "দেখ, আমি দুটা উনান জ্বালিয়া কত রান্না রাঁধি।"

২৯

ছয়মাস পরে, নবনিযুক্ত বামুনঠাকুরকে গদাধরের বাটী হইতে বিদায় করিবার আবার কারণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এবার স্বতন্ত্ররূপ কারণ। রাত্রে আহারকালে, সুধা দেখিল যে, তাহার ঈপ্সিত মৎস্যপুচ্ছ তাহার স্থালীমধ্যে আসন প্রাপ্ত হয় নাই; বামুনঠাকুর তাহা অপর এক পরিচারিকার আহার-পাত্রে রক্ষিত করিয়াছিল। যে পরিচারিকার পাত্রে, সুধাকে বঞ্চনা করিয়া, সেই পুচ্ছপ্রবর স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ অতিক্রম করে নাই; এবং সে পাপীয়সী দাঁতে 'মিসি' দিত, এবং বামবাহুতে সুবর্ণবিনির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিত, এবং গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী ফিরিতে অযথা বিলম্ব করিত; অতএব বামুনঠাকুর যে নিতান্ত দুঃশীল, তাহা বিশেষরূপে স্থির হইয়া গেল।

প্রভাতে সুধার নিকট সকল তথ্য অবগত হইয়া, মানদা মৎস্যপুচ্ছভুক্তা পরিচারিকা সহ মৎস্যপুচ্ছদাতা বামুনঠাকুরকে বিদায় করিয়া দিল। আবার দ্বারবান্ নূতন বামুনঠাকুরের অনুসন্ধানে ছুটিল।

আজ গদাধর সে দিনের মত এ সকল সংবাদ অবগত হইতে পারে নাই। সে অতি প্রত্যুষ হইতে এক মক্কেলের কাগজপত্র আলোচনা করিতে এত ব্যস্ত ছিল যে, মৎস্যপুচ্ছকে আশ্রয় করিয়া তাহার পাকশালায় যে বিচ্ছেদান্ত প্রণয় অভিনয় অভিনীত হইয়াছিল, তাহার কোনও তথ্য সে অবগত হইতে পাইতে পারে নাই। অতি সত্বর আদালতে যাইবার অভিলাষে, যখন সে নিমেষমধ্যে স্নান সমাধা করিয়া, আহার জন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সে জানিতে পারিল যে, এ পর্য্যন্ত রন্ধনের কোনও উদ্যোগই হয় নাই। তাহার সহিত মানদার সাক্ষাৎ হইলে, মানদা বলিল, "তাইত; তুমি কি খাইয়া আদালতে যাইবে? রান্নাও হয় নাই এবং বাজার হইতেও কোনও খাবার আনাইয়া রাখা হয় নাই।" গদাধর বলিল, আমি আমার জন্য ভাবি না; আদালতে যাইয়া চাকর দ্বারা জলখাবার আনাইয়া খাইব; আমি তোমাদের জন্য ভাবিতেছি; চাকর চাকরাণীদের জন্য ভাবিতেছি; তাহারা কি খাইবে?" মানদা হাসিয়া বলিল, "তা আমি সব ঠিক করিয়াছি, খোকার দুধ গরম করিবার জন্য সুধা উনান জ্বালিয়াছিল। খোকার দুধ গরম হইলে,—সুধা বাকী দুধে বাদাম বাটা ও বাতাসা দিয়া আমার জন্য ক্ষীর প্রস্তুত করিয়াছিল; সুধা বাল্যকাল হইতে আমাকে মানুষ করিয়াছে কি না? সে জানে যে, আমি এইরূপ ক্ষীর খাইতে বড় ভালবাসি। এ ক্ষীর খাইতে উত্তম হয়। বরং সুধাকে একদিন

তোমার জন্য একটুখানি প্রস্তুত করিতে বলিব।” গদাধর কতকটা নিশ্চিন্ত হইল; বলিল, “শুধু ক্ষীর খাইয়া কিরূপে থাকিবে?” মানদা বলিল, “আমি শুধু ক্ষীর খাই নাই, বাজার হইতে বেশ গরম গরম সিঙ্গাড়া আনাইয়াছিলাম; সিঙ্গাড়াগুলা বেশ ছিল। ইচ্ছা ছিল খানকতক তোমার জন্য রাখি, কিন্তু বারান্দায় এক বিড়াল বসিয়াছিল, তাহাকে কিছুতেই মারিতে পারিলাম না; একখানা সিঙ্গাড়াও তাহার গায়ে লাগিল না; গরম সিঙ্গারা তাহার গায়ে লাগিলে পুড়িয়া মরিত।” মানদার সম্বন্ধে গদাধর নিশ্চিন্ত হইয়া, চাকরগণের আহারের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্ন শুনিয়া মানদা বলিল,—“তাহাদের কথা তুমি ভাবিও না; তাহারা এক বেলা না খাইলে মরিয়া যাইবে না।”

গদাধর বলিল—“মানদা, এ'টা তোমার ভাল কথা হইল না। উহারা তোমার আশ্রয়ে বাস করিতেছে। তোমাকে মার মত বিবেচনা করিয়া, যথাসময়ে আহার পাইবার জন্য তোমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। খোকা যদি যথাসময়ে দুধ খাইতে পাইল, তাহা হইলে উহারাও যথাসময়ে খাইতে পাইবে।”

গদাধর আদালতে যাইবার সময় সরকারকে ডাকিয়া বলিয়া গেল যে, অতঃপর দুইজন বামুনঠাকুর রাখা আবশ্যক হইবে। একজন অন্দরমহলে পাকশালায় রাঁধিবে; অন্য একজন বাহিরে রাঁধিবে। এবং যাবৎ বামুনঠাকুর না আইসে, তাবৎ প্রত্যেক চাকরকে প্রতি বেলা চারি আনা হিসাবে খোরাকী দিতে হইবে; তাহারা আপন ইচ্ছামত খাদ্য কিনিয়া খাইবে।

গদাধর যাহা মনে করিয়াছিল, তাহা করিতে পারে নাই; আদালতে যাইয়া সে সুযোগমত জলযোগ করিয়া লইতে পারে নাই; সমস্ত দিন তাহাকে কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বিকালে পাঁচটার পর বাড়ি ফিরিবার সময়, তাহার মানদা কথিত সেই কথাটা মনে পড়িল,—এক বেলা না খাইলে কেহ মরিয়া যায় না।

বাটী ফিরিয়া গদাধর শুনিল, মানদা মুলীকে সঙ্গে লইয়া, গাড়ি চড়িয়া, গহনা পরিয়া জ্ঞানদা বাবুদের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছে। খোকাকে এক পরিচারিকার নিকট রাখিয়া গিয়াছে। গদাধর যাইয়া, খোকাকে আপনার বুকে তুলিয়া লইল। সে যে সমস্ত দিন অনাহারে ছিল, খোকাকে বুকে লইয়া তাহা ভুলিয়া গেল। ভাবিল, এমন সোণার ছেলেকে ফেলিয়া মানদা কিরূপে স্থানান্তরে যাইতে পারে?

সরকারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সে গদাধরকে সংবাদ দিল যে, দ্বারবান্ একটিও বামুনঠাকুর পায় নাই। অন্য স্থলে পাচক অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং রাত্রের আহার জন্য ভৃত্যবর্গকে আরও চারি আনা হিসাবে খোরাকী দিতে গদাধর, সরকারকে আজ্ঞা করিল। গমন কালে, গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া সরকার জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনার আহারের কি হইবে?”

গদাধর খোকার মুখচুম্বন করিয়া কহিল,—“আমার জন্য চিন্তা নাই; আমি বাজার হইতে কিছু লুচি ও হালুয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইব।”

কিন্তু সে রাত্রে গদাধরের আহার হয় নাই। ধনসম্পত্তি লইয়া, লোকজন লইয়া, কলিকাতার ন্যায় খাদ্যপরিপূর্ণ বৃহৎ নগরীর বক্ষে বাস করিয়া, গদাধরের একটা দিন অনাহারে চলিয়া গেল। কেন? তাহার ভৃত্যেরা কি বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে সক্ষম হয় নাই? না, তা নয়?

খোকা বড় বায়না লইয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তথাপি তাহার মাতা বাটীতে প্রত্যাগতা হইল না দেখিয়া, সে গদাধরের বক্ষেও শান্ত হইয়া ঘুমাইল না। খোকাকে লইয়া গদাধর বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। কখনও বারান্দায়, কখনও বাগানে তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু সে কোনও রূপে শান্তি লাভ করিল না। এজন্য ভৃত্য যখন বাজার হইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিল, তখন সে খোকাকে ছাড়িয়া আহার করিতে যাইতে পারিল না।

তাহার পর মানদা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, রক্তাধর নাড়িয়া ঘুনীর সহিত গল্প করিতে করিতে বাটী ফিরিয়া খোকাকে কোলে লইল। কিন্তু তখনও গদাধর আহারে বসিতে সক্ষম হইল না। মানদার বাম কর্ণের দুর্লভ মুকুতা বিরচিত দুলটি কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল;—মানদা খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার অন্বেষণ জন্য গদাধরকে প্রেরণ করিল। বলিল,—"তোমার খাবার আমি রক্ষা করিব, তুমি ফিরিয়া আসিয়া আহার করিও।" অন্বেষণে বিফল মনোরথ হইয়া, বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া গদাধর দেখিল, মর্ম্মর বিগঠিত শীতল হর্ম্ম্যতলে, ফুল্ল কমলরাশির ন্যায় মানদার সুনিদ্রিত দেহতট বিস্তৃত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী পাত্রে সংস্থাপিত আহারদ্রব্য, মানদার স্খলিত অঞ্চলোপরে উপবিষ্ট হইয়া, এক ভদ্র মার্জ্জারপুত্র অপরিম্লান বদনে আহার করিতেছে। তখন রাত্রি একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর পুনরায় আহারদ্রব্য আনয়ন করিয়া, আহার করা গদাধর আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। সে ক্লান্ত দেহে শয্যার কোমল আশ্রয় গ্রহণ করিল।

৪০

নিদ্রাঘোরে গদাধর মধুর স্বপ্ন দেখিল।—যেন এক অমৃতময়ী সুবর্ণ স্থালীতে অমৃতোপম খাদ্যদ্রব্য ধারণ করিয়া, আপন লালিত্যানুলিপ্ত বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার ক্ষুধিত মুখমধ্যে তাহা প্রদান করিতেছে। তাহার নিশাকর-কর তুল্য বিমল লাবণ্য-কিরণে যেন নিশীথের সমস্ত নিবিড় অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তাহার মধুরতা, স্নিগ্ধ নিশীথ বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া, যেন বিশ্বজননীর স্নেহাশীর্ব্বাদের ন্যায় তাহার নিদ্রিত অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে।—এ স্বপ্নদৃষ্টা লাবণ্যময়ী কে?

গদাধর তাহাকে চিনিয়াছিল;—সে অম্বিকা!

হায়! বিধাতা, হতভাগ্য গদাধরকে তুমি আবার এই সুখের স্বপ্ন কেন দেখাইলে? তাহার হৃদয় মধ্যে যে ছবি ম্লান হইয়া যাইতেছিল, তাহা আবার কেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিলে? না জানি তোমার বিপুল বিশ্বের কি মঙ্গলকামনায় অম্বিকাকে আবার গদাধরের হৃদয়মধ্যে টানিয়া আনিলে? তোমার কার্য্য তুমিই জান;—আমরা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করি,—"কেন?"

প্রভাতে উঠিয়া, গদাধর রাত্রের সুখ-স্বপ্নের কথা বার বার চিন্তা করিল। অনশনে অবসন্ন দেহাশ্রিত দুর্ব্বল মন লইয়া, সে অম্বিকার চিন্তা হইতে আপনাকে বিরত রাখিতে সক্ষম হইল না। অম্বিকার দেবী-মূর্ত্তি, প্রভাত সূর্য্যের বিমল রশ্মির ন্যায়, হিমস্নাত সদ্যপ্রস্ফুটিত প্রভাত প্রসূনরাশির ন্যায়, তাহার হৃদয়মধ্যে সহস্র সৌন্দর্য্য-ছটায় ফুটিয়া উঠিল। গদাধরের সে মূর্ত্তি চিন্তা করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু তখন তাহার অধিকার অনধিকারের

বিচার করিবার সাধ্য ছিল না। সে অনন্ত-মনে চিত্তমধ্যে অম্বিকার শুভা মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার পূজা করিল।

এই পূজা-নিরত মন লইয়া, সে তাহার কার্য্যাগারে আসিয়া, উপবেশন করিল। তাহাকে কার্য্যাগারে আগত দেখিয়া, সরকার আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুই জন উপযুক্ত পাচককে সে নিযুক্ত করিয়াছে; এবং কোনও অবগুণ্ঠনবতী তাহার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে কক্ষান্তরে অবস্থিতি করিতেছে; অনুমতি পাইলে, সে তাহাকে লইয়া আসিবে।

আইনব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর কোন কোন ক্ষেত্রে গদাধরের বিখ্যাত উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য কচিৎ পুরমহিলা-গণ গদাধরের সাক্ষাৎ লাভ প্রত্যাশায় আগমন করিতেন। সরকারের সংবাদ শুনিয়া গদাধর মনে করিল, সেইরূপ কোন পুর-মহিলা সমাগতা হইয়া থাকিবে। গদাধর সরকারকে কহিল,—"স্ত্রীলোকটিকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।"

এ স্ত্রীলোকটি অন্য কেহ নহে,—অম্বিকা!

কিন্তু অম্বিকা তথায় কিরূপে আগত হইল? তাহা বলিতেছি. শুন। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয়ের চক্ষুর পীড়া জন্মে। কালীদহে এবং কালীদহের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল চিকিৎসক ছিলেন, এই পীড়া দেখিয়া তাঁহারা সকলেই কহিলেন যে, এরূপ পীড়ার চিকিৎসা এই পল্লী গ্রামে হইবার নহে; ইহার জন্য কৃষ্ণ-চাটুর্য্যে মহাশয়কে কিছু কাল কলিকাতায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে হইবে, এবং তথাকার বিশেষজ্ঞ পারদর্শী চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে হইবে।

এ কথা শুনিয়া অম্বিকা পিতাকে কহিয়াছিল,—"বাবা আমাদের পক্ষে কলিকাতা যাইয়া বাস করা কিছুমাত্র অসুবিধাজনক হইবে না; গদাধরকে পত্র লিখিয়া জানাইলেই সে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারিবে।"

কিন্তু এক্ষণে গদাধরের প্রতি কৃষ্ণ-চাটুর্য্যের আর পূর্ব্বের ন্যায় আস্থা ছিল না। সেই যে সে কালীদহে আগমন করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় মনে করিয়াছিলেন, যে এক্ষণে গদাধর বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া, এবং জমীদারের সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, গ্রামের লোকের নিকট তাঁহাদিগের কুৎসা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা সংসারে কতবার দেখিয়াছি, কত উপকৃত ব্যক্তি সৌভাগ শিখরে আরোহণ করিয়া আপনার দুর্দ্দিনের উপকারককে ভুলিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, বুঝি গদাধরও এই শ্রেণীর লোক। সত্য বটে, তিনি গদাধরকে শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সময়ে সময়ে পত্র লিখিতেন, এবং গদাধরও এ সকল পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিত। কিন্তু গদাধরের পত্রগুলা সম্মান-সূচক হইলেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইত, এবং তাহাতে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা অম্বিকার একটি মাত্র কথা থাকিত না। কন্যার প্রতি গদাধরের এই তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়া, তাঁহার বিশেষ অভিমান হইত। এই জীবন-দাত্রী, বহু উপকারিণী কন্যাকে নির্দ্দয় অকৃতজ্ঞ গদাধর কিরূপে উপেক্ষা করিল? ভগবানের সৃষ্ট মানুষ, মানুষ নাম ধরিয়া, কিরূপে এরূপ অকৃতজ্ঞ হইতে পারিল?

অম্বিকার কথা শুনিয়া, কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় কহিলেন,—"মা, তুমি গদাধরের

কথা বলিও না। এবং তাহার নিকট হইতে কোনও প্রকার সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা রাখিও না।"

অম্বিকা। বাবা, তুমি গদাধরের উপর রাগ করিও না। সে কোন কারণ বশতঃ আমাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া, তুমি তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া রহিয়াছ।

কৃষ্ণ। আমি তাহার উপর রাগ করি নাই। কিন্তু দেখ, সে কি অকৃতজ্ঞ। তুমি একদিন তোমার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তাহাকে গঙ্গাস্রোত হইতে উদ্ধার করিয়াছ; এখন সে তোমাকে একখানা পত্র লেখাও আবশ্যক বিবেচনা করে না। ইদানীং তুমি পত্র লিখিলেও তাহার উত্তর দেয় না, এবং আমাকে পত্র লিখিলেও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে না।

অম্বিকা। বাবা আমার কি সাধ্য যে আমি কাহারও জীবন উদ্ধার করি। তুমি ত কতবার বলিয়াছ যে, তিনিই একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। আমি ধন্য যে, আমার ন্যায় তুচ্ছ তৃণকে তিনি ক্ষণেকের জন্য আপনার যন্ত্ররূপে চালনা করিয়াছিলেন। নিজের এই সৌভাগ্যের জন্য, আমি কেন গদাধরের কৃতজ্ঞতা কামনা করিব?

কৃষ্ণ। মা, তুমি তাহার কৃতজ্ঞতা কামনা কর না, আমিও তাহার প্রতি অপ্রীতি রাখি না। তথাপি কলিকাতা যাইতে হইলে, আমরা তাহার সাহায্য চাহিব না। এক্ষণে আমাদিগের কোনও কার্য্য করা তাহার পক্ষে অপ্রীতিকর হইতে পারে। আমরা যে কলিকাতা যাইব, এ সংবাদও গদাধরকে প্রদান করা হইবে না।

অতএব গদাধরের অজ্ঞাতে, কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতেছিলেন। তথায় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আসিয়া নেত্রপীড়া উপশম জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষিতা চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে ভিষকৃগণ স্থির করিলেন, যে অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা নেত্রগোলকের পার্শ্বস্থ কয়েকটা সূক্ষ্ম শিরা বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক হইবে।

চিকিৎসকগণের যুক্তি শুনিয়া অম্বিকা আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে বাল্যকাল হইতে পিতা ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না; এক্ষণে সেই পিতার সঙ্কটাবস্থায় তাহার যে বিহ্বলতা ঘটিয়াছিল তাহা অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে। সে প্রাণপণ শক্তিতে পিতার সেবা করিয়াও একবারও মনে করিতে পারে নাই যে পিতার তাৎকালিক শারীরিক অবস্থাতে তাহা যথেষ্ট হইল। তাহার এই সেবাব্রতে সহায়তা করিবার জন্য যদি সে কাহাকেও পাইত! যদি এই মহাব্রতে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার জন্য, তাহার একটি ভ্রাতা থাকিত! আগামী কল্য যখন তাহার পিতার চক্ষুতে অস্ত্র প্রয়োগ হইবে, তখন সে সহায়হীনা কিরূপে স্থির হইয়া থাকিবে? চিত্তব্যাকুলতা লইয়া কিরূপে পিতার শুশ্রূষা করিতে সক্ষম হইবে?

সে কাতরস্বরে পিতাকে কহিল,—"বাবা, আমার ইচ্ছা যে কাল তোমার চোখে অস্ত্র হইবার আগে, গদাধরকে ডাকিয়া আনি;—তুমি কি বল?"

এক্ষণে কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় চক্ষুরোগে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। এখন পৃথিবীতে যেখানে যতটুকু স্নেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া, আপনার কাতরতাকে আবৃত করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, দেখা

যাউক, নির্দ্দয় গদাধরের নিকট হইতে কিছু স্নেহ লাভ করিতে পারা যায় কি না ?” ইহা মনে করিয়া, তিনি অম্বিকাকে কহিলেন,—“তুমি নিজে যাইয়া, আগামী কল্য সকালে গদাধরকে লইয়া আসিও। তুমি নিজে না যাইলে, সে আসিবে না।”

পিতার আজ্ঞা পাইয়া, অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া, একখানি শকটে আরোহণ করিয়া, অম্বিকা গদাধরকে লইতে আসিয়াছিল।

৪১

অম্বিকাকে দেখিয়া গদাধরের মনে হইল তাহার রাত্রের স্বপ্নটা জীবন্ত হইয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে। অথবা তাহার জাগরণটা জাগরণ নহে, জাগরণের স্বপ্ন মাত্র ;—এখনও সে ঘুমাইতেছে, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। হায়! গদাধরের বাস্তব জীবনটা যদি স্বপ্নময় হইয়া যাইত!

আত্মহারা গদাধর অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া, কহিল,—“অম্বিকা! দেবি! তুমি কিরূপে আসিলে ?”

অম্বিকা গদাধরের নিকট দেবীত্ব লাভ করিতে পারিয়া তাহার চিন্তাভারাক্রান্ত অন্তরমধ্যে কি অনুভব করিয়াছিল, তাহা বলিবার অবসর আমাদের নাই। সে কহিল,—“বাবার চোখের পীড়া হইয়াছে; আমি তাঁহাকে লইয়া, দুই মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াছি।”

গদাধর বলিল,—“কই, এ সংবাদ ত তুমি আমাকে দাও নাই।”

অম্বিকা মনে মনে ভাবিল,—“তুমিই কি আমাদের সংবাদ লইয়াছিলে ? কালীদহে যাইলে, কিন্তু আমাদের সহিত দেখা করিলে না! আমি যে চাতকিনীর মত তোমার একবিন্দু করুণার প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না ?”—প্রকাশ্যে বলিল,—“তুমি পাছে আমাদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়, এ জন্য বাবা তোমাকে এ সংবাদ দিতে বারণ করিয়াছিলেন।”

গদাধরের চক্ষে জল আসিল, কহিল,—“বিব্রত! বিব্রত! আমি তোমাদের লইয়া বিব্রত হইব ? ছি! ছি! অম্বিকা, কিরূপে তুমি এরূপ কথা ভাবিলে ? আমি গদাধর, আমি কি মানুষ নহি ? তোমাদের সমস্ত যত্ন কি বৃথা হইয়া গিয়াছে ;—তোমরা কি গদাধরকে তোমাদের সহস্র চেষ্টার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পার নাই ? আমি তোমাদের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িব ? দেবী অম্বিকা কি আমাকে জল নিমজ্জন হইতে, আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া উদ্ধার করে নাই ? আমার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে, ত্রিদিবের দেবীর ন্যায় বসিয়া তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে নাই ? এই যে বাটীতে আমি বসিয়া রহিয়াছি, ইহার প্রত্যেক ইটখানি কি কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয়ের অপার করুণার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না ? চল অম্বিকা,—আমি এই দণ্ডে তাঁহার নিকট যাইব। তাঁহার চোখের পীড়া কি কঠিন ?”

অম্বিকা। কঠিন পীড়া; আজ বেলা এক প্রহরের পর অস্ত্র করা হইবে।

পূর্ব্বদিন যে একবারও আহার হয় নাই, তাহা গদাধর ভুলিয়া গেল ;—মুহূর্ত্তমধ্যে সে অম্বিকার সহিত গাড়িতে গিয়া বসিল। গাড়িতে বসিয়া, অম্বিকার মুখের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া, সে আবার বলিল,—“ছি! অম্বিকা, তোমরা কিরূপে ভাবিলে যে, আমি তোমাদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িব ?”

অম্বিকা। তাহা বলিতে পারি না। প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে তুমি একবার কালীদহে গিয়াছিলে ; মনে আছে ? তখন

তুমি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস নাই কেন?

গদাধর। তোমার পত্রের উত্তরে, তাহাত তোমাকে জানাইয়াছিলাম।

অম্বিকা। তোমার সে পত্রখানা এখনও আমার নিকট আছে। তুমি লিখিয়াছিলে যে আমি তোমাকে যে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে বলিয়াছিলাম, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তুমি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ কর নাই। তুমি আরও লিখিয়াছিলে যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, জগতের অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া, তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ কর নাই। পত্রখানা আমি বাবাকে দেখাইয়াছিলাম।

গদাধর। এ'টা তুমি ভাল কাজ কর নাই। পত্রখানা তোমার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। তাহা তোমার বাবাকে দেখান উচিত হয় নাই। তোমাতে আমাতে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল কথা হইয়াছিল, তিনি ত তাহা জানেন না। সে সকল কথা না জানিয়া আমার সেই পত্রখানা পাঠ করিলে, তিনি সহজেই মনে করিবেন, যে আমি তাঁহার প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছি। তাঁহার অপ্রসন্নতা আমার সকল কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে।

অম্বিকা। তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া, দুইটা কথা কহিলেই, তিনি সব অভিমান ভুলিয়া যাইবেন;—তিনি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

গদাধর। আর আমি যে তোমার প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছি?

অম্বিকা। করিয়াছ বুঝি? কিন্তু তোমার প্রতি আমার কোনও অভিমান নাই। তোমার পত্রখানা পড়িয়া একটু ব্যথা পাইয়াছিলাম;—বুঝিতে পারি নাই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, জগতের কিরূপে অকল্যাণ হইবে। তুমি এখন আমাকে বুঝাইয়া দাও।

গদাধর। অম্বিকা, ভগবান্ জানেন, তুমি যাহা বুঝিতে চাহিতেছ, তাহা বুঝাইবার জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু—!

অম্বিকা। কিন্তু কি?

গদাধর। তাহাও আজ বলিতে পারিব না; তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

গদাধর বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার হৃদয়ের সমস্ত গুপ্ত কথাগুলি তাহার সেই সতৃষ্ণ নয়ন পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এবং সেই গোপন কথাগুলি অম্বিকার বক্ষে স্থান লাভ করিয়া, হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনের সহিত নৃত্য করিতেছিল। আমিত তোমাদিগকে বার বার বলিয়াছি ভালবাসা কেহ গোপন রাখিতে পারে না!

অম্বিকা পিতার নিকট প্রত্যাগতা হইয়া গদাধরের আগমন সংবাদ দিল। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের চক্ষু বস্ত্রখণ্ডমধ্যে বদ্ধ ছিল; তিনি গদাধরকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া, অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন; স্তব করিয়া কহিলেন "পশ্যাম্যচক্ষুঃ।"—তাহার পর গদাধরের হস্তে, আপন হস্ত ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি চক্ষুহীন হইলেও, তোমাকে এবং অম্বিকাকে দেখিতে পাইব। তোমাদের দর্শন হইতে যদি আমাকে বঞ্চিত না হইতে হয়, তাহা হইলে, চক্ষুহীন হইলেও আমি দুঃখিত হইব না।"

গদাধর, কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয়ের সহিত গল্প করিতে লাগিল; অম্বিকা স্থানান্তরে গৃহকার্য্যে রত হইল। কিয়ৎকাল পরে, সে প্রত্যাগতা হইয়া, গদাধরকে ডাকিল,—"আইস।"

গদাধর। কোথায় যাইব?

অম্বিকা। পার্শ্বের ঘরে তোমার জন্য কিছু আহার সামগ্রী রাখিয়াছি। চল, আহার করিবে।

গদাধর। এখন আহার করিব না।

অম্বিকা। ডাক্তারদের আসিবার এখনও বিলম্ব আছে। তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বেই তুমি আহার করিয়া লও।

গদাধর। ডাক্তারেরা চলিয়া যাইবার পর আহার করিব।

কিন্তু অম্বিকা কিছুতেই ছাড়িল না; বলিল, "না, এখনই তোমার আহার করিতে হইবে।" কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়েও গদাধরকে আহার করিতে যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। গদাধর অগত্যা পার্শ্বের ঘরে আহার করিবার জন্য উপস্থিত হইল। তথায়, পরিষ্কৃত কদলী পত্রে সদ্যপ্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যসকল সৌরভ বিস্তার করিয়া ক্ষুধাকে আহ্বান করিতেছিল। গদাধর ভাবিল, এই বহুবিধ খাদ্য অম্বিকাদেবী কিরূপে এত অল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইল। অম্বিকাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল খাদ্যদ্রব্য কি তুমি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছ?"

অম্বিকা বলিল,—"একজন ব্রাহ্মণী আছে, সে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। বাবার জন্য আহার দ্রব্য আমিই প্রস্তুত করিয়া থাকি। আমি না রাঁধিলে তাঁহার আহারের সুবিধা হয় না। তিনি বেশী মসলা দেওয়া ব্যঞ্জন আহার করিতে পারেন না।"

গদাধর আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"এত দ্রব্য তুমি এত অল্প সময় মধ্যে কিরূপে রন্ধন করিলে?"

অম্বিকা। আমি সকালে উঠিয়া, রন্ধনের আয়োজন করিয়া, তোমাকে আহ্বান করিবার জন্য গিয়াছিলাম। রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখিয়া তোমাকে ভোজন করাইবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল।

গদাধর। কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে?

অম্বিকা। স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যেন তোমার সমস্ত দিন আহার হয় নাই; যেন তুমি অনশনে কাতর হইয়া, আমার নিকট আহার দ্রব্য প্রার্থনা করিতেছ।

গদাধর। সত্য অম্বিকা, তোমার স্বপ্ন সত্য; গতকল্য আমার ভাগ্যে আহার লাভ ঘটে নাই।

অম্বিকা। কেন?

গদাধর আহার করিতে করিতে পূর্ব্ব দিনের সমস্ত ঘটনা অম্বিকার নিকট বিবৃত করিল। কিন্তু সে আপন স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করে নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় বিহগকুল।

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় "পাখী।" শ্রোতৃবর্গ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "বিহগকুল আমাদের আলোচনার যোগ্য কেন?" তদুত্তরে আমি বলিতে পারি যে ভগবানের রাজ্যে পাখী ও ফুলের মধ্যে যত প্রকার বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিচাতুর্য্য প্রকটিত হইয়াছে এমন বোধ হয় আর কোনও পদার্থেই হয় নাই। কি বর্ণবিন্যাসে, কি স্বরমাধুর্য্যে এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি বিলাসে, পাখীর ন্যায় প্রাণীজগতে আর কিছু নাই বলিলেও

অত্যুক্তি হয় না; অবশ্য পুষ্পেও ভগবানের সৃষ্টিচাতুর্য্য অপূর্ব্ব। প্রসূনের সুগন্ধ ও নয়নমনোহারী রূপও আমাদিগকে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করে। পক্ষী ও ফুল এতদুভয়ের মধ্যে কাহার স্থান উচ্চে, এ বিষয় নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে, তবে পাখী যুগপৎ শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করে, ইত্যবধানে ইহার স্থান কিছু উচ্চে অবধারণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। নয়ন-মনোহর ও সুগন্ধী কুসুমদামখচিত পুষ্পোদ্যানে সুললিত বিহগ কূজনের সমাবেশ হইলে তাহা কি অপূর্ব্ব হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সুমধুর বিহগ-কাকলি শ্রবণে কত কবির হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কামিজন স্পৃহণীয় —বসন্ত সমাগমে যখন কোকিলের কুহুতানে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠে, তখন কত বিরহী বিরহিণীর প্রাণ ব্যাকুল হয় তাহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ পাখী ও ফুল কবিতার উৎস; অতএব এস্থলে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে কীট পতঙ্গভোজী পক্ষী দ্বারা শস্য-ক্ষেত্রের কত অনিষ্ট নিবারিত হইতেছে এবং শকুনি গৃধ্রিনী চিল প্রভৃতি আম-মাংসভোজী পক্ষীগুলি দ্বারা জগতের স্বাস্থ্যও রক্ষিত হইতেছে, ইহারা ভগবানের মিউনিসিপালিটিতে মেথরের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। কত পাখীর পালকে বিলাসীর পরিচ্ছদ ও শিরোভূষণাদির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, অনেক পক্ষী, মাংসলোলুপ ব্যক্তিগণের রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছে, অনেক পক্ষীর নীড়দ্বারা (বাবুই প্রভৃতির) অশ্ব পর্য্যান প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে;—এই প্রকারে দেখা যায় যে পাখী মানবের অশেষ বিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে। অতএব পক্ষিতত্ত্ব আলোচনায় কিছু সময় অতিবাহিত করিলে তাহা যে কেবলই বৃথায় যাইবে এমন মনে হয় না, তজ্জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

বিবিধ ফলপুষ্প-সমন্বিত আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমি নানাপ্রকার বিহগ-কুলেরও আবাস ভূমি। ভারতীয় সমস্ত পক্ষী সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার সাধ্যাতীত; অতএব অদ্য কতকগুলি বিখ্যাত পাখী সম্বন্ধে স্বল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করার ইচ্ছা করি। ভরসা করি সুধীগণ এসম্বন্ধে ইতঃপর বিস্তৃত আলোচনা করিতে যত্নপর হইবেন। পাশ্চাত্য দেশে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে। orinthology বিজ্ঞানের একটী শাখা বিশেষ বলিয়া পারিগণিত হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষাতেও পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য মনে হয়। প্রাচীন ভারতে,ময়ুর, কোকিল, শুক, সারিকা, লাব, তিত্তির, হংস, কপোত ও সারস প্রভৃতি পক্ষী প্রতিপালিত হইত, এ সম্বন্ধে সংস্কৃত কাব্য নাটকাদি পাঠে বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়। শুক শারিকাবাচন (পড়ান) এবং লাব তিত্তিরাদির যুদ্ধ প্রদর্শন কলা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পক্ষী প্রতিপালন প্রভৃতি বিষয়ে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, না থাকাই বিচিত্র, থাকার সম্ভাবনাই অধিক। পক্ষী-জাতি সাধারণতঃ অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসে। প্রায় সমস্ত পক্ষিই প্রত্যহ স্নান করিয়া থাকে। ইহাদের পুচ্ছের উপরিভাগে একটী করিয়া তৈলাধার থাকে, স্নানের সময় শরীরে কিছু জল দিয়া পরে তাহা হইতে চঞ্চু পুটে তৈলাক্ত পদার্থ, আহরণ করতঃ সর্ব্বাঙ্গ ম্রক্ষিত করে এবং অতঃপর পক্ষগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া ভাল রকম অবগাহন করে। তৈলাধার নষ্ট হইলেই পক্ষিসকল পীড়িত হয়, অতএব

পক্ষি-প্রতিপালকগণের এ বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। সম্প্রতি বৈনিক বিদ্যা নামক একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, বাজপক্ষী বিষয়ক এই গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

ভারতীয় পক্ষীর মধ্যে কতকগুলি স্বর মাধুর্য্যে এবং কতকগুলি বর্ণবিন্যাসে আমাদের শ্রবণও নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত গুলিকে গায়ক পক্ষী (singing bird) বলা যায়। এই শ্রেণীর কতকগুলি পাখী কেবলমাত্র কীট পতঙ্গভোজী, কতক গুলি শস্য ও কীটাদি ভক্ষণ করে, এবং কতকগুলি কেবলমাত্র শস্যভোজী। মাংসভোজী (শ্যেনাদি) ও জলচর (হংস প্রভৃতি) এবং উভচর (জল ও স্থলচর বক, সারস প্রভৃতি) সম্বন্ধে আলোচনা করার আজ ইচ্ছা নাই। কপোত জাতীয় পক্ষীও অদ্য বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে না, প্রসঙ্গাধীন ২।৪টী কথা মাত্র বলা যাইবে। অন্য গায়ক পক্ষী সম্বন্ধেই যথাসম্ভব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

অস্মদ্দেশীয় কীটপতঙ্গভোজী গায়ক পক্ষীর মধ্যে শ্যামা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। ইতঃপর ভীমরাজ, আড়েরাজ, শামা, দয়েল, আগ্‌গীন, চণ্ডুল, পিদ্দা, হরবোলা, চাতক, বৌ কথাকও, পাপীয়া, কোকিল প্রভৃতির স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কীট ও শস্যভোজীর মধ্যে আগ্‌গীন ও চণ্ডুল (Lark) জাতীয় পক্ষী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র শস্যভোজী গায়ক পক্ষী মধ্যে তুতী (Linnet) ও মুনিয়া উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত পক্ষীগুলির বিষয় পরপর সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

(১) শ্যামা ঃ—এই পক্ষী ভারতবর্ষের অনেক স্থানে দেখা যায়। পার্ব্বতীয় প্রদেশের নিকটবর্ত্তী উপত্যকা সকলেই ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের পুং জাতীয় পক্ষীই গায়ক। ইহার স্বর-মাধুর্য্য ও বৈচিত্র্য অতি মনোরম এবং পরের স্বর অনুকরণ শক্তিও অদ্ভুত। পিঞ্জরাবদ্ধাবস্থায় যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইলে শ্যামা ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। শাবকাবস্থায় ইহাকে পুং স্ত্রী ভেদ করা সহজ নহে, যাহারা সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করে তাহারা অনায়াসেই এই ভেদ নির্দ্দেশ করিতে পারে। পক্ষী মাত্রেরই পুং জাতি গুলিই গায়ক হইয়া থাকে। শ্যামা সম্বন্ধেও এই বিধির ব্যতিক্রম নাই। বসন্ত কালের আরম্ভ হইতেই ইহারা গান করিতে আরম্ভ করে। এবং বর্ষার আরম্ভ হইতে ইহাদের পক্ষ পরিবর্ত্তিত হয়। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে কুরিচে পড়া বলে। এই সময় গান করা বন্ধ হয়। বর্ষার প্রারম্ভে প্রায় সকল পক্ষীই পক্ষ পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে, পুনরায় শরৎ কালে কিছু কিছু গান করিতে আরম্ভ করে। কুরিচের সময় পাখীগুলি দুর্ব্বল হয়, এই সময় ইহাদের প্রচুর আহার্য্যের প্রয়োজন, ভগবান্ এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় বর্ষাকালে কীট পতঙ্গাদির প্রাচুর্য্য বিধান করিয়াছেন। পক্ষী প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলিতে হইলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইবে এবং সভ্যগণেরও ধৈর্য চ্যুতি হইবে, অতএব তাহাতে বিরত হইলাম।

(২) দয়েল পাখী ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইহারা প্রায়শঃ মনুষ্যাবাসের নিকটেই বিচরণ করে। বসন্ত কালে ইহারা অতি প্রত্যুষে উচ্চ স্থানে বসিয়া মনের আনন্দে মিষ্ট স্বরে গান করিয়া থাকে। ইহাদেরও পুং জাতিই গায়ক। আমাদের

দেশে (ময়মনসিংহে) পুং জাতীয় পোষা পাখীর সহিত আরণ্য পাখীকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করার প্রথা আছে। পোষা পাখীটীকে মুক্ত করিয়া দিলে সে আরণ্য পাখীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন আরণ্য পাখীটী মনুষ্যের করতলগত হয়, এই ক্রীড়া দর্শনীয় বটে। দয়েল পাখীও দীর্ঘজীবী হয়। দয়েল পাখীর শাবকাবস্থায় পুং স্ত্রী ভেদ সহজে নির্ণয় করা যায় না। ইহারা বৃক্ষের কোটরে অথবা প্রাচীর ইত্যাদির গর্ত্তে অণ্ড প্রসব করে

(৩) পিদ্দা অতি ক্ষুদ্রকায় পক্ষী, ইহার বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ, পক্ষের উপরে কিছু শ্বেত বর্ণ থাকে এবং পুচ্ছের নিম্নেও শ্বেতাভ। ইহার স্বর মিষ্ট এবং বিচিত্র। পুং জাতীয় পক্ষীই গায়ক। মুঙ্গের, গোরখপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রাপ্য। কলিকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার অনেক শাবক বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। শাবক অবস্থায়ই ইহাদের পুং স্ত্রী ভেদ অবধারণ করা যায়। ইহারা অনবরত পুচ্ছ সঞ্চালন করিতে থাকে। বসন্তকালই ইহাদের গানের সময়।

(৪) দামা শ্যামা হইতে আয়তনে বড়। ইহার পুং জাতীয় পক্ষীর মস্তক, গ্রীবা বক্ষস্থল ও উদরের নিম্নভাগ বাদামী রং বিশিষ্ট, পৃষ্ঠদেশ ঈষৎ নীলাভ ধূসর বর্ণ, পুচ্ছ খর্ব্ব, চঞ্চু কৃষ্ণবর্ণ, পদদ্বয় গোলাপীবর্ণ বা ফিকে। বঙ্গের অনেক স্থানেই এবং গোরখপুরে এই পাখী দেখা যায়। ইহারা সুগায়ক। কলিকাতার পক্ষিব্যবসায়িগণ অনেক খাড়ি পাখী বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে, কিন্তু এগুলি সহসা গান করে না এবং দীর্ঘজীবী হয় না। সময় সময় কলিকাতায় গায়ক পাখীও পাওয়া যায়।

(৫) কস্তুরা—তিন প্রকার আছে, তন্মধ্যে হিমালয় পর্ব্বতে যে গুলি পাওয়া যায় তাহার বর্ণ নীলাভ বেগুনী, চঞ্চু পীত বর্ণ এবং পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, ইহারা অতি সুগায়ক। ভারতের প্রায় সমস্ত পার্ব্বত্য দেশেই ইহা দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতেও এক প্রকার কস্তুরা আছে। ঈষৎ শ্বেতবর্ণ পক্ষযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ কস্তুরা হিমালয় পর্ব্বতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় এবং দারজিলিং ও মণিপুরেও ইহা দেখা যায়। ইহার চঞ্চু ও পদদ্বয় পীতবর্ণ এবং ইহারা বড় মিষ্ট স্বরে প্রত্যুষে এবং দিবাবসানে গান করে। কলিকাতায় কদাচিৎ এই পাখী বিক্রয়ার্থ আনীত হয়

(৬) হরবোলা—এই পক্ষী দুই জাতীয় আছে। এক জাতীয় পক্ষীকে সবুজা এবং অপর জাতীয়কে হারওয়া বলে। ইহাদের বর্ণ হরিৎ, মস্তকের উপরিভাগ রক্তাভ হরিদ্রা বর্ণ যুক্ত হয়। ইহাদের চঞ্চু দীর্ঘ এবং ঈষৎ বক্র। ইহারা পুষ্পের মধু পান করিয়া থাকে এবং অল্প পরিমাণে কীট পতঙ্গাদিও ভক্ষণ করে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই এই পাখী বিদ্যমান। ময়মনসিংহের এবং ঢাকার ও শ্রীহট্টের অনেক স্থানে এই পাখী দেখা যায়। কলিকাতায় এই পক্ষী সময় সময় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। ইহাদের স্বর কিছু কর্কশ হইলেও বিচিত্র ও সুখদ।

(৭—৮) ভীমরাজ ও আড়েরাজ ফিঙ্গ জাতীয় পাখী। ভীমরাজের দুইটী অতি দীর্ঘ পুচ্ছ হয় এবং মস্তকে কেশগুচ্ছ হয়। যখন এই পাখী গগনমার্গে উড্ডীয়মান হয়, তখন বোধ হয় যেন ২টী কীট ইহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। আড়েরাজ, ভীমরাজ হইতে ছোট এবং প্রথমোক্ত পাখীর ন্যায় ইহার দীর্ঘ পুচ্ছ হয় না, ইহার চঞ্চু ঈষদ্ বক্র এবং মস্তকে কেশের ন্যায় দীর্ঘ পালক হয়। এই দুই জাতীয় পাখীই বড় অনু-

করণ-প্রিয়। নানাবিধ জন্তুর এবং পাখীর স্বর ইহারা অনায়াসে অনুকরণ করে, কোনও কোনও ভীমরাজ মানুষের কথাও শিখিতে পারে। গারো হীলে ও গোরখপুরে ভীমরাজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আড়েরাজও গারো হীলে জন্মে। ইহারা বড় পোষ মানে। শাবক হইতে প্রতিপালন করিলে, মুক্তাবস্থায়ও ইহারা পলায়ন করে না। ইহারা ছোট ছোট মাছ এবং মাংস-খণ্ডও ভক্ষণ করে।

(৯) চাতক অতি ক্ষুদ্র পাখী, ইহার বর্ণ পীত এবং পাখার অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা বর্ষাগমে অতি কাতর স্বরে ফটিক জল, ফটিক জল রবে গগনমণ্ডল মুখরিত করে। ইহাদের নীড়-নির্ম্মাণ কৌশল বিচিত্র। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা হইলেই ইহারা ডাকিতে আরম্ভ করে।

(১০—১১) বৌ কথা কও ও পাপীয়া এক শ্রেণীর পক্ষী। ইহারা উভয়েই পরভৃৎ। বৌ কথাকও ফিঙ্গের বাসায় এবং পাপীয়া সাতভেয়ে (ছাতারা) পাখীর বাসায় অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। ইহা ভগবানের একটা সৃষ্টিরহস্য বটে। কোকিল যে কাকের বাসায় অণ্ড প্রসব করে ইহা হয়ত অনেকেই জানেন, এই জন্য ইহা পরভৃৎ সংজ্ঞায় অভিহিত। পরের নীড়ে অণ্ড প্রসব করে বলিয়াই যদি এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে বৌ কথাকও এবং পাপীয়াও পরভৃৎ। সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে কোকিলের নামই উল্লিখিত দেখা দেখা যায়, বৌ কথাকও এবং পাপীয়ার সংস্কৃত নাম কি তাহা কেহ অবগত থাকিলে আমাকে জানাইলে সুখী হইব। কোকিল পাখী এতই সুপরিচিত যে, এতৎ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক।

(১২) শক্করখোরা নামক ২।৩ জাতীয় ক্ষুদ্র পাখী ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দেখা যায়। ইহাদের বর্ণবিন্যাস সুন্দর এবং আকৃতি অতি ক্ষুদ্র, ইহাদের চঞ্চু দীর্ঘ এবং বক্র, পদদ্বয় ছোট, ইহারা পুষ্পের মধু পানে রত থাকে। কোনও কোনও জাতীয় শক্কর খোরাও মধুর স্বরে গানও করিয়া থাকে। নীল বর্ণ বিশিষ্ট শক্করখোরা গুলিই গায়ক হয়। ইহার এক জাতীয় পক্ষীর বক্ষঃস্থল গাঢ় রক্ত বর্ণযুক্ত, ইহারা দেখিতে অতি রমণীয়।

(১৩—১৪) চণ্ডুল ও আগ্‌মীনু(Lark)জাতীয় পক্ষী। ইহারা উভয়ই বড় সুগায়ক। এগুলি দেখিতে চড়াই পাখীর মত এবং প্রায়শঃ ভূমিতেই বিচরণ করে, বৃক্ষশাখায় প্রায় আরোহণ করে না। কখনও কখনও ইহারা আকাশ পথে ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সুন্দর স্বরলহরী বিকীর্ণ করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই পাখী পাওয়া যায় এবং কলিকাতায়ও বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। কাবুল দেশে একপ্রকার Lark পাওয়া যায়, তাহাকে জল্‌ বলে। ইহারা উৎকৃষ্ট গায়ক।

এই জাতীয় পক্ষী প্রায় জলে স্নান করে না, ইহারা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া স্নান-সুখানুভব করিয়া থাকে। ইহারা শস্য ও কীটভোজী।

(১৫) আসাম ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে সেরগঞ্জ নামক একপ্রকার সুন্দর গায়ক পক্ষী পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে অনেকটা মাছরাঙ্গা পক্ষীর মত, ইহারা পরস্বর অনুকরণে পটু, কিন্তু স্বর কর্কশ। ইহারা কীট পতঙ্গ এবং মৎস্যাদি আহার করে। কলিকাতায় সময় সময় ব্যবসায়িগণ এই পক্ষী বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে।

(১৬) শস্যভোজী গায়ক পক্ষীর মধ্যে ক্ষুদ্রকায় তুতী ও মুনিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুতী পাখী দুই প্রকার আছে, একপ্রকার রক্তবর্ণ যুক্ত এবং অপর প্রকার চড়াই পাখীর মত। রক্তবর্ণ বিশিষ্ট পাখীগুলিকে পোষণ করিলে

এক বৎসর পরে আর রক্তবর্ণ থাকে না। বোধ হয় আহারাদির অনিয়মে এই প্রকার হয়। তুতী পাখী ভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কলিকাতায় ব্যবসায়িগণের নিকট এই পাখী অনেক পাওয়া যায়। ইংরেজীতে এই পাখী গুলিকে (Linnet) বলে। বুনিয়া পাখী ছোট এবং বড় সুদৃশ্য। এই জাতীয় অনেকপ্রকার সুন্দর পাখী আছে। ইহারা অতি ধীরে ধীরে মিষ্ট স্বরে গান করে। দুইটী পুং জাতীয় পক্ষীকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া অনেকে আনন্দ অনুভব করেন। যুদ্ধ করাইতে হইলে কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করাইতে হয়, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে। ভারতবর্ষে Nightingale আর্য্যা স্থায় দেখা যায় না, কিন্তু কান্দাহার হইতে অনেক পাখী কলিকাতায় আমদানি হইয়া থাকে; ইহাকে বুলবুল বোস্তা বলে। এই পাখী ক্ষুদ্রকায় বিশিষ্ট এবং দেখিতেও তত সুশ্রী নহে, কিন্তু ইহার স্বর এত উচ্চ যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ফলতঃ গায়ক পাখীর মধ্যে ইহার ন্যায় দ্বিতীয় পাখী আর নাই। Europe এর অনেক স্থানে এবং আফ্রিকার নাইল নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে এবং এসিয়া মহাপ্রদেশের পারস্য, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানে এই পাখী পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের শ্যামা এবং বিদেশীয় বুলবুল বোস্তা এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আমার মতে স্বরমাধুর্য্যে শ্যামা শ্রেষ্ঠ এবং স্বরের উচ্চতা ও বিচিত্রতায় বুলবুল শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ গায়ক পক্ষীর মধ্যে শ্যামা ও বুলবুল বোস্তা অতুলনীয়। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বুলবুল বোস্তা যখন তাহার স্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর করতঃ মনের আনন্দে গান করিতে আরম্ভ করে তখন হৃদয় বিমোহিত হয়। ক্ষুদ্রকায় বুলবুলের স্বর এত দূর ব্যাপ্ত হয় যে, শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। শ্যামা পাখী স্বভাবতঃ রাত্রিতে গান করে না; কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহারাও রাত্রি-গায়ক হইয়া থাকে।

পশ্চিমাঞ্চলে গোলাপচেসম্ নামে এক প্রকার ছোট পাখী পাওয়া যায়, ইহারাও কিছু কিছু গান করিয়া থাকে। গায়ক পক্ষী যত প্রকার আছে তাহাদের প্রধান প্রধান গুলির বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইতঃপর সারিকা শ্রেণীর পক্ষী সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলা যাইতেছে। এই জাতীয় পক্ষীর মধ্যে ময়না, গ্রাম্য সালিক, গাঙ্গ সালিক, ঝুটে ময়না, গুয়ে সালিক, পাবই (দুই জাতীয়) বিশেষ বিখ্যাত। এই গুলির প্রায় সকলই স্ফুটবাক্ (মনুষ্যের ও অন্যান্য স্বর স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে)। ইহাদের প্রায় সকলগুলিই ফল ও কীটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাবক হইতে প্রতিপালন করিলে ময়না ব্যতীত আর সমস্ত গুলিই বেশ পোষ মানে। হল্‌দে পাখী (বেনেবৌ) অতি সুন্দর, ইহারাও সারিকা শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

শুক জাতীয় পক্ষীর মধ্যে, ময়না, চন্দনা, টিয়া, সবেদী টিয়া (শিকু), গেঁড়া উল্লেখ যোগ্য। ইহারাও মনুষ্যের স্বর স্পষ্টভাবে অনুকরণ করিতে পারে। লট্‌কন নামে অতি ক্ষুদ্রকায় শুক জাতীয় পক্ষী অতি রমণীয়। অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা ও আফ্রিকা হইতে কাকাতুয়া, চীয়েমন্, লালমন মুরী প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর সুন্দর শুক জাতীয় পক্ষী ভারতবর্ষে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। ইহাদের বর্ণ বিন্যাস এত মনোরম যে, দেখিলে বিমোহিত ও বিস্মিত হইতে হয়। এই সমস্ত পক্ষীর বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত

করা অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; অতএব এ সম্বন্ধে প্রয়াস করা হইল না।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বুলবুল পাখী বর্ত্তমান। এই জাতীয় ৫।৭ প্রকার পাখী আছে, ইহারা দেখিতে সুশ্রী। বুলবুলের যুদ্ধ দর্শনীয় বটে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বুলবুলের যুদ্ধ বিলাসরূপে প্রচলিত আছে। আরণ্য পাখী ধৃত করিলে ৫।৭ দিন মধ্যেই পোষ মানে। তখন দুইটীকে অভুক্তাবস্থায় রাখিয়া উভয়ের মধ্যে আহার্য্য দিলেই পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের কোমরে সূত্রাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, ইহাকে প্রচলিত ভাষায় পেটি বাঁধা বলা হয়।

ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কাঠঠোকরা এবং হুপো নামক এক প্রকার সুন্দর পাখী আছে, ইহাদের বর্ণ অতি বিচিত্র। মাছ রাঙ্গা ভারতবর্ষে অনেক প্রকার আছে, সমস্তগুলির বর্ণনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুবৃহৎ হইবে।

গারো হীলে এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশে ধনেশ নামক এক প্রকার বৃহৎ চঞ্চুযুক্ত পক্ষী আছে। উড়িবার সময় ইহাদের পক্ষ-বিধূনন শব্দ বহু দূর হইতে শ্রুতিগোচর হয়। শাবক উৎপাদন সময়ে এই পক্ষীর স্ত্রী জাতীয়টী নীড়ে এক প্রকার কয়েদীর মত বাস করে। কুলায়ের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার আবরণ থাকে এবং একটী মাত্র ছিদ্র থাকে, ঐ রন্ধ্র পথে পুং জাতীয় পাখীটী স্ত্রীর মুখে আহার্য্য দান করে। তাহা সে নিজে আহার করে এবং শাবকগুলিকেও আহার্য্য দান করে। শাবক বড় হইলে বাসা ভগ্ন করিয়া দেয়। বানর প্রভৃতির উৎপাত নিবারণ করার জন্য নীড়ের নিম্নে ভূতলে নানা প্রকার কণ্টকযুক্ত ছোট ছোট বৃক্ষ শাখা বিকীর্ণ করিয়া রাখে। ইহা অতি বিচিত্র ব্যাপার বটে। নিবিষ্টচিত্তে অনুসন্ধান করিলে ভগবানের রচনায় কত প্রকার অদ্ভুত রহস্য আছে তাহা কে বলিতে পারে।

বসন্ত নামে দুই প্রকার পক্ষী আছে, আমাদের দেশে ইহাকে ভগদন্ত পাখী বলে। ইহাদের বর্ণ হরিৎ ও মস্তকের কিয়দংশ ও গলদেশ রক্ত ও হরিদ্রাবর্ণযুক্ত, ইহাদের স্বর হলুধ্বনির ন্যায়। টুনটুনীর নীড় নির্ম্মাণ প্রণালী বড় বিস্ময়জনক। শকরখোরা ও চাতকের নীড় নির্ম্মাণ প্রণালীও আশ্চর্য্যজনক। ক্ষুদ্রকায় অনেক পক্ষীর নীড়ই সুন্দর হয়। পক্ষীর নীড় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হয়। টুনটুনি, ও রবিণ জাতীয় ক্ষুদ্র পাখী অনেক আছে, সমস্তের উল্লেখ এক প্রকার অসম্ভব। Fly Catcher (টাকুয়া চোরা) নামক এক প্রকার হরিৎ বর্ণ ছোট পাখী আছে, ইহাদের চঞ্চু দীর্ঘ এবং পদদ্বয় ক্ষুদ্র, এই জাতীয় পক্ষীর মধ্যে সা বুলবুল উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পুচ্ছ সুদীর্ঘ এবং রমণীয়, পাখীটী ছোট। কাক জাতীয় পক্ষী অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ অতি রমণীয়, এই পাখীটী হয়ত অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ফিঙ্গে জাতীয় ২।৩ প্রকার পক্ষী আছে, ইহারা ক্ষুদ্রকায় হইলেও বড় বড় পাখীগুলি ইহাদের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে। ছোট জাতীয় ফিঙ্গেগুলির স্বর বড় মিষ্ট, এই জাতীয় পক্ষী অতি প্রত্যূষে ডাকিতে আরম্ভ করে।

খঞ্জন পাখী অতি সুন্দর, ইহাদের গতি বড় দ্রুত ও সুন্দর, সংস্কৃত কবিগণ খঞ্জন পাখীর অনেক বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার চঞ্চল গতির সহিত রমণীর চক্ষুর চটুলতার উপমা দিয়াছেন। এই পাখীগুলি সাময়িক অর্থাৎ Migratory। হাঁড়িচাঁচা নামক এক প্রকার বিচিত্র [illegible] দীর্ঘপুচ্ছ পাখী আছে, ময়মনসিংহ [illegible] ইহাকে [illegible]

কেচিয়া বলে। ইহাদের স্বর কিছু কর্কশ, কিন্তু মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে পারে। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীর অণ্ড ও শাবক নষ্ট করিতে বড়ই পটু।

কুথয়া নামক এক প্রকার বড় পাখী আছে, উহারা বেশি উড়িতে পারে না, ঝোপের মধ্যে বাস করে এবং কুহুকুহু রবে বনভূমি মুখরিত করে।

গারো হীলে রাজা পাখী (কানাইয়া) নামে এক প্রকার ছোট পাখী আছে, এগুলির পুংটীর বর্ণ গাঢ় লাল এবং পৃষ্ঠদেশ ও মস্তক কৃষ্ণবর্ণ, স্ত্রীজাতীয় পাখীগুলি পীতাভ। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, এক এক দলে ১০।১২টী স্ত্রী জাতীয় এবং একটী পুং জাতীয় পাখী থাকে।

সাত ভেয়ে (ছাতারে) পাখীও দলবদ্ধাবস্থায় থাকে। ইহারা বড় বেশি উড়িতে পারে না। পাপীয়া ইহাদের নীড়ে অণ্ড প্রসব করে, অতএব পাপীয়া পরভৃৎ, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

পারাবত জাতীয় পক্ষীর মধ্যে বন্য কপোত, হরিয়েল, ৪।৫ প্রকার ঘুঘু এবং হুড়মা উল্লেখযোগ্য। কুমড়ী নামক এক প্রকার গৃহপালিত ঘুঘু আছে, সেগুলির স্বর মিষ্ট ও কাতর। ইহারা পিঞ্জরাবস্থায়ও শাবক উৎপন্ন করে।

ভূলেখী পক্ষীর মধ্যে ময়ুর, দ্রোণ, তিত্তির, লাব, চকোর, বটের, বন্য কুক্কুট প্রভৃতি প্রধান। ময়ূরের বিচিত্র বর্ণবিন্যাস দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহার কলাপে ইন্দ্রধনুর বর্ণ প্রতিফলিত হইয়া আছে, দেখিলেও নয়ন ক্লান্ত হয় না। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—"What if we wear the richest Ves[illegible] and flies are better [illegible] পাখাগুলি প্রায়ই যুদ্ধপ্রিয়। কুক্কুট, তিত্তির এবং বটেরের যুদ্ধ দর্শনীয় বটে। পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকার যুদ্ধ বিশেষ প্রচলিত আছে। এই জাতীয় পাখীগুলি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া স্নান সুখ অনুভব করে। দ্রোণ পাখী গারো হীলে আছে, ইহাদের পুংপক্ষীর বর্ণ নীলাভ কৃষ্ণ এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে গাঢ় রক্তবর্ণ। বন্য কুক্কুট, দ্রোণ, ময়ুর প্রভৃতি প্রায় সকল গুলিই পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে বিচরণ করে।

চটক জাতীয় পক্ষী অনেক প্রকার। গ্রাম্য চড়ুই, বাবুই ২।৩ প্রকার পোড়াচড়া, গুয়াচড়া, রামগয়রা প্রভৃতিই প্রধান, বাবুয়ের নীড় নির্ম্মাণ কৌশল বিস্ময়জনক। এই পাখীকে অনেক ক্রীড়া শিক্ষা দিয়া দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করা যায়। শিক্ষা প্রণালীর বিষয় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার অস্ত অবকাশ নাই। বিদেশীয় কেনেরী এই জাতীয় এবং ইহারা অতি সুগায়ক। কেনেরী নানাজাতীয় আছে, বিস্তৃত বিবরণ ইংরেজী গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

শ্বাপদ পক্ষীর (শ্যেন, চিল, কুরুবক, পেচক, শকুনী, গৃধিনী) বিষয় আজ আর কিছু বলিব না। এই শ্রেণীতে কাকহাটী (লটোরা) নামক এক প্রকার অতি সুন্দর ছোট পাখী আছে, ইহারা ছোট পাখী বধ করিয়া ভক্ষণ করে এবং কীটাদিও ভোজন করে, ইহাদের স্বর মিষ্ট এবং সুশ্রাব্য। জলচর হংস, সারস, বক কুমষ্টিক, ডাহুক কায়েম পিঁকি, রামশালিক, প্রভৃতিও অদ্যকার প্রবন্ধে পরিত্যক্ত হইল।

এতাবতা যে সমস্ত পক্ষী সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল, এতদ্ব্যতীত, আরও যে কত প্রকার পক্ষী আছে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব; অন্ততঃ, মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহা সম্ভবে না। শিক্ষিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক পক্ষিতত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। ফলতঃ পক্ষিতত্ত্ব

আলোচনায় যে বিমল আনন্দ অনুভূত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

পক্ষি-প্রতিপালন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যথা :—

(১) বৈজিকতত্ব, (২) দেহতত্ব, (৩) প্রাপ্তি স্থান, (৪) নীড় নির্ম্মাণ স্থান ও প্রণালী, (৫) অণ্ডপ্রসব কাল ও সংখ্যা (৬) শাবকের সংখ্যা প্রভৃতি, (৭) পক্ষী ধৃত করা, (৮) শাবক সংগ্রহ ও প্রতিপালন, (৯) পিঞ্জর প্রভৃতি নির্ম্মাণ প্রণালী (১০) স্নান আহার ও পানীয় প্রভৃতি, (১১) রোগ ও চিকিৎসা, (১২) প্রশংসনীয় গুণাবলী, (১৩) ব্যবসায়ী কর্তৃক বিক্রয়ের স্থান প্রভৃতি বিষয়, (১৪) অন্যান্য আবশ্যকীয় মন্তব্য। মোটামুটি ভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে আলোচিত হইলেই পক্ষি-প্রতিপালন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে পারে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বিহঙ্গমকুল মুক্তাকাশে স্বাধীন ভাবে মনের আনন্দে উড়িয়া বেড়ায় তাহাদিগকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করতঃ পিঞ্জরের ক্ষুদ্রায়তনে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। সত্য বটে একথা আংশিকরূপে যথার্থ, কিন্তু এই ভাবে বিচার করিলে আরণ্য হস্তী প্রভৃতির স্বাধীনতা হরণ করতঃ আলানে নিবদ্ধ করিয়া মানবের ব্যবহারে আনয়ন করা এবং অশ্ব প্রভৃতিকে খলিন যুক্ত করতঃ মানুষের কার্য্যে নিয়োগ করাও নিষ্ঠুরতা এবং গো মহিষ প্রভৃতিকে শকট বাহন ও হল চালান কার্য্যে নিযুক্ত করাও অবৈধ, এতদুত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে গো, অশ্ব হস্তী প্রভৃতি দ্বারা মানবের বহু প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হইতেছে, পক্ষী দ্বারা তাহার কিছুই হয় না। একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। মানুষের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট না হইলে সে অতি কঠোরহৃদয় হয় এবং তাহার অকরণীয় কিছুই থাকে না। চিত্তের প্রফুল্লতা সাধন একান্ত আবশ্যক, এতদুদ্দেশ্যে পশু পক্ষী প্রতিপালন, চিত্রবিদ্যার অনুশীলন, কাব্যাদি পাঠ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা নিতান্ত কর্ত্তব্য। জগতে এমন কোনও কার্য্যই নাই যাহা নিরবচ্ছিন্ন দোষ সংস্রবশূন্য; সকল কার্য্যেরই দুইটা দিক্ আছে। তবে পক্ষী পালনে কতকটা দোষ থাকিলেও ইহা একবারে পরিহার্য্য কেন হইবে আমি বুঝিতে অক্ষম। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যাহারা পশু পক্ষীর প্রতি দয়া শূন্য এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালনের নিয়ম অবগত নহে, তাহারা যেন কদাপি পক্ষী প্রভৃতি পালনের প্রয়াস না করে। ফলতঃ কোনও কার্য্যে আগ্রহ ও স্পৃহা না থাকিলে সে কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে না ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সভ্যতার সৃষ্টি হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম্য ও আরণ্য পশু পক্ষী পালন প্রথা যে প্রচলিত আছে, ইতিহাস ইহার সাক্ষী দিতেছে।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, অনেক শিকারী ব্যক্তি এবং পক্ষি-ব্যবসায়িগণ অযথা পক্ষী বধ ও ধৃত প্রভৃতি করিয়া এবং শাবকাদি নষ্ট করিয়া বড়ই নিষ্ঠুরতা ও অনিষ্ট করিয়া থাকে। এতাদৃশ অনিষ্ট নিবারণ জন্য বিশিষ্ট রাজবিধি প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে Game preservation act প্রচলিত আছে, এবং জার্ম্মেনীতে Nightangale রক্ষার জন্য কঠোর রাজবিধি প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও ঐ সকল বিধির অনুকরণে স্থল বিশেষে [illegible] পরিবর্দ্ধন করতঃ, রাজবিধি প্র[illegible] [illegible] করি;

করিয়াছেন। সম্রাটের ইচ্ছা হইলে কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে যমুনার অপর পারে লইয়া যান এবং সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় আগ্রাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পীড়িত বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এরূপ ঘটিবার কারণ কি? বোধ হয় তাহারা খসরুকে রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, সেই জন্য খসরু সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। এই কথা বলিয়া জনৈক ভৃত্যের সাহায্যে তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এমন সময় মিথ্যার অবতার স্বরূপ মির্জা আজিজ কোকা পিতাকে এইরূপ অবস্থায় শায়িত দেখিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, খসরুর সম্বন্ধে জাঁহাপনার কি আজ্ঞা হয়।

আজিজের প্রতি আকবরের উক্তি।

আজিজের এই বাক্য শ্রবণে, পীড়িত বাদশাহ উত্তর করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে, তিনিই কেবল একমাত্র রাজা। আমার মনে সহস্র চিন্তা রহিয়াছে। তোমাদের কথায় বোধ হইতেছে যেন তোমরা আমাকে মৃত্যুর করাল কবলে পরিত্যাগ করিয়াছ। তথাচ এরূপ হইতে পারে আমি আরও কিছুদিন বাঁচিতে পারি। যাহা হউক আমি এলাহাবাদে সেলিমের যেরূপ যুদ্ধনৈপুণ্য, রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং রাজকার্য্য পরিচালনের অন্যান্য আবশ্যক গুণসকল দেখিয়াছি, তাহা কি ভুলিতে পারিব? এমন কোন কারণ দেখিতেছি না যাহাতে তাহার প্রতি আমার হৃদয়ের ভালবাসা এবং অপত্য স্নেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও কমিয়া যাইতে পারে। যদি কোন কু-অভিসন্ধিপরায়ণ লোকের মন্ত্রণাতে পড়িয়া, সে পুত্রোচিত কর্ত্তব্য নষ্ট করিয়া থাকে, [illegible] কি সে [illegible] জ্যেষ্ঠ পুত্র [illegible] কে [illegible]াধিকার [illegible] কি এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নয়? আমাদের বংশাগত নিয়মানুসারে সেলিমই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ কখনও বাদশাহের পদ লাভ করিতে পারে না। খসরুকে আমি বিশাল বঙ্গদেশ সমর্পণ করিব।"

সেলিমের সহিত আমীরগণের সাক্ষাৎ।

পিতার নিকট হইতে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভগ্ন-মনোরথ ষড়যন্ত্রকারী আমীরগণ দলে দলে আমার নিকট আসিতে লাগিলেন, এমন কি আমার ঘরে তিল ধারণের স্থান রহিল না। তাঁহারা মেরিরেল সদর জেহান, মীর জুম্মাউদ্দিন, হোসেনি আজু এবং এদি খোজার দ্বারা আমাকে জানাইলেন যে, "আমাদের বাদশা আপনার পুত্র খসরুর পদোন্নতি করিয়া জাঁহাপনাকে "সা-ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। জাঁহাপনার নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আপনি তাঁহার প্রতি পিতৃ-তুল্য ব্যবহার করিবেন।" আমি তাঁহা-দিগকে এই উত্তর দিলাম যে, "পিতা সম্ভাষণ করিবার সময় আমাকে "বাবা"* ভিন্ন অন্য কোন নামের দ্বারা ডাকিতেন না। আমি যে তোমাদের ভবিষ্যৎ বাদশা, তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ পুত্র কখনও পিতা বা ভাই হইতে পারে না।"

এই উত্তরে আমীরগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহারা উত্তরটী সন্তোষজনক বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের দুরভিসন্ধি ও কুমন্ত্রণার জন্য অনু-তপ্ত হইয়া আমার নিকট শপথ করিলেন যে, আর তাঁহারা আমার প্রতিকূলাচরণ করিবেন না এবং বন্ধুতা ও অনুরাগের পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন। মির্জা কোকা (খোনে আজেম) কেবল আমার নিকট আসিলেন

* পিতা পুত্রকে "বাবা" বলিয়া ডাকেন। "বাবা" কথাটী স্নেহজ্ঞাপক। ইহা দ্বারা পিতা বুঝায় না।

না। তিনি আমাকে গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, তিনি আমাদের বংশে বহুদিন হইতে অনেক উপকার করিয়া আসিতেছেন সেইজন্যই আমি তাঁহার সমস্ত দোষ উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। মানব মাত্রেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইলে নিজ দোষ বর্জ্জন করিয়া থাকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে,আমাকে কখনও দোষের জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে না। আমি খানে আজেমকে কতবার যে হৃদয়ের গোপনীয় সংবাদ বলিয়াছি, তাঁহাকে প্রীতি, স্বাধীনতা ও অনুগ্রহ দেখাইয়াছি, তাহা আর কি বলিব। আমি না যাইলে যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলাম।

সেলিম কর্ত্তৃক আমীরগণকে
পুরস্কার বিতরণ।

পরবর্ত্তী ১৮ই জামোদ শনিবার* বোখারাবাসী সেখ্ ফেরিদ অভিনন্দন দিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আমার স্বার্থের জন্য যেরূপ অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে রাজনীতি ও সামরিক বিভাগের প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে তরবারি, অশ্ব, অশ্বাভরণ, এবং এক লক্ষ মুদ্রা দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলাম। তাঁহার পর রাজা মানসিংহ আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিরীচ (তরবারিবিশেষ) কটীবন্ধ, অশ্ব ও অন্যান্য আসবাব প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলাম। তৎপর দিন খসরুকে রাজা মানসিংহ ও মির্জ্জা আজিজ্ কোকার সমভিব্যাহারে আমার সম্মুখে আসিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলাম মির্জা কোকা খসরুকে বাঙ্গালা প্রদেশের অধিকার ও তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য পেস্তা মহম্মদ তোগলক নামক এক ব্যক্তিকে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

খসরুর ন্যায় উচ্চাভিলাষী নীচপ্রকৃতি সম্পন্ন অকৃতজ্ঞ পুত্রকে আমার নিকট হইতে বহুদূরে রাখা যদিও আমারও অনুচরবর্গের অভিপ্রেত নয়, তথাচ আমি তাহার আকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ পূরণ করিতে সাহস করিলাম। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, সে আগ্রার প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়া যমুনা পার হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম।

সেলিমের সহিত মৃত্যুশয্যায়
আকবরের সাক্ষাৎ।

এইরূপ উদ্বেগপূর্ণ সংশয়ে পড়িয়া, পিতা তাঁহার একটী পরিচ্ছদ ও স্বীয় মস্তক হইতে পাগড়ি উন্মোচন করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তিনি আমাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়াই আমি প্রেরিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিনীতভাবে রাজপ্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ৮ই মঙ্গলবার পিতা অতিশয় কষ্টের সহিত নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ অবস্থাতে তিনি আমীরগণকে তাঁহার নিকট আনাইবার জন্য একজন লোক পাঠাইতে বলিলেন। কারণ যাহারা এতকাল ধরিয়া নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া, তাঁহার গৌরবজনক কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির সহিত আমার কোনরূপ মনোমালিন্য থাকে, এরূপ

* আকবর ১০ই বুধবারে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন, নচেৎ এই দিন ৫ই শনিবার হইত।

তাঁহার ইচ্ছা নহে। পিতার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আমীরগণকে বাদশাহের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে আনিবার নিমিত্ত আমি খোজাগুলিকে পাঠাইলাম।

আকবরের শেষ জীবনে সেলিম।

ইহার পরেই আমি বুঝিতে পারিলাম, পিতার জীবনের অন্তিম সময় আসিয়াছে! এক্ষণে পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য করা উচিত। গদগদশ্রুলোচনে আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইলাম এবং তাঁহার পাদমূলে আমার মস্তক বিন্যস্ত করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মুমূর্ষু বাদশাহ আমার সৌভাগ্যের শুভচিহ্নস্বরূপ তাঁহার প্রিয় তরবারি ফাতাউলমুলক্‌কে * দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার সম্মুখে ইহা কটিদেশে বন্ধন কর।" আদেশ পালন করিয়া পুনরায় তাঁহার চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া আমার তাৎকালীন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। দুঃখে অভিভূত হইয়া আমি এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, নিশ্বাস গ্রহণ করিতেও আমার কষ্টবোধ হইতে লাগিল।

আকবরের মৃত্যু সময়ে সেলিমের প্রতি উপদেশ।

বুধবার রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় পিতার প্রাণবায়ু স্বর্গে চলিয়া গেল। কল্মা শিহদেৎ পাঠ† করিবার জন্য মেরিয়েন সদর জেহানকে তাঁহার নিকট আনিবার নিমিত্ত তিনি আমাকে পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আশা করিয়াছিলেন পরমায়ুদাতা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাঁহার জীবন আর কিছু দিনের জন্য রক্ষা করিতে পারেন। এই আশায় তিনি কল্মাপাঠ বন্ধ রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মেরিয়েন তথায় উপস্থিত হইলে পর জানু পাতিয়া আকবরের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কল্মা পাঠ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে পিতা আমাকে নিকটে যাইতে বলিলেন এবং হস্ত দ্বারা আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পুত্র! এই আমার শেষ বিদায়. এই পৃথিবীতে আমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। আমার অন্তঃপুরচারিণী নিরাশ্রয়া বেগমদিগকে রক্ষা করিও, আমি তাহাদিগকে যেরূপ খোরপোষ স্বরূপ অর্থদান করিতাম, তুমিও তাহা প্রদান করিবে। যদিও আমার মৃত্যুতে, তোমাকে অনেক ভার বহন করিতে হইবে, তথাপি আমার কথা যেন বিস্মৃত হইও না। তুমি আমার নিকট অনেক শপথ ও অঙ্গীকার করিয়াছ। যাহা শপথ করিয়াছ, তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হইও না—অঙ্গীকার ভুলিও না। জানিও তোমার উপর আমি অনেক ভার ন্যস্ত করিলাম। সেগুলি ক্ষুদ্রই হউক্ আর বৃহৎ হউক, কখনও ভুলিও না। যুদ্ধে কিরূপ কার্য্যের দ্বারা আমি গৌরব লাভ করিয়াছি, তাহা মনে রাখিও। যে বদান্যতার অনুশীলনে আমি মুক্তহস্তে এত অর্থদান করিয়াছি, তাহা ভুলিও না। আমার মৃত্যুর পর অনুগত দাস দাসী ও আশ্রিতগণকে ভুলিও না, আমার অনুরূপ হইয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে। পীড়িত ও অভাবযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কষ্টের সময় সাহায্য করিও। আমি যে সমস্ত কথা বলিলাম তাহার প্রত্যেকটি কল্যাণকর—সমস্তগুলিকেই অন্তরে লিখিয়া রাখ এবং পুনরায় বলিতেছি আমাকে ও আমার বাক্যগুলকে বিস্মৃত হইও না।"

এই সমস্ত উপদেশ পালন করিতে অঙ্গীকার করাইয়া তিনি সদর জেহানকে

* সাম্রাজ্যে জয়চিহ্নস্বরূপ।

† মুসলমানদের নিয়ম বা বিধান পুস্তক—"এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ ঈশ্বর নাই ইত্যাদি—একেশ্বর-বাদিত্ব'

পুনরায় কল্মা পড়িতে বলিলেন এবং নিজেও স্পষ্টভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে তাহার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সদর জেহানকে তাঁহার উপাধানের নিকট যাইয়া কোরাণের অপর একটী অধ্যায় সৌরানিস্ এবং আদিলার ভজনা পাঠ করিতে বলিলেন, যাহাতে মৃত্যু কালে তাঁহার প্রাণবায়ু বিনাকষ্টে মুক্তপথে প্রয়াণ করিতে পারে। সদর জেহান বাদশাহের অভিলাষ অনুসারে সৌরানিস্ পাঠ শেষ করিয়া যেমন আদিলের উপাসনা শেষ করিতে যাইবেন, সেই সময় মহানুভব ধর্ম্মপরায়ণ বাদশাহের প্রাণবায়ু নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট চলিয়া গেল। মৃত্যুকালে তাঁহার কোন যন্ত্রণা লক্ষিত হয় নাই, কেবল মাত্র নয়নকোণে এক বিন্দু অশ্রু দৃষ্ট হইল।

ভারতী-মঙ্গল কাব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

ক্ষণমাত্র নিশাচরে কৈল শরজাল।
পরিপূর্ণ কৈল বাণে আকাশ পাতাল ॥
বায়ু বাণ ছাড়ে রাম নিজ বাহুবলে।
শরজাল উড়াইয়া অতি দূরে ফেলে ॥
পুনঃ ছাড়ে রাম এই অবসর পাইয়া।
রাবণের দিব্যধনু ফেলিলা কাটিয়া ॥
অতি তূর্ণ আকর্ণ পূরিয়া পুন হানে।
রথধ্বজ জর্জ্জর করিল খরবাণে ॥
মহাকোপে হানে প্রভু পঞ্চশত শর,
মোহ পাইয়া রথোপরে পড়ে নিশাচর।
ক্ষণেকে সম্বিত পায়ে উঠে ধনু ধরি।
মুষ্টিচাপে চাপি হানে সিংহনাদ পূরি ॥
বিংশতি নারাচ হানে রাঘবের বুকে।
মূর্চ্ছান্বিত হৈলা হরি বাক্য নাহি মুখে
দণ্ডমাত্র স্থির হইয়া উঠে গদাধর।
আরক্ত লোচন কোপে কম্পিত অধর ॥
অতিদ্রুত হানে তীক্ষ্ণ চতুঃষষ্টি বাণে ॥
সারথি স্যন্দন কেতু অবিদিতে হানে ॥
সম্বরি রামের বাণ নিশাচরনাথে।
অতি কোপে রাঘবকে হানয়ে নির্ঘাতে ॥
শক্তি নিক্ষেপিয়া দুয়ে করয়ে সমর।
তুলনা দিবার, নাই ত্রিলোক ভিতর ॥
পঞ্চদশ অহক্ষণ গেল হেন মতে।
পরস্পর কেহ কাকে নারে পরাজিতে ॥
তৎকালে রাবণে মহা করিল সংগ্রাম।
বাণঘাতে জর্জ্জরিত হইলা শ্রীরাম ॥
বিষম সঙ্কট দেখি অম্বুজলোচনে।
মন্ত্র জপি ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়ে ধনুর্গুণে ॥
আকর্ণ পূরিয়া প্রভু ছাড়ে সেই শর।
বসুমতী কাঁপে ঘন কম্পিত সাগর ॥
সূর্য্য সম তেজঃ ধরি চলিল আকাশে ॥
রাবণের বক্ষে পশি পৃষ্ঠদেশে খসে ॥
দেহত্যাগ করি বীর পড়িল ভূমিতে।
ত্রিভুবন ভরি সব হৈল আনন্দিতে ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবে রামের উপরে।
রামপদে ভূপানুজে ভণে যোড়করে ॥

ত্রিপদী।

মরিল রাবণ বীর, ধরণী হইল স্থির,
হৃষ্টমন দেবতা সকল।
রঘুনাথ বিভীষণ, লক্ষ্মণাদি হর্ষ মন,
আনন্দিত যত কপিবল ॥
বিভীষণে ডাকি আনি, রাঘব বলিলা বাণী,
যাও মিত্র সীতাকে আনিতে।

ইহা শুনি বিভীষণে, হনু সনে হর্ষ মনে,
গেলা শীঘ্র অশোক বনেতে ॥
সীতাকে প্রণাম করি, রাক্ষসের অধিকারী
বলে বাণী হৈয়া যোড়কর।
শুন বাক্য সীতা সতী, যাইবে তুমি শীঘ্র গতি,
এই আজ্ঞা কৈল গদাধর ॥
শুনি সীতা কুতুহলে, বিশিষ্ট বিমানে চলে,
উত্তরিলা রাম সন্নিধানে।
জানকী পরীক্ষা করি, রঘুবংশ অধিকারী,
দেশেতে চলিলা রঙ্গমনে ॥
বিভীষণে রাজা করি, সসৈন্য সহিতে হরি,
গমন করিলা অযোধ্যাতে।
দূত মুখে বার্ত্তা শুনি, কৌশল্যা সুমিত্রারাণী,
রাম কাছে চলে আনন্দিতে ॥
ভরত অনুজ সাথে, রামকে দেখিয়া পথে
কৈল নতি অবনী লোটাইয়া।
চারি ভ্রাতা কোলাকোলি, হৈয়া বড় কুতুহলী,
পুরে প্রবেশিলা হর্ষ হৈয়া ॥
করি লগ্ন শুভক্ষণ, রাজা হৈলা নারায়ণ,
ধন্য হৈল সকল সংসার।
হর্ষযুক্ত প্রজা সব, পুরী মনে মহোৎসব,
দেবগণে হরিষ অপার ॥
সখী স্থানে হেন কথা, কহে সুযজ্ঞের সুতা,
হেন মত শুনেছি পুরাণে।
তেন মত মায়া করি, কিবা কোন দুরাচারী,
ভাণ্ডিবারে আইল মোর স্থানে ॥
তুলসী এমত জানি, ধ্যান করি থাকি থানি
সত্য জানি এই শঙ্খচূড়।
নিষ্কর্ষ জানিয়া মনে, উঠি রামা সেইক্ষণে,
নতি করি হৈল করযোড় ॥
ভৃঙ্গারে সলিল আনি, চরণ পাখালে ধনী
বসাইল উত্তম আসনে।
অধিক সুসজ্জ হৈয়া তাম্বুল চন্দন লৈয়া,
অর্ঘ্য দিল পতির চরণে ॥
শঙ্খচূড় হর্ষ মনে, তুলসী কামিনী সনে,
সুখে তথা বঞ্চে বিভাবরী।
প্রাতে উঠি দৈত্যনাথে, রমণী লইয়া সাথে,
আনন্দিতে চলে নিজপুরী ॥
অনুব্রজি(১) অনুচরে, লইয়া চলিল পুরে,
নানা বাদ্য বাজে গুরুতর।
তুলসী বিমানে চড়ে, ঘন জয়ধ্বনি পাড়ে,
দৈত্য চড়ে রথের উপর ॥
পরম কৌতুক মনে, বেষ্টিত বাহিনীগণে,
মাধুর্য্য গমনে যায় চলি।
পঞ্চ শব্দ বাদ্যধ্বনি, শ্রবণে নাহিক শুনি,
মহাশব্দে বাজে করতালী ॥
শুভক্ষণে দৈত্যরায়, আপন ভবনে যায়,
তুলসী গেলেন অন্তঃপুরে।
আসিয়া রমণীগণ, করি বহু নির্ম্মঞ্ছন, (২)
শুভ লগ্নে বসাইল ঘরে ॥
দৈত্যকে আনিয়া পরে, কুলাচার কর্ম্ম করে,
বাস গৃহে রহিলা দম্পতী।
সবে উল্লাসিত হৈয়া, দ্বারেতে কপাট দিয়া,
ঘরে গেল সকল যুবতী ॥
শুন বাক্য সরস্বতি! নাহি মোর অন্য গতি,
তোমার চরণ মাত্র সার।
মহা অঘ(৩)সাগরেতে, মোকে দয়া করি চিতে
পার কর হৈয়া কর্ণধার ॥
জপি তোকে দিবা রাতি, বর্ণিতে তোমার স্তুতি
কৃপা করি দেহ বল স্বর।
রাগ তাল নাহি জানি, দয়া কর ঠাকুরাণী
ভণে রাজসিংহ ধরামর ॥

পয়ার।

হেন কালে বিধু অস্ত রজনী প্রভাত।
হরি স্মরি শয্যা ত্যজি, উঠে দৈত্যনাথ ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করি সমাপন।
সমুচিত কালে করে শয়ন ভোজন ॥
হেন মতে নানা সুখে আছে দৈত্যপতি।
অপার হরিষ মনে তুলসী সংহতি ॥
ইতিমধ্যে ভার্গব আচার্য্য একদিনে।
আসি উত্তরিলা শঙ্খ দৈত্যের ভবনে ॥

(১) অগ্রসর হইয়া। (২) আরতি। (৩) পাপ।

আচার্য্যের আগমন শুনি দৈত্যনাথ।
দ্রুত নতি করি উঠে আচার্য্য সাক্ষাৎ ॥
নিজ শিরে লৈয়া আনি দিল সিংহাসন।
ভৃঙ্গারে আনিয়া-বারি পাখালে চরণ ॥
আসনে বসিলা দ্বিজ পরম কৌতুকে।
গলে বস্ত্র শঙ্খচূড় রহিল সম্মুখে ॥
শুক্র আসিছেন হেন শুনিয়া ভারতী,
অন্তঃপুর হৈতে আইল তুলসী যুবতী ॥
মুনি দেখি কৈল নতি ভক্তি ভাব করি।
কৃতাঞ্জলি করি অগ্রে তিষ্ঠিল সুন্দরী ॥
নানা মতে স্তুতি ভক্তি করিল দম্পতি।
দেখিয়া আচার্য্য অতি তুষ্ট হৈলা মতি ॥
শঙ্খচূড় প্রতি শুক্রে কৃপা করি বলে।
শুচি হৈয়া দৈত্যপতি আইসহ সকালে ॥
ইহা শুনি হরষিত হৈয়া দৈত্যপতি।
স্নান করি শুচি হৈয়া আইল শীঘ্রগতি ॥
যোড় হাতে রহে আসি শুক্রের সম্মুখে।
কৃপা করি মুনি কৃষ্ণ মন্ত্র দিলা তাকে ॥
রাধিকা কবচ দিলা করিতে ধারণ।
ইহা পায়া শঙ্খচূড় অতি হর্ষ মন ॥
অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য হৈল শুক্রের প্রসাদে।
মহা সুখে নানা রঙ্গে আছয়ে প্রমোদে ॥
কি কব ধনের সীমা লক্ষ্মী যার ঘরে।
ত্রিভুবন জয় কৈল শঙ্খ দৈত্যবরে ॥
বিচারি দেবতাগণে যার লাগ পায়।
মহা বিড়ম্বনা করি মারিয়া খেদায় ॥
নলিনীদলেতে যেন স্থির নহে জল।
তেমনই নির্জ্জরগণ (১) হৈলা টলমল ॥
সকল অমর মিলি করিয়া যুকতি।
ইন্দ্রের নিকট যাইয়া হৈলা উপস্থিতি ॥
গোচরে বিবুধগণ (২) হৈয়া যোড় কর।
মন দিয়া দুঃখ বাণী পুরন্দর (৩) ॥
শঙ্খচূড় নামে দৈত্য হৈয়া বলবান।
ধন জন লৈল কাড়ি অবশিষ্ট প্রাণ ॥

(১) দেবতা। (২) দেবতা। (৩) ইন্দ্র।

দুর্ব্বলের বল রাজা যে দয় বিহিত।
আপনার প্রজা রক্ষা করিতে উচিত ॥
শঙ্খের তাড়নে হেন মত লয় মনে।
ভিক্ষা মাগি খাই যাইয়া মরত ভবনে ॥
স্বর্গে হেন স্থান নাই পলায়ন করি।
বিচারিয়া দৈত্যদূতে লৈয়া যায় ধরি ॥
ধীবরে নবীন জলে যেন ধরে ঝষ (১)।
শঙ্খচূড়ে তাড়ি তেন ধরে সুমনস (২) ॥
দানবের মার্জ্জ (৩) হয়া জীবনে কি কাজ।
ইহার উপায় শীঘ্র চিন্ত দেবরাজ ॥
শুনিয়া এমত বাণী বাসব (৪) লজ্জিত।
মাতলিকে কহে রথ সাজাও ত্বরিত ॥
সুসজ্জ হইয়া আইল অমরবাহিনী (৫)।
বীরধর্ম্ম ভাবি কুপি করে শঙ্খধ্বনি ॥
সারথি পুষ্পক রথ আনে শীঘ্রগতি।
বজ্র হস্তে লৈয়া যানে চড়ে বলারাতি (৬) ॥
যুদ্ধ মনে চলে ইন্দ্র সংহতি বরূথ (৭)।
দৈত্য কাছে দেবরাজে প্রেষে (৮) এক দূত ॥
আজ্ঞা পায়া দেবদূত অতি বেগে চলে।
শঙ্খচূড় নিকটেতে দ্রুত গিয়া মিলে ॥
দেখে সিংহাসনে বসি আছে দৈত্যপতি।
দূত গিয়া কহে তাকে শক্রের (৯) ভারতী ॥
শুন শঙ্খচূড় দৈত্য আমার উত্তর।
তব কাছে মোকে (১০) পাঠাইছে পুরন্দর ॥
জীবনের আশা যদি থাকয় মনেতে।
স্বর্গ ছাড়ি (১১) তূর্ণ তুমি চলহ মরতে ॥
নতু বল আছে হেন যদি জান মনে।
তবে আসি কর রণ শচীপতি সনে ॥
এই ত উভয় মত বলিলাম বাণী।
তবে কে নু কর বল শীঘ্র যাই জানি ॥
দূতের এমত ভাষা শুনি দৈত্যরায়।
হবি(১২ যোগে অগ্নি যেন কোপে তেন প্রায় ॥

(১) মৎস্য। (২) দেবতা। (৩) রজক। (৪) ইন্দ্র। (৫) দেবসৈন্য। (৬) ইন্দ্র। (৭) সৈন্যদল। (৮) প্রেরণ করে। (৯) ইন্দ্রের। (১০) আমাকে। (১১) শীঘ্র। (১২) ঘৃত।

কহ যায়া দূত তুমি শক্রের গোচর।
শীঘ্র আসি যথা শঙ্ক করিতে সমর॥
অপসরা সমাজে বসি করে অহঙ্কার।
যদি আসি করে রণ তবে প্রতীকার॥
এই বার্ত্তা লয়ে দূত করিল গমন।
যুদ্ধসজ্জা শঙ্খচূড় করে আয়োজন॥
স্থির হৈয়া থাক মন বাণী পদাম্বুজে।
রাজসিংহ দ্বিজে ভণে ভূপতি অনুজে॥

ত্রিপদী।

তূর্ণ দৈত্যপতি, ডাকয়া সারথি,
বলে অতি কোপ মনে।
করিয়া সত্বর, সাজাইয়া সুন্দর
আন রথ এই ক্ষণে॥
সব সৈন্য স্থানে, কহিবে আপনে,
করি আসে যুদ্ধ সাজ।
করিতে সমর, আসে পুরন্দর
আর নাহি সহে ব্যাজ॥
চলিল সারথি, অতি দ্রুত গতি,
কহে সব চমূ (১) স্থানে।
শুনিয়া সত্বরে, সকল অসুরে,
কুপিয়া চলিল রণে॥
সংহতি বাহিনী, দ্বারে রথ আনি,
রাজাকে জানায় বার্ত্তা।
হাতে শরাসন, করি শুভক্ষণ,
চলিল দানবকর্ত্তা॥
চড়ি রথোপরে, অতি আড়ম্বরে,
লক্ষ লক্ষ সেনা সঙ্গে।
কোপে বেগে ধায়, পতঙ্গম প্রায়,
সমর উৎসব রঙ্গে॥
আসি দুই দলে, এক স্থানে মিলে,
তর্জ্জে গর্জ্জে পরস্পরে।
উভয় বাহিনী, করে হানাহানি,
হৈল যুদ্ধ ঘোরতরে॥
দেবাসুরে রণ, হৈল অখণ্ডন,
তুলনার নাহি স্থান।
প্রাণপণে দোঁহে, মহা যুদ্ধ সহে,
দুই সম বলবান॥
মত্ত দৈত্য সব, নাহি পরাভব,
দেবতা কাতর হৈল।
ইন্দ্রের গোচর, ত্যজিয়া সমর,
প্রাণ লয়া পলাইল॥
দেখি হেন কাজ, কুপি দেবরাজ,
গেলা দৈত্য সন্নিধানে।
প্রচণ্ড প্রতাপে, শর যুড়ি চাপে,
আকর্ণ পূরিয়া হানে॥
দেব দৈত্যনাথে, ধনু লয়া হাতে,
শক্রকে হানয়ে শরে।
অতি কুপি চিত্তে, হানয়ে নির্ঘাতে,
ক্ষণেকে জর্জ্জর করে॥
বজ্র লৈয়া হাতে, ত্রিদশের নাথে
ক্ষেপিলা অরির শিরে।
দৈত্যের উপরে, পড়িল নির্ভরে,
কিছু না ভেদিয়া ফিরে॥
ব্যর্থ হৈল বাণ, ইন্দ্র ম্রিয়মাণ,
পুনি হানে দৃঢ় হাতে।
ক্ষণেকে তাহারে, খণ্ড খণ্ড করে,
শঙ্খচূড় দৈত্যনাথে॥
শঙ্খে হানে পুন, করি শঙ্খধ্বনি,
টানি পঞ্চ শত শরে।
মধ্য বক্ষে পৈশে, পৃষ্ঠ দেশে খসে,
শক্র মূর্চ্ছা রথোপরে॥
দেখিয়া সারথি, ভয় পায়া অতি,
বেগে যায় পলাইয়া।
দেবতার ভঙ্গ, দানবের রঙ্গ,
তাড়ি নেয় খেদাইয়া॥
দৈত্যে জিনি রণ, আনন্দিত মন,
ইন্দ্র হৈল শঙ্খচূড়।
বিধু দিবাকর, অগ্নি জলেশ্বর,
মারিয়া করিল দূর॥
সুসঙ্গ নগর, অতি মনোহর,
দুর্গপুর নাম গ্রাম।
তাহাতে বসতি, অপূর্ব্ব ভূপতি,
কিশোর কেশরী (১) নাম॥
তাহার অনুজে, বাণী পদাম্বুজে,
মজাইয়া নিজ চিত।
রাজ পঞ্চাননে, ভারতী চরণে
রচিল নূতন গীত॥

ক্রমশঃ।

(১) সৈন্য।

(১) সিংহ।

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড। ১৩১৭ সাল, ফাল্গুন। [১১শ সংখ্যা।

সাধু-চরিত।

পওহারী বাবা।

জৌনপুর জেলার অন্তঃপাতী প্রেমাপুর নামক গ্রামে লছমী নারায়ণ ও অযোধ্যানাথ নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠ লছমী নারায়ণ সংসার ত্যাগ করিয়া গাজীপুরের সন্নিহিত কুর্থা নামক গ্রামে বনের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাধন ভজন করিয়া জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। কনিষ্ঠ অযোধ্যানাথের গঙ্গারাম ও হরভজন নামে দুই পুত্র জন্মে। ২য় পুত্র হরভজন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া এক নেত্র বিহীন হন; এক্কারণ মাতা পিতা তাঁহাকে শুক্রাচার্য্য বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিয়দ্দিবস পরে লছমী নারায়ণ পীড়িত হইলে অযোধ্যানাথ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার সেবার জন্য পাঠাইতে চান, কিন্তু জ্যেষ্ঠ শুক্রাচার্য্যকে পাঠাইতে বলেন। অগত্যা দশমবর্ষীয় শুক্রাচার্য্যই জ্যেষ্ঠতাতের সেবার জন্য গমন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে অযোধ্যানাথের আর একটী পুত্র জন্মে, উহার নাম বলরাম। বলরামের জন্মগ্রহণের পরে তদীয় জননীর শুক্রাচার্য্য নিমিত্ত বিচ্ছেদদুঃখের অনেক উপশম হয়।

এদিকে হরভজন পূর্ব্বোক্ত আশ্রমে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান ও গঙ্গাস্নান করিয়া বেলা দশটা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। অনন্তর রন্ধন করিয়া পিতৃব্য ও তদীয় জনৈক শিষ্যের ভোজনাদি সম্পাদন পূর্ব্বক স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিতেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইল। ইহার পরে তিনি গাজীপুরের সন্নিহিত হুসেনপুর গ্রামে যাইয়া তথাকার পণ্ডিত শিউরতনের (শিবরত্নের) নিকট সংস্কৃত ভাষা ও জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করেন। পরে শঙ্করা গ্রামে নন্দা পণ্ডিতের নিকট বালবোধ, শীঘ্রবোধ প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থ অভ্যাস করেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি গাজীপুরের বেচন পণ্ডিতের নিকট "সারস্বত" ও "চন্দ্রিকা" অধ্যয়ন করেন। ইহার এক বৎসর পরে গোপাল পণ্ডিতের নিকট বেদান্ত পঞ্চদশী শিক্ষা করিয়া একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি একবার মাতৃদর্শনার্থ প্রেমপুরে গিয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে লছমীনারায়ণের মৃত্যু হইলে বৎসরাবধি কাল পিতৃব্য সংক্রান্ত তৎকাল কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে আশ্রমের ভার পিতৃব্যের জনৈক শিষ্যের প্রতি অর্পণ করিয়া স্বয়ং তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। হরভজন শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, চিদাম্বরম্ প্রভৃতি বহু তীর্থ

ভ্রমণ করিয়া "গিরনার" পর্ব্বতে গমন করেন। তথায় জনৈক সিদ্ধ পুরুষের নিকট প্রায় ৩ বৎসর যোগশিক্ষা ও পরে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পিতৃব্যের আশ্রমে প্রত্যাগত হন। এই সময়ে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এবং এই সময় হইতেই তিনি প্রত্যেক পুরুষকে বাবা এবং প্রত্যেক রমণীকে "মাইজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং কখনও 'আমি করিতেছি বা বলিতেছি' এতদ্রূপ বাক্য বলিতেন না, প্রত্যুত 'দাস করিতেছে বা বলিতেছে' এইরূপই বলিতেন।

এই সময়ে তিনি প্রাতঃকালে স্নান পূজাদি সমাপন, তৎপরে যোগানুষ্ঠান ও তদনন্তর আহার ও বিশ্রাম এবং আবার অপরাহ্ণে যোগ সাধনা—এইরূপে কালযাপন করিতেন। স্বহস্তে পাক করায় অনেক সময় নষ্ট হয়, অথচ পরান্নভোজন নিষিদ্ধ, এ কারণ তিনি অনেক দিন আহার করিতেন না। কোনও দিন দুগ্ধ ও বিল্বপত্র-রস এবং কোনও দিন ৫০টী মরিচ খাইতেন, আবার কোনও কোনও দিন নিরম্বু উপবাস করিতেন। এইরূপ কঠোর নিয়মে কিয়ৎকাল যাপন করিয়া, তিনি জননীকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগের মাঘ মেলায় গমন করেন। প্রয়াগ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আশ্রমস্থ কুটীর সংস্কার এবং যোগ সাধনার্থ পূজাগৃহের নিম্নে একটী গুহা নির্ম্মাণ করান। গুহা নির্ম্মাণের পরে তিনি উহাতে প্রবেশ করিয়া কখনও এক দিন, কখনও দুই তিন দিন এবং কখনও বা সপ্তাহ কাল বাস করিতেন। এই সময়ে পূজা বা স্নানাহার করিতেন না, কেবল যোগসাধনই করিতেন। একারণ লোকে তাহাকে "পওহারী" বলিত। পওহারী পদ বোধ হয় "পবন-আহারী" বা "পয়-আহারী" শব্দ হইতে অপভ্রষ্ট।

পওহারী বাবা অঙ্গে ভস্ম লেপন বা মস্তকে জটা ধারণ করিতেন না। সর্ব্বদা কেশ পরিষ্কৃত ও বদ্ধ অবস্থায় রাখিতেন। কৌপীন ও মলিদার আলখেল্লা ধারণ করিতেন। এই অবস্থায় কিয়ৎকাল গত হইলে তিনি গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে বিশ্বস্তরূপে শুনিলেন যে, তাঁহার গুরুর মৃত্যু হইয়াছে। তখন তিনি অযোধ্যায় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী জনৈক সাধুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি রথের দিন ব্যতীত আর কুটীরের বাহিরে যাইতেন না, কতিপয় বৎসর পরে ঐ দিনেও কুটীরের বহির্গত হইতেন না। দ্বারে বসিয়াই রথ দেখিতেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-করণেচ্ছু-দিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কেবল একাদশীর দিনই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

যেস্থানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না এবং বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয় না, তথায় বাস করিলে শরীরের দৃঢ়তা যায় এবং বর্ণও সাদা হয়। পাওহারী বাবা যোগসাধনার্থ নির্ব্বাত ও আতপশূন্য গুহায় বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার দেহ ও বর্ণ ঐরূপ হইয়াছিল। এই অবস্থায় কতিপয় বৎসর কাটাইয়া তিনি রেল-পথে প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় গমন করেন। তথায় সামান্য পর্ণকুটীরে অবস্থান, প্রখর সূর্য্যোত্তাপ সহন, এবং অত্যন্ত শীতল বায়ুসেবন নিবন্ধন তাঁহার দেহের চর্ম্ম উঠিয়া যাইতে লাগিল এবং বুকে সর্দ্দি বসিয়া যাওয়াতে স্বরভঙ্গ হইল। তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না; ইহার উপর আবার প্রত্যহ জ্বর হইতে লাগিল। তাঁহার আশ্রমের সন্নিধানে কতিপয় গরিব ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা পওহারী বাবাকে ঔষধ খাইবার

জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী প্রথমে তাঁহাদিগের কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, শেষে দেখিলেন যে. তাঁহাদের কথা রক্ষা না করিলে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবেন, এ নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আপনারা আমাকে ঔষধই খাইতে বলেন, দাসকে কি পথ্য দিবেন না? এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত ঔষধ এবং ভিক্ষালব্ধ উৎকৃষ্ট ক্ষীরাদি নির্ম্মিত পথ্য আনিয়া তাঁহাকে দিলেন। বাবাজি অতি যত্নে ঐগুলি একখানি বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং কিয়দ্দূরে গমন পূর্ব্বক জলে ফেলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণেরা ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহারা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, বাবাজী ঔষধ-পথ্য সেবন না করিয়া সেগুলি ফেলিয়া দিতেছেন। তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বাবাজী বলিলেন যে, "বাবা সকল, কেন এ দাসের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, দাস কোন অপরাধ ত করে নাই। আপনারা রোগের জন্যই ঔষধ-পথ্য দিয়াছিলেন, দাস তাহা রোগকে দিয়াছে, দেখুন, আর দাসের রোগ নাই।" তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে, জ্বর-স্বরভঙ্গাদি সমস্তই আরাম হইয়াছে। অতঃপর তিনি প্রয়াগে স্নান করিয়া পদব্রজে প্রেমাপুরে আসিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। এবার কিন্তু গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন না। সন্নিহিত উপবনে একদিন থাকিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

পওহারী বাবা সাধুসেবায় আবাল্য নিযুক্ত ছিলেন। যখন মঠ তাঁহার অধীন হয়, তদবধি তিনি আদেশ করেন যে, আশ্রমাগত ব্যক্তি অভুক্তাবস্থায় যেন চলিয়া না যায়। প্রথমে তাঁহার শিষ্য নন্দকুমার এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পনর বৎসর পরে বাবাজির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারামই ঐ ভার লন। লছমীনারায়ণের জীবিতাবস্থায় কৃষকেরা অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে প্রতিলাঙ্গলে পাঁচ সের করিয়া শস্য আশ্রমে প্রেরণ করিত এবং নিকটবর্ত্তী জমীদারেরাও সাহায্য করিতেন, কিন্তু তখন সদাব্রতের বন্দোবস্ত ছিল না। বৎসরান্তে সঞ্চিত ধন ও শস্য দুঃখীদিগকে দান করা হইত। পওহারী বাবাও ঐরূপ অর্থ ও শস্য পাইতেন, সুতরাং সদাব্রতের জন্য উহাতে কুলাইত না। এই সময়ে এই অভাব দূরীকরণের জন্য এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। পূর্ব্বে আশ্রমের নিকট দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে এক প্রকাণ্ড চড়া আশ্রম-সমীপে পড়ায় তথায় চাষ আবাদ দ্বারা বহু শস্য পাওয়া যাইত, সুতরাং সদাব্রতের কার্য্যে কোনও বাধা হইতে পারিল না।

পওহারী বাবার এইরূপ সদাব্রতের সংবাদ পাইয়া নানা স্থান হইতে সাধু সন্ন্যাসী ও রাহিলোক আসিতে লাগিল। বহু লোকের সমাগমে পাছে যোগানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হয়, এই নিমিত্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ দূরবর্ত্তী প্রদেশে কয়েকখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইলেন। এক দিবস এক উন্মাদরোগগ্রস্ত কাষ্ঠ হস্তে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল এবং পওহারী বাবাকে মারিবার জন্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে নানাপ্রকার কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে গুহার মধ্যে প্রবেশোদ্যত হইল। তাহাকে সে স্থান হইতে দূরীভূত করিবার জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি যত চেষ্টা করিলেন, সকলই বিফল হইল, অধিকন্তু সে বিকট শব্দে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে বাবাজি হোম করিতেছিলেন, হোম সমাপ্ত হইলে তিনি বাহিরে

আসিয়া উন্মত্তকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। সে আনীত হইলে বাবাজি তাহার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন যে, "ইঁহাকে ছাড়িয়া দাও, উনি অতি সাধু ব্যক্তি।" তৎকালেই ঐ লোকের ঐ কঠিন পীড়া আরাম হইল।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের কিছুদিন পর পওহারীবাবার দীক্ষাগুরুর আশ্রমস্থিত জনৈক সন্ন্যাস-ভেকধারী, বাবাজীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার যে অদ্যাপি ধন ধান্যাদির প্রতি মায়া আছে তাহা উল্লেখ করিয়া বলে যে, তোমার ঠাকুরের গায়ের অলঙ্কারগুলি আমাকে দাও এবং তোমার এই আশ্রম আমাকে দান কর। বাবাজি ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, যদি আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে আমি অবশ্যই দিব, কিন্তু আপনি দিবাবসান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন্, নতুবা আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না, কারণ আমাকে ইহারা যাইতে দিবে না। অনন্তর নিশাগমে কুটীরের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া এবং উক্ত চাবিটী ঐ সন্ন্যাসীকে দিয়া বাবাজি আশ্রম ত্যাগ করিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে আশ্রমদ্বার রুদ্ধ এবং সন্ন্যাসীকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া সকলেই তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সন্ন্যাসী দেখিল যে, আশ্রমের কর্ত্তৃত্ব দূরে থাকুক, এখানে আর কিছুকাল থাকিলে জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই, অতএব পলায়নই শ্রেয়স্কর। এই বিবেচনা করিয়া সে পলায়ন করিল। এদিকে পওহারীবাবার জন্য নানা স্থানে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু কেহই তাঁহার সংবাদ আনিতে পারিল না। অনন্তর প্রায় এক বৎসর পরে আজিমগড়ের পণ্ডিত রামাচারী জী ব্রহ্মপুরে গিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আনয়ন করেন। পরে জানা গেল যে, পওহারী বাবা আশ্রম ত্যাগের পরে শ্রীক্ষেত্রের দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। সেখানে জনৈক সদাশয় বঙ্গবাসী তাঁহাকে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, বাবাজি তাহাতেই এপর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন।

পওহারীবাবা ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এক সুবৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উহা প্রায় এক মাস ছিল। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ হইতে পরমহংস, হংস, সন্ন্যাসী, সাধু ও দরিদ্রগণ ঐ যজ্ঞে আগমন করেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা ও প্রয়োজন, তদনুসারে সকলেই পরম সুখে সেবিত হইয়াছিলেন। এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা জমীদারবর্গ, ও ধনাঢ্য বণিক্ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেই প্রদান করিয়াছিলেন।

একদিন পওহারীবাবা অর্দ্ধরাত্র সময়ে গঙ্গাস্নান করিয়া জনশূন্য নদীতীরে যোগানুষ্ঠান করিতেছিলেন। কোনও ঘটনাবিশেষে ঐ সময়ে তাঁহার যোগক্রিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না, অধিকন্তু এরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল যে, তাহাতে শরীর পর্য্যন্ত নিতান্ত অসুস্থ হইল। এই অসুখ সঞ্চারের পরে অনেকেই "কি অসুখ এবং কি কারণে অসুখ হইয়াছে" জানিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছুই বলেন নাই। অনন্তর ১৩০৫ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে পওহারীবাবা স্বীয় হোমাগ্নিতে স্বশরীর ভস্মীভূত করেন। ঐ দিবস প্রাতঃকালে পওহারীবাবার ভ্রাতা গঙ্গারাম, ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বদরীনারায়ণ, কাশী কলেজের পণ্ডিত ভাগবতাচারী, পণ্ডিত জনার্দ্দন প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন তদীয় আশ্রমে

উপস্থিত হইয়া কুটীর হইতে ধূমনির্গম দর্শন করিলেন। প্রথমে উহা হোমের ধূম বলিয়া বিবেচিত হয়, পরে ধূমরাশি শুভ্রবর্ণ দর্শন করিয়া এবং গৃহের সর্ব্বত্র অগ্নি জ্বলিতেছে দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা অধীর হইয়া পড়িলেন। বদরীনারায়ণ কুটীরের উপরিভাগে উঠিয়া, সর্ব্বত্র জ্বলন্ত অনল দর্শনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন যে, "মহারাজ! অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অনুমতি দিন।" এই সময়ে পওহারীবাবা বদরীনারায়ণের মুখের দিকে তাকাইয়া কোনও বিষয়ের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধীরহৃদয় বদরীনারায়ণ তাহার মর্ম্মবোধে সমর্থ হইলেন না। এদিকে বদরীর চীৎকার শুনিয়া পওহারীবাবার প্রিয় সেবক ভৃগুনাথ ও অপরাপর কতিপয় ব্যক্তি কুটীরের উপর উঠিলেন। তাঁহারা উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, বাবাজির সদ্যঃস্নাত সিক্ত কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া রহিয়াছে, সমস্ত শরীরে ঘৃত লেপন করা হইয়াছে, পরিধান কুশসংযুক্ত কৌপীন। তিনি হোমকুণ্ডের সম্মুখে উত্তরাস্য হইয়া কম্বলের উপরিভাগে পদ্মাসনে যোগমগ্ন রহিয়াছেন, এবং তাঁহার তপঃপূত শরীর অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতেছে। এইরূপে মহাত্মা পওহারীবাবার ঐহিক লীলার অবসান হয়।

মৌনী বাবা

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আবুদিয়া গ্রামে রামচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক কায়স্থ বাস করিতেন। রামচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা ভাল না থাকায়, তিনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য পাবনায় গমন করেন। কালক্রমে রামের দুইটী পুত্র জন্মে, ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম প্যারীলাল ও কনিষ্ঠের নাম হীরালাল। এই প্যারীলালই পরবর্ত্তী সময়ে মৌনী বাবা নামে পরিচিত হন।

প্যারীলাল ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে পিতৃনিবাসে জন্ম গ্রহণ করেন। উপযুক্ত বয়সে প্যারীলাল ও হীরালাল পাবনা গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। প্যারীলাল পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার পিতা যেমন দেবভক্ত ছিলেন, ইনি সেরূপ ছিলেন না। সৎকর্ম্ম করা ও ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। এই সময়ে পাবনা স্কুলে একজন ব্রাহ্ম শিক্ষক ছিলেন, তিনি প্যারীলালকে ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন। এদিকে কিয়দ্দিবস পরেই প্যারীলালের মাতার ও পিতার পরলোক লাভ হইল। সুতরাং উঁহারা স্বাধীন হইয়া প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়া উভয় ভ্রাতা অর্থকৃচ্ছে পতিত হইলেন। তখন প্যারী পাঠ বন্ধ করিয়া চাকরী গ্রহণ করিলেন। উহাতে যে টাকা পাওয়া যাইত, তদ্দ্বারা আপনার ও ভ্রাতার ভরণ পোষণ এবং ভ্রাতার পড়ার খরচ চালাইতেন। কিয়দ্দিবস পরে কিঞ্চিদধিক অর্থাগম হওয়াতে প্যারীলাল বিবাহ করিলেন। ইনি জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী গোপালপুর, এই উভয় স্থানের স্কুলে ক্রমান্বয়ে শিক্ষকতা করেন। গোপালপুরে অবস্থান কালে ইহাঁর পত্নী ও সহোদরা ইহাঁর সঙ্গে ছিলেন। প্যারীলাল এই সময়াবধি সামান্য পরিমিত দ্রব্য আহার এবং কোনও কোনও দিন উপবাস করিতেন। অত্যাবশ্যক সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে সময় পাইতেন, তাহাতেই সাধন ভজন করিতেন। এই

রূপে প্রায় দ্বাদশ বৎসর যাপিত হইল। এই সময়ের অন্তে প্যারীলালের প্রিয়তমা পত্নী কালগ্রাসে পতিত হইলেন এবং তাহার কিয়দ্দিবস পরে হীরালাল পাঠ ছাড়িয়া দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্যারীলাল দেখিলেন যে, এমন সুযোগ আর হইবে না, অতএব কনিষ্ঠের প্রতি সংসারের ভার দিয়া যোগসাধনার্থ চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। প্যারীলাল চিত্রকূটে তিন বৎসর যোগাভ্যাস করিয়া ওঁকারনাথ পর্ব্বতে গমন করেন। শেষোক্ত পর্ব্বত অতি মনোরম বলিয়া বহুসংখ্যক যতি, ব্রহ্মচারি প্রভৃতি তথায় বাস করিয়া থাকেন। প্যারীলাল উক্ত স্থানে একটী স্থান স্থির করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি প্রায়ই উপবাস করিতেন, মধ্যে মধ্যে অল্পমাত্রায় ভোজন করিতেন, প্রায়ই নিদ্রা যাইতেন না, বৃষ্টি বা রৌদ্রে বিচলিত হইতেন না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠ নামক এক বণিক্ তাঁহার নিমিত্ত একটী গুহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। গুহা নির্ম্মিত হইলে প্যারীলাল তন্মধ্যে যাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতার সহিত যোগানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না, মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এজন্য প্যারীলাল "মৌনী বাবা" নামে বিখ্যাত হন।

মৌনী বাবার গুহায় তিনটী পিতলের ঘটী, একটী পাথরের নোড়া এবং এক খানি চর্ম্মমাত্র ছিল, অন্য আর কিছুই ছিল না। তিনি চর্ম্মে উপবেশন ও শয়ন করিতেন, নোড়া দ্বারা বালিসের কার্য্য সম্পাদিত হইত এবং ঘটী জলরক্ষাদির জন্য আবশ্যক ছিল। এই মহাপুরুষ যে কোন্ সময় শৌচক্রিয়াদির জন্য বাহিরে আসিতেন, তাহা সাধারণে জানিতে পারিত না। পাছে লোকে বিরক্ত করে, এজন্য তিনি প্রায়ই গুহা হইতে বহির্গত হইতেন না। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগাক্রান্ত, অর্থাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ, গুপ্ত-ভাবে স্বার্থসিদ্ধিতৎপর এবং উপদেশপ্রার্থী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা কোনও না কোনও সময়ে তাঁহার সাক্ষাৎ-কার লাভ করিত এবং বাসনাতীত ফল লাভে চরিতার্থ হইয়া ফিরিয়া যাইত। এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়াছেন যে, যে দিনে মৌনী বাবার দৃষ্টিতে পড়িয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার বহু ধনাগম হইতেছে এবং ওঁকারনাথের মোহান্ত বলিয়াছেন যে, "আমি এ জীবনে কত শত সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু মৌনী বাবার মত আর একজনও দেখি নাই।"

মৌনী বাবা স্বীয় শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিতেন না। তিনি প্রতিদিন এক পোয়া দুগ্ধ ও এক ছটাক বিল্বপত্রের রস পান করিতেন, আর কিছুই খাইতেন না। এ কারণ তাঁহার শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও শুষ্ক হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে মৌনী বাবা যোগাসনে মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৪২

অম্বিকা গদাধরের অনশন-কথা শ্রবণ করিলে, এবং গদাধর অম্বিকার স্বপ্নকাহিনী শুনিলে, পরস্পর পরস্পরের দিকে আরও একটু আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। হৃদয়াবেগে উভয়ের সংযমের বাঁধ বুঝি ভগ্ন হইয়া যায়!—কিন্তু দৈব তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল।—আহার এবং কথা সমাধা হইতে না হইতে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল-যে, ডাক্তারেরা সমাগত হইয়াছেন। শুনিয়া, উভয়ের মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

গদাধর ত্বরিতপদে ডাক্তারদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের চক্ষে অস্ত্রপ্রয়োগ জন্য যে সকল উদ্যোগ করা আবশ্যক, তাহা সম্পন্ন করিল। চিকিৎসকগণ প্রস্তুত হইলে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় সহাস্যবদনে কহিলেন, "আপনাদের শুভকার্য্য সমাধা করুন। আপনাদের কৌশলে আমার রোগ আরোগ্য হইলে, ভালই; নচেৎ দুইটা চক্ষুর জন্য আমি বিশেষ খেদ করিব না।" ডাক্তারেরা একবাক্যে বলিলেন, "আপনার চক্ষু আমরা নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া দিব।"

তাঁহারা অস্ত্রপ্রয়োগও করিয়াছিলেন, চক্ষু আরোগ্যও করিয়াছিলেন;—কিন্তু আরোগ্যটা অল্প দিনে ঘটে নাই। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া কালীদহে ফিরিতে কৃষ্ণ চাটুর্য্যের প্রায় দুই বৎসর বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এই দুই বৎসর কাল, তিনি কন্যাকে লইয়া গদাধরের বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গদাধরের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি পৃথক্ বাস করিতে পারেন নাই।

যদিও মানদা অম্বিকা-ঘটিত তাহার স্বামীর অপবাদ মুখীর নিকট ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিল, তথাপি সে অম্বিকাকে আপন বাটীতে স্থান দিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হয় নাই। তাহার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প শুনিবার জন্য এবং তাহার পুত্রকে কোলে লইয়া শান্ত করিবার জন্য একজন সগ্রামবাসিনী পরিচিতা সঙ্গিনী পাইয়া, মানদা অম্বিকাকে লইয়া বেশ আনন্দে ছিল। অম্বিকার যত্নে সে সুপক্ব এবং রুচিকারক উপাদেয় আহার-সামগ্রীসকল আহার করিতে পাইত; পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান কালে অম্বিকা তাহার সবিশেষ সহায়তা করিত। অম্বিকা তাহার মূল্যবান্ সজ্জাসকল সযত্নে পেটক মধ্যে সজ্জিত করিয়া রাখিত। তাহার শয্যাকক্ষ ও শয্যা অম্বিকার যত্নে সদ্য আহৃত কুসুম-সুবাসে সুবাসিত হইয়া থাকিত। সুতরাং অম্বিকা মানদাদের বাটীতে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করায় মানদার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

বাটীতে অম্বিকা থাকাতে, গদাধরের বাটীর শ্রী শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। অম্বিকার আলস্যহীন উদ্যোগে, তাহার গৃহের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা সুচারু সুশৃঙ্খলা বিরাজ করিত। গৃহতল সুমার্জ্জিত এবং পরিচ্ছন্ন গৃহসামগ্রীসকল নির্ম্মল বক্ষে ধারণ করিয়া লক্ষ্মীর পদাশ্রিত স্বর্ণ-কমলের ন্যায় শোভা পাইত। মহিমাময়ী অম্বিকার মহিমা ছায়ায়, গদাধরের ভবন মধ্যে তপোবনের পরমা শান্তি পরিলক্ষিত হইত।

কিন্তু গদাধরের সহিত অম্বিকার বড় একটা সাক্ষাৎ ঘটিত না। গদাধরের ভোজন

সময়ে তাহার ভোজন-কক্ষে আহারসামগ্রী সকল সজ্জিত করিয়া এবং মানদাকে তথায় উপবিষ্ট করাইয়া, অম্বিকা অন্য কার্য্যের জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া যাইত। সময়ান্তরে মানদার সহিত সম্ভাষণ জন্য গদাধর অন্তঃপুর মধ্যে সমাগত হইলে, সে মিত্তৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে ক্রীড়া করিত। যে কক্ষ কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের শয়ন জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই এক নিকটবর্ত্তী কক্ষে অম্বিকা শয়ন করিত। মুণীও অম্বিকার সহিত এই কক্ষে মেঝের উপর শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিয়া থাকিত। মানদার আশঙ্কার পথে বুদ্ধিমতী মুনী সতর্ক প্রহরীর কার্য্য করিত।

মুনীও বুঝিতে পারে নাই যে আপনি অন্তরালে থাকিয়া, অম্বিকা যে অদৃশ্য আদর অজস্র গদাধরকে পাঠাইয়া দিতেছিল, তাহার অদৃশ্য অথচ অপ্রতিহত স্রোত নিবারণ করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত। অন্তরালে থাকিয়া, গদাধর আপনাকে এই ভালবাসার তীব্র স্রোতের মধ্যে ভাসাইয়া দিয়াছিল। শুষ্ক শুভ্র, স্নিগ্ধ শয্যায় শয়ন করিয়া, তদুপরি মনোরম কুসুমসকল বিকীর্ণ দেখিলে, গদাধর মনে করিত অম্বিকার কোমল স্পর্শ পুষ্পাকারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আহার কালে, সুস্বাদু ব্যঞ্জন মধ্যে সে তাহারই অপরিমিত আদরের আস্বাদন পাইত। মানদা যখন অপূর্ব্ব ভূষায় ভূষিত হইয়া গদাধরের সমীপবর্ত্তী হইত, গদাধর তখন তাহার অঙ্গরাগ মধ্যে অম্বিকারই বিচিত্র চারুতার অনুসন্ধান পাইত। গৃহের উজ্জ্বল প্রফুল্ল দ্রব্যসকলের মধ্যেও সে অম্বিকার লাবণ্য-হিল্লোল অবলোকন করিত। খোকা যখন অম্বিকার নিকট হইতে নির্ম্মল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া গদাধরের নিকট আসিত, গদাধর তখন মনে করিত, কে যেন তাহাকে প্রণয়ের উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছে। এইরূপে অন্তরালে থাকিয়াও অম্বিকা গদাধরকে শত আদরে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

নারিকেল-মধ্যস্থিত অম্বুর ন্যায়, যে প্রেম গদাধর তাহার হৃদয় মধ্যে কঠিন কর্ত্তব্য-বন্ধনে বদ্ধ রাখিয়াছিল, অম্বিকাও তাহার সন্ধান পাইয়াছিল। পূর্ণিমার শশী মেঘাবৃত থাকিলেও বারিধির হৃদয় যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, গদাধরের প্রেম তাহার হৃদয় মধ্যে গুপ্ত থাকিলেও, অম্বিকার হৃদয়-সাগর তাহার আকর্ষণে তেমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কানন মধ্যে বসন্ত সঞ্চার হইলে, গৃহের কোণে বসিয়া গৃহপালিতা কোকিলা যেমন তাহার সন্ধান পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠে, অম্বিকার মনটি অন্তরালে থাকিয়াও, গদাধরের হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত গুপ্ত প্রেমের সন্ধান পাইয়া তেমনই প্রফুল্ল হইয়া, বুঝি কোকিলার ন্যায় মধুর কুহুরাগে আকাশতল প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। ভ্রমরা যেমন পদ্মকলির মধ্যস্থ পলাশনিবদ্ধ মধুর সন্ধান পায়, অম্বিকাও তেমনই গদাধরের বক্ষোনিবদ্ধ প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিল।

তথাপি এ যাবৎ কেহ কাহারও নিকট আপনার প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করে নাই। গদাধর আপনার হৃদয়ের সহিত মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল। অম্বিকা মনে করিত, "এখন নয়, মরণের পূর্ব্বদিন প্রাণেশ্বরকে সকল কথা বলিয়া যাইব।"

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাল গদাধরের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, অম্বিকার কালীদহ প্রত্যাগমনের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। স্থির হইয়া গেল যে, আর চারি

দিন পরে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় কন্যাকে লইয়া কালীদহে যাত্রা করিলেন। অন্তরালে থাকিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে, সজল নয়নে অম্বিকা গদাধরকে বার বার দর্শন করিল। হায়! সে তখনও জানিতে পারে নাই যে, ইহজীবনে সে ইহজীবনে আর কখনও গদাধরকে দেখিতে পাইবে না; অচিরকাল মধ্যে তাহার সংসারলীলার শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়া যাইবে।

কালীদহ ফিরিবার পূর্ব্ব দিন রাত্রে অম্বিকা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বপ্ন ঘোরে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, —"গদাধর, প্রাণেশ্বর, বিদায় দাও।" বলা বাহুল্য, মুলীর সতর্ক কর্ণে কথাগুলা বজ্র-নিনাদে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। আহারাদির পর কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় অম্বিকাকে লইয়া প্রস্থান করিলে, এবং বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া, গদাধর আদালতে যাইলে, মুলী শয়নকক্ষের নিভৃতে মানদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া, কহিল—"ছুঁড়ীর জন্য আমার বড় দুঃখ হয়, এতটা বয়স হইল, কাহাকে স্বামী বলে তাহা জানিল না। জামাই বাবুর জন্য ছুঁড়ী পাগল হইয়া যাইবার মত হইয়াছে। যাইবার সময়, জামাই বাবু কোথায় ছিল কে জানে,—সে তাহাকে দেখিবার জন্য, বড় বড় ছলছলে চোখ দু'টা উঁচু করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া জামাই বাবুর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। সে জামাই বাবুকে বড় ভালবাসে।

মুলীর কথা শুনিয়া, মানদা একটুখানি হাসিল, ভাবিল,—"মুলী পোড়ারমুখী ভালবাসার কথা আবার কি বলে?" এস, পাঠিকাগণ আমরা মানদাকে ডাকিয়া বলি,—"বাদাম বাটা সংযুক্ত ক্ষীরের প্রতি অথবা ইলিশ মৎস্যের ডিম্বের প্রতি তোমার যে ভাব, তাহাকেই আমরা ভালবাসা বলি।"

৪৩

তোমরা চারুশশীর কথা অনেক দিন শুন নাই। এক্ষণে আমি তাহার কথা বলিব, শ্রবণ কর।

তাহার স্বামী অতুলানন্দ অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যকৃতের বিকৃতি কোন প্রকারে আরোগ্য না হওয়ায়, চারুশশীকে অকালে বৈধব্য-অনলে দগ্ধ করিয়া সে ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এ ঘটনাটা ছয় মাস পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

কন্যার এই বিপদে, চারুশশীর পিতা গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ বয়সে একান্ত বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইদানীং তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ভরণপোষণের জন্য তিনি অনেকটা কন্যার অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেন। জামাতার মৃত্যু ঘটায় তাঁহার এই সাহায্যের পথ বন্ধ হইয়া গেল। ইহার উপর, আবার কন্যার ভরণপোষণের ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতা ঝামাপুকুরের বাটী ও কয়েকখানা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে কয়েক সহস্র অর্থ চারুশশী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, তাহা সে তাহার পিতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থা নিবন্ধন কন্যার গচ্ছিত অর্থে, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়কে মধ্যে মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এবং কন্যা পাছে এ বিষয় অবগত হইয়া, রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া, মাতাকে দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করে, এই আশঙ্কায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কন্যার প্রীত্যর্থে নানারূপ

কৌশলানুষ্ঠান অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কন্যার কোনও মতের প্রতিবাদ করা বা তাহার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা, তাঁহার পক্ষে, বা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পক্ষে একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

পিতার অজস্র প্রশ্রয়ে চারুশশী পিতৃগৃহে আসিয়া এক প্রকার উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছিল। সে গ্রাম মধ্যে সর্ব্বত্র রটনা করিয়াছিল যে, মানদার কপাল পুড়িয়াছে; অম্বিকা কলিকাতায় যাইয়া, নিলর্জ্জার ন্যায় গদাধরের গৃহে বাস করিয়া অবাধে গদাধরের সহিত প্রেমলীলায় অভিভূতা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, কলিকাতা অবস্থান কালে, চারুশশী অম্বিকার কোনও তত্ত্বই অবগত হইতে পারে নাই। কালীদহে আসিয়া, যখন সে শুনিল যে, অম্বিকা কালীদহে নাই এবং কলিকাতায় যাইয়া পিতার সহিত গদাধরের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে, তখন সে কল্পনার বলে অম্বিকার প্রেমলীলা সম্বন্ধে নানা প্রকার কাহিনী রচনা করিয়া গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট বিবৃত করিল। সকলেই জানিল যে, অম্বিকা কলঙ্কসাগরে ডুবিয়াছে। গ্রামের সকলেই বলিল,—ছি! ছি! ছি!

একদিন দিবা অবসানকালে, কাঁখে কলসী লইয়া, চারুশশী গাত্র ধাবন জন্য গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বকথিতা বিমলা তৎপ্রদেশে তাহাকে সমাগতা দেখিয়া নিগূঢ় তথ্য অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল,—"হ্যাঁ লা চারু, ব্যাপারখানা কি বল দেখি।"

চারু। কাহার কথা বলিতেছিস্?

বিমলা। আবার কাহার কথা বলিব,—সেই অম্বিকার কথা। কতদিন মনে করিয়াছি যে, তোকে সকল কথা জিজ্ঞাসা কি একটু মন খুলিয়া কথা কহিবার উপায় আছে?

চারু। কাজের কথা আর বলিস্ না; রাতদিন কাজ কাজ করিয়া আমারও হাড় আলাতন হইয়াছে। স্বামী নাই, পেটের একটা ছেলে নাই,—আমার কোন ঝঞ্ঝাটই নাই, ভাই!—তবু সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটু হাঁফ্ ছাড়িবার অবসর নাই। সেই সকালে উঠিয়াছি, আর এই সন্ধ্যা হইতে চলিল; ইহার মধ্যে যদি ভাই একদণ্ড বসিয়া থাকি।

বিমলা। আজ তো'দের কি রান্না হ'য়েছিল চারু?

চারু। আমাদের আবার রান্না! আমার পোড়া কপাল পুড়িয়া অবধি মা বাবা দুজনেই নিরামিষ খা'ন। তা' আমি সমস্ত যোগাড় যন্ত্র করিয়া দিয়াছিলাম, মা উননটা জেলে দু'টো নিরামিষ তরকারি আর ডাল ও ভাত রাঁধিয়াছিল। পোড়া দেশে, কলিকাতার মত পাথুরে চুণ পাওয়া যায় না, আমি বিধবা মানুষ, কিরূপে গুগ্‌লির চুণ ছুঁইব?—ভাই ও পাড়ার ঠান্‌দিদিকে দিয়া খাবার জন্য দুইটা পান সাজিয়া লইয়াছিলাম।

বিমলা। তুই আর পান খা'স না?

চারু। কি বলে আর কি কয়!!—বিধবা মানুষের কি কখনও পান খাইতে আছে। ধনের চাল, বড় এলাচের দানা এই সব তামাক পাতার সহিত মিশাইয়া, মা একরকম দোক্তা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে, পান না খাইয়া মুখটা যখন বড় বেতার হইয়া যায়, তখন তাই চারটি চারটি মুখে দিই।

কথা কহিতে কহিতে চারুশশী আপনার নবনির্ম্মিত সুবর্ণগঠিত চুড়ীগুলি ঘুরাইয়া দেখিল। নূতন চুড়ি দেখিয়া বিমলা কহিল,—"দেখি, দেখি, এ চুড়ি কবে গড়ালি?"

চারুশশী কহিল, "আমার শুধু-হাত দেখিয়া মা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল, 'তুই, হাত খালি করিলে আমিও হাতে কিছু রাখিব না।'—কি করিব? মার কান্না দেখিয়া ও বাবার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া. কঙ্কণ ও বালার ভাঙ্গিয়া এই সরু রকম পাঁচ গাছ ক'রে চুড়ি গড়াইয়াছি।—কেমন গড়ন হইয়াছে, ভাই?"

বিমলা। বেশ গড়ন হইয়াছে;—আর তোর হাত দু'খানিতে মানাইয়াছে ভাল।

হাস্যময়ী সখীর নিকট, আপন আহার বিহার সম্বন্ধে উল্লিখিত রূপ ভূমিকা সমাধা করিয়া, নেত্র ঘূর্ণন, নাসাসঙ্কোচন ও ওষ্ঠ-স্ফুরণ সহকারে চারুশশী অম্বিকা-ঘটিতা মূল কাহিনী কল্পনাবলে বিরচিত করিয়া কীর্ত্তিত করিল। শুনিয়া, গঙ্গার হৃদয় তরঙ্গভঙ্গিমায় শিহরিয়া উঠিল; দিবা অবসান কালের নির্ম্মল নীল আকাশ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; গগনবিচারী বিহঙ্গমগণ বৃক্ষপল্লবের নিভৃতে মুখ ঢাকিল; সর্ব্বংসহা মেদিনীর মুখে শর্ব্বরীর ছায়া পড়িল। সেই মধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিমলা দেবী অত্যন্ত পুলকিতা হইল; এবং তাহার পোড়া সংসারের সমস্ত জ্বালা ভুলিয়া গেল।

যাহারা চারুশশীর শ্রীমুখ হইতে অম্বিকার কথা শুনিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই, পর দিন তাহারা বিমলার নিকট হইতে সেই সকল অলঙ্কারযুক্তা, ছন্দঃবন্ধনসম্পন্না অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিল। তাহার পরদিন অম্বিকা-কথা-অনভিজ্ঞা অন্যা কামিনীগণ আবার সেই কাহিনী শুনিয়া ধন্যা হইল। এইরূপে, উলুবন মধ্যে অগ্নির ন্যায়, সমস্ত গ্রাম মধ্যে অম্বিকার কলঙ্করাশি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

অম্বিকা কালীদহে প্রত্যাগতা হইলে, তাহারও কর্ণে এ সংবাদ পৌঁছিল। হায়! গদাধরের উজ্জ্বল শুভ্র গৌরব সে কিরূপে কলঙ্কলিপ্ত দেখিবে? সমস্ত শ্রবণ করিয়া, সে মনে করিল, "এক্ষণে তাহার মরণই মঙ্গল।"

৪৪

অম্বিকা ও তাহার পিতাকে যে দিন গদাধর বিদায় দিয়াছিল, তাহার দশ দিন পরে সে তাহার চক্রবর্ত্তী কাকার নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইল। উমাকালী চক্রবর্ত্তীর অনুরোধে সুবিধাজনক মূল্যে, এ যাবৎ গদাধর অনেকগুলি মহল ক্রয় করিয়াছিল। উমাকালী চক্রবর্ত্তীর সুব্যবস্থায় এক্ষণে এই সকল জমিদারীর বার্ষিক আয়, সদর মালগুজারি বাদে, প্রায় চল্লিশ সহস্র মুদ্রা হইয়াছিল। এই জমিদারী-ঘটিত কোন একটা ব্যাপারে, উমাকালী পত্র লিখিয়া গদাধরকে আহ্বান করিয়াছিল।

পত্র পাইবার কয়েক দিন পরে, খোকার মুখ চুম্বন করিয়া এবং তাহাকে দুষ্টামী করিতে নিষেধ করিয়া, এবং মানদার নিকট বিদায় লইয়া, গদাধর কয়েক দিনের জন্য নাড়িচা যাত্রা করিল। যাইবার পূর্ব্ব-দিন সে কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইল যে, পরদিন সে কয়েকটা কার্য্যের জন্য নাড়িচা যাত্রা করিবে, এবং সম্ভবতঃ পাঁচ দিন পরে সে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবে।

নাড়িচা আর পূর্ব্বের নাড়িচা ছিল না। তাহার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহার পাঠশালায় গ্রাম্য বালকেরা পাঠ অভ্যাস করিত। গদাধরের মাতার নামে প্রতিষ্ঠিত তাহার শিবমন্দিরে গ্রাম্য মহিলাগণ পূজা করিতে আসিত। তাহার শ্যামল শ্রী দ্বিখণ্ডিত করিয়া, সীমন্তিনীগণের সিঁথির ন্যায় এক সরল রাজপথ নান্দীপুর অভিমুখে বিস্তৃত

ছিল। এই রাজপথের সীমান্তে, গঙ্গা-সৈকতে, সীমন্তিনীগণের সীমন্তপ্রান্ত বিভূষিত সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় রক্ত ইষ্টক গঠিত সোপানাবলী বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ঘাটের উপর, রাজপথের পার্শ্বে, গদাধরের জমিদারী-কাছারী; কাছারী বাটী ইষ্টক-নির্ম্মিত, দ্বিতল।—নিম্নতলে বসিয়া উমাকালী চক্রবর্ত্তীর নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ গদাধরের জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করিত; দ্বিতলের কয়েকটা ঘর গদাধরের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাছারী বাটীর পশ্চাতে, দুইটা অতি বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়াতলে, একখানা বড় আটচালা ছিল, তাহাতে সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত; তথায় পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামের অধিবাসিগণ খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বিক্রয় জন্য আগমন করিত।

গদাধরের নৌকা আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বাঁধাঘাটে ভিড়িল। কিন্তু তীরে চক্রবর্ত্তী কাকা তাহার আগমন অপেক্ষায়, দণ্ডায়মান ছিল না। কেবল মাত্র কর্ম্মচারিগণ তথায় উপস্থিত ছিল। তীরে উঠিয়া, গদাধর তাহাদের নিকট শুনিল যে, পূর্ব্ব রাত্র হইতে তাঁহার প্রবল জ্বর হওয়ায় তিনি শয্যাগত হইয়াছেন। গদাধর চিন্তিত মনে, তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

গৃহের দাওয়ার বসিয়া উমাকালীর স্ত্রী স্বামীর জন্য পানীয় প্রস্তুত করিতেছিলেন। গদাধরকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল, বলিলেন,—"তুমি আসিলে? কাল সমস্ত রাত্রি বিকারের ঘোরে, কেবল তোমার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছেন। তাঁহার এরূপ পীড়া আমি আর কখনও দেখি নাই।"

গদাধর। আপনি কাঁদিবেন না। আমি ডাক্তার আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছি। সহজেই রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে।

উমা. স্ত্রী। তাই বল, বাবা! তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। তুমি একবার ঘরের ভিতর যাইয়া দেখ।

উমাকালী গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ান ছিল; গদাধরকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,"তুমি আসিবে আমি তাহা জানিতাম। তোমার বাবার মৃত্যুকালে আমি তাঁহার নিকট এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, যেন আমি তোমার হাতে গঙ্গাজল খাইয়া তাঁহার মত মরিতে পারি; তাঁহার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হইবার নহে। আমি তোমার হাতে গঙ্গাজল খাইয়া এ পৃথিবীর কার্য্য শেষ করিব। এস বৎস আমার পার্শ্বে বসিয়া আমার মুখে গঙ্গাজল দাও। তোমার চক্রবর্ত্তী কাকার প্রতি তোমার শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর।

গদাধর আপন উত্তরীয়াঞ্চলে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া কহিল, "দেখিতেছি আপনি অকারণ ভীত হইয়াছেন। আপনার পীড়া কঠিন নহে। আমি ডাক্তার আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছি; আপনি শীঘ্র আরোগ্য হইবেন।"

উমাকালী স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমার কার্য্য তুমি করিয়াছ; কিন্তু ডাক্তার আসিয়া আমার কিছু করিতে পারিবে না। উপর হইতে আমার তলব আসিয়াছে; দয়াময় এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। তাঁহার আহ্বান অমান্য করা চলিবে না।—বাবাজি, তুমি আমার মুখে গঙ্গাজল দাও। আহা কি শীতল এই গঙ্গাজল!—গঙ্গা, মা, —আজ মরণকালে প্রাণ ভরিয়া বুঝিলাম তুমি সত্যই পতিতোদ্ধারিণী।"

উমাকালীর স্ত্রী অঞ্চলে আপন সজল নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া,রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—

"তুমি অকল্যাণ কথা কহিও না; রোগ কাহার না হয়, তোমার অসুখ ভাল হইয়া যাইবে। সরবত আনিয়াছি, খাও।"

উমাকালী পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আমরা সহজেই মায়াবদ্ধ জীব। ইহার উপর, তুমি যদি ক্রন্দন কর, পৃথিবীর মায়াত্যাগ করা সহজ হইবে না। আমার এ বৃদ্ধ জীর্ণ দেহ আর পৃথিবীর কোনও কাজে লাগিবে না। তোমার ক্ষোভ করিবার কিছু নাই,—পুণ্যময়ি, একান্ত মনে তুমি আমার প্রাণপণ সেবা করিয়াছ। এক্ষণে আমার এ জীর্ণ দেহের সেবা কর', জীর্ণ মন্দির সংস্কারের ন্যায় নিতান্ত অনর্থক হইবে।

বৃদ্ধা গৃহিণী চক্ষের দরবিগলিত ধারায় উমাকালীর পদ স্নাত করিয়া কহিলেন,—"ওগো! আমার আর কেহ নাই; আমি জন্ম:বিচ্ছিন্ন আর কাহাকেও জানি নাই; এ পদ সেবায় আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

উমাকালী গদাধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমার কেহ না থাকিলেও, তুমি সন্তানের মাতা না হইলেও, তোমার গদাধর আছে। গদাধরের দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার দুঃখ থাকিবে না;—একা গদাধর তোমার শত পুত্রাধিক পুত্র। আমি গদাধরকে দেখিয়া মৃত্যু যন্ত্রণাও ভুলিয়া গিয়াছি,—কি সৌম্য বীর মূর্ত্তি! পৃথুল স্কন্ধ, যেন পৃথিবীর সমস্ত ভার বহনে সক্ষম; বিশাল বক্ষঃ, যেন জগতের সমস্ত লোকের আশ্রয়স্থান। শোন, পৃথিবীর কীর্ত্তিমান্ মানুষগণ পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের ন্যায় ভগবানের আশ্রিত; সংসার-সংগ্রামে তাহাদের রথে বসিয়া ভগবান্ আপনি পদ্মকরে রজ্জু ধরিয়া বিজয়ের দিকে তাহা চালনা করেন। গদাধর কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষ। দেবী বীনাপাণি স্বয়ং পৃথিবীর মধ্যে অবতীর্ণা হইয়া, উহাকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমি পুণ্যবান্, তাই মৃত্যুকালে উহাকে দেখিতে পাইলাম।"

গদাধরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, গৃহিণী কহিলেন,—"বাবা, তুমি একটু' এই বিছানায় বসিয়া থাক। কাল রাত্র হইতে কেবল তোমারই নাম করিতেছেন, আর সব কত কথা বলিতেছেন, তাহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না '

গদাধর রাত্রি দিন উমাকালীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল; অতি যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিল; ডাক্তার আসিল; নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিল; কিন্তু উমাকালী আরোগ্য হইতে পারিলেন না। পরদিন দ্বিপ্রহরে, হরিনাম করিতে করিতে, গঙ্গাতীরে, তিনি জন্মের মত নয়ন মুদ্রিত করিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক তাঁহার জন্য শোক করিয়া কহিল, "আহা; এমন পরোপকারী লোক আর জন্মিবে না। গদাধর মনে করিল, যে সে দ্বিতীয় বার পিতৃহীন হইল।

উমাকালী যেজন্য গদাধরকে নাড়িচা গ্রামে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে কথা, তিনি মৃত্যুর আগে গদাধরকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তা, সে কথা গদাধরের কর্ণগোচর না হইলেও, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পর পরিচ্ছেদে আমরা তাহা বিবৃত করিব॥

৪৫

কলিকাতা হইতে কালীদহে প্রত্যাগমনের পর একদিন সকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় গঙ্গাস্নানের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, তিনি দেখিলেন, বৃক্ষাদি সমাচ্ছন্ন এক নিভৃত স্থানে কোনও ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে। তৎকালে এরূপভাবে কে তথায় বসিয়া রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার মনে

কৌতূহলের উদয় হইল। তিনি নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় তথায় উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রমনে কি চিন্তা করিতেছেন। চিন্তা এত গভীর যে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যের সামীপ্য তাঁহার উপলব্ধি হইল না। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় আরও লক্ষ্য করিলেন যে, গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের মুষ্টিমধ্যে কি একটা দ্রব্য বদ্ধ রহিয়াছে। তিনি গোবিন্দলালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দবাবু, এরূপ সময়ে আপনি এরূপ স্থানে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন?"

কিন্তু সে কথা গোবিন্দলালের শ্রবণপথে প্রবেশ করিল না। তিনি তখন শ্রবণশক্তিটাও চক্ষে পূরিয়া তাহা দিগন্তপ্রান্তে নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বুঝি মরণের পরপারে কি আছে তাহা দৃষ্টি করিবার জন্ম অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় আবার তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিলেন।

চেতনা লাভ করিয়া, নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহসা অবলোকন করিয়া গোবিন্দলাল অত্যন্ত চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিহ্বলের স্থায় অস্ফুট স্বরে বলিল, "যাঁ্যা?"

কৃষ্ণচাটুর্য্যে আবার প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি এখানে কি করিতেছেন?"

গোবিন্দলাল আপনার মুষ্টিধৃত দ্রব্যটা মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "কি করিতেছি?"

কৃষ্ণচাটুর্য্যে মৃত্তিকাতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যটা হস্তে তুলিয়া, পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "এ যে আফিঙ! আপনি এতটা আফিঙ হস্তে করিয়া, একাকী নিভৃতে বসিয়া কি করিতেছিলেন?"

গোবিন্দ। তাহা কি আপনাকে বলিতে হইবে? যদি না বলি?

কৃষ্ণ। আপনাকে বলিবার জন্ম আমি জেদ করিব না; ইচ্ছা হয় বলিবেন; ইচ্ছা না হইলে বলিবেন না। কিন্তু এই অহিফেন আমি আর আপনার হস্তে দিব না।

গোবিন্দ। আমি আপনাকে সকল কথাই বলিব। কাহাকেও আমার দুঃখের কথা না বলিলে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে।

কৃষ্ণ। আপনার কি এমন দুঃখ?

গোবিন্দ। আমার দুঃখ ভয়ানক; তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, আত্মনাশের জন্ম অহিফেন ক্রয় করিয়া, তাহা গলাধঃকরণ করিবার জন্য, এই নিভৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আপনি কেন আসিয়া আমাকে বাধা দিলেন?

কৃষ্ণ। আপনি বালক নহেন; আপনি জানেন যে, আত্মনাশে পাপ আছে।

গোবিন্দ। যে, পাপের ভার আমি অহরহ মস্তকের উপর বহন করিতেছি, আত্মনাশের পাপ তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

কৃষ্ণ। আপনি কি জানেন না যে, মানুষ যতই পাপ করুক, ভগবানের ভাণ্ডারে তাহার অপেক্ষা অধিক ক্ষমা আছে!—আপনি কি এমন পাপ করিলেন?

গোবিন্দ। কি পাপ করিয়াছি শুনিবেন? আমি আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি।

কৃষ্ণ। আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন? কই আমি ত নষ্ট হই নাই।

গোবিন্দ। আমি আপনার কন্তার বিবাহ রহিত করিয়াছি।

কৃষ্ণ। আমার কন্তার বিবাহ না হওয়া তাহার কোষ্ঠীর ফল।—কল্যাণময়ের কল্যাণময়ী ইচ্ছা আপনার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

গোবিন্দ। আমি আপনার স্বর্গগতা পত্নীর কুৎসা রটনা করিয়াছি।

কৃষ্ণ। কুৎসা তাঁহার কর্ণে পৌছায় নাই ;—তিনি যে রাজ্যে বাস করিতেছেন, সেখানে নিন্দা পৌছায় না। এক্ষণে এ সকল কথা ছাড়িয়া, আপনি বলুন, আপনার দুঃখটা কি ?

গোবিন্দ। প্রথম দুঃখ, আমি নিরন্ন, আমার অন্নের সংস্থান নাই। আগামী কল্য আমি কি খাইব তাহা আমি জানি না।

কৃষ্ণ। সহসা আপনার এরূপ অসচ্ছল হইবার কারণ কি ?

গোবিন্দ। আমার বাটীর পার্শ্বে এক খণ্ড জমীতে আমি একটি ফলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলাম। জমীটা আমার নহে ; প্রসন্ন দাসের। প্রসন্নদাসের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুত্র মাতুলালয়ে যাইয়া বাস করিতেছিল। তাহার অনুপস্থিত সময়ে আমি জমীটা হস্তগত করিয়াছিলাম। হস্তগত করিয়া, আপনাকে মহালাভবান্ মনে করিয়াছিল। পনের বৎসর পরে প্রসন্ন দাসের পুত্র আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিল। নবীন যুবা আমার নিকট আসিয়া তাহাদের জমীটা প্রার্থনা করিল। আমি বিদ্রূপ করিয়া, তাহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিলাম। সে অনুন্যোপায় হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমিও মকর্দ্দমা করিব বলিয়া কোমর বাঁধিলাম। স্ত্রীর অলঙ্কার এবং সামান্য লাখেরাজ যাহা ছিল, বন্ধক রাখিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিয়া, ভাল ভাল উকিল নিযুক্ত করিলাম। ধর্ম্মাধিকরণে, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, মিথ্যা বলিবার জন্য সাক্ষীগণকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। মকর্দ্দমায় আমার হার হইল। প্রসন্ন দাসের পুত্রের জমী প্রসন্ন দাসের পুত্র পাইল। ঋণের জন্য আমার জীবনোপায় লাখরাজ জমীগুলি বিক্রয় হইয়া যাইল। এই সময় বিপদের উপর মহা বিপদ্ ঘটিল। আমার জামতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কন্যার কলিকাতার বাটী এবং দ্রব্যজাত বিক্রয় করিয়া কন্যাকে লইয়া বাটী আসিলাম। কন্যা তাহার সমস্ত টাকা—পনের হাজার টাকা—আমার নিকট গচ্ছিত রাখিল। অভাবের সময় মনুষ্য যাহা করিয়া থাকে, আমিও তাহাই করিলাম ;—গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গচ্ছিত টাকা হইতে ব্যয় করিতে লাগিলাম। কয়েক মাস পরে কন্যা আপন অর্থ আমার নিকট প্রার্থনা করিল। বলিল, "আমার টাকা আমাকে দাও, আমি কোম্পানির কাগজ কিনিব।"

কৃষ্ণ। আপনি কি করিলেন ?

গোবিন্দ। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। গচ্ছিত টাকা হইতে আমি যে কিছু টাকা ব্যয় করিয়াছি, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কৃষ্ণ। কন্যার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে ভয়ের কারণ কি ?

গোবিন্দ। আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, কন্যাটি আপনার কন্যা নহে ; আমার কন্যা। বাল্যকালে সে যখন পাড়ার অপর কোনও কন্যাকে গালি দিতে পারিত, আমি তখন কত আনন্দিত হইতাম। তখন ত বুঝিতে পারি নাই যে, পরের মেয়েকে গালাগালি দিয়া, সে যে গালাগালিটা অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এখন আমারই উপর প্রযুক্ত হইবে। হায়! হায়! মোহ ঘোরে যে জাল বুনিয়া আপনাকে মহাবুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে মনে গৌরব করিয়াছিলাম, দেখিতেছি নিজেই এক্ষণে সেই জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, একেত সেই রূঢ়ভাষিণী কন্যা ; তাহাকে সহজেই ভয়

করিতে হয়। তাহার উপর নিজে চোরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলাম, কাজেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম।

কৃষ্ণ। তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেই ত হইত।

গোবিন্দ। প্রথমে তাহাই চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার গৃহিণীটিও সেই কন্যারই মাতা; দুই জনে মহা রণ বাঁধিয়া গেল; গালাগালি বিদ্যায় কে কম বুঝা গেল না। তাহার পর আমি একটি বুদ্ধি স্থির করিলাম। কন্যাকে বলিলাম, "তোমার যে টাকা আমি গ্রহণ করিয়াছি তাহার জন্য আমার ভদ্রাসন বাটী তোমাকে লেখা পড়া করিয়া দিব।" বাটী লেখা পড়া করিয়া দিলাম; কন্যা শান্ত হইল।

কৃষ্ণ। আপনার এ বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছে।

গোবিন্দ। আগে সকল কথা শুনুন্। তাহার পর উত্তমত্বের বিচার করিবেন।

যে দিন বাটী বিক্রয়ের কবলা খানা আনিয়া কন্যার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তাহার সাতদিন পরে, প্রসন্ন দাসের পুত্রটা টেরি কাটিয়া, লম্বা কোচা ঝুলাইয়া, চুরুট খাইতে খাইতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। মনে হইল কালীঘাটের পাঁটার মত তাহাকে গুপ্ করিয়া বলি দিয়া ফেলি। কিন্তু হাতে তখন খাঁড়া ছিল না, এবং তাহা থাকিলেও এ হাতে খাঁড়া তুলিবার শক্তি ছিল না। তাই ছোড়াটা বাঁচিয়া গেল। আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'মহাশয়, বাড়িটা কবে ছাড়িয়া দিবেন?' আমি ত অবাক! জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাড়ি তোমাকে ছাড়িয়া দিব কেন?' সে অম্লান বদনে উত্তর করিল,—'চারুশশী লেখাপড়া করিয়া বাটী আমাকে দান করিয়াছে!'—হায়! আকাশের বজ্র! তোমার প্রহারও এত কঠিন নহে!—মহাশয় আফিঙটা আমায় দিন; এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিব না।

কৃষ্ণ। আপনি পত্নীকে লইয়া, আমার বাটীতে আসিয়া বাস করুন; আমরা যত্নে আপনার সেবা করিব।

পাঠকগণ! তোমরা আশ্চর্য্য হইলেও ইহা সত্য যে, গোবিন্দলাল সমাজচ্যুত কৃষ্ণচাটুর্য্যের বাটীতে আসিয়া সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। এবং কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয়ের বাটীতে বাস কালে, গোবিন্দলালের পত্নী অম্বিকার চিবুক ধরিয়া এক দিন বলিয়াছিলেন, "মা, আমরা ত জানিতাম না যে, তুমি মানুষী নহ।"

কিন্তু কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় দেখিলেন যে, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কালাদহে বাস করা একান্ত অসম্ভব।—চারুশশীর নির্লজ্জতার আঘাত অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব, নাড়িচা গ্রামে গদাধরের কর্ম্মচারিরূপে তাঁহাকে বাসস্থান দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, তিনি উমাকালীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র পাইয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ জন্য উমাকালী গদাধরকে আহ্বান করিয়াছিল কিন্তু উমাকালী গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথা গদাধরকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

৪৬

ডাক্তারেরা কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, চক্ষের উপকারের জন্য প্রত্যহ কিছুকাল তাঁহার জলপথে ভ্রমণ করা আবশ্যক।—জল-বায়ুর শৈত্যে তাঁহার চক্ষের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিবে। তদনুযায়ী প্রত্যহ দিবাবসানকালে তিনি নৌকায় আরোহণ করিয়া গঙ্গাবক্ষে ইতস্ততঃ

বিচরণ করিতেন। কখনও তাঁহার বাক্যালাপের সঙ্গিনীরূপে, তিনি জলভ্রমণ কালে প্রিয়তমা কন্যা অম্বিকাকে সঙ্গে লইতেন।

একদিন অম্বিকাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি জলভ্রমণ জন্য বাহির হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন সান্ধ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই দিন প্রভাত পর্য্যন্ত অজস্র বৃষ্টিপাত হওয়ায়, বিকালে গঙ্গার জল অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল; কর্দ্দমাক্ত জলে মহাবেগে স্রোত বহিতেছিল। নৌকার পাটাতনের উপর বিস্তৃত ক্ষুদ্র গালিচায় পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অম্বিকা জলের স্রোতলীলা অবলোকন করিতেছিল। সে মানবজীবনের সহিত এই জল-স্রোতের উপমা মনোমধ্যে কল্পনা করিতেছিল। আমাদেরও জীবন পৃথিবীর ধূলি-কর্দ্দম সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন করিয়া, এই সমল জলরাশির ন্যায় মহামরণের দিকে এমনই তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। সূর্য্যের তাপে জলরাশি শুষ্ক হয়; তখন কর্দ্দমাদি ত্যাগ করিয়া, তাহা বাষ্পরূপে আকাশে উঠে; আমরাও বুঝি তপস্যার তাপে পৃথিবীর ক্লেদত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিব।

গঙ্গার চঞ্চল বিস্তৃত বক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অম্বিকা সহসা চমকাইয়া উঠিল। তাহার বোধ হইল, দূরে স্রোত মধ্যে জীবন সঙ্কট পড়িয়া কে যেন হস্ত সঞ্চালন করিতেছে। বহুদিনের পূর্ব্বের কথা তাহার স্মরণ পথে উদিত হইল। তাহার গদাধর একদিন এমনই বিপদে পড়িয়াছিল। করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সে তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, দূরে চাহিয়া দেখ, কে যেন স্রোত মধ্যে পড়িয়া, সাহায্য পাইবার জন্য হস্ত সঞ্চালন করিতেছে; ঐ দিকে সত্বর নৌকা চালনা করিবার জন্য নাবিকগণকে আদেশ দাও।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের আদেশ পাইয়া নাবিকেরা প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালনা করিল। তরী সঙ্কটাপন্নের অনুসন্ধানে তীরের ন্যায় ছুটিল।

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে ললাটে হস্তার্পণ করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আজ কি বার?—শনিবার। গদাধরের পত্র পাইয়াছিলাম সোমবারে। সে পত্র সে রবিবারে লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল যে পরদিন সে নাড়িচা আগমন করিবে। তাহা হইলে, সে সোমবারেই নাড়িচা আগমন করিয়াছিল। পাঁচ দিন নাড়িচায় থাকিয়া আজ শনিবারে তা'র কলিকাতা ফিরিবার কথা। সর্ব্বনাশ! বুঝিবা তাহারই কোন বিপদ্ ঘটিল।" কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নাবিকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "চালাও; চালাও, আরও জোরে নৌকা চালাও; আজ গঙ্গাধরের কলিকাতা ফিরিবার কথা ছিল, বুঝি বা তাহারই কোনও বিপদ্ ঘটিয়াছে। জানি না, বুঝি তাহারই বিপদ্ আশঙ্কায় আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

পিতার বাক্য শুনিয়া, অম্বিকার প্রাণ ওষ্ঠে আসিল। সে বুঝিতে পারিল না কি একটা মহাভাবে তাহার হৃদয় বিহ্বল হইয়া পড়িল। এক দিকে গদাধরের বিপদ্ অনুমান করিয়া হৃদয় মধ্যে মহা অবসন্নতার স্রোত বহিতেছিল; অন্যদিকে গদাধরের জীবনোদ্ধার করিবার সম্ভাবনায় একটা মহা উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। দুইটা বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গের মধ্যে তাহার হৃদয়টা, বাত্যান্দোলিত অতসী-পুষ্পের ন্যায় দুলিতেছিল। এবং তাহাকে নিতান্ত কাতর করিয়া তুলিয়াছিল।

তাহার হৃদয়ের সমস্ত কাতরতা, তাহার বিশাল এবং করুণ চক্ষু দুইটির মধ্যে নিহিত করিয়া, সে নির্নিমেষ লোচনে জল প্রবাহ মধ্যে পূর্ব্ব দৃষ্ট স্থানের দিকে চাহিয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে নৌকাখানি সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। জয় জনার্দ্দন! তোমার কৃপায় আর কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার গদাধরের জীবন রক্ষা হইবে।

কিন্তু, না। নৌকা নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে যে দ্রব্যটা জলের উপর সঞ্চালিত হইতেছিল, তাহা স্রোত মধ্যে অন্তর্হিত হইল। মাঝিগণ চিৎকার করিয়া উঠিল। কহিল, "আর উপায় নাই, স্রোত অত্যন্ত প্রখর। এ প্রখর স্রোত মধ্যে আর তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।" মাঝিদিগের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের হৃদয়স্পন্দন থামিয়া গেল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "অম্বিকা?"

তাঁহার আহ্বান অম্বিকার কর্ণে প্রবেশ করিবার আগে, অম্বিকা জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল। অম্বিকার সন্তরণ পারদর্শিতা সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত থাকিয়া, নাবিকগণ ভীতিবিচলিত হৃদয়ে তাহাকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন; কহিলেন, "আমার কন্যা সন্তরণ-বিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছে; তোমাদিগের কোনও চিন্তা নাই। তথাপি তোমরা নৌকাটা উহার নিকটবর্ত্তী রাখিও।" নাবিকেরা তাহাই করিল।

যেস্থানে গদাধর নিমজ্জিত হইয়াছিল বলিয়া সে অনুমান করিয়াছিল, অতি দ্রুত বেগে সেই স্থানে আগতা হইয়া, অম্বিকা তাহার প্রাণাধিক প্রাণের অনুসন্ধান জন্য জল মধ্যে প্রবেশ করিল। জলমধ্যে কোথাও তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া, নিশ্বাস গ্রহণ জন্য সে জলের বাহিরে মাথা তুলিল। একটা বৃহদাকার কাষ্ঠ খণ্ড প্রবল স্রোত বেগে ঋজুভাবে ভাসিয়া আসিতেছিল। অম্বিকা জলের বাহিরে মস্তক উত্তোলন করিবা মাত্র, তাহা, সেই বৃহৎ কাষ্ঠের এক প্রান্ত দ্বারা প্রচণ্ড বেগে প্রহৃত হইল। মস্তকে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, অম্বিকার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। স্বর্ণকমল জন্মের মত জলে ডুবিল। বিধাতার লিখিত ভাগ্যলিপি সফল হইল

বৃদ্ধ, মহাজ্ঞানী কৃষ্ণ চাটুর্য্য মহাশয় আপন বিরলপক্ক কেশরাশি সবলে মুষ্টি মধ্যে গ্রহণ করিয়া, হাহাকার রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নাবিকেরা নৌকা লইয়া, রজ্জু লইয়া, জলে নামিয়া, ডুবিয়া, নানারূপ অনুসন্ধান করিল, কিন্তু পঙ্কিল জল মধ্যে সে পঙ্কজিনীর আর দেখা পাওয়া গেল না। গঙ্গার তরল, তরঙ্গিত অঞ্চল মধ্যে, সে কোথায় লুকাইল কে জানে? তুমি গঙ্গা! তুমি কত পূজার পুষ্প আপন বক্ষে গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আজ যে পুষ্পটি তোমার বক্ষে স্থান লাভ করিল তাহা অতি পবিত্র!—অপার্থিব!!

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ধনুর্বেদ।

সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদের কথা সকলেই জানেন। ঋক্ বা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ আয়ুর্বেদের সত্তাও কাহারও অপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু ইহা ভিন্নও আমাদিগের দেশে গান্ধর্ববেদ ও ধনুর্বেদ নামে আরও দুইখানি বেদ ছিল। গান্ধর্ব্ববেদে সঙ্গীত ও ধনুর্বেদে অস্ত্রশস্ত্রাদির বিষয় বিবৃত। এই ধনুর্বেদবিষয়ে উত্তরকুরুবাসী সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, মহর্ষি ভার্গব, দেবরাজ ইন্দ্র ও চতুঃষষ্টি কলায় পূর্ণাভিজ্ঞ জগবন্দ্য শূলপাণিও ভিন্ন ভিন্ন সংহিতার প্রণয়ন করেন, কিন্তু তৎসমুদয় এখন হয় মহাকালের কুক্ষিগত, নতুবা কোথায় কোন্ গিরিগুহায় লোকলোচনের অবিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ও কীটগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। আমরা এই প্রবন্ধে শিবান্তেবাসী মহর্ষি বশিষ্ঠপ্রণীত ধনুর্বেদের কথা বলিব। ইহাতে ধনুর্বেদের অধ্যাপক ও শিষ্য কে হইতে পারিবে, ভারতীয় আর্য্যগণের কত প্রকার অস্ত্র ও শস্ত্র ছিল, রাজা কি প্রকারে ধনুঃ, বাণ ও নালিক শতঘ্নী প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রসাহায্যে আপনার রাজ্য ও দুর্গ রক্ষা করিতেন, তাহা সবিস্তার বর্ণিত আছে। ইহার প্রারম্ভে লিখিত রহিয়াছে—

অথৈকদা বিজিগীষুর্বিশ্বামিত্রো রাজর্ষি গুরুং বশিষ্ঠম্ অভ্যুপেত্য প্রণম্য উবাচ—ব্রূহি ভগবন্ ধনুর্বিদ্যাং শ্রোত্রিয়ায় দৃঢ়চেতসে শিষ্যায় দুষ্টশত্রুবিনাশায় চ। তমুবাচ মহর্ষিব্রহ্মর্ষিপ্রবরো বশিষ্ঠঃ শৃণু ভো রাজন্ বিশ্বামিত্র যাং সরহস্যধনুর্বিদ্যাং ভগবান্ সদাশিবঃ পরশুরামায় উবাচ তামেব সরহস্যাং বচ্মি তে হিতায় গোব্রাহ্মণ সাধুবেদরক্ষণায় চ যজুর্বেদাথর্ব্বসম্মিতাং সংহিতাম্।

কোন এক সময়ে বিজয়েচ্ছু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আপনার গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্ আমি দুষ্টশত্রুগণের বিনাশের নিমিত্ত আপনার নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতে অভিলাষী। আমি দৃঢ়চেতাঃ আমাকে শিক্ষা দান করিলে তাহা বিফল হইবে না। মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বলিলেন হে রাজন্! ভগবান্ সদাশিব যোদ্ধৃকুলধুরন্ধর পরশুরামকে যে সরহস্য ধনুর্বেদের শিক্ষা দান করিয়াছিলেন আমি গো, ব্রাহ্মণ, সাধু ও বেদরক্ষার নিমিত্ত সেই ধনুর্বিদ্যাই তোমাকে শিখাইব। এই ধনুর্বেদসংহিতা যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ তুল্য মর্য্যাদাভাক্।

তত্র চতুষ্টয়পাদাত্মকো ধনুর্বেদঃ যস্য প্রথমে পাদে দীক্ষাপ্রকারঃ, দ্বিতীয়ে সংগ্রহঃ তৃতীয়ে সিদ্ধপ্রয়োগঃ, চতুর্থে প্রয়োগবিষয়ঃ ॥২

ধনুর্বেদ চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দীক্ষা বা উপদেশ, দ্বিতীয় অংশে অভ্যাস করার বিধি, তৃতীয় অংশে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপবিধি ও চতুর্থভাগে অস্ত্রসন্ধানবিধি বিবৃত।

ধনুর্বেদে গুরুর্বিপ্রঃ প্রোক্তো বর্ণদ্বয়স্য চ।
যুদ্ধাধিকারিঃ শূদ্রস্য স্বয়ং ব্যাপাদিশিক্ষয়া ॥৩

শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণকেই ধনুর্বেদেরও অধ্যাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আপৎকাল ভিন্ন তাঁহার যুদ্ধাধিকার প্রদত্ত হয় নাই। কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণই একমাত্র যুদ্ধাধিকারী। শূদ্রগণ শুদ্ধ মৃগয়া নিমিত্ত ধনুর্বেদ শিক্ষা করিতে অধিকারী হইবে। ধনুর্বেদশিক্ষার প্রয়োজন কি?

দুষ্টদস্যুচৌরাদিভ্যঃ সাধুসংরক্ষণং ধর্ম্মতঃ।
প্রজাপালনং চ ধনুর্বেদস্য প্রয়োজনম্ ।৫

দুষ্ট লোক, দস্যু ও তস্করপ্রভৃতি হইতে সাধুগণকে রক্ষা করা ও ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন নিমিত্ত ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজন।

একোঽপি যত্র নগরে
প্রসিদ্ধঃ স্যাৎ ধনুর্দ্ধরঃ।
ততো যান্ত্যরয়ো দূরাৎ
মৃগাঃ সিংহগৃহাদিব ॥৬

যদি কোন নগরে একজনও প্রসিদ্ধ ধনুর্দ্ধর থাকে, তাহা হইলে যে প্রকার লোক সকল সিংহের বাসস্থানের দূর দিয়া গমন করে, তদ্রূপ শত্রুগণ উক্ত নগরের দূর দিয়া গমন করিয়া থাকে, সে নগরে আর প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না।

চতুর্ব্বিধ মায়ুধম্। মুক্তম্, অমুক্তং,
মুক্তামুক্তং যন্ত্রমুক্তঞ্চ।৪

আয়ুধ চারি প্রকার—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত। যাহা হস্তদ্বারা শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা যায়, সেই আয়ুধের নাম অস্ত্র। যেমন চাকা, বোমা প্রভৃতি। আর যাহার অল্পাংশ হাতে থাকে, একাংশ শত্রুদেহে পাতিত হয়, তাহার নাম অমুক্ত আয়ুধ বা শস্ত্র। যেমন খড়্গকৃপাণাদি। আর বর্শা, বল্লম, সুলফি (সর্কি) ও গদা প্রভৃতির নাম মুক্তামুক্ত আয়ুধ। আর যে সকল অস্ত্র যন্ত্রসাহায্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে উহাদের নাম যন্ত্রমুক্ত আয়ুধ। যেমন তির-গোলা-গুলি প্রভৃতি।

এই তির, গোলা ও গুলিনিক্ষেপক যন্ত্রের নামই যথাক্রমে ধনুঃ, কামান ও বন্দুক। আমাদিগের দেশে কি কামান ও বন্দুক ছিল? তাহা হইলে বশিষ্ঠ কেন বলিলেন—

ধনুশ্চক্রং চ কুন্তং চ খড়্গঞ্চ ক্ষুরিকা গদা।
সপ্তমং বাহুযুদ্ধং স্যাৎ এবং যুদ্ধানি সপ্তধা॥৯

ধনু, চক্র, কুন্ত (কোঁচ), খড়্গ, ছোরা, গদা (লাঠী) ও বাহুযুদ্ধ, যুদ্ধ সমুদয়ে এই সাত প্রকার।

হাঁ যুদ্ধ সাধারণতঃ এই সাত প্রকারই বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে কামান ও বন্দুক এবং কামানবন্দুকের যুদ্ধও ছিল, কিন্তু উহা অতি লোকক্ষয়কর বলিয়া ধর্ম্মপ্রাণ মন্বাদি ঋষিরা উহার ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥
৯০-৭অ

মনু বলিতেছেন, যোদ্ধৃগণ কখন কূট আয়ুধ, অর্থাৎ বহিঃকাষ্ঠময় অন্তর্গুপ্তশস্ত্র অস্ত্র অথবা বিষাক্ত শর, বিষাক্ত গুলি, কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র (কামান বন্দুক) ব্যবহার করিবেন না। উক্তঞ্চ শ্রীমতা শুক্রাচার্য্যেণ—

নালিকাস্ত্রেণ তৎযুদ্ধং মহাহ্রাসকরং রিপোঃ।
৩৩৬—৪অ-৭প্র

যেহেতু নালিকাস্ত্রদ্বারা যে যুদ্ধ করা হয়, তাহাতে শত্রুপক্ষের মহাহ্রাস হইয়া থাকে। উহা পরমার্থতঃ ধর্ম্মযুদ্ধ বা বীরত্বমূলক কার্য্য নহে। এইজন্যই ন্যায়পরায়ণ ভারতীয় ঋষিগণ ঐ সকল অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে অনুশাসন করেন।

এখনকার ত মনু বা শুক্রাচার্য্য কামান ব বন্দুকের কথা বলিলেন না? কামান ম্লেচ্ছ শব্দ ও বন্দুক যাবনিক শব্দ, ঐ সকল অস্ত্রও ম্লেচ্ছ ও যবনগণকর্ত্তৃক সমুদ্ভাবিত, ঐ সকল বিজ্ঞানসম্মত অস্ত্রশস্ত্র কখনই আমাদিগের ছিল না। না এ কথা কখনই সত্য ও সঙ্গত নহে। মনু যে অগ্নিজ্বলিততেজন কর্ণীর উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই কামান এবং শুক্রাচার্য্যের নালিকাস্ত্রই কামানবন্দুক। উক্তঞ্চ শুক্রাচার্য্যেণ—

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।
১৯৫—ঐ

নালিকাস্ত্র দুই প্রকার—বৃহন্নালিক ও ক্ষুদ্রনালিক। এই বৃহন্নালিক অস্ত্রই কামান

ঙ ক্ষুদ্র নালিকাস্ত্রই বন্দুক। উক্তঞ্চ
তির্য্যগূর্দ্ধচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকং।
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদিতিলবিন্দুযুতং সদা ॥১৯৬
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবখণ্ডধৃক্‌কর্ণমূলকং।
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্ ॥১৯৭
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দৃঢ়ং।
লঘু-নালিক মপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥
১৯৮

যে আয়ুধের নালের দৈর্ঘ্য পাঁচ বিঘত, যাহার গোড়ায় ছিদ্র আছে ও গোড়া হইতে উপরের দিক্ পর্য্যন্ত ভিতরটা ছিদ্রময় বা ফাঁপা, লক্ষ্য ঠিক করিবার নিমিত্ত যে নালের অগ্রভাগ ও গোড়ায় দুইটি তিলবিন্দু বা মাছি থাকে, যে নালের উপাঙ্গ উত্তম কাষ্ঠ নির্ম্মিত, নলের ছিদ্র মধ্যমাঙ্গুলিপরিমিত যাহাতে লৌহময় কাণ ও আঘাতে অগ্নি নিঃসৃত হয় এমন প্রস্তরখণ্ড ও বারুদ গাদানের শলা থাকে, তাহারই নাম লঘু নালিক বা বন্দুক। ইহা পদাতিক ও অশ্বারোহিসৈন্যগণধার্য্য। ইহার বন্দুক নাম হইল কি কারণে? উক্তঞ্চ শ্রীমতা মহর্ষি-বশিষ্ঠেন—বাণভঙ্গকরাবর্ত্তকাষ্ঠচ্ছেদনমেব চ।
বিন্দুকং গোলকযুগং যোবেত্তি স জয়ী ভবেৎ॥
৫২ ধনুর্ব্বেদ সংহিতা—৫১পৃষ্ঠা

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন ক্ষুদ্রনালিকাস্ত্রের আগায় ও গোড়ায় দুইটী তিলবিন্দু থাকে। বশিষ্ঠও বলিতেছেন যে—নালিকাস্ত্রে দুইটী গোল বিন্দুক থাকে। এই বিন্দুক থাকে বলিয়াই তবান্ নালিকাস্ত্র "বন্দুক" নামের বিষয়ীভূত হইয়াছে। বশিষ্ঠ বলিতেছেন যে—
নালীকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ॥ ৭৪
—২৭ পৃ

এই নালিকাস্ত্রের বাণ বা গুলি অতীব দ্রুতগামী, ইহা নলযন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতি উচ্চস্থান বা অতিদূরে যেখানে তির বা কৃপাণাদি কার্য্যকর হয় না, তথায় ও দুর্গযুদ্ধে এই নালিকাস্ত্র প্রশস্ত। শুক্রাচার্য্য তৎপরই বলিতেছেন যে—
যথা যথা তু ত্বক্‌সারং যথাস্থূলবিলান্তরং।
যথা দীর্ঘং বৃহন্নালং দূরভেদি তথা তথা ॥১৯
৪অ। ৭প্রকরণ

যে প্রকার বংশখণ্ডের ভিতর ফাঁপা নালিকাস্ত্রের নলও তদ্রূপ ফাঁপা। উহা যত লম্বা ও উহার গুলি যত বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইতে পারিবে।
মূলকীলভ্রমাৎ লক্ষ্যসমসন্ধানভাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতং।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্ ॥
২০০ ঐ

আর যে নালের মূলে একটী কীল বা খিল আছে, যাহা ঘুরাইয়া দিলে লক্ষ্যে গোলকপাত হয়, যাহার কাঠের বাঁট নাই, নালও অনেক বড় ও লোকে যাহা শকট প্রভৃতিতে উঠাইয়া এক স্থানহইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, তাহারই নাম বৃহন্নালিক বা কামান। ইহার যুদ্ধই উত্তম যুদ্ধ ও তাহাতে জয়লাভও অবশ্যম্ভাবী।

ইহারই গোড়ায় কাণ থাকে বলিয়া ইহার নামান্তর কর্ণী বা কর্ণকাবতী। উক্ত কর্ণী শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া গন্নি ও Gun এবং কর্ণকাবতী শব্দ অপভ্রংশে কন্না হইয়া লাটিনের canna শব্দ ব্যুৎপাদিত হয়, পরে তাহাই ফরাসী ভাষায় Canon ও ইংরাজীভাষায় Cannon গড়াইয়া দিয়াছে। আমরা আবার সেই ঘরের নাতী Cannonকে কামান বানাইয়া লইয়াছি। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুর্ব্বি—
এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবতী এতয়া হ স্ম
বৈ দেবা অসুরাণাং শতভর্হান্ তৃংহন্তি। ৩৮
এই যে সূর্ম্মী, ইহা কর্ণবিশিষ্ট। দেবতারা ইহাদ্বারা অসুরদিগের শত শত যোদ্ধাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

আচ্ছা এই কর্ণকাবতীর আবার সূর্ম্মী নাম হইল কেন? ঋক্‌বেদে বজ্র বা কামানকে শর্ম্মও বলিয়াছেন। উক্ত শর্ম্ম শব্দই অপভ্রংশে সূর্ম্মী হইয়াছে। উহার অর্থও বজ্র বা কামান।

সপ্ত যৎ পুরঃ শর্ম্ম শারদীঃ

দর্ত্ত্ হন্ দাসীঃ ১০।২০সূ। ৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যং যৎ যস্মাৎ কারণাৎ হে ইন্দ্র ত্বং শারদীঃ শরন্নায়ঃ অসুরস্য সপ্ত পুরঃ পুরীঃ শর্ম্ম শর্ম্মণা বজ্রেণ দর্ত্ত্ বিদারিতবান্।

যদি কর্ণী, কর্ণকাবতী, সূর্ম্মী, শর্ম্ম ও বজ্র প্রভৃতি লৌহময় কামানই হয়, তাহা হইলে কেন অমরাদি বিদ্যুৎপাতকে বজ্রপাত প্রভৃতি বলিলেন? ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন—

দধে হস্তয়ো র্বজ্র মায়সম্।

৪-৮১ সূ—১ম

ইন্দ্র দুই হস্তে লৌহনির্ম্মিত বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন। যাহা লৌহনির্ম্মিত ও হস্তধারণযোগ্য, তাহা বিদ্যুৎ হইতে পারে না। ইহা পৌরাণিক ভ্রান্তি। তথাহি—

পব্যা রথানাম্ অদ্রিং ভিন্দন্তি ওজসা।

৯—৫২সূ—৫ম

ইন্দ্র রথবাহিত পবি বা বজ্রদ্বারা বল ক্রমে পর্ব্বত সকল ভেদ করিয়া থাকেন।

আমরা বাহুল্যভয়ে অধিক প্রমাণের সমাহার করিলাম না। এই দুইটী মন্ত্র দ্বারাই জানা যাইতেছে যে ইন্দ্রের বজ্র লৌহময় ছিল, উহার একটী হস্তধার্য্য অন্যটী রথবাহ্য। তাই শুক্রাচার্য্য ক্ষুদ্র নালিক ও শকটবাহ্য বৃহন্নালিকের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা বেদমূলক, সুতরাং যাহারা শুক্রনীতির এই বর্ণনাসমূহকে আধুনিক মনে করেন, তাঁহারা কত দূর স্বদেশদ্রোহী, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন।

আচ্ছা তবে কেন অমরাদি বজ্রের নাম "শতকোটি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? হাঁ বেদে বজ্রের নাম শতপর্ব্বা ও শতঘ্নীও রহিয়াছে। শতপর্ব্বার অর্থ—এক শত পাব বিশিষ্ট, সুতরাং উহা বিদ্যুৎ হইতে পারে না। আবার "শতকোটি" বিশেষণদ্বারাও এমন কিছু বুঝিতে হইবে না যে উহা এক শত প্রান্তবিশিষ্ট কিমাকার কিস্তূত পদার্থ যাহা কামানহইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র!

হাঁ শতকোটিশব্দের অর্থ—"শত ধার বিশিষ্ট" হইলে তাহা কামানের অববোধক হইতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ শতকোটি শব্দের অর্থ শতধারবিশিষ্ট নহে। এ বিষয় শব্দসারপ্রভৃতি অভিধান ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম বলিতেছেন—

শতং কোটয়ঃ অগ্রাঃ শিখা যস্য

বজ্রম্—ইত্যমরঃ।

আমরা এই ব্যাখ্যাও সত্যগন্ধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পণ্ডিতেরা বজ্রকে বিদ্যুৎ ভাবিয়া এই বিকৃতার্থের উদ্বমন করিয়াছেন। টীকাকার রঘুনাথচক্রবর্ত্তীও বলিতেছেন যে—

শতং কোটয়ো ধারা যস্য

ইহাকে আমরা ঠিক বলিয়া মনে করিতে অসমর্থ। ফলতঃ এই কোটি শব্দের অর্থ এখানে ধার বা প্রান্ত নহে। ইহার অর্থ দাহ বা দাহনকারী কিংবা ছেদনকারী।

শতং কোটয়তে দহতীতি

(কুট দাহে), ছিনত্তি বা

(কুট ছেদনে) শতকোটিঃ।

যাহার প্রহারে শত শত লোক মরিয়া যায়, তাহার নামই শতকোটি। তাই বজ্রের নামান্তর "শতঘ্নী"।

শতং হন্তীতি শতঘ্নী।

যে শতকে বধ করে। বেদও ঐ কারণে বজ্রকে শতঘ্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যদাহ কৃষ্ণযজুঃ—

বজ্রমেব এতচ্ছতঘ্নীং যজমানো
ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি। ৩৭পৃ।

দেবযজমানগণ শতঘ্নী বা বজ্রদ্বারা আপনাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ দৈত্যদানবদিগকে প্রহার করিয়া থাকেন। আচ্ছা তবে কেন মহামহোপাধ্যায় বিজয় রক্ষিত বলিতেছেন যে—

ইয়ং কণ্টকসংছন্না শতঘ্নী ভবতি শিলা।

যে প্রস্তরখণ্ডে বহু লৌহকণ্টক প্রোথিত থাকে, তাহারই নাম শতঘ্নী।

হাঁ তিনি এইরূপ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার এ উক্তি বেদবিরুদ্ধ হইতেছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার ধনুর্ব্বেদেও বলিতেছেন যে—
সিংহাসনস্য রক্ষার্থং শতঘ্নীং স্থাপয়েৎ গড়ে।
রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপ্যঞ্চ বহু ধীমতা॥
৭৫—২৭পৃ

রাজা আপনার সিংহাসনরক্ষায় জন্য দুর্গে শতঘ্নী স্থাপন করিবেন। আর বুদ্ধিমানেরা তথায় অনেক বারুদ ও গোলা গুলিও রাখিবেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বহু স্থানেও এই শতঘ্নী বা কামানের কথা রহিয়াছে। তথাহি—

উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাং।১১
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্ ১৩-৫

বেশ বুঝা গেল যে অযোধ্যা পরিখাপরিবেষ্টিত দুরাক্রম্য দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল দুর্গের উপর শত শত শতঘ্নী বা কামান পাতা থাকিত।

তবে আমাদিগের এ সকল কামান বন্দুক যাইয়া কেবল তির ও ধনুক থাকিল কেন? যেহেতু উহা বড়ই নরহত্যামূলক তাই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় আর্য্যগণ উহার পরিহার করিয়া শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥ মনু

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

ভারতী-মঙ্গল কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

পয়ার।

শঙ্খচূড় ইন্দ্র হৈয়া বসিল আসনে।
সোম সূর্য্য অগ্নি জল, হৈল দৈত্যগণে॥
মাস পক্ষ অহোরাত্র অয়ন বৎসর।
ঋতু আদি করি সব হৈল দৈত্যেশ্বর॥
কালোচিত করে কর্ম্ম পূর্ব্ব প্রায় মতে।
হেন মতে ইন্দ্রত্ব করয়ে দৈত্যনাথে॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব আর ঐরাবত হাতী।
পূর্ব্বেই করিছে বশ জিনি শচীপতি॥
অমরা সমান পুরী করিল নির্ম্মাণ।
শুন কালিদাস তার কি কব বাখান॥
কনক প্রাচীর শোভা করে চারি ভিতে।
উপরে কলস তার চক্রের সহিতে॥
হেমের করিছে হর্ম্ম্য অতি মনোহর।
চামর পতাকা ঘণ্টা শোভে তদুপর॥
মধ্য প্রকোষ্ঠেতে চরি করিছে ভবন।
দর্পণে করিছে সব ঘর আচ্ছাদন॥
মণিময় স্বর্ণ সিংহাসন আছে তাতে।
সভা করি সদা তথা বৈসে দৈত্যনাথে॥
অধিক সাবাস্থ মতে সম্মুখ দুয়ারে।
ধনু হস্তে থাকে শত সহস্র অসুরে॥
হইল শঙ্খের বশ এ তিন ভুবন।
অনাথের মত হৈয়া ফিরে দেবগণ॥

প্রাণভয়ে জলে বনে পলাইয়া ফিরি।
দাস জানি কৃপা করি তার মহেশ্বরী॥
প্রজার ভূমিপ (১) গতি বালকের মাতা।
ইহা জানি দেবসনে আসিলাম এথা॥
দেবাসুর নাগনর পতঙ্গ প্রভৃতি।
সকলি হয়াছে মাতা তোমাতে উৎপত্তি॥
শঙ্খরূপ সিন্ধুতে পড়িছে দেবগণে।
তাতে তরী হয়ে তারা তরাবে আপনে॥
ইন্দ্রের শুনিয়া স্তুতি ত্রৈলোক্যতারিণী।
সুমধুর স্বরে কিছু কহিলেন বাণী॥
যাইব অবশ্য রণে ব্যাজ নাহি আর।
যুদ্ধহিত চিন্তা যায়া কর আপনার॥
এত শুনি মঘবন্ত প্রণাম করিয়া।
কার্ত্তিক নিকটে চলে হরষিত হৈয়া॥
নির্জ্জর সংহতি শক্র দ্রুতগতি ক্রমে।
উপনীত হৈলা যায়া কার্ত্তিকের ধামে॥
করি যোগ্য সম্ভাষণ সহস্রলোচনে।
নিবেদে সকল দুঃখ শক্তিধর স্থানে॥
যেন রূপে শঙ্খচূড়ে করিয়াছে জয়।
অমর অরণ্যবাসী পায়া প্রাণে ভয়॥
তাহাতে আপনে মুখ্য বট সেনাপতি।
তবে কেন দেবতার এতেক দুর্গতি॥
আপনে এখনে মন দিয়া কর রণ।
তবে শঙ্খচূড় হবে অবশ্য নিধন॥
শুনি ষড়ানন তূর্ণ দিলেন উত্তর।
নিশ্চয় যাইব আমি করিতে সমর॥
এত বলি তূর্ণ পূর্ণ তুণ শর সাথে।
পৃষ্ঠে বান্ধি শরাসন লইলেন হাতে॥
কলেবরে কনক কবচ দিল তুলি।
শ্রবণে কুণ্ডল চারু জিনিয়া বিজলী॥
রতন মুকুট দিল শিরের উপর।
ললাটে চন্দন ফোঁটা জিনি শশধর॥
মুকুতার হারগলে মাণিক্যে রাজিত।
কটিতে বান্ধিল বস্ত্র কাঞ্চনে রচিত॥

(১) রাজা।

আরক্ত রাঙ্কব যুক্ত উপানৎ পায়।
কলাপী বাহনে চড়ি চলিল ত্বরায়॥
মহেশ নিকটে আসি হৈল উপস্থিতি।
ভূমে নমি দণ্ড সম করিলেন নতি॥
আশীর্ব্বাদ কৈলা হর শিরে দিয়া কর।
বাম ভাগে এক পাশে বসে শক্তিধর॥
ভদ্রকালী ডাকিনী যোগিনীগণ সনে।
মস্তকে মুকুট তুলি দিলেন তখনে॥
মুক্তকচ আউলাইয়া পড়িছে ভূমিতে।
নব ধূমযোনি যেন শোভে গগনেতে॥
গলে দিলা মুণ্ডমালা শবশিশু কাণে।
বিচিত্র শার্দ্দূলচর্ম্ম শোভে পরিধানে॥
চরণকমলে শোভে নূপুর সোনার।
শরধনু হস্তে সিংহপৃষ্ঠে আসোয়ার॥
উপনীত হৈলা আসি শিবসন্নিধানে।
নতি করি তিষ্ঠিলেন অর্দ্ধেক আসনে॥
ইহা দেখি শূলপাণি ইন্দ্রকে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
সুসজ্জ করহ শীঘ্র অমরবাহিনী।
না করিবে ব্যাজ আর শুন বজ্রপাণি॥
ইহা শুনি ইন্দ্র বলে ডাকিয়া সারথি।
স্যন্দন সাজায়ে আন অতি লঘুগতি॥
পবনেকে প্রেরে পুন দেব পুরন্দর।
সব দেবসেনা তুমি আনহ সত্বর॥
চন্দ্র সূর্য্য কুবের বরুণ আদি করি।
বায়ু দূতে জানাইল ঘরে ঘর ফিরি
দিবা বিভাবরী ভাবি ভগবতী মনে।
ভারতী ভাবিয়া ভাবা ভূপাম্বুজে ভণে॥

ত্রিপদী।

সাজিল অমর সেনা, দৈত্য সনে দিতে হানা,
যার যেই ভূষণ বাহনে।
ধূলে হৈল অন্ধকারে, চলে দর্প অহঙ্কারে,
কৈলাসে চলিলা হর্ষ মনে॥
মার্ত্তণ্ড দ্বাদশ জন, রথে করি আরোহণ,
অস্ত্রশস্ত্র লৈয়া আপনার।

শতাঙ্গ দ্বারেতে হৈয়া, গেলেন পদাতি হৈয়া
জানাইলা হরে নমস্কার ॥
রথে চড়ি দ্বিজরাজ, করিয়া অপূর্ব্বসাজ,
শঙ্করকে জানাইলা নতি।
শিবের আদেশ পাইয়া, নিজ যোগ্য স্থান চাইয়া
আসনে বসিল নিশাপতি ॥
জলাধিপ স্ববাহিনে, আসি মিলে শিবস্থানে,
নতি করি বৈসে যোগ্যাসনে।
হেনকালে ধনেশ্বর, মহেশকে যুড়ি কর,
প্রণমিয়া তিষ্ঠে যোগ্য স্থানে ॥
চতুর্দ্দশ রবিসুত, তার সাজ অদভুত,
মহিষপৃষ্ঠেতে দণ্ড হাতে।
মহেশের সগোচরে, গল বস্ত্রে যোড়করে,
দণ্ডবৎ কৈল ভূমিগতে ॥
তনু অতি সুলক্ষণ, আসি মিলে হুতাশন
চন্দ্রচূড় কাছে কুতুহলে।
নম্র হৈয়া যোড় হাতে, মাটি ছোয়াইয়া মাথে,
নতি করি তিষ্ঠে এক স্থলে ॥
বিংশতি দ্বিগুণ করি, খণ্ড দিয়া তদুপরি
এই সংখ্যা আসিল পবন।
আসি অতি দ্রুতগতি, শিবকে করিয়া নতি,
বসিতে বলিলা পঞ্চানন ॥
চতুঃষষ্টি গণরাজ, জানি গুরুতর কাজ,
মূষিকবাহনে উত্তরিলা।
দণ্ডসম ভূমি পড়ি, হরকে প্রণাম করি,
যোগ্যমত আসনে বসিলা ॥
সম্বর্ত্তাদি চারি মেঘ, করিয়া বিষম বেগ,
আসি মিলে কৈলাস শিখরে।
শঙ্কর নিকটে যাইয়া, অতি সবিনীত হৈয়া,
নমস্কার কৈলা যোড় করে ॥
যত দিক্‌পাল সব, করি সাজ অসম্ভব,
কৈলাসেতে হৈলা উপনীত।
কপর্দ্দী নিকটে যায়া, ভূমিগতে সম্ভাষিয়া,
আসনে বসিলা একত্রিত ॥
স্বর্গে যত দেব বৈসে, আসিল শিবের পাশে,
এক মুখে না হয় গণন।
যার যেই অস্ত্র লৈয়া, সব্যস্তে সসজ্জ হৈয়া,
আইলা যথা আছে পঞ্চানন ॥
সুন্দর সাজায়া যান, আনিলেক বিদ্যমান,
মাতলি সারথি মহাশয়।
কি কব রথের সাজ, যা'তে চড়ে দেবরাজ,
শুভ্রবর্ণ বটে চারি হয় ॥
স্বর্ণময়-চারিক্ষুর, চরণে কিঙ্কিনী জোড়,
চলিতে বাজয়ে ঘোর নাদে।
গলাতে পদক সারি, লোহিত পাটের ডুরি,
দিয়া তাকে দৃঢ় করি বান্ধে ॥
শিরে মণিময় চূড়া, চৌদিকে মুকুতা জড়া,
গ্রীবা অগ্রে মাণিক্যের হার।
মুখে রেশমের ডুরি, সারথি রাখিতে ধরি,
তাহে গুণা মিশ্রিত সোণার ॥
পট্টবস্ত্র রক্তরঙ্গ, তা দিয়া ঢাকিছে অঙ্গ,
মধ্যে মধ্যে কাঞ্চনের ফুল।
কি দিব উপমা তায়, দ্যুতি বিদ্যুতের প্রায়,
ত্রিভুবনে নাহি সমতুল ॥
পুষ্পক আখ্যান রথ, তেজে দ্বিজরাজ যত,
উর্দ্ধে ধ্বজ পতাকা সহিত।
শুদ্ধ সুবর্ণের চাল, চৌদিকে কিঙ্কিনী জাল,
মণিমুক্তা প্রবালে ভূষিত ॥
উত্তম আসন মাঝে, বিচিত্র বসন সাজে,
যেখানে বসিবে পুরন্দর।
জানাইল দেবদূতে, মাতলি স্যন্দন সাথে,
আসিয়া তিষ্ঠয়ে দ্বারোপর ॥
শুনগো ভারতী মাতা, বলি আমি এই কথা,
নিজ গুণে মোকে কর ত্রাণ।
দৃঢ় ভাবি সরস্বতী, ভণে পদ হীন মতি,
দ্বিজ রাজসিংহ অভিধান ॥

পয়ার।

এত শুনি শচীপতি করি গাত্রোত্থান।
দুর্গাবলি উঠিপরে করিলা প্রয়াণ ॥
কুলিশ দক্ষিণ হস্তে, উপানৎ পায়।
অপসরে বেষ্টিত মন্দ মন্দ গতি যায় ॥

শিরোপরে স্বর্ণ ছত্র ধরিছে কিঙ্করে।
চারি দিকে করে বাতাস ধবল চামরে ॥
রথে চড়ে দেবরাজ স্মরি হরগৌরী।
সঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গে নাচে বিদ্যাধরী ॥
ডিণ্ডিমী ডমরু বাজে, কাড়া ঘন ঘন।
অনুকূল বাত্যা বহে পৃষ্ঠেতে পবন ॥
স্বর্ণকুম্ভ পুষ্পমালা, কাঞ্চন রজত।
দধি মধু শুক্লধান্য দেখে নানা মত ॥
স্পন্দিত দক্ষিণ ভুজ দক্ষিণ লোচন।
হর্ষ মনে সুরপতি করিলা গমন ॥
সারথি অত্যন্ত বেগে রথ চালাইল।
ক্ষণমাত্র কৈলাসেতে আসি উত্তরিল ॥
দ্বারী যায়া কহিলেক শঙ্করের স্থানে।
ত্রিদশের নাথ দ্বারে চড়িয়া স্যন্দনে ॥
শুনি হেন বাণী হর দিলেন উত্তর।
এথা আসিবার যাইয়া বলহ সত্বর ॥
ইন্দ্রের গোচর আসি বলিলেক দ্বারী।
চল যত্র যাইতে আজ্ঞা কৈলা ত্রিপুরারি ॥
রথ হৈতে নামি ইন্দ্র ভক্তিযুক্ত হৈয়া।
গল বস্ত্রে শিব কাছে উত্তরে আসিয়া ॥
ভূমিষ্ঠে প্রণাম কৈল দেব পুরন্দর।
বসিবারে আজ্ঞা তাকে কৈলা মহেশ্বর ॥
আপনার উপযুক্ত বুঝি এক স্থান।
বসিলা আসনোপরি সহস্র নয়ন ॥
শিব বলে চল যুদ্ধে শুন দেবরাজ।
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে আর কি কারণে ব্যাজ ॥
এত বলি যুদ্ধ সজ্জা করে পশুপতি।
প্রথমে অঙ্গেতে দিলা নবীন বিভূতি ॥
কনক পিঙ্গল জটে বান্ধিলা শেখর।
দৃঢ় করি হাড়মালা বান্ধিলা তৎপর ॥
উত্তম কাঞ্চনবর্ণ ভুজঙ্গম দিয়া।
মস্তক আচ্ছাদি থৈল কিরীটি করিয়া ॥
তিন ছড়া অস্থি স্রজ গলে দিলা তুলি।
পুষ্পভ্রম ভাবি তাহে ঝাঁকে পড়ে অলি ॥
বৈজয়ন্তী মালা করি বাসুকিকে দিলা।
বিচিত্র ভুজঙ্গে কটি আটিয়া বান্ধিলা ॥
শার্দ্দূল অজিন অতি দৃঢ় করি পরি।
ব্যালের মঞ্জির শোভে চরণ উপরি ॥
অঙ্গের বসন কৈল চিত্র মৃগ চামে।
পিণাক কার্ম্মুক তুলি লৈল কর বামে
ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে অতি শোভাকর।
হেন অপরূপ বেশে সাজে মহেশ্বর ॥
আনিল নন্দিকেশ্বর বৃষ সাজাইয়া।
সুশোভিত ঐরাবত হস্তীকে গঞ্জিয়া ॥
তাহে আরোহিলা হর মাহেন্দ্র লগ্নেতে।
সর্পগণে ফণা ধরি ছত্র হৈল মাথে ॥
সহস্র কন্দর্প জিনি শোভে মহেশ্বর।
ত্রিপুর বধেতে যেন ছিল আড়ম্বর ॥
তাহার সমান বেশে চলে ত্রিনয়ন।
শুন কালিদাস তার কি কব বাখান ॥
ইহা শুনি দ্বিজ পুনি পুছে মুনি স্থানে।
কে বটে ত্রিপুর সেই মৈল কি কারণে ॥
এই পুণ্য ইতিহাস আর শুনি নাই।
কৃপা করি বিস্তারিয়া কহত গোসাঁঞি ॥
সব বিঘ্ন বিনাশক অপূর্ব্ব কাহিনী।
স্বর্গে বাস তার যেই শুনে এই বাণী ॥
শুন মাতা সরস্বতী মোর নিবেদন।
অন্য গতি নাই বিনা তোমার চরণ ॥
করহ বুঝিয়া তুমি যে হয় উচিত।
ভূপাত্মজ দ্বিজে ভণে নূতন সঙ্গীত ॥

ত্রিপদী।

শুন কালিদাস, পুণ্য ইতিহাস,
ত্রিপুর বধের কথা।
যেবা ভক্তি মনে, এই ভাষা শুনে,
বিঘ্ন লেশ নাহি তথা ॥
করি তিন পুরী, সেই দুরাচারী,
বৈসে তিন সহোদর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য স্থান, হৈল কম্পবান,
নদী বন ধরাধর ॥
যথা ইচ্ছা মনে, চলে পুরী সনে,
গমন বিদ্যুত প্রায়।

বৎসর অন্তরে, এই তিন পুরে,
　　এক স্থানে সবে যায় ॥
তপ করি বনে, যাচি ব্রহ্মা স্থানে,
　　দানবে লয়াছে বর ।
যুদ্ধে তার সাথে, না পারে জিনিতে,
　　কিবা দেব নাগ নর ॥
যবে তিন ভাই, হবে এক ঠাঁই
　　এই তিন পুরী সনে ।
এক অস্ত্র দিয়া, যে ফেলে ভেদিয়া,
　　মৃত্যু তার সেই ক্ষণে ॥
পায়া এই বর, তিন সহোদর,
　　অধিক প্রবল হৈয়া ।
করিয়া সমর, জিনিল অমর,
　　পুরী সনে তথা যাইয়া ॥
ইন্দ্র আদি সব, হৈল পরাভব,
　　দেবতা বিকল অতি ।
কাতর হইয়া, গেলেন চিন্তিয়া,
　　যথা প্রভু পশুপতি ॥
শিব সন্নিধানে, যায়া দেবগণে,
　　বিস্তর মিনতি করে ।
তার শুনি বাণী, বলে শূলপাণি,
　　কি বাক্য বলহ মোরে ॥
কহে দেব সবে, ত্রিপুর দানবে,
　　সদা করে উৎপাত ।
এদুষ্ট না মৈলে, ভাসিলাম জলে,
　　কৃপা কর বিশ্বনাথ ॥
দেবের বচন, শুনি ত্রিলোচন,
　　বলে শঙ্কা কি কারণে ।
নাহি ব্যাজ আর, প্রতিজ্ঞা আমার,
　　হবে যুদ্ধ তার সনে ॥
ধরণী স্যন্দান, হইল্য তখন,
　　চারি বেদ হৈল হয় ।
সূর্য্য দ্বিজরাজে, রথ চক্র সাজে,
　　চালে শোভে ঋক্ষ চয় ॥
করি হেন মত, সাজাইয়া রথ,
　　মহেশ চলিলা রঙ্গে ।
রথে কৈল উড়া, বাজে কাড়া পড়া,
　　সমর দুন্দুভি সঙ্গে ॥
তথা যাহা হয়, লয়া ধনুঃশর,
　　রহিলা সন্ধান করি ।
বৎসর অন্তরে, মিলিল সত্বরে,
　　এক স্থানে তিন পুরী ॥
এই ছিদ্র পায়া, আকর্ণ পূরিয়া,
　　অস্ত্র ছাড়ে মহেশ্বর ।
ভস্ম পুরী সনে, হইল তখনে,
　　তিন ভাই একেবারে ॥
অমর সকলে, ডাকে মহারোলে,
　　জয় জয় ভূতপতি ।
কৃপাকরি মনে, রাখিলা আপনে,
　　দেবতার তুমি গতি ॥
মরিলে ত্রিপুর, স্থির হৈল সুর,
　　শিব গেলা নিজালয় ।
এই ইতিহাস, সর্ব্ববিঘ্ননাশ,
　　যেই শুনে তার জয় ॥
শুন কালিদাস, ত্রিপুর বিনাশ,
　　কথা সাঙ্গ এত দূরে ।
ভারতী চরণে, নৃপ মুজে রণে,
　　নিজ ধাম দুর্গাপুরে ॥

পয়ার ।

মহেশের সেনা চলে অপরূপ বেশ ।
গলে হাড় মালা শিরে তাম্র বর্ণ কেশ ॥
ব্যাপি চর্ম্ম পরিধান ভস্মরজ অঙ্গে ।
বদনে ভ্রুকুটী ঘটা নাচে রণরঙ্গে ॥
কারো করে খড়ি কারো করে শাল তাল
সেনাপতি হয়া চলে নন্দি মহা কাল ॥
রণ ভেরী কাড়া পড়া ঘন বাজে ঢোল ।
মুখ বাদ্যে শিব সেনা করে মহারোল ॥
জয় জয় মহাদেব ডাকে ঘন ঘন ।
হেন আড়ম্বরে শিব করিলা গমন ॥
এইরূপে আশুবেগে গেলা কত দূরে ।
বসিলেন বটতলা সুর নদী তীরে ॥

জিজ্ঞাসিলা মহাদেব দেবগণ স্থানে।
বলহ যুকতি সবে কি করি এখনে॥
বলিলা ত্রিদশ নাথ হয়্যা যোড়কর।
দূত পাঠাইতে যুক্তি দৈত্যের গোচর॥
সকলে প্রামাণ্য কৈল ইন্দ্রের বচন।
দেব দূত ডাকি আনি প্রেষিলা তখন॥
দেবের বচনে দূত গমন করিল।
শঙ্খের ভবনে তূর্ণ যায়্যা উত্তরিল॥
দ্বারী স্থানে এই বলিল ভারতী।
শঙ্খ কাছে মোকে পাঠায়েছে পশুপতি॥
ইহা জানি অন্তপুরে যাইতে দিল তাকে।
উপনীত হইল দূত শঙ্খের সম্মুখে॥
শুনহ দানবপতি আমার বচন।
তব কাছে মোকে পাঠায়াছে ত্রিলোচন॥

(ক্রমশঃ)

ভৌগোলিক রেনেল

আমরা অনেকেই ভৌগোলিক রেনেলের নাম জানি, অনেক সময়েই তাঁহার নাম প্রবন্ধাদিতে উল্লেখ করি এবং পুস্তকেও কখন কখন তাঁহার প্রণীত ম্যাপ ব্যবহার করি। কিন্তু রেনেলের জীবনী সম্বন্ধে আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু অবগত নহি,—এ কথা বলিলে বিশেষ কিছু অতিরঞ্জন হইবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক যে মেজর রেনেলের অর্থাৎ ভারতবর্ষের "আদিম" ম্যাপ-প্রণয়নকারীর বিষয় বিশেষ কিছু অবগত, তাহা নহে। তবে, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে রেনেলকে, কি জন্য এবং কোন্ সময়ে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, কি উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গদেশের ম্যাপ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা পর্য্যালোচনার প্রয়াস পাইব।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর, ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডিভনসায়ারস্থ টেন নদী তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র চাডলি গ্রামে, জন রেনেলের ঔরসে এবং য়্যানী রেনেলের গর্ভে জেমস্ রেনেল জন্মগ্রহণ করেন। জন রেনেল সৈন্যবিভাগে কাপ্তেনের কার্য্য করিতেন। বালক রেনেল যখন কেবল পাঁচ বৎসর বয়স্ক, তখন তিনি পিতৃহারা হন। ঠিক কোন্ যুদ্ধে কাপ্তেন রেনেল প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি লফেল্ডের (Lowfeldt) যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে য়্যানী রেনেল ও তাঁহার সন্তানগণের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা হয়। বাধ্য হইয়া পত্নী, স্বামীর পরিত্যক্ত যৎসামান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আত্মীয়টি তাঁহাদিগকে গলগ্রহস্বরূপ বিবেচনা করিতেন এবং য়্যানী রেনেল বাধ্য হইয়া চাডলী গ্রামস্থ ইলিয়ট নামক এক বিপত্নীকের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধা হইয়া পুত্র ও কন্যাসহ তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

জেমস্ রেনেলের বয়ঃক্রম এই সময় দশ বৎসর মাত্র। "Child is the father of the man"—সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই, প্রতিভা কোন দিন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়। দশ বৎসর বয়স্ক গ্রাম্য পাঠশালার "পড়ো" তখনই পাঠশালার নক্সা, গ্রামের নক্সা আঁকিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি চাডলি ও তাহার সন্নিকটস্থ গ্রাম, পর্ব্বত প্রভৃতির নক্সা অঙ্কিত করিয়া শিক্ষক ও

বন্ধু বান্ধবকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। এই প্রতিভা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চাডলি গ্রামস্থ পাদরীর করুণ দৃষ্টি এই পিতৃহীন অনাথ বালকের উপরে পড়িল। তাঁহারই সুপারিশে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রেনেল ব্রিলিয়ান্ট নামক ক্ষুদ্র জাহাজের কাপ্তেন হাইড পার্কারের অধীনে একটী ক্ষুদ্র চাকুরী পাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিলেন।*

এই সময়ে ইংলণ্ডে সপ্তবৎসরব্যাপী যুদ্ধের (Seven year's war) আয়োজন চলিতেছিল। রেনেলের পদপ্রাপ্তির সার্দ্ধ পাঁচ মাস পরেই ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ব্রিলিয়ান্ট রণতরী চ্যানেল-প্রহরীর কার্য্যে দুই বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া, পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। আমরা বাঙ্গালী—যুদ্ধ ক্ষেত্রের ধার ধারি না, কাটাকাটি রক্তারক্তি শুনিলে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠি, 'পলায়নই প্রকৃষ্ট পথ—এই মহাসত্য কথাই যখন আমাদের ধ্রুব সত্য, তখন আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘন ঘন "কামানের গর্জ্জন, উন্মত্ত সৈন্যদের প্রলয় হুঙ্কার, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, যুদ্ধ ঢক্কার উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের আর্ত্তধ্বনি" এই দৃশ্য হইতে দূরে লইয়া যাওয়াই সমীচীন মনে করি। রেনেল অবশ্যই তখন বালক ব্যতীত কিছুই নয়। কিন্তু তবু সে ইংরাজ, তাই যখন সেণ্টকাস বেতে (St. Cas Bay) উভয় পক্ষীয় কামান প্রলয়ের দৃশ্য অভিনীত করিতেছিল, তখন নির্ভীকচিত্তে বালক যুদ্ধক্ষেত্রের নক্সা, আপেক্ষিক স্থিতি (Bearing) ইত্যাদির মাপ লইতেছিল। যুদ্ধান্তে, ইংরাজ সেনাপতি লর্ড হো (Lord Howe) রেনেল প্রণীত "Plan of St. Cas Bay; J. Rennel 1758. To the Right Honourable Lord Howe this plan is dedicated by his obedient servant J. Rennel" ম্যাপ পাইয়া রেনেলকে যে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

এক বৎসর পরে, রেনেলের ভারতবর্ষে আসিবার কথা হইল। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া রেনেল আবশ্যক পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রেনেল এই প্রসঙ্গে নিজেই লিখিয়াছেন—I imagine that we shall lay siege to Pondicherry or some other French Settlement and have brought some books which are very needful for me. They are Mulier's Works, which will give me a perfect idea of attack & defence and the method of choosing ground, building forts and taking plans of places." অর্থাৎ আমি কল্পনা করিতেছি যে, আমাদিগকে কোন দিন পণ্ডিচেরী বা অন্য কোন ফরাসী অধিকৃত স্থান অবরোধ করিতে হইবে। সেই সময় এই পুস্তকগুলি আমার অত্যন্ত প্রয়োজনে আসিবে। বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। রেনেল যে জাহাজে যাত্রা করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন, দুর্ঘটনাবশতঃ রেনেল তাহাতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই উহা ছাড়িয়া দিল। যাহা হউক, ১৭৬০ সনের মার্চ্চ মাসে "আমেরিকা" জাহাজে কর্ম্মচারীর পদে (midshipman) নিযুক্ত হইয়া মাদ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজে পৌঁছিয়া রেনেল ক্যাপ্তেন পার্কারের অধীনে গ্রাফটন (Grafton) জাহাজে চাকুরী লইলেন।

* "With the rating of a Servant" Markham.

রেনেল যে বৎসর (১৭৬০খৃ) ভারতবর্ষ পৌঁছেন, তখন কোম্পানী উত্তর ভারতে বাঙ্গালা ও বিহারের প্রকৃত অধিপতি হইয়াছেন। মুসলমান-গৌরব-রবি অস্তাকাশে অন্ধকারে বিলীন হইতেছিল। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী-প্রদীপও তখন নির্ব্বাপিত প্রায়। কয়েক মাস পরে ১৭৬১ সনের ২১শে জানুয়ারী পণ্ডিচেরী ইংরাজ-কবলে পতিত হইল। যদিও ১৭৬৩ সনের সন্ধিতে পণ্ডিচেরী ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল, তত্রাপি ফরাসিগণ আর ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েন নাই।

দুই বৎসর পরে, ইংরাজ কোম্পানি যখন মাদুরা অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা রেনেলের হস্তে নেপচুন (Neptune) নামক ক্ষুদ্র জাহাজের আধিপত্য অর্পণ করেন। রেনেল এ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন এবং অবসরকালীন কালীমির অন্তরীপ, পাম্বেনপ্রণালী এবং লঙ্কা ও টিনেভিলির মধ্যবর্ত্তী পাকপ্রণালী নক্সা সম্পন্ন করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। মাদুরা অধিকারে সাহায্যের জন্ত রেনেলকে গবর্ণর যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করেন।

এই কার্য্যাবসানে রেনেল বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু কাপ্তেন টিঙ্কারের (Tinker) অনুরোধে গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেব রেনেলকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ অধিকারভুক্ত স্থানের সার্ভে করিবার জন্ত সার্ভেয়ার-জেনারেলের পদে নিযুক্ত করেন। বিপদ্ যেরূপ একক আইসে না, সৌভাগ্যও তেমনি "তেলো মাথায়"ই তৈল দিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত পদপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারগণের অন্যতম শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। এই সময়ে রেনেলের বয়ঃক্রম মাত্র একবিংশ বৎসর।

রেনেল বঙ্গদেশে যে সার্ভে করেন, তৎপূর্ব্বে আর বঙ্গদেশের সার্ভে হয় নাই। বস্তুতঃ পলাশীক্ষেত্রের যুদ্ধের ছয় বৎসর পরেই এই ব্যাপার সংঘটিত হওয়া যে ইংরাজের বুদ্ধির পরিচায়ক সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রেনেল কয়েক বৎসরে এই কার্য্য সুকৌশলে সম্পন্ন করেন। প্রথম বৎসরের কার্য্যান্তে যখন গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেব বিলাত প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি রেনেলের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া যান— As the work you are now employed on will, I think, be of great use, so nothing in my power shall be wanting to put your services in such a light to the company that they may give you the encouragement that your diligence deserves" রেনেলের পদের বেতনস্বরূপ তিনি বাৎসরিক নয় শত পাউণ্ড পাইতেন এবং অন্যান্ত বাবদে বাৎসরিক একশত পাউণ্ড—একুনে এক সহস্র পাউণ্ড অর্থাৎ পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা পাইতেন।

দ্বিতীয় বৎসরে রেনেল উত্তরে প্রায় হিমাচল পর্য্যন্ত সার্ভে শেষ করেন ইহার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার গতির নক্সাও সম্পন্ন হয়। রেনেল ঢাকায় তাঁহার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভুটানের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত সার্ভে করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে তিনি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন। রেনেল যখন ভুটানের সীমান্ত প্রদেশে জরীপ করিতেছিলেন, তখন সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সহস্রাধিক সন্ন্যাসী নগর লুণ্ঠন করিয়া

সার্ভেয়ারগণকে আক্রমণে উদ্যত হয়। লেফটেন্যান্ট মরিসন নামক এক কর্ম্মচারী নব্বইজন সিপাহীসহ এই বিদ্রোহী দলকে শাসন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। মরিসন রেনেলের বন্ধু। সন্ন্যাসিগণ মরিসন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। রেনেল মরিসনের অধীনে স্বেচ্ছা-সেবকরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। যুদ্ধের পরদিন, ইংরাজ সৈন্য শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে একটী গ্রামে উপস্থিত হইলে লুক্কায়িত সন্ন্যাসীর দল অকস্মাৎ ইংরাজ-সৈন্যকে আক্রমণ করে। মরিসন সাহেব পলায়নে জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু রেনেল সন্ন্যাসীর দলের মধ্যে পড়িয়া যান। রেনেলের সঙ্গে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একখানি তরবারি ছিল। ইহা দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে করিতে তিনি কিছু দূর পিছাইয়া আসিয়া পরে দৌড়িতে থাকেন। শত্রুরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া দূর হইতে তাঁহার প্রতি বন্দুক ছুড়িতে থাকে। ইতিমধ্যে মরিসন তাঁহার সৈন্যদের একত্রিত করিলে সন্ন্যাসিগণ পলায়ন করে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রেনেল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে পাল্কি করিয়া ছাউনিতে আনা হয়।

রেনেল সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার ২টী হস্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং শত্রুর তরবারির আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বাম কনুইতে ও হস্তেও তিনি গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, পৃষ্ঠেও অস্ত্র লেখা ছিল। সে প্রদেশে তখন উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসক কেহই ছিলেন না এবং সেই জন্য তাঁহাকে নৌকায় করিয়া তিন শত মাইল দূরে ঢাকায় আনয়ন করা হয়। নৌকায় রেনেলকে ছয় দিবস অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। ইহার জন্য তাঁহাকে আরও বেশী ভুগিতে হয়। যাহা হউক, ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও বন্ধুবর্গের শুশ্রূষায় রেনেলের জীবন রক্ষা হয় বটে, কিন্তু তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে আর কোন দিন তাঁহার দক্ষিণ হস্তের উপযুক্ত ব্যবহারে সমর্থ হন নাই। এই ঘটনায় লর্ড ক্লাইব আদেশ দেন যে, সর্ভেয়ার জেনারেলের রক্ষার্থ একদল সিপাহী সর্ব্বদাই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবে। সুস্থ হইয়া রেনেল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার ম্যাপ, ও দিল্লি পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের এবং গঙ্গার ম্যাপ প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিক অর্ম্ম এই সকল ম্যাপ হইতে তাঁহার সুবিখ্যাত ইতিহাস (History of the Military Transactions of the British Nation in Hindustan) প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর রেনেল ১৭৬৭ ও ১৭৬৮ এই দুই বৎসর ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব সীমানাস্থিত ভূভাগের সার্ভে করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রংপুর ও রাঙ্গামাটীরও সার্ভে সম্পন্ন করেন। এই স্থানে পুনর্ব্বার তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত হন। ভূটানীগণ তাঁহার গতিরোধার্থ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ রেনেল অল্পেই নিষ্কৃতি পান। কেবল মাত্র তাঁহার একটী সৈন্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ১৭৬৮,৬৯ ও ৭০ সনে রেনেল 'ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি'র সার্ভে করেন। একদিন রেনেল সহকারীর সহিত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে স্বকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এই সময়ে অকস্মাৎ এক বৃহৎ চিতা তাঁহাকে আক্রমণ করে। সঙ্গীনের আঘাতে চিতাকে রেনেল যম-ভবনে প্রেরণ করেন, কিন্তু ব্যাঘ্র তৎপূর্ব্বেই রেনেলের সঙ্গীয় পাঁচ জনকে সেই পথের পথিক করেন।

রেনেল এতদিন অবিবাহিত ছিলেন; কিন্তু ১৭৭২ সনের ১৫ই অক্টোবর তারিখে

তিনি ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারীর (ঔপন্যাসিক থ্যাকারীর পিতামহ) অন্যতম কন্যা হেনরিয়াটাকে বিবাহ করেন। এই শুভ বিবাহ কলিকাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে বিবাহে স্বামি-স্ত্রী উভয়েই বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন।

"মেঠো আমীনের" কাজ শেষ করিয়া রেনেল তাঁহার Bengal Atlasপ্রণয়নে যত্নবান্ হন। ভারত আফিসে (India Office) রেনেলের স্বহস্তের ম্যাপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রংপুর, দিনাজপুর, মেঘনানদী, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, রাঙ্গামাটী ও কুচবিহারের ম্যাপ প্রভৃতি এই Bengal Atlasএই প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৭৭৯ সনের নবেম্বর মাসে প্রথম একবার ও পরে ১৭৮১ সনে দ্বিতীয় বার এই অভিনব পুস্তক ছাপা হইয়াছিল। এই পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী-লেখক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মার্কহাম সাহেব বলিয়াছেন, "It was a work of the first importance both for strategical and administrative purposes and is a lasting monument of the ability and perseverance of the Young Surveyor-General."

বিবাহের কিছু দিবস পরে সস্ত্রীক মেজর রেনেল চাটগাঁয় বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ গমন করেন। ইসলামাবাদে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া পরে পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। ১৭৭৭ সনের মার্চ্চ মাসে স্বদেশ প্রত্যাগমনার্থ রেনেল সাহেব Ashburnham (আসবার্ণহাম) জাহাজে উঠিয়া সেণ্টহেলেনা দ্বীপে পৌছেন। তথায় তাঁহারা অক্টোবর পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদের একটী কন্যা ভূমিষ্ঠা হয়। ১৭৭৮ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী রেনেল পোর্টসমাউথ বন্দরে পৌছেন।

বিলাত প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাঁহার আবেদনে গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস বাৎসরিক ৬০০ পৌণ্ড (৯হাজার টাকা) পেনসন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। বিলাত পৌঁছিলে ডিরেক্টারগণ এত টাকা পেনসন দিতে আপত্তি করিয়া ৪০০ পৌণ্ড পেনশন ধার্য্য করেন; কিন্তু দুই বৎসর পরে পুনরায় ৬০০ পৌণ্ড ধার্য্য করেন। অনেক কাল ধরিয়া মেজর রেনেল এই পেনসন্ ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালের ২৯শে মার্চ্চ রেনেল দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ ৬ই এপ্রিল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবিতে সমাহিত করা হয়।

বিলাত প্রত্যাগমন করিয়া রেনেল ভারতবর্ষের একখানি ম্যাপ প্রণয়ন করেন। এই ম্যাপের স্কেল এক ডিগ্রীতে এক ইঞ্চি স্থির করেন এবং ম্যাপের সঙ্গে ১৪৬ পৃষ্ঠা বর্ণনা থাকে। ১৭৮৩ সনে প্রথম ইহা প্রকাশিত হয়, ১৭৮৮ সনে দ্বিতীয়বার ও ১৭৯৩ সনে তৃতীয়বার প্রকাশিত হয়। শেষোক্তবারে দেড় ডিগ্রীতে এক ইঞ্চি স্কেল ও বর্ণনায় ৬০৪ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছিল। এ ম্যাপ প্রণয়নের উদ্দেশ্য রেনেল নিজেই এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—Now that we are engaged either in wars, alliances or negotiations, with all the principal powers of India, and have displayed the British standard from one end of it to the other, a map of Hindustan, such as will explain the local circumstances of our political connectioms and the marches of our armies, cannot but be highly interesting to every person whose imagination has been struck by the splendour of our

Victories, or whose attention is roused by the present critical state of our affairs in that quarter of the glove"

আমরা রেনেলের জীবনীর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি, কৃতকার্য্য হইব বলিয়া একার্য্যে অগ্রসর হই নাই। উপযুক্ত কেহ যদি একার্য্যে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে। তবে একথা বলিতে পারি যে, বাঙ্গালা ও বেহারের সার্ভে, বেঙ্গল আটলাস, ও হিন্দুস্থানের ম্যাপে রেনেলের নাম যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, একথা নিশ্চয়। যে সকল বৈদেশিক পর্য্যটক ও গ্রন্থকার প্রভৃতির নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, মেজর রেনেল যে তাঁহাদের মধ্যে একজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের হেতু দেখা যায় না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

আকবরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

আমার পিতার পবিত্র দেহকে কবরাধারে উত্তোলন করা হইল—ইহাতে রাজা বা দরিদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না। তৎপরে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইয়া কর্পূর, মৃগনাভি, গোলাপ পুষ্প দ্বারা শবাধারকে পরিপূর্ণ করা হইল। তাহার উপর একখানি আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া শবাধারটী চির বিশ্রামের স্থানে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত করা হইল। শবাধারের একধারে আমি রহিলাম এবং অপর তিন ধার আমার তিন পুত্র স্কন্ধে তুলিল। আমরা প্রাসাদের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত লইয়া যাইলাম। এই স্থান হইতে আমার তিন পুত্র ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ শবাধার সেকেণ্ড্রা পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া গেলেন। এই স্থানে বিখ্যাত আকবরের অবিনশ্বর দেহকে ভগবানের কোষাগারে রক্ষিত করা হইল। যতদিন পৃথিবী থাকিবে,[১] ততদিন এইরূপ হইবে এবং অনন্তকাল এইরূপ হইয়া আসিতেছে।

সমাধি-উৎসব।

পরে সমাধির বিধিবিহিত কার্য্যসকল পালন করিয়া, আমরা তাঁহার পবিত্র কবরের নিকট বসিয়া উপর্য্যুপরি সাত দিবস চক্ষের জল বর্ষণ করিলাম। আমি তাঁহার কবরের উপর পবিত্র উপদেশসকল সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া পাঠ করিবার জন্য কুড়িজন লোককে নিযুক্ত করিলাম এবং তাঁহার কবরের উপর সমাধি নির্ম্মাণ জন্য পাঁচ লক্ষ আশরফি ব্যয় করিতে মনস্থ করিলাম। আমাদের অশৌচকালের সাত দিবস আমি দুই শত খাদ্যপূর্ণ ও মিষ্টান্নপূর্ণপাত্র সায়ংসন্ধ্যা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে আদেশ দিলাম। ইহার পরে, প্রধান প্রধান আমীরগণ ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিগণ—যাঁহারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় আমাদের সহিত সেকেণ্ড্রা গিয়াছিলেন, সকলেই আগ্রাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে ৭৫ বৎসর ১১ মাস ৯ দিন বয়সে আমার পিতার জীবিতকাল শেষ হইল।

সেলিমের সংকল্প।

পিতার মৃত্যুর সময় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ আমীর একত্রিত হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে,তাহারা আমার পুত্র খসরুকে হিন্দুস্থানের সিংহাসন প্রদান করিবে এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হস্তগত করিয়া নামমাত্রে খসরুকে বাদ্‌শা বলিয়া ঘোষণা করিবে। কিন্তু অদৃষ্ট-নিয়ন্তা ভগবান্ আমার পক্ষে ছিলেন এবং ইমামের নিষ্কলঙ্ক প্রেতাত্মাগণও আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন মানবীয় শক্তির সাহায্যে আমি এই রাজ্যাধিকার লাভ করি নাই। অপরিবর্ত্তনশীল ভগবানের কৃপায় আমি এই রাজত্বের গুরুভার প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য আমি কৃতসংকল্প হইলাম যে, আমার রাজ্য-শাসন সময়ে, মনুষ্যের সহিত ব্যবহারে, অসহায়দিগকে রক্ষা করিতে, দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিতে, আমি পুত্রকন্যা বা আত্মীয় স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিব না।

সেখ বেয়জিদ।

আমি শুনিয়াছি, এক পর্ব্বদিনের প্রাতঃকালে যখন বেয়জিদ্ স্নান করিয়া উঠিতেছিলেন, তখন কোন ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার মস্তকে পাঁশ ফেলিয়া দিয়াছিল। তিনি কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া পাঁশগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, মন! আমার মুখ কি তবে এই পাঁশেরই উপযুক্ত? যশস্বী হইলেই প্রকৃত মহত্ত্ব থাকে না! অহঙ্কারী ও গর্ব্বিত হইলে মানসিক উন্নতি হইতে পারে না! বিনয়ের দ্বারা মনুষ্য-সমাজে উন্নত হওয়া যায়! গর্ব্বের দ্বারা মানবের পতন হয়! উদ্ধত ও আড়ম্বরশালী ব্যক্তিগণের মস্তক নত হইয়া থাকে। তুমি যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে ইহার জন্য কখনও আকাঙ্ক্ষা করিও না।

হাওদেলে সেলিমের শিবিরস্থাপন।

এক্ষণে বিদ্রোহী খসরুর অনুসরণ করিবার সময় যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিব। ১০ই জিলহিজ্জি, আমরা হাওদেলে শিবির স্থাপন করিলাম। শেখ ফেরিয়া একদল অশ্বারোহীর সহিত আমাদের অগ্রে যাইতেছিলেন। এই স্থানে আমি মোজ্‌গুল শুক্ককে তাঁহার চির বিশ্বস্ততার জন্য আগ্রার দুর্গ ও খোজাজাহানের গৃহস্থিত ধনাগার রক্ষার ভার দিলাম। অন্যান্য বিশ্বস্ত পুত্রগণকে অবিলম্বে আমার সহিত যোগদান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলাম। আমি বয়োধিক্যের সহিত সমস্ত দৃঢ়তা হারাইয়াছিলাম এবং বন্ধুত্ব ও তাহার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে পরিশ্রম ও শ্রান্তি অপেক্ষা অধিকতর কষ্টদায়ক হইয়াছিল। কার্য্য-সূত্রে আমাকে প্রিয়জনগণের নিকট হইতে অনেক দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই মাসের বৃহস্পতিবার ১২ই তারিখে আমরা ফুরিদবাদে শিবির স্থাপন করিলাম এবং ১৩ই শুক্রবার দিল্লীতে পৌঁছিয়া, পিতামহ হুমায়ুনের কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া বিখ্যাত সম্রাটের অবিনাশী প্রেতাত্মাকে উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করিলাম। এই স্থানে নিজ হস্তে দরিদ্রদিগকে টাকা ও কাপড়ে ত্রিশ সহস্র টাকা দান করিলাম। তৎপরে আমি সেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার কবরের নিকট আমির জমলউদ্দিন খর্জ্জুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং হাকিম সজাবারকে বিশ হাজার টাকা দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্য প্রদান করিলাম।

বিরা পান্থনিবাসে সেলিম।

১৪ই জিলহজ্জি, শনিবার, আমরা বিরা

পাম্বনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তথায় বিশ্রামার্থ শিবির স্থাপন করিলাম। বিদ্রোহী খসরু এই স্থানটী ভস্মীভূত করিয়াছিল। এখানে আগা মোল্লাকে এক-হাজারী হইতে পনের শত অশ্বারোহীর উপর নেতৃত্ব প্রদান করিলাম এবং বদকৃশান জাতীয় জেথিন্ বেগকে এক লক্ষ আশরফি (নয় লক্ষ মুদ্রা) তাহার জাতীয় লোকগণকে বিতরণ করিবার জন্য প্রদান করিলাম। ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আরও সাহায্য করিব, এইরূপ আশা প্রদান করিয়াছিলাম। কারণ তাহারা খসরুর বিদ্রোহে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল. তখনও তাহাদের মন হইতে বিদ্রোহ-ভীতি দূর হয় নাই। আজমীরে মুয়েন্ উদ্দিন চিস্তির সমাধির নিকট যে সমস্ত মুসলমান দরবেশ ছিল, তাহাদিগকে বিতরণ করিবার জন্য রাজা মানসিংহকে পঞ্চ শ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলাম এবং মাসের ১২ই তারিখে আমরা পাণিপথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পাণিপথে সেলিম্।

এই নগরটী তৈমুরলঙ্গ বংশের সৌভাগ্যের চিরানুকূলতা বরণ করিয়া আসিয়াছে। এই স্থানের নিকট আমার পিতা বাদশা আকবর শাহ দুইটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই পাণিপথেই আমার পিতামহ হুমায়ুন আফগানজাতীয় সুলইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হুমায়ুন কিরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিব।

হুমায়ুনের পাণিপথ যুদ্ধের বিবরণ।

আফগান্‌জাতীয় বল্লালের পুত্র এবং ইব্রাহিমের পিতা সেকেন্দার লোদী, ভাতার খাঁর পুত্র দৌলৎ খাঁকে পাণিপথের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দৌলৎ খাঁ, সেকেন্দারের মৃত্যুর পর ঈর্ষ্যাপরতন্ত্রবশে ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে অনেক ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন; ইহাতে ইব্রাহিমের মনে তাঁহার উপর সন্দেহ হয়। এই জন্য দৌলৎ খাঁ নবীন রাজার রাজধানী দিল্লীতে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দৌলৎ খাঁ তথায় যাওয়া নিরাপদ্‌জনক বিবেচনা না করিয়া, ভাবি বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অযথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় পুত্র দিলওয়ার খাঁকে প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। ইব্রাহিম তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তদীয় পুত্র দিলওয়ার খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন, যদি তাঁহার পিতা শীঘ্রই দিল্লীতে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে অন্যান্য শাসন-দ্রোহী আমীরগণের যে শাস্তি হইয়াছে, তাঁহাকেও সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। দিলওয়ার অতি সত্বরেই এই ভীতিজনক আদেশ পিতাকে জানাইলেন, কিন্তু তিনি উত্তর পাঠাইলেন যে, এক্ষণে তাঁহার পক্ষে দিল্লী গমন করা অসম্ভব, এইরূপ ছল করিয়া তৎক্ষণাৎ কাবুলে পলায়ন করিলেন এবং তথায় গমন করিয়া পিতামহ হুমায়ুনের সহিত যোগদান করিলেন। এই ঘটনা সংযুক্ত কতকগুলি কারণের জন্য, আমি ইব্রাহিম খাঁ গাওরকে উচ্চতম পদ এবং দিলওয়ে খান্ উপাধি প্রদান করিয়াছিলাম।

সৈয়াদ কমল।

যদি দিলওয়ার খাঁর পরিবর্ত্তে গোখারা-বাসী সৈয়দ হামিদের পুত্র সৈয়াদ কমল এই সময়ে পাণিপথে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে অশিষ্টাচারী দুর্ভাগ্য খসরু এই স্থান অতিক্রম করিয়া কখনও

পলায়ন করিতে পারিত না; কারণ অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া দীর্ঘকাল সৈন্যচালনা করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং আমার কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যগণ তাহাদের অনুসরণ করিতেছে, ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে হতাশ হইয়া পড়িত। এতদ্ব্যতীত আমি পূর্ব্বেই তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সৈন্যসকল প্রেরণ করিয়াছি, তাহারাও চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাকে এককালে ঘেরিয়া ফেলিত। অবশেষে দিল্‌ওয়ের খাঁ ভ্রমবশতঃ পাণিপথ পরিত্যাগ করার জন্য আক্ষেপ করিয়া, দ্রুতগতিতে লাহোরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় গিয়া খসরুর হস্ত হইতে লাহোর রক্ষা করিয়াছিলেন।

পানিপথ হইতে খসরুর পলায়ন ও আবদর্ রহমানের যোগদান।

পানিপথে খসরু করগ্রাহকের সাহায্যে একখানি পাল্কি সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু দিলওয়ের খাঁ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তথা হইতে অগ্রসর হইয়া লাহোরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং খসরু দ্বারা পরিচালিত সৈন্যগণের ভয়ের কারণ হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের দেওয়ান্ আবদর্ রহমান, দিলওয়ার খাঁর প্রমুখাৎ খসরুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আট সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক লাহোর দুর্গে রাখিয়া প্রচুর সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে খসরুর সহিত যোগদান করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং খসরুর পদতলে পড়িয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রাজদ্রোহিতা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খসরু তাঁহাকে আলিক-অম্বর উপাধি দিয়া, তাহার ক্ষণব্যাপী রাজ্যের লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিয়াছিল।

আবদর রহমনের শাস্তি।

খসরুর পরাজয়ের পর দেওয়ানের এইরূপ ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা সাধনের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলাম। তাহাকে বন্দী করিয়া, সদ্যঃমৃত কৃষ্ণবর্ণ গর্দ্দভের চর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অবয়বকে আবৃত করা হইয়াছিল। এইরূপ নবপরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া, তাহাকে লাহোরের প্রত্যেক রাজপথে এবং প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তৎপরে তাহার অসহায় বালকবালিকাগণের কাতর ক্রন্দন ধ্বনিতে আমার হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছিল, সেই জন্যই আমি তাহার সমস্ত দোষমার্জ্জনা করিয়া, প্রাণদণ্ড রহিত করিলাম। তাহার ন্যায় বিশ্বাসহীন নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিকে দয়া প্রদর্শন করা উচিত নয়। কিন্তু আমার প্রকৃতি এতদূর কোমল যে, সে অমার্জ্জনীয় হইলেও, তাহাকে ক্ষমা করিলাম। এরূপ কতকগুলি দোষ আছে, যাহা মার্জ্জনা করিতে কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তি রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া, রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং যাহারা স্ত্রীলোকের মর্য্যাদার উপর হস্তক্ষেপ করে, এইরূপ বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচদিগের দোষ অমার্জ্জনীয়। তাহাদিগকে ক্ষমা করিলে রাজশক্তির অবমাননা করা হয়।

ক্রমশঃ

শিপ্রা-তটে মহাকালপুরী "অবন্তী" দর্শনে।*

১

কল্পে কল্পে যিনি
লীলায় আপনি
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড
করেন বিলয়—
সে-কালের কাল,
নাম মহাকাল,
এ অবন্তী কি রে
তাঁহারি আলয় ?
যাঁর অধিষ্ঠানে
দুরন্ত শমনে
পশিতে যেখানে
কভু নাহি চায়,
যাঁর ভয়ে ডর'
পাপ-মতি কলি
কাঁপি' থর থরি
দূরান্তরে রয়;
মাতি স্ফীত হয়,
পূতি-গন্ধময়,
জীবনান্তে দেহ
যাঁহার কৃপায়;
জীবে দয়াময়—
নাম মৃত্যুঞ্জয়,
এ অবন্তী কি রে
তাঁহারি আলয় ?
"মহাকাল পুরী"
যুগে যুগে হেরি
ভিন্ন ভিন্ন নামে
সুপ্রসিদ্ধ হয়,—

পাপরাশি হ'তে
তরায় জগতে,
এ "অবন্তী" নাম
তাই সে রে পায়
কলিকালে শুনি
নাম উজ্জয়িনী,—
মধুময় বাণী—
জাগায় হৃদয়,
হৃদয়ে জাগায়
প্রাচীন গাথা—
উপকথা মত
এবে রে হায়!
বৌদ্ধের প্রভাবে
ভারতের যবে
হ'য়েছিল ওরে
অবনতি-দশা,
এই উজ্জয়িনী
শান্তি-প্রদায়িনী
পূরায় তখন
হতাশের আশা।
এরি পদ চুমি'
আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি
পেয়েছিল পুনঃ
নবীন জীবন;
এরি হ'তে আজি
এক-চিত্তে ভজি
আর্য্যের সর্ব্বস্ব
ধর্ম্ম সনাতন !!
বৌদ্ধের বিপ্লব—
ঘূর্ণী-বায়ুবলে—
ধর্ম্মের মন্দির
ভেঙ্গে চুরে গেলে,

* ইহাকে অবন্তিকা, উজ্জয়িনী, মহাকালপুরী এবং বিশালাও বলে। মহাপুণ্যা লোক-পাবনী শিপ্রা নদীকে ক্ষিপ্রা নদীও কহে।

করে সংস্কার
যতনে তাহার
এই উজ্জয়িনী
ভারত-মণ্ডলে।
হয় এ রে জানি
ভারতের রাণী
তুলিয়া আসন
হস্তিনা হইতে,
পাতে সে আসন—
"বত্রিশ সিংহাসন"
বসাতে "বিক্রমে"
আদরে যাহাতে !!
যাঁহা হ'তে অতি
সাহিত্য-উন্নতি ;
জ্যোতিষাভিধান
পেয়েছি কত ;
আয়ুর্ব্বেদ আদি
ত্রিকোণ জ্যামিতি
গণিত ভূগোল
কলা-বিদ্যা শত
সর্ব্ব-শাস্ত্রে মতি
রাখিয়ে নৃপতি
নব-রত্নে অতি
করিত আদর ;
কোথা সে রাজন্ ?
কোথা বা আসন ?
না হেরি পরাণ
বড়ই কাতর !
দিয়ে নব যুগ
ঘুচায় যে দুখ,—
'সম্বৎ' বলিয়া
যাহারে কয় ;
স্মরি' তার কথা
পাই মনে ব্যথা,
নয়নের জলে
ভাসায় হৃদয় !!

ওহে "মেঘ-দূত !"
হ'য়ে মম দূত
যাও হে স্বরগে
কহিতে বারতা—
"যেন হে রাজন্
নয়টি রতন
আসেন লইয়া
সঙ্গেতে হেথা।"

২

কৃষ্ণ স্বচ্ছ জল
করে যে ভূতল
পবিত্র শীতল
চলি' খর-স্রোতে,
যাহাতে রে ভেসে
নর-নারী হেসে
ভব-পারে যায়
চাপি' মুক্তি-পোতে
যে বিমল নীরে
খেলিয়া বিরলে
অবন্তীর ছায়া
এ মাহাত্ম্য করে,
হয় কি রে সেই
শিপ্রা নদী এই ?
সে অবন্তি-ছায়া
কেন নাহি ধরে ?
কোথা সে আশ্রম ?—
ছায়া নাহি নীরে !—
সান্দীপনি হায় !
লইয়া মাধবে
সঙ্কুক্ষিত যেথা
করিত সাদরে
গূঢ় ধনুর্ব্বেদ
মথিয়া অথর্ব্বে ?*

* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অগ্রজ বলদেবকে সঙ্গে লইয়া অবন্তী নগরীতে সান্দীপনি ঋষির নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন।

না দেখি রে নীরে—
প্রাসাদ-শিখরে
তরঙ্গ আকারে
উড়িতে পতাকা,
তরঙ্গে তরঙ্গে
খেলিতে রে রঙ্গে
"বিক্রমের" নাম
পতাকায় আঁকা!
কোথা রাজ-সভা?—
নব-রত্ন-আভা
করেছিল যারে
ধরায় অতুল,
আজি তার ছায়া—
শূন্য নদী-কায়া
হেরিয়া পরাণ
আকুল বিকুল!!
অমৃত কিরণ—
কবিতা কুসুম-
ক্ষরিত সতত
যে সুধাংশু হ'তে,
সেই কালিদাস
অমিয়-নিবাস,
প্রতিবিম্ব তাঁর
পড়ে না শিপ্রাতে!
বররুচি ধীর,
অমর, মিহির;—
রবি-ছবি তিন
জলে না জলেতে,
ধন্বন্তরি আর—
তারা রত্ন-রাজি—
না দেখি রে আজি
ভাসিয়া খেলিতে!!
কোথা ভর্ত্তৃহরি!†
রয়েছে পাসরি,
শূন্য সিংহাসন
আছে তব পড়ে;
বৈরাগ্য শতক—
কনক চম্পক—
দেখিব না আর
ভেসে যেতে জলে!
বুঝেছি রে আমি
অস্তাচলগামী
সুখ-রবি সেই—
এই ভারতের,
তাই রে জলেতে
না পাই দেখিতে
মনোরম ছবি
সে নব-যুগের!!!
ওহে মহাকাল!*
তব ইন্দ্রজাল
করিছে ভুবন
মোহিত কেবল,
পারে না বুঝিতে
রহস্য কি এতে,
তুমি যার ওহে
হও সূত্রধর!
কেহ বা পড়িছে,
আবার উঠিছে,
কেহ বা কাঁদিয়া
ভাসায় ভূতল!!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

† ভর্ত্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা; ইনিও এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভর্ত্তৃহরির প্রাসাদ বলিয়া যাহা এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার কতকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত। ইনি বৈয়াকরণ ও কবি ছিলেন। ইঁহার প্রণীত অনেক পুস্তক আছে, তন্মধ্যে বৈরাগ্যশতক, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, হরিকারিকা, বাক্যপদীয়, মহাভাষ্য দীপিকা, মহাভাষ্য ত্রিপদী পাওয়া যায়। শেষে ইনি যোগী হইয়াছিলেন।

*। মহাকালরূপী শিবের পুরী বলিয়া এই অবন্তী "মহাকালপুরী" নামে আখ্যাত। ইহা সপ্ত মোক্ষ পুরীর অন্যতম। এখানে যে শিব বিরাজিত আছেন, তিনি মহাকালেশ্বর নামে বিখ্যাত।

শিশিরের বিদায়।

শিশির সুস্থির হও মিছা কেন আর,
মত্ত হও স্মরি সেই পূর্ব্ব অধিকার ?
ছিল তব যে বিভব   একে একে গেল সব,
কারে আশা কর আর সাহস কাহার ?
কাল-ক্রোড়ে নিদ্রা এবে উচিত তোমার।

সহজে না ভুলা যায় চির-পরিচয়,
কৃপা করি উষা তোমা দিয়াছে আশ্রয়,
উষারই অশ্রুজল   হয়েছে তব সম্বল
সে বা আর কয় দিন, ক্রমে পাবে লয়,
শীতল মরুৎ তব গেল হিমালয়।

চিরদিন কাহারও সমান না যায়,
উপচয় অপচয় চক্রনেমি প্রায়,
বিদ্যমান অবসান   হও এবে সাবধান,
বিধির নিদেশ সুখে ধরহে মাথায়,
বসন্তেরে স্থান দিয়া লভ হে বিদায়।

সময়ে দুর্দ্দিন তব যাইবে কাটিয়া,
আবার দু দিন পরে আসিবে ফিরিয়া,
এইরূপ যাওয়া আসা   সুখ দুখ ভালবাসা
যখন বা এসে পড়ে থাকিবে সহিয়া,
তবে না থাকিবে হেথা সংসারী হইয়া।

পাইয়া প্রকৃতি-রাণী বিধির নিদেশ,
সাজিয়া কুসুম-দামে মনোহর বেশ,
আরক্ত পলাশবাস   নবীন মল্লীক হাস,
সানন্দে বসন্তে অঙ্কে করিয়া নিবেশ
করে, কিশলয়-করে আদর অশেষ।

দেখনা মলয়ানিল হই গুরুতর,
কতনা অবজ্ঞা করে তোমার উপর
মানী মানে উচ্চমানে   কি ছার ক্ষণিক প্রাণে
আদরের স্থান যদি হয় অনাদর,
মানীর সে স্থান ত্যাগ উচিত সত্বর।

সুগম করিবে পথ শিশির শীকর,
চক্রবাক চক্রবাকী হবে সহচর,
কলহংস কলতানে   মাতি তব জয় গানে,
পথশ্রম অপনোদ করিবে সত্বর,
যাও হে শিশির যথা হিম গিরিবর।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গহরাজ।

চন্দ্র ও জোনাকী।

নীলাকাশে বসি চন্দ্র কহিতেছে হাসি—
"কি হবে জোনাকী আর বৃক্ষ'পরে বসি ;
তোমার আলোর তেজে রহিতে না পারি ;
দূর্ব্বাতলে ঘুমাইতে অনুরোধ করি।
যাও যাও জোনাকি গো জ্বালিও না আলো
আঁধারে বসিয়া থাক সেই হবে ভাল।"
শুনিয়া চাঁদের কথা কহিল জোনাকী—
"অত গর্ব্ব কেন তব ওহে দ্বিজরাজ ?
ভাতিলে রবির কর নীল নভস্তলে,—
তুমিও জোনাকী হবে ধরণীর মাঝ।
আমার আলোক তবু দূর্ব্বাদলে পায় ;
তুমি দিনে ধোঁয়া হও আকাশের গায়।
ভেবে দেখ তবে চন্দ্র যাবে অহঙ্কার ;
একই দশা উভয়ের—তোমার আমার।"

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

সাহিত্য-সংহিতা।

একাদশ খণ্ড]　　১৩১৭ সাল, চৈত্র।　　[১২শ সংখ্যা।

মানদা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

(৪৭)

নাড়িচা হইতে পাঁচদিন পরে, গদাধরের কলিকাতা ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। তাহার চক্রবর্ত্তী কাকার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া, তাহার কলিকাতা ফিরিতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কলিকাতা প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাহার কাশীদহে যাওয়া হয় নাই।

যত দিন সে নাড়িচাতে ছিল, ততদিন প্রায় প্রত্যহ সে কলিকাতা হইতে পত্র পাইত। সে পত্রগুলা মানদা লিখিত না; স্থনীর উপদেশমত সরকার পত্র লিখিত। যে দিন গদাধর কলিকাতা ফিরিল, তাহার পূর্ব্বে তিন দিন সে কলিকাতা হইতে কোনও সংবাদ পায় নাই। এজন্য তাহার মন কিছু উদ্বিগ্ন ছিল। কাহারও কি পীড়া হইয়াছে?—সেই সংবাদ গোপন করিবার জন্য বুঝি সরকার তাহাকে কোনও পত্র লিখে নাই;—বেচারা ভাল মানুষ তাহাকে অপ্রিয় সংবাদ দিয়া অকারণ উদ্বিগ্ন করিতে বুঝি ইচ্ছা করে না। আচ্ছা, মানদা গদাধরকে একখানিও পত্র লিখিল না কেন? গদাধর কত পত্র লিখিল; কত স্নেহপূর্ণ, আদর-মাখা পত্র লিখিল; মানদা তাহার একখানিরও উত্তর দিল না কেন? বুঝি মানদা পীড়ায় শয্যাগতা আছে, তাই তাহাকে স্বহস্তে পত্র লিখিতে পারে নাই। অথবা খোকার কোনও পীড়া হইয়াছে; পুত্রের পীড়ায় বিব্রত হইয়া, সে পত্র লিখনের সুযোগ পায় নাই।

গদাধর অত্যন্ত চিন্তিতমনে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সে অনুসন্ধান পূর্ব্বক মানদার সন্ধান পাইল। মানদা শিথিলবেশে এক শয্যার উপর শুইয়া, একখানা নবপ্রকাশিত নাটক মনোযোগসহকারে পাঠ করিতেছিল। গদাধরকে আগত দেখিয়া, সে হাই তুলিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি আজই আসিবার কথা ছিল।"

গদাধর। হাঁ;—আমি ত পত্র লিখিয়া, সে কথা তোমাকে জানাইয়াছিলাম। তুমি কি আমার পত্র পাও নাই?

মানদা। পাইব না কেন? ঐ দেখ তোমার সমস্ত পত্র টেবিলের উপর জড় করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কত কথা লিখ; অত কথা কি আমি পড়িয়া উঠিতে পারি?—আর, তোমার হাতের লেখা যে টানা!

গদাধর। তুমি বিছানায় শুইয়া রহিয়াছ কেন?—অসুখ ক'রে নাই ত?

মানদা। অসুখ করিবে কেন? কাল রাত্রে, জ্ঞানদা বাবুর পুত্রবধূর সহিত থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম; তাই আজ দু'পর বেলা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

গদাধর। খোকা—

মানদা। বেশ থিয়েটার;—তুমি এক দিন দেখিতে যাইও;—নূতন পালা হইয়াছে। এই দেখ, আমি একখানা বই কিনিয়া লইয়া আসিয়াছি।

গদাধর। খোকা—

মানদা। পয়সা লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জ্ঞানদা বাবুর পুত্রবধূর নিকট এক টাকা ধার করিয়া এই বইখানা কিনিলাম। আজ টাকাটা পাঠাইয়া দিতে হইবে।

গদাধর। খোকা—

মানদা। খোকাকে লইয়া যাই নাই। অনেক দিন আগে, একবার থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। সেবার তুমি আমাকে লইয়া গিয়াছিলে। তা, আমার পাশে এক মাগী এক-গা গহনা প'রে আর একটা ছেলে কোলে ক'রে ব'সেছিল। এমন বদ্ ছেলে দেখিনি। থিয়েটার আরম্ভ হইবামাত্র কান্না জুড়িয়া দিল। নীচের বাবুরা ছেলের চীৎকারের জন্য বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। নিম্ন হইতে ধমক দিয়া বলিল, "ছেলে থামা, মাগী, ছেলে থামা।" আমার বড় লজ্জা হইল। সেই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিলাম, ছেলে লইয়া কখনও থিয়েটার দেখিতে আসিব না। আমরাই মেয়েমানুষ, আমাদেরই ভাগ্যে থিয়েটার দেখা ঘটে না;—উহাদের ভাবনা কি। পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বড় হইয়া কত থিয়েটার দেখিবে।

গদাধর। খোকা কোথায়? বেড়াইতে গিয়াছে?

মানদা। না, মুলী কয়েক দিন তাহাকে বেড়াইতে পাঠায় নাই।

গদাধর। কেন?

মানদা। তাহার জ্বর হইয়াছে।

গদাধর। খোকার জ্বর হইয়াছে? সে কোথায়?

মানদা। কি জানি?—বোধ হয় বারান্দায় মুলীর নিকট শুইয়া আছে।

গদাধর। তাহাকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস। কোনও ডাক্তার ডাকিয়াছিলে?—

মানদা। তিন দিন জ্বর না ছাড়ায়, আজ মুলী সরকারকে ডাক্তার ডাকিবার কথা বলিয়াছিল। সরকার বলিয়াছে, ডাক্তার সন্ধ্যার সময় আসিবে।

গদাধর। ডাক্তারের ব্যবস্থা আমি করিতেছি। তুমি তাহাকে এখানে লইয়া আইস।

মানদা। আমি এখন উঠিতে পারিতেছি না। তুমি যাও; বারান্দায় যাইলেই তাহাকে দেখিতে পাইবে।

গদাধর ত্বরিতপদে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় একখানা গাত্রবসনে আবৃত হইয়া, একটি ক্ষুদ্র উপাধানে ঠেশ দিয়া, মুলীর নিকট খোকা নীরবে বসিয়াছিল। মুলী আপন পদদ্বয় সম্প্রসারিত করিয়া, একখানা থালাতে কতকগুলি ডাল লইয়া, বিচারকের ন্যায় গম্ভীর মুখে, তাহার মধ্য হইতে এক একটি আবর্জ্জনা-কণা নখাগ্রে ধারণ করিয়া, গৃহতলে নিক্ষেপ করিতেছিল। গদাধরের মুদ্গরাঘাত তুল্য পদশব্দ শ্রবণ করিয়া, মুলী সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিস্তৃত পা দু'টি সঙ্কুচিত করিয়া লইল। খোকা চক্ষু উন্মীলন করিয়া বহুদিন পরে তাহার পিতাকে দেখিয়া ম্লান অধরে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

গদাধর তাহাকে আপন বাহুমধ্যে তুলিয়া লইল। আপন স্নেহ-প্লাবিত বক্ষে আদরে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। তাহার জ্বর-তপ্ত ললাটতল আগ্রহভরে চুম্বিত করিল। এবং অবশেষে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মানদার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

কি জানি কেন, গদাধরের স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে বসিয়া খোকার চক্ষে জল আসিল। বুঝি সে জলধারা অমোঘ ভাষায় গদাধরকে হৃদয়ের অভিমানের কথা জানাইয়া দিল। বুঝি তাহা নীরবে বলিয়া দিল, "বাবা, তোমার অনুপস্থিত কালে আমাকে কেহ আদর করে নাই।" খোকার চোখে জল দেখিয়া, গদাধর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। উত্তরীয়াঞ্চলে সযত্নে তাহার চক্ষুর জল মুছিয়া কহিল,—ছি খোকা! কাঁদিও না। আমি তোমার অসুখ শীঘ্র ভাল করিয়া দিব।"

খোকা আরও কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাবা! মা আমাকে মারিয়াছিল।"

গদাধর বলিল, "এবার মারিলে, হাত কাটিয়া দিব! কেন, মানদা? কেন তুমি আমার গোপালকে মারিয়াছিলে?

মানদা খোকাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বলিল,—"তুমি যে দুষ্টুমি কর, তাইত তোমাকে মারি। সে দিন সমস্ত দু'পর বেলা জলের চৌবাচ্ছাতে বসিয়াছিলে কেন? তাহাতেই ত তোমার জ্বর হইল। তুমি দুষ্টুমী না করিলে, তোমাকে আর মারিব না।"

গদাধর বুঝিল, তাহার অনুপস্থিত কাল জলের চৌবাচ্ছাতে বসিয়া, মার খাইয়া খোকার জ্বর হইয়াছে। হায়! হায়! মানদার কি কোনও কালে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মিবে না? আপন গর্ভের সন্তান, তাহার প্রতি যত্ন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা কি সে কখনও বুঝিবে না? আপন গর্ভের সন্তানকে যে যত্ন করা উচিত, তাহা মানদা বুঝিত। কিন্তু তাহার জন্য সে আপনি কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিত না। তোমরা ত জান, সে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিত। সে খোকাকে ভালবাসিত, এবং আমাদের মনে হয়, বুঝি সে গদাধরকেও একটু ভালবাসিত; কিন্তু সে আপনাকে যত ভালবাসিত তত ভালবাসা আর কাহাকেও বাসিত না।—মুলীকেও নহে!

(৪৮)

গদাধর অনেক দিন কালীদহ হইতে কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই। অম্বিকার মৃত্যুর পর, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় আর কাহাকেও পত্র লিখিতেন না। রত্নেশ্বর বাবু জমীদার লোক,—তাঁহার জমীদারী চাল—ঘন ঘন পত্র আদান-প্রদানের প্রথা তাঁহার সেরেস্তায় প্রচলিত ছিল না। গদাধর নিজেও খোকার পীড়া লইয়া বড় বিব্রত হইয়াছিল; এজন্য পত্র লিখিয়া কালীদহের সংবাদ সংগ্রহ করিবার অবসর তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং অম্বিকার শোচনীয় পরিণামের কথা তাহার কর্ণগোচর হয় নাই।

তথাপি এক একবার অম্বিকার জন্য তাহার হৃদয়টা ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আমরা শুনিয়াছি, দুর দেশে অত্যন্ত প্রিয়তমের অমঙ্গল ঘটিলে, আমাদের হৃদয়, কি এক অচিন্ত্য নৈসর্গিক বিধান অনুযায়ী তাহার সংবাদ অনুভব করিয়া ব্যথিত হইয়া উঠে। গদাধরের মনে হইত, অম্বিকা যেন তাহার হৃদয়ের কতকটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে অম্বিকার সংবাদ লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল।

কিন্তু খোকার রুগ্ন শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া সে কোথাও যাইতে পারিত না। তাহার শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া তাহার একখানা পত্র লিখিবারও প্রবৃত্তি হইত না। সে মনে

করিত, দুই এক দিনের মধ্যে খোকা আরোগ্য হইলে, সে পত্র লিখিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, কলিকাতার যাবতীয় ডাক্তার আসিয়া তাহাকে দেখিল, তথাপি খোকা এ যাবৎ আরোগ্য হইতে পারিল না। গদাধর ডাক্তারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনারা কি আমার পুত্রকে আরোগ্য করিতে পারিবেন না?"

একজন ডাক্তার কহিলেন, "অদ্যকার রাত্রি অতিবাহিত না হইলে আমরা কিছুই অবধারণ করিতে পারিব না। আমার বিবেচনায়, আজ ডাক্তার ইমার্সন আসিয়া যদি এখানে রাত্রি-যাপন করেন, তাহা হইলে বিশেষ ভাল হয়

গদাধর কহিল,—"আপনাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহা করিতে হইবে। আপনি ডাক্তার ইমার্সনের নিকট যাইয়া এ বিষয়ের ব্যবস্থা করুন।"

ডাক্তার কহিলেন,—"আমি তাঁহাকে আজ এখানে রাত্রিযাপনের কথা বলিয়াছিলাম, তিনি সম্মত হ'ন নাই। আমার মনে হয়, আপনি নিজে যদি তাঁহার বাটীতে যাইয়া, একবার অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি 'না' বলিতে পারিবেন না।"

গদাধর বলিল,—"ভাল আমিই যাইব। যে উপায়ে পারি, তাঁহাকে সম্মত করিতেই হইবে।"

খোকার শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া, দিবাবসান কালে, গদাধর ডাঃ ইমার্সনকে রাত্রিবাসের জন্য আহ্বান করিতে তাঁহার বাটীতে গমন করিল। যাইবার পূর্ব্বে সে মানদাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিল যে, সে যেন গদাধরের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত খোকাকে ছাড়িয়া একদণ্ডের জন্য স্থানান্তরে গমন না করে। মানদা বলিয়াছিল যে, সে কোথাও যাইবে না; গদাধর নিশ্চিন্তমনে ডাক্তারের বাটীতে যাইতে পারে।

ডাঃ ইমার্সনের বাটীতে যাইয়া গদাধর শুনিল যে, ডাক্তার সাহেব বাটীতে উপস্থিত নাই; তাঁহার চিকিৎসাধীন অন্য কোন পীড়িতকে দেখিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন; বোধ হয় অল্প কাল মধ্যে প্রত্যাগত হইবেন। ডাক্তার সাহেবের বেহারা আসিয়া গদাধরকে লইয়া, বসিবার ঘরে বসাইল। বলিল, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন; সন্ধ্যা হইয়াছে, তিনি এখনই বাটী ফিরিবেন।

অগত্যা ডাক্তার সাহেবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গদাধর নীরবে, ডাক্তার সাহেবের নির্জ্জন কামরায় বসিয়া রহিল। বাহিরে, বাগানে, ঝিঁ ঝিঁ পোকারা সান্ধ্য-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেছিল। গদাধর বসিয়া বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিল। বাতায়ন-পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিল, আকাশে তারাগণ ফুটিয়া উঠিয়াছে;—দেববালারা স্বর্গদ্বারে বুঝি অসংখ্য সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া দিয়াছে। ডাক্তার সাহেবের বাগানে টবের উপর বসিয়া ফ্লক্স, পিঙ্ক, কার্নেসন্, ডেজি প্রভৃতি মরসুমী পুষ্পগুলি গ্যাসালোকে মধুর হাস্য করিতেছে। পুষ্পময়ী, আলোকময়ী, সঙ্গীতময়ী কি সুন্দর সন্ধ্যা!—কিন্তু গদাধরের ব্যাকুল হৃদয়ে কোন সৌন্দর্য্যই স্পর্শ করিল না। সে বসিয়া বসিয়া খোকার বিশুষ্ক মুখখানি ভাবিতেছিল। খোকাকে কি সে আরোগ্য করিতে পারিবে না?

দেখিতে দেখিতে এক ঘণ্টা কাল অতীত হইয়া গেল। ডাক্তার সাহেব ত এখনও বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন না। গদাধর চিন্তিত হইল। মনে করিল, "একবার বাটী যাই; আবার আসিব।"

আবার ভাবিল, "না, একটু অপেক্ষা করি, ডাক্তার সাহেব হয়ত এখনই আসিবেন। যদি চলিয়া যাই, আর ডাক্তার সাহেব যদি আমার অনুপস্থিত সময় মধ্যে আগত হইয়া, আবার অন্য আতুরের চিকিৎসার জন্য অন্যত্র চলিয়া যা'ন, তাহা হইলে আবার অনেক বিলম্ব ঘটিবে, তা'র চেয়ে তাঁ'র অপেক্ষায় আর একটু বসিয়া থাকি। খোকা মানদার পাশে বেশ শুইয়া আছে; আমার চিন্তা কি?—আমি আর একটু অপেক্ষা করি।"

এইরূপে আর একটি ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ডাক্তার সাহেবের খানাকামরার ঘড়িতে আটটা বাজিল। গদাধর অস্থির হইয়া উঠিল;—আর ত সে থাকিতে পারে না। মানদা হয় ত খোকার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া গিয়াছে। খোকা হয় ত একাকী ভয় পাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে 'বাবা, বাবা' বলিয়া ডাকিতেছে। আচ্ছা! আজ ডাক্তারেরা ডাক্তার সাহেবকে রাত্রে বাটীতে রাখিবার জন্য বলিলেন কেন? অন্যদিন ত তাঁহারা এরূপ বলেন নাই। আজ রাত্রে ডাক্তারেরা খোকার কি কোন বিপদ্ আশঙ্কা করিয়াছেন? গদাধরের হৃৎপিণ্ডটা তাহার কণ্ঠাবরোধ করিয়া দিবার উপক্রম করিল। সে বাটী ফিরিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

বেহারা আসিয়া বলিল, "বাবু, আপনি যদি এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছেন, তবে আর দুই মিনিট অপেক্ষা করুন; সাহেবের আহারের সময় হইয়াছে, এখনই বাটী ফিরিবেন।" বেহারা সত্য অনুমান করিয়াছিল। দুই চারি মিনিটের মধ্যে সাহেবের গাড়ি আসিয়া গাড়ি-বারান্দায় দণ্ডায়মান হইল।

ব্রুহাম হইতে অবতরণ করিয়া, গদাধরকে দেখিয়া, ডাঃ ইমার্সন কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়াছি; আহারাদি করিয়া আপনার সহিত কথা কহিব।" গদাধর প্রাণ হস্তে করিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল।

নয়টার পর, ডাক্তার সাহেব আসিয়া, গদাধরের সহিত কথা কহিলেন। গদাধরের অনুনয় শুনিয়া, তিনি বলিলেন,—"বেশ, আমি আপনার বাটী যাইয়া রাত্রি যাপন করিব। আমি এখনই প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি, আপনার গাড়িতেই যাইব।"

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় গদাধর ডাক্তার সাহেবকে লইয়া বাটী ফিরিল।

৪৯

ডাক্তার ইমার্সনকে আহ্বান করিবার জন্য গদাধর বাটীর বাহির হইলে, গদাধরের বাটীতে জ্ঞানদা বাবুর স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ দিবাবসানকালে খোকাকে দেখিতে আসিতেন।

আজ জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে একটা উৎসব ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে আজ তাঁহার বাটীতে যাত্রার অভিনয় হইবে। গদাধরের পুত্রের পীড়া দেখিয়া, এ বিবাহটা তৎকালে স্থগিত করিবার জন্য, জ্ঞানদা বাবু একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। যে উৎসবে গদাধর যোগদান করিতে পারিবে না, তাহাতে তাঁহার আনন্দ ছিল না। কিন্তু কন্যাপক্ষ বড় জেদ করিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "কন্যা বয়স্থা হইয়াছে; আর বিলম্ব করিলে জাতি থাকিবে না।" কাজেই অপ্রসন্ন মনে জ্ঞানদা বাবু বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। স্থির করিলেন যে, অভিনয় [illegible] না। কিন্তু তাঁহার এক [illegible] বলিলেন, "ইহা হইতে পারে না। [illegible] পুত্রের মনে চিরদিন

ক্ষোভ থাকিয়া যাইবে; উহার সহোদরদের গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে যাত্রা হইয়াছিল; উহার গাত্রহরিদ্রাতেও যাত্রা হওয়া চাই।” অতএব সেই দিন সন্ধ্যাকালে জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে যাত্রা অভিনয়ের উদ্যোগ হইতেছিল। বাহির-বাটীতে আসর সজ্জা করিবার জন্য, এবং অন্দরমহলে শীঘ্র ভোজনকার্য্য সমাধা জন্য বাটীর প্রত্যেক লোক অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। গৃহিণীর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। তথাপি সে দিনও তিনি গদাধরকে ভুলেন নাই। তাহার পীড়িত পুত্রকে দেখিবার জন্য সমস্ত উৎসব ত্যাগ করিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন।

গদাধরের নির্দ্দেশমত, জ্ঞানদাবাবুর গৃহিণীকে মানদা ‘মা’ বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহাকে সমাগতা দেখিয়া, মানদা জিজ্ঞাসা করিল,—“মা, আপনাদের বাটীতে আজ নাকি যাত্রা হইবে?”

গৃহিণী বলিলেন,—“হাঁ মা, আজ আমাদের বাটীতে যাত্রা হইবে। তোমার খোকার অসুখ, এজন্য তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ি পাঠাই নাই। খোকা ভাল হউক, আবার যাত্রা দিয়া তোমাদের লইয়া যাইব।”

মানদা কহিল,—“খোকা অনেক ভাল আছে। বাবু বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, আমি আমাদের গাড়িতেই যাইয়া, একবার দেখিয়া আসিব। কিসের পালা হইবে?”

গৃহিণী উত্তর করিলেন,—“অভিমন্যু-বধ।—বেশ পালা। তা, খোকা ভাল থাকিলে, গদাধরকে বলিয়া তুমি একবার যাইয়া দেখিয়া আসিতে পার।”

মুনী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল,—“অভিমন্যু-বধ বড় চমৎকার পালা,—সপ্তরথীর যুদ্ধ আছে, সখিদের নাচ গান আছে, [illegible] বড় চমৎকার! আমি একবার ন'পাড়ার বাবুদের বাড়ীতে দেখিতে গিয়াছিলাম।”

মানদা বলিল,—“আমি যাইব;—তুই আমার কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া রাখ্।”

খোকাকে দেখিয়া, জ্ঞানদা বাবুর গৃহিণী চলিয়া যাইলে, মানদা বেশবিন্যাস করিতে বসিল। কমনীয় কৌষেয় বসনে, বিদ্যুৎ-প্রভা রত্নাভরণে মনঃসম্মোহনকারী গন্ধানুলেপনে সে আপনার পরিমার্জ্জিত এবং পরিণত বরদেহ শারদীয়া দেবীপ্রতিমার ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া, দিক্‌সকলকে চমকিত করিয়া দিল। অলঙ্কার-নিবদ্ধ সুদর্শন মণি-মালা দিগ্বিদিকে নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি উদ্গীরণ করিল। গদাধরের গৃহমধ্যে তড়িত লীলাতুল্য ঔজ্জ্বল্যের তরঙ্গ উঠিল। মাতার এ বেশ দেখিয়া খোকা বলিল, “মা, তুমি কোথায় যাইবে? আমিও তোমার সহিত যাইব।” মানদা বলিল,—“তোমার অসুখ সারুক;—তোমাকেও ভাল ভাল পোষাক পরাইয়া যাত্রা শুনিতে লইয়া যাইব।” খোকা আর কিছু বলিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পার্শ্ব ফিরিয়া, শয়ন করিল।

অন্তঃপুরের দ্বারের নিকট, কাল ঘোড়ার জুড়ি-পাল্কীগাড়ি মানদার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু গদাধর প্রত্যাগমন না করিলে এবং তাহার অনুমতি না পাইলে মানদা যাইতে পারে না। ও হরি! তবে কি মানদা গদাধরকে ভয় করিত? না, মানদা গদাধরকে ভয় করিত না।—কিন্তু মানদার অকর্ম্মণ্যতা গদাধরের কার্য্যতৎপরতাকে ভয় করিত। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।—আলস্য চিরদিন কর্ত্তব্যের মহিমা-তলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে। মানদা গদাধরকে ভয় না করিলেও, তাহার অনুমতি না লইয়া, সহসা যাইতে পারিল না।

মুনী তাহাকে উৎসাহ প্রদান করিল।

বলিল,—"জামাইবাবু এখনই ফিরিয়া আসিবে; তোমার ভাবনা নাই। চল ক্ষান্ত ঝিকে খোকার কাছে বসাইয়া, আমরা যাই। আট্টা বাজিতে চলিল; এতক্ষণ বোধ হয় যাত্রা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহার পর, আমরা আর বসিবার স্থান পাইব না।"

অতএব মুলীকে লইয়া, মানদা যাত্রা শুনিবার জন্য জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে প্রস্থান করিল। ক্ষান্ত ঝি আসিয়া, খোকার কাছে বসিল। খোকা ঝির দিকে না ফিরিয়া, বালিশে মুখ লুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—"ঝি, মা চলিয়া গিয়াছে" ঝি বলিল, "হাঁ।"

কিয়ৎকাল পরে খোকা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"ঝি বাবা কোথায়?" শিশু-কণ্ঠের কি কাতর ধ্বনি!—তোমাদের মনে আছে, ডাক্তার সাহেবের বসিবার ঘরে বসিয়া, ঠিক আট্টার সময় গদাধরের মন কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল?—খোকা যখন বলিল, "ঝি, বাবা কোথায়?" —তখনও ঠিক আট্টা বাজিয়াছিল। তবে কি খোকার কাতর আহ্বান গদাধর শুনিতে পাইয়াছিল? মনস্তত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিতগণও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনও সমর্থ হইবেন না। এ প্রশ্ন চিরদিনই প্রশ্ন থাকিবে। খোকার কথা শুনিয়া ঝি বলিল. "বাবা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন, এখনই ফিরিয়া আসিবেন।"

কিছুক্ষণের জন্য খোকা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। তাহার পর আবার ডাকিল, —"ঝি!"

"কেন?"

"আমার তৃষ্ণা পাইয়াছে; তুমি আমাকে জল আনিয়া দাও।"

ঝি জল আনিয়া দিল। খোকা বলিল, —"আমি উঠিতে পারিব না; তুমি আমার মুখে ঢালিয়া দাও।" ঝি খোকার মুখে জল ঢালিয়া দিল। কিন্তু বেশী ভাগ জল বিছানায় পড়িল। খোকা বলিল, "ঝি, বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে।" ঝি বিছানায় হাত দিয়া কহিল,—"ও একটুখানি ভিজিয়াছে; আপনি শুকাইয়া যাইবে।" খোকা জলসিক্ত শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

খোকা ঝিকে আবার ডাকিল। কহিল, —"ঝি, আবার আমার তৃষ্ণা পাইয়াছে; তুমি আমাকে আরও একটু জল দাও।"

ঝি বলিল,—"বার বার জল খাওয়া হইবে না। অসুখ করিবে। গরম দুধ আনিয়া দিতেছি, খাও।" ঝি দুধ আনিবার জন্য চলিয়া গেল। খোকা একাকী সেই সিক্ত বিছানার উপর পড়িয়া রহিল। চক্ষু মেলিয়া, গৃহভিত্তিসকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বড় ভীত হইল। সভয়ে ডাকিল, "ঝি।" ঝি দুগ্ধ আনয়ন জন্য রান্না বাড়ীতে গিয়াছিল; তথায় উনানের পার্শ্বে বসিয়া, বামুন ঠাকুরের নিকট মুলীর নিন্দা করিতেছিল। সে খোকার ক্ষীণ আহ্বান শুনিল না।

খোকা আবার ডাকিল,—"ঝি! ও ঝি। আমার বড় ভয় করিতেছে।—আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে!"—বামুনঠাকুরের সরস ভাষায় ঝির কর্ণ তখন ভরিয়া-গিয়াছিল। সে কর্ণে খোকার ক্ষীণ আহ্বান পৌঁছিল না।

বড় ভয়! বড় তৃষ্ণা!—শিশু অস্থির হইয়া উঠিল। যদি তাহার উত্থানশক্তি থাকিত, তাহা হইলে, সে উঠিয়া কুঁজা হইতে আপনি জল লইয়া পান করিত; [illegible] হইয়া [illegible] উচ্চৈঃস্বরে [illegible] ছিল না।

তথাপি সে অতিকষ্টে বিছানা হইতে নামিতে চেষ্টা করিল। চেষ্টা করিতে গিয়া খট্বা হইতে মর্ম্মরমণ্ডিত গৃহতলে পড়িয়া মস্তকে আহত হইল। পিপাসা-কাতর, ভয়শঙ্কিত শিশুর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে হস্ত-পদের সাহায্যে কোন ক্রমে জলের কুঁজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার ক্ষীণ হস্তপদ বিজড়িত হইয়া আসিল। তাহার মস্তক চেতনা বিলুপ্ত হইল।

(৫০)

ডাক্তার ইমার্সনকে সঙ্গে লইয়া গদাধর বাটী ফিরিয়া, সমভিব্যাহারী বেহারাকে ডাক্তার সাহেবের শয়নঘর দেখাইয়া দিল। সে ডাক্তার সাহেবের শয্যা বসন গুছাইয়া রাখিল। ডাক্তার সাহেব বসিবার ঘরে বসিয়া চুরুট ধরাইয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। গদাধর দ্বিতলে উঠিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কক্ষের পর কক্ষ গ্যাসালোকে আলোকিত হইয়া, নীরবে হাসিতেছিল। তাহারা গদাধরের ভাগ্যকে নীরবে বিদ্রূপ করিতেছিল। বাতায়নপথে নিশীথ বায়ু প্রবেশ লাভ করিয়া নীরব কক্ষসকল মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ করিতেছিল। গৃহসামগ্রী সকলের কৃষ্ণছায়া সকল যমদূতগণের কৃষ্ণপক্ষের ন্যায় গৃহতলে বিস্তৃত ছিল। নীরব, নির্জ্জন কক্ষসকল দেখিয়া গদাধরের বক্ষঃ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষীণ বিকম্পিত কণ্ঠে, করুণস্বরে ডাকিল,—"মানদা!" হায়! তাহার এ আহ্বানে কে উত্তর দিবে?"

তোমরা ত জান মানদা তখন জ্ঞানদা বাবুর বাটী[illegible] গিয়াছিল। সে কি [illegible] অভিমন্যুর [illegible]

অর্জ্জুন যখন স্কন্ধবিলম্বিত শরাসন দূরে নিক্ষেপ করিয়া হাহাকার রবে চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন কি জানি কেন, মানদার চিত্তে একটা মহাবিষাদ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। আপনার খোকার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আর তাহার যাত্রা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল না। সে উঠিয়া, মুলীকে ডাকিয়া বলিল, 'মুলী, আর আমি যাত্রা শুনিব না, তুই গাড়ি আনিতে বল; আমি বাড়ি যাইব।' মুলী বলিল, 'আর একটু অপেক্ষা কর, জয়দ্রথ বধের আর বিলম্ব নাই; আমরা জয়দ্রথ বধ দেখিয়া বাটী যাইব।' অগত্যা, মানদা আপনার পূর্ব্ব বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিতেছিল। অভিনয় দর্শনাভিলাষিণী উপবিষ্টা সীমন্তিনীগণ অভিনয়দর্শনে ক্লান্ত হইয়া মুগ্ধনেত্রে কম্পাকবিকম্পিত সচল দীপশিখার ন্যায় তাহার বহু রত্নালঙ্কার-বিভূষিত গমনশীল বরদেহ অবলোকন করিতেছিল। অচঞ্চল চপলার ন্যায়, নব-সূর্য্য-রশ্মি প্রতিফলিত নবীন ক্ষীর ক্রমের ন্যায়, ফুল্ল প্রসূন-প্রফুল্লা লতাপ্রতানিনীর ন্যায়, রত্নমণ্ডিতা মানদা মরি! মরি! কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল! অলঙ্কারপ্রিয় নারী-সমাজ মধ্যে সে কি মহা উন্মাদনার অবতারণা করিয়াছিল! তাহারা অর্জ্জুনকে ভুলিয়া, অভিমন্যুকে ভুলিয়া এবং নারাচ-খড়্গ-ভল্ল-গদা-বিভূষিত সপ্তরথীকে ভুলিয়া অবাক্ হইয়া মানদার প্রতি আপনাদিগের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। সহসা মহিলামণ্ডলী বিচলিত হইয়া উঠিল। কেরোসিন-তৈলপূর্ণ একটি প্রদীপ্ত আলোকাধার মানদার বিলুণ্ঠিত সুবর্ণাঞ্চলে বিজড়িত হইয়া হর্ম্ম্যতলে পতিত হইয়া বিচূর্ণ হইয়া গেল। এবং পলক মধ্যে গৃহতলে পতিত তৈলরাশি মানদার দেহকে ধূমমণ্ডিত

করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বহ্নিরাশি লোল রক্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া মানদার বসনাঞ্চল আক্রমণ করিল। সে প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। জ্ঞানদা বাবুর স্ত্রী এবং মুন্নী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিল। কিন্তু তাহারা মানদার নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই, অগ্নি মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার প্রবল অধিকার বিস্তার করিয়া লইয়াছিল। মানদার গৃহতল বলুণ্ঠিত দেহকে পরিবেষ্টিত করিয়া, আপনার রক্তবর্ণ বিজয় কেতন আকাশে তুলিয়া দিয়াছিল।

জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে দগ্ধদেহ লইয়া মানদা যখন বার বার কাতর স্বরে বলিতেছিল, "জল দাও, জল দাও, পিপাসা পিপাসা," যখন তাহার ক্ষীয়মান দেহ প্রতিক্ষণে মৃত্যুর দংশনে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন গদাধর বাটীতে ফিরিয়া প্রকোষ্ঠ সকল জনশূন্য দেখিয়া, ডাকিতে লাগিল,—'মানদা! মানদা!'—হায়! মানদা এক্ষণে এ আহ্বানের কিরূপে উত্তর দিবে?

খোকার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া গদাধর দেখিল, শূন্য শয্যা পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার উপর তাহার খোকা শুইয়া নাই। গদাধর আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করিল না; শয্যার উপর হস্তার্পণ করিয়া দেখিল, তুষারের ন্যায় ধবল এবং ততোধিক শীতল শয্যা মৃতবৎসার ক্রোড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।

গদাধর বারান্দায় বাহির হইয়া শুনিল নিম্নতলে, রন্ধনশালায়, পরিচারিকাসকল কথা কহিতেছে। সে উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে আহ্বান করিল। ক্ষান্ত ঝি গদাধরের কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া, বামুন ঠাকুরের রসালাপ অকালে ভঙ্গ করিয়া, আপন কুণ্ডলীকৃত বসনাঞ্চলে তপ্ত দুগ্ধ বাটী সন্তর্পণে গ্রহণ করিয়া ত্বরিত পদে উপরে আসিল। অন্য দুই পরিচারিকাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে আসিল। তাহাদিগকে গদাধর জিজ্ঞাসা করিল,—"ইহারা সব কোথায়? খোকা কোথায়?

ক্ষান্ত ঝি বলিল,—"মা ঠাকুরাণী মুন্নী দিদির সহিত জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে গিয়াছেন।"

গদাধর। আর খোকা?

ক্ষান্ত। খোকা বাবু ঘরের ভিতর খাটের উপর শুইয়া আছে। আমি তাহার জন্য দুধ আনিতে নীচে গিয়াছিলাম।

গদাধর। আমি ঘরের ভিতর গিয়াছিলাম। খোকাকে খাটের উপর দেখিতে পাইলাম না।

ক্ষান্ত। আমি এইমাত্র খোকাকে রাখিয়া দুধ আনিতে গিয়াছিলাম।

গদাধর পরিচারিকাগণের সহিত আবার খোকার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। কোথায় খোকা? পরিচারিকাগণ সভয়ে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। গদাধর গৃহের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। দ্বারের পার্শ্বে জলের কুঁজার নিকট ও কি? গদাধর দেখিল, তাহার নয়নমণি, তাহার জীবনাধিক, তাহার ক্ষীরপুত্তলি, তাহার সংসারের সার, অবশদেহে শ্বেত মর্ম্মরের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। গদাধর ত্বরিতপদে তাহার নিকটে যাইয়া, তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। স্থিরনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে গৃহতলে বসিয়া পড়িল। বুঝি তাহার বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল। হায়! হায়! খোকা তাহাকে ফাঁকি দিয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে;—তাহার প্রাণপাখী স্বর্ণদেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে। [illegible] র শীতল দেহ [illegible] প্রায় এক ঘণ্টা [illegible] তাহার প্রাণ- [illegible]

যে কারণেই প্রাণবিয়োগ ঘটুক, ইহা সত্য যে, তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। গদাধর তাহাকে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছিল;—শত চেষ্টা করিয়াও রক্ষা করিতে পারে নাই। গদাধর ভাবিল, কি পাপে সে বজ্রাঘাততুল্য এই নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইল? দাঁড়াও গদাধর! তোমার শোক প্রাপ্তির এখনও শেষ হয় নাই। আগে ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে যে সকল শোক তোমার জন্য সঞ্চিত আছে, তাহা বিধাতার বিধান মনে করিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ কর; তাহার পর ভাবিও, তোমার কি পাপে এ তাপ ঘটিল। কে জানে, তোমাকে শোকের আগুনে দগ্ধ করিয়া, করুণাময় আপনার কোন করুণ কার্য্য সংসাধনের জন্য কি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন?—আঘাতের পর আঘাত প্রদান করিয়া কি অস্ত্র গঠিত করিতেছেন।

গদাধর যখন পুত্রের মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল, তখন সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গৃহমধ্যে হৃদয়বিদারক হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। গদাধর আপন পৃথুল ললাটে হস্তার্পণ করিয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, মুলী—স্খলিতাঞ্চলা পক্ককেশা অশীতিপর বৃদ্ধা মুলী ভূতগ্রস্তার ন্যায়, জ্ঞানাপহতার ন্যায় অশ্রুজলে তাহার কুঞ্চিত কপোল প্লাবিত করিয়া, তাহার দন্তহীন বদনবিবর বিস্তার করিয়া তীব্র শোকধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া, গদাধর তাহাকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, মানদা কোথায়?

মুলী তাহার বাহুর লোল পেশী সমুদয় আন্দোলিত [illegible] করিয়া কহিল, [illegible]

ফাঁকি দিয়াছে; সে আর পৃথিবীতে নাই; তাহার দগ্ধ দেহ জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে পড়িয়া রহিয়াছে; আইস,—দেখিবে।"

গদাধরের চক্ষের জল শুষ্ক হইয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল!! তাহার বিশুষ্ক ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া অস্ফুট কণ্ঠ বাণী নির্গত হইল,—

"Now men of death, work forth
your will,
For I can suffer and be still," *

(৫১)

আপনার শোকতপ্ত প্রাণটা, বিপুল কার্য্যস্রোত মধ্যে নিমজ্জিত করিবার জন্য গদাধর পরদিন হইতে আপন ব্যবহারজীবীর কার্য্য মহা পরিশ্রমসহকারে সম্পন্ন করিতে লাগিল। যতক্ষণ তাহার শ্রমক্লান্ত দেহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া না পড়িত, ততক্ষণ সে কার্য্যের পর কার্য্য সম্পাদন করিয়া, আপনার মনকে শোক-চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করিত না। তথাপি ক্ষণে ক্ষণে তাহার হৃদয়-ক্ষত অসহ্য জ্বলিয়া উঠিত। পথে, কোনও শিশুকে আর্ত্তস্বরে 'বাবা' বলিয়া ক্রন্দন করিতে শুনিলে সে একান্ত অধীর হইয়া পড়িত। তাহার মনে হইত, তাহারই সেই খোকা কোন দুঃখে পড়িয়া আশ্রয়লাভাশায় যেন তাহাকেই ডাকিতেছে। সে কতবার শকট হইতে অবতরণ করিয়া এইরূপ ক্রন্দনমান শিশুর নিকট উপস্থিত হইত; তাহার অঙ্গের ধুলা ঝাড়িয়া তাহাকে কোলে লইত; আশ্বস্ত করিত; খাদ্য এবং খেলনা ক্রয় করিয়া দিত। কোন কোন স্থলে, দরিদ্র শিশুগণকে সে আপন বাটীতে লইয়া আসিত এবং তাহার অভিভাবকগণকে আহ্বান করিয়া বহু অর্থ প্রদান করিয়া [illegible]য় করিত। ফলতঃ শিশুগণের ক্ষুদ্র

* Scott, Marmion, ii st, 30,

দুঃখও সে সহ্য করিতে পারিত না। কোনও স্থানে অগ্নিদাহের কথা শুনিলেও তাহার মন অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিত।

মানদার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা হইবার পর, একদিন গদাধর নিশীথকালে আপন শয়নকক্ষে নিদ্রা যাইতেছিল। বাহিরে একটা জনতার কলরব শুনিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বাতায়ন-পথে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, দূরে কাহারও বাটীতে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়াছে। দেখিয়া, গদাধরের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। গাড়ি প্রস্তুত করিবার অপেক্ষা না করিয়া, রাত্রির বসন পরিবর্ত্তন না করিয়া, সে একাকী দহ্যমান স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এবং কিয়ৎকাল মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই স্থানে কতকগুলি লোক অগ্নিনির্ব্বাণকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে, একজন গদাধরকে বলিল, সকল লোকেরই জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছি; কিন্তু বোধ করি একটী স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষা করিতে পারিব না। এই সম্মুখের বাড়ীতে সে রহিয়া গিয়াছে। এই বাটীর চারিদিকে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিরূপে আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিব?" গদাধর, বাক্যমাত্র উচ্চারণ না করিয়া, সেই অগ্নির দিকে মহাবেগে প্রধাবিত হইল। দুই জন পাহারাওয়ালা তাহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখের দিকে প্রধাবিত দেখিয়া, তাহার গতিরোধ করিবার জন্য, তাহার সম্মুখে আসিয়া, সবলে তাহার বাহুদ্বয় গ্রহণ করিল। হায়! তাহারা ত জানিত না যে, সেটা গদাধরের বাহু? তখন তাহাতে একটা মত্ত হস্তীর বল সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহাদের বাহুধারণটা গদাধর অনুভব করিতে পারে নাই। সে পূর্ব্ববৎ প্রচণ্ডবেগে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিয়া, সকলের মনে প্রতীতি জন্মিল যে, আর একটা মানুষ সেই ভীষণ অগ্নিযজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদান করিল। জনতার মধ্যে একটা হাহাকার পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু দুই মিনিট পরে, লোকসকল আবার পুলকিত হইয়া উঠিল;—এক রমণীর মৃতবৎ দেহ স্কন্ধে করিয়া, সতীদেহধারী শূলপাণির ন্যায় বিপুল-দেহ গদাধর অগ্নির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। জনসমারোহের জয় জয় নিনাদে দিক্‌সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গদাধর বাটী ফিরিয়া নিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

শিশুগণ ক্রন্দন করিলে, অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিলে, গদাধরের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, অগ্নিজ্বালায় অন্তর পুড়িয়া যাইত।

এইরূপে একমাস কাল অতিবাহিত হইল। একমাস পরে, গদাধর কালীদহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এত দিন সে তাহার সর্ব্বনাশের কথা পত্র লিখিয়া কালীদহের কাহাকেও জ্ঞাপন করে নাই। এক্ষণে রত্নেশ্বর বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া সে নিজ মুখে তাহার শোক-সংবাদ প্রদান করিল। তাহার সংবাদ শুনিয়া রত্নেশ্বর বাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকা হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গদাধরের শোক মহা-উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইল।

সন্ধ্যার পর, শান্তিলাভ প্রত্যাশায় সে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হায়! কি মহা অন্ধকারে গৃহটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে? কই বহির্বাটীতে ত কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় উপস্থিত নাই। [illegible] অম্বিকা দেবীর নিকট [illegible]েছেন। [illegible] গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিল। দেখিল বহির্বাটীর একটা ক্ষীণালোক কক্ষে কোন ভদ্র ব্যক্তি নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। গদাধর সেই ব্যক্তির পরিচয় অবগত ছিল না; কিন্তু তিনি গদাধরকে চিনিতেন।

গদাধরকে দেখিয়া, তিনি আবার মস্তক অবনত করিলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আপনি গদাধর বাবু, রত্নেশ্বর বাবুর জামাতা, এ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান জমীদার! দেখুন এই পাপ জিহ্বাটা আপনার শত নিন্দা করিয়া ব্যথিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি আপনার মহাগৌরবকে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হয় নাই। আপনি আমাকে জানেন না? আমি গোবিন্দলাল। আমি দেবী অম্বিকার নিন্দা করিয়াছিলাম। যাহাতে তাহার বিবাহ না হয়, তাহার জন্য তাহার মাতার নামে কুৎসা রটনা করিয়াছিলাম। তথাপি মহিমাময়ী দেবলোকে স্থান লাভ করিয়াছে;—আমি পৃথিবীতে থাকিয়া নরক-জ্বালা উপভোগ করিতেছি।"

গদাধর বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"অম্বিকা কি বাটীর মধ্যে রহিয়াছে?"

গোবিন্দলাল। আমি তাহাকে সর্ব্বত্র অবলোকন করিতেছি। তাহার প্রসন্ন, দেবদুর্লভ মুখের শান্ত হাসি, ঐ দেখুন, আকাশের গাত্রে, শতকোটী নক্ষত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গদাধর। কোথায় সে?

গোবিন্দ। আপনি তাহা অবগত নহেন? আমাকেই কি তাহা বিবৃত করিতে হইবে?

গদাধর। কোথায় অম্বিকা?

গোবিন্দ। দেখিতেছি, আপনি কোন সংবাদ অবগত নহেন। এক [illegible] কিছু অধিক, সময় পূর্ব্বে, এক [illegible] বড় [illegible] হইয়াছিল। সেই দিন আপনার নাড়িচা হইতে কলিকাতা ফিরিবার কথা ছিল। সেই দিন বিকালে নৌকারোহণ করিয়া অম্বিকা পিতার সহিত গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতেছিল। দূরে স্রোতমধ্যে কোনও সচল দ্রব্য নিরীক্ষণ করিয়া সে মনে করিয়াছিল যে, আপনি স্রোতোজল মধ্যে মজ্জমান হইয়াছেন। সে আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

গদাধর। তাহার পর? তাহার পর?

গোবিন্দ। তাহার পর, তাহাকে আর পাওয়া যায় নাই। দেবী আমার, মাতা আমার, দেবকার্য্যে পবিত্র গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে।—আমার কন্যাকে আপনি কি জানেন? রাক্ষসীর নাম চারুশশী;—তাহার স্বামীর নাম ছিল অতুলানন্দ! রাক্ষসী দেবীর নিন্দা করিয়াছিল। দেবী আপন মহিমালোকে দেবলোক আলোকিত করিয়া স্বর্গের উপর বসিয়া রহিয়াছে; আর রাক্ষসী নরকের কীটের ন্যায় উঃ! রাক্ষসী আপনারও নিন্দা করিয়াছিল; আপনাকে লম্পট বলিয়া লোকের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিল। রাক্ষসী...

কিন্তু গদাধর আর গোবিন্দলালের কথা শুনিতেছিল না। সে কক্ষগাত্রে ভর দিয়া, অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন তাহার পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। তাহার চক্ষুর সম্মুখে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য রাত্রির আঁধারে আবৃত হইয়াছিল। তবে এ পৃথিবীতে অম্বিকা আর নাই! তবে তাহার ভাগ্যলিপি সফল হইয়াছে!!

বহুক্ষণ পরে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গদাধর দ্বিতলে আরোহণ করিতেছিল। সিঁড়িতে সে

সহসা স্তম্ভিত হইয়া, দণ্ডায়মান হইল। উপর হইতে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের অতি গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল। মেঘ-নিনাদের ন্যায় গম্ভীর স্বরে তিনি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত ভগবানের মধুর স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

"ভয়ানং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পবনানাম্।"

গদাধর বুঝিল, যিনি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্" তিনিই প্রাণিগণের একমাত্র গতি এবং একমাত্র পাবন সে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের কণ্ঠের সহিত আপন কণ্ঠ মিলিত করিয়া, যুক্ত করে, ভক্তিগদ্গদচিত্তে ডাকিল,—

"তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।"

সমাপ্ত

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভারতী মঙ্গলকাব্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

অমর বাহিনী সঙ্গে ল'য়ে মহেশ্বর।
সুসজ্জে আসিছে তিনি করিতে সমর ॥
কহিছেন এই বাণী শুন সাবধানে।
দেবের বিষয় ধন লয়াছ আপনে ॥
সে সকল কণ্ঠে বটে দেও ফিরাইয়া।
নতু যুদ্ধ কর আসি সুসজ্জ হইয়া ॥
দুই মধ্যে কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য তোমার।
তাহা কহ তথা যায়া বলি সমাচার ॥
ক্ষণেক স্তকিত হৈয়া বলে দৈত্যপতি।
কহিবে হরেতে মোর এ সব ভারতী ॥
এই যাত্রা করি আমি ব্যাজ নাই আর।
কহিব আপন কথা গোচরে তাঁহার ॥
ইহা শুনি দেবদূত চলিল সত্বরে।
দ্রুত আসি উত্তরিল শঙ্করগোচরে ॥
শিবকে কহিল দূত দৈত্যের কথন।
ইহা শুনি তথাতে তিষ্ঠিলা ত্রিলোচন ॥
ডাকিয়া অসুরগণে বলে শম্ভাসুরে।
সুসজ্জ হইয়া সবে চলহ সমরে ॥
অস্ত্র শস্ত্র যত আছে লহ আপনার।
চল তুর্ণ গতি সব ব্যাজ কেন আর ॥

ইহা শুনি দৈত্যগণ চলিল ত্বরিতে।
সুসজ্জ হইতে লাগে যার যেই মতে ॥
কোন দিতি সুত চলে উত্তম স্যন্দনে।
মত্ত স্তম্বেরমে চড়ি ধায় কোন জনে ॥
কেহ দিব্য তুরঙ্গে হইল আসোয়ার।
অতি বেগে রণে চলে করি মার মার ॥
কেহ কেহ পদব্রজে করিল গমন।
হেন রূপে অসংখ্য চলিল দৈত্যগণ ॥
দ্বারী আসি জানাইল রাজার গোচরে।
আসিয়া সকল সৈন্য তিষ্ঠিয়াছে দ্বারে ॥
ইহা শুনি সেবককে কহে দৈত্যনাথে।
সারথিকে কহ যায়া শতাক্ষ আনিতে ॥
হবে সমর ঘোর নাহিক সংশয়।
অত্যন্ত শিক্ষিত যেন যোড়ে চারি হয় ॥
নানা মত শেল জাঠি অস্ত্র বহুতর।
দিব্য শরাসন আর প্রচণ্ড মুদ্গর ॥
কহিবে সব্যস্থ মতে লইতে এ সব।
কি বুঝি সমরে পড়ে হয় পরাভব ॥
[illegible] সত্বর
[illegible] উপস্থিত [illegible] সারথি গোচরে ॥

যেন রূপ আজ্ঞা করিছিল দৈত্যনাথ।
কহিল সকল কথা সারথি সাক্ষাতে ॥
সারথি দূতের হেন বচন শুনিয়া।
সাজাইল রথখান সুসবাস্ত হৈয়া ॥
বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্র তোলে রথোপরে।
অতি শীঘ্র রথ আনিলেক রাজদ্বারে ॥
শুনিল দানবনাথ দ্বারেতে স্যন্দন।
সোণার কিরীট সানা পরিল তখন ॥
তুলসী এমন বাণী শুনিয়া সত্বরে।
তূর্ণ করি আসিলেক পতির গোচরে ॥
হেদেগো ভারতীমাতা শুন এই বাণী।
অন্তকালে তরাইবে নিজ দাস জানি ॥
দ্বিজ রাজসিংহ নাম ভূপতি অনুজে।
নূতন সঙ্গীত ভণে বাণী পদাম্বুজে ॥

ত্রিপদী ॥

শুনিয়া এমত বাণী, বলিল তুলসী রাণী,
শঙ্খচূড় দৈত্যের সদনে।
বিস্তর মিনতি করি, বলে দানবের নারী,
অসুরের ধরিয়া চরণে ॥
শুনিয়াছি পঞ্চানন, সংহতি দেবতাগণ,
আসিছেন যুদ্ধ করিবার
যিনি সংহারেন জীব, আসিছেন সেই শিব,
তাঁর হাতে কে পাবে নিস্তার ॥
মোর মনে হেন লয়, ইথে যাইতে যুক্তি নয়,
হর সঙ্গে করিতে সমর।
পণ্ডিত সুধীর তুমি, সহজে অবলা আমি,
শঙ্কা করি কহিতে বিস্তর ॥
ত্রিভুবনে যত আছে, দেব সঙ্গে কে পারিছে,
হেন না শুনেছি কোন কালে।
দেব সঙ্গে যেই জন, বাদ করে অনুক্ষণ,
বহু কাল নাই যায় ভালে ॥
জিনিয়া নির্জ্জরগণ, যে আনিছ ধনজন,
দেও তাহা হরের গোচরে।
বিরে [illegible]
[illegible] পারি
দৈত্যরাজ [illegible] তুলসীকে কহে বাণী,
[illegible]

বুঝিব তথাতে গেলে, যেবা থাকে কর্ম্মফলে,
সে মত করেন পঞ্চানন ॥
নিতান্ত অভব্য নারি, এমত বুঝিবা তুমি,
নাহি জানি কেবা মহেশ্বর।
সুখে যায়া ঘরে থাক, কোন মত ঘটে দেখ,
যেই থাকে কর্ম্মে লেখা মোর ॥
শঙ্খের এমত কথা, শুনি সুধর্ম্মের সুতা,
চলি গেলা আপন ভবনে।
তবে শঙ্খ দৈত্যবরে, রণ হেতু যাত্রা করে,
রথে যাইয়া চড়ে হর্ষমনে ॥
গমন সময় কালে, ঢাক ঢোল করতালে,
নানা বাদ্যে হৈল আড়ম্বর।
অতি বেগে শঙ্খাসুরে, চলে দর্প অহঙ্কারে
সৈন্য সনে করিয়া সত্বর ॥
শতাঙ্গের চক্রভরে, মেদিনী কম্পিতা করে,
ধূলি আচ্ছাদিল দিনমণি।
অন্ধকার দরশনে, দিবারাত্রি নাহি জানে,
আত্ম পর নাহি চিনাচিনি ॥
আছে যথা বিশ্বনাথ, শঙ্খচূড় সেনা সাথ,
তথা উত্তরিল শীঘ্রগতি।
সংহতি অমর সব, দেখে বসিয়াছে ভব,
রথ হতে নামে দৈত্যপতি ॥
গলাতে বসন থৈয়া, চলিল পদাতি হৈয়া,
ধনুর্ব্বাণ রাখি সুধা গাতে।
মহেশকে নতি করি, দানবের অধিকারী,
দণ্ড সম পড়িল ভূমিতে ॥
যুড়িয়া উভয় কর, স্তুতি করে দৈত্যবর,
ভক্তিভাবে শিবের চরণে।
অতি হীনমতি আমি, জগতের নাথ তুমি,
তোমার মহিমা কেবা জানে ॥
তুমি হরি তুমি ব্রহ্মা, বেদে নারে দিতে সীমা,
আগম পুরাণ আদি করি।
এ তিন লোকের গতি, মৃত্যুঞ্জয় পশুপতি,
প্রধান পুরুষ ত্রিপুরারি ॥
[illegible]সুর নাগনর, সকলি আশ্রিত তোর,
তুমি প্রভু গুণের নিধান।

স্তুতি ভক্তি নাহি জানি, কৃপা কর শূলপাণি,
　　অধমেরে কর পরিত্রাণ ॥
যবে কর কৃপাদৃষ্টি,　তাবত আছয়ে সৃষ্টি,
　　কোপদৃষ্টে ত্রিলোক বিনাশ।
সমুদ্র মন্থনে বিষ,　উঠে পাড়ে দশ দিশ,
　　তাতে রক্ষা কৈলা কৃত্তিবাস ॥
ভারতী চরণোপরে,　ভনে মুর্গ ধরা ময়ে,
　　ভূপ মুখ্য রাজসিংহ নাম।
করি আমি যোড় পাণি,　দয়া কর নারায়ণী,
　　সেবকের পূর মনস্কাম ॥

পয়ার।

শঙ্খচূড় দৈত্য অতি ভক্তি যুক্ত হৈয়া
শঙ্করকে স্তুতি করে সম্মুখে দাণ্ডাইয়া ॥
শুন নিবেদন প্রভু শুন নিবেদন।
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বট পঞ্চানন ॥
কি বলিতে পারি আমি কি বলিতে জানি
ভক্তজনে কৃপা করি তার শূলপাণি ॥
হওত সদয় প্রভু হওত সদয়।
চরমে চরণে স্থান দেও দয়াময় ॥
ত্রিলোকের গতি তুমি ত্রিলোকের গতি।
সৃজক পালক সংহারক পশুপতি ॥
সহজে অজ্ঞান আমি সহজে অজ্ঞান।
নিজ গুণে চরণকমলে দেও স্থান ॥
তুমি আশুতোষ প্রভু তুমি আশুতোষ।
কেন না করিলে দয়া কি করিছি দোষ ॥
ধ্যানে নাহি পায় মুনি ধ্যানে নাহি পায়।
কর পরিত্রাণ প্রভু যে ভজে সদায় ॥
দেহত চরণে স্থান দেহত চরণে ॥
মোর অন্যগতি প্রভু নাই তোমা বিনে ॥
অন্য গতি নাই হর অন্য গতি নাই।
চরণে শরণ লৈল যে কর গোসাই ॥
সর্ব্বময় তুমি নাথ সর্ব্বময় তুমি।
আগমে নাহিক অন্ত কি বলিব আমি ॥
ব্রহ্মতেজোময় তুমি ব্রহ্মতেজোময় ॥
অনাথের নাথ হর ত্রিলোক আশ্রয় ॥
আমি হীনমতি প্রভু আমি হীনমতি।
কিবা জানি স্তবস্তুতি কি জানি ভকতি ॥
ক্ষম অপরাধ হর ক্ষম অপরাধ।
অধমকে কৃপা করি করহ প্রসাদ ॥
তোমার সেবক বটি তোমার সেবক।
কি কাজে নির্দ্দয় হৈলা কোপ করি মোক ॥
হীনে করে দোষ যদি হীনে করে দোষ।
প্রধান অবশ্য তাতে ক্ষমা করে রোষ ॥
অগ্নি জল স্থল তুমি অগ্নি জল স্থল।
কৈবল্যশরণী দাতা তুমি সে সকল ॥
দেবের ঈশ্বর বট দেবের ঈশ্বর।
দীন হীনে কম না হইও মহেশ্বর ॥
সদা ব্রহ্মাহরি সেবে সদা ব্রহ্মাহরি।
অসুর অজ্ঞান আমি কি বলিতে পারি ॥
জপ তপ জ্ঞান নাহি জপ তপ জ্ঞান
পদসারাবরে মোকে রাখ ত্রিনয়ন ॥
দেও এই বর প্রভু দেও এই বর।
তব শ্রীচরণে সদা মন রৌক মোর ॥
না জানে বিধাতা তোমা না জানে বিধাতা।
তাতে অতি মূঢ় আমি কি বলিব কথা ॥
নিজ গুণে তরে জ্ঞানী নিজ গুণে তরে।
অধম তরায় যে ঠাকুর বলি তারে ॥
কে জানে মহিমা নাথ কে জানে মহিমা।
যোগ ধ্যানে যোগীগণ না পাইল সীমা।
বায়ু রবি শশী তুমি বায়ু রবি শশী।
ঋতু অব্দ মাস পক্ষ বট দিবা নিশি ॥
কি বলিব আর প্রভু কি বলিব আর।
যথা শক্তি কৈল স্তুতি যে সাধ্য আমার ॥
শুনহ ভারতী মাতা শুনহ ভারতী।
ভূপাসুজে ভণে তোকে করিয়া ভকতি ॥

ত্রিপদী।

শঙ্খে কৈলে এত স্তুতি,　হর্ষ হৈয়া পশুপতি,
　　হৈয়া [illegible] কহে অতি।
তু [illegible]　[illegible] মন,
　　[illegible]

শুন শম্ভু মহারাজ, কর তুমি এই কাজ,
মোর বাক্য শুন সাবধানে।
রণে করি পরাভব, দেবের বিষয় সব,
ইহা তুমি নিলা কি কারণে॥
মোর মনে হেন দেখে, দুই যায়া থাক সুখে,
বিরোধের নাহিক কারণ।
দেবতার ধন জন, দেও যায়া এইক্ষণ,
অবিরোধে থাক দুই জন॥
মহেশের হেন বাণী, শঙ্খচূড় দৈত্য শুনি,
নিবেদয় যুড়ি দুই কর।
আমি কহি যে বচন, কৃপা করি পঞ্চানন,
নিবেদন বাক্য শুন মোর॥
শুনহ প্রমথরাজ, কর্ত্তার এমত কাজ,
সমভাব দৃষ্টি সকলেকে।
মোকে যেন দেখ পর, মিত্র বটে পুরন্দর,
আত্মভাব কেন দেবতাকে॥
শুন প্রভু পশুপতি, দেবতা দানব প্রতি,
সমভাব কর পঞ্চানন।
যত বিবরণ মোর, নিবেদি চরণে তোর,
যেই ইচ্ছা করহ তেমন॥
মোর পিতৃগণ যত, অমরে করিল হত,
সর্ব্বস্ব নিয়াছে কর্ত্তার।
সেই ধন নিছি আমি, তাতে কেন বল তুমি,
কেন ধন দিব দেবতার॥
কিছু নাই মোর দোষ, বৃথা না করিও রোষ,
ধন নাহি দিব দেবতাকে।
অন্যায় করিলে তুমি, কি বলিতে পারি আমি,
হবে মোর ভাগ্যে যেই থাকে॥
শুনিয়া এমত ভাষ, বলে প্রভু কৃত্তিবাস,
মনে বড় হৈছে অহঙ্কার।
শুন বেটা দিতিসুত, কৈলে বড় অদভুত,
তুচ্ছ কৈলে বচন আমার॥
জান আছে ভুজবল, দিব তার প্রতিফল,
[illegible] করহ সমর।
কৈলে যেন [illegible] কি [illegible] আর,
উচিত [illegible] ॥

শুনিয়া এমত বাণী, যুড়িয়া উভয় পাণি,
দৈত্যনাথ করিলেক নতি।
কোপ মনে বেগে চলে, আপনার সৈন্যে মিলে,
স্যন্দনে চড়িল তূর্ণ গতি॥
শুন মাতা নারায়ণী, ভূপানুজে বলে বাণী,
পূর্ণ কর মম মনস্কাম।
তব পদ ভাবি মনে, নূতন সঙ্গীত ভণে,
মূর্খ দ্বিজ রাজসিংহ নাম॥

পয়ার।

রথে চড়ি শঙ্খচূড় ধনু হাতে নিল।
সকল বাহিনী স্থানে ডাকিয়া কহিল॥
এবে হৈল দেব সাথে রণ উপস্থিত।
ধনুর্ব্বাণ সৈন্য সব হও সাবহিত॥
রথে চড়ি চল সব করিতে সমর।
হবে গুরুতর যুদ্ধ প্রবল অমর॥
শঙ্খের এমত বাণী শুনি দৈত্যগণ।
নিজ নিজ রথে সবে কৈল আরোহণ॥
মদ্যপানে মত্ত হৈল সকল অসুরে।
রক্তচক্ষু করি সবে তিষ্ঠে রথোপরে॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে কাড়া পড়া ঢোল।
রণভেরী সিংহনাদে হৈল মহারোল॥
ঘোর শঙ্খনাদ আর বীরের গর্জ্জনে।
সিন্ধু টলমল কৈল ক্ষিতি কাঁপে ঘনে॥
নিন্দিয়া মেঘের ধ্বনি শব্দ করে রথে।
দানবের সেনাগণ চলে এই মতে॥
দেখি মহাদেব কহে দেবগণ স্থানে।
নিশ্চিন্তে তোমরা সব রৈলা কি কারণে॥
দেখ সৈন্য সঙ্গে আইসে শঙ্খ দিতিসুতে।
সুসজ্জ সকল যায়া উঠ শীঘ্র রথে॥
শুনিয়া দেবতাগণ চড়িল স্যন্দনে।
সিংহনাদ করি ধনু দুই হাতে টানে॥
ভিড়াভিড়ি হৈল আসি উভয় বাহিনী।
দুই দলে পরস্পর কহে কটুবাণী॥
দেবতা অসুর দুয়ে বাক্যযুদ্ধ করে।
অস্ত্রঘাতে রণ দোঁহে আরম্ভিল পরে॥

অসংখ্য অসুর সেনা মহা বলবান্।
অজস্র আয়ুধ হানে নাহি অবসান ॥
পুঙ্খ অনুপুঙ্খ শর ছাড়ে তূর্ণ করে।
বাণ আচ্ছাদিল রবি, কৈল অন্ধকারে ॥
সমরে অমরগণ ধনু লৈল হাতে।
কুপিয়া আকর্ণ পূরি হানয়ে নির্ঘাতে ॥
দানবের অস্ত্র সব করিয়া সংহার।
দৃঢ় হস্তে পুনঃ বাণ লাগে হানিবার ॥
সবে বিন্ধি দৈত্যগণ করিল জর্জ্জর।
মহেশের অহঙ্কারে যুঝয় অমর ॥
বাণাঘাতে কোপে অতি সব দৈত্যগণ।
ক্ষেপে অতি শীঘ্র অস্ত্র টানি শরাসন ॥
ভিন্দিপাল ভল্লগদা মুষল মুদ্গর।
সিংহনাদ করি ছাড়ে কাঁপে ধরাধর ॥
প্রবল দৈত্যেয়গণ বিষম যুঝার।
নির্জ্জর সবের অস্ত্র করিল সংহার ॥
দৃঢ় করি কার্ম্মুকেতে বাম হস্ত চাপে।
মন্ত্র পড়ি ক্ষেপে ইষু অখণ্ড প্রতাপে ॥
তা দেখি ত্রিদশ সব হৈয়া সাবধান।
মহাকোপে ছাড়ে পুন দিব্য দিব্য বাণ ॥
কেহ কাটে কেহ হানে কেহ বা নিবারে।
শক্তি নিক্ষেপিয়া রণ দুই দলে করে ॥
বাণে বাণে ঠেকাঠেকি উঠয়ে অনল।
শোণিতে লোহিত হৈল বাহিনীসকল ॥
অস্ত্রের নির্ঘাৎ শব্দ বাহিনী গর্জ্জনে।
টলমল সিন্ধু গিরি স্বর্গ মর্ত্ত্য সনে।
প্রলয় কালেতে যেন মহাশব্দ করে।
কি দিব তুলনা যুদ্ধ দেবাসুরে করে ॥
মধুপানে মত্ত আছে দিতি-সুতগণ।
অত্যন্ত কুপিয়া করে বাণ বরিষণ ॥
জর্জ্জর অমরগণ বিষম প্রহারে।
রণ ছাড়ি প্রাণভয়ে পলায়ন করে ॥
পাছু পানে ফিরি চায় যায়া অতি দূর।
না জানি বা কোন পথে আইসে অসুর ॥
অমরে সমর ত্যজি যদি দিল ভঙ্গ।
নাচে দিতিসুত সব হৈয়া বড় রঙ্গ ॥

ভরদ্বাজ গোত্র দ্বিজ রাজসিংহ নাম।
কৃপা করি নারায়ণী পুর মনস্কাম ॥
কৌথুমি শাখার এক দেশ অধ্যয়ন।
তিনটি প্রবর বটে অতি বিলক্ষণ ॥
ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য আদি।
ভূপাত্মজে ভণে ভাবি রাণী নিরবধি ॥

ত্রিপদী

দেখি হেন বিপরীত, কুপিল তারকজিৎ,
আসি তিষ্ঠে সমর সম্মুখে।
ডাকি কহে ষড়ানন, স্থির হও দেবগণ,
ফির ফির উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ॥
কার্ত্তিকের হেন বাণী, দেব সেনাগণে শুনি,
ফিরি আইসে সিংহনাদ করি।
পুন দেব দৈত্যসনে, হৈল গুরুতর রণে,
তর্জ্জে গর্জ্জে পুন ধনু ধরি ॥
চড়িয়া ময়ূরোপরে, ব্যোমপথে শক্তি ধরে,
অতি তূর্ণ গতায়াত করে।
চণ্ড চাপ করে ধরি, সমরে বিনাশে অরি,
ঘোর অন্ধকার হৈল শরে ॥
যেন কুলিশের ধ্বনি, শিঞ্জিনীর শব্দ শুনি,
ঘোর রবে কম্পিত মেদিনী ॥
অস্ত্র যেন উল্কা ছুটে, অসংখ্য দানব কাটে,
কম্পান্বিত দনুজবাহিনী ॥
রথ রথী ঘোড়া হাতী, রণে পড়ে শতাশতি,
মহানদী হইল রুধিরে।
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
ত্রাহি ত্রাহি দৈত্যগণ করে ॥
শোণিত-সরিৎ মাঝে, শক্র হৈয়া মৃত গজে,
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে হয় তল।
কাটা ধ্বজ দিব্য অসি, অসংখ্য ফিরয়ে ভাসি,
মৎস্য হৈয়া সরিতে সকল ॥
মৃত তুরঙ্গম দলে, মকর হইয়া জলে,
খরস্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়।
[illegible] যেন [illegible] শতদলে,
[illegible]

মৃণাল হইল হাত, বায়ুরে জন্মিল পাত,
কাক্যসব হৈল মত্ত অলি।
সুধাসম করি জ্ঞান, রুচির করয়ে পান,
ঘন রব করে চঞ্চু তুলি॥
ষণ্ড গুহ মহাবীর, সুপর্ব্বাণ কৈল স্থির,
দৈত্যগণ সংহারে বিস্তর।
একই সুচাপে যুড়ে, সহস্র হইয়া পড়ে,
না শুনেছি এমত সমর॥
যেন মত্ত দন্তাবলে, প্রফুল্লিত শতদলে,
অতি বেগে পশে যাইয়া রোষে।
তেমত মর্দ্দন করি, মহারণে ধনু ধরি,
শক্তি ধরে অসুর বিনাশে॥
যেন পড়ে ধারাধর, তেমত বরিষে শর,
কার্ত্তিকেয় মহা যোদ্ধাপতি।
বিনাশে অসুর চয়, রথধ্বজ হস্তী হয়,
যোদ্ধাগণ সহিতে সারথি॥
হৈল অসম্ভব রণ, মৈল বহু সেনাগণ,
এক অক্ষৌহিণী পরিমাণ।
দেখি দৈত্য কাঁপে ডরে, তূর্ণ পলায়ন করে,
গেল দূরে ত্যজি রণস্থান॥
উল্লাসিত দেবগণ, উর্দ্ধে তুলি শরাসন,
দৈত্য প্রতি টিটকারী করে।
তাকে দেখি শঙ্খাসুরে, কার্ম্মুক করিয়া করে,
রথ আনে সম্মুখ সমরে॥
তাকে দেখি শক্তিধর, লৈয়া করে ধনুঃশর,
আসি তিষ্ঠে দৈত্য বিদ্যমানে।
দুই জনে পরস্পরে, কুপি সিংহনাদ করে,
বাক্য যুদ্ধ হৈল দুই জনে॥
দৈত্য বলে সুপর্ব্বাণ কি কারণে ত্যজ প্রাণ,
রণ ছাড়ি ফিরি যাও ঘরে।
নিতান্ত বালক তুমি, তাতে রণে বৈরি আমি
ত্যজ রণ দৃঢ় বলি তোরে॥
দনুজের হেন বাণী কুপিল কার্ত্তিক শুনি,
হাস্য করি কহিলা বচন।
যবে হবে যুদ্ধারম্ভ, [illegible]
[illegible]

হেন মতে দুই বীরে, মহা বাক্যযুদ্ধ করে,
পুনঃ পুন কার্ম্মুক টঙ্কারে।
ভারতীর শ্রীচরণে নূতন সঙ্গীত ভণে,
রাজসিংহ নাম ধরাধরে॥

পয়ার।

হেন মতে বাক্যযুদ্ধ দুই জনে করি।
অস্ত্রাঘাত যুদ্ধ দোঁহে করে ধনু ধরি॥
প্রথমত পঞ্চবাণ লৈয়া শক্তি ধরে।
হানিল দৈত্যের বক্ষে অত্যন্ত নির্ভরে।
হৃদয়ে পশিয়া বাণ পৃষ্ঠে হৈল পার।
ঘূর্ণিত হইল দৈত্য দেখে অন্ধকার॥
ক্ষণেকে সুস্থির হৈয়া দানবের নাথে।
আরক্ত লোচন কোপে ধনু লৈল হাতে॥
মাজিয়া শিঞ্জিনী দশ শাণ দিল বাণে।
কার্ত্তিকের বক্ষ মধ্যে অতি কোপে হানে॥
পুন সপ্তবাণ হানে কিরীটি উপরে।
বিংশতি আয়ুধে কুপি কার্ম্মুক সংহারে॥
অন্য এক ধনু লৈয়া বীর ষড়ানন।
অসুর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
অতি কোপে পঞ্চদশ ভল্লবাণ লয়া।
হানিল দৈত্যের মাথে আকর্ণ পূরিয়া॥
সারথিকে দিব্য নারাচে হানিল।
রথধ্বজ ধনু অশ্ব জর্জ্জরিত কৈল॥
ইহা দেখি অতিশয় কোপে দৈত্যবর।
যুড়িল অনল অস্ত্র কার্ম্মুক উপর॥
মন্ত্র পড়ি সেই অস্ত্র শঙ্খে ছাড়ে রণে।
তা দেখি তারকজিৎ ব্যস্ত হৈল মনে॥
নিক্ষেপে বরুণ অস্ত্র আকর্ণ পূরিয়া।
সংহারে দৈত্যের অগ্নি সলিল সিচিয়া॥
বাণ ব্যর্থ দেখিয়া লজ্জিত দৈত্যপতি।
ক্ষেপে স্তম্বেরম ইষু অতি দ্রুতগতি॥
কেশরী আয়ুধ দেখি ছাড়িল কার্ত্তিকে।
নাশিল দ্বিরদ দ্রুত সমরে ক্ষণেকে॥
[illegible] দৈত্য ভুজঙ্গম অস্ত্র নিক্ষেপিল।
গরুড় আয়ুধে গুহ তাহা নিবারিল॥

নানা মত মায়া যুদ্ধ করয়ে অসুরে।
সব শর শক্তিধরে তখনি সংহারে॥
ইহা দেখি দিতি-সুত অতি কোপ করি।
কম্পবাণ গণ্ড ওষ্ঠ গর্জ্জে ধনু ধরি॥
লইল প্রচণ্ড গদা অতিশয় কোপে।
তার ভারে রথখান অতিশয় কাঁপে॥
ঘণ্টায় ঘাগরে গদা মহা দীপ্তিমান্।
কনকে রচিত তেজ মার্ত্তণ্ড সমান॥
ছাড়িলেক সেই গদা নিজ বাহুবলে।
পবন জিনিয়া গদা মহাবেগে চলে॥
দেখি কার্ত্তিকেয় অতি শঙ্কা পায় মনে।
পঞ্চ ষষ্টি বাণ অতি তূর্ণ করি হানে॥
সে সকল বাণ সংহারিয়া অনায়াসে।
কার্ত্তিকের ভিতে অতি দ্রুত করি আইসে॥
নানাজাতি অস্ত্র গুহ বরিষণ করে।
নাশি বাণ বক্ষে আসি পড়িল নির্ভরে॥
তমোময় দেখি দেব হইল পতন।
শোণিত বদনে স্রবে মুদ্রিত লোচন॥
ক্ষণেকেই সম্বিত পাইয়া শক্তিধর।
ক্রোধে লম্ফে আরোহণ কৈল পীকোপর॥
মহাচণ্ড এক শূল লইয়া তখনে।
অতি কোপে দনুজকে হানে মহারনে॥
প্রতিঘাত নানা বাণ ছাড়িল অসুরে।
তাকে ভেদি বক্ষেতে পশিল সেই শরে॥
মোহ পায়া স্যন্দনে পড়িল দিতিসুত।
কম্পিত অসুর সেনা দেখিয়া অদ্ভুত॥
চৈতন্য পাইয়া কোপে উঠি দৈত্যনাথে।
সিংহনাদ করি পুন ধনু লৈল হাতে॥
অবিরত ক্ষেপে বাণ নাই অবকাশ।
অনিল অচল ঢাকে সূর্য্যের প্রকাশ॥
কার্ত্তিকের কার্ম্মুক কাটিল পুনি শরে।
হৃদয়ে পঞ্চাশ বাণ হানিল নির্ভরে॥
কুমারেও প্রতিঘাত করেন তাহার।
যেন শক্তিধর তেন অসুর দুর্ব্বার॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে দোঁহে ধনুর্ব্বেদ মতে।
তুলনা দিবার স্থান নাহি ত্রিজগতে॥
জিনিতে না পারে কেহ দোঁহে সমসর।
না হৈছে না হবে নরে এমত সমর॥
পুন কুপি আকর্ণ পূরিয়া বড়াননে।
শাণ দিয়া অতি তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ হানে॥
প্রমত্ত পন্নগ যেন পশে যায়া হ্রদে।
তেন বাণ অসুরের বক্ষঃ দেশ ভেদে॥
এই ছিদ্রে শক্তিধর পুন চারি শরে।
অতি তূর্ণ চতুষ্টয় সৈন্ধব সংহারে॥
ত্রয়োদশ বাণে রথ সারথিকে সাথে।
ধ্বজ ধনু কাটি দ্রুত পাড়িল ভূমিতে॥
ঘোর সিংহনাদ করি হানে শক্তিধর।
খণ্ড খণ্ড কৈল অসুরের কলেবর॥
হেন কালে দিব্য রথ যোগায় সারথি।
তূর্ণ লম্ফে চড়ে তাতে শঙ্খ দৈত্যপতি॥
বিশিষ্ট কার্ম্মুক করে করিয়া তখনে।
দশ দিক্ অন্ধকার করিলেক বাণে॥
যথাশক্তি কার্ত্তিকেয় করেন সমরে।
নিক্ষেপয় অনিবার দোঁহে পরস্পর॥
সপ্তষষ্টী শরে শঙ্খে শরাসন কাটি।
পঞ্চদশ বাণে পুন বিনাশে কিরীটি॥
কবচ কাটিয়া বাণ হাণে সুধা অঙ্গে।
উলটি পালটি দৈত্য হানে নানা রঙ্গে॥
ময়ুরের পক্ষে হানে সপ্তদশ শরে।
দুই পক্ষে চারি বাণ হানিল নির্ভরে॥
মূর্চ্ছিত ময়ূর বহু কেকানাদ করি।
দীর্ঘ গ্রীবা হয়া পড়ে মেদিনী উপরি॥
ভূমি পরে পড়ি গুহ গদা লয়া করে।
শঙ্খের উপরে গদা পাক দিয়া ছাড়ে॥
সপ্ত স্থানে গদা সংহারিল শঙ্খে বাণে।
তাকে দেখি শক্তিধর কোপযুক্ত মনে॥
পুন শক্তিধর এক শক্তি লয়া করে।
শঙ্খের হৃদয়ে পুন হানিল নির্ভরে॥
মোহ পায়া দৈত্যরাজ ক্ষণমাত্র থাকি।
স্থির হৈয়া কহে কোপে কার্ত্তিককে ডাকি॥

মধ্যাহ্নের সূর্য্য জিনি তেজ অতিশয়।
দেখিয়া অন্তরে গুহ ভাবিলা সংশয়॥
ছাড়িল অমোঘ অস্ত্র শঙ্খ দৈত্যনাথে।
কার্ত্তিকের বক্ষে আসি পড়িল নির্ঘাতে॥
নির্গত হইল পৃষ্ঠে বক্ষঃ বিদারিয়া।
ভূমিতে পড়িল গুহ, মূর্চ্ছিত হইয়া॥
শুন মাতা সরস্বতী নিবেদন মোর।
ভূপানুজে ভণে গীত শ্রীচরণে তোর॥

ত্রিপদী।

মোহ পাইলে ষড়ানন, শঙ্খচূড় হর্ষ মন,
হানে বাণে অমর বাহিনী।
যেমত কদলী ঝড়ে, দেব সেনা তেন পড়ে,
ত্রাহি ত্রাহি হৈল মহাধ্বনি॥
পায়্যা রণে পরাভব, পলায় দেবতা সব,
পাছে পাছে দৈত্যেনেয় তাড়ি।
ফেলিল ধনুকবাণ, ভয়ে তনু কম্পমান্,
অতি দূরে গেল রণ ছাড়ি॥
বহু দূরে যায়্যা ফিরি, যথা পায় বড় গিরি,
তাহে চড়ি করে নিরীক্ষণ।
ধনুর্ব্বাণ লৈয়া হাতে, না জানিবা কোন পথে,
আইসে কিবা দৈত্য সেনাগণ॥
দেবতার দেখি ভঙ্গ, দানব সবের রঙ্গ,
ঘন ঘন টিটিকারী বলে।
ঘোর সিংহনাদ করে, ক্ষিতি কাঁপে পদভরে,
ইষু চাপ উচ্চ করি তোলে॥
ভদ্রকালী ইহা দেখি, অন্তরে অত্যন্ত দুঃখী,
অতি ক্রোধে কাঁপে কলেবর।
ওষ্ঠধর কাঁপে ঘন, সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ,
আসিলেন করিতে সমর॥
দশন বিকট মুখে, অনল উঠয়ে চক্ষে,
অতি দীর্ঘ বিস্তার রসন।
ক্ষিতি কাঁপে পদভরে, মেঘ জিনি নাদ করে
দৈত্য ধরি করয়ে অশন॥
সঙ্গে অনুচরীগণ, হস্তে লৈয়া শরাসন,
নানা অস্ত্র করয়ে প্রহার।
ছাড়ি বহু প্রহরণ, বিনাশে দানবগণ,
ভদ্রকালী ডাকে মার মার॥
কম্পমান দিতিসুত, দেখি কর্ম্ম অদ্ভুত,
ভক্ষণ করয় ভদ্রকালী।
রথ রথী তুরঙ্গম, বড় বড় গুম্বেরম,
হস্তে ধরি মুখে দেয় তুলি॥
হৈল হেন বিঘটন, অবশিষ্ট দৈত্যগণ,
অস্ত্র বহু করে বরিষণ।
বদন প্রকাশ করি, অনায়াসে মহেশ্বরী,
সব ইষু করেন ভক্ষণ॥
ভ্রম পায়্যা কীটগণে, যেন পড়ে হুতাশনে,
পুনর্ব্বার নাহিক উদ্ধার।
দৈত্য সবে তেন মতে, একেবারে শতে শতে,
ভদ্রকালী করেন সংহার॥
জানিয়া শঙ্কট রণ, ভয়ে ভাঙ্গে সেনাগণ,
প্রাণ লয়্যা পলাইয়া যায়।
পাছে পাছে ভগবতী, তাড়ি নেয় বেগে অতি,
যাকে পায় তাকে ধরি খায়॥
দেখে এক রথোপরে, ধনুর্ব্বাণ লয়ে করে,
একেশ্বর আছে দৈত্যপতি।
অতি কোপে মহেশ্বরী, ঘোর সিংহনাদ করি,
শঙ্খ কাছে আইসে শীঘ্রগতি॥
দেখি তাঁকে দিতিসুতে, শরাসন লয়ে হাতে,
দিব্য অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আকর্ণপূরিয়া টানি, করি ঘোর মহাধ্বনি,
শতে শতে নিক্ষেপয় বাণ॥
ভদ্রকালী নানা শরে, তাকে নিবারণ করে,
আর অস্ত্রে হানয়ে তাহারে।
হেন মতে দুইজনে, অত্যন্ত কুপিয়া মনে,
শক্তি নিক্ষেপিয়া রণ করে॥
শুন বাণী সরস্বতী, কৃপা করি মোর প্রতি,
কর মাতা সর্ব্বত্র কল্যাণ।
যথাশক্তি পার্য্যমানে, নূতন সঙ্গীত ভণে,
দ্বিজ রাজসিংহ অভিধান॥

জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

কর্ণালে সেলিম।

১৭ই জিল্‌হজ্জি মঙ্গলবারে, আমি কর্ণালে এদি খোজাকে দুই হাজারীর পদে উন্নীত করিয়া আমির-পদবী প্রদান করিয়াছিলাম এবং তহনসের সেখ্ নেজামকে ছয় সহস্র মুদ্রা উপহার দিয়াছিলাম। এই স্থানে আমি সংবাদ পাইলাম যে, একজন সামান্য দোকানদার দৈহিক পদার্থের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখাইবে বলিয়া, জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়াছে অর্থাৎ সে ঈশ্বরকে মানবদৃষ্টির সম্মুখীন করিতে পারে। ইহাই সকলকে বলিতেছে। এইরূপে, সেই ব্যক্তি তাহার আশ্চর্য্যজনক অসাধু বাক্যের উপর সাধারণের প্রতীতি জন্মাইয়াছিল। কিন্তু তাহার অসম্ভব বাক্যে আমার বিশ্বাস না হওয়াতে দণ্ডস্বরূপে আমি তাহাকে হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দিলাম।

সাহাবাদে সেলিমের জলাভাব।

১৯শে বৃহস্পতিবার, আমরা সাহাবাদে পৌঁছিলাম। সেখানে আমাদিগকে জলের অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অনন্যোপায় হইয়া, ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে হস্তোত্তোলন করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। অন্তর্যামী ভগবান্ আমাদের এই অননুভবনীয় অভাব বুঝিতে পারিয়া, সেই দিনই প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন; ইহাতে সমবেত সৈন্যমণ্ডলী প্রচুরপরিমাণে জল প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিল। যাবতীয় বস্তুর মধ্যে জলের মূল্য ও আবশ্যকতা যে কত অধিক, অভাবের সময়ে তাহা সৈন্যগণের মধ্যেই প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যায়। যাহারা নির্ম্মল সুশীতল নির্ঝর বারি পান করিয়াও তৃপ্তি অনুভব করে নাই, তাহারা জলাভাবের সময়, কর্দ্দমাক্ত আবিলপূর্ণ জলও পরিতৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া পান করে এবং তাহাতেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে, যেন তাহাদের মৃতদেহে নবজীবনের সঞ্চার হইল। এমন কি, অনেক গর্ব্বিত রাজার জীবনে এরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছে যে, বহুমূল্য হীরক প্রদান করিয়াও এক পাত্র পানীয় জল প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

পেরিথল গিরিসঙ্কটে সেলিম।

যখন পিতা আকবরের সহিত কাশ্মীর উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, তখন আমিও এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। কাশ্মীর উপত্যকার মনোরম নয়নানন্দদায়ক হরিদ্বর্ণ দৃশ্যে আত্মহারা হইয়া আমরা পেরিথলের গিরিপথে প্রবেশ করিলাম, হিন্দুস্থানের কোন উপত্যকার এরূপ সুন্দর দৃশ্য কখনও দেখি নাই। কিছু দূরে যাইবার পর আমার পরিচারকগণ দৃষ্টির অন্তরাল হইয়া পড়িল। সেই সময় আমি এরূপ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম যে, এক পদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না। আমি যে কোনরূপ খাদ্য, ফল বা পানীয়ের জন্য অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। অশ্বরক্ষক, পানপাত্রধারী বা কোন ক্রীতদাসকেই সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না।

ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হইয়া, আমি [illegible] ক্ষমতা [illegible] অগ্রসর হইবার

পর তথায় আসক খাঁর কতকগুলি মেষ দেখিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটী মেষকে ধৃত করিলাম এবং ইহাকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞা দিলাম। সেই মেষমাংস হইতে কাবাব প্রস্তুত করা হইল। ইহা দ্বারা আমি প্রাণান্তকারী ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলাম। এক্ষণে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে, তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমার জীবনে সেইরূপ উপাদেয় খাদ্য আর কখনও ভোজন করি নাই। এইরূপে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, নিকটে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য উপযুক্ত সামগ্রী না থাকিলে কিরূপ কষ্ট হয়। ইহার পর হইতে আমি পরিচারকগণকে আদেশ দিয়াছিলাম যে, মৃগয়া বা অন্য কোন স্থানে যাইবার সময় খাদ্যাদি লইতে যেন তাহারা বিস্মৃত না হয়। কাশ্মীরে অবস্থান কালে, আমি বা খান্ খানান্, রুটী ইত্যাদি না লইয়া কোন স্থানে বহির্গত হইতাম না। আরও একটী কথা এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি। কাশ্মীরবাসিগণের এইরূপ বিশ্বাস যে, পেরিথল গিরিসঙ্কটের মধ্যে মনুষ্য বা কোন জন্তুর রক্তপাত হইয়া মৃত্যু ঘটিলে, প্রকৃতির ভীষণ কম্পন আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু আমি কখনও এরূপ চিহ্ন দেখি নাই, যদ্দ্বারা এই ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি।

সেখ আমেদ লাহোরি।

সাহাবাদের শিবিরে অবস্থান কালে, আমি আমেদ লাহোরিকে মির আদিলের (ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারকর্ত্তার) পদ প্রদান করিলাম। আমার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে তিনি ঐ কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার [illegible] বিশ্বস্ত হই নাই। তিনি আমারই তত্ত্বাবধানে থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ বাটজন ছাত্র আমার নিকটে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বার্ত্তাপত্রপ্রকাশক এবং অবশিষ্টগুলি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে কতকগুলি নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইত। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রদিগের নিয়ম পালন

তাহারা জীবনে রিপুরূপ শত্রুদিগের দ্বারা কখনও প্রতারিত হয় নাই। তাহারা সর্ব্বদা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিত। যুদ্ধ বা মৃগয়া ব্যতীত কখনও কোন জন্তুর প্রাণনাশ করিত না। ভগবানের শক্তি ও গৌরবের আধারস্বরূপ জ্যোতিকে তাহারা সর্ব্বদা মান্য করিত। প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুকেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের চিহ্ন, এইরূপ চিন্তা করিত। মানসিক কুপ্রবৃত্তিসকলকে প্রশ্রয় দান না করিয়া সর্ব্বদা দমনে রাখিত। মুহূর্ত্তের জন্য ভগবান্‌কে বিস্মৃত হইত না। প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় ভগবান্‌কে স্মরণ না করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিত না।

আকবর চরিত্রে মহত্ব।

স্বর্গীয় পিতা আকবর মানসিক প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিবার জন্য এই সমস্ত অনুশাসনাবলী অনুসারে কার্য্য করিতেন। অন্দরে বা রাজদরবারে, তিনি প্রত্যেক কার্য্যেই এই নিয়মগুলিকে দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার সহিত পালন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি আমার উপদেষ্টা এবং প্রত্যেক বিষয়ের উদাহরণস্থল। বাহ্য [illegible]আকলাপের দ্বারা তাঁহার প্রতি কপট [illegible]ক্তি প্রকাশ করা অপেক্ষা, তাঁহার উপদেশে

বিশ্বাস পোষণ করাই আমি উচিত বিবেচনা করি। এই সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অনিত্য সংসারের বৃথা অহঙ্কারে মানসিক প্রবৃত্তিসকল অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ রাজা অদ্যাবধি পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। কারণ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি অধিকাংশ সময়ই ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, মালা জপ করিয়া ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করিতেন, এবং সেই অনাদি পুরুষের সিংহাসনসম্মুখে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইতেন। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, এই সংসারে লোকের সন্তোষসাধন করিয়া জীবন কাটাইবে। কখনও আনন্দে অধীর হইবে না, এবং সকল সময়ে সকল বিষয়ে ঈশ্বর ভিন্ন কাহার উপর নির্ভর করিতে নাই।

আন্‌বন্দে সেলিম।

২১শে জিল্‌হুদ্‌জি শনিবারে, আমি আন্‌বন্দ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম। এই স্থানে এল্‌বেগ্‌ ওজবেগকে বাহাদুর খাঁ উপাধি দিয়া, সাতাস জন আমীর এবং মুনসেবদার ও পাঁচ সহস্র সৈন্যের সহিত তাঁহাকে সেখ্‌ ফরিদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলাম সেখ ফরিদ সৈন্যগণসমভিব্যাহারে আমাদের অগ্রে যাইতেছিলেন। বাহাদুর খাঁ, জেমেলবেগ, শেরিফ আমোল, এবং অন্যান্য আমীরগণের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য তাঁহাকে দশ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিলাম। তাঁহাদিগকে একত্রে বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে এবং ফলাফল আমাকে জানাইবার জন্য আদেশ করিলাম।

খসরুর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ।

২৪শে জিলূহদ্‌জি (১৬ই এপ্রিল আমার সৈন্যগণ খসরুর অনুসরণ করিতেছে জানিতে পারিয়া তাহার কয়েকজন সেনাপতি আমাদিগের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অনুমতি পাইয়াছিল। সেখ্‌ ফরিদ রাজপতাকা লইয়া সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সৈন্যসমাবেশ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বদকশানাধিপতি বাহাদুর খাঁ, যিনি সমরকৌশলে খ্যাতি লাভ করিয়া বীরাগ্রগণ্য হইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় সৈন্যগণ লইয়া তথায় অগ্রসর হইলেন এবং তিন দলে সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। অতঃপর একদলকে লইয়া শত্রুদিগের সম্মুখীন হইলেন এবং অপর দুই দল দুই পার্শ্ব দিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে পর যুদ্ধারম্ভ হইল। ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেকেই হত হইল। কিন্তু ফরিদ ও মহম্মদ খাঁর নিকট জয়ের আশা নাই বুঝিতে পারিয়া, খসরুর চারিজন প্রধান সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং অপর দুইজন সহস্র বন্দীর সহিত আমার নিকট আনীত হইল। এই সমস্ত বন্দীকে আমি নানারূপ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। কাহারও জীবিতাবস্থায় গাত্রের ছাল উন্মোচন করিয়া লওয়া হইল, কাহারও গলায় বৃহৎ কাষ্ঠ বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল, কাহাকেও বা নদীগর্ভে ও হস্তিপদতলে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করা হইল। যাহারা আহত হইয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, তাহারা ভীত হইয়া নিরাশহৃদয়ে খসরুর নিকট উপস্থিত হইল।

লাহোরের অবরোধ।

এই দিনেই সংবাদ পাইলাম, শত্রুসৈন্য লাহোর দুর্গ অবরোধ করিয়াছে। তত্রত্য দুর্গস্থ সৈন্যসকল এবং অধিবাসিগণ পরস্পরের সাহায্যে লাহোর রক্ষা করিবার

জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনাচক্রে পড়িয়া, হোসেনবেগ বদকশানি খসরুকে বলিয়াছিল যে, লাহোর অধিবাসিগণ রাজকোষের দ্বার খুলিয়া যথেচ্ছভাবে সঞ্চিত অর্থরাশি নষ্ট করিতেছে। যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র-প্রক্ষেপক যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইয়াছে, তাহাদিগকে বেতনাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতেছে। লাহোর লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে হুসেনবেগ্ খসরুকে এইরূপে উত্তেজিত করিয়াছিল। লাহোরে বহুসংখ্যক ধনকুবের ছিলেন, তাহাদের প্রভূত অর্থ ও অসীম ঐশ্বর্য্য দ্বারা হুসেন বেগের হৃদয় আকৃষ্ট হওয়ায়, পাপিষ্ঠ ধনলিপ্সা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া এই ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল। তাহার এইরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে সহজেই পরিচালিত হইয়া, এবং লাহোর লুণ্ঠনে সে বিপুল ধনরাশির অধিপতি হইবে এই দুরাশায় আশান্বিত হইয়া, খসরু ও সৈন্যগণকে নগর মধ্যে আনয়ন করিয়া তোরণদ্বারসকল অর্গলবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিল। সাত দিবস ধরিয়া তাহাদের লুণ্ঠন কার্য্য চলিয়াছিল। নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম হৃদয়ে লুণ্ঠনকারিগণ যে সকল অত্যাচার সাধিত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাযোগ্য নহে। প্রত্যেক ধনবানের গৃহে প্রবেশ করিয়া অসহায়া অন্তঃপুরবাসিনীগণের উপর অত্যাচার করিয়া এবং পিতামাতার সম্মুখে বালকবালিকাদিগের অকথ্য নির্য্যাতন করিয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থসকল বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যবসায়ীদের দোকানপাট লুট করিয়া তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছিল। এই সাত দিবসের মধ্যে লাহোরের অতি ভীষণ দৃশ্য হইয়াছিল। সহস্র সহস্র নগরবাসী [illegible] পড়িয়া হাহাকার করিতেছিল, কোথাও রাশীকৃত শবরাশি চলাচলের পথ বন্ধ [illegible], অনেক গৃহস্থের মধ্যেই ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। কেহ বা বিপদে পড়িয়া দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের কৃপা ভিক্ষা করিতেছিল। সম্ভ্রান্তশালী ব্যক্তিগণের পুত্রকন্যাদিগকে বন্দী করিয়া তাহারা কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং তাহাদের অভিভাবকগণের নিকট উপযুক্ত অর্থ পাইলে পর মুক্তি দান করিতেছিল।

রক্তপিপাসু তস্করগণ দুর্গের একটী তোরণদ্বারে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। লাহোর দুর্গে দ্বাদশটী প্রবেশদ্বার ও চারটী নির্গম-দ্বার ছিল। সেই সময় দিলওয়ার খাঁ, হোসিন বেগ্, সহর কোতোয়াল নৌরুদ্দীনকুলী এবং অন্যান্য লোক ভিতর দিক হইতে তোরণটী রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। নগরবাসিগণ ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার বিষয় বুঝিতে পারিয়া সেই প্রজ্বলিত তোরণের উপর বারিবর্ষণ করিয়া, অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিল। আমার সৈন্যগণকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া শত্রুরা নিরাশ হইয়া পড়িল এবং নৌরুদ্দীন্ কুলী দুর্গ প্রাচীরের উপর উঠিয়া শত্রুদিগের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই শত্রুগণ ভীষণ গুলিবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

খসরুর সেনাপতিগণের নৈশ আক্রমণের কল্পনা।

খসরুর সেনাপতিগণ লাহোর আক্রমণে হতাশ হইয়া এবং বাদসাহের সেনাদলের আগমনের সংবাদ পাইয়া, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ফল বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বাদসাহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া হয়ত তাহারাই অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এই সমস্ত ব্যাপারে

অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। সহস্র অশ্বারোহী লইয়া বাদসাহের সৈন্যকে নৈশ আক্রমণের দ্বারা বিধ্বস্ত করিবে তাহারা এইরূপ কল্পনা করিয়াছিল।

দোবলে সেলিম।

এইরূপ কল্পনা করিয়া ২৪শে জিল্‌-হজ্জি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ২১শে বৃহস্পতিবার (১৮ই এপ্রেল) রজস্‌ আলির পান্থনিবাসে অবস্থান কালে সংবাদ পাইলাম, খসরু বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া লাহোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহা শুনিয়া আমি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। কারণ সে পলায়ন করিলে পর তাহাকে ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। যদিও সে সময় অতিশয় বৃষ্টি হইতেছিল, তথাপি সে কষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আমি তথা হইতে যাত্রা করিলাম। সেই দিনই গান্‌ঘোয়াল নদী পার হইয়া দোবলে ছাউনি করিলাম।

খসরুর বিরুদ্ধে সেলিমের অভিযান।

২৬শে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে সেখ ফরিদ, খসরুর গতি প্রতিরোধ করিয়া শত্রুসৈন্য সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে আমি সুলতানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলাম। খোসাওলমুক্ত কতকগুলি ভর্জ্জিত গোধূম লইয়া আমার নিকট দিতে আসিতেছিল, এমন সময় খসরুর সহিত সেখ ফরিদের যুদ্ধের কথা শুনা গেল। বলিতে কি, কল্যাণের জন্য একগ্রাসমাত্র গ্রহণ করিয়াই আমি অশ্ব আনিতে আদেশ দিলাম, এবং অশ্ব উপস্থিত হইলে রক্ষাকর্ত্তা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। সৈন্য সমাবেশ করিতে কিংবা যুদ্ধোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলাম না। কেবল মাত্র তরবারি ও বর্শা লইয়াই দ্রুতবেগে অশ্বকে চালনা করিয়া যুদ্ধস্থলে অগ্রসর হইলাম। আমার সহিত দশ সহস্রাধিক অশ্বারোহী ছিল। তাহারা কেহই জানিত না যে, সেই দিনই তাহাদিগকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। ঈশ্বরের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলেও এরূপ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা সামরিক নীতি-বিরুদ্ধ। এইজন্য সৈন্যগণ অতিশয় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদের অন্তর হইতে নিরাশা দূর করিয়া দিলাম এবং অনতিবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলাম। যে সময়ে আমি গান্‌ঘোয়ালে পৌঁছিয়াছিলাম, তখন আমাদের বিশ সহস্র অশ্বারোহী, ও পঞ্চাশ সহস্র উষ্ট্র-পৃষ্ঠারোহী গোলন্দাজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। আমি সমস্তই সেখ ফরিদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলাম।

খসরুর নিকট দূত প্রেরণ।

এই বিপদসঙ্কুল সঙ্কটের সময়েও আমি মির জুমল্‌উদ্দীনকে খসরুর নিকট প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম এবং তাহাকে জানাইলাম যে, সময় থাকিতে যদি সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভগবানের সৃষ্ট সহস্র সহস্র প্রাণীর অনর্থক রক্তপাতজনিত পাপে তাহাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। এই প্রস্তাবে যদিও খসরু আমার নিকটে আসিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি [illegible] পরামর্শে [illegible] প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। [illegible] আমাকে এই উত্তর

প্রদান করিয়াছিল যে, যখন এত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন যুদ্ধ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। ভগবান্ যাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তিনিই ঈশ্বরপ্রদত্ত রাজমুকুট পরিধান করিয়া হিন্দুস্থানের উপর আধিপত্য লাভ করিবেন।"

যুদ্ধস্থলে খসরু ও সেখ্ ফরিদ।

মীর জুমল উদ্দীনের নিকট তাহার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ গর্ব্বিত উত্তর পাইয়া, আমি সেখ্ ফরিদকে আদেশ প্রদান করিলাম যে, আর চিন্তার অবকাশ নাই, কালবিলম্ব না করিয়া বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ কর। তৎক্ষণাৎ আমার অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। বাহাদুর খাঁ উজ্‌বেগ ত্রিশ সহস্র বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র উষ্ট্র-পৃষ্ঠারোহী গোলন্দাজ লইয়া এক পার্শ্ব হইতে এবং সেখ্ ফরিদ অপর পার্শ্ব হইতে মনোনীত এক দল যোদ্ধা লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে দুই সহস্র অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ খসরুর পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল। ইহারা সকলেই বর্ম্মাবৃত। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সমভাবেই যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং রাজলক্ষ্মীর কৃপায়, যুদ্ধে আমারই জয়লাভ হইয়াছিল। খসরুর ত্রিশ সহস্র সৈন্য ভূমিশায়ী হইলে পর, অবশিষ্ট সৈন্যগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল।

খসরুর আত্মসমর্পণ।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্যগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সুযোগে খসরু অলক্ষিতভাবে পলায়ন করিবার জন্য অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটী সিংহাসনের ভিতর বসিয়াছিল। কিন্তু বাহাদুর খাঁ সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

প্লেটোর কথা

ভারত-গৌরবের প্রাচীনতা আরও প্রাচীন হইলেও, পুরাতন ভারতের ন্যায় পুরাতন গ্রীসেরও একটা মহাগৌরবের দিন ছিল। তখন শৌর্য্যে বীর্য্যে এবং জ্ঞানালোচনায় গ্রীকেরা প্রাচীন হিন্দুগণের সমকক্ষ ছিলেন। তখন গ্রীকগণের বীরপদভরে, মেদিনীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন গ্রীক জ্ঞানিগণের জ্ঞানালোকে সমস্ত নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন গ্রীকবাগ্মিগণের তেজঃপূর্ণা ভারতীতে [illegible] উঠিয়াছি[illegible]

ভারতের ন্যায় গ্রীসের আর সে দিন নাই। কিন্তু সে গৌরবের [illegible] স্মৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে। যে সকল মহাপুরুষ একদিন, যজ্ঞাগ্নির ন্যায় জ্ঞানাগ্নি এই ক্ষুদ্র গ্রীসদেশে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা মহাকালের অন্ধকার মধ্যে লীন হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজ্বালিত জ্ঞানাগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও তাহা সমস্ত পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

যাঁহারা অমানুষিক অধ্যবসায়-বলে এই অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকে সমস্ত ইউরোপ-খণ্ড আলোকিত করিয়া গিয়াছিলেন, আজ অধম আমরা, তাঁহাদিগের মধ্যে এক মহাপুরুষের পুণ্যকথা লিখিয়া, আমাদের লেখনীকে পবিত্র করিব। এবং মহাত্মাদিগের জীবনকাহিনী

আলোচনা করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তাহা সঞ্চয় করিয়া ধন্য হইব।

গ্রীসদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে এই ক্ষুদ্র দেশটী ক্ষুদ্রতর বহুরাজ্যে বিভক্ত ছিল। পুরাতন গ্রীসদেশ, ভারতের বীরভূমি পুরাতন রাজপুতানার ন্যায় বিরোধী এবং নির্ব্বিরোধ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টিমাত্র। তখন এই ক্ষুদ্র রাজ্যমধ্যে, মেসেনিয়া, লেকোনিয়া, থিসেলিয়া, এটিকা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্রতর রাজ্য বর্ত্তমান ছিল।

যে এটিকা প্রদেশের কথা উপরে উক্ত হইল, সুবিখ্যাত এথেন্স নগর সেই প্রদেশের রাজধানী। এথেন্স নগরের কিঞ্চিৎ দূরে ইজিনা নামক উপসাগর মধ্যে ইজিনা নামক মনোহর, জলধি পরিখা-পরিবেষ্টিত এক দ্বীপনগর ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও এই নগর বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তখন এই নগরের যে গৌরব ছিল, এখন তাহা আর নাই।

এই ইজিনা নগরে, ৪২৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে, দার্শনিকপ্রবর জগদ্বিখ্যাত প্লেটো জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে, পুরাতন গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি-কুশল পেরিক্লিস্ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। পেরিক্লিসের শোক নিবারণ জন্য, জননী-গ্রীসের কোলে বিধাতা যেন প্লেটোকে আনিয়া দিয়াছিলেন।

একজন সুবিখ্যাত লোক জন্মগ্রহণ করিলে উত্তরকালে তাহার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত হইয়া পড়ে। এই সকল কাহিনীতে প্রায় সর্ব্বত্র অদ্ভুত রসের প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্লেটোর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার মাতা পিতা এই উভয় কুলই দেববংশসম্ভূত। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, গ্রীক-দেবতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এপলোই তাঁহার প্রকৃত পিতা। কিন্তু এ সকল কথা, গুণমুগ্ধ ভক্তগণের মোহোক্তিমাত্র। এ সকল কথায় কাহারও আস্থা নাই। প্লেটোর অমানুষিক গুণাবলির কথা শ্রবণ করিলে, আমাদের মুগ্ধমনে, তাঁহাকে দেবকুমার বলিবার অভিলাষ জন্মে বটে, তথাপি দেবগুণে বিভূষিত থাকিলেও তিনি মানুষের সন্তান!—মানুষের অলৌকিক, অমানুষিক সন্তান।

প্লেটোর পিতার নাম এরিস্টন্। এটিকা রাজ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব একাদশ শতাব্দীতে এক বীর-রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম কড্রস্। কথিত আছে, এরিস্টন্ রাজা কড্রসের বংশধর। প্লেটোর গর্ভধারিণীর নাম, পেরিক্টিয়নী।

জন্মগ্রহণ কালে প্লেটোর নামকরণ হইয়াছিল,—"এরিস্টক্লিস্।" কিন্তু তাঁহার বিশাল স্কন্ধ এবং পৃথুল ললাট অবলোকন করিয়া, তাঁহার মল্ল-শিক্ষাগুরু তাঁহাকে 'প্লেটোন্'—এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি প্লেটো, প্লেটো নামে বিখ্যাত আছেন।

কেবলমাত্র বিপুল স্কন্ধ নহে, বাল্যকালে প্লেটো শারীরিক সামর্থ্যের বহু নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ গ্রীস বা মোরিয়া উপদ্বীপের তদানীন্তন প্রচলিত মল্লক্রীড়ায় তিনি কতবার বিজয় উপহারও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। শারীরিক উন্নতি ব্যতীত মানসিক উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না। শরীরটা আগে চাই, নতুবা মাথাটা বসিবে কিসের উপর। প্লেটোর মাথাটা একটা সুদৃঢ় দেহের উপর স্থানলাভ করিতে পারিয়াছিল

[illegible] বিচলিত হয়

[illegible] কথা শুনিয়া

এবং এথেনস্‌বাসী গ্রীকগণকে তৎকালে সাধারণতঃ পিলোপনিশীয় সমরে বিনিযুক্ত দেখিয়া প্লেটোর জীবনীলেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এমত অনুমান করেন যে, কয়েক বৎসরের জন্য তিনি যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এ অনুমান সত্য হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যুদ্ধকার্য্যে তিনি কখনই আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই; লোকহত্যাব্রত সাধনার জন্য তিনি ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হন নাই। জ্ঞানসাধনার জন্য তিনি তাঁহার পুণ্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

এই জ্ঞানসাধনার জন্য তিনি শিশুকাল হইতেই উপাদানসংগ্রহে উদ্যোগী ছিলেন। গ্রীসের সাধারণ ভদ্রসন্তানের ন্যায় তিনি শিশুকালে পাঠশালায় যাইয়া ভাষা ও কাব্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের কবিতা সকল কণ্ঠস্থ করিয়া, যতি ও ছন্দ বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অতি বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার কথোপকথন নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হেলেনার অন্ধ প্রাচীন কবিকুল গুরু হোমরের অনেক কাব্যাংশ হিরণ্য মাল্য-মধ্যে সুমার্জ্জিত মুকুতার ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। প্লেটো হয়ত নিজেই কবি ছিলেন; ইংরাজী কবি শেলীর অনুগ্রহে আমরা তাঁহার দুই একটি মনোহর কবিতার ইংরাজি অনুবাদ দেখিয়াছি। শেলী যাহা প্লেটোর কবিতা বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, ঠিক সেই কবিতাটিই প্লেটোর লিখিত কিংবা প্লেটোর লিখিত বলিয়া অনুমিত, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কিন্তু প্লেটো যে কবি ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ ঘটিবার কারণ নাই। কাব্যালোচনা তাঁহার যেরূপ প্রিয় ছিল, কবি ব্যতীত, অন্য কাহারও সেরূপ প্রিয় হইতে পারে না।

ভবিষ্যৎকালে যে জ্ঞানের চর্চায় প্লেটো গ্রীকগণকে চমকিত করিয়াছিলেন, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস্, তাঁহার সেই জ্ঞান শিক্ষার প্রথম গুরু। প্লেটোর পাঠশালার বাল্যপাঠ সমাধা হইলে, প্লেটোর পিতা এরিস্টন্ তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার অভিলাষে সক্রেটিসের নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন নিশীথ কালে সক্রেটিস্ স্বপ্নে দেখিলেন যে, এক মরালশাবক তাঁহার বক্ষে ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া, মধুর সঙ্গীতধ্বনিসহকারে, শ্বেত পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইল। ইহার পরদিনই প্লেটোর পিতা এরিস্টন্‌কে সমাগত দেখিয়া, সক্রেটিস্ অনুমান করিলেন, তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত সফল হইয়াছে। তিনি প্লেটোকে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মরালশাবক মনে করিলেন। ভাবিলেন, এই বালকই তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য হইয়া, একদিন মধুর বাগ্মিতার দ্বারা সমস্ত গ্রীসবাসীকে মুগ্ধ করিয়া দিবে। তা, প্লেটো কেবল গ্রীসবাসীকে কেন, সমস্ত জগদ্বাসীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

প্লেটো ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর সক্রেটিসের নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। মল্লযোদ্ধা, কবি প্লেটো এইরূপে মহা দার্শনিক হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সক্রেটিসের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই। অবসর পাইলেই তিনি হিরাক্লিটস্ এবং পাইথাগোরাস্ নামক দার্শনিকদ্বয়ের রচনাও সবিশেষ সমালোচনা করিতেন। এই দার্শনিকদ্বয়ের মধ্যে একের অবসাদপূর্ণতা এবং অন্যের রহস্যপূর্ণতায় দ্বারা, প্লেটোর সমস্ত ভবিষ্যৎ দর্শনচিন্তা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

গুরু সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো প্রায় দশ বৎসর কাল মেগারা নগরে যাইয়া,

তাঁহার সহতীর্থ ইউক্লিডিসের নিকট বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি গণিত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ প্লেটো দেশভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মিসর দেশে নীল নদের উপকূল পর্য্যটন করিয়া ভ্রমণ করিতেন। জ্ঞানের অনুসন্ধানে তিনি ফিনিসিয়া ও প্যালেষ্টীন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য তিনি চ্যাল্‌ডিয়া প্রদেশেও গমন করিয়াছিলেন। এট্‌নার ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত সন্দর্শন লালসায় তিনি সিসিলি দ্বীপেও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সিসিলি হইতে প্রত্যাগমন কালে, সিরাকিউস রাজ্যের রাজশ্যালক ডিয়নের সহিত তাঁহার সবিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। ডিয়ন তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্লেটোর অদ্ভুত বাগ্‌বিন্যাস শ্রবণ করিয়া, এবং তাঁহার সুগভীর গবেষণাপূর্ণ যুক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ডিয়ন তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিলেন। ডিয়ন সিরাকিউস্ রাজ্যের শাসনকার্য্যে সহায়তা করিতেন; কিন্তু রাজা ডায়নিসিয়াসের প্রজানিপীড়ন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি রাজাকে সাম্যনীতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রদান করিতেন। দুর্দ্ধর্ষ রাজা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন না। এক্ষণে প্লেটোকে পাইয়া ডিয়ন মনে করিলেন যে, যদি একবার রাজাকে প্লেটোর উপদেশ শুনাইতে পারেন, তাহা হইলে রাজা নিশ্চিত প্রজাদলননীতি পরিত্যাগ করিবেন; এবং সিরাকিউস্ রাজ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; প্রজাসাধারণের সমস্ত দুঃ[illegible] অপনীত হইবে। ইহা মনে করিয়া ডি[illegible] প্লেটোকে সিরাকিউস রাজ্যে আনয়[illegible] করিলেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত ডায়নিসিয়াস্ প্লেটোর উপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ইজিনার বাজারে বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদান করিল। সৌভাগ্যক্রমে কোন সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রয় করিয়া, তাঁহার মুক্তি বিধান করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি এথেন্‌স্ নগরে, সম্ভবতঃ ৩৮৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার শিক্ষামন্দির স্থাপন করিলেন। এথেন্‌স্ নগরের পশ্চিম সীমান্তে এক মনোহর উদ্যান মধ্যে এই বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইল। এই উদ্যানসংলগ্ন কলোনস্ নামক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া প্লেটো তথায় আপন নিবাসাশ্রম নির্দ্ধারিত করিলেন। আশ্রমের দ্বারদেশে এই সগর্ব্ব উক্তি লিখিত হইল যে, জ্যামিতি-শাস্ত্রবেত্তা ব্যতীত আর কেহ সেই আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

উপরোক্ত মনোরম উদ্যানমধ্যস্থ শান্ত আশ্রমমধ্যে বসিয়া, বিপুল ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, প্লেটো ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায়, জ্ঞানের সূক্ষ্ম সূত্রসকল, সমাগত শিষ্যগণের নিকট ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধুর বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব যুক্তিজালে আচ্ছন্ন হইয়া, শিষ্যগণ বিমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার জ্ঞানালঙ্কৃত অদ্ভুত বাগ্মিতা আশ্রম-সীমা অতিক্রম করিয়া, জলদনাদে দেশবিদেশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার সুযশ দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ আসিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এইরূপে আরও বিশ বৎসর কা[illegible] [illegible] বৎসর বয়সের সময় [illegible] একবার সিরাকিউস্ রাজ্যে

গমন করিতে হইয়াছিল। এবারও তিনি তাঁহাকে প্রিয়তম বন্ধু ডিয়ন কর্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্দ্ধর্ষ রাজা ডায়নিসিয়স্ মৃত হওয়ায় তৎপুত্র সিরাকিউসের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু তখনও ডিয়ন রাজ-সভাসদ ছিলেন। তিনি নূতন রাজার মঙ্গল কামনায়, তাঁহাকে প্লেটোর সদুপদেশ শুনাইবার বাসনা করিয়াছিলেন নবরাজা মুগ্ধনেত্রে প্লেটোকে নিরীক্ষণ ও তাঁহার অমৃতময়ী বাক্যাবলি শ্রবণ করিলেন; কিন্তু প্লেটোর উপদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করা সহজ মনে করিলেন না। উচ্ছৃঙ্খল যুবক ক্রমে প্লেটোর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রাজসভা মধ্যে প্লেটোর আদর লক্ষ্য করিয়া, রাজানুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সভাসদ্‌গণ হিংসা-জর্জ্জরিত হইয়া রাজার কর্ণে গরল ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহাদের কথায় উত্তেজিত হইয়া, তিনি সদাশয় ডিয়নকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। এবং প্লেটোকে রাজসভায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্লেটো স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চাহিলে, রাজা কহিলেন, "আমি আপনাকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি প্রদান করিলাম। কিন্তু ডিয়ন নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিলে, আপনাকে আবার এ রাজ্যে আসিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনি অঙ্গীকার না করিলে আমি আপনাকে ছাড়িব না।" অগত্যা উক্তরূপ অঙ্গীকার করিয়া প্লেটো স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় রাজা প্লেটোর নিকটে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি বোধ হয় স্বদেশে ফিরিয়া, আপনার বিদ্যা-মন্দিরের দার্শনিকগণের নিকট আমার নিন্দা করিবেন।" প্লেটো গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নিন্দা দূরের কথা, সে মন্দিরে [illegible] করিবার অবসরই আমাদের হইবে না।"

প্লেটো তাঁহার মনোরম ও শান্ত আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া, আবার দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন, আবার সুধীগণ তাঁহার কাব্যময়ী কথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইল। আবার তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ তাঁহার বিদ্যামন্দিরে সমবেত হইলেন। এইরূপে আরও দশ বৎসর অতীত হইল। আহা! কি পরমা শান্তিতে বৃদ্ধ প্লেটো সে দশটি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। বৃক্ষগণের শাখাসঞ্চালনে, পক্ষিগণের মধুর কুহরণে, ধর্ম্মানুশীলনে, না জানি বৃদ্ধ কত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

দশ বৎসর পরে সিরাকিউসের রাজা তাঁহাকে পত্র লিখিলেন,—"আপনি সিরাকিউস্ রাজসভায় আসিয়া, আপনার পূর্ব্ব অঙ্গীকার প্রতিপালন করুন; ডিয়ন নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন।" সংবাদ পাইয়া, সত্যবাদী প্লেটো অগত্যা সিরাকিউস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মিথ্যাবাদী রাজার ইহা একটি কৌশলমাত্র। প্লেটোর ন্যায় এক মহাজ্ঞানীকে রাজসভার অলঙ্কার স্বরূপ, রাজ্য মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার অভিলাষে রাজা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্লেটো রাজার চাতুরী বুঝিতে পারিয়া কোন ক্রমে সত্বর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমন-পথে ডিয়নের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বন্ধুদ্বয়ের সেই শেষ সাক্ষাৎ।

একাশী বৎসর বয়সে প্লেটোর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি লেখনী হস্তে উপবিষ্ট ছিলেন।

প্লেটো যে সকল অভিমত প্রকাশ করিতেন, তাহা তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভাবায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। পরে ভাবা আরও পরিমার্জ্জিত করিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সমস্ত অভিমত "কথোপকথন" নামক গ্রন্থাবলীতে বিবৃত আছে। আমরা সময়ান্তরে সে সকল অভিমতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাদরায়ণ ও শঙ্করের জীবতত্ত্ববিচার।

জীবতত্ত্ব বিচার না করিয়া কে যে পরম শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অদ্যাপি অজ্ঞানের সূচিভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আর্য্যজাতির যে কোন আধ্যাত্মিক গ্রন্থ আছে, তাহাতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে জীবতত্ত্ববিচার দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ আন্বিক্ষিকী বিদ্যার কথাই বল, আর অবিরাম লোকোত্তর নির্ব্বৃতির অব্যবহিত নিয়ত কারণস্বরূপ বৈয়াসকী রাজবিদ্যার কথাই তোল, অথবা কাপিল ও পাতঞ্জলতন্ত্র প্রভৃতি কল্যাণদায়ী গ্রন্থসমূহের অনুশীলন কর, ইহারা সকলেই জীবতত্ত্ব-নিরূপণে তৎপর—সকলেই এই তত্ত্বকে মুমুক্ষুর পক্ষে অতি আবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর" এই অদ্ভুত নীতির কথা কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল অতি অর্ব্বাচীন অনার্য্যভাবাপন্ন গীতিকাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "হরি বিচারে কায নাই, প্রেমে ভেসে যাই।" ইহা অতীব সত্য যে, এইরূপ প্রেমে ভাসিবার ইচ্ছাটা যখন আর্য্যজাতির মধ্যে ক্রমবিকাশের দিকে ধাবিত হইতেছিল, তখন হইতেই আর্য্য জাতির মনোবৃত্তি শৃঙ্গাররস সেবিত বা বিলাসিতার আবিল সলিলে ক্রমনীতিতে মগ্ন হইতে লাগিল—তখন হইতেই আর্য্য জাতি, অনার্য্যজাতি ও তদ্‌ভাবের সংমিশ্রণে আসিয়া আপন আর্য্যভাবকে অংশতঃ কলুষিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। আর ইহাতেই বা কি সন্দেহ যে, বিচার-বিমুখতা অধঃপতনের অব্যভিচারী চিহ্ন! সংসারে প্রেম-দুলাল বা ভক্তি-দুলাল, ললি[illegible] দাস বা বিসখা দাস অপেক্ষা যে বিচার-বিধৌত-বুদ্ধি কুমারিল ও শঙ্করের অধিক আবশ্যকতা, ইহাতেই বা কোন্ মতিমান্ অপ্রত্যয়ান্বিত হইতে পারে?

বিচারবিতৃষ্ণাটা বর্ত্তমান সময়ে ভক্তিবাদীর মধ্যে অত্যধিকমাত্রায় দেখিতে পাই। তাঁহাদের অনেকেই ভক্তির দোহাই দিয়া কেবল বিচার ও তদুপযোগী ফল তত্ত্বজ্ঞানের অযথা নিন্দাবাদেই নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু বিচারশীল ব্যক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানীর দর্শনও পাপজনক বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনে করাটা অবশ্যই তাঁহাদের নিজের প্রতি যেরূপ কুফল প্রসব করে, তদ্রূপ ঐ উভয়ের প্রতি নহে, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শে, ক্রমনীতিতে জনসমাজ তদীয় মতে আপন মত মিলাইয়া অমনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে থাকে। যদিও ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতাতে "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" এবং "জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতং" এইরূপে জ্ঞানীদিগের প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা "জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড" ইত্যাদি অসম্বদ্ধ প্রলাপকে ইহা হইতেও অধিক মূল্যবান্ বলিয়া জানেন। যদিও জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি পরম পদের পরম্পরা কারণ হইতে পারে, কিন্তু তৎশূন্য ভক্তি যে মনুষ্যকে কুসংস্কার ও অবিবেকের অন্ধকূপে ফেলিয়া থাকে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ফলতঃ ভক্তি শব্দটা মহাভারতে থাকিলেও তাহা যে অবৈদিক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কারণ সংহিতা, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে ইহার আবিষ্কার অদ্যাপি কেহ করিতে পারে নাই। যাহা

হউক, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভক্তি পরমপদের অনুকূল না হইলেও, সর্ব্বস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি যে মনুষ্যকে তত্ত্বজ্ঞানের দিকে লইয়া যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভক্তি যেরূপ শৃঙ্গার রস, গোপীভাব ও সখী ভাব প্রভৃতি কুৎসিত ভাব দ্বারা বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে এইরূপ আশা করিতে পারা যায় না যে, ইহা দ্বারা পরমপদের পথ পরিষ্কৃত হইবে। বিশেষতঃ বিচার ও জ্ঞানের বিশেষ ভাবটা বর্ত্তমান ভক্তিবাদীর মধ্যে প্রবলভাবে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কোন বিচারশীল ব্যক্তিই এইপ্রকার ভক্তিকে তত্ত্বজ্ঞানের অরাতিস্বরূপ না বলিয়া থাকিতে পারেন না।

পরব্রহ্ম জীবের আপন মূলস্বরূপ বলিয়াই আর্য্যমহর্ষিরা জীবতত্ত্ব বিচারে এত লিপ্ত ছিলেন। যদিও কোন কোন মহর্ষি বিচার-বিভ্রাটের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পান নাই, তথাপি তাঁহারা যে এই বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ আনিতে পারা যায় না। আর জীবতত্ত্ব বিচার যে ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্যথা সিদ্ধ নিয়ত কারণ, এই বিষয়েও তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু মহর্ষি বাদরায়ণ যে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থাবলীই ব্যক্ত করিয়া দেয়। তৎ প্রণীত গীতা, বেদান্ত সূত্র ও মহাভারতাদি দেখিলে ইহাই বিচারশীল ব্যক্তির মনে উদয় হয় যে, তিনি আত্মতত্ত্বের প্রদীপ জ্বালিয়া শত শত জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থাবলী ঐ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। [illegible] তদীয় বেদান্ত-সূত্রের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, তথাপি ভাষ্যকার বিদ্যামূর্ত্তি শঙ্করের যুক্তিপূর্ণ বেদানুযায়ী ভাষ্যের সাহায্যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি উহা বুঝিয়া লইতে পারেন।

জীবতত্ত্ববিচার যখন তত্ত্বজ্ঞানের অব্যভিচারী কারণ, তখন তাহা জিজ্ঞাসুমাত্রেরই গ্রহণীয় বিবেচনায় আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে ভগবান্ বাদরায়ণের বেদান্ত সূত্র ও ভগবান্ শ্রীশঙ্করের ভাষ্যের যথাযথ অনুবাদ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। আশা করি এই আচার্য্যদ্বয়ের মহত্ত্বই ইহার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইবে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই অনুবাদ বিশেষ ফলোপধায়ক হইবে। তবে ইহা সত্য যে, দার্শনিক বিষয় বলিয়া ইহাতে উপন্যাসের ভাবোদ্গার নাই, কিন্তু ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে যে, লোকোত্তর অনাময় রসে তাঁহারা সিক্ত হইবেন, তাহার উপমা মরজগতের মরজিনিষে কোথায় পাওয়া যায়? তবে ইহা সত্য যে, যাঁহারা অত্যন্ত বহির্মুখ ও মায়িক, ভোগবিলাসের আবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের জন্য বেদান্তসূত্র ও তদীয় ভাষ্য কখনও সন্তোষকর হইতে পারে না।

পূর্ব্বে "তৎ" পদবাচ্য অর্থাৎ পরব্রহ্মের নির্ণয়ার্থ পঞ্চভূতবিষয়ক শ্রুতির বিরোধ দূরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে এই ৩য় পাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত 'ত্বং' পদার্থের শোধনার্থ জীববিষয়ক শ্রুতির বিরোধ পরিহার করা যাইবে। 'জীব উৎপন্ন হয় না এবং মরে না' প্রভৃতি শ্রুতির সহিত জাতেষ্টি ও শ্রাদ্ধ বিষয়ক শ্রুতির বিরোধ হয় কি না, এইরূপ সন্দেহে বিরোধ হয়, ইহা মনে করিয়া অমুক মৃত অমুক উৎপন্ন, এই লৌকিক

ব্যবহারের দৃষ্টান্তে জাতেষ্টি ও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় শ্রুতিই ঐ শ্রুতির বাধক হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে,—

"চরাচরব্যাপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ।" অ ২। পা ৩। সূ১৬

"দেবদত্ত জন্মে এবং মরে ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার শরীরাদি সংশ্রবনিবন্ধন গৌণ, কেননা এই ব্যবহারের অন্বয়ব্যতিরেক শরীরাদি জড় বস্তুর সহিতই দেখিতে পাওয়া যায়।"

ভাষ্য—

"জীব জন্মে এবং মরে ইত্যাদি লোক ব্যবহার ও জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বিধান হেতু, প্রকৃতপক্ষে জীবেরও জন্মমরণ হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তির এইরূপ ভ্রান্তি হইতে পারে, আমরা তাহার নিরাস করিতেছি। শাস্ত্রে যে জীবের পক্ষে কর্ম্মের ফলভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার উপপত্তি হয় না বলিয়া জীবের জন্মমরণ স্বীকার করা যাইতে পারে না। আর শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই জীব বিনষ্ট হইলে শরীর-সম্পর্কিত ইষ্টানিষ্টের প্রাপ্তি ও পরিহারের জন্য শাস্ত্রীয় বিধি এবং নিষেধ উভয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে শ্রুতির প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শরীরেরই মৃত্যু হয়, কিন্তু জীবের নহে।" তবে কি প্রকারে লৌকিক জন্মমরণব্যবহার জীবের পক্ষে দেখান গেল? দেখান গিয়াছে, কিন্তু উহা গৌণ প্রশ্ন। যাহার অপেক্ষা তুমি ঐ লোকব্যবহারকে গৌণ বলিতেছ, সেই মুখ্য ব্যবহার কাহাকে আশ্রয় করিয়া হইবে? উঃ। উহা চরাচর শরীরাদি জড় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া হইবে অর্থাৎ জন্ম বা মরণ উভয়ই স্থাবর বা জঙ্গম শরীর সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, স্থাবর জঙ্গম ভূত সমূহ জন্মিতেছে ও মরিতেছে বলিয়া তৎসম্বন্ধেই জন্ম-মরণ শব্দের প্রয়োগ মুখ্য, কিন্তু উঁহাদের সহিত জীবের সংশ্রব রহিয়াছে, এই জন্য তদাশ্রিত জীবাত্মাতে ঐ ব্যবহারের উপচার হইয়া থাকে, কেন না শরীরের জন্ম হইলেই জীব জন্মিল এবং তাহা বিনষ্ট হইলেই জীব মরিল এইরূপ ব্যবহার হয়, কিন্তু উহা ব্যতীত কখন এইরূপ ব্যবহার হয় না। আর অদ্যাপি এইরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যিনি ঐরূপ ঘটনা ব্যতীত জীবসম্বন্ধে জন্মমরণ ব্যবহার করিতে কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে "সেই এই পুরুষ শরীর প্রাপ্ত হইলেই জায়মান এবং শরীর হইতে উৎক্রমণ করিলেই ম্রিয়মাণ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকেন" এই শ্রুতি শরীরের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিতই জন্ম-মরণ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ইহা প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের বিধানকে শরীরের জন্মসাপেক্ষ বলিয়াই জানিবে, কিন্তু উহা জীবের জন্মসাপেক্ষ নহে। আকাশাদি পদার্থের ন্যায় পরব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি হয় কি না এই বিষয়ের আলোচনা অব্যবহিত পর সূত্রে করা যাইবে। এই সূত্রের দ্বারা ইহা দেখান গেল যে, জন্মমরণ ব্যাপারটা কেবল দেহ সম্বন্ধেই ঘটে, কিন্তু জীব সম্বন্ধে নহে।"

"নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।" ঐ ঐ ১৭ সূত্র।

"আকাশাদি পদার্থের ন্যায় জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, যেহেতু সৃষ্টিবিধায়ক শ্রুতি সমূহে উহা উল্লিখিত হয় নাই, বরং বহু-শ্রুতিতে উহা অজন্মা বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছে।"

ভাষ্য—

"ইহা সুনিশ্চিত যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়

প্রকৃতির অধ্যক্ষ, শুভাশুভ কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোক্তা জীবাত্মা আছে। ঐ আত্মা কি আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় অথবা পরব্রহ্মের ন্যায় উৎপন্ন হয় না এইরূপ সংশয় আইসে, কেন না শ্রুতিতে উভয় ভাবের কথাই পাওয়া যায়। কোন কোন শ্রুতিতে অগ্নি হইতে যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি পরিশ্রুত হইয়া থাকে এবং কোন কোন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "নির্ব্বিকার ব্রহ্মই শরীরাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে জীব রূপে পরিজ্ঞাত হইতেছেন, কিন্তু জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হন না।" এই উভয় পক্ষের মধ্যে জীব যে উৎপন্ন হয় না, এই পক্ষ পরীক্ষা করার উদ্দেশে আপাততঃ গ্রহণ করা যাইতেছে, কেন না তাহা হইলে "এক বস্তু জানিতে পারিলেই সকল বস্তু জানিতে পারা যায়" শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞাটা অক্ষুন্ন থাকিয়া যায়; কারণ তাহাতে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় জীবও ব্রহ্মকারণক হইয়া পড়ে। অন্য পক্ষে ব্রহ্মের ন্যায় জীব নিত্য বস্তু হওয়াতে এই প্রতিজ্ঞাটা ভঙ্গননীতির অনুসরণ করে, কেন না জীব ব্রহ্ম-কারণক না হওয়ায় এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে তদুপাদানক নিখিল কার্য্য বস্তুর জ্ঞানের ন্যায় এক ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা জীবপরিজ্ঞান অসম্ভব হইয়া উঠে। আর নির্ব্বিকার পরব্রহ্মকে কোন প্রকারে জীব বলিয়া ধরা যাইতে পারে না, কারণ পরমাত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল, নির্লেপ এবং জীব ঠিক ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়ায় এই উভয় পদার্থ পরস্পর ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। পরমাত্মা হইতে জীবের ভিন্নতা হয় বলিয়া সে বিকৃত বস্তুতে পরিণত না হইয়া থাকে না। সুতরাং যেরূপে আকাশাদি সবিকার বস্তুসমূহ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া তাহাদের উৎপত্তি সুনিশ্চিত, সেইরূপে পুণ্য পাপ, সুখ দুঃখ প্রভৃতির ক্রীড়া-কুরঙ্গ এবং প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভাবাপন্ন জীবেরও প্রপঞ্চ উৎপত্তি অবসরে উৎপত্তি কখনই যুক্তিযুক্ত। এইজন্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদে "যেরূপ অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসকল উদগীর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রাণাদি ভোগ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়।" শ্রুতি প্রাণাদি ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি উপদেশ করিয়া "এই জীব সকলও পরব্রহ্ম হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে" এই অংশ দ্বারা ভোক্তা জীবের পৃথগ্‌ভাবে সৃষ্টি বিধান করিয়াছে। (এইত গেল বৃহদারণ্যকের কথা, আবার মুণ্ডক উপনিষদে রহিয়াছে যে,) "যেরূপ প্রদীপ্ত অনল হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হয়, হে সৌম্য, সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে তৎ সমানরূপ বিবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি জীবের উৎপত্তি ও লয় বর্ণনা করে। পরমাত্মা যেরূপ চৈতন্য স্বরূপ, জীবও সেইরূপ চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া এই শ্রুতিতে জীবকে পরমাত্মার সমানরূপ বলা হইয়াছে। আর উপনিষদের কোন স্থলে যে জীবের উৎপত্তি শ্রুত হয় নাই, ইহা অপর স্থলের শ্রুত বিষয়কে নিবারণ করিতে পারে না। আর যে স্থলে যে বিষয়ের উল্লেখ হয় নাই, সেই স্থলে অপর স্থলে কথিত অতিরিক্ত বিষয়ের অধ্যাহার করিয়া লইলে কোন ক্ষতি নাই। এই প্রকারে "নির্ব্বিকার ব্রহ্মই শরীরাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে" ইত্যাদি বিষয়েরও "তিনি স্বয়ং আপনাকেই আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় পরব্রহ্মের বিকারভাব প্রাপ্তিরূপ অর্থ সঙ্গত। সুতরাং উৎপত্তিই সুনিশ্চিত। এইরূপ আপত্তির নিরাকরণার্থ বলা যাইতেছে যে, আত্মা জীব উৎপন্ন হয় না,

কারণ এই বিষয়ে বেদের প্রমাণ নাই। উৎপত্তি প্রকরণের অধিকাংশ স্থলেই জীবের উৎপত্তি শ্রুত হয় নাই। আর যদি বল যে, কোন স্থলে অশ্রুত বিষয় অপর স্থলে শ্রুত বিষয়কে বারণ করিতে পারে না ইহা বলা হইয়াছে? সত্য, কিন্তু জীবের উৎপত্তিই অসম্ভব, ইহাই আমরা বলিতেছি। যদি বল কি কারণে, তবে শুন। ঐ শ্রুতি সমূহ দ্বারাই জীব যে নিত্য বস্তু ইহা বুঝিতে পারা যায়। চকার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অনাদিত্ব প্রভৃতিও জীব যে উৎপন্ন বস্তু এই সম্বন্ধে হেতুভূত। শ্রুতি দ্বারা যেরূপ তাহার নিত্যত্ব ও অনাদিত্ব জানা যায়, সেইরূপ নির্ব্বিকারত্বও বটে। সুতরাং নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের জীবরূপে অবস্থিতি হইলেও ব্রহ্মরূপে অবস্থিতির কোন বাধা ঘটিতেছে না। আর এইরূপ অবস্থাতে জীবের উৎপত্তি স্বীকারটা কোন প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। প্রোক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেখান যাইতেছে—"জীব মরে না," "ঐ মহান্ আত্মা অনুৎপন্ন, অজর, অমর, নিত্য মুক্ত ও অভয় পদে অবস্থিত পরব্রহ্মই বটে", "নির্ম্মল বোধস্বরূপ আত্মার জন্ম ও মরণ হয় না", "সৃষ্ট বস্তু সকল সৃজন করিয়া তাহাতে ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন", "এই জীবরূপে পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বিধান করিয়াছেন", "সেই এই আত্মা শরীরের নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন", "তুমিই ব্রহ্ম", "আমি ব্রহ্ম", "এই জীবাত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম"। এই শ্রুতি সমূহ জীবের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করে বলিয়া তাহার উৎপত্তি নিরাশ করিতেছে।

যদি বল যে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জীব বিকার স্বরূপ এবং বিকার স্বরূপ বলিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে? তবে বলিতেছি যে, জীব ও পরব্রহ্মের স্বরূপতে কোন ভিন্নতা নাই। "এক দেব সর্ব্বভূতে গূঢ় ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা" এই শ্রুতি এই বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ। বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির ভিন্নতা জনিত এক শুদ্ধ বুদ্ধ অখণ্ড ব্রহ্মাত্মাকে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। এই সম্বন্ধে ঘটাদি উপাধির বিভিন্নতা জনিত আকাশের বিভিন্নতা জ্ঞানকে উদাহরণ রাখা যাইতে পারে। এই বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ রহিয়াছে যে, "সেই এই ব্রহ্মাত্মাই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময় ও শ্রোত্রময় পুরুষ"। এই সকল শ্রুতি স্বরূপ ও বিকার শূন্য ব্রহ্মাত্মারও বুদ্ধি প্রভৃতি বস্তুময়ত্ব দেখাইতেছে। এই স্থলে তন্ময়ত্বের অর্থ প্রকৃত স্বরূপের লেশমাত্র ভিন্নতা না হইয়া তদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত রূপে স্ত্রীময় জাল্ম ইত্যাদি বিষয়কে রাখা যাইতে পারে। উপনিষদের কোন কোন স্থলে যে জীবের উৎপত্তি বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এইরূপ উপাধি সম্পর্কজনিত, এইরূপ বুঝিয়া লওয়াই উচিত। আর উপাধির উৎপত্তিতে জীবের উৎপত্তি ও তৎ-প্রলয়ে তাহার যে প্রলয় প্রতীয়মান হইয়া থাকে, ইহাও শ্রুতিতে ব্যক্ত হইয়াছে। উহা এই, "চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি পরব্রহ্ম [illegible] পরি-ণত ভূতসকল হইতে উৎপ[illegible] থাকেন, তিনিই উহাদের বিলয়ে বি[illegible] অর্থাৎ শরীরাদির নাশে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিলয়ের পরে তাঁহার কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ জাগতিক সবিকল্প জ্ঞান থাকে না, (কিন্তু তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানের বিলোপ ঘটে না)।" এই স্থলে ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, উপাধিরই বিলয় ঘটে, কিন্তু তদুপহিত আত্মার নহে; যথা মৈত্রেয়ী

প্রশ্ন—"আপনার বিলয়ের পরে তাঁহার কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না। এই উক্তি দ্বারা আপনি আমার ভ্রান্তি জন্মাইয়াছেন, ইহা আমি বুঝিতে পারি না যে, বিলয়ের পরে কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না ইহার মর্ম্মটা কি?" ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, "আমি ভ্রান্তিজনক বাক্য বলিতেছি না। এই আত্মা অবিনাশী এবং অপরিণামী বিলয়ের অর্থাৎ মৃত্যুর পর বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই জন্য তাঁহার পক্ষে বিশেষ জ্ঞানের অভাব ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে জীবের ব্রহ্মকার্য্যতা প্রতিজ্ঞাও অটুট রহিল, কেন না নির্ব্বিকার ব্রহ্মেরই জীবভাব স্বীকার করা গিয়াছে। এইরূপে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ততাও উপাধি নিমিত্তকই বটে। কেন না "ইহার পরে মুক্তির নিমিত্ত বলুন" শ্রুতির এই অংশ প্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় আত্মার অর্থাৎ জীবের নিখিল সাংসারিক ভাব প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক পরব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিয়াছে। অতএব জীব উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় না।"

পাঠক, "চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি পরব্রহ্মাই" ইত্যাদি উপনিষদের দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যুর পরে জীবের কোন সবিকল্প জ্ঞান অর্থাৎ জাগ[illegible]ষয়ক জ্ঞান থাকে না, [illegible] জ্ঞানে তিনি আলো-[illegible] [illegible]রাং লিঙ্গশরীরবাদী-[illegible] দ্বারা ভগ্ন না হইয়া রহিল না। কৃতবিদ্য শ্রেণীর প্রত্যয়ার্থ ঐ সকল শ্রুতির মূলস্বরূপ ও তদুপরি রত্নপ্রভা টীকার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "প্রজ্ঞান ঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।" বৃং ৪।৫।১৩। "মা ভগবান্ মোহান্তমাপীপদন্নবা অহমিমং বিজানামি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" "ন [illegible]

অরেঽহংমোহংব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি।" বৃং ৪।৫।১৪।

"জীবস্যোপাধিক জন্মনাশয়োঃ শ্রুতিমাহ তথাচেতি। এতেভ্যো দেহাত্মনা পরিণতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সাম্যেন উত্থায় জনিত্বা তান্যে বলীয়মানান্যনু পশ্চাদ্বিনশ্যতি। প্রেত্যৌপাধিকমরণানন্তরং সংজ্ঞা নাস্তীত্যর্থঃ। ননু প্রজ্ঞানঘনঃ, সংজ্ঞা নাস্তীতি চ বিরুদ্ধং ইত্যত আহ তথেতি। উপাধিলয়াদ্বিশেষজ্ঞানাভাব এব সংজ্ঞাভাবঃ নাত্মস্বরূপবিজ্ঞানাভাব ইত্যুত্তরং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিরিত্যন্বয়ঃ। অত্রৈবাস্মিনি বিজ্ঞানঘনে প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি ইত্যুক্ত্বা মা মোহান্তং মোহমধ্যং ভ্রান্তিং আপীপদদাপাদিতবান্ ইমমর্থং ন জানামি ক্রুহি ত্বদুক্তেরর্থমিতি মৈত্রেয়ীপ্রশ্নার্থঃ। মুনিরাহ নবেতি। মোহং মোহকরং বাক্যং উচ্ছিত্তিঃ পূর্ব্বাবস্থানাশো ধর্ম্মোঽস্য ইতি উচ্ছিত্তিধর্ম্মা পরিণামী স ন ইত্যনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা অপরিণামী তস্মাৎ অবিনাশীত্যর্থঃ। তর্হি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি ইতি কথমুক্তং, তত্রাহ মাত্রেতি। মাত্রাভির্বিষয়ৈরসংসর্গাত্তথোক্তমিত্যর্থঃ।"

"প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি" ও "মাত্রাঽসংসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি" শ্রুতির এই দুই অংশ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মৃত্যুর পর জীবের কোন প্রকার মায়িক উপাধি থাকে না, কেবল তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ চৈতন্যরূপে অবস্থিত থাকেন, আর ইহাই ব্রহ্মরূপে অবস্থিতির সহিত অভিন্ন জিনিষ। গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।" যখন মৃত্যুর পরে জীবের কোন প্রকার মায়িক উপাধি থাকে না, তখন লিঙ্গ শরীর কি প্রকারে থাকিতে পারে, কেন না উহার

মায়া-বিজৃম্ভিত ছাড়া কোন অপর জিনিষ নহে। আর লিঙ্গ শরীর না থাকিলে যে, ব্যক্তিগতভাবে কর্ম্মের ফলভোগ হইতে পারে, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমষ্টিভাবে বা ব্রহ্মভাবে জীব অনাদি অনন্ত হইলেও তাহার ব্যক্তিত্বের সীমা মৃত্যু পর্য্যন্ত বলিয়া একই ব্যক্তি এক জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণ করে, এই ধারণাটা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত জিনিষে পরিণত না হইয়া রহিল না। তবে একভাবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাম মৃত্যুর পরে শ্যাম হইবে ও জন্মের পূর্ব্বে উপেন ছিল, কেন না রাম যখন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, তখন ব্রহ্মই মায়ার সংস্রবে শ্যাম ও উপেন রূপে পরিণত হওয়ায় রামের সম্বন্ধেও উহার সমাবেশ করিয়া লইতে পারা যায়, অর্থাৎ রাম পূর্ব্বজন্মে উপেন ছিল এবং মৃত্যুর পরে শ্যাম হইবে। এইরূপে জীবের ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য অধিকার করিয়া অজ্ঞানি-সমাজের মনস্তুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই পূর্ব্বতন ঋষিরা অদ্ভুত পরলোকতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমানে অনেকেই প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে অন্ধবিশ্বাসের শরণে আসেন। ফলতঃ মানুষ ন্যায়ই পড়ুক আর পাতঞ্জলই পড়ুক, অথবা রঘুনন্দনের সম্পত্তিতে স্ফীত হউক, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানা উচিত যে, এই জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অন্য কোন উপায় নাই। বিদ্যাগর্ব্বে মাতিয়া অনেকেই যে সত্যকে অসত্যে এবং অসত্যকে সত্যে পরিণত করিয়া বসেন, তাহার অনেকানেক উদাহরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জীবগত ব্যক্তিত্ব আগন্তুক হইলেও জীব যে অকস্মাদ্ভূত নহে, কিন্তু অনাদি অনন্ত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেন না তাহার মৌলিকতত্ত্ব আর পরব্রহ্ম একই জিনিষ। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরব্রহ্মই মায়ার মোহিনী লীলার সংস্রবে আসিয়া জীব বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মনে কর রামের যে অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক ব্যাপার দেখিতেছ, এইগুলির সহিত সার্দ্ধ ত্রিহস্ত শরীরের অবিনাভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ব্যতীত জীবের আন্তরিক বা বাহ্যিক কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে পরলোকের কাহিনী প্রসঙ্গে আতিবাহিক শরীর, যাতনা শরীর ও স্বর্গীয় শরীর প্রভৃতির কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উদ্দেশ্য অজ্ঞলোকদিগকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক শাসনে রাখা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। আর পৃথিবীর সকল লোকই যে বেদান্তের মুখ্য সিদ্ধান্ত একজীববাদের মর্ম্ম বুঝিয়া লইবে ইহা অতীব অসম্ভব। পরন্তু যাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্ম্মল ও সূক্ষ্ম বস্তুতে প্রবেশক্ষম করিতে অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা 'হারাইয়া তাড়াইয়া কাশ্যপ-গোত্র নীতিতে' যদি অন্ধবিশ্বাসের শরণ লয়েন ও ইহার নিকটে স্বকীয় বিচার শক্তিকে বিক্রয় করিয়া বসেন, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। এই বিষয়ে বিশেষদর্শীর মৌন অবলম্বন করাটাকেও একটা প্রশংসার কথা বলিয়া ধরিয়া লইতে মন চাহে না, কেন না তাঁহারাও যদি সত্য নির্ণয়ে ঔদাসীন্য দেখান, তবে জগতের তিমিররাশির বিধ্বংস কে করিবে?—কাহাকে আদর্শ করিয়া অজ্ঞ লোকগুলি আপন মনুষ্যজন্ম সফল করিবার প্রশস্তবর্ত্মে অগ্রসর হইবে? তবে ইহা সত্য যে, পরলোকের রাজমার্গে যে আবর্জনা-রাশি পড়িয়া রহিয়াছে, সেইগুলি নিঃশেষে

অপসারিত হইলে কতকগুলি লোকের জীবিকাক্ষেত্রের পুষ্টিসাধনে কিছু সময়ের জন্য ব্যাঘাত ঘটিবে, কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণের গন্তব্য মার্গকে অপরিষ্কৃত রাখা কখন ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

আত্মাকে অনাদি অনন্ত মানাই আর্য্য দর্শনের আস্তিকতা। আর একজীববাদে ইহার কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহাকে নাস্তিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে ঐ নাস্তিকতাটা তদনুষ্ঠানকারীর স্কন্ধেই চাপিয়া বসিবে। তবে ইহা অতীব সত্য যে, যাঁহারা সার্দ্ধত্রিহস্ত শরীরের কার্য্যবিশেষকে আত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক। আর ইহাও মিথ্যা নহে যে, এই শ্রেণীর স্বনামবিখ্যাত মহোদয়েরা মৌলিক বস্তুর সহিত অপরিচিতই রহিয়াছেন। পক্ষপাত বা গোঁড়ামিকে ভাগীরথী-সলিলে ভাসাইয়া দিয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তি যদি শুদ্ধ-শান্ত-চিত্তে আত্মতত্ত্ব-বিচারে নিযুক্ত হন, তবে অবশ্যই একদিনে না হউক সময়ে তাঁহাকে একজীববাদে আসিতেই হইবে। বন্ধন-মুক্তির জঞ্জাল অজ্ঞান অবস্থাতেই মানব মনে টিকিতে পারে, কিন্তু প্রবুদ্ধ অবস্থাতে নহে। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবা মাত্রই মানব মুক্ত হইয়া যায়, ইহাই "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" শ্রুতি ও "পরং জ্যোতিরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" বেদান্ত সূত্র উপদেশ করিতেছে। তত্ত্বজ্ঞান অবস্থা ব্যতীত মুক্তি শব্দের অভিধেয় অপর কোন জিনিষ নাই সত্য, কিন্তু যখন "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সংপৎস্যে" শ্রুতি ও "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে" বেদান্ত সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহারও সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে, কেন না আর্য্য নীতিতে শ্রুতি ও আর্য্য গ্রন্থের সম্মান রাখাই বিধেয়। এই শ্রুতি ও সূত্রের আশয় এই যে, আগন্তুক উপাধির ব্যক্তিত্ব বিলয় সহকারে স্বরূপাবস্থিতি। আর ইহা শরীরপাতের পরেই সংঘটিত হইতে পারে। যদিও এইরূপ মুক্তি মৃত্যুর পরে সকলেরই পক্ষে সম্ভবপর, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কেহ ইহা অনুভব করিতে পারে না বলিয়া শাস্ত্রে কেবল তাঁহাদিগকে অধিকার করিয়াই ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আত্মা নিত্য মুক্ত, সুতরাং বন্ধন ও মুক্ত অবস্থাতে স্বরূপতঃ তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই; কিন্তু অজ্ঞানী লোকেরা এই সুগভীর তত্ত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য আপন মনে অনেক যাতনা ভোগ করে।

এ সম্বন্ধে এই স্থলে এইরূপ আপত্তিও আসিতে পারে না যে, যখন মৃত্যুর পরে সকল জীবের এক অবস্থা, তখন তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য এত প্রয়াসের আবশ্যক কি? কেন না তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত পরম শান্তি ও অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায় না। ইহকালের লাভটা কি কখন উপেক্ষণীয় জিনিষে পরিণত হইতে পারে? দেখিতেছি জগতের প্রায় সমস্ত ঘটনা ঐহিক লাভালাভের উপর নির্ভর করিয়াই হইয়া থাকে। আর উপনিষদেও লিখিত আছে যে, "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি। নোচেদবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"

যখন তত্ত্বজ্ঞানীর শরীরপাতের পরেও মহামায়ার লীলাখেলার নিবৃত্তি হইতেছে না, তখন কি প্রকারে বলা যাইতে পারে তিনি মায়ার পরপারে চলিয়া যান। ব্যক্তিগতভাবে সুষুপ্তি বা সমাধিতে সাময়িক কার্য্যোপরম ঘটিলেও সমষ্টিভাবে

তদীয় কার্য্যোপরমের কোন প্রমাণ নাই। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, এমন সময় অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না, যাহাতে মায়ার কোন না কোন কার্য্য না হইতেছে। এইজন্য শুদ্ধ ব্রহ্মে লীন হওয়ার ন্যায় শুদ্ধ ব্রহ্ম কথাটারও অর্থ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া করিতে হয় অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের অর্থ মায়ার নির্লেপ আশ্রয় বা সাক্ষী, কিন্তু মায়াশূন্য ব্রহ্ম নহে। পুনর্ব্বার মায়ার সমুত্থান অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্ম কখন মায়াশূন্য হইতে পারে না। আর অসঙ্গত নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের কি প্রকারে মায়োৎপাদিনী শক্তি হইতে পারে? পক্ষান্তরে বিরোধী বস্তুর অন্ততঃ প্রাতিভিক সত্তা ব্যতীত স্বসত্তার সিদ্ধি হইতে পারে না। আমাদের সম্বন্ধে যে কোন বস্তুর জ্ঞান হয় উহাই অন্য বস্তুর সহিত তুলনা সাপেক্ষ। সুতরাং মায়াশূন্য একমাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মের কোন প্রকার উপলব্ধি হইতে পারে না বলিয়া তাহার সম্বন্ধে প্রামাণিকতার অত্যন্তাভাব হইয়া পড়ে।

এই স্থলে এইরূপ আপত্তিও আসিতে পারে না যে, যখন অনাদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত মায়া ব্রহ্মের সহবাসে থাকেন, তখন অদ্বৈত কথাটার সঙ্গতি কি প্রকারে হইতে পারে? পরন্তু অদ্বৈতবাদের মর্ম্ম অপরিজ্ঞানকেই ইহার মূলে দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ অদ্বৈত কথার অর্থ পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট দ্বিতীয়শূন্যত্ব হওয়ায় প্রাতিভিক সত্তা-শালিনী মায়ার অবস্থিতিতেও ঐ প্রকার-বিশিষ্টাভাবের কোন বিপ্রতিপত্তি ঘটি-তেছে না। আর বিশেষণাভাব প্রযুক্ত বিশিষ্টাভাবের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মায়ার প্রাতিভাসিক সত্তা হওয়াতে ইহাও প্রমাণিত না হইয়া রহিল না যে, তিনি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকেন, একরূপে বা একভাবে অবস্থিতি তাঁহার ভাগ্যে কখন ঘটে না। অধিকন্তু তদীয় প্রবাহের কদাপি বিরাম হইতেছে না। ইহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে মায়া ও মায়িক বস্তুকে যে মিথ্যা বলা যায়, তাহারও মূলে এই প্রাতিভিক সত্তা ও অবিরাম পরিবর্ত্তন-কেই দেখিতে পাই। সংসার ভ্রান্তিময় এই কথাটারও এইরূপে সমাধান করিয়া লইতে কোন বাধা নাই।

জীবাত্মা স্বয়ং অচেতন হইয়াও আগন্তুক চৈতন্য বিশিষ্ট বা সাঙ্খ্যবাদীদিগের ন্যায় নিত্যচৈতন্যশালী এইরূপ সন্দেহে নিত্য চৈতন্যশালী বলিয়া নির্ণয় হইতেছে— "জ্ঞোঽতএব।" ঐ ঐ ১৮।

আত্মা উৎপত্তিরহিত বলিয়া নিত্যচৈতন্য-স্বরূপই বটেন, কিন্তু আগন্তুক চৈতন্য-বিশিষ্ট নহেন।

ভাষ্য—

ঐ আত্মা কি কণাদমতাবলম্বীর ন্যায় স্বয়ং অচেতন হইয়া আগন্তুক চৈতন্যবিশিষ্ট অথবা সাঙ্খ্যবাদীর ন্যায় নিত্যচৈতন্য স্বরূপ? এইরূপে বাদীদিগের বিপ্রতিপত্তিজনিত সংশয় হইয়া থাকে। আগন্তুকচৈতন্য সম্বন্ধে সংশয় হইবার কারণ এই যে, আত্ম-চৈতন্য আত্মা ও মনের সংযোগ জন্য, যেরূপ অগ্নি ও ঘট সংযোগ জন্য ঘটের লোহিত গুণ হইয়া থাকে। আর নিত্য চৈতন্য স্বীকার করিলে সুপ্ত, মূর্চ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে চৈতন্য দৃষ্ট হওয়া চাই, আর তাহারা ঐ অবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার পরে যখন সুস্থ হইয়া চৈতন্যযুক্ত হয়, তখন জিজ্ঞাসিত হইলে 'আমাদের কিছুই চৈতন্য ছিল না' এইরূপ ব্যক্ত করিয়া থাকে; সুতরাং কখন চৈতন্য থাকে, কখন থাকে না বলিয়া আত্মাকে আগন্তুক চৈতন্যশালী বলাই উচিত। এইরূপ আপত্তিতে বলা যাইতেছে যে, এই জীবাত্মা নিত্য চৈতন্য

স্বরূপ, যেহেতু উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ নির্ব্বিকার চৈতন্যাত্মা ব্রহ্মই উপাধি সম্পর্কে জীবরূপে অবস্থিত হন। আর পরব্রহ্ম যে চৈতন্য স্বরূপ এই বিষয়ে প্রমাণ 'বিজ্ঞান রূপ আনন্দই ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম সত্য অনন্ত ও জ্ঞান স্বরূপ', 'কি অন্তরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম চৈতন্য-ঘন মূর্ত্তি।' এই শ্রুতি সমূহ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পরব্রহ্মই জীব, সুতরাং যে উষ্ণ ও প্রকাশশালী হইবে তাহাকেই যেমন অগ্নি মনে করা উচিত, সেইরূপ নিত্য চৈতন্যশালী জীব কখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। আর বৃহদারণ্যকের "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" এই প্রকরণে স্বপ্ন অবস্থায় "আত্মা স্বয়ং অলুপ্ত ব্যাপার থাকিয়া লুপ্ত ব্যাপার বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকে।" "এই স্বপ্ন অবস্থায় আত্মা স্বয়ং-জ্যোতিঃ হইয়া থাকেন।" "বুদ্ধির সাক্ষিরূপ আত্মার চৈতন্যের বিনাশ হয় না।" ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, "অনন্তর জাগ্রদবস্থাতে যে অনুভব করে যে, আমি শুনিতেছি সেই আত্মা।" এই শ্রুতি দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়-গোলক সমূহ দ্বারা আমি ইহা জানিতেছি, আমি উহা জানিতেছি এই প্রকারে বিজ্ঞান-ময় আত্মার অনুসন্ধান হওয়ায় তাহার চৈতন্যশালিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, আত্মার নিত্য চৈতন্য স্বীকারে ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বৈয়র্থ্য হইয়া পড়ে, কেননা গন্ধাদি বিষয়ক বৃত্তির জন্য তাহার আবশ্যকতা অর্থাৎ ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তি বহির্গত হইয়া গন্ধাদি আকারে পরিণত হইলেই গন্ধাদি প্রত্যক্ষ হইতে পারে। (বেদান্ত পরিভাষাতে এই বিষয় স্ফুট হইয়াছে)। এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, গন্ধগোচর বৃত্তির জন্য ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়"। আর সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চৈতন্যাভাবের আপত্তিও শ্রুতি দ্বারাই পরিহৃত হইয়াছে। সুষুপ্তি অধিকার করিয়া শ্রুত হওয়া যায় যে, "সুষুপ্তিতে যে আত্মা কোন বিষয় উপলব্ধি করে না, উহার অর্থ আত্মা চৈতন্যবিচ্যুত না হইয়াও কোন জিনিষ অনুভব করে না, কেন না নিত্য বস্তু হওয়ায় দ্রষ্টার দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের অত্যন্ত বিলোপ হইতে পারে না। তবে যে ঐ অবস্থায় কিছু অনুভব করে না ইহার কারণ তদতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তুর অভাব।" এক্ষণে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় বিষয়ের অভাবেই অনুভবশূন্যতা, কিন্তু চৈতন্যাভাব বশতঃ নহে।

আকাশের উপরে কোন বস্তু নাই বলিয়াই তৎসম্বন্ধে সূর্য্যের প্রকাশকত্বাভাব, কিন্তু স্বকীয় প্রকাশ নাই বলিয়া নহে, এই বিষয়কে এ স্থলে দৃষ্টান্তে রাখা যাইতে পারে। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নহে, যেহেতু উহা দ্রব্য ইত্যাদি তর্ক ও তর্কাভাসে পরিণত না হইয়া থাকে না। কেননা আত্মার জ্ঞানতাদাত্ম্য প্রতিপাদক শ্রুতি ঐ তর্ককে ক্ষীণবল করে। অতএব আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপই সিদ্ধ হইল।

অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

বৈরাগ্য-শতক।

[সংস্কৃত ভাষায় বৈরাগ্য-শতক নামে শতকবিভাবিশিষ্ট একখানি বৈরাগ্যবিষয়ক গ্রন্থ আছে। সংসার যে নানাবিধ দোষপূর্ণ ও দুঃখময় এবং ঈশ্বরচিন্তা ও বৈরাগ্যই যে একমাত্র সুখ ও শান্তির নিকেতন, ইহাই এই সকল কবিতা দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সেই কবিতাগুলির পদ্যানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল]।

অনন্ত চিন্ময় যিনি বিশ্বব্যাপী সনাতন
অনুভব-শক্তি বিনা জ্ঞানগম্য নাহি হ'ন
দিক্‌কাল-অবচ্ছিন্ন হেন পূর্ণ তেজাধার
শান্তমূর্ত্তি পরমেশে করি আমি নমস্কার ॥১

মাৎসর্য্য-পূরিত হায় সংসারে পণ্ডিতগণ
সৎকাব্যের সমাদর নাহি হেরি সেকারণ
মূর্খের কথাই নাই—গর্ব্বে ভরা ধনিজন
কবি-হৃদে সুকাব্যের নাই তাই প্রস্ফুরণ ॥২

সংসারের গতি ভাই! নহে কভু শুভকর
সুকর্ম্মের (ও) পরিণাম নিত্য অতি
ভয়ঙ্কর—
এসংসারে পুণ্যার্জ্জিত নশ্বর বিষয়ে রত
নিয়োজয়ে কামিজনে ব্যসনেতে অবিরত
কর্ম্মবাসনায় আর বিষয়-লিপ্সায় হায়
চিরদিন মানবের গত ভাই! এ ধরায় ॥৩

কত না দুর্গম স্থানে ভ্রমিলাম এ ধরায়
তবু কোন সফলতা হ'লনা সাধিত হায়
জাতি কুল অভিমান করি সব পরিহার
সেবিনু অপরে আমি—অবিরাম-নির্ব্বিকার—
কিন্তু হায়, তাহাতেও নহে কোন ফলোদয়
বুঝিয়াছি এবে ভাই! সকলি প্রপঞ্চময়।
আত্ম-সম্ভ্রমের পানে কভু নাহি দিয়া মন
পরবাসে কাক-সম ভীতচিত্তে অনুক্ষণ
আহারে বিহারে কাল যাপিয়াছি অবিরল
এ আচারে কহ দেখি লভিলাম কোন্ ফল?
॥৪

খনন করেছি আমি নিধি লোভে ভূমিতল
ওষধি-সংযোগে ধাতু দাহিয়াছি অবিরল
হইয়াছি কতবার দুস্তর-সাগর পার
সেবিয়াছি কত যত্নে কত ভূপ অনিবার
মন্ত্রসিদ্ধ হ'য়ে আমি অর্থ লভিবার আশে
যাপিয়াছি কত নিশা ভীষণ শ্মশানাবাসে
কিন্তু হায় কি কপাল! করিয়াও চেষ্টা ঘোর
কাণা কড়িটিও লাভ হ'লনা হ'লনা মোর
অতএব অয়ি তৃষ্ণে! আর কেন অকারণ?
করহ এখন মোরে ভব-পাশ-বিমোচন ॥৫

খল দুর্জ্জনের তুষ্টি করিবারে সম্পাদন
তাহার দুর্ব্বাক্য-বাণে বিদ্ধ আমি অনুক্ষণ
যদিও তাহাতে মোর ঘৃণার সঞ্চার মনে
হাস্য-পরিহাস তবু বাড়িয়ে তা'দের সনে
গললগ্নী-কৃতবাসে তা'দের সন্তোষকর—
কহিয়াছি কত কথা এই আমি নিরন্তর
ইহাতেও অয়ি আশা! তৃপ্ত না হইলে তুমি
এখন ও) তা'দের হাতে তুচ্ছ ক্রীড়নক আমি॥৬

নারিনু ভুঞ্জিতে কিছু ভোগ্য বস্তু এ ধরায়
ভ্রমিলাম ভুক্ত হ'য়ে শুধু আমি কিন্তু হায়
চলিয়া যেতেছে কাল—আমাদের মনে লয়
আমরাই গত কিন্তু কাল কভু গত নয়
তৃষ্ণা আমাদের জীর্ণ হইল না কোন কালে
আমরাই জীর্ণ কিন্তু হইতেছি পলে পলে ॥ ৭

বলিতে আক্রান্ত মুখ পলিত হইল শির
শিথিল হইয়া এল ক্রমে ক্রমে এ শরীর
নিখিল এ দেহ জরা করিতেছে আক্রমণ
ধরিছে তরুণ ভাব তৃষ্ণা কিন্তু অনুক্ষণ ॥৮

দিনান্তে বারেক নিত্য ভিক্ষায় ভোজন হায়
মধুর সুমিষ্ট রস না বিরাজে কভু তা'র
শয্যা ভূমিতল আর দেহমাত্র পরিজন
শত খণ্ড জীর্ণবাস মলিন তা' অনুক্ষণ—
নিদারুণ দশাগ্রস্ত হেন লোক সমুদায়
বিষয়-বাসনা তবু কভু না ত্যজিতে চায়। ॥৯

অনল-মহিমা নাহি জানিয়া পতঙ্গ-দল
মোহের কুহকে মজি' ধায় তাহে অবিরল
অজ্ঞানবশতঃ দেখ দলে দলে মীনগণ
বড়িশ-আমিষ-লোভে করে মৃত্যু আলিঙ্গন
নিখিল-বিপদ-বার্ত্তা জ্ঞাত কিন্তু এ আমরা
তবু তা' ত্যজিতে নারি মোহেতে এমনি হারা!
ইহা হ'তে আছে কিবা সংসারে আশ্চর্য্য আর
মোহের মহিমা অহো! কি গহন—কি অপার ॥১০

ভোগের বাসনা ভাই! হইয়া আসিল ক্ষীণ
অভিমানও এতদিনে ধীরে ধীরে হ'ল লীন
প্রাণোপম সমবয়া রম্য সে সুহৃদগণ
করিয়াছে একে একে পুণ্যরাজ্যে পলায়ন
আমিও এখন হায় এমনি সামর্থ্যহীন
ধীর যষ্টি-উত্তোলনে আপনাকে বুঝি ক্ষীণ
নেত্রও ক্রমশঃ হায় দৃষ্টিশক্তি-বিরহিত
মৃত্যুর কথায় তবু দেহ-মন কণ্টকিত ॥ ১১

যতই সুচিরস্থায়ী হো'ক না বিষয়চয়
কালবশে কোন কালে অবশ্য লভিবে লয়
ইহাই যদ্যপি ভাই! অনিবার্য্য বিশ্বনীতি
তবে কি বর্জ্জন তা'র নহে ভবে শ্রেষ্ঠ রীতি।
বিষয়-বিনাশ আর স্বেচ্ছায় বর্জ্জন তা'র
উভয়ি সমান কথা বুঝিয়া রাখিবে সার
দৈববশে কোন কিছু পায় যদি কারো নাশ
জনমে কেবল তা'র অবিরাম হা-হুতাশ
কিন্তু যদি স্বেচ্ছাবশে কর তাহা পরিহার
সুখশান্তি-উপভোগ চিত্তমাঝে অনিবার
বিষয় সম্ভোগ হ'তে হইবে বিরক্ত যত
পরম মঙ্গল লাভ হইবে তোমার তত ॥ ১২

আশা নাম্নী নদী এক নিত্য অতি ঘোরতর
তৃষ্ণোর্ম্মি-আকুল সদা নীর অতি মনোহর
রাগ দ্বেষ আদি করি' জলজন্তু সে নদীর
বিতর্ক বিহঙ্গ তা'র—জানেন অন্তরে ধীর
দুস্তর প্রভাবে তা'র ধর্ম্মরূপ দ্রুমবর
উন্মূলিত হয় ভবে এ অতি বিস্ময়কর
মোহের আবর্ত্তে ইহা নিত্যকালই করালিনী
চিন্তার অতুঙ্গ তট ব্যাপি' ইহা প্রসারিণী
শুদ্ধচেতা যোগিগণ গিয়া এ নদীর পার
শান্তির পীযূষধারা পীয়ে সুখে অনিবার ॥ ১৩

নির্ম্মল-মানস যাঁরা হ'য়েছেন ব্রহ্মজ্ঞানে
সুদুষ্কর কার্য্যে নানা রত তাঁরা ধরাধামে
নানা উপভোগাস্পদ ধন-লালসা বর্জ্জন
তাঁদের পক্ষেতে ভাই! তুচ্ছ কথা অনুক্ষণ
কিন্তু কি আশ্চর্য্য-মোরা হইয়াও ধনহীন
মাত্র আকাঙ্ক্ষার ঘোরে ধনের মোহেতে লীন ॥ ১৪

গিরির কন্দরে বাস করিয়া মহাত্মগণ
যাপিছেন দিন মরি—করি' ব্রহ্ম-উপাসন
ক্রোড়স্থ বিহঙ্গকুল মুদিতাঁখি বিগলিত—
প্রেমাশ্রু করিয়া পান হইতেছে পুলকিত
আর মোরা মনে মনে আকাশ-কুসুম সম
সুরম্য প্রাসাদ নানা সরোবর-অনুপম
আর সে তটেতে তা'র শত শত মনোহর—
ক্রীড়াভূমি বিরচিয়া মনে মনে নিরন্তর—
আমোদে প্রমোদে ভাই! করিতেছি আয়ুঃক্ষয়
ইহা হ'তে এ জগতে আছে আর কি বিস্ময়? ॥ ১৫

অজ্ঞান-আবেশে ভাই! এ জগতে মূঢ়জন
নিজের গৃহকে করে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দরশন,
নিজাত্মজে ভাবে তা'রা সকলেরই মনোমত
নিজের নগণ্য বিত্ত না'জানি প্রচুর কত।
নিজ শয্যা-সঙ্গিনীকে প্রিয়তমা বলি' জানে
নবীন-বয়স্ক বলি' নিজেকে নিয়ত মানে

দূর্ণমান এ সংসার ভাবি' তা'রা অনশ্বর
নিবসে' সংসার রূপ কারাগারে নিরন্তর—
কিন্তু ভাই! ভবমাঝে চিরধূর্জ্জটিসেই জন
শক্য যে ত্যজিতে ইহা ভাবি' তুচ্ছ
মনে মন ॥ ১৬

ক্রন্দ্যমান ওই শিশু ক্ষুৎপীড়িত অতি দীন—
আকর্ষিছে জীর্ণাঞ্চল জননীর স্ফূর্ত্তিহীন—
সম্মুখে আবার হায় নিরন্ন-জঠরা জায়া
অবস্থিত দীনভাবে—ম্লানকান্তি শুষ্ককায়া—
হেরি ইহা মহামতি কোন্ দগ্ধোদর তরে—
কহিতে সক্ষম বাণী "দাও"-গদগদ
স্বরে ॥ ১৭

পদ্মপত্রে অবস্থিত বারির কণার মত
ক্ষণিক-চঞ্চল-প্রাণ-তা'র লাগি অবিরত—
বিবেক-বিহীন ভাবে ধরাধামে মূঢ়জন—
কোন্ না ঘৃণিত কার্য্য করিতেছে সম্পাদন?
ধনমদমত্ততায় নিঃশঙ্ক ধনীর পাশে—
বর্ণি কত নিজ গুণ অকুণ্ঠায় মহোল্লাসে—
জন্মিবে যে কত পাপ—তাহে হেন
আচরণে—
বিমূঢ় আমরা তাহা বারেক কি ভাবি
মনে? ১৮

অহো! কি দুঃখের কথা হইয়াও হতমান
পরান্নে নিরত মোরা পোষিবারে তুচ্ছ প্রাণ
বিদ্যাধর কেলিভূমি গঙ্গা-তরঙ্গ-শীকর—
সুশীতল হিমাদ্রির শিলাতল মনোহর
সকলই কি এক কালে লভিয়াছে ভবে লয়?
ইহা হ'তে এ সংসারে আছে আর কি
বিস্ময় ॥ ১৯

বনমাঝে তরুশাখে পক্ব সুমধুর ফল
লতা ও পল্লবময়ী চারু শয্যা সুকোমল—
আর পুণ্যতটিনীর স্বচ্ছস্নিগ্ধ পেয় জল—
ইচ্ছামাত্র সুবিগম্য ভবমাঝে অবিরল
তথাপি মানবগণ দীনভাবে নিরন্তর—
ধনীর দ্বারেতে গিয়ে সহে তাপ গুরুতর ॥ ২০

চল এবে বনে যাই পরিহরি এ সংসার
পুণ্য সে প্রদেশে গিয়া করি ফলমূলাহার—
রচিয়া কোমল শয্যা নবীন পল্লব যোগে
রহিব নিরত ভাই! অবিরাম সুখভোগে
নীচমনা অবিবেক বিমূঢ় জনের তথা
নাহিক সম্বন্ধ কোন—জেনো এই সার কথা
বিত্তরূপ ব্যাধিজাত বিকারবিহ্বল তা'রা
করে যে কটূক্তি সদা দম্ভ-মদে আত্মহারা
যাও যদি শান্তিধাম পুণ্য সে বিজন স্থানে
শুনিতে হ'বেনা ভাই! আর তাহা কভু
কাণে ॥ ২১

বহু কষ্টে তুচ্ছবিত্ত করি' যা'রা উপার্জ্জন
করয়ে ভ্রূভঙ্গী ভাই! গর্ব্বে তা'র সর্ব্বক্ষণ—
দুর্জ্জন কপটাচার তা'দের মুখের পানে
কি কারণ চেয়ে থাকা নারি তা' বুঝিতে মনে
গিরির কন্দরে কিগো! কন্দের অভাব
আছে!

পবিত্র নির্ঝর-রাজি এবে কি শুকায়ে গেছে
ফলভরা তরুরাজি এবে কি দেয় না ফল!
হ'য়েছে কি শাখা-রাজি পরিশূন্য বল-
কল? ॥ ২২

ধনীর সকাশে ধনপ্রার্থনার মত ভাই!
দুঃখকর এ সংসারে আর বুঝি কিছু নাই
সে দুঃখ সন্তাপ ভাগী দীনজন সমুদায়
গণে যে সকল দিন—অতি দীর্ঘ ব'লে হায়!
পক্ষান্তরে শান্তিময় যে দিবস সমুদয়
বিষয়বিরাগী কাছে ক্ষীণ-প্রতিভাত হয়
ধ্যান-অবসানে আমি ভূধর কন্দরস্থিত
শিলা-শয্যাসীন ভাবে হইয়া প্রফুল্লচিত—
হাসিয়া অন্তর-মাঝে কবে সে সকল দিন
করিব স্মরণ আমি—ব্রহ্মানন্দে হ'য়ে
লীন! ॥ ২৩

অতি রম্য ভিক্ষাহার নাহি তাহে দৈন্যভয়
দুঃখ অভিমান মোহ মাৎসর্য্য তাহাতে নয়।
সর্ব্বত্র সুলভ ইহা পূত সাধুজন প্রিয়
শম্ভু সত্র ব'লে ইহা ভা'ব তাই বরণীয় ॥ ২৪

ভোগে আছে রোগভয় কুলচ্যুতিভয় কুলে
ধনে রাজে রাজভয় দীনতা মানের মূলে
বলেতে রিপুর ভয় জরাভয় রূপ মাঝে
শাস্ত্রে রহে বাদিভয় খল ভয় গুণে রাজে
দেহ মাঝে বিদ্যমান অবিরাম কালভয়
এই মত এ সংসারে সকলি আতঙ্কময়
কিন্তু এক বৈরাগ্যেই মনে বুঝে দেখ ভাই !
কোন কালে কোনরূপ আতঙ্কের লেশ
নাই ॥ ২৫

দৃশ্যমান এই দেহ হ'লেও সে ঘৃণাকর
কবির বর্ণনা গুণে কতই না মনোহর।
মাংসগ্রন্থি কুচদ্বয় কনককলস-সম
শ্লেষ্মাধার স্মেরানন রম্য শশধরোপম
প্রস্রাবার্দ্র জঘন সে যেন করিবর-কর
কি কুহক কল্পনার কি আশ্চর্য্য অতঃপর ॥ ২৬

করাল মরণ আসি' করে জন্ম আক্রমণ
জরায় যৌবন-নাশ নিত্য কাল সংঘটন
ধন লালসায় আর স্ত্রীসম্ভোগ কামনায়
চিত্তের সন্তোষ শান্তি সকলি চলিয়া যায়
মাৎসর্য্য-আবেশে আসে অন্যের গুণেতে দ্বেষ
দুর্জ্জন ভূপালগণে শঠতার একশেষ
ঘটয়ে বুদ্ধির দোষে ধনসম্পত্তির লয়
একে অন্য অভিভূত এই নীতি বিশ্বময় ॥ ২৭

নানা রোগে চিন্তাঘোরে নরের সুস্থতা ভাই !
উন্মূলিত দিন দিন ইহাতে সন্দেহ নাই
যথায় সম্পদ্ সদা তথায় বিপদ রাজে
জন্ম অন্তরালে তাই মরণ এ ভব মাঝে
তাই বলি এ সংসারে কহ আছে কি এমন ?
ধাতার সৃষ্টিতে যাহে নাহি দোষ আবরণ ॥ ২৮

সম্ভোগ-ভরঙ্গ ভাই ! অত্যুচ্চ তরঙ্গ মত
দৃশ্যমান এ জীবন ক্ষণধ্বংসী অবিরত
চঞ্চল যৌবন-সুখ পদ্মপত্রে বারিপ্রায়
স্থায়ী মাত্র ক্ষণকাল সংসার মাঝারে হায়
বিচারি' এসব মনে বুদ্ধিমান্ জনগণ
সংসার অসার জ্ঞান করিবেন অনুক্ষণ ;
জীবে অনুকম্পা তার সদাই বিহিত হয়
ইহা ছাড়া এ সংসারে আর কিছু কিছু নয় ॥ ২৯

জলদ-হৃদয় স্থিত চঞ্চল তড়িত প্রায়
ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য-রাজি জেনো তাই এ ধরায়
ভীমবায়ু বিঘটিত অভ্রপটল-স্খলিত
জলকণা সম ভাই ! এ জীবন তুলিত।
মোহমদিরার প্রায় যৌবন-লালসা ভাই !
তুচ্ছ সে বিলাস মাত্র সুখ শান্তি তাহে নাই।
অতএব বৃথা কাল না করি' ক্ষেপণ আর
অর্পিবেন মন বুদ্ধি বুদ্ধিমান জন তাঁ'র
যোগঅনুষ্ঠান-কল্পে ধৈর্য্য সমাধির হেতু
হইতে সংসার পার ইহাই প্রকৃষ্ট সেতু ॥ ৩০

সম্যক্ বিচারে শক্য নহেক মায়ান্ধ নয়
তাই তা'র চক্ষে চারু প্রতিভাত চরাচর
পরন্তু বিবেকী ব'লে ভবে যারা গণনীয়
এ বিশ্ব তাঁহার কাছে নহে কভু রমণীয় ॥ ৩১

অধম অনর্থ রুচি কোন জন নিঃসংশয়
সুহৃৎ তনয়বন্ধু সুশীল বান্ধবময়
অপরূপ ছল এই দিয়াছে মোদের পর
তারই ঘোরে ভবে মোরা ঘুরে মরি নিরন্তর
তা না হলে এ সংসারে কে কাহার পরিজন ?
কেবা সে বলনা ভাই ! তোমার নিজের জন?
দৃশ্যমান এ সংসার কেবলই স্বপনময়
অথবা কুহক ভরা ইন্দ্রজাল সুনিশ্চয় ॥ ৩২

সংশয় কারণ যাহা অবিনয় নিকেতন
দোষসন্নিপাত রূপ সাহসের সুপত্তন
অবিশ্বাস পূর্ণ যাহা কপটতা আবরিত
শ্রেষ্ঠ সুরনর(ও) যাহা ত্যজিতে অশক্তচিত
নিখিল মায়ার যাহা দৃঢ়াধার মহীতলে
সুধামাখা নারীরূপী সেই তীব্র হলাহলে
কোন্ জন এ সংসারে ধর্ম্মের বিনাশ আশে
করেছে সৃজন হায় তাহা না ভাবেতে
আসে ॥ ৩৩

বিষয়ে আসক্তি ভরা লোকের হৃদয়ে রবে
কামানল অবিরল স্বভাবতঃ দীপ্ত ভবে

তখন পাণ্ডিত্য-ত্যাগী কবিগণ অকারণ
তাহার উপর কেন কু-কাব্যের হুতাশন
আহুতি নিক্ষেপ করি গিয়াছেন হায় হায়
প্রখর দহনে যার বিশ্ব এবে জ্ব'লে যায় ॥ ৩৪

স্বপ্নমায়া সম হায় তুচ্ছ ও চপল অতি
অবসানে অবসাদ অঙ্গনাগণেতে রতি
বল বল এ জগতে আছে কোন্ প্রয়োজন ?
পরিত্যাজ্য উহা ভাই সযতনে সর্ব্বক্ষণ
বিচারি যদিও এই তত্ত্বকথা শতবার
তথাপি ভুলিনা কথা সে কুরঙ্গনয়নার ॥ ৩৫

যাবৎ মূঢ়তা হেন রহে হৃদে বিদ্যমান
তাবৎ বিষয়রাজি সুখ-তৃপ্তি করে দান
কিন্তু তত্ত্বদর্শীদের বিশুদ্ধ মানসে অহ
কিবা সুখ কি বিষয়! কোথায় বা পরিগ্রহ ॥৩৬

ভূতাত্মক এই দেহ আগেও ছিল না যবে
দূরাদূর ভাবীতেও যখন ইহা না রবে
তখন কেবল মধ্য অবস্থায় ক্ষণ তরে
দেহ সনে পরিচয় মোদের এ চরাচরে
সংযোগ বিয়োগ যবে অনিবার্য্য ভবে ভাই,
লঙ্ঘন তাহার কভু কার(ও) কোন শক্তি নাই
অতএব কার পরে করি সখ্য সংস্থাপন
কারই বা বিয়োগ শোকে হব সদা
নিমগন ॥ ৩৭

সুখ দুঃখ তুলনায় নাহি ভেদ পরস্পর
অশুচি শূকর যথা তেমতি ত্রিদিবেশ্বর,
সুধা যথা দেবেন্দ্রের সতত বাঞ্ছিত ধন
শূকরও পুরীষ ভোগে তেমতি সুতৃপ্ত মন
প্রেমের পিয়াস ইন্দ্র রম্ভায় মিটান যথা
শূকরেরও কাম-আশা শূকরীতে পূর্ণ তথা
মৃত্যু হ'তে উভয়েরই নিরখি সমান ভয়
কর্ম্মগতি অনুসারে অন্য ভাবও ভিন্ন নয় ॥ ৩৮

কৃমিকুল-সমাকীর্ণ লালা ক্লিন্ন মাংসহীন
দুর্গন্ধপূরিত অস্থি-সুখেতে হইয়া লীন
চর্ব্বণ কালেতে যথা—ঘৃণ্য সারমেয়গণ
পার্শ্বস্থ ইন্দ্রের (ও) পানে নাহি করে বিলোকন
কেবল প্রাণের তরে এক এক বার চায়
মোহান্ধ মানবও তথা সুনিশ্চিত এ ধরায়
বিষয়-সম্ভোগ কালে পাছে অন্য কোন জন—
হয় আসি' অন্তরায় তাই সদা ক্ষুব্ধ মন—
ভুলেও বারেক হায় ব্রহ্ম পদার্থের পানে
মন নিবেশিতে হায় সে পাপাত্মা নাহি জানে
বিষয়ের পরিগ্রহে নিজের তুচ্ছতা কত !
নির্দ্ধারিতে নয় তাহা না হয় নিমেষ(ও)
রত ॥ ৩৯

কয়েক নিমেষ মাত্র যাদের জীবন-মান
তাদের বিয়োগ দুঃখে কেন সাধু মুহ্যমান ?
যেমন নিমেষ মাত্র তাদের সঞ্চার ভবে
তেমতি পলকে হায় তাহারা বিনাশ লভে
কিবা সুর কিবা গিরি কি বিশাল পয়োধর
চিরস্থায়ী নহে কিছু সকলি ত বিনশ্বর ॥৪০

পুত্রাভাবে পুত্র আশে দারুণ অশান্তি ক্লেশ
লব্ধ যদি রোগাতঙ্কে উদ্বেগের একশেষ
অবশেষে নানাবিধ উপায়ে ব্যাধির পার—
হইলেও ধীরে ধীরে—উপশম প্রতীকার
হয় যদি সেই পুত্র দুরাচার দুর্ব্বিনয়
তা হ'লে স্মরিয়া তাহা মনঃক্লেশ সঞ্চরয়
আবার তনয় যদি হয় সর্ব্বগুণাধার,—
অহিত আশঙ্কা মনে উপজে তরেতে তার—
আর যদি কালবশে পঞ্চভূতে পায় লয়
তা হ'লে দুঃখের আর অবধি নাহিক রয়
পুত্র নামধারী এই মহাশত্রু তেকারণ—
বাঞ্ছা না করয়ে যেন এ সংসারে কোন
জন। ৪১

পঞ্চভূতাত্মক এই দেহনাশ সুনিশ্চয়
প্রণয় বিষয় সুখ(ও) অতি চঞ্চলতাময়
কষ্টপূর্ণ-ভোগরাজি মহাকর্ম্মভোগকর
কালভুজঙ্গিনী সম বামাকুল নিরন্তর
সংসার-আসক্তি-মাঝে অনন্ত যাতনা কত !
চঞ্চলা কুটিলা অতি কমলা সে স্বভাবতঃ
কৃতান্ত নিতান্ত বৈরী স্বেচ্ছাচার বলবান্
আত্ম-হিতকর কার্য্যে তথাপি না ধায় প্রাণ ॥ ৪

অর্থ প্রাণ উভয়ের বিনাশ আশঙ্কা স্থলে
কামনা করয়ে মূঢ় প্রাণ রক্ষা ধরাতলে
আবার বিপদ্ হ'তে উত্তীর্ণ হইলে পর
ধনের তরেতে তারা লালায়িত নিরন্তর—
সে ধন-মোহন-মদে হ'য়ে তা'রা মুগ্ধমন
অপর আপদে ধায় করি' ঘোর প্রাণপণ
ধন প্রাণ উভয়ের তরে হেন মূঢ় নর
উভয়েই করয়ে পণ ভবমাঝে নিরন্তর।৪৩

ব্রহ্মা আদি শুদ্ধমতি সে মহাপুরুষগণ
করেছেন পুরাকালে এ জগৎ সরজন
মহাসত্ত্বশীল পৃথু ভরতাদি ভূপদল
করেছেন রক্ষা ক্ষিতি প্রকাশিয়া ভুজবল
পরশুরামাদি যত মহাত্মা বীরেন্দ্রচয়
দিয়াছেন অন্যে ইহা তৃণসম করি' জয়
পক্ষান্তরে অতুলন বীরেন্দ্র পুরুষ কোন
ভুঞ্জিছেন অখণ্ডন (?) চতুর্দ্দশ পৃথ্বী হেন
কতিপয় নগরের আধিপত্য লভি হায়
মানবের মদগর্ব্ব কি অদ্ভুত এ ধরায়॥ ৪৪

ধনীর সুচারু হর্ম্ম্য নহে সে কি মনোহর?
সুমধুর গীতবাদ্য না কি শ্রুতি-সুখকর?
অথবা সে প্রেয়সীর সুধামাখা সমাগম—
দেয় নাকি স্বর্গসুখ এ জীবনে অনুপম!
কিন্তু হায় কত কাল পার্থিব ও ভোগচয়
প্রীতিদানে আমাদের এ জীবনে শক্য হয়?
যেমতি শিখার ছায়া পতঙ্গের পক্ষ বায়
চঞ্চল হইয়া উঠে—ভোগ্য সুখ সমুদায়—
তেমতি অস্থির ভবে—অচির-বিনাশী আর—
যত্নে তাই সাধুগণ করি' ইহা পরিহার—
চির-সুখ-কামনায় অটল, প্রশান্ত মনে—
ছেদিয়া সংসার পাশ-গেছেন গহন বনে॥ ৪৫

দূরে থাকি' নিরঙ্কুশ আধিপত্য বসুধায়
ত্রিলোক রাজত্ব আমি গণিনা তৃণের(ও) প্রায়
আমার মানস শুধু ধাবিত হ'তেছে তথা
সুযুপ্ত কুরঙ্গকুল অনাকুল চিত্তে যথা;
রহে যথা হেথা সেথা শৈল শিলাস্তূপচয়
নরের শঠতা যথা লেশমাত্র নাহি রয়॥ ৪৬

মৃগ-খুরধারে যার প্রান্তভূমি বিখণ্ডিত
নবশ্যাম-তৃণদল নির্ঝর যথায় স্থিত
কুসুম-সংসর্গী চারু সুরভি যথায় বয়
পবনে তরঙ্গায়িত যথায় বিটপিচয়
তা'র শাখে নানা জাতি বিহঙ্গের কলস্বরে
যেই স্থান অবিরাম প্রাণারাম মূর্ত্তি ধরে
অসীম মঙ্গলময় সে অরণ্য-নিকেতন
কা'র মনে সুখরাশি নাহি করে বিতরণ?॥৪৭

সীমন্তিনী-ভুজলতা গহন লঙ্ঘিয়া যারা
গিয়াছেন তপোবনে চিরশান্তি রস ভরা—
দুর্জ্জনের তীক্ষ্ণধার তিরস্কার রূপ শর—
হইতে বিমুক্ত যাঁ'রা ভবমাঝে নিরন্তর—
অনাবিল শান্তি সুখ সম্ভোগে সমর্থ তা'রা—
চিরধন্য তাঁহারাই—ঈশ-প্রেম মাতোয়ারা॥
৪৮

কল্যাণ ত তোমাদের কহ হে কুরঙ্গগণ
অনাময় তোমার ত শাখাগুলি হে কানন?
তোমার ত অমঙ্গল নহে অয়ি প্রবাহিণি!
কুশল ত বটে তব কহ গো পুলিন-ভূমি!
কহ কহ শিলারাশি তোমরা ত আছ ভাল!
তোমা সবাকার সুখে মন মোর বাসে ভাল
প্রাণ-অন্তঃকর-নিজ-বাস হ'তে মোর মন
হইয়াছে কোনরূপে অতি কষ্টে নিঃসরণ (?)
হয় চির পরিচয় এখন সবার সনে
ইহাই একান্ত মম জানিবে কামনা মনে॥ ৪৯

ভোগোদ্দেশে যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন
বিরাজিত তপোবনে সে সকলই সর্ব্বক্ষণ
বল্কল পল্লব রাশি ঘনচ্ছায় তরুতল
বস্ত্র-আস্তরণ-গৃহ কার্য্য সাধে অবিরল
মনোহর ফল-মূল ক্ষুধা-প্রশমন তরে
গিরি ও নদীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে
মুগ্ধ-মৃগকুল সহ অবিরাম চলে কেলি
সৌহৃদ্য সম্পন্ন হয় বিহঙ্গ-সনেতে মেলি
চন্দ্রকর সাথে রাত্রে দীপাবলি প্রয়োজন
ব্যজনের কাজ সদা পবনেই সম্পাদন

হেন রূপ নিজায়ত্ত বিভব থাকিতে নর
কেন যাচে দীনভাবে ? এ অতি বিস্ময়কর !
॥ ৫০

ধনের মহিমা কত কীর্ত্তন করিব আর
শতমুখ কীর্ত্তনেও না হয় ঘোষণা তা'র
ভূমিরূপ শয্যা তথা—নবতৃণদল শ্যাম—
শিলাতল পূতাসন নয়নের অভিরাম—
ঘনচ্ছায় তরুতল চির-চারু-নিকেতন
শীতল নির্ঝর-বারি সুপানীয়-অনুপম—
কন্দ মূল আদি তথা ভোগ্যরাজি নিরন্তর
সহায় মৃগেন্দ্র-যূথ চির-আঁখি-মনোহর—
লভয়ে সবাই ইহা বিনা কোন প্রার্থনায়—
তথাপি কাহারও মন তপোবনে নাহি ধায়।
মাত্র সে একটি দোষ রাজে ওই তপোবনে
পর-প্রয়োজন-সাধে হ'লেও বাসনা মনে—
হইয়া থাকিতে হয় অনুক্ষণই নির্ব্ব্যাপার
ইহা বিনা দোষান্তর নাহি হেরি' তথাকার'
পান ভোজনাদি সবি অনায়াস লভ্য ব'লে
প্রার্থী আর নহে কেহ সেই চারু বনস্থলে ॥
৫১

মিটা'য়ে প্রার্থীর আশা সাধিয়া শক্রর প্রিয়
মন্থনিয়া জ্ঞানরাশি—শাস্ত্র হ'তে রমণীয়
করেন আশ্রয় শেষে যাঁ'রা দিব্য তপোবন—
তাঁ'রাই সংসার-মাঝে নিঃসন্দেহ ধন্য জন
॥ ৫২

খাদ্য হেতু ইচ্ছামত কাননের নানা ফল
শয়ন-উদ্দেশে ভূমি আচ্ছাদনে বল্কল—
কুশ-পুষ্প সমিধাদি পূজার সম্ভার কত
মৃগরূপী পুত্র কন্যা সকলি সুলভ ভ্রাতঃ!
তরুরাজী-মিত্র হেন—অনায়াসে অবিরাম
বিতরে অদন-বাস আর চারু দিব্যধাম
হেন রূপে যাহা মোরা লভি অনায়াসে বনে
দুঃখ ছাড়া অতিরিক্ত কি আছে বা
নিকেতনে ?॥ ৫৩

পার্থিব বিষয় চিন্তা ত্যজেছেন যেইজন
হর্ম্ম্য আর বনবাসে তুল্য তাঁ'র দরশন
কিন্তু যা'রা নিরন্তর মোহেতে আচ্ছন্নমতি
বিষয়-ইন্দ্রিয়-চৌরে প্রতারিত তা'রা অতি
॥ ৫৪

স্থূল আবরণ বাসে করি' অঙ্গ আবরণ
জড় পিণ্ডাকারে বসি দেখ মূঢ় বৃদ্ধজন
কহিছেন ভাবিছেন অতীত বৃত্তান্ত কথা
কি দুর্দ্দশা হায় তার কি দারুণ মর্ম্মব্যথা !
অশ্রু ও লালায় মুখমণ্ডল প্লাবিত হায়
ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস কাসে প্রাণ যেন বাহিরায়
কটিপৃষ্ঠ জানুদণ্ড বক্ষঃদেশ ভগ্ন তার
বহেনা শোণিত উষ্ণ ধমনী মাঝারে আর।
হেন দশাপন্ন তবু অতিথি ভিক্ষুকগণে
জড়িত পরুষ ভাষে যাতনা দিতেছে মনে,
মাঝে মাঝে রুক্ষভাষা বধূর কঠোর ভাষ
পশিছে শ্রবণে তার ছেদিয়া মর্ম্মের পাশ
উপেক্ষি সে ভাব কিন্তু করি ধনু প্রদর্শন
করিছে বায়স কুলে দারুণ ত্রাসিত মন,
শত আশা-পাশে হায় এখন(ও) জীবন তার
রয়েছে জড়িত দেখ কি রহস্য চমৎকার ॥
শান্তি সুখ সম্ভোগের সময় এখন(ও) হায়
হয় নাই সমাগত ও বৃদ্ধের এ ধরায় ॥ ৫৫

বিষয়ে আসক্ত জন করিলেও বনবাস
জড়িত করিয়া তায় রাখয়ে দোষের পাশ
কিন্তু অনাসক্ত জন যদিও নিবসে গেহে
তপস্যা ইন্দ্রিয়দম তার অসম্ভব নহে
আসক্তি অধর্ম্ম ত্যজি সৎকর্ম্মে নিরত হ'লে
নিকেতনই তপোবন তুল্য এই ধরাতলে ॥৫৬

সচ্ছন্দে কৃপার স্রোত যাহে না বাহিত হয়
বিবেক বলিয়া কভু সে বিবেক গণ্য নয়
যাহে না উপজে প্রীতি পরদুঃখ নিবারণে
সে পন্থা পন্থাই নয় বুঝিয়া রাখিবে মনে
পরহিংসা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাহিক যায়
সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয় সুবিপুল এ ধরায়

শাস্ত্রজ্ঞান নহে তাহা সুহূর্ত্ত সুনিশ্চয়
যাহা হ'তে শান্তিরূপ ফল নাহি সঞ্চরয় ॥ ৫৭

শৈশব যৌবন আর জরাভার নিবন্ধন
সম্মুখে বিস্তৃত হেরে এই বিশ্বে কোন জন
কাহাকেও আছে বিশ্ব চৌদিকে বেষ্টন করি'
কারও বা পশ্চাতে ইহা যেন বিদ্যমান হেরি
রমণীয় বোধে একে শিশু করে সমাদর
যুবাও দুর্লভ বোধে সেবে এরে নিরন্তর
সংসার বিষয় হ'তে হইয়াও বহিষ্কৃত
কেন হেরিতেছে পুনঃ ঐ বৃদ্ধ পিপাসিত ॥৫৮

যাহারা সংসার মাঝে বিবেক-বিমূঢ়-মন
তা'দের সংসার এই দারা পুত্র পরিজন
কিন্তু তা'রা জানে নাকো উহাই তা'দের হায়
যোগ অভ্যাসের পথে পদে পদে অন্তরায়
পক্ষান্তরে সাধুদের শাস্ত্রই সংসার পাশ—
যোগ অভ্যাসের বাধা যাহাতে লভয়ে
নাশ ॥৫৯

সুমহান্ পুণ্যরূপ পুণ্যে এই দেহতরি
করিয়াছি ক্রয় ভাই! বিপুল সৌভাগ্য ধরি'
এ হেতু যাবৎ ইহা টুটিয়া নাহিক যায়
দুঃখাব্ধি তরিতে তুমি কর যত্ন এ ধরায় ॥ ৬০

দিবা ও রজনীরূপ তটভূমি নিপাতনে
সবার আতঙ্ককর রূপ ধরি ক্ষণে ক্ষণে
এই যে কালের স্রোত কাছ দিয়ে ব'য়ে যায়
পড়িলে তাহার মুখে তরিতে নাহি উপায়
হ'য়েও বিদিত ইহা সাধুতে কলুষ আসে
বিচিত্র এ ভাবে মন বিস্ময় রসেতে ভাসে ॥৬১

রহিলেও ভোগ্যরাজি বহুকাল বিদ্যমান
ল'ভে লয় কালবশে এ নীতির নাহি আন,
অনিবার্য্য ইহা যদি; মূঢ়চেতা নরগণ
স্বেচ্ছাবশে তবে কেন নাহি করে বরজন?
আপনা হইতে যদি ভোগ্যরাজি চলে যায়
কত পরিতাপ মনে মোদের উপজে হায়—
কিন্তু যদি স্বইচ্ছায় করি উহা পরিহার
বিধানিয়া শান্তি সুখ লীন তা'রা জেনো
সার ॥৬২

সংসারঅরণ্য এই চিরভয়ঙ্কর স্থান
আবার এ দেহগেহে বহু ছিদ্র বিদ্যমান
বলবান্ কলি চৌর বিচারিছে সব স্থানে
মোহের আঁধার নিশা ত্রাস সঞ্চারিছে প্রাণে
এ সময় ঘুমঘোরে নাহি রহি অচেতন
জ্ঞান অসি ধরি' করে জাগহ হে জনগণ!
বিরতি ফলক আর শীলতা কবচ ল'য়ে
সমাহিত মনে সদা রহ স্থিরদৃষ্টি হ'য়ে ॥ ৬৩

বেদস্মৃতি পুরাণাদি পাঠে কোন্ প্রয়োজন?
কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান কেন করে নরগণ?
কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গরূপ কুটীরে বসতি বটে
তা'ও কিন্তু চিরকাল কারও না ললাটে ঘটে
ক্ষণকাল স্বর্গবাস নহে চির সুখময়
অথবা সংসারপাশ তাহে না ছেদিত হয়
মাত্র ব্রহ্ম-অর্চ্চনাই দুঃখ-মুক্তি-কালানল
স্বাত্মানন্দ পদ তাহা প্রকাশক অবিরল
বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র আর সবি ভাই! এ সংসারে
ভব ব্যাধি হ'তে ইহা তারিতে নাহিক পারে
অনুষ্ঠানে কর্ম্মকাণ্ড জন্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান
কর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল তাহাতেই বিদ্যমান
হেনরূপ বিনিময়ে চলিতেছে এ সংসার
কা'র সাধ্য এ গহন রহস্য [illegible]তে পার ॥৬৪

জরাকালে মানবের দেখ কত কষ্টকর
অঙ্গ সব সঙ্কুচিত গতি-চ্যুতি নিরন্তর
দন্তরাজি একে একে সকলি স্খলিত হয়
দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি তদা না অটুট র'য়
বক্ত্র হ'তে অবিরাম লালার ঝরণা ঝরে
কথায় বন্ধুরা আর তেমতি না সমাদরে ॥
থাকুক অন্যের কথা নিজ দেহ-অর্দ্ধাঙ্গিনী
সেবা শুশ্রূষায় হায় দিনদিনই উদাসিনী
কি আর অধিক কথা পুত্রও পূর্ব্বের মত
সাধু-ব্যবহারে আর নাহি হয় কভু রত ॥৬৫

যাবৎ শরীর সুস্থ অথবা নীরোগ র'য়
জরায় যাবৎ নাহি আক্রান্ত হইতে হয়
যাবৎ ইন্দ্রিয়-রাজি রহে দেহে বলবান্
যাবৎ আয়ুর ক্ষয় নাহি ঘটে মতিমান!

তাবৎ নিজের শ্রেয়ঃ সংসাধিত হয় যার
একমনে অবিরাম সচেষ্ট রহিবে তা'র
দীপ্তাগ্নি হইলে গৃহ নীর আহরণ তরে
কূপ খননের আশা কোন ফল নাহি ধরে ॥৬৬

রমণীয় হর্ম্ম্যতলে অবিরাম অবস্থান—
মধুর কোকিল-কণ্ঠ-গায়ক-গায়িকা গান—
প্রাণসমা প্রমদার প্রীতিভরা আলিঙ্গন—
তথাপি সংসার মাঝে বীতস্পৃহ সাধুগণ
ভ্রান্ত পতঙ্গের ওই পক্ষ-বায়ুবিকম্পিত
দীপশিখা সম উহা ভাবি' মনে অনিশ্চিত
পরিহরি সযতনে দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান বলে
পশেন গহন বনে অনাবিল কুতূহলে ॥৬৭

শত পরিচর্য্যাতেও প্রভুমনে তুষ্টি নাই
তুরগচঞ্চলচিত্ত ভবে ভূপগণ ভাই!
অসার সংসার পাশে আমরাও অনুক্ষণ
রয়েছি আবদ্ধ হায় পাসরিয়া ধর্ম্মধন
অলক্ষ্যে আসিয়া জরা করিছে যে দেহাশ্রয়
মৃত্যুও অচিরে আসি' ঘটা'বে যে পঞ্চে লয়
বারেক(ও) একথা ভাই ভুলেও করি না মনে
আছি শুধু মোহ-মদে মত্ত মোরা এ জীবনে
যা' হ'বার হ'য়ে গেছে মোহাবেশে এ ধরায়
ত্যজিয়া এখনও সব হও রত তপস্যায়,
বিনা তপস্যায় সখে! হেন কিছু নাহি আর
হ'বে যাহে অবহেলে এই ভবনদী পার ॥৬৮

জীর্ণ হ'ল হৃদিমাঝে মোর মনোরথ যত
যৌবন প্রভাব(ও) হায় হ'তে সে বসেছে গত
যে সব সদ্‌গুণে আমি হ'য়েছিনু বিভূষিত
গুণজ্ঞ অভাবে তাহা নহে এবে প্রস্ফুরিত
কিবা যে কর্ত্তব্য এবে বুঝিয়া উঠিতে নারি
সম্মুখে কৃতান্ত ওই—সকল বিধ্বংসকারী—
কাল অন্তকারী সেই মদনারি মহেশের—
চরণ ধেয়ান বিনা গতি নাই আমাদের ॥৬৯

বিশ্বাধীশ শিব আর জগদাত্মা জনার্দ্দনে
যদিও অভেদ ভাব নিরন্ত আমার মনে—
তরুণেন্দুশেখর সে মহেশ্বরে তবু মোর
বিশেষ ভকতি যেন—এ বটে মোহের
মোর ॥৭০

উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাস্নাত শান্তিময়ী সে নিশায়
জাহ্নবী-পুলিনে কবে সুখাসীন হ'য়ে হায়—
পাসরি সংসার আশা হইয়া নিশ্চিন্ত মন
"শিব" "শিব" এই নাম করি ব'সে
উচ্চারণ!
কবেই বা হৃদয়ের বাষ্পোদ্গম-নিবন্ধন—
আকুল নয়ন হ'য়ে ভবমাঝে অনুক্ষণ
উদ্বেল অন্তরে ওই "শিব" নাম উচ্চারিয়া
ভ্রমণ করিব আমি এ সংসার পাসরিয়া ॥ ৭১
তরুণ-করুণ-রস পূরিত-হৃদয়ে কবে
বিতরিয়া ধনরাশি ফুল্ল মনে এই ভবে
পরিণাম-বিষময়-ভব নদী হ'তে পার—
শ্রীহরিচরণযুগ হৃদে ধরি' অনিবার
শারদ কৌমুদী-কর-সমুজ্জ্বল নিশাকাল
যাপিয়া হইব সুখী ছেদিয়া সংসার-জাল ॥৭২
পুণ্য বারাণসী ধামে বসিয়া জাহ্নবী-তীরে
হইয়া কৌপীন-বাস ধরিয়া অঞ্জলি শিরে
কবে মোর: গৌরীনাথ! হে শম্ভো,
ত্রিপুরহর!
"হে ভব!" প্রসন্ন হও এই রবে নিরন্তর—
যাপন করিব দিন যেন নিমেষের প্রায়—
সে সুখের দিন কবে জীবনে ভাতিবে
হায় ॥৭৩

হে বিভো! মদন-অরি! অবগাহি গঙ্গাজলে
পূজিব তোমায় কবে পূত ফল পুষ্পদলে
একান্ত অন্তরে কবে ধেয়ান করিব তব
ভূধর-বিবরে কবে শিলা-শয্যা হ'ব ভব!
ফলাশী ও আত্মারাম হ'য়ে তব করুণায়
নরের দাসত্ব হ'তে কবে মুক্তি পা'ব
হায় ॥৭৪

শান্তগুণ সমন্বিত মুনিদের এ সংসারে
ভূমিই সুরম্য শয্যা গহন-বন-মাঝারে,

ভুজলতা তাঁহাদের উপাধান-সুখকর—
ব্যোম-বায়ু চন্দ্রাতপ ব্যজন সে নিরন্তর
চন্দ্রালোক তাঁহাদের যেন প্রদীপের সম
বিরতি-বনিতাসহ বাসে সুখ অনুপম—
মহান্ ঐশ্বর্য্যশালী সুখী ভূপালের প্রায়
সুষুপ্তিতে তাঁহাদের যামিনী বহিয়া যায় ॥৭৬

চির জীর্ণ শতখণ্ড কন্থা ও কৌপীন যাঁর
অনায়াসলভ্যাহার ঘটে যাঁ'র অনিবার
শয়ন যাঁহার নিত্য শ্মশানে অথবা বনে
মিত্রামিত্রে সমভাব সতত যাঁহার মনে
বিমল বিশুদ্ধচেতা হেনরূপ যোগিজন
নিখিল সংসার-সুখ করিলেও বরজন
পরম আনন্দ আর দিব্য শান্তি উপভোগে
যাপন করেন কাল ব্রহ্মের মিলন যোগে ॥৭৬

যাবতীয় সুখ-সাধ করিলেও বরজন
না ত্যজেন রাজবৎ শয়ন সন্ন্যাসিগণ
ভূমিতলে হয় পূর্ণ পর্য্যঙ্কের অভিলাষ
ভুজযুগ উপাধান—চন্দ্রাতপ মহাকাশ
বিরতিরূপিনী চারু বনিতার সঙ্গজাত—
পবিত্র প্রমোদ আদি বিদ্যমান অবিরত
পবন চামর যোগে দিব্য দিব্যাঙ্গনাগণ
ব্যজন করয়ে ভাই! ফুল্ল মনে অনুক্ষণ ॥৭৭

যোগীর মধুর বাক্য যেন অমৃতায়মান
ঘৃত-মধু হ'তে তাহে স্বাদ রস বিদ্যমান
সুধা সম তাঁহাদের সে সার-বচনে মরি,
পরম তোষেতে যায় মোদের হৃদয় ভরি
মাত্র ক্ষুধা শান্তি হেতু যাবৎ ভিক্ষায় তাই!
শক্য হ'ব আহরণে যথা মাত্র শক্তু ভাই!
তাবৎ কেবল তুচ্ছ অর্থের অর্জ্জন তরে
মাত্র না সেবিব কভু দারুণ দীনতা-ভরে
সাধুর সংসর্গে মোরা জীবন যাপিব ভবে
তা' হ'লে জ্ঞানের আঁখি মোদের প্রস্ফুট হ'বে ॥৭৮

হিংসা শূন্য অনায়াসলভ্য সদা যে পবন
বিধাতা-বিহিত উহা ভুজগের সু অশন
ব্যবস্থিত তৃণাঙ্কুর পশুনিকরের তরে
তা'তেই তাহারা কত তুষ্টি-পুষ্টি-বল ধরে
সংসার-সাগর পার পটীয়সী বুদ্ধিযুত—
মানবগণের তরে বিধাতাও সেই মত—
বিটপীর পত্র আর সুস্বাদু নির্ঝর জল—
রেখেছেন যোগাইয়া ভবমাঝে অবিরল—
কিন্তু নর নিজ দোষে অবিরাম ভাবে হায়
বৃথা লালায়িত হ'য়ে অশেষ যাতনা পায় ॥৭৯

শালি অন্ন শাক আদি খাদ্য ভাই ক্ষুধাগমে,
তৃষ্ণায় সরসী জল কাম-তৃপ্তি স্ত্রী-সঙ্গমে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা কামরূপ ব্যাধি দেহে যে সকল
তা'দের ঔষধি ভবে এই গুলি অবিরল—
কিন্তু অজ্ঞ জনগণ ভাবি ইহা সুখকর—
বিপরীত ব্যবহার করে ভাই! নিরন্তর ॥৮০

অয়ি মা কমলে! তুমি ত্যজিয়া এখন মোরে
অন্যের সকাশে যেয়ে বাঁধ' তায় মোহডোরে,
ভোগের বাসনা আমি করিয়াছি পরিহার
নিঃস্পৃহ-সকাশে তব কি আদর হ'বে আর?
পবিত্র-পলাশ পত্রে লব্ধ শক্তু যোগে এবে
জুড়া'ব জঠর জ্বালা ইহা মা রেখেছি ভেবে,
এখন তোমায় ল'য়ে কি কাজ আমার আর!
হ'য়েছি যখন আমি পুণ্য বলে মোহপার ॥৮১

লীলা-বিকশিত কাম-লালসা-পূরিত আর
দৃষ্টি নিক্ষেপণে বালে! বল' কি ফল তোমার
ক্ষান্ত হও ধনি! এবে ক্ষান্ত হও এ মিনতি
বৃথা পরিশ্রমে তব কহ কেন হেন মতি?
মোদের হইতে এবে বাল চপলতা-গত
অন্যরূপে আমাদিগে এখন ভাবহ মাতঃ!
কানন-নিবাসে এবে মোদের পরম সুখ
নষ্ট মোহ এবে মোরা-অপগত সব দুখ
এখন আমরা মাগো! অখণ্ড এ ভূমণ্ডল—
তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি অবিরল ॥৮২

ইন্দীবর-দল-শোভী নেত্রবাণ নিরন্তর
ক্ষেপণ করিছে মরি এ রমণী মোর'পর

না জানি অন্তরে এর আছে কোন্ অভিলাষ ?
বিযুক্ত আমরা এবে হইতে মোহের পাশ
শান্ত একে আমাদের কন্দর্প-কুসুম আশা
তথাপি না ক্ষান্ত হায় এ চারু বরাকী বাশা॥

৮৩

হতজন ও কন্দর্পের পীড়া হ'তে মুক্ত নয়
ইহা হ'তে এ জগতে আছে আর কি বিস্ময় !
কাণ-কৃশ-খঞ্জ আর কর্ণ-পুচ্ছ-বিরহিত
ব্রণাঙ্গ নির্লোম হায় কৃমি পূঁয-সম্পূরিত
নৃ-কঙ্কাল গলদেশ হ'লেও বিক্ষত-ক্ষত
ক্ষুত্তৃষায় জীর্ণ শীর্ণ রহিয়াও অবিরত—
অভাগা কুক্কুর দেখ সম্ভোগের লালসায়—
কুক্কুরীর পিছে পিছে কামমত্ত হ'য়ে ধায়॥ ৪

কোদণ্ড-টঙ্কারে তোর নাহি ভয় রে মদন !
তোর করযুগই ইথে পায় ব্যথা অকারণ—
সুন্দরি ! তোমার ওই সুস্নিগ্ধ-বিলাসময়—
চঞ্চল কটাক্ষে আর নহে ক্ষুব্ধ এ হৃদয়
হে সুকণ্ঠ পিকবর ! তুমিও বিরত হও
মৃদু কলরবে আর বৃথা কেন কষ্ট পাও
চন্দ্রচূড় মহেশের পদধ্যানামৃত পিয়া—
তুচ্ছ জ্ঞানে এ সংসার আছি আমি পাসরিয়া॥

৮৫

ক্ষান্ত হও বুধগণ ! নারী-সঙ্গ সুখ হ'তে
ক্ষণেকের তরে উহা বহমান এ মরতে
দয়া মৈত্রী-প্রজ্ঞারূপী অঙ্গনাসংসর্গে ভবে—
প্রবৃত্ত হও না আসি চির তৃপ্তি লাভ হ'বে
তরুণীগণের ওই কেয়ূর-শোভিত ঘন—
মানস-লোচন-হর বক্ষোদেশে চারু স্তন
আর সে মধুর ধ্বনি সমন্বিত মণিময়—
মেখলা-ভূষিত চারু শ্রোণিবিম্ব সমুদয়—
নরকে তোমায় নাহি সাহায্য করিবে দান —
তবে কেন মোহে তা'র ভ্রান্ত তুমি মতিমান্

॥৮৬

সাধ যদি দাও গালি ধ'রিয়া রসনা শত
গালিদানে জিহ্বা মোর কখন নহেক রত
"শিব" "শম্ভো" এই রব মাত্র-এই রসনায়-
হ'বে উচ্চারিত ভাই ! মজি শিব-সাধনায়
ল'য়ে এ পবিত্র নাম ভব মাঝে যোগিগণ
যাপন করেন কাল-প্রশান্ত প্রফুল্ল মন ॥৮৭

পুরাযুগে জ্ঞানীদের অখণ্ড এ ভূমণ্ডলে
হ'ত ক্লেশ-নিবারিত শুধু দিব্য বিদ্যাবলে
ভোগ্য সুখ-বর্দ্ধনাশে বিষয়ীরা অনন্তর
করিতেন মহাযত্নে সে বিদ্যার সমাদর
কিন্তু কি দুঃখের কথা তুচ্ছ ধনীরাও এবে
ভুলেও সে মহাবিদ্যা আর না কেহই সেবে
বর্ত্তমানে সকলেরি ঔদাসীন্য-নিবন্ধন
দিন দিন ক্ষীণ জ্যোতি সে বিদ্যা পরম ধন॥

৮৮

নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ মানি' মত্ত বারণের মত
অজ্ঞ কালে রহিতাম গর্ব্বী আমি অবিরত
কিন্তু গুরু প্রসাদাৎ কিঞ্চিৎ শিখিনু যবে
বুঝিলাম কিছু মোর জানা হয় নাই তবে ॥৮৯

বিদ্যাবলে সাধুদের মাৎসর্য্যাদি পায় লয়
তুচ্ছ জ্ঞানে দুর্জ্জনেরা পরন্তু গর্ব্বিত হয়
মুক্তির সাধনোপায় সংযমীর যেই স্থান
কাম-পীড়িতের তথা কামোন্মাদই বর্দ্ধমান ॥

৯০

যথায় উদ্যান মাঝে দিব্য ভোগ্য বিদ্যমান
যথায় করেন যোগী ঘোর তপঃ অনুষ্ঠান
কৌপীনই যথায় ভাই মহামূল্য দিব্য বাস
অনায়াসলব্ধ ভিক্ষা যথায় মিটায় আশ
মৃত্যুও যথায় ভাই ! নিত্য সুখ শুভকর
ত্যজি' হেন কাশীবাস কেন বাস স্থানান্তর ?

৯১

ধনমান বন্ধু আর যৌবন ও পরিজন
বিনাশ লভিতে ভবে বসে যবে হে রাজন !
প্রার্থীরা হতাশ হ'য়ে প্রত্যাবৃত্ত হয় যবে
জাহ্নবীর পয়ঃপূত গিরির কন্দরে তবে—

করিবেন বাস সদা বুদ্ধিমান্ জনগণ
ইহা হ'তে শ্রেয়ঃ কিছু নাহি করি দরশন ॥৯২

মনোহর শৈল শিলা মহার্হ শয়ন যাঁর
গিরিগুহা গৃহস্থান হয় যাঁর অনিবার
তরুর বল্কল যাঁ'র পরিধান কার্য্য করে
বন্য পশুপক্ষী যাঁ'র সখ্য ও সৌহৃদ্য ধরে
কাননের ফল মূল উপাদেয় খাদ্য যাঁর
ঝরণার জল পানে শান্তি যাঁর পিপাসার
বিদ্যারূপা নারীসহ কেলি যাঁ'র অনুক্ষণ
তুচ্ছজ্ঞান যাঁ'র কাছে নীচজন উপাসন
নির্ম্মল শান্তি হেন পূতপ্রাণ সাধুজনে
ঈশ্বর সমান ভক্তি করি মোরা মনে মনে ॥৯৩

বিধাতার অনিবার্য্য চিরনীতি অনুসারে
অত্যুচ্চ ভূধররাজি ধরাশায়ী এ সংসারে
নানাবিধ জলজন্তু-সমাকীর্ণ পারাবার
নিমিষে শুকায়ে যায় কিপ্রভাব বিধাতার !
হইলেও পৃথ্বী এই নগরাজি-সংরক্ষিত
হইবে যখন তাই ! মহাকাল-কুক্ষিগত ?
তখন মানবে এই কথা কিবা আছে আর
করুভ-কর্ণের প্রায় চঞ্চল যা' অনিবার ॥ ৯৪

অভ্রংলিহ অট্টালিকা নগনদী উপবন
সুদুস্তর পারাবার ধ্বংস হয় হে রাজন !
সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অণুমাত্র রূপে হায় —
হইবেক পরিণত সংশয় নাহিক তা'য়
জল-বুদ্বুদের প্রায় ক্ষণধ্বংসী এ জীবন
তুচ্ছ অতি এ সংসারে বুঝে দেখো ভ্রান্তমন
৯৫

ধারণা আছিল আগে "তুমি""আমি" এক নয়
সে ভেদ গিয়াছে টুটে এবে সবই একময়
যেই তুমি সেই আমি নাহি কোন ভেদ আর
অভেদ এ জ্ঞানই ভাই ! জ্ঞানের চরম সার ॥
৯৬

মাতা ভ্রাতা সখা বন্ধু তাতরূপী ভূতগণ !
ক'রেছ তোমরা মোর বহু শ্রেয়ঃ সংসাধন
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আমি আজি তোমা সবাকার
পবিত্র চরণ তলে করিতেছি নমস্কার
অবিরাম তোমাদের সহবাসজাত পুণ্যে
লভেছি যে দিব্যজ্ঞান লভে তাহা নহে অন্যে
তাহাতে তাবৎ মোহ অপগত নিবন্ধন
ব্রহ্মে লীন হ'তে আমি এখন সংন্যস্তমন
তোমাদের সহ মোর না হ'বে সাক্ষাৎ আর
চির জীবনের মত এই শেষ সাক্ষাৎকার ॥৯৭

শ্রীহরিগোপাল বসু।

সতর সাল।

কি ভীষণ ধূম-তারা বক্ষ মাঝে ধরি,
দীর্ঘ পুচ্ছে কলুষিত করি ধরাতল,---
বাতাতপে দগ্ধ করি তরু-লতা-জীব
নাশিলে আদর্শ দীর্ঘ জীবনী সকল।
কোন্ রূপে এসেছিলে ধরি রুক্ষবেশ,
বলিতে পার কি এবে ওহে বর্ষশেষ ?
এক মনে জপিতেছি বিদায়ের দিন ;
ভয়ে ভাবি কত কথা আকাশ পাতাল।
ও কঠোর যমরূপে আসিও না আর ;
চলে যাও চলে যাও হে সতর সাল ?

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।